কাসাসুল আম্বিয়া

[নবী (আ)-গণের জীবনকথা]

WWW.BANGLAKITAB.COM

মূল

আল্লামা ইব্‌নে কাছীর (রহ)

অনুবাদ

মুফ্‌তী মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন

ফাযেলে দেওবন্দ, ইফ্‌তা হাটহাজারী মাদ্রাসা

মুফতী, জামিয়া মাউনতলা, বরিশাল

সম্পাদনায়

মুফাস্‌সিরে কুরআন মাওলানা শামসুল হক

কামেল তাফসীর (১ম শ্রেণী), হাদীস (১ম শ্রেণী), এমএ (১ম শ্রেণী)

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স

পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা) | ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ | ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

WWW.BANGLAKITAB.COM

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র এবং দুরূদ ও সালাম তাঁর মনোনীত নবী ও রাসূলদের উপর। মহান আল্লাহ্ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁদের একমাত্র ব্রত। তাঁরা ছিলেন মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের ঈমান, আকীদা, ইখলাস, সততা, বিশ্বস্ততা, আখলাক, ইবাদত, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ছিল উচ্চতম ও অনুপম। তাই তাঁদের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ রয়েছে। তাঁদের অনুসরণ ব্যতীত শান্তি, সফলতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যায় না। তাই তাঁদের পবিত্র জীবনী সম্পর্কে অবহিত হওয়া অতি প্রয়োজন। তাঁদের জীবনকথায় রয়েছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ও পথ-নির্দেশনা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ 'তাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা।' (সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ১১১)

বস্তুত তাঁদের অনুসরণ না করে পৃথিবীতে কিছু পরিমাণ উন্নতি লাভ করা সম্ভব হলেও আখিরাতের জীবনে সফলতা লাভ করা তাঁদের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। সেখানে মুক্তি ও শান্তি পেতে হলে নবী-রাসূলদের আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। তাই কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে ঃ 'বলো, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।'

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ৩২)

শরীআতের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে স্বপ্ন অথবা ইলহাম অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে যাঁর প্রতি বিশেষ ওহী নাযিল করা হয়েছে, তিনিই নবী (মুফতী আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃঃ ৫২১)। নবীদের প্রতি দীন প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আর শরীআতের পরিভাষায় রাসূল হলেন এমন এক মানুষ, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁর প্রতি শরীআতের বিধান ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এবং একই সাথে শরীআতের বিধান প্রচারের দায়িত্বও তাঁকে প্রদান করেছেন (মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, আন-নুবুওয়্যা ওয়াল আম্বিয়া, পৃঃ ১৭)। কারো কারো মতে তিনিই রাসূল, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ও মনোনীত হয়েছেন।

(আন-নাসাফী, শারহু আকাইদ, পৃঃ ৪০)

প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে যে সকল পয়গাম্বরের প্রতি কিতাব বা সহীফা নাযিল করা হয়েছে এবং যাঁদেরকে নতুন শরীআত দেয়া হয়েছে, তাঁরাই রাসূল। সকল রাসূলই নবী। নবীগণ পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রচারিত শরীআতের অনুসরণ করেন এবং মানুষের মধ্যে তা প্রচার করেন। কাজেই প্রত্যেক নবী রাসূল নন। নবী-রাসূলগণ সকলেই জ্ঞানী, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন। সর্বোপরি তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে মহৎ আদর্শে ও উন্নত চরিত্রে ভূষিত করেছেন। তাঁরা সকল সৎগুণের অধিকারী। তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছেন। সত্য প্রচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই তাঁদের কর্ম। তাঁরা সবকিছুই আল্লাহ্‌র নির্দেশে করেছেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি যেই দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছেন, তা পালন করতে তাঁরা বিন্দুমাত্র অলসতা প্রদর্শন করেননি। প্রয়োজনে এ জন্য তাঁরা তাঁদের জীবন কুরবান করেছেন।

নুবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ্‌র দান। তিনি তাঁর বান্দাসমূহের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। নিজের চেষ্টা-সাধনায় তা হাসিল করা যায় না। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ 'আল্লাহ্

ফেরেশতাদের মধ্য হতে মনোনীত করেন রাসূল এবং মানুষের মধ্য হতেও। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।' (সূরা হাজ্জ ঃ আয়াত ৭৫)

নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষ যখন পাপ- পংকিলতায় লিপ্ত হয়ে মনুষ্যত্বহারা হয়ে যায়, স্রষ্টার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না, এমনকি সে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিবিধ অমূলক ধারণা পোষণ করে এবং তার সঙ্গে সৃষ্টবস্তুকে শরীক করতে থাকে, তখন মানব সমাজে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁর খাস রহমতে মানবজাতিকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তা ছাড়া, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি সীমিত। সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মহান আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচয় লাভ করতে মানুষ সক্ষম হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষকে সঠিক পথে চলার দিশা প্রদান করেন এবং তার নিজের কিছু পরিচয় প্রদান করে মানুষকে তাঁর নৈকট্য লাভের সুযোগ দান করেন। কাজেই নবী-রাসূলদের আবির্ভাব আল্লাহ্র অসীম করুণারই প্রকাশ। তাই ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি নুবুওয়াত ও রিসালাত অস্বীকার করলো, সে প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্কে চিনতে পারলো না।'

নবী-রাসূলের আগমন না হলে বলতে পারতো, আমরা জানতে পারিনি বলেই সৎপথ অবলম্বন করতে পারিনি। তাই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ 'আমি সুসংবাদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে।' (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ 'প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে, তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হয়নি। (সূরা ইউনুস ঃ আয়াত ৪৭)

'আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি।' (সূরা নাহল ঃ আয়াত ৩৬)

'এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে হিদায়াতকারী (পথ-প্রদর্শক)।' (সূরা রা'দ ঃ আয়াত ৭)

নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা কত? এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) তাঁর মুসনাদে হযরত আবূ যার্র গিফারী (রা.) হতে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বললেন, হযরত আদম (আ.)। আমি বললাম, তিনি কি নবীও ছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হাঁ, তিনি আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী নবী। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, তিনশত দশের কিছু অধিক। আরেকটি রিওয়ায়াত হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আবূ যার্র গিফারী (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রাসূল হলেন তিনশত পনের জন। একটি বড় দল (মিশকাত)। কোন কোন বর্ণনায় দুই লাখ চব্বিশ হাজারের উল্লেখও পাওয়া যায়। (আন-নাসাফী, শারহুল আকাইদ, পৃঃ ১৩১)

আমার প্রিয় ভাই বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স-এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মাদ শিহাবউদ্দিন তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে নবী-রাসূলগণের জীবনকথা উপর একখানা কিতাব প্রকাশ করার আগ্রহ পেশ করে এ সম্পর্কিত একখানা কিতাব লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। দীর্ঘদিন থেকে আমিও

WWW.BANGLAKITAB.COM

নবী-রাসূলগণের জীবনকথা উপর একখানা কিতাব লেখার আগ্রহ মনে মনে পোষণ করে আসছিলাম। সুতরাং এ দায়িত্ব আমি আগ্রহের সাথেই পালন করতে রাজি হলাম। নিঃসন্দেহে নবী-রাসূলদের জীবনী সম্পর্কীয় বহু বই-পুস্তক দেশের বই বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমঝদার পাঠক সমাজ ভাল করেই অবগত আছেন যে, ঐসব বই-পুস্তককে কিস্সা-কাহিনী ও পুরাতন ঘটনার সমষ্টি বলা গেলেও ইতিহাসের সাথে তার ন্যূনতম সম্পর্ক বিদ্যমান নেই।

এ বিষয় নির্ভরযোগ্য কিতাব নির্বাচন করতে গিয়ে **"কাসাসুল আম্বিয়া"** কেই নির্বাচন করলাম। যার মূল লেখক **আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছীর (রহ)**। কিতাবখানার উর্দূ অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মাদ আসগার সাহেব (জামিয়া দারুল উলূম, করাচী)। আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ) তাঁর এ কিতাবে হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা ﷺ পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলগণের জীবনকথা সংকলন করেছেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে নবী-রাসূলগণের কিস্সাগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন নবী-রাসূলগণের গোটা জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কিতাবখানা আমার কাছে খুবই পছন্দ হলো। কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করা হলে অনেকেই নবী-রাসূলগণের কর্মময় জীবন সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন এ ধারণায় আমি উর্দূ কিতাবখানার অনুবাদ শুরু করি। আয়াতে কারীমার তরজমায় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আল্ কুরআনুল কারীম ও আল্ বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে সহযোগিতা নিয়েছি। আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে অল্প দিনের মধ্যেই অনুবাদের কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপিটি ভাই মুহাম্মাদ শিহাবউদ্দিন-এর হাতে অর্পণ করি।

অবশেষে ধন্যবাদ জানাই **'বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স'**-এর কর্ণধার **জনাব মুহাম্মাদ শিহাবউদ্দীন** সাহেবকে। তিনি এই গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের পরম ধন্যবাদার্হ হয়ে গেলেন।

অসংখ্য সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক সেই বিশ্বনবী-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর; যিনি আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবীরূপে নিজের জীবন ও সাধনা দিয়ে জগতের বুকে মনুষ্যত্ব ও মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। সেই সাথে রেখে গিয়েছেন মানবজাতির চিরকালের মহাসনদ পবিত্র কুরআন ও নিজের জীবন ও সাধনার নির্যাস সুন্নাহ যা তাঁর অনুসারীদের চিরকালের পাথেয়। যা আঁকড়ে থাকলে পৃথিবীতে কেউ তাদের বিপথগামী করতে পারবে না; ইহ-পরকালে কেউ তাদের পরাজিত ও পরাভূত করতে পারবে না। জীবনে চলার পথে এ গ্রন্থও হোক তাঁর অনুসারীদের অন্যতম সাথী, পথ-প্রদর্শক, বন্ধু ও আলোকবর্তিকা।

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
তারিখ, ০১-০১-২০১৩ ইং।

বিনীত
মুফ্তী মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দিন
ফাযেলে দেওবন্দ, ইফ্তা হাটহাজারী মাদ্রাসা
মুফতী, জামিয়া মাউনতলা, বরিশাল।

WWW.BANGLAKITAB.COM

WWW.BANGLAKITAB.COM

সূচিপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা ২৫

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি ২৫
হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি ২৫
হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ২৬
হযরত আদম (আ)-কে সিজদার আদেশ ২৮
হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর বেহেশতে বসবাস ৩৩
অস্থায়ী জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর বসবাস ৩৪
নিষিদ্ধ বৃক্ষের নাম ৩৫
আদম (আ)-এর বসবাসের স্থান বেহেশতে ছিল, না পৃথিবীতে? ৩৬
হযরত আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার বাধানুবাদ ৪৮
হাদীসে আদম (আ)-এর সৃষ্টির আলোচনা ৫২
জান্নাতী, জাহান্নামী ও রোগাক্রান্ত আদম সন্তানদের বিবরণ ৫৫
আদম সন্তানের অঙ্গীকার ৫৭
বিতাড়িত ও অপমানিত ইবলীস ৬০
বেহেশতে আদম (আ)-এর অবস্থানকাল ৬০
বেহেশতে অবস্থানকাল সম্পর্কে মতান্তর ৬০
পৃথিবীতে আদম (আ)-এর সর্বপ্রথম খাদ্য ও বস্ত্র ৬১
কাবীল ও হাবীলের ঘটনা ৬২
হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের স্তার লাভ ৬৬
হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকাল ও নিজ পুত্র হযরত শীস (আ)-কে ওসীয়ত ৭১

হযরত ইদরীস (আ)-এর ঘটনা ৭৩

হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা ৭৫

বংশ পরিচয় ৭৫
নূহ (আ)-এর আবির্ভাব ৭৬
হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে কুরআনের বাণী ৭৬
পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ (আ) ৯১
তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত ৯২
নিজ পুত্র সম্পর্কে নূহ (আ)-এর আল্লাহর কাছে আবেদন ১১০
আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযরত নূহ (আ)-এর প্রশংসা ১১৪
হযরত নূহ (আ)-এর রোযা পালন ১১৫
হযরত নূহ (আ)-এর হজ্জ আদায় ১১৫

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয় পৃষ্ঠা

ছেলের প্রতি হযরত নূহ (আ)-এর ওসিয়ত ১১৫
হযরত নূহ (আ)-এর বয়স ১১৬
হযরত নূহ (আ)-এর রওযা শরীফ ১১৬

হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনা ১১৭

বংশ পরম্পরা ১১৭

হযরত সালেহ (আ)-এর কাহিনী ১৪২

পাথর থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া ও ছামূদ জাতির ধ্বংস ১৫২
তবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় হিজর উপত্যকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবতরণ ১৬০

আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা ১৬৩

বংশ পরম্পরা ১৬৩
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে খোদা দাবিদার এক যালিম বাদশাহর বাকবিতণ্ডা ১৮০
বিতর্কের তারিখ ১৮২
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন ১৮৩
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম ১৮৯
নির্জন মরু অঞ্চলে হাজেরা (রা) ও শিশু ইসমাঈল (আ) ১৯১
ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মা হাজেরা (রা)-কে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ফারান পাহাড়ে হিজরত এবং কা'বা ঘর নির্মাণ ১৯১

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনা ১৯৭

কে ছিলেন যাবীহুল্লাহ ২০০
হযরত ইসহাক (আ)-এর আগমন ২০১
কা'বা ঘর নির্মাণ ২০৮
প্রসঙ্গত : আলোচনা ২১১
বেহেশতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাসাদ ২২৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শারীরিক অবয়ব ২২৮
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তেকাল ও তাঁর বয়স ২২৯
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মস্থান ২২৯
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ২৩১

হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা ২৩২

হযরত শোআইব (আ)-এর কাহিনী ২৫২

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ২৬৯
হযরত ইসমাঈল (আ) ২৬৯
হযরত ইসহাক (আ) ২৭২

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা ২৭৮

হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন ও পরবর্তী ঘটনা ২৭৯
হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যুলায়খার প্রেম ২৮৮

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
জেলখানায় ইউসুফ (আ)	২৯৪
বাদশাহর স্বপ্ন	২৯৮
হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে তাঁর ভাইদের আগমন	৩০৩
হযরত ইউসুফ (আ)-এর শানস ব্যবস্থা	৩১৭
হযরত ইউসুফ (আ)-এর দো'আ	৩১৮
হযরত ইউসুফ (আ)-এর ওসিয়ত	৩২০
হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা	৩২১
হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর ঘটনা	৩২৮
ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রসমূহের বর্ণনা	৩৩০
আসহাবুর রাস	৩৩১
ইয়াসীন সম্প্রদায়ের ঘটনা	৩৩৪
হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা	৩৩৮
হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা	৩৪৬
নাম ও বংশ পরম্বরা	৩৪৬
হযরত মূসা (আ)-এর মাদইয়ান থেকে বিদায়	৩৫৯
পরাজিত হওয়ার পর ফেরআউনের কর্মসূচী	৩৮০
ফেরআউনকে তার বাহিনীসহ ধ্বংস	৩৯৫
বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা	৪০৮
বনী ইসরাঈলের তীহ ময়দানে অবস্থান ও বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন	৪১১
আল্লাহ তা'আলা ও মূসা (আ)-এর মধ্যে কথাবার্তা	৪১৭
মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে তার জাতির অবস্থা	৪২১
পথভ্রষ্ট জাতির কাছে মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন	৪২৩
মূসা (আ)-এর আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন	৪২৮
বনী ইসরাঈলের গাভীর ঘটনা	৪৩৩
মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর ঘটনা	৪৩৫
হযরত মূসা ও খিযির (আ) সম্পর্কিত ঘটনার কিছু কথা	৪৩৮
হযরত মূসা (আ)-এর জীবনে প্রথম পরীক্ষা	৪৪২
মূসা (আ)-এর মায়ের অবস্থা	৪৪৪
মূসা (আ)-এর আঘাতে এক কিবতী মারা যাওয়ার ঘটনা	৪৪৬
মূসা (আ)-এর মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা	৪৪৭
ফেরআউনের কাছে হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর আগমন	৪৪৯
বনী ইসরাঈলের পরবর্তী ঘটনাসমূহ	৪৫১
মীনার তৈরি	৪৫৪
কারুনের সাথে মূসা (আ)-এর ঘটনা	৪৫৬
হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	৪৬০

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর আলোচনা	৪৬২
মূসা (আ)-এর হজ্ব পালন	৪৬৫
মূসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য	৪৬৫
হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল	৪৬৬
প্রসঙ্গত আলোচনা	৪৬৬
হযরত ইউশা (আ)-এর নবুওয়াত ও বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব গ্রহণ	৪৬৯
বালআম ইবনে বাউরের ঘটনা	৪৭২
হযরত খিযির (আ)-এর ঘটনা	৪৭৭
হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ	৪৭৯
খিযির (আ) কি এখনো জীবিত?	৪৮০
একটি আশ্চর্য ঘটনা	৪৮২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় খিযির (আ)-এর উপস্থিতি	৪৮৪
হযরত ইলইয়াস (আ)-এর ঘটনা	৪৯১
হযরত হিযকীল (আ)-এর ঘটনা	৪৯৫
হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)-এর ঘটনা	৪৯৮
হযরত শামুয়েল (আ)-এর ঘটনা	৪৯৯
বংশ পরম্পরা	৪৯৯
হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা	৫০৫
বংশ পরম্বরা	৫০৫
হযরত দাউদ (আ)-এর রাজ্য শাসন	৫০৮
হযরত দাউদ (আ)-এর বয়স	৫১৪
হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাত	৫১৫
হযরত সোলায়মান (আ)-এর ঘটনা	৫১৭
হযরত সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বকাল, আয়ুষ্কাল ও ওফাত	৫৩৪
শা'ইয়া ইবনে আমসিয়া (আ)-এর ঘটনা	৫৩৬
আরমিয়া ইবনে হালকিয়া (আ)-এর ঘটনা	৫৩৮
বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের দুঃখজনক ঘটনা	৫৩৮
হযরত দানিয়াল (আ)-এর ঘটনা	৫৪৯
বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর পুণঃ নির্মাণ এবং বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয়বার একত্রিত হওয়া	৫৫১
হযরত উযায়র (আ)-এর ঘটনা	৫৫৪
হযরত উযায়র (আ)-এর নবুওয়াত	৫৫৭
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা	৫৫৯
হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মারার কারণ	৫৬৮

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনা	৫৭২
মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ)-এর ঘটনা	৫৭২
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের বিবরণ	৫৮২
আল্লাহ সন্তান গ্রহণ ও অপবাদকারীদের অপবাদ থেকে পবিত্র	৫৯৩
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান, শৈশবকাল ও ওহীর সূচনা	৬০১
চার আসমানী কিতাব নাযিলের সময়কাল	৬০৪
মৃত লোককে জীবিত করা	৬০৯
দস্তরখানের ঘটনা	৬০৯
হযরত ঈসা (আ)-এর হালত ও কয়েকটি উপদেশ	৬১১
হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেয়া ও শুলে চড়াবার ইয়াহুদ ও নাসারাদের মিথ্যা দাবি	৬১২
হযরত ঈসা (আ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৈহিক আকৃতি	৬১৩
শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ	৬১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বংশ তালিকা	৬১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী	৬১৫
হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ	৬১৭
আরবের অধিবাসী	৬২০
কা'বা	৬২১
কা'বার মুতাওয়াল্লী	৬২২
কা'বায় প্রতিমা	৬২২
কুরায়শ	৬২২
কুসাই	৬২২
বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া	৬২৩
আবদুল মুত্তালিব	৬২৩
আবদুল্লাহ্	৬২৩
আবদুল্লাহ বিবাহ	৬২৪
আবদুল্লাহর মৃত্যু	৬২৪
মহানবী ﷺ-এর বংশ-পরিচয়	৬২৪
পিতার দিক হতে মহানবী ﷺ-এর বংশ-পরম্পরা এরূপ	৬২৪
মহানবী ﷺ-এর মাতৃকুলীয় বংশধারা	৬২৫
ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশিত মহানবী ﷺ-এর বরকতসমূহ	৬২৫
মহানবী ﷺ-এর শুভজন্ম	৬২৫
আবদুল্লাহর ইন্তিকাল	৬২৬
দুগ্ধপান ও শৈশব	৬২৬
মহানবী ﷺ-এর প্রথম বাক্য	৬২৭
আমিনার ইন্তিকাল	৬২৮

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল	৬২৮
বালক মুহাম্মদ ﷺ-এর সিরিয়া ভ্রমণ	৬২৮
ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী	৬২৮
ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার সিরিয়া ভ্রমণ	৬২৮
হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ	৬২৯
হযরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তান	৬৩০
মহানবী ﷺ-এর কন্যাগণ	৬৩০
মহানবী ﷺ-এর অন্যান্য পত্নীগণ	৬৩০
একাধিক বিবাহ সম্পর্কে কিছু কথা	৬৩২
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা ও ফুফুগণ	৬৩৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাহারাদারগণ	৬৩৫
কা'বাগৃহ নির্মাণ ও মহানবী ﷺ-কে 'আল-আমীন' স্বীকৃতি প্রদান	৬৩৫
মহানবীর নুবুওয়াতপ্রাপ্তি	৬৩৯
ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়	৬৩৬
ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত	৬৩৭
দাওয়াতী কাজে মহানবী ﷺ-এর দৃঢ়তা	৬৩৭
ঘৃণা ছড়ান ও তার বিপরীত ফল	৬৩৮
কুরায়শদের নির্যাতন	৬৩৮
মহানবী ﷺ-এর প্রতি কুরায়শদের প্রলোভন ও তার উত্তর	৬৩৯
সাহাবীদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ	৬৪০
আবূ তালিবের ওফাত	৬৪১
মহানবী ﷺ-এর মি'রাজ	৬৪১
মি'রাজ সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্য	৬৪২
কুরায়শ কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য	৬৪৩
মদীনায় ইসলাম	৬৪৩
মদীনায় ইসলামের প্রথম মাদ্‌রাসা	৬৪৪
মদীনায় হিজরতের সূচনা	৬৪৫
মহানবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরত	৬৪৫
ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান	৬৪৫
ছাওর গুহা হতে মদীনা যাত্রা	৬৪৬
সুরাকার ঘোড়া মাটিতে দেবে যাওয়া	৬৪৬
সুরাকার স্বীকারোক্তি	৬৪৬
কুবায় অবতরণ	৬৪৭
হযরত আলী (রা)-এর কুবায় মিলন	৬৪৭
মহানবী ﷺ-এর মদীনায় প্রবেশ	৬৪৭

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিষয়	পৃষ্ঠা
মসজিদে নববী নির্মাণ	৬৪৮
ইসলামে জিহাদের নির্দেশ	৬৪৮
ইসলাম প্রচার তরবারির মুখাপেক্ষী নয়	৬৫০
রাজনীতিবর্জিত ধর্ম ও জিহাদবর্জিত রাজনীতি কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নয়	৬৫০
ইসলামী জিহাদ	৬৫৪
ইসলামী জিহাদের কয়েকটি ধারা	৬৫৫
ইসলামী জিহাদ শান্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে–অশান্তির নয়	৬৫৫
জিযিয়া কর	৬৫৭
জিযিয়ার কয়েকটি ধারা	৬৫৭
গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ	৬৫৮
গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ এবং বিভিন্ন ঘটনা	৬৫৯
সারিয়্যা-ই-উবায়দা ইবনে হারিছ	৬৫৯
দ্বিতীয় হিজরী	৬৬০
কেবলা পরিবর্তন	৬৬০
সারিয়্যাহ-ই-আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ এবং ইসলামে সর্বপ্রথম গনীমত	৬৬০
বদর যুদ্ধ	৬৬০
আবূ জাহলের পতন	৬৬২
বিরাট মু'জিযা	৬৬৩
যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ	৬৬৩
ইসলামী সাম্য	৬৬৩
আবুল আসের ইসলামগ্রহণ	৬৬৪
লেখাপড়ার গুরুত্ব	৬৬৪
এ বছরের কতিপয় ঘটনা	৬৬৪
তৃতীয় হিজরী	৬৬৫
হযরত হাফসা ও যায়নাবের সাথে বিবাহ	৬৬৫
উহুদের যুদ্ধ	৬৬৫
সেনা-বিন্যাস	৬৬৫
মহানবী ﷺ আহত হলেন	৬৬৭
সাহাবীদের আত্মত্যাগ	৬৬৭
চতুর্থ হিজরী	৬৬৮
বি'রে মাউনা অভিমুখে সারিয়্যা-ই-মুনযির (রা)	৬৬৮
পঞ্চম হিজরী	৬৬৮
কুরায়শ-ইহুদী আঁতাত	৬৬৮
পরিখা-যুদ্ধ	৬৬৮
আল্লাহ্র সাহায্য	৬৬৯

www.BANGLAKITAB.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ হিজরী	৬৬৯
হুদায়বিয়ার সন্ধি	৬৬৯
মহানবী ﷺ-এর মু'জিযা	৬৬৯
বিশ্বের শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত	৬৭০
হযরত খালিদ ইব্‌নে ওয়ালীদ (রা) ও হযরত আমর ইব্‌নে আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	৬৭১
সপ্তম হিজরী	৬৭১
খায়বারের যুদ্ধ	৬৭১
ফাদাক বিজয়	৬৭১
উমরাতুল কাযা	৬৭২
অষ্টম হিজরী	৬৭২
মু'তার যুদ্ধ	৬৭২
মক্কা বিজয়	৬৭২
মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদের সাথে মুসলমানদের আচরণ	৬৭৩
মহানবী ﷺ-এর মহত্ত্ব ও আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	৬৭৩
হুনায়নের যুদ্ধ	৬৭৩
তায়েফ যুদ্ধ	৬৭৪
উমরা-ই-জি'রানা	৬৭৪
নবম হিজরী	৬৭৪
তাবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন	৬৭৪
কয়েকটি মু'জিযা	৬৭৫
মসজিদে যিরারে অগ্নি-সংযোগ	৬৭৫
প্রতিনিধি দলের আগমন	৬৭৫
দলে দলে ইসলাম গ্রহণ	৬৭৫
ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল	৬৭৫
দশম হিজরী	৬৭৬
বিদায় হজ্জ	৬৭৬
বিদায় হজ্জের ভাষণ	৬৭৬
একাদশ হিজরী	৬৭৭
সারিয়্যাহ-ই-উসামা	৬৭৭
মহানবী ﷺ-এর অন্তিম পীড়া	৬৭৭
হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতী	৬৭৭
শেষ নবীর শেষ ভাষণ	৬৭৭
মহানবীর সর্বশেষ বাক্যসমূহ	৬৭৮
মহানবী ﷺ-এর মহান চরিত্র ও মু'জিযা	৬৭৮
মহানবী ﷺ-এর মু'জিযা	৬৭৯
	৬৮০

WWW.BANGLAKITAB.COM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা

হযরত আদম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ط فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

অর্থ : (হে নবী! ঐ সময়ের কথা একটু খেয়াল করুন) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা[১] বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতারা আরয করল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে এর ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে ও খুন-খারাবি করবে? আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ করা ও আপনার পবিত্রতা বয়ান করার কাজ তো আমরাই করছি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এ সব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে

১. 'খলীফা' তাকে বলে, যে কারো মালিকানায় থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মালিকের দেওয়া ক্ষমতা ও অধিকার ব্যবহার করে।

WWW.BANGLAKITAB.COM

বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে, খলীফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এ সব জিনিসের নাম বল দেখি। তারা আরয করল, শুধু আপনিই তো সব দোষ থেকে পবিত্র রয়েছেন। আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আসলে শুধু আপনিই সবকিছু জানেন ও বুঝেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! তুমি এ সব জিনিসের নাম তাদেরকে বলে দাও। যখন তিনি তাদেরকে ঐ সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, আমি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয় জানি (যা তোমরা জানো না)। তোমরা যা প্রকাশ কর তাও আমার জানা আছে, আর যা তোমরা গোপন রাখ তাও আমি জানি। তারপর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম, 'আদমের সামনে নত হও' তখন ইবলীস ছাড়া সবাই নত হলো। সে অস্বীকার করল ও অহংকার প্রকাশ করল এবং কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। এরপর আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার বিবি দুজনেই বেহেশতে থাক এবং সেখান থেকে যা ইচ্ছা তাই মজা করে খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না, তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে। শেষ পর্যন্ত শয়তান দুজনকেই (ঐ গাছের লোভ দেখিয়ে আমার হুকুম পালন করা থেকে) সরিয়ে নিল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়ল। আমি তখন হুকুম দিলাম, এখন তোমরা সবাই এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদেরকে দুনিয়ায় একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকতে হবে এবং সেখানেই জীবনযাপন করতে হবে। ঐ সময় আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু কথা শিখে তওবা করল, যা তার রব কবুল করে নিলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখনই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াত মেনে চলবে তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। আর যারা তা মানতে অস্বীকার করবে, আর আমার আয়াতগুলো মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।–সূরা বাকারা : ৩০–৩৯

إِنَّ مَثَلَ عِيسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অর্থ : আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা আদমের মতো। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হুকুম দিয়েছেন যে হয়ে যাও, আর সে হয়ে গেল।[১] –সূরা আলে ইমরান : ৫৯

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا .

অর্থ : হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐ আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে নিজেদের হক দাবি করে থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন। –সূরা নিসা : ১

অনুরূপভাবে সূরা হুজুরাতে বর্ণিত আছে—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ .

১. অর্থাৎ, শুধু 'বিনা পিতায়' জন্ম হওয়াই যদি কারো পক্ষে আল্লাহর ছেলে হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা খ্রিষ্টানদের পক্ষে আরো বেশি উচিত ছিল। কারণ, মাসীহ (আ)-এর জন্ম তো শুধু পিতা বিহীন হয়েছিল; কিন্তু আদম (আ)-তো মাতা-পিতা উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল।

WWW.BANGLAKITAB.COM

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐ সব নামে) চিনতে পার।[১] আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন। –সূরাহ হুজুরাত : ১৩

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ
مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ۭ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ
وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ
الصّٰغِرِيْنَ ۝ قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝ قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝ قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ
لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَاۗىِٕلِهِمْ ۭ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۭ لَمَنْ تَبِعَكَ
مِنْهُمْ لَاَمْلَــَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ
شِئْتُمَا ۠ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ
لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا
مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۝ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝ فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ
فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۭ وَ
نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۔۔۔ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ قَالَ

---

১. সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে মুমিনদের সম্বোধন করে ঐ হুকুম দেওয়া হয়েছিল, যা মুসলিম সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য জরুরি। এখন এ আয়াতে গোটা মানবজাতিকে সম্বোধন করে সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ বা মহা পথপ্রদর্শক থেকে সংশোধন করা হয়েছে, যা সব যুগে দুনিয়ায় ফাসাদের কারণ হয়ে আছে। অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কুসংস্কার। এ ছোট আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সম্বোধন করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত : তোমাদের সকলের মূল এক। একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি এবং বর্তমানে তোমাদের যত বংশই পৃথিবীর বুকে দেখা যায় তা আসলে একটি প্রাথমিক বংশের বিভিন্ন শাখা, যা এক মাতা ও এক পিতা থেকে শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : মূলে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি-গোত্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার নীতি কখনো এই ছিল না যে– এর ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ, সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত, বড় ও ছোটর পার্থক্য হবে, এক বংশ অন্য বংশের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করবে, এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষকে হীন ও ঘৃণ্য মনে করবে; এক জাতি অন্য জাতির উপর নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে। বরং স্রষ্টা মানুষকে যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে রূপ দান করেছেন তার কারণ হলো, এটাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরিচিতির স্বাভাবিক পদ্ধতি।

তৃতীয়ত : মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চতার যদি কোনো ভিত্তি থাকে ও থাকতে পারে তবে তা হচ্ছে নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব।

اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ ۞ قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۞

অর্থ : আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করার সূচনা করেছি। তারপর তোমাদের সুরত (আকার-আকৃতি) বানিয়েছি। এরপর ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা কর। এ হুকুম পেয়ে সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না।[১] (আল্লাহ) প্রশ্ন করলেন, যখন আমি নিজেই তোকে সিজদার হুকুম দিলাম, তখন কিসে তোকে সিজদা করা থেকে বারণ করল? সে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে বানিয়েছেন মাটি থেকে। (আল্লাহ) বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর বড়াই করার কোনো অধিকার নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই তাদের মধ্যেই শামিল, যারা নিজেরাই অপমান চায়।[২] (ইবলীস) বলল, আমাকে ঐদিন পর্যন্ত সময় দিন, যখন এদেরকে আবার (জীবিত করে) উঠানো হবে। (আল্লাহ) বললেন, যা তোকে সময় দিলাম। সে বলল, আচ্ছা (হে আল্লাহ!) আপনি যেভাবে আমাকে গোমরাহ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন (এর বদলায়) আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথে তাদের জন্য ওঁতপেতে বসে থাকব। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে– সবদিক দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখব। আপনি তাদের বেশির ভাগ লোককেই শোকর-গোযার পাবেন না। (আল্লাহ) বললেন, এখান থেকে তুই অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। আর জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যারা তোর পেছনে চলবে তোকেসহ তাদের সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব। হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি এ বেহেশতে বাস কর। এখানে তোমাদের মন যা চায় তা-ই খাও। কিন্তু ঐ গাছটির কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। তারপর শয়তান তাদের দুজনকে কুপরামর্শ দিলো, যাতে তাদের যে লজ্জাস্থানকে একে অপর থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল তা দুজনের সামনেই খুলে দেয়। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছে এর কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা তোমরা যেন চিরকাল বেঁচে থাকতে না পার। সে দুজনকেই কসম খেয়ে বলল, আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী। এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দুজনকেই (ধীরে ধীরে) বশ করে ফেলল। যখনি তারা ঐ গাছের স্বাদ গ্রহণ করল তখনি দু'জনেরই লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন তারা বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদেরই শরীর ঢাকতে লাগল। তাদের রব তাদের দুজনকেই ডেকে বলল, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলে দেইনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? দু'জনেই বলে উঠল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহমত না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।[৩] (আল্লাহ) বলেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে বসবাসের এবং জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে। (আল্লাহ আরোও) বললেন, সেখানেই তোমাদের বাঁচতে হবে, সেখানেই তোমাদেরকে মরতে হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদেরকে (শেষ পর্যন্ত) বের করে আনা হবে। –সূরাহ আ'রাফ : ১১–২৫

---

১. এর দ্বারা বোঝায় না যে, ইবলীস ফেরেশতাদের মধ্যে গণ্য ছিল। যখন পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তা'আলা আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম দিয়েছিলেন, তখন এর মর্ম এও ছিল যে, ফেরেশতাদের ব্যবস্থাপনাধীন গোটা সৃষ্টিলোকও আদমের আনুগত্য মেনে নেবে। এই সৃষ্টিলোকের মধ্যে একমাত্র ইবলিসই এগিয়ে এসে ঘোষণা করল, সে আদমের সামনে মাথা নত করবে না।

২. মূলে 'সাগিরীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সাগির' শব্দের অর্থ– যে ছোট্টায় অপমান-লাঞ্ছনা ও নীচতা নিজের জন্য কবুল করে নেয়। আল্লাহর হুকুমের মর্মকথা হলো– তুই বাগাহ হওয়া সত্ত্বেও তোর নিজের বড়াই ও অহংকারের মত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তুই নিজেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে চাস।

৩. এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরমের অনুভূতি তার সহজাত ও স্বভাবগত। এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে মানুষের নিজের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে খুলতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এজন্যই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা-সরল রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছে..... [অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সূরা হিজরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۞ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ ۖ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۞

অর্থ : আমি কাদা মাটির শুকনো খামির থেকে মানুষকে বানিয়েছি।[১] এর আগে জিনকে আমি আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি।[২] ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদা মাটির শুকনো খামির থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং এর মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেব, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। ফলে ইবলিস ছাড়া সব ফেরেশতাই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের সাথী হতে অস্বীকার করল। (তাদের রব) জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো, তুই সিজদাকারীদের সাথী হলি না কেন? জবাবে সে বলল, যাকে তুমি কাদা মাটির শুকনো খামির থেকে সৃষ্টি করেছ, এমন মানুষকে সিজদা করা আমার সাজে না। তখন রব বললেন, আচ্ছা,

---

..... মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা। উলঙ্গতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা খুলে দেওয়া ও কোনো প্রকারে মানুষকে ঘিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করা। তা ছাড়া এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌছানোর জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিল, 'আমি তোমাদের অধিকতর উন্নত অবস্থায় পৌছিয়ে দিতে চাই।' এছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সৎগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছে, মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আর যে জিনিস শয়তানকে লঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল তা হচ্ছে, সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে একগুঁয়েমি দেখিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয় নি।

১. এখানে পবিত্র কুরআন এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে যে, মানুষ পশুর অবস্থা থেকে উন্নতি করে মানুষ হয়নি। আধুনিককালে ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী তাফসীরকাররা পশু থেকে মানুষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকলেও মানুষের সৃষ্টির সূচনা কিন্তু সরাসরি মাটির উপাদান থেকেই হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সে উপাদানকে 'সালসা-লিম মিন হামইম মাসনূন' বলে উল্লেখ করেছেন। এ শব্দগুলো পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছে যে, পচা মাটির খামির নিয়ে একটি পুতুল তৈরি করা হয়েছিল, যা পরে শুকিয়ে যায় এবং তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়।

২. 'সামূম' দ্বারা গরম বাতাসকে বোঝানো হয়। আর আগুনকে যখন 'সামূম' বলা হয়, তখন তার দ্বারা আগুন না বুঝিয়ে খুব গরম বোঝানো হয়ে থাকে। এর দ্বারা কুরআন মাজীদের যে যে জায়গায় বলা হয়েছে 'জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে', সেসব জায়গায় এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তাহলে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কারণ, তুই বিতাড়িত। কিয়ামত পর্যন্ত তোর উপর অভিশাপ। সে আবার করল, হে আমার রব! আমাকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন সবাইকে আবার জিন্দা করা হবে। আল্লাহ বললেন, আচ্ছা তোকে ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া হলো যার সময় আমার জানা আছে। ইবলীস বলল, হে আমার রব! যেভাবে তুমি আমাকে গোমরাহ করেছ, তেমনিভাবে আমি এখন পৃথিবীতে তাদের জন্য সুসজ্জিত করে তাদের সবাইকে গোমরাহ করব। অবশ্য তোমার বান্দাহদের মধ্যে যাদেরকে তুমি মুখলিস বানিয়েছ তাদেরকে ছাড়া। (আল্লাহ) বললেন, এটাই ঐ রাস্তা, যা সোজা আমার কাছে পৌঁছে।[১] নিশ্চয়ই যারা আমার প্রকৃত বান্দাহ তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা খাটবে না। তোর কর্তৃত্ব শুধু ঐ গোমরাহ লোকদের উপরই চলবে, যারা তোকে মেনে চলে।[২] নিশ্চয়ই তাদের সবার জন্য দোযখের শাস্তির ওয়াদা রইল। ঐ দোযখের সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে একটি অংশকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।[৩]

–সূরা হিজর : ২৬-৪৪

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۞ قَالَ
اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ۞
قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ۞ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ
مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا
يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۞ اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ۞

অর্থ : (ঐ ঘটনা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে বলল, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ আমি কি তাকে সিজদা করব? সে আরো বলল, তুমি ভেবে দেখেছ কি? সে কি এমন যোগ্য ছিল যে, আমার উপর তুমি তাকে সম্মান দিয়েছ? যদি তুমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও তাহলে অল্প কিছু লোক ছাড়া (আদমের) গোটা বংশকে মূল থেকে উপড়িয়ে ফেলব। আল্লাহ বললেন, আচ্ছা তুই চলে যা। তাদের মধ্য থেকে যে-ই তোর পেছনে চলবে, তোকেসহ তোদের সবার জন্য দোযখই হবে পুরো বদলা। তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে তোর কথা দ্বারা ফুসলাতে পারিস ফুসলিয়ে নিয়ে যা, তাদের উপর তোর আরোহী ও পদাতিক বাহিনীকে চড়াও করে দে, তাদের ধন-সম্পদ (খরচে) ও সন্তানাদির (পরিচালনায়) তাদের সাথে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদার জালে জড়িয়ে ফেল। আর শয়তানের ওয়াদা তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার বান্দাহদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব খাটবে না। আর তাদের অভিভাবক হিসেবে তোর রবই যথেষ্ট। তারা তোকে অভিভাবক বানাবে না)।

–সূরা বনী ইসরাঈল : ৬১-৬৫

---

১. 'সিরাতুন 'আলাইয়া মুসতাকীম'-এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে– এক অর্থ, যা আমি অনুবাদে করেছি; দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে; 'এ কথা সঠিক, আমিও এ কথা মেনে বলব'।

২. এ কথাটির অন্য অর্থ এও হতে পারে যে, আমার দাসদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না। তুই তাদেরকে জোর করে নাফরমান বানাতে পারবি না। অবশ্য যারা নিজেরা গোমরাহ এবং তোর অনুসরণ করতে নিজেরাই ইচ্ছা করে, তাদেরকেই তোর পথে চলার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। তাদেরকে আমি জোর করে ফিরিয়ে রাখব না।

৩. দোযখের এ দরজাগুলো বোধ হয় বিভিন্ন রকমের গুনাহের জন্য আলাদা আলাদা করে বরাদ্দ করা হবে। যেমন– কেউ নাস্তিকতার দরজা দিয়ে দোযখে যাবে, কেউ শিরকের দরজা দিয়ে, কেউ মুনাফিকীর দরজা দিয়ে, কেউ প্রকৃতি পূজার দরজা দিয়ে, কেউ যুলুম-অত্যাচার ও জীবের উপর নির্যাতন করার দরজা দিয়ে, কেউ মিথ্যা ও গোমরাহীর প্রচার ও ধর্মদ্রোহিতার দরজা দিয়ে এবং কেউ অশ্লীলতা ও অন্যায়-অনুচিত কাজের প্রচার-প্রসারের দরজা দিয়ে ঢুকবে। যার কয়েক রকমের গুনাহ থাকবে সে সবচেয়ে বড় গুনাহর জন্য নির্দিষ্ট দরজা দিয়েই ঢুকবে।

সূরা কাহফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ۖ أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ۝

অর্থ : স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস তা করল না। সে জাতিতে জিন ছিল। তাই সে তার রবের হুকুম অমান্য করল।[১] তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরকে তোমাদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছ? অথচ তারা তোমাদের দুশমন। এটা কতই না মন্দ বদল, যা যালিমরা (আল্লাহর বদলে) গ্রহণ করেছে। -সূরা কাহফ : ৫০

সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۖ أَبٰى ۝ فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۝ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ۝ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى ۝ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَعْمٰى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ۝

অর্থ : এর আগে আমি আদমকে একটি হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা ভুলে গেলেন। আমি তাঁর মধ্যে মযবুত ইচ্ছা শক্তি পাই নি।[২] (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর তখন সবাই সিজদা করল। কিন্তু ইবলীস তা করতে অস্বীকার করল। তখন আমি বললাম, হে আদম! এ কিন্তু আপনার ও আপনার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন হয় না, সে আপনাদের দুজনকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়। আর আপনারা বিপদে পড়ে যান। এখানে তো আপনি ভুখাও থাকেন না, নেংটাও থাকেন না এবং পিপাসায়ও ভোগেন না, রোদেও কষ্ট পান না। কিন্তু শয়তান তাঁকে ফুসলালো। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে ঐ গাছটির সন্ধান দেবো, যা দ্বারা চিরস্থায়ী জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব হাসিল করা যায়? শেষ পর্যন্ত দুজনেই

১. অর্থাৎ ইবলিস ফেরেশতা ছিল না; সে জাতিতে জিন ছিল। তাই আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। যদি সে ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হতো তবে সে নাফরমানি করতেই পারত না; কিন্তু জিন ফেরেশতাদের মতো না হয়ে মানুষের মতোই এক স্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত, যাকে জন্মগতভাবে অনুগত বানানো হয়নি; বরং কুফর ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয় রকমের ইখতিয়ারই তাকে দান করা হয়েছে।

২. হযরত আদম (আ) যে আদেশ অমান্য করেছিলেন, তা তিনি আল্লাহর নাফরমানি করার নিয়তে জেনে-বুঝে করেননি, বরং গাফিলতি, ভুলে যাওয়া ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণেই তা ঘটেছিল।

ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেলল। এর ফলে তখন তখনই তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন দুজনই বেহেশতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল।[১] এভাবেই আদম তার রবের নাফরমানী করে বসলেন এবং সঠিক পথ থেকে সরে গেলেন। তারপর তাঁর রব তাকে বাছাই করে নিলেন, তাঁর তাওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে হেদায়াত দান করলেন।[২] আল্লাহ বললেন, তোমরা উভয়ই (মানুষ ও শয়তান) এখান থেকে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। আমার পক্ষ থেকে যদি কোনো হেদায়াত পৌঁছে তাহলে যে আমার হেদায়াত মেনে চলবে সে গোমরাহও হবে না, হতভাগাও হবে না। আর যে আমার 'যিকির' (নসীহত) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে অবশ্যই তার দুনিয়ার জীবন তো সংকীর্ণ হবেই,[৩] কিয়ামতের দিন তাকে আমি অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! দুনিয়ায় তো আমার চোখ ছিল, এখানে আমাকে অন্ধ বানিয়ে উঠালেন কেন? আল্লাহ বলবেন, এভাবেই যখন আমার আয়াত তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হচ্ছে। –সূরা ত্বা-হা : ১১৫-১২৬

সূরা সোয়াদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۞ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۞ إِنْ يُوْحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سٰجِدِيْنَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ۞ إِلَّا إِبْلِيْسَ ط اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۞ قَالَ يٰإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ط أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۞ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ط خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ۞ وَّ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۞ إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ۞ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ ۞

১. অন্য কথায় নাফরমানী ঘটার কারণেই ঐ সব সুখ-শান্তির উপকরণ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যা সরকারিভাবে তিনি পেয়েছিলেন। সরকারি পোশাক ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারে তো এরপর ঘটার কথা।

২. অর্থাৎ, আদম (আ)-কে শয়তানের মতো লাঞ্ছিতভাবে দরবার থেকে বিতাড়িত করেননি; বরং যখন তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করেছিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করলেন।

৩. পৃথিবীতে জীবন সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সে গরিব হয়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, এখানে তার শান্তি ও স্বস্তি মিলবে না। সে কোটিপতি হলেও অস্বস্তি ও অশান্তিতে তার জীবন কাটবে। সাত রাজ্যের বাদশাহ হলেও অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে তার মুক্তি সম্ভব হবে না। দুনিয়ায় তার যা সাফল্য ঘটবে তা হাজার রকমের অবৈধ চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটবে। তাই তার বিবেক থেকে শুরু করে তার চারদিকে গোটা পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের সাথে সবসময় তার টক্কর ও লড়াই চলতে থাকবে। আর এ কারণেই শান্তি, নিরাপত্তা ও নির্মল আনন্দ লাভ তার ভাগ্যে কখনো জুটবে না।

অর্থ : তাদেরকে বলুন, এ এক বিরাট খবর, যা শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক। এদেরকে বলুন, ঐ সময়ের কোনো খবরই আমার ছিল না, যখন উর্ধ্ব জগতে বিতর্ক চলছিল। আমাকে তো ওহীর মাধ্যমে এ সব কথা শুধু এজন্য জানানো হয় যে, আমি সুস্পষ্ট সতর্ককারী। (হে নবী!) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ বানাব। যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! আমি যাকে আমার নিজের দু' হাত দিয়ে বানিয়েছি তাকে সিজদা করতে কোন্ জিনিস তোকে নিষেধ করেছে? তুই কি নিজেকে বড় মনে করছিস, না তুই কোনো উঁচু স্তরের সত্তাদের মধ্যে একজন? সে জবাবে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। তুই বিতাড়িত। তোর উপর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার লা'নত। সে বলল, (হে আমার রব!) এ কথাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে আবার জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তোকে ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল, যার সময়টা আমার জানা আছে। ইবলীস বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সবাইকে গোমরাহ করেই ছাড়ব। অবশ্য আপনার ঐ বান্দাহদেরকে ছাড়া, যাদেরকে আপনি খালিস (একনিষ্ঠ) করে নিয়েছেন। আল্লাহ বললেন, তাহলে এ কথাই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, তোকে এবং মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব। (হে নবী!) তাদেরকে বলে দিন, আমার এ (তাবলীগের) কাজের বদলায় তোমাদের কাছে আমি কোনো মজুরি চাই না। আর আমি বানোয়াট লোকদেরও কেউ নই। এটা তো গোটা দুনিয়াবাসীর জন্য একটি নসীহত। কিছু সময় পর তোমরা নিজেরাই এ বিষয়ে জানতে পারবে। -সূরা সোয়াদ : ৬৭-৮৮

পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধি

প্রতিনিধি সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন— إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ط

অর্থ : আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি। -সূরা বাকারা : ৩০

এ প্রসঙ্গে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْأَرْضِ .

অর্থ : তিনিই সে (সত্তা) যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা (প্রতিনিধি) বানিয়েছেন।"-সূরা আনআ'ম : ১৬৫

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ .

অর্থ : কে তোমাদেরকে পৃথিবীর খলীফা বানান? -সূরা নামল : ৬২

হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি

তারপর আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার কথা জানিয়ে দেন। যেরূপে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট কাজ শুরু করার পূর্বেই সে বিষয়ে আগাম সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে, অনুরূপভাবেই হযরত আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার কথা আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেরেশতাগণ এ কথা শুনে, এ আদম (আ) সৃষ্টির হিকমত (তাৎপর্য) ও কারণ জানার জন্য (অত্যন্ত বিনয়ের সাথে) জিজ্ঞেস করলেন—

أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ .

অর্থ : আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে এর ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে ও খুন-খারাবি করবে? -সূরা বাকারা : ৩০

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণের এই জিজ্ঞাসা, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির ব্যাপারে কোনো আপত্তি অথবা তাঁর প্রতি কোনো প্রতিবাদ করা উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন কোনো কোনো অজ্ঞ তাফসীরকারদের ধারণা। যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত ও অমূলক।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন– "হযরত আদাম (আ)-এর আগে, জিন জাতি পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলাও রক্তপাত এবং হানা-হানি করেছিল। তাদের সে আচরণ ও অত্যাচার দেখে ফেরেশতাগণ এ ব্যাপারে আশঙ্কা করেছিলেন যে, মানুষগণ পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটাবে। (এ জন্যই ফেরেশতাগণ আদম (আ) সৃষ্টি সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছিলেন যে, "আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটবে"।)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, হযরত আদম (আ)-এর দু' হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে জিন জাতি বসবাস করে। তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত করেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি একদল ফিরিশতা প্রেরণ করেন। তারা (ফেরেশতা) পৃথিবীতে এসে জিনদেরকে মারধর করে তাড়িয়ে দেন বিভিন্ন দ্বীপে (অনাবাসিক এলাকায়)।

হযরত ইবনে আব্দুল্লাহ আব্বাস (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আর এক বর্ণনা মতে, তারা (ফেরেশতাগণ) লওহে মাহফূয থেকে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে (ফেরেশতাগণকে তাদের দুই সাথী হারূত ও মারূত) এ বিষয়টি অবগত করেছিলেন। আর তারা জানতে পেরেছেন, তাদের উর্ধ্বতন এক ফেরেশতা "শাজাল" থেকে। এ কথা ইবনে হাতিম (র) হযরত আবূ জাফর বাকের (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, ফেরেশতাগণ সব জাতির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে এরূপে অবগত হয়েছিলেন যে, তাঁরা (ফেরেশতাগণ) অবগত ছিলেন যে, এই মাটি থেকে সৃষ্ট জীবের মধ্যে মাটির বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে। ফেরেশতাগণ বললেন—

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ . "আমরাই তো আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ করা ও আপনার পবিত্রতা বয়ান করার কাজ করছি।" –সূরা বাকারা : ৩০

অর্থাৎ আমরা সব সময় আপনার ইবাদত করবো। আমাদের মধ্য হতে কেউ আপনার অবাধ্য হবো না, আর করবও না। যদি এ আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য শুধু এ হয় যে, তারা আপনার ইবাদত-বন্দেগী করবে তবে আমরাই তো এ কাজের জন্য প্রস্তুত। আমরা তো রাত দিন সর্বদাই আপনার ইবাদতেই মগ্ন থাকি। আমাদের দ্বারাই তো আপনার অভিপ্রায় সফল হচ্ছে। ফেরেশতাদের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন—

اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ . "নিশ্চয় আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।" –সূরা বাকারা : ৩০

অর্থাৎ, এ মানবজাতির সৃষ্টির মধ্যে কি গোপন তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা শুধুমাত্র আমিই জানি। যেমন, অতি তাড়াতাড়ি এদের মধ্য থেকেই নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণের আবির্ভাব হবে ও শয়তানের আসল রূপ প্রকাশ পাবে।

হযরত আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে ইল্‌ম দান করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন –

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا "আর তিনি (আল্লাহ) আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।" –সূরা বাকারা : ৩১

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এগুলো সে সমস্ত নাম ছিল, যেগুলো দ্বারা একে অপরকে জানতে পারে। যেমন– মানব, দানব, জীব-জন্তু, আসমান, নদ-নদী, সমুদ্র-পাহাড়, উট, গাধা ইত্যাদি।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদমকে প্রতিটি জিনিসে নাম শিক্ষা দেন। যেমন– থালা-বাসন, দা-কুড়াল, ডেগ, এমনকি নির্গমন বরং বিনা শব্দে যে বায়ু বের হয়, তার নামও শিক্ষা দেন। তিনি আরো বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সকল জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং প্রতিটি জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত ইবনে যোবায়ের, হযরত সায়ীদ এবং কাতাদাহ (র) প্রমুখও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

হযরত রাবী বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সমস্ত ফেরেশতার নাম শিক্ষা দেন, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ বলেন– আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর বংশধর সন্তানদের নামসমূহও শিক্ষা দেন।

–তাফসীরে তাবারী : ১/১৭০

তবে সঠিক মত হল এই যে, হযরত আদাম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় সব ধরনের বস্তুর নাম এবং তার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য শিক্ষা দেন। যেমন– মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু, গাছ-গাছালি ইত্যাদি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ) সায়ীদ ও হিশামের সূত্রে একখানা হাদীস বর্ণনা করেন। যে হাদীসখানা হযরত কাতাদাহ (রা) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ একত্র হয়ে বলবে, আহ! কতইনা ভাল হতো, (এ সময়) যদি আল্লাহ তা'আলার কাছে আমাদের জন্য কেউ সুপারিশ করতো! তারপর তারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট হাজির হয়ে আরয করবে যে, আপনি মানবজাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই আদেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছেন এবং আপনাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। –বুখারী

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

অর্থ : তারপর এ সব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে, খলীফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এ সব জিনিসের নাম বল দেখি।

–সূরা বাকারা : ৩১

হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আল্লাহ তা'আলা এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন না, যিনি আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান হবেন। তারপর তাদেরকে উপরোল্লিখিত পন্থায় পরীক্ষা করা হলো। ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বাণী– اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ "যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এর অর্থ এই যে, যদি তোমরা তোমাদের বর্ণিত ধারণায় (অর্থাৎ আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানবান কাউকে আল্লাহ সৃষ্টি করবেন না) সত্যিই হয়ে থাক, তবে এ বস্তুগুলোর নাম বলে দাও।

এ সম্পর্কে বুযুর্গ ব্যক্তিদের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। যা বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। (তারপর) ফেরেশতারা বললেন– سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ : (হে আল্লাহ!) শুধু আপনিই তো সব দোষ থেকে পবিত্র রয়েছেন। আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি শিখিয়ে দিয়েছেন। আসলে শুধু আপনিই সবকিছু জানেন ও বুঝেন। –সূরা বাকারা –৩২

অর্থাৎ, আপনার জ্ঞান, আপনার শিখানো ছাড়া কেউই অর্জন করতে পারে না। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ

অর্থ : যা কিছু তাঁর জ্ঞানের মধ্যে আছে, তা থেকে কিছুই তাদের আয়ত্তে আসতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে দিতে চান তাহলে আলাদা কথা। –সূরা বাকারা : ২৫৫

তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন–

يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ .

অর্থ : হে আদম! তুমি এ সব জিনিসের নাম তাদেরকে বলে দাও। যখন তিনি তাদেরকে ঐ সবের নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলি নি যে, আমি আসমান ও জমিনের সকল গোপন বিষয় জানি (যা তোমরা জানো না)। তোমরা যা প্রকাশ কর, তাও আমার জানা আছে, আর যা তোমরা গোপন রাখ তাও আমি জানি। –সূরা বাকারা : ৩৩

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা গোপন জিনিস তেমনভাবেই জানেন, যেমন জানেন প্রকাশ্য জিনিস। কারো মতে "প্রকাশ্য জিনিস" জানা দ্বারা এখানে ফেরেশতাদের কথা বুঝানো হয়েছে। যা ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার আদম (আ) সৃষ্টির ঘোষণা শুনে তারা বলেছিলেন— اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا .

অর্থ : আপনি কি সেখানে এমন কাউকে নিয়োগ করতে চান, যে এর ব্যবস্থাকে নষ্ট করবে?

–সূরা বাকারা : ৩০

আর "গোপন জিনিস" জানা দ্বারা ইবলীসের অন্তরে, যে অহংকার ও বড়াই গোপন ছিল সেটিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সায়ীদ ইবনে যোবায়ের, মুজাহিদ, সুররী, যিহাক, সাওরী ও ইবনে জারীর (র) তারা সকলেই এ অভিমত সমর্থন করেছেন। আবুল আলীয়া, রবী, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেছেন— وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (তোমরা গোপন রাখ) এ কথার দ্বারা ফেরেশতাদের সে কথাকে বুঝানো হয়েছে যে, "আমাদের প্রতিপালক, আমাদের চেয়ে জ্ঞানবান ও মর্যাদাসর অধিকারী করে কাউকে সৃষ্টি করবেন না।

হযরত আদম (আ)-কে সিজদার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۡ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

অর্থ : তারপর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম, 'আদমের সামনে নত হও' তখন ইবলিস ছাড়া সবাই নত হলো। সে অস্বীকার করল ও অহংকার প্রকাশ করল এবং কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

–সূরা বাকারা : ৩৪

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, এ আদেশ এবং তা বাস্তবায়নের মধ্যে শামিল ছিল হযরত আদম (আ)-এর জন্য বিরাট এক সম্মান ও মর্যাদা। যখন আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতী হাতের দ্বারা সৃষ্টি করলেন এবং তাতে রূহ সঞ্চার করলেন, তখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করার জন্য।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অর্থ : যখন আমি তাকে পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং এর মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। –সূরা হিজর : ২৯

এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে চার প্রকারের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। ১) তাকে তাঁর নিজ কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ২) তার মধ্যে নিজের রূহ দান করেছেন। ৩) তাকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। ৪) তাকে জ্ঞান দান করেছেন, যা দ্বারা তিনি বস্তুসমূহের নাম অবহিত হয়েছেন।

এ কারণেই ঊর্ধ্বজগতে বসে যখন মূসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁদের মধ্যে কথাবার্তায় বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে মূসা (আ) হযরত আদমকে (আ) বলেছিলেন যে, আপনি মানবজাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মধ্যে তিনি (আল্লাহ) তাঁর নিজ রূহ দান করেছেন। তাঁর ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আপনাকে তিনি সকল জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার গুণাবলী ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন। কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরাও হযরত আদম (আ)-এর কাছে অনুরূপভাবে আরয করবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ز فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ .

অর্থ : আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করার সূচনা করেছি। তারপর তোমাদের সূরত (আকার-আকৃতি) বানিয়েছি। এরপর ফেরেশতাদের বলেছি, আদমকে সিজদা কর। এ হুকুম পেয়ে সবাই সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস সিজদাকারীদের মধ্যে শামিল হলো না। -সূরা আ'রাফ : ১১

আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ করলাম তখন কোন জিনিসে তোমাকে সিজদা করতে বারণ করল?

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ .

অর্থ : সে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে বানিয়েছেন মাটি থেকে। -সূরা আ'রাফ : ১২

হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, ইবলীস এখানে যুক্তি প্রদান করেছে এবং সে-ই (ইবলীসই) সর্বপ্রথম এভাবে যুক্তি প্রদানকারী। মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন (রহ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে এরূপ যুক্তির সূচনা করে, সে হল ইবলীস। আর সূর্য ও চন্দ্রের পূঁজাও এ যুক্তির আলোকেই শুরু হয়।

ইবনে জারীর (রহ) উল্লিখিত দু'টি মতই বর্ণনা করেছেন। -তাফসীরে তাবারী : ৮/৯৮

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, ইবলীস নিজকে তার ও আদম (আ)-এর মধ্যে (জ্ঞানের দিক থেকে) তুলনা করেছিল। সুতরাং আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য তার ও ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ হওয়া সত্ত্বেও, সে (ইবলিস) নিজকে আদম (আ)-এর অপেক্ষা বেশি শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন ধারণা করে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। (এখানে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও) ইবলীস (তার শ্রেষ্ঠত্বের) যুক্তি দেয়। কিন্তু এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশের সামনে তার সমস্ত যুক্তি বাতিল ও নিরর্থক হয়ে যায়। তাছাড়াও ইবলিসের এ যুক্তিটি ছিল একেবারেই ভ্রান্ত ও মনগড়া। কারণ, মাটি আগুনের চেয়ে উত্তম ও উপকারী। কেননা, মাটির মধ্যে রয়েছে কোমলতা, স্থিরতা, সহিষ্ণুতা ও শীতলতা। আর এ মাটি উৎপাদনশক্তি সম্পন্ন। এ মাটি থেকেই প্রায় সব জিনিসই উৎপাদিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্ব শস্যোৎপাদক। আর মাটির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ তা'আলারও পছন্দনীয়।

পক্ষান্তরে আগুনের গুণাবলী এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আগুনের মধ্যে রয়েছে, উগ্রতা, তীব্রতা, উত্তপ্ততা এবং ধ্বংস করার প্রবণতা। যেগুলো আল্লাহ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয়। যে কারণে তিনি এ আগুনকে জাহান্নামের সামগ্রী বানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে অধিক মর্যাদা ও সম্মানও দান করেছেন। যা অভিশপ্ত ইবলীস অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে নিজ কুদরতী হাত দ্বারা করেছেন এবং তাতে নিজ রূহ মুবারক দান করেছেন।

আর এ বিশেষ মর্যাদার কারণেই তাঁকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ط أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۞ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۞

অর্থ : ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি কাদা মাটির শুকনো খামির থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করছি। যখন আমি তাকে পূর্ণ আকৃতি দান করব এবং এর মধ্যে আমার রূহ থেকে কিছু ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। ফলে ইবলিস ছাড়া সব ফেরেশতাই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের সাথী হতে অস্বীকার করল। (তাদের রব) জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলিস! তোর কী হলো, তুই সিজদাকারীদের সাথী হলি না কেন? জবাবে সে বলল, যাকে তুমি কাদা মাটির শুকনো খামির থেকে সৃষ্টি করেছ, এমন মানুষকে সিজদা করা আমার সাজে না। তখন রব বললেন, আচ্ছা তাহলে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। কারণ, তুই বিতাড়িত। কিয়ামত পর্যন্ত তোর উপর অভিশাপ।

–সূরা হিজর : ২৮–৩৫

ইবলীস আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছনার পাত্র হয়ে গেল। ইবলিস নিম্নলিখিত কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল—১) ইবলীস হযরত আদম (আ)-কে তুচ্ছ মনে করেছিল। ২) আল্লাহ তা'আলার আদেশকে অমান্য করেছিল। ৩) হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও সে (ইবলীস) নিজেকে আদম (আ)-এর চেয়ে বেশি শ্রেষ্ঠ দাবি করে অমূলক যুক্তি প্রদান করেছিল। ৪) সত্যকে প্রত্যাখান করেছিল।

ইবলীস আদম (আ)-কে তো সিজদা করলই না বরং সে এরপরও শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করল এবং মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করে তার অনুগত করার কথা বলল। ইবলিসের এ অপরাধ প্রথম অপরাধের অপেক্ষা জঘন্যতম ছিল। ইবলীস যেন পাপের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ط قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ز لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ۞ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ط وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞

অর্থ : (ঐ ঘটনা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে বলল, যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ, আমি কি তাকে সিজদা করব? সে আরো বলল, তুমি ভেবে দেখেছ কি? সে কি এমন যোগ্য ছিল যে, আমার উপর তুমি তাকে সম্মান দিয়েছ? যদি তুমি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে সময় দাও তাহলে অল্প কিছু লোক ছাড়া (আদমের) গোটা বংশকে মূল থেকে উপড়িয়ে ফেলব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আচ্ছা তুই চলে যা। তাদের মধ্য থেকে যে-ই তোর পেছনে চলবে, তোকেসহ তাদের সবার জন্য দোযখই হবে পুরো বদলা। তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে তোর কথা দ্বারা ফুসলাতে পারিস ফুসলিয়ে নিয়ে যা, তাদের উপর তোর আরোহী ও পদাতিক বাহিনীকে চড়াও করে দে, তাদের ধন-সম্পদ (খরচে) ও সন্তানাদির (পরিচালনায়) তাদের সাথে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে ওয়াদার জালে জড়িয়ে ফেল। আর শয়তানের ওয়াদা তো ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য আমার বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব খাটবে না। আর তাদের অভিভাবক হিসেবে তোর রব যথেষ্ট (তারা তোকে অভিভাবক বানাবে না)।

-সূরা বনী ইসরাঈল : ৬১-৬৫

সূরা কাহাফেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে—

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۭ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۗءَ مِنْ دُوْنِيْ ۔

অর্থ : স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস তা করল না। সে জাতিতে জিন ছিল। তাই সে তার রবের হুকুম অমান্য করল। তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে তাকে ও তার বংশধরকে তোমাদের অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছ? -সূরা কাহফ : ৫০

অভিশপ্ত ইবলীস জেনে শুনে অহংকারবশতই আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছিল। তার জাতিসত্তার খারাপ উপাদানই তাকে এই অহংকার ও অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করেছে। কারণ, ইবলীস আগুনের সৃষ্টি। আর আগুনের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এরূপই, যা ইবলীস থেকে প্রকাশ পেয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিনদেরকে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আদমকে সেই বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা তোমাদের বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, প্রত্যেক আদম (সন্তান)-কে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, ইবলীস জিন জাতি মধ্য থেকে ছিল। জিনেরা যখন পৃথিবীতে দ্বন্দ-কলহ ও রক্তপাত ঘটাল, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের এক বাহিনী পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারা (ফেরেশতারা) এসে জিনদেরকে মারধর করে নির্জন ও বিজন এলাকায় এবং বিভিন্ন দ্বীপে তাড়িয়ে দেন। আর সেই জিনদেরই দলভুক্ত ইবলীসকে ধরে আকাশে নিয়ে যান। তারপর থেকে সে (ইবলীস) সেখানেই বসবাস করতে থাকে। তারপর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁকে সিজদা করার জন্য যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হলো, তখন ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করার কারণে সে অভিশপ্ত হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) ও কতিপয় সাহাবা (রা) এবং সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) প্রমুখ বলেন যে, ইবলীস পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশের ফিরিশতাগণের সর্দার ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তার নাম ছিল 'আযাযীল'। হযরত আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনা মোতাবেক, তার নাম ছিল হারিস। হযরত নাক্কাশ (রা) বলেছেন যে, তার উপাধি ছিল আবু বকর দাওস। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট হতে এভাবেও বর্ণিত আছে যে, ইবলীস ফেরেশতাদের তাদের একটি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদেরকে জ্বিন বলা হতো। এরা বেহেশতের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিল। ইবলীস ছিল এ দলের নেতা। এ দলের

মধ্যে ইলম ও ইবাদতে সে (ইবলিস) ছিল অগ্রণী। তার ডানাও ছিল চারটি। তারপর (অবাধ্যতা ও অহমিকার কারণে) আল্লাহ তা'আলা তাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করেন। -তারিখে তাবারী : ১/৭৮

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা সোয়াদে বলেন—

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝ قَالَ يَٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ ۝ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۝ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۝ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۝ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۝ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۝ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝

অর্থ : (হে নবী!) যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ বানাব। যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। এ হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু ইবলিস নিজের বড়ত্বের অহংকার করল এবং সে কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে আমার নিজের দু'হাত দিয়ে বানিয়েছি তাকে সিজদা করতে কোন্ জিনিস তোকে নিষেধ করেছে? তুই কি নিজেকে বড় মনে করছিস, না তুই কোনো উঁচু দরজার সত্তাদের মধ্যে একজন? সে জবাবে বলল, আমি তার চেয়ে ভালো। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা। তুই বিতাড়িত। তোর উপর বিচার দিবস পর্যন্ত আমার লা'নত। সে বলল, (হে আমার রব!) এ কথাই যদি হয়ে থাকে তাহলে এদেরকে আবার জীবিত করে উঠানোর দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তোকে ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া গেল, যার সময়টা আমার জানা আছে। ইবলিস বলল, আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সবাইকে গোমরাহ করেই ছাড়ব। অবশ্য আপনার ঐ বান্দাহদেরকে ছাড়া, যাদেরকে আপনি খালিস করে নিয়েছেন। আল্লাহ বললেন, তাহলে এ কথাই সত্য এবং আমি সত্যই বলে থাকি যে, তোকে এবং মানুষের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব। -সূরা সোয়াদ : ৭১-৮৫

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَءَاتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَٰكِرِينَ ۝

অর্থ : সে বলল, আচ্ছা (হে আল্লাহ!) আপনি যেভাবে আমাকে গোমরাহ হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন (এর বদলায়) আমিও এখন আপনার সত্য-সরল পথে তাদের জন্য ওতপেতে বসে থাকব। সামনে, পেছনে, ডানে,

বামে- সবদিক দিয়ে তাদেরকে ঘেরাও করে রাখব। আপনি তাদের বেশির ভাগ লোককেই শোকর-গোযার পাবেন না। -সূরা আ'রাফ : ১৬-১৭

অর্থাৎ, আপনি আমাকে আপনার মহান দরবার থেকে অপসারণ করে দিলেন, এর কারণে আমি মানুষদেরকে সবদিক থেকে সব ধরনের পথভ্রষ্ট করার জন্য তাদের পথে ওঁত পেতে বসে থাকব। অতএব সৎ ও ভাগ্যবান লোক সে-ই যিনি শয়তানের বিরোধিতা করবে আর দুর্ভাগা সে-ই, যে তার অনুসরণ করবে। হযরত সুবরা ইবনে ফাকীহ (রা) থেকে ইমাম আহমদ (রহ) একখানা হাদীস বর্ণনা করেন, সুবরা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানদের (পথভ্রষ্ট করার) জন্য রাস্তায় (ওঁত পেতে) বসে থাকে। -আহমদ : ৩/৪৮৩, নাসায়ী

হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এই সিজদার আদেশ সকল ফেরেশতাদের প্রতি ছিল, না শুধু মাত্র পৃথিবীর ফেরেশতাগণের প্রতি ছিল? অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে সকল ফেরেশতাগণের প্রতি সিজদা করার আদেশ ছিল। এরূপ কথা কুরআন মাজীদের ব্যাপক আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আর শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশের কথা, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তবে সনদের ধারাবাহিকতার ভিন্নতা রয়েছে এবং বর্ণনায় অপরিচিতভাব বিদ্যমান। যদিও পরবর্তী যুগের কতিপয় আলিম এ বর্ণনাটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং সুস্পষ্ট। আর হাদীসও প্রথম বর্ণনাটিকেই সমর্থন করে। কুরআন মাজীদের আয়াত "হযরত আদমের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদাবনত করান" এখানে অর্থ ব্যাপক। ফেরেশতাদের বিশেষ কোনো দলকে এখানে সিজদা করতে বলা হয় নি। সমস্ত ফেরেশতাকেই সিজদা করতে বলা হয়েছে।

হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর বেহেশতে বসবাস

সৃষ্টির পর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে বেহেশতে বসবাস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর আমি আদমকে বললাম, তুমি ও তোমার বিবি দুজনেই বেহেশতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা মনে চায় তাই মজা করে খাও, কিন্তু এ গাছটির কাছেও যেও না, তাহলে তোমরা অন্যায়কারীদের মধ্যে গণ্য হবে। -সূরা বাক্বারা : ৩৫

তারপর সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞

অর্থ : (আল্লাহ) বললেন, এখান থেকে তুই অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। আর জেনে রাখ, তাদের মধ্যে যারা তোর পেছনে চলবে তোকেসহ তাদের সবাইকে দিয়ে আমি দোযখকে ভরে ফেলব। হে আদম! তুমি ও তোমার বিবি এ বেহেশতে বাস কর। এখানে তোমাদের মন যা চায় তা-ই খাও। কিন্তু ঐ গাছটির কাছেও যেও না। তাহলে তোমরা যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। -সূরা আ'রাফ : ১৮-১৯

আল্লাহ তা'আলা বলেন— "(ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলীস তা করতে অস্বীকার করল। তখন আমি বললাম, হে আদম! এ কিন্তু আপনার ও আপনার স্ত্রীর দুশমন। এমন যেন না হয়, সে আপনাদের দুজনকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়। আর আপনারা বিপদে পড়ে যান। এখানে তো আপনি ভুখাও থাকেন না, নেংটাও থাকেন না এবং পিপাসায়ও ভোগেন না, রোদেও কষ্ট পান না।" -সূরা ত্বা-হা : ১১৬-১১৯

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি হযরত আদম (আ)-এর বেহেশতে প্রবেশের পূর্বেই হয়েছিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন— وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেশতে বসবাস কর।" -সূরা আ'রাফ : ১৯

এরূপে হযরত আদম (আ)-এর প্রতি হযরত মূসা (আ)-এরও একটি কথা ছিল যে, "আপনি আপনাকে ও আমাদেরকে বেহেশত থেকে কেন বের করিয়েছেন?" হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত হুযায়ফা (রা) এ দুজন সাহাবী থেকেই বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষদেরকে সম্মিলিত করবেন। তারপর মুমিনগণের (প্রবেশের) জন্য যখন বেহেশত সুসজ্জিত করা হবে, তখন সকল মুমিন হযরত আদম (আ)-এর কাছে উপস্থিত হবেন এবং আরয করবেন, হে আমাদের (সকলের) সম্মানিত পিতা! আমাদের জন্য বেহেশত খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তখন হযরত আদম (আ) বলবেন, আমার একটি ভুলের কারণেই তো তোমাদের বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। -মুসলিম

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা এটি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) যে বেহেশতে বসবাস করেছিলেন, সে বেহেশত ছিল "জান্নাতুল মাওয়া" (স্থায়ী জান্নাত) তবে এ বিষয়টিও মতান্তর থেকে মুক্ত নয়।

অস্থায়ী জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর বসবাস

কোনো কোনো আলেম বলেন, হযরত আদম (আ) যে বেহেশতে বসবাস করেছিলেন, তা ছিল অস্থায়ী বেহেশত। কারণ, সেখানে তাকে নিষেধ করা হয়েছিল একটি বৃক্ষের ফল খেতে। অথচ প্রকৃত স্থায়ী বেহেশতে কোনো জিনিসের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে না। দ্বিতীয়ত, এ বেহেশতে হযরত আদম (আ) নিদ্রা গিয়েছিলেন এবং তাকে এখান থেকে অপসারণ করাও হয়েছিল। (অথচ প্রকৃত স্থায়ী বেহেশতে কারো কোনো নিদ্রা থাকবে না এবং যে একবার প্রকৃত বেহেশতে প্রবেশ করবে, তার আবার সেখান থেকে অপসারিত হওয়ার কথা নয়।) এছাড়া অভিশপ্ত ইবলীস এখানে প্রবেশ করেছিল। (অথচ প্রকৃত জান্নাতে ইবলীস এর প্রবেশ নিষিদ্ধ।)

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম (আ) যে বেহেশতে বসবাস করেছিলেন, সেটি জান্নাতুল মা'ওয়া বা স্থায়ী ও প্রকৃত বেহেশত ছিল না। আর হযরত উবাই ইবনে কাব, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ ও সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রা) প্রমুখেরও এ অভিমত। ইবনে কুতায়বা (রহ) তাঁর আল-মারিফে এ অভিমত বর্ণনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গের উপর একখানা স্বতন্ত্র পুস্তকও রচনা করেছেন। এতে তিনি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ) এবং তাঁর ছাত্রগণ থেকেও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ওমর দারেমী ইবনে খতীব (রহ) থেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম কুরতুবী মু'তাযিলা ও কাদরিয়া থেকে এ কথাটি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনে ইয়াসার এ অভিমতটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সুদ্দি আবূ সালিহ ও আবূ সালিফের সূত্রে ইবনে আশম (রহ) থেকে এবং মুররা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এবং কেউ কেউ একদল সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলিসকে বেহেশত থেকে বের করে দেওয়া হয়। অতঃপর হযরত আদমকে (একা) বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়। হযরত আদম (আ) তথায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে লাগলেন। যার ফলে তিনি পেরেশান হয়ে পড়েন। আদম (আ) সেখানে তাঁর একজন সাথীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। কারণ, সেখানে (বেহেশতে) তার কোনই সাথী (স্ত্রী) ছিল না যে, যার কাছে বসে তিনি একটু শান্তি লাভ করবেন। এক সময় তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। জাগ্রত হয়ে তাঁর পাশে একজন নারী উপবিষ্ট দেখতে পান। যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন। হযরত আদম (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? কি বা তোমার পরিচয়? তিনি বললেন আমি একজন নারী। আদম (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন যাতে আপনি আমার কাছে শান্তি লাভ করতে পারেন, সেজন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন উপস্থিত ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ)-এর জ্ঞানের পরিধি অনুমান করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আদম

আপনার কাছে যে নারী রয়েছে, তাঁর নাম কি? তিনি বললেন, তার নাম 'হাওয়া'। ফেরেশতাগণ বললেন, 'হাওয়া' নাম কেন? তিনি বললেন, কারণ, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন (জীবন্ত) বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হাওয়াকে হযরত আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের ছোট হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সময় তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তারপর পাঁজরের যেখান থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই বিদীর্ণ স্থানটি সম্পূর্ণরূপে গোশত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج

অর্থ : যিনি তোমাদেরকে একটি জান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন পুরুষ স্ত্রীকে ঢেকে নিল, তখন হালকাভাবে গর্ভধারণ করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে লাগল। –সূরা আ'রাফ : ১৮৯

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মহিলাদের সাথে নরম ও সহজভাবে চলবে। নিশ্চয়ই নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের উপরের অংশটুকু খুব বাঁকা হয়ে থাকে। (সেখান থেকেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।) যদি তুমি তাকে সোজা করতে যাও, তবে তা তুমি ভেঙে ফেলবে। (অর্থাৎ, তালাক হয়ে যাবে)। আর যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দাও তবে সেটি বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং মহিলাদের সাথে নরম ও উত্তম আচরণ করবে। –বুখারী, মুসলিম

নিষিদ্ধ বৃক্ষের নাম

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ. "(হে আদম!) তোমরা এ বৃক্ষটির নিকটবর্তী হবে না।"

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে যে বৃক্ষটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, সেটি কোন বৃক্ষ ছিল এ বিষয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন, এ বৃক্ষ ছিল আঙ্গুর বৃক্ষ। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) শা'বী, জা'দা বিন হুবায়রা, মুহাম্মাদ বিন কায়েস ও সুদ্দী এবং ইবনে মাসউদ (রা) ও আরো কতিপয় সাহাবা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলদের ধারণা যে, সেই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষটি গম বৃক্ষ ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) হাসান বসরী (রহ) ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ, আতিয়্যা আওফী, আবূ মালিক, মুহারি বিন দিছার ও আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকেও বর্ণিত আছে যে, সে গাছটি ছিল গম বৃক্ষ।

ওহাব (রহ) এ কথাও বর্ণনা করেছেন যে, সেই (নিষিদ্ধ) বৃক্ষের ফল ও দানাগুলো মাখনের চেয়েও নরম এবং মধুর চেয়েও মিষ্ট। ইমাম ছাওরী (রহ) আবূ হুসাইন– আবূ মালিক (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতে যে নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে সেটি ছিল খেজুর বৃক্ষ। ইবনে জারীর হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটি ছিল যয়তুন বৃক্ষ। কাতাদাহ (রা) ও জুরাইয (রহ) এরও এ অভিমত। হযরত আবুল আলীয়া বলেছেন সে বৃক্ষটি এমন বৃক্ষ ছিল যে, যার ফল ভক্ষণ করলে মানুষ অপবিত্র হয়ে যেতো। আর অপবিত্র মানুষ জান্নাতে কিভাবে বসবাস করবে।

এ মতামতগুলো খুবই কাছাকাছি। (অর্থাৎ, এ মতামতসমূহের মধ্যে তেমন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না।) আল্লাহ তা'আলা এ বৃক্ষটির নাম গোপন রেখেছেন। এ নামটি উল্লেখ করার মধ্যে যদি কোনো উপকারিতা থাকতো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা এর নাম বলে দিতেন। এভাবে তিনি (আল্লাহ) কুরআন মাজীদে অনেক বিষয় অস্পষ্ট বা গোপন রেখেছেন।

আদম (আ)-এর বসবাসের স্থান বেহেশতে ছিল, না পৃথিবীতে ?

হযরত আদম (আ)-কে যখন বেহেশতে বসবাসের জন্য প্রেরণ করানো হয়েছিল, তখন বেহেশতের অবস্থান আকাশে ছিল, না পৃথিবীতে ছিল, এ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এ মতপার্থক্যগুলো এমন যে, এ বেহেশতের অবস্থান আকাশে ছিল। আর এটিই হলো "জান্নাতুল মাওয়া"। এ নামটি কুরআন মাজীদেও উল্লেখ করা আছে। কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদীস শরীফ দ্বারা এ কথাটি প্রমাণিত যে, জান্নাতের অবস্থান আকাশেই ছিল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ "এরপর আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর।" –সূরা বাক্বারা :৩৫

উল্লিখিত আয়াতে اَلْجَنَّةَ (আল-জান্নাত) এর আলিফ-লামটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, বরং এর দ্বারা একটি জান্নাতকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর সে জান্নাতটি হলো "জান্নাতুল মাওয়া"। আর তাওরাত কিতাবেও স্পষ্টভাবে এর উল্লেখ আছে। মুহাম্মাদ বিন হাশিম, "আল মিলাল ও আন্ নিহাল" গ্রন্থে এবং মুহাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এবং ঈসা রুমানীও তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়টির মতপার্থক্যের কথা বর্ণনা করেছেন।

অধিকাংশ আলেমের মতামত এই যে, হযরত আদম (আ) যে জান্নাতে বাস করেছিলেন, তা প্রকৃতই জান্নাত এবং সেটা আকাশে অবস্থিত। আবুল কাসিম আল-আগলাব ও কাজী মাওয়ারদী তাঁদের তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত আদম (আ) যে জান্নাতে বাস করেছিলেন, সে জান্নাতের অবস্থানের ব্যাপারে এ মতপার্থক্য রয়েছে যে, কেউ বলেন সেটি চিরস্থায়ী (অনন্ত) জান্নাত। আর কেউ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সেটিকে সাময়িকভাবে (কিছু কালের জন্য) হযরত আদম (আ)-এর পরীক্ষাস্থল হিসেবে বানিয়েছিলেন। সেটি সেই চিরস্থায়ী জান্নাত নয়, যেটি মু'মিন বান্দাদেরকে পুরস্কারস্বরূপ স্থায়ীভাবে দেয়া হবে। (অর্থাৎ, যেখানে মু'মিন বান্দাগণ স্থায়ীভাবে থাকবেন।) এর মধ্যেও আবার মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, সে (অস্থায়ী) জান্নাত আকাশে ছিল। কারণ, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে সেখান থেকে অবতরণ করানো হয়েছিল। এটি হযরত হাসান (রহ)-এর মত। অন্য একদল বলেন, সেটি (অস্থায়ী জান্নাত) পৃথিবীতে ছিল। কারণ, তাতে আদম ও হাওয়া (আ) উভয়কে পরীক্ষা করানো হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষকে তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। আর পরীক্ষার মূল ক্ষেত্র হচ্ছে পৃথিবীই।) ইবনে ইয়াহইয়াও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আর এসমস্ত ঘটনা ঘটেছিল ইবলীসকে হযরত আদম (আ)-এর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দেয়ার পর। এ বিষয় আল্লাহ তা'আলাই বেশি অবহিত। এ বিষয়ের উপর তিনটি বর্ণনা রয়েছে। কাজী মাওয়ারদীর কথা দ্বারা প্রমানিত হয় যে, তিনি এ ব্যাপারে কোনো অভিমত দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। আবু আব্দুল্লাহ রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে চারটি অভিমত পেশ করেছেন। কাজী মাওয়ারদী কর্তৃক বর্ণিত তিনটি, আর চতুর্থটি হলো, এ ব্যাপারে চুপ থাকা।

এ ব্যাপারে এ বর্ণনাও পাওয়া যায় যে, সে জান্নাত আকাশেই ছিল; কিন্তু সেটি অস্থায়ীভাবে ছিল, স্থায়ীরূপে ছিল না। এটি আবূ হিবায়ী থেকে বর্ণিত আছে। যারা বলে থাকেন যে, "সে জান্নাত পৃথিবীতেই অবস্থিত ছিল," তাদের পক্ষ থেকে আরোপিত একটি প্রশ্নের সুন্দর জবাব আছে। তারা বলেন যে, নিঃসন্দেহে ইবলীস যখন সিজদা করা থেকে বিরত রইল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান দরবার থেকে তাকে তাড়িয়ে দেন এবং তাকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া ও নেমে যাওয়ার জন্য আদেশ দেন। উল্লেখ্য, এটি শরীয়াতের কোনো আদেশ ছিল না যে, যার বিরোধিতা বা অমান্যতা করার সুযোগ থাকবে; বরং এ আদেশটি ছিল, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় আদেশ। যা সর্বাবস্থায় পালন করা আবশ্যক। ইবলীস (শয়তান)-কে নেমে যাওয়ার এ আদেশটি ছিল আল্লাহ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ـ

অর্থ : (আল্লাহ) বললেন, এখান থেকে তুই অপমানিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যা। -সূরা আ'রাফ : ১৮

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ـ

অর্থ : (আল্লাহ) বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। এখানে তোর বড়াই করার কোনো অধিকার নেই। বের হয়ে যা। আসলে তুই তাদের মধ্যেই শামিল, যারা নিজেরাই অপমান চায়।[১] -সূরা আ'রাফ : ১৩

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ "ঠিক আছে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই বিতাড়িত।" -সূরা সোয়াদ : ৭৭

উল্লিখিত আয়াতে, فِيْهَا (ফীহা) "তার মধ্যে" অথবা مِنْهَا (মিনহা) "সেখান থেকে" এর যমীর (সর্বনামটি) দ্বারা জান্নাত অথবা আকাশ অথবা তার অবস্থান স্থলকে বুঝানো হয়েছে। অলঙ্ঘনীয় আদেশ ঘোষণা হওয়ার পরে সেখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে এক মুহূর্তের জন্যও যেকোনো অবস্থাতেই, চাই বসবাসের জন্য হোক অথবা পথ অতিবাহিত করার জন্য হোক, অবস্থান করতে পারবে না। কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাদের পরস্পরে (অর্থাৎ, ইবলীস এবং হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-এর) সাক্ষাৎ হয়েছিল। কারণ, কুরআনে বর্ণিত আছে যে, ইবলীস আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, "হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তজীবনদান বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা।

-সূরা তা-হা : ১২০

ইবলীস আরো বলল—

وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ۞ وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۞

অর্থ : সে তাদেরকে বলল, তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছে এর কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা তোমরা যেন চিরকাল বেঁচে থাকতে না পার। সে দুজনকেই কসম খেয়ে বলল, আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী। -সূরা আ'রাফ : ২০-২১

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইবলীস (শয়তান) বেহেশতে পুনরায়ও হয়তো আদম ও হাওয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকবে। এর উত্তর এটা হতে পারে যে, সেখানে বসবাসের সুবাদে না হলেও সেখান দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।

অথবা এটাও হতে পারে যে, সে (ইবলীস) জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে আদম ও হাওয়া (আ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। অথবা আকাশের নিচে থেকে তাদেরকে এ কাজের প্রতি উৎসাহিত উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু এই তিনটি জবাবের মধ্যেও কিছু অস্পষ্টতা বিদ্যমান আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত।

আর যারা জান্নাত পৃথিবীতে ছিল বলেন, তারা তাদের স্বপক্ষে নিম্নের হাদীসখানা দলীল হিসেবে বর্ণনা করেন। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, হযরত আদম (আ)-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল, সেই মুহূর্তে তাঁর জান্নাতের আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা হলো। তাঁর সন্তানরা আঙ্গুর তালাশে বের হলো। ফেরেশতাগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম সন্তানরা! তোমরা কি উদ্দেশ্যে বের হয়েছ? তারা জবাবে বললো, আমাদের সম্মানিত পিতা জান্নাতী আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা তোমাদের পিতার জন্য যথেষ্ট করেছ। তারা (পুত্ররা) সবাই ফিরে গেলেন। তারপর

ফেরেশতাগণ তাঁর রূহ কবজ করেন। তারপর তাঁরাই তাকে গোসল করিয়ে, সুগন্ধি মেখে কাফন পরান। এরপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে এ জানাযায় শামিল হন। তারপর তাঁরাই আদম (আ)-কে দাফন করেন। এরপর ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ)-এর পুত্রদেরকে বললেন, এটাই হলো তোমাদের মৃতলোকের দাফনের পদ্ধতি। এ হাদীসের এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, জান্নাত পৃথিবীতেই ছিল। কারণ, জান্নাত যদি পৃথিবীতে অবশিষ্ট না-ই থাকত, তবে হযরত আদম (আ)-এর পুত্ররা জান্নাতি আঙ্গুরের তালাশে পৃথিবীতে কেন বের হবেন? আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে খুব ভাল জানেন। যে সব আলেম এ মত সমর্থন করেন যে, "জান্নাত পৃথিবীতেই অবস্থিত ছিল, তারা কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াতখানা তাদের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন—

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ . "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।" –সূরা বাকারা : ৩৫

এ আয়াতে বর্ণিত اَلْجَنَّةَ (আল-জান্নাত)-এর আলিফ-লাম দ্বারা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট কোনো জান্নাতের কথা বলা হয় নি। উল্লিখিত আলোচনায় এর স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি উত্থাপন করা যেতে পারে। সেটি হচ্ছে, হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথাটি কোথাও উল্লেখ নেই যে, তাঁকে সৃষ্টি করার পর তাঁকে পুনরায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ)-এর জান্নাত পৃথিবীতেই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে اَلْجَنَّةَ (আল-জান্নাত)-এর মধ্যে যে আলিফ-লাম রয়েছে, এর দ্বারা পৃথিবীর জান্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। আর এ কথাটিও স্পষ্ট যে, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টিও করা হয়েছে পৃথিবীতে বসবাসের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন–

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً .

অর্থ : (হে নবী! স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। –সূরা বাকারা : ৩০

এ অভিমত ব্যক্তকারী আলেমগণ অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের অন্য আয়াত (দলীল হিসেবে) বর্ণনা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ج "আমি তাদের (মক্কাবাসী)-কে এ রকম পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম এক বাগানের মালিকদেরকে।" –সূরা কালাম : ১৭

আয়াতের এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, এখানে জান্নাত দ্বারা পৃথিবীর কোন সুরম্য বাগানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, এখানে اَلْجَنَّةَ (আল-জান্নাত) এর আলিফ-লাম দ্বারা সেই নির্দিষ্ট জিনিস বুঝানো হয়েছে, যা চিন্তাধারার মধ্যে বিদ্যমান। যেটাকে আরবী ব্যাকরণে "আহদে যিহনী" বলা হয়। তাই আদম (আ)-এর জান্নাত দ্বারা পৃথিবীর বিশেষ বাগানকেই বুঝানো হয়েছে। মোটকথা, উপরোক্ত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আদম (আ) যে জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন, সেটি পৃথিবীতেই ছিল। কিন্তু এক প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি সে জান্নাত পৃথিবীতেই হয়ে থাকে, তাতে হযরত আদম (আ)-কে এ আদেশ কেন দেয়া হয়েছিল যে, اِهْبِطُوْا مِنْهَا (এখান থেকে নেমে যাও)। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, কুরআন মাজীদের আয়াত এবং আসমানী নির্দেশ দ্বারা, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) জান্নাত থেকে নিচে অবতরণ করার কথা প্রমাণ করে না। কারণ, অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে هبوط (অবতরণ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা নিচে নেমে আসা বা অবতরণ করাকে বুঝানো হয় নি। যেমন, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ . "হে নূহ! তুমি অবতরণ কর।" –সূরা হূদ : ৪৮

যখন হযরত নূহ (আ) নৌকায় অবস্থান করছিলেন এবং সে নৌকাটি জুদী পাহাড়ের উপর গিয়ে থেমে গিয়েছিল এবং পানি ভূপৃষ্ঠ থেকে শুকিয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে এ আদেশ দিয়েছিলেন যে, হে নূহ! তুমি তোমার সাথীদেরকেসহ অবতরণ কর। তোমার উপর এবং তোমার সাথীদের উপর আল্লাহ তা'আলার মঙ্গল (শান্তি) রয়েছে—

اِهْبِطُوْا مِصْرًا . "তোমরা কোনো নগরে অবতরণ কর।" –সূরা বাক্বারা : ৬১

কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে— وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ . "কতক পাথর এমন রয়েছে, যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে।" –সূরা বাক্বারা : ৭৪

কুরআন মাজীদ ছাড়াও, হাদীস শরীফের অনেক স্থানে এবং বিভিন্ন অভিধানেও এরূপ শব্দ বর্ণিত আছে। কিন্তু সে শব্দ দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হয় নি যে, "আকাশ থেকে অবতরণ কর।" "জান্নাত পৃথিবীতে অবস্থিত ছিল" এই মতের সমর্থক আলেমগণ বলেন যে, যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, هَبُوْطٌ (হাবূত) শব্দের অর্থ আকাশ থেকে অবতরণ করা, তাতে কোনই জটিলতা নেই। কারণ, তাতে হযরত আদম (আ)-এর জান্নাত পৃথিবীতে থাকার ব্যাপারে কোনই বাধা সৃষ্টি হয় না। এভাবে যে, হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা বসবাসের জন্য যে জান্নাত দিয়েছিলেন, সেটি পৃথিবীর উঁচু স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানে জান্নাতের সকল আরাম, আয়েশ ও ভোগসামগ্রী বিদ্যমান ছিল। আর সে স্থানটি বৃক্ষরাজি, ফল-ফলাদি, ছায়া ও অসংখ্য নেয়ামত দ্বারা ছিল সুসজ্জিত। যেমন- কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে- اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى . "তোমার জন্য এটাই নির্ধারিত হলো যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না।" –সূরা ত্বাহা : ১১৮

অর্থাৎ, পেটে ক্ষুধাও লাগবে না এবং বাহ্যিক পোষাকেরও প্রয়োজন হবে না। এর পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى . "এবং তুমি সেখানে পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।"

অর্থাৎ, তোমার অভ্যন্তরে (অন্তরে) পিপাসার উষ্ণতা অনুধাবন করবে না এবং শরীরের উপরাংশে সূর্যের তাপ স্পর্শ করবে না। (অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় তুমি শান্তিময় জীবনযাপন করবে।)

বর্ণিত আয়াত দুটিতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে একই সাথে ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্রতার কথা ও পরবর্তীতে আবার একই সাথে পিপাসার্ত কষ্ট ও রৌদ্রের ক্লিষ্টতার কথা বর্ণনা করেছেন। কারণ, ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্রতার মধ্যে এবং পিপাসার কষ্ট ও রৌদ্রের ক্লিষ্টতার মধ্যে রয়েছে সামঞ্জস্যতা ও সম্পৃক্ততা। আর এরূপ বর্ণনা দ্বারা কুরআন মাজীদের বিশুদ্ধতা ও সুন্দর বাচন ভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তারপর যখন হযরত আদম (আ) থেকে একটি ভুল অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে গেল, তখন তাঁকে জান্নাতের আবাস হতে এমন এক পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো, যে পৃথিবী ছিল পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও পরীক্ষার স্থান। এছাড়া এ পৃথিবীর অধিবাসীরা ধর্ম, কর্ম, চরিত্র, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও জীবন যাপনের দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ছিল বৈপরীত্য। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে একের মাঝে অপরের অমিল ছিল। যেটা ছিল তাঁর জন্য এক প্রতিকূল পরিবেশ।

মোটকথা– উক্ত আলোচনা দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ) পৃথিবীর জান্নাতে বসবাস করেছিলেন। অতঃপর একটু ভুলের কারণে তাকে পৃথিবীর দুঃখ ও কষ্ট এবং পরীক্ষায় নিপতিত হতে হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন— وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ . "তোমাদেরকে দুনিয়ায় একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকতে হবে এবং সেখানেই জীবনযাপন করতে হবে।"

–সূরা বাক্বারা : ৩৬

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় না যে, হযরত আদম (আ) আকাশে ছিলেন। তারপর তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। কারণ, অনুরূপ বনী ইসরাঈলদেরও আছে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيٓ إِسْرَآئِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞

অর্থ : এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, এখন তোমরা দুনিয়ায় বসবাস কর। তারপর যখন আখিরাতের ওয়াদা পূরণের সময় আসবে, তখন আমি তোমাদের সবাইকে একসাথে হাজির করব।

–সূরা বানী ইসরাঈল : ১০৪

উল্লিখিত আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের লোকদেরকে পৃথিবীতে (ভূপৃষ্ঠে) বসবাস করার জন্য বলেছেন। এ আছে দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তারা আকাশ থেকে অবতরণ করেছে। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ)-কেও পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য যে আদেশ দেয়া হয়েছিল, এর দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, তাঁকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণের আদেশ দেয়া হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলেমগণ বলেছেন যে, জান্নাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলেমগণের উপরোল্লিখিত মতামত ও বক্তব্যসমূহ জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের স্বপক্ষে কোনোভাবেই দলীল হয় না। কারণ এ কথা আলেমদের বক্তব্যে আদৌ প্রকাশ পায় নি যে, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব অমান্যকারী। বরং তাঁদের পক্ষ থেকে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণাদিও বর্ণিত রয়েছে। যেমন, কুরআন মাজীদের বহু আয়াত এবং হাদীস শরীফের বহু হাদীস দ্বারা জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

যখন হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) দু'জনে জান্নাতে বসবাস করতে শুরু করলেন, তখন অভিশপ্ত শয়তান তাঁদের দু'জনকে পদস্খলন ঘটাতে চাইল।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ "শেষ পর্যন্ত শয়তান দুজনকেই (ঐ গাছের লোভ দেখিয়ে আমার হুকুম পালন করা থেকে) সরিয়ে নিল এবং তারা যে অবস্থায় ছিল, তা থেকে তাদেরকে বের করে ছাড়ল।" –সূরা বাকারা : ৩৬

অর্থাৎ, তাঁদের উভয়কে জান্নাতের সুখ-শান্তি, অসংখ্য নেয়ামত ও রহমত এবং আনন্দ-খুশি উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে কষ্ট ও পরিশ্রম, দুঃখ ও ক্লেশের মধ্যে নিপতিত করা হলো। শয়তান তাঁদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে নিষিদ্ধ কাজটি তাদের কাছে সুন্দররূপে উপস্থাপন করে তাদেরকে এ কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করল। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَٰلِدِينَ ۞

অর্থ : তারপর শয়তান তাদের দুজনকে কুপরামর্শ দিল, যাতে তাদের যে লজ্জাস্থানকে একে অপরের থেকে গোপন করে রাখা হয়েছিল তা দুজনের সামনেই খুলে দেয়। সে তাদেরকে বলল, তোমাদের রব যে তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছে এর কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তোমরা যেন ফেরেশতা হয়ে যেতে না পার অথবা তোমরা যেন চিরকাল বেঁচে থাকতে না পার। –সূরা আ'রাফ : ২০

অর্থাৎ, শয়তান তাদেরকে বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ বৃক্ষের ফল এ জন্যে খেতে নিষেধ করেছেন যে, যদি তা খাও তবে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে, তথা তোমরা এখানে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। তারপর শয়তান তার কথাটিকে দৃঢ় করানোর জন্য তাদের সামনে শপথ করল। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত

হয়েছে—وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ "সে দুজনকেই কসম খেয়ে বলল, আমি তোমাদের সত্যিকার হিতকামী। -সূরা আ'রাফ : ২১

কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.

অর্থ : কিন্তু শয়তান তাঁকে ফুসলালো। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে ঐ গাছটির সন্ধান দেব, যা দ্বারা চিরস্থায়ী জীবন ও অক্ষয় রাজত্ব হাসিল করা যায়? -সূরা ত্বাহা : ১২০

অর্থাৎ, শয়তান হযরত আদম (আ)-কে বুঝালো, আমি কি তোমাকে এমন বৃক্ষের কথা বলে দিব, যার ফল খেলে তোমার এই সুখ-শান্তি ও অসংখ্য নিয়ামত সমৃদ্ধ এ জান্নাতে স্থায়ী হয়ে যাবে। আর তুমি এমন বাদশাহী (রাজত্ব) লাভ করবে, যা কখনই বিলোপ হবে না এবং হ্রাস পাবে না। শয়তানের এ কথা ছিল শুধু কুমন্ত্রণা ও অবাস্তব।

এ কথার অর্থ ছিল এই যে, এ বৃক্ষের ফল খেলে তুমি অবিনশ্বর জীবন লাভ করবে। আর এর অর্থ এরকমও হতে পারে, যেরকম নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রহ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যে, আরোহী তার ছায়ায় একশত বছর ভ্রমণ করার পরেও সেই ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। সেটি হলো অনন্ত (জীবনের) বৃক্ষ।

আবু দাউদ তায়লিসী (রহ)-ও তাঁর মুসনাদে, শো'বা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। গুনদুর হযরত শো'বাকে জিজ্ঞেস করেন, সেটি কি সত্যিই স্থায়ী (জীবনের) বৃক্ষ? তিনি (শো'বা) বললেন, হাদীসে ই (অনন্ত জীবনের বৃক্ষ) কথাটি নেই।

এটি ইমাম আহমদ (রহ)-এর নিজের ব্যাখ্যামূলক কথা। যখন অভিশপ্ত শয়তান আল্লাহ'র নামে শপথ করল, তখন আল্লাহর কারণে হযরত আদম (আ) তার কথাকে বিশ্বাস করেছিলেন। আর আল্লাহর নামের যে কোনো কথাকে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে থাকেন। তাই হযরত আদম (আ) শয়তানের প্রতারণায় পড়ে গেলেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ

অর্থ : এভাবে ধোঁকা দিয়ে সে দুজনকেই (ধীরে ধীরে) বশ করে ফেলল। যখনি তারা ঐ গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তখনি দুজনেরই লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন তারা বেহেশতের (গাছের) পাতা দিয়ে তাদেরই শরীর ঢাকতে লাগল। -সূরা আ'রাফ : ২২

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদেঅ অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে—

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚ

"শেষ পর্যন্ত দুজনেই ঐ গাছের ফল খেয়ে ফেলল। এর ফলে তখন তখনই তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে গেল। তখন দুজনই বেহেশতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল।[১]" -সূরা ত্বা-হা : ১২১

১. *অন্য কথায় নাফরমানী ঘটার কারণেই ঐ সব সুখ-শান্তির উপকরণ তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, যা সরকারিভাবে তিনি পেয়েছেন। সরকারি পোশাক ছিনিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে এর প্রথম প্রকাশ ঘটে। খাদ্য, পানীয় ও বাসস্থান থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তো এরপর ঘটার কথা।*

হযরত হাওয়া (আ) এ ফল হযরত আদম (আ)-এর পূর্বেই খেয়েছিলেন এবং তিনি হযরত আদম (আ)-কে তা খেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

বুখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসখানা উপরোক্ত কথারই সুস্পষ্ট সহায়ক। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি বনী ইসরাঈলরা না হতো, তবে কখনই গোশত নষ্ট হতো না। আর হাওয়া যদি না হতো, তবে কোনো স্ত্রীলোক তার স্বামীর সাথে কখনই বিশ্বাস ভঙ্গ করতো না।"

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এ কথাটি প্রতীয়মান হলো যে, হযরত আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে হযরত হাওয়া (আ)-ই উৎসাহিত করেছিলেন।

এ হাদীসগুলো হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। বনী ইসরাঈলদের কাছে রক্ষিত তাওরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাওয়া (আ)-কে ফল খেতে উৎসাহিত করেছিল একটি সাপ। সে সাপটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। হযরত হাওয়া (আ) সাপটির কথামতো নিজেও ফল ভক্ষণ করেন এবং হারত আদম (আ)-কেও ভক্ষণ করান। এ ক্ষেত্রে ইবলীসের কথা উল্লেখ নেই। তারপর দু'জনার চোখ খুলে যায় এবং তাঁরা অনুভব করলেন যে, তাঁরা উভয়ই বস্ত্রহীন। তারপর তাঁরা যয়তুন গাছের পাতা তাঁদের শরীরে জড়িয়ে নেন এবং তাঁদের এ কাজের জন্য অনুতপ্ত হন। তাওরাতে (প্রথম থেকেই) উভয়ের বস্ত্রহীন থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর ওহাব বিন মুনাব্বাহ (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম থেকেই আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ের পোষাক ছিল শুধু এক প্রকার জ্যোতি। যা (জ্যোতি) তাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রেখেছিল।

এ বিষয়টি জানা থাকা প্রয়োজন যে, বর্তমান আহলে কিতাবদের কাছে যে তাওরাত গ্রন্থ রক্ষিত রয়েছে, সেটি মূল কিতাব থেকে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত। সুতরাং তাওরাতের এ কথাটি যে, "হযরত আদম (আ) প্রথম থেকেই বস্ত্রহীন ছিলেন" সঠিক নয়। কারণ, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে–

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا .

অর্থ : তাদের শরীর থেকে তাদের পোশাক খুলিয়ে ফেলেছিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান একে অপরের সামনে খুলে যায়। –সূরা আ'রাফ : ২৭

উল্লেখ্য যে, আসমানী কিতাবসমূহের তথ্যের মধ্যে আলোচনা ভিন্নরকম থাকতে পারে না। (অর্থাৎ, তাওরাত বা অন্য কোনো আসমানী কিতাবে যে বর্ণনা রয়েছে, তার বিপরীত বর্ণনা কুরআন মাজীদে থাকবে, তা হতে পারে না।)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট ও ঘন কেশবিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন। মনে হতো যেন তিনি ছিলেন একটি লম্বা খেজুর বৃক্ষ। তারপর আদম (আ) যখন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেন তখন তাঁর পোষাক খসে পড়ে। তখন সর্বপ্রথম তাঁর লজ্জাস্থান তাঁর কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। যখন নিজ লজ্জাস্থানের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে, তখন তিনি লজ্জায় জান্নাতের দিকে দৌঁড়াতে আরম্ভ করেন। পথে একটি গাছের সাথে তাঁর চুল আটকে যায়। তারপর আদম (আ) যখন নিজকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেন, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার কথা শুনতে পেয়ে আরয করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! না, আমি পলিয়ে যাচ্ছি না, শুধু লজ্জার কারণে এরূপ অস্থির করছি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা যে বলেছেন, "তারা জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল।" –সূরা ত্বাহা : ১২১

গাছের পাতা দ্বারা যয়তুন বৃক্ষের পাতাকে বুঝানো হয়েছে। এ বর্ণনার সূত্রও সঠিক। আর এরূপ বর্ণনা আহলে কিতাব থেকেও বর্ণিত আছে। যদিও আয়াতে সুনির্দিষ্ট কোনো বৃক্ষের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি। কিন্তু উপরোক্ত কথাটি মেনে নিলেও কোনো প্রকার জটিলতা সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা আদম (আ) খেজুর গাছ সদৃশ লম্বা ছিলেন। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তাঁর কেশ ছিল ঘন ও লম্বা। (পোষাক দ্বারা) তাঁর সতর আবৃত ছিল। তারপর জান্নাতে বসে তিনি যখন একটি ভুল করে ফেললেন, তখন তাঁর লজ্জাস্থান তাঁর কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁকে জান্নাত থেকে বের হতে হলো। পথে একটি বৃক্ষ তাঁর কেশগুচ্ছ জড়িয়ে ধরলো। তারপর তাঁর পরওয়ারদেগার তাঁকে ডেকে বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আদম (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনার কসম! আপনার থেকে পালিয়ে যাচ্ছি না, বরং লজ্জাবশত এরূপ করছি।

উল্লিখিত হাদীসে ইবনে আসাকের মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। এর পূর্বে এটি হাসান বসরী (রহ) উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ এদের উভয়ের মধ্যে কোনই সাক্ষাৎ হয় নি। এ কারণে ইবনে আসাক (রহ) এ হাদীস সাঈদ ইবনে উবাই ওরওয়াকার সূত্রে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া ইবনে হাম্যাও উবাই বিন কা'ব থেকে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করেন। সুতরাং এ সূত্র এবং বর্ণনা অধিক শুদ্ধ। এছাড়াও তিনি খুসায়মা ইবনে সুলায়মান সূত্রেও এটি বর্ণনা করেন। যা হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

অর্থ : তাদের রব তাদের দুজনকেই ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করি নি এবং তোমাদেরকে বলে দেই নি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? দুজনেই বলে উঠল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর রহম না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব।[১] –সূরা আ'রাফ : ২২–২৩

এ হলো তাঁর ভুলের স্বীকারোক্তি ও অনুশোচনা এবং তা থেকে ফিরে আশা আর আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে বিনয়াবনত হওয়া এবং নিজের অক্ষমতা, অযোগ্যতা ও অপারগতা প্রকাশ করা।

স্মর্তব্য যে, আদম (আ)-এর সন্তানদের যে কেউই তার অন্যায় ও ভুলের জন্য এরূপ অনুতপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হবে।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۔

অর্থ : (আল্লাহ তা'আলা) বললেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে বসবাসের এবং জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে। –সূরা আ'রাফ : ২৪

১. *এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরমের অনুভূতি সহজাত বা স্বভাবগত। এর প্রাথমিক প্রকাশ হচ্ছে মানুষের নিজের শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশকে অপরের সামনে খুলতে প্রকৃতিগতভাবে লজ্জা অনুভব করা। এ জন্যই মানুষকে তার প্রকৃতি ও স্বভাবের সোজা-সরল রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে শয়তানের সর্বপ্রথম চাল হচ্ছে মানুষের এই শরম ও লজ্জাবোধের উপর আঘাত হানা। উলঙ্গতার পথ দিয়ে মানুষের জন্য প্রকাশ্য জঘন্যতা ও অশ্লীলতার দরজা খুলে দেওয়া ও কোনো প্রকারে মানুষকে ঘিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত করা। তা ছাড়া এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, উচ্চ ও উন্নত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। তাই শয়তানকে মানুষের সামনে হিতাকাঙ্ক্ষীর ছদ্মবেশে এসে বলতে হয়েছিল, "আমি তোমাদের অধিকতর উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিতে চাই।" এছাড়া এর দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে, মানুষের যে বিশেষ সংগুণ মানুষকে শয়তানের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে তা হচ্ছে, মানুষ দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ করে ফেললে লজ্জিত হয়ে সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আর যে জিনিস শয়তানকে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল, তা হচ্ছে, সে দোষ করা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার সামনে একগুঁয়েমি দেখিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পিছপা হয় নি।*

এ আদেশ ছিল আদম ও হাওয়া (আ)-এর প্রতি। কারো মতে, সাপটিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদেরকে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, তারা একে অপরের শত্রু থাকবে।

আর হযরত আদম এবং হাওয়া (আ)-এর সাথে সাপটিকেও বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ কথা যারা বলেন, তারা তাদের এ কথার দলীলস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করে থাকেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাপ মেরে ফেলার আদেশ দিয়ে বলেন, "যেদিন থেকে আমরা সে (সাপ)-গুলোর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছি, সেদিন থেকে আমরা ওদের সাথে আর কোনোরূপ সন্ধি করি নি।" -আহমদ

কারো মতে, এখানে দ্বিবচন শব্দ ব্যবহার করে সকলকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- কুরআন মাজীদের আয়াতে বর্ণিত আছে-

وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ج وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ .

অর্থ : (হে নবী!) আর স্মরণ করুন দাউদ ও সোলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করেছিল শস্য ক্ষেত সম্পর্কে। তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ। আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাদের বিচার। -সূরা আম্বিয়া : ৭৮

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত 'তাদের বিচার' এখানে বহুবচন (সর্বনাম) দ্বারা দু' ব্যক্তির কথা আলোচনা হয়েছে। সূরা বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ج وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۞ فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۞

অর্থ : আমি তখন হুকুম দিলাম, এখন তোমরা সবাই এখান থেকে বের হয়ে যাও। তোমরা একে অপরের দুশমন। তোমাদেরকে দুনিয়ায় একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত থাকতে হবে এবং সেখানেই জীবন যাপন করতে হবে। ঐ সময় আদম তার রবের কাছ থেকে কিছু কথা শিখে তাওবা করল, যা তার রব কবুল করে নিলেন। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। আমি বললাম, তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখনই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়াত পৌঁছবে, তখন যারা আমার হেদায়াত মেনে চলবে, তাদের জন্য কোনো ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। আর যারা তা মানতে অস্বীকার করবে, আর আমার আয়াতগুলো মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে তারাই দোযখের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। -সূরা বাকারা : ৩৬-৩৯

মুফাসসিরগণ বলেছেন, উল্লিখিত আয়াতে প্রথম অবতরণ বা বের হয়ে যাও আদেশ দ্বারা জান্নাত থেকে প্রথম আকাশে অবতরণের আদেশ এবং দ্বিতীয় অবতরণ বা নেমে যাও আদেশ দ্বারা নিকটবর্তী আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণের আদেশ বুঝানো হয়েছে। তবে এ বর্ণনাটি দুর্বল। কারণ, আল্লাহ তা'আলার প্রথম আদেশই ছিল (সরাসরি) পৃথিবীতে অবতরণের আদেশ।

আসল কথা এই যে, শুধু শব্দ হিসেবে 'নেমে যাও' বা বের হয়ে যাও কথাগুলো বলা হয়েছে। কিন্তু অর্থগত হিসেবে এখানে একবার অবতরণ করার আদেশই বুঝানো হয়েছে। তবে এটা হতে পারে যে, এখানে প্রতিবারের আদেশ দ্বারা নতুন কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলা উদ্দেশ্য। যেমন, প্রথম আদেশে পারস্পরিক শত্রুতার কথা বলা

হয়েছে। আর দ্বিতীয় আদেশে বলা হয়েছে, "যে আমার সৎপথের অনুসরণ করবে, সে জান্নাতী এবং সফলকাম হবে। আর যে অনুসরণ করবে না, সে জাহান্নামী ও হতভাগা হবে।

এ ধরনের শব্দ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। হাফেজ আসাকির (রহ) মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা দু' ফেরেশতাকে আদেশ দেন যে, আদম ও হাওয়া (আ)-কে আমার নৈকট্য থেকে বের করে দাও। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর মাথা থেকে মুকুট এবং মীকাঈল (আ) তাঁর কপাল থেকে (সম্মানের) তিলক তুলে নেন। তারপর হযরত আদম (আ) কোনো গাছের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি দ্রুত কোনো শাস্তিতে নিপতিত হয়েছেন।

অতঃপর তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার মস্তক অবনত করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যেতে চাও? আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! লজ্জার কারণে আমি এরূপ করছি। ইমাম আওযায়ী (রহ) হাসান ইবনে আতিয়্যা (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ) জান্নাতে একশ' বছর বাস করেছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় ষাট বছর বাস করার কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আদম (আ) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়াতে সত্তর বছর, আর নিজ পুত্র হাবীল মারা যাওয়ার শোকে চল্লিশ বছর ক্রন্দন করেছিলেন। ইবনে আসাকির (রহ) এটি বর্ণনা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আদম (আ)-কে মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান "দাহনায়" অবতরণ করানো হয়। হযরত হাসান (রহ) বলেন, হযরত আদম (আ)-কে হিন্দুস্তানে এবং হযরত হাওয়া (আ)-কে জিদ্দায় শয়তানকে বসরা থেকে চার মাইলের দূরত্বে দস্তমীসান নামক স্থানে অবতরণ করানো হয়। আর সর্পটিকে অবতরণ করা হয় ইস্পাহানে। হযরত আবূ হাতিমেরও এ অভিমত। হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে হিন্দুস্থানে নামানো হয়। নামানোর সময় তাঁর কাছে হাজারে আসওয়াদ এবং জান্নাতী গাছের এক মুঠো পাতাও ছিল। হযরত আদম (আ) নেমে এসে সে পাতা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেন। সেই পাতা থেকেই হিন্দুস্থানে সুগন্ধি গাছ উৎপন্ন হয়। হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত আদম (আ) সাফা পর্বতে এবং হযরত হাওয়া (আ) মারওয়া পর্বতে অবতরণ করেন। ইবনে হাতিম (রহ) এ বর্ণনাটি সমর্থন করেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেছেন, যখন হযরত আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করানো হয়, তখন তাঁকে প্রতিটি বস্তু তৈরির কাজ শিখিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, শিল্পকার ও কারিগর করে প্রেরণ করেন। আর জান্নাতের ফল-ফলাদিগুলো তাঁর আহার্য হিসেবে সাথে দিয়ে দেন। সুতরাং তোমাদের সম্মুখে বর্তমানে যে সব ফল রয়েছে, সেসব মূলত জান্নাতী ফল থেকেই এসেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, এ পার্থিব ফলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আর সে জান্নাতী ফলগুলো কখনই নষ্ট হয় না। সর্বদা একই অবস্থায় থাকবে। ইমাম হাকেম (রহ) তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হযরত আদম (আ) জান্নাতে শুধু আসর ও মাগরিবের নামাযের মধ্যবর্তী সময়টুকু অবস্থান করেন। হাকেম (রহ) বলেন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তবে তাঁরা এ হাদীস খানা বর্ণনা করেন নি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে, জুমআর দিন। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়। -মুসলিম

বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এভাবে বর্ণিত আছে যে, জুমআর দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

ইমাম আহমদ বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দিনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হলো জুমআর দিন। এ দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয় এবং এ দিনেই কিয়ামত হবে।

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় অবতরণ করানো হয়েছিল। এ সময় তাঁদের শরীরে জান্নাতী গাছের পাতা ছিল। তখন হযরত আদম গরমে খুব অস্থির হয়ে পড়েন। তিনি বসে কাঁদতে শুরু করলেন এবং হাওয়া (আ)-কে বললেন, হে হাওয়া! গরমে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তারপর জিবরাঈল (আ) কিছু তুলা নিয়ে উপস্থিত হন এবং হাওয়া (আ)-কে বলেন, এ তুলা কেটে সুতা তৈরি করে লও। জিবরাঈল (আ) হাওয়াকে সুতা কাটার নিয়মও শিখিয়ে দেন। তারপর হযরত আদম (আ)-কে কর্তিত সুতা দ্বারা কাপড় তৈরি করার আদেশ দেন এবং কাপড় তৈরি করার নিয়মও শিখিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) জান্নাতে তাঁর স্ত্রী (হযরত হাওয়া) এর সাথে সহবাস করেন নি। এর পূর্বেই তাঁর ভুলের কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। তাঁরা পৃথিবীতে এসেও আলাদা আলাদাভাবে শয়ন করতেন। একজন "বাতহা" উপত্যকায়, আর একজন অন্য এক স্থানে শয়ন করতেন। একদিন হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত আদমের কাছে আগমন করেলেন এবং তাঁকে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসার জন্য আদেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, জিবরাঈল (আ) হযরত আদমের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, হযরত হাওয়া (আ)-কে আপনি কেমন পেয়েছেন? হযরত আদম (আ) বললেন, খুব ভাল পেয়েছি।

বর্ণিত হাদীসখানা গরিব। পূর্ববর্তী কয়েকজন আলেমের বক্তব্য এই যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্য থেকে সাঈদ ইবনে মাইসারা, ইনিই হলেন আবূ ইমরান বিকরী আল বাসরী। যার ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন যে, ইনি 'মুনকারুল হাদীস'। ইবনে হিব্বান বলেছেন ইনি মনগড়া হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। ইবনে আদী বলেছেন যে, তার ব্যাপারটি অজ্ঞাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলেন। ফলে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" –সূরা বাক্বারা : ৩৭

হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলা পক্ষ হতে যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সে বাণী সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে বাণী ছিল–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থ : হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর অন্যায় করে ফেলেছি। এখন যদি আপনি আমাদেরকে মাফ না করেন এবং আমাদের উপর দয়া না করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। –সূরা আ'রাফ : ২৩

মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, আবূ আলীয়া, বারী ইবনে আনাস, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইবনে কাব, খালিদ ইবনে মাদান, আতা আল খুরাসানী এবং আব্দুর রহমান ইবনে যায়িদ ইবনে আসলাম এ সকল মনীষীগণ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে।

উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি যদি (আমার অপরাধের জন্য) তওবা করি এবং (এর থেকে) পত্যাবর্তন করি, তবে কি আমাকে পুনরায় জান্নাতে ফিরিয়ে নেওয়া হবে? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। এটাই সে বাণীসমূহ যা হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলা থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ হাদীসটি গরিব এবং সনদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। ইবনে আবু নাজীহ (রহ) হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার শিখানো সে বাণীগুলো ছিল এরূপ–

اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ اِنَّكَ

خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্র ও প্রশংসিত। হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। অতএব, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাকারীদের সর্বোত্তম। হে আল্লাহ! আপনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। অতএব আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি দয়ালুদের সর্বোত্তম। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি ও প্রশংসা করছি।

হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আপনি আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী অতি দয়ালু।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্বাস (রা) বলেছেন যে, হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করেন, "হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি কি আমাকে আপনার নিজ কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করেন নি? উত্তরে বলা হলো, কেন নয়? অবশ্যই। তারপর আদম (আ) আরয করলেন, আপনি কি আপনার পবিত্র রূহ আমার মধ্যে প্রদান করেন নি? জবাবে বলা হলো, কেন নয়? অবশ্যই। তারপর আরয করেন, যখন আমি হাঁচি দিচ্ছি, তখন কি আপনি 'তোমার উপর আল্লাহর রহমত হোক' বলেননি এবং আপনার রহমত কি আপনার গজবের (ক্রোধ) উপর প্রবল নয়? জবাবে বলা হলো, কেন নয়? অবশ্যই। তারপর আরয করলেন–

আপনি কি আমার জন্যে তাকদীরে এ কথা লিখে রাখেন নি যে, আমি এরূপ কাজ করব? জবাবে বলা হলো, কেন নয়? অবশ্যই। তারপর আরয করেন, আমি যদি আমার ভুলের জন্য তওবা করি এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করি, তবে কি আপনি আমাকে বেহেশতে পুনরায় ফিরিয়ে নেবেন? উত্তরে বলা হলো, জী হ্যাঁ।

ইমাম হাকিম বলেছেন, এর সনদ (সূত্র) সঠিক। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (রহ) এ হাদীস বর্ণনা করেন নি।

হযরত ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন হযরত আদম (আ) থেকে ভুল সংঘটিত হয়ে গেল, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কাছে মুহাম্মদ ﷺ-এর ওসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিচয় কিভাবে জান? অথচ আমি তাঁকে এখনো পর্যন্ত সৃষ্টি করি নি। হযরত আদম (আ) জবাবে বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তাঁর পরিচয় এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আপনি আমাকে আপনার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করে আপনার পবিত্র রূহ আমার মধ্যে প্রদান করেছেন, তখন আমি আমার মাথা উত্তোলন করে আরশের উপরে লেখা দেখতে পেয়েছি—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তখন আমি বুঝতে পারলাম, যে নামটি আপনার পবিত্র নামের সাথে সম্পৃক্ত, নিশ্চয়ই তিনি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। তিনি আমার কাছে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়। যখন তুমি তাঁর ওসীলা দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রেখ, মুহাম্মদ ﷺ-কে যদি সৃষ্টি করা না হতো, তবে তোমাকেও আমি সৃষ্টি করতাম না। উপরোক্ত ঘটনা নিম্নের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট।

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۞ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ـ

অর্থ : আদম তার প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হলেন ও তাকে পথ নির্দেশ করলেন। –সূরা ত্বাহা : ১২১-১২২

হযরত আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার বাধানুবাদ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে পরস্পরে কথাবার্তায় বিরোধ হয়। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি যে, আপনার একটি ভুলের কারণে সমস্ত মানুষ জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং আপনি আমাদেরকে স্থায়ী আরাম-আয়েশ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আপনি একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে তিনি (আল্লাহ) কথা বলেছেন। (এত বড় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হয়েও) আপনি এমন একটি ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করছেন, যে ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন। –বুখারী

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মূসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে পরস্পরে কথাবার্তা হয়। হযরত আদম (আ)-কে হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনি সেই আদম (আ) যে, আপনার একটি ভুলের কারণে আপনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। হযরত আদম (আ) উত্তরে বললেন, আপনি সেই মূসা (আ), আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল করে মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে তিনি (আল্লাহ) কথা বলেছেন। আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছেন, যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার তাকদীরে (ভাগ্যে) লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথাবার্তায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি দু'বার বললেন। –বুখারী, মুসলিম

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে কথোপকথন হলো। হযরত মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি সেই মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যে, আল্লাহ আপনাকে তাঁর কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং (সৃষ্টি করার পরে) তাতে তাঁর রূহ মুবারক দান করেছেন। আর আপনি লোকদের সাথে প্রতারণা করেছেন এবং তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। আদম (আ) উত্তরে বললেন, আপনি তো সেই মূসা, আল্লাহ আপনাকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনয়ন করেছেন এবং আপনার সাথে তিনি (আল্লাহ) কথা বলেছেন। (অথচ) আপনি আমাকে আমার এমন একটি কর্মের জন্য তিরস্কার করছেন, যেটা আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে আমার জন্য লিখে রেখেছেন। এ কথাবার্তায় আদম (আ) বিজয়ী হলেন। –তিরমিযী, নাসায়ী

ইমাম আহমদ (রহ) বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর মধ্যে পরস্পরে কথাবার্তা হয়।

হযরত মূসা (আ) বললেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের ক্ষতি করেছেন। আপনি আমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছেন। আদম (আ) উত্তরে বললেন, হে মূসা! আপনি সেই (বিশিষ্ট) ব্যক্তি যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কথা বলেছেন এবং আপনাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। আর আপনার জন্য নিজ হাতে তাওরাত কিতাব লিখেছেন। এরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও) আপনি আমাকে এমন কর্ম সম্পর্কে তিরস্কার করছেন, যা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে লিখে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ বলেন, এ কথায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হলেন।

হযরত আওস (রহ) বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ)-এর মধ্যে কথাবার্তা হয়। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বললেন, হে আমাদের (সম্মানিত) পিতা! আপনি আমাদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছেন এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, আপনি সেই মূসা, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে কথা বলেছেন এবং আপনাকে তাওরাত কিতাব দান করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছেন, যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন? এ কথায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন। হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন। হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন। (এভাবে তিনবার বলেন।)

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বললেন, আপনি সেই আদম, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন এবং আপনাকে জান্নাতে জায়গা দিয়েছেন। এরপর আপনি একটি কাজ করে বসেন। যাতে জান্নাত থেকে আপনাকে বের হতে হলো। হযরত আদম (আ) উত্তরে বললেন, আপনি সেই মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। এখন আপনি বলুন, আমাকে কি প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে? না আমার তাকদীর (ভাগ্য)-কে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে? মূসা (আ) বললেন, তাকদীর (ভাগ্য) প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হন।

মুহাম্মদ ইবনে সুরাইন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ)-এর সাথে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বললেন, আপনি আদম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতে বাসস্থান দিয়েছেন এবং নিজ ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। এরপর আপনি যা করার করেছেন। হযরত আদম (আ) হযরত মূসাকে উত্তরে বললেন, আপনি কি সেই ব্যক্তি, যার সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলেছেন এবং যার উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? হযরত মূসা (আ) বললেন, আপনার কৃতকর্মের কথা আগে বলা হয়েছে। (অর্থাৎ, আপনার কর্মের কথাটি আপনার সৃষ্টির আগেই লেখা হয়েছে।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথাবার্তায় হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয় লাভ করেন।

ইবনে আবূ হাতিম (রহ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর মধ্যে পরস্পরে কথাবার্তা হয়। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বললেন, আপনি তো সেই ব্যক্তি, আপনাকে আল্লাহ তাঁর কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে জান্নাতে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন।

তারপর আপনি একটি ভুল করে মানুষদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ) উত্তরে বললেন, আপনি মূসা (আ), আপনাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূল হিসেবে মনোনয়ন করেছেন এবং তিনি (আল্লাহ) আপনার সাথে কথা বলেছেন। তিনি আপনাকে এমন সব কতক ফলক দান করেছেন, যাতে যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। আপনার সাথে একান্তে কথোপকথনের জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। হে মূসা! আপনি কি অবগত আছেন, সেই তাওরাত কিতাব (আমার সৃষ্টির) কত বছর আগে লেখা হয়েছিল, এরপর হযরত আদম (আ) বললেন, আপনি কি তাতে এ কথাটি লেখা পান নি যে, "আদম তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করে নি, যার ফলে সে বিপদগামী হয়েছে"। হযরত মূসা (আ) উত্তরে বললেন, জী হ্যাঁ, পেয়েছি। তারপর হযরত আদম (আ) বললেন, (হে মূসা!) আপনি আমাকে আমার এমন একটি কর্মের জন্য তিরস্কার করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগেই আমার ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথায় আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হন। -মুসলিম

ইমাম আহমদ (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, আবূ সালমা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যে কথোপকথন হয়। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বললেন, হে আদম! আপনি সেই ব্যক্তি, আপনি আপনার সন্তানদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। হযরত আদম (আ) উত্তরে বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং আপনার সাথে কথা বলেছেন এবং তাওরাত কিতাব আপনার উপর নাযিল করেছেন। আপনি কি তাতে এ কথাটি পেয়েছেন যে, আমাকে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেওয়া হবে? মূসা (আ) বললেন, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথায় আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

হযরত মূসা (আ)-এর এ কথাটি "আপনি আপনার সন্তানদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এটি হাদীসের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। হাদীসে এ বর্ণনাটি সুস্পষ্ট নয়।

উল্লিখিত সকল বর্ণনাই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) হতেও বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দোয়া করেছেন যে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে একটু আদম (আ)-কে দেখান। যিনি আমাদেরকে এবং তাঁর নিজকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (হযরত আদমকে) দেখালেন। এই সাক্ষাতের সময় মূসা (আ) আদম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রূহ মুবারক দান করেছেন এবং যাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন এবং সব বস্তুর নাম শিখিয়েছেন? তিনি বললেন জী হ্যাঁ। এরপর মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনাকে কি এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছিল যে, আপনি আমাদেরকে ও আপনার নিজেকে জান্নাত হতে বের করিয়ে দিয়েছেন? তখন হযরত আদম (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা। আদম (আ) বললেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের পয়গম্বর মূসা? আপনার সাথে আল্লাহ তা'আলা পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি কথা বলেছেন? মূসা (আ) উত্তরে বললেন, জী হ্যাঁ। তারপর হযরত আদম (আ) বললেন, আপনি আমাকে এমন একটি কাজে দোষারোপ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলা অনেক আগে থেকেই আমার ব্যাপারে লিখে রেখেছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথায় হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হয়ে যান। -আবূ দাউদ

হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, হযরত ওমর (রা) বলেছেন, (সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনে বলেছেন) "হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে মূসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি মানবজাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন এবং ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। তারপর আপনার একটি কর্ম আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। হযরত আদম (আ) বললেন, আপনি কি আমার এ (ত্রুটির) কথাটি লেখা পান নি? এ কথায় হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হলেন।

মোটকথা, এ হাদীস বিভিন্ন সূত্রে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। এদিক থেকে এ হাদীসের বর্ণনা সহীহ হওয়াতে কোনই সন্দেহ নেই।

উল্লেখ্য যে, প্রাচীন যুগে কাদেরিয়া ও জাবরিয়া এ সম্প্রদায় দুটি খুব প্রসিদ্ধ ছিল। কাদেরিয়াদের মতবাদ এই যে, তারা মনে করে মানুষ নিজেই তার কর্মের স্রষ্টা। এ কাজে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করুক অথবা নাকরুক। দ্বিতীয় ভ্রান্ত সম্প্রদায় হচ্ছে জাবরিয়া। তাদের মতবাদ হলো এই যে, মানুষ অপারগ। মানুষ নিজে কিছুই করতে পারে না। সে (মানুষ) শুধু পাথর সদৃশ। মূলত এ দুটি মতবাদই ভ্রান্ত। ইসলামী (সঠিক) আকীদা- যা কুরআন ও হাদীস থেকেই সংগৃহীত, তা এই যে, আল্লাহ সবকিছুরই স্রষ্টা। চাই সে কাজগুলো মানুষের দ্বারা সংঘটিত হোক বা না হোক। যেমন- খাওয়া, উপার্জন ইত্যাদি। তবে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে এক প্রকার ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) প্রদান করেছেন যে, ইচ্ছা করলে সে করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে না-ও করতে পারে। যেমন- একবার হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের কতটুকু ইখতিয়ার আছে? তিনি

প্রশ্নকারীকে বললেন, তুমি তোমার এক পা উঠাও। প্রশ্নকারী তার এক পা উঠাল। অতঃপর হযরত আলী (রা) তাকে দ্বিতীয় পা উঠাতে বললেন, প্রশ্নকারী বললেন, তা কি করে সম্ভব? এটা তো হতে পারে না। তারপর হযরত আলী (রা) বললেন, এরূপেই। (অর্থাৎ, মানুষ একেবারে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী। এ কারণেই কাদেরিয়া সম্প্রদায় এ হাদীসের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছে। কারণ, এ হাদীস তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। আর জাবরিয়া সম্প্রদায়, এ হাদীসকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের স্বপক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রতীয়মানও হয়। কারণ, হযরত আদম (আ) তাঁর ত্রুটিকে পূর্ব নির্ধারিত (তাকদীর) বলে বর্ণনা করেছেন। তবে এর উত্তর রয়েছে।

আলেমগণ বলেছেন, হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উত্তরে তাকদীরের কথা এজন্য বলেছিলেন যে, মূসা (আ) তাঁকে যে বিষয়ে তিরস্কার করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা করেছিলেন। আর তওবাকারীর অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে যে, তার (তাওবাকারীর) কোনো পাপই নেই। -হাদীস

কেউ কেউ বলেছেন যে, আদম (আ)-এর এরূপ বলার কারণ, আদম (আ) ছিলেন তার আদি পিতা। কেউ কেউ বলেছেন, এ দু'জন নবী ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন শরীয়তের বাহক। আবার কেউ বলেন, এরূপ বলার কারণ এই যে, তাঁরা দু'জন ছিলেন আলমে বরযখে। সে জগতের কথা ভিন্ন। সঠিক কথা হলো এই যে, এই হাদীস বহু কথনে (উক্তিতে) বর্ণিত হয়েছে। আর কোনো কোনো হাদীস বর্ণিত হয়েছে অর্থগতভাবেও। সুতরাং এ হাদীসের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করা হঠকারীতা ছাড়া আর কিছুই না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে (এ সম্পর্কিত) যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার সারকথা এই যে, হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে দোষারোপ করার কারণ ছিল এই যে, (তাঁর ধারণায়) তিনি নিজেকে ও তাঁর সন্তানদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে কথার উপরে হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আমি "আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করি নি।" কারণ আমার এ বহিষ্কার আমার ফল খাওয়ার কারণে হয় নি। বরং আমার ও আপনাদের জান্নাত থেকে বের হওয়ার ব্যাপারটি আমার সৃষ্টির অনেক আগে আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছিলেন এবং নির্ধারণ করেও রেখেছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাকে আপনি অন্তত এতটুকু দোষারোপ করতে পারেন যে, আমাকে এ ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি তা খেয়ে ফেলেছি। আর আমার এ কর্মের কারণে আমাকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয় নি। সুতরাং আমি না আপনাদেরকে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছি। আর না আমি আমার নিজকে জান্নাত হতে বের করেছি। এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও রহস্য। সুতরাং হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হয়ে যান।

যারা এ হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা মূলত হঠকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ। কারণ, এ হাদীসসমূহ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত। আর তাঁর বর্ণনার সংরক্ষণতা ও বিশ্বস্ততা দোষমুক্ত ও সর্বজন স্বীকৃত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়াও অন্যান্য সাহাবী থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কিছু পূর্বে হাদীসের যে কয়েকটি উত্তর দেয়া হয়েছে, সে উত্তরগুলো মূলত শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ। এছাড়াও এর কোনো কোনো উত্তরে বাজরিয়া সম্প্রদায়ের সহযোগিতা হয়। এসব উত্তরের কতগুলো বিষয় গ্রহণযোগ্য।

প্রথমতঃ মূসা (আ) এমন কাজের জন্য তিরস্কার করতে পারেন না, যে কাজ থেকে তিনি তওবা করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ মূসা (আ) নিজেও আল্লাহর আদেশ ব্যতীতই এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, সে কৃতকর্মের জন্য তিনি এ বলে তওবা করেছেন—

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ.

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর অন্যায় করেছি। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। –সূরা ক্বাসাস : ১৬

তৃতীয়ত ঃ হযরত আদম (আ) যদি ভুলের কারণ হিসেবে তাকদীর (পূর্ব লিখিত)-এর কথা বলে থাকেন, তবে প্রত্যেক মানুষই পাপ করে এ কথা বলতো যে, তাকদীরে ছিল, তাই এ (পাপের) কাজ আমি করেছি। আর এভাবে হলে ইসলামী দণ্ড ও শাস্তির বিধান রহিত হয়ে যেত। এটা কখনই হতে পারে না। "তাকদীর" যদি অপরাধেরই দলীল হতো, তবে ছোট বড় প্রতিটি অপরাধের ব্যাপারেই সকলে তাকদীরকে দলীল হিসেবে পেশ করতো। যাতে অন্যায় অবিচার ও বিশৃঙ্খলার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যেতো।

এ জন্যে আলেমগণ বলেছেন যে, হযরত আদম (আ) মূসা (আ)-এর কথার উত্তরে তাকদীরের দ্বারা তাঁর কৃতকর্মের উপর দলীল পেশ করেন নি। বরং তাঁর তাকদীর দ্বারা তাঁর মসীবতের কথারই দলীল পেশ করেছেন। (অর্থাৎ, আমার তাকদীরে এই মসীবতই লেখা ছিল। অন্যথায় তিনি যদি তাঁর ভুল করাটা তাকদীর হিসেবেই মনে করতেন, তাতে তিনি তাঁর ভুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন না।)

হাদীসে আদম (আ)-এর সৃষ্টির আলোচনা

ইমাম আহমদ (রহ) বলেছেন, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত মাটির সংমিশ্রণে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। সুতরাং আদম সন্তানরা (সেই) মাটি অনুযায়ী কেউ হয় সাদা, কেউ হয় কালো, কেউ হয় লাল বর্ণের, আবার কেউ হয় এর মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় সুন্দর, কেউ হয় কুৎসিত, কেউ হয় কোমল হৃদয়ের, কেউ হয় কঠোর হৃদয়ের, আবার কেউ হয় এর মধ্যম।

উল্লিখিত বর্ণনাটি মুহাম্মাদ ইবনে জাফর সূত্রে বর্ণিত। আর হাওয়াহ (রহ) সূত্রে এটি বর্ণিত আছে। হাওয়াহ (রহ) যোহায়র (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আশ'আশ (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে এক মুষ্ঠি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদম (আ)-এর সন্তানরাও ভূপৃষ্ঠের অনুরূপ সাদা, কালো ও লাল বর্ণের এবং এর মাঝামাঝি হয়। আবার সুন্দর ও কুৎসিত হয় এবং এর মাঝামাঝিও হয়।

(ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনে হিব্বান (রহ) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।)

ইবনে মাসউদ (রা) ও কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু মাটি তুলে নেওয়ার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে পৃথিবীতে পাঠালেন। (পৃথিবীতে আগমন করার পর) পৃথিবী হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বলল আপনি আমার থেকে কিছু মাটি তুলে নিয়ে আমাকে ত্রুটিযুক্ত করবেন, অযথা আমাকে ত্রুটিযুক্ত করবেন, এর থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়ে খালি ফিরে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে আরয করেন, হে পরওয়ারদেগার! সে (পৃথিবী) আপনার নাম নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। সুতরাং আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মীকাঈল (আ)-কে পাঠালেন। পৃথিবী তাঁর কাছেও আশ্রয় প্রার্থনা করে। তিনিও তাকে আশ্রয় দেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে গিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মতই আরয করেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আযরাঈল (আ)-কে পাঠালেন। পৃথিবী তাঁর কাছেও অনুরূপভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়ন না করে আমি খালি হাতে ফিরে যাব, আমি এর থেকে ক্ষমা চাই।" সুতরাং আযরাঈল (আ) ভূপৃষ্ঠের (বিভিন্ন স্থান) থেকে মাটি সংগ্রহ করে তা মিশিয়ে নিলেন। এ মাটিগুলো ছিল সাদা, কালো ও লাল বর্ণের। আর এর ফলেই আদম সন্তানদের বর্ণও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) এ মাটি নিয়ে (উর্ধ্ব জগতে) চলে আসলে– আল্লাহ তা'আলা এ মাটিগুলো পানিতে মিশিয়ে খামির বানান। এতে এ খামির নরম আঠাযুক্ত মাটি হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন–

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

অর্থ : আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ বানাব। যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁ দিয়ে দেবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। –সূরা সোয়াদ : ৭১-৭২

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলীস তাঁর উপর অহংকার করতে না পারে। প্রথমে একটি মানবদেহ তৈরি করেন। তারপর আত্মাবিহীন এ দেহটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত এভাবেই পড়ে থাকে। আর সে সময়টি ছিল জুমুআর দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়কাল।[১] ফেরেশতাগণ তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করেন এবং তা দেখে ঘাবড়িয়ে যান। সবচেয়ে বেশি ঘাবড়িয়ে যায় ইবলীস। সে তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করার সময় তাঁকে আঘাত করতো। ফলে (আত্মাবিহীন) দেহটির থেকে ঠনঠনে পোড়া মাটির অনুরূপ শব্দ বের হতো।

যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

অর্থ : মানুষকে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হতে। –সূরা আর-রাহমান : ১৪

এরপর ইবলিস এ (আত্মাবিহীন) দেহটির মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে এবং পেছন দিক দিয়ে বের হেয়ে এসে ফেরেশতাদেরকে বলে, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা একে ভয় করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব অমুখাপেক্ষী। আর এটি হচ্ছে শূন্যগর্ভ একটি বস্তু। এটি যদি আমার আয়ত্তে এসে যায়, তবে আমিই একে ধ্বংস করব। অতঃপর যখন তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করার সময় এসে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন, হে ফেরেশতাগণ! যখন আমি এর মধ্যে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলেই তার সামনে সিজদাবনত হয়ো। এরপর আল্লাহ তাঁর মধ্যে রূহ করলেন। প্রথমে রূহ যখন তাঁর মাথায় প্রবেশ করে, তখন হযরত আদম (আ) হাঁচি দেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে বলল, আপনি "আল-হামদুলিল্লাহ" বলুন। হযরত আদম (আ) আল-হামদুলিল্লাহ বললেন। এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম (আ)-এর উত্তরে বললেন, "রাহিমাকা রব্বুকা"– তোমার প্রতিপালক তোমার উপর রহম করুন। এরপর রূহ যখন তাঁর দু' চোখে গিয়ে পৌছে, তখন হযরত আদম (আ) বেহেশতের ফলসমূহ দেখতে পান। তারপর রূহ যখন তাঁর পেটে গিয়ে পৌছে, তখন তিনি হঠাৎ ক্ষুধার অনুভব করেন। সুতরাং রূহটি তাঁর পা পর্যন্ত গিয়ে পৌছার পূর্বেই তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদির প্রতি অতি দ্রুত এগিয়ে যান। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ. "মানুষকে তাড়াহুড়ার স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।" –সূরা আম্বিয়া : ৩৭

কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে– "তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস করল না, সে সিজদা করতে অস্বীকার করল।" –সূরা হিজর : ৩০–৩১

(এ ঘটনা উপরোক্ত সূত্র ব্যতীত আরো অনেক সূত্রে কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে।) এ ঘটনাটি যদিও বিভিন্ন প্রকার হাদীস থেকে সংগৃহীত। কিন্তু অধিকাংশ কথাই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রহ) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে [আদম (আ)-কে] কিছু দিন (বিনা আত্মায়) রেখে দেন। এ সময় ইবলিস তাঁর চারপাশে বার বার আসা-যাওয়া করতে থকে। তখন তাঁর অভ্যন্তরে ফাঁকা শূন্যগর্ভ দেখতে পেলে সে বুঝেছিল যে, এটি তার উপর ক্ষমতাবান হবে না।

---

১. *পৃথিবীর চল্লিশ বছরের সমান উর্ধ্বজগতের একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়। এ আলোকে আদম (আ)-এর আত্মাবিহীন দেহটি চল্লিশ বছর (উর্ধ্ব জগতের একদিনের কিছু নির্দিষ্ট সময়) পর্যন্ত পড়ে থাকে। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, "তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বছরের সমান। (সূরা হাজ্ব :৪৭) "ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিন পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। –সূরা মা'আরিজ : ৪*

ইবনে হিব্বান (রহ) তার সহীহ কিতাবে অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আদম (আ)-এর মধ্যে যখন রূহ সঞ্চার করা হলো, তখন রূহ প্রথমেই (নাসিকার ছেদ্র দিয়ে) তাঁর মাথায় গিয়ে পৌঁছে। এতে তার হাঁচি আসে।" এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, "ইয়ার হামুকাল্লাহ"। (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।)

হাফিজ আবূ বকর বাযযার (রহ) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর হাঁচি আসে। হাঁচি দিয়ে তিনি "আলহামদুলিল্লাহ" বলেন। এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রাহিমাকা রব্বুকা" (হে আদম! তোমার প্রতি তোমার রব রহম করুন।) এ হাদীসের সূত্রে কোনো ত্রুটি নেই।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা (রহ) বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেন। প্রথমত তাকে কাঁদা বানিয়ে কিছুদিন রেখে দেন। যখন সেটি খামীরে পরিণত হয়, তখন আদম (আ)-এর আকৃতি বানিয়ে সে অবস্থায় কিছু দিন রেখে দেন। এরপর সেটি পোড়ামাটির ন্যায় ঠনঠন শব্দ করার মত হয়ে গেল। ইবলীস যখন তাঁর পার্শ্ব দিয়ে যাতায়াত করতো, তখন বলতো, "তোমাকে মহান এক কাজের জন্য বানানো হয়েছে।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মধ্যে তাঁর নিজ রূহ মোবারক প্রদান করেন। রূহ প্রথমে তাঁর চোখ ও নাকে প্রবেশ করে। এতে তাঁর হাঁচি আসে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমতের বাক্য (আল-হামদু লিল্লাহ) প্রবেশ করে। এতে তাঁর হাঁচি আসে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে রহমতের বাক্য (আল-হামদু লিল্লাহ) ইত্যাদি) বলা শিখান। [আদম (আ) এ বাক্য 'আলহামদু-লিল্লাহ' বললে] আল্লাহ তা'আলা তাঁর জবাবে "ইয়ারহামুকা রাব্বুকা" (তোমার উপর তোমার প্রতিপালক রহম করুন) বললেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! এ ফেরেশতাদের জামাআতের কাছে যাও এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বল এবং দেখ, তারা কি বলে। হযরত আদম (আ) ফেরেশতাদের কাছে গেলেন এবং তাঁদেরকে সালাম দিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর সালামের উত্তরে বললেন, "ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" (আপনার উপর শান্তি, আল্লাহ'র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক)।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! এটাই হবে তোমার বংশধর সন্তানদের সালাম। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার পরওয়াদেগার! আমার সন্তান-সন্ততি আবার কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! আমার দু' হাতের একখানা হাত পছন্দ কর। আদম (আ) আরয করলেন, আমি আমার রবের ডান হাত খানা পছন্দ করলাম। আমার রবের উভয় হাতই বরকতের। তারপর আল্লাহ তাঁর হাত মোবারক বিস্তৃত করে দিলেন। এর মধ্যে অগণিত মানুষ দেখা গেল। তাদের মধ্যে কারো কারো চেহারা ছিল জ্যোতির্ময়। তাদের মধ্য হতে একজনের চেহারার উজ্জ্বলতায় হযরত আদম (আ) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইনি তোমার সন্তান দাউদ। আদম (আ) আরয করলেন। হে আমার রব! এর বয়স কত বছর নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমার বয়স থেকে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। যাতে তার বয়স একশ' বছর হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এরূপই করে দিলেন এবং এ ব্যাপারে সাক্ষীও রাখলেন। তারপর যখন হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের সময় এসে গেল, (অর্থাৎ, ওফাতের সময় এসে গেল) তখন আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মউতকে তাঁর কাছে প্রেরণ করলেন। আদম (আ) মালাকুল মউতকে বললেন, আমার বয়স থেকে এখনো চল্লিশ বছর বাকি আছে। মালাকুল মউত বললেন, আপনি আপনার বয়স থেকে সেই চল্লিশ বছর বয়স আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে দান করেন নি? হযরত আদম (আ) তা অস্বীকার করে বসেন এবং পূর্বের সে কথা তিনি ভুলে যান। এ কারণেই তাঁর সন্তানদের মধ্যে অস্বীকার করার ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। উল্লিখিত হাদীসটি আবূ বকর বাযযার, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ী (রহ)-ও বর্ণনা করেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (রহ) এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন।[১]

১. *তিরমিযী (রহ) বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। নাসায়ী (রহ) বলেছেন, হাদীসটি মুনকার, অর্থাৎ, গ্রহণযোগ্য নয়।*

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকেও এ হাদীসখানা বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পিঠের উপর তাঁর (আল্লাহর) কুদরতী হাত বুলান। ফলে আদম (আ)-এর পিঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল সন্তানরা বেরিয়ে পড়ে। আর এ সময় প্রতিটি মানুষের দু' চোখের মাঝখানে পেশানীর উপর নূর (জ্যোতি) চমকাতেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে হযরত আদম (আ)-এর সামনে উপস্থিত করেন। তখন আদম (আ) আরয করেন, হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরা হলো তোমার সমস্ত সন্তান। তারপর হযরত আদম (আ) এক ব্যক্তির জ্যোতির্ময় চেহারা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর পরিচয় জানতে আরয করেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ হলো তোমার সন্তানের মধ্য হতে এক ব্যক্তি। যার নাম হবে দাউদ। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি এর বয়স কত বছর নির্ধারণ করে রেখেছেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আপনি আমার বয়স থেকে তাঁর বয়স চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দিন। হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালে সময় হয়ে গেলে মালাকুল মউত তাঁর কাছে এসে হাজির হয়ে যান। মালাকুল মউতকে দেখে হযরত আদম (আ) বলেন, আমার বয়স তো এখানো চল্লিশ বছর বাকি আছে। মালাকুল মউত আরয করলেন, আপনি কি আপনার সে বয়স আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে দিয়ে দেন নি? হযরত আদম (আ) অস্বীকার করলেন এবং সে কথা ভুলে গেলেন। এ কারণেই তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অস্বীকার করার ও ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছি। ফলে তাঁর সন্তানগণও ভুল করে থাকে। ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

জান্নাতী, জাহান্নামী ও রোগাক্রান্ত আদম সন্তানদের বিবরণ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইবনে আবূ হাতিম (রহ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যে হাদীসের পরম্পরা রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত। সেখানে এ কথারও উল্লেখ আছে যে, তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সকল সন্তানদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত করে বললেন, হে আদম! এরা হলো তোমার সন্তান। তার মধ্যে বিভিন্ন রোগাক্রান্ত সন্তানও ছিল। যেমন– কুষ্ঠ রোগী, শ্বেতী রোগী ও অন্ধ। আদম (আ) এ সব রোগাক্রান্ত লোকদেরকে দেখে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার সন্তানদেরকে এরূপ রোগাক্রান্ত কেন করলেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরূপ করার কারণ হলো, যাতে তারা আমার (নেয়ামতের শোকর করে)। এরপর দাউদ (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা রয়েছে।

এ হাদীসখানা ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (রহ) তাঁর মুসনাদে হযরত আবূ দারদা (রা)-এর হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর কাঁধে তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) কুদরতী হাত রাখেন। ফলে মৃত্তিকার সদৃশ তাঁর সাদা বর্ণের সন্তানরা বেরিয়ে আসে। আবার তাঁর বাম কাঁদে তাঁর কুদরতী হাত রাখেন। ফলে সেখান থেকে কয়লার মত তাঁর কুৎসিত কালো সন্তানরা বেরিয়ে আসে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ডান পার্শ্বের সন্তানগুলো সম্পর্কে বললেন, এরা জান্নাতী। আমি কোনই পরওয়া করি না। এরপর বাম পার্শ্বের সন্তানগুলো সম্পর্কে বললেন, এরা জাহান্নামী। আমি কোনই পরওয়া করি না।

ইবনে আবীদ দুনিয়া (রহ) বলেন যে, হযরত হাসান (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে, তাঁর ডান দিক থেকে জান্নাতী লোকদেরকে বের করেন এবং বাম দিক থেকে জাহান্নামী লোকদেরকে বের করেন। তারপর সবাই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যার মধ্যে অন্ধ, বধির ও বিভিন্ন রোগাক্রান্ত লোকও ছিল। হযরত আদম (আ) আরয করেন, হে রব! আপনি আমার সন্তানদেরকে এক সমান করে কেন সৃষ্টি করলেন না? (এর ভেদ কী?) আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! আমার ইচ্ছা যে, আমার শোকর আদায় করা হোক। আবূ হাতিম ও ইবনে হিব্বান (রহ) তাঁদের সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেন যে,

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাতে যখন রূহ সঞ্চার করেন, তখন তাঁর হাঁচি আসে। তিনি (হাঁচি দিয়ে) "আল-হামদু লিল্লাহ" বলেন। এ প্রথম আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে হযরত আদম (আ)-এর মুখ হতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা (হামদ) বের হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার উত্তরে বললেন, "ইয়ারহামুকা রব্বুকা ইয়া আদামু", হে আদম! তোমার উপর তোমার রব রহম করুন।" তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আদম! এখন তুমি ফেরেশতাদের কাছে যাও এবং তাঁদের মজলিসে শামিল হয়ে তাঁদেরকে সালাম কর। হযরত আদম (আ) ফেরেশতাদের মজলিসে পৌঁছে তাঁদেরকে "আসসালামু আলাইকুম" বললেন। তাঁরা উত্তরে বললেন, "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ"।

এরপর আদম (আ) নিজ রবের কাছে ফিরে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, হে আদম! এটাই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের পরস্পরিক সালাম (অভিবাদন)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত মোবারক একত্র করে বললেন, হে আদম! তুমি এ দু'হাতের একখানা হাতকে পছন্দ কর। হযরত আদম (আ) আরয করলেন, আমি আমার রবের ডান হাত পছন্দ করলাম। আমার রবের উভয় হাত মুবারক ও বরকতময়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। এ কুদরতী হাতের মধ্যে আদম (আ) ও তাঁর বংশধর সন্তানদেরকে দেখা গেল। আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে রব! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিলেন, এরা হচ্ছে তোমার সন্তান। এ সময় প্রতিটি মানুষের বয়স (আয়ু) তার দু'চোখের মাঝখানে কপালের উপর লিখে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন খুব জ্যোতির্ময় এক ব্যক্তি। তাঁর বয়স লেখা হয়েছিল মাত্র চল্লিশ বছর। তখন হযরত আদম (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমার বয়স থেকে ষাট বছর তাকে দিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বললেন, ঠিক আছে, যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তুমি জান্নাতে বসবাস কর। হযরত আদম (আ) জান্নাতে বসবাস করতে থকেন। তারপর তাঁকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হলো। হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলে মালাকুল মাউত তাঁর কাছে এসে হাজির হন। হযরত আদম (আ) তাঁকে বললেন, হে মালাকুল মউত! আপনি অনেক আগে এসে গেছেন। আমার বয়স তো এক হাজার বছর লেখা হয়েছিল। মালাকুল মউত আরয করলেন, জী হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিকই আছে। কিন্তু আপনার সেই বয়স হতে ষাট বছর আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আদম (আ) তা অস্বীকার করলেন এবং তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন এ কারণে, তাঁর সন্তানগণের মধ্যে অস্বীকার করার এবং ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। আর এ দিন থেকেই (পারস্পরিক কথাবার্তা ও লেনদেনের ব্যাপারে) সাক্ষী রাখার ও লিপিবদ্ধ করে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদম (আ)-কে বললেন, যাও, ঐ ফেরেশতাদের দলের কাছে গিয়ে তাদেরকে সালাম কর। তারা যে উত্তর তোমাকে দেবে সেটা শুনবে। সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম (অভিবাদন)। তারপর হযরত আদম (আ) মজলিসে গিয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে "আসসালামু আলাইকুম" বললেন। ফেরেশতাগণ তাঁর সালামের উত্তরে "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর সালামের উত্তরে "ওয়া রাহমাতুল্লাহ" বাক্যটি বাড়িয়ে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে হযরত আদম (আ)-এর আকৃতিতে প্রবেশ করবে।

অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (রহ) এ হাদীসকে সহীহ বুখারী গ্রন্থে "আল ইস্তিয়ান" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত আদম (আ)-এর দেহের দৈর্ঘ ছিল ষাট হাত, আর প্রশস্ততা ছিল সাত হাত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন ঋণ প্রদান-এর আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সর্বপ্রথম যিনি (তাঁর নিজ কথা) অস্বীকার করেন, তিনি ছিলেন হযরত আদম (আ)।" -মুসনাদে আহমদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর কোমরের উপর হাত বুলান। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল সন্তানগণ তাঁর পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে এবং তাঁর সামনে সমবেত হয়। হযরত আদম (আ) তাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ হচ্ছে তোমার সন্তান দাউদ। পুনরায় আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তার বয়স কত বছর নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! তাঁর বয়স একটু বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, না, তা হতে পারে না। তবে তোমার বয়স হতে তাকে কিছু বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। হযরত আদম (আ)-এর বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল এক হাজার বছর। আদম (আ) তাঁর বয়স থেকে চল্লিশ বছর দাউদ (আ)-কে দান করলেন। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখলেন এবং তা লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করে রাখলেন।

হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলে, তাঁর রূহ কবজ করার জন্য ফেরেশতা (মালাকুল মউত) তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। হযরত আদম (আ) তাঁকে বললেন, এখনো আমার চল্লিশ বছর বয়স বাকি আছে। ফেরেশতা বললেন, আপনি তো সে চল্লিশ বছর বয়স আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে দিয়ে দিয়েছেন। আদম (আ) বললেন, না, আমি তো এরূপ দেই নি। তারপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর সামনে সেই সংরক্ষিত "লিখিত দলীল" এবং ফেরেশতাদের সাক্ষী পেশ করেন।

অন্য এক বর্ণনায়ও মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি অস্বীকার করেন, তিনি হলেন আদম (আ)।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর বলেন আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর কোমরের উপর (আল্লাহ) নিজ কুদরতী হাত দ্বারা স্পর্শ করেন। ফলে আদম (আ)-এর সব সন্তান তাঁর পিঠ থেকে বেরিয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে আদম (আ)-এর সামনে সম্মিলিত করেন। হযরত আদম (আ) তাদের মধ্যে এক জ্যোতির্ময় ব্যক্তিকে দেখে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! এ ব্যক্তির বয়স (আয়ু) বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, না। তবে তোমার বয়স থেকে তাকে কিছু দিয়ে দিতে পার। হযরত আদম (আ) তাঁর বয়স থেকে চল্লিশ বছর তাঁকে দিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর এ কথাটি লিখে রাখেন এবং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রাখেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সময় যখন আদম (আ)-এর রূহ কবজ করার ইচ্ছা করলেন, তখন আদম (আ) আবেদন করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার নির্ধারিত বয়স থেকে চল্লিশ বছর এখনো বাকি আছে। উত্তরে তাঁকে বলা হলো, সে বয়স তো আপনি আপনার সন্তান দাউদ (আ)-কে দিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম (আ) তা অস্বীকার করলে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব লিখিত দলীল ও ফেরেশতাদের সাক্ষী তাঁর সামনে উপস্থিত করেন। পুনরায় আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর বয়স একশত বছর পুরা করে দেন এবং হযরত আদম (আ)-এর বয়স এক হাজার বছর পূর্ণ করে দেন।

তাবরানী কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে যে, যখন লেনদেন সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম অস্বীকার যিনি করেন, তিনি হলেন আদম (আ)।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বলেন।

আদম সন্তানের অঙ্গীকার

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ) তাঁর মুয়াত্তা কিতাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিম ইবনে ইয়াসার জিহনী (রহ) বলেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ج أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوا بَلَىٰ ـ

অর্থ : (হে রাসূল! জনগণকে ঐ সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিন) যখন আপনার পালনকর্তা বনী আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের প্রতিপালক। -সূরা আ'রাফ : ১৭২

এ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? হযরত ওমর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি সে প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা আমি শুনেছি। তিনি ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পৃষ্ঠে নিজ কুদরতী ডান হাত বুলান। এতে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ থেকে তাঁর একদল সন্তান বেরিয়ে আসে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এদেরকে সৃষ্টি করা হলো বেহেশতের জন্য। এরা বেহেশতীদেরই আমল করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার আদম (আ)-এর পৃষ্ঠে হাত বুলান। এতে তার অন্যান্য সন্তানরা বেরিয়ে আসে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, এদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এরা দোযখীদের আমল করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যবানে এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তবে আমলের কি প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তিনি তাকে জান্নাতের (নেক) কাজেই মগ্ন রাখেন। সে জান্নাতীদের নেক কাজ করা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে এবং জান্নাতে চলে যাবে। আর আল্লাহ যাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তাকে জাহান্নামের (অসৎ) কাজে মগ্ন রাখেন। শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামীদের কাজ (অসৎকাজ) করা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে এবং জাহান্নামে চলে যাবে।"

উক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর সন্তানদেরকে আদম (আ)-এরই পৃষ্ঠ থেকে ছোট ছোট পিপড়ার মতো বের করে এনে তাদেরকে দু' দলে বিভক্ত করেছেন। ডান দল ও বাম দল। তারপর ডান দলকে বলেছেন এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে জান্নাতের জন্যে। (এ ঘোষণায়) আমার কোনো পরওয়া নেই। আর বাম দলকে বললেন, এদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, জাহান্নামের জন্য। এ ব্যাপারেও আমার কোনো পরওয়া নেই।

সূরা আ'রাফের একটি আয়াত, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" আদম সন্তানদের থেকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ওয়াদা নেয়াকে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কিছু আপত্তি আছে।

যদিও এ ব্যাপারে মুসনাদে আহমদেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 'নোমান' নামক জায়গায় আরাফার দিন (অর্থাৎ, জিলহজ্ব মাসের নয় তারিখে) হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠে অবস্থিত সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার নেন। অতঃপর তাঁর পৃষ্ঠ হতে তাঁর সকল সন্তানকে আল্লাহ তা'আলা বের করেন। তারা আকারে ছিল ছোট ছোট পিপীলিকার মতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে হযরত আদম (আ)-এর সম্মুখে ছাড়িয়ে দেন। তারপর তাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, "আমি কি তোমাদের রব নই? তারা সকলে বলল, হ্যাঁ অবশ্যই আমরা সাক্ষী রইলাম (আপনি আমাদের রব)।

-সূরা আ'রাফ : ১৭২

এ ওয়াদা এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরাতো এ সম্পর্কে গাফিল ছিলাম। অথবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্ব পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে অংশীবাদ করেছিল। আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কর্মকাণ্ডের জন্যে আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? -সূরা আ'রাফ ১৭২-১৭৩

অধিকাংশ আলেমের মতে, সেদিন আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-এর সন্তানদের থেকে তাওহীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। তাঁরা তাদের দলীল হিসেবে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের দিন কোনো এক জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হতে, তবে কি তুমি নিজকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে গোটা সম্পত্তি বিনিময় স্বরূপ দিতে রাজি হতে? সে (জাহান্নামী) জবাবে বলবে অবশ্যই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমার নিকট এর চেয়েও অনেক সহজ বস্তু চেয়েছিলাম। তোমরা আদমের পৃষ্ঠে থাকাকালীন আমি তোমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলাম যে, আমার সাথে তুমি কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তা

অমান্য করে তুমি আমার সাথে শরীক করেছ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ) এ হাদীসখানা শো'বার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ জাফর রাযী (রহ) বলেছেন, হযরত উবাই ইবনে ক'ব (রা) ..... وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ

"স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতেই তার সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করলেন।

এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত আদম সন্তানকে উদ্দেশ্য করেছেন। সৃষ্টি করে তাদের সম্মিলত করেন। এরপর তাদেরকে বাকশক্তি দিয়ে তাদের থেকে অঙ্গীকার নেন এবং তাদের নিজেদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী রাখেন যে, আমি কি তোমাদের রব নই? তখন জবাবে সকলে বলল, কেন নয়? (নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী রাখলাম। যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ সম্পর্কে একেবারেই গাফিল ছিলাম। তোমরা এখন জেনে রাখবে, আমি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই, আমি ছাড়া কোনো পালনকর্তা নেই, আমার সাথে কাউকে শরীক নির্ধারণ কর না। আমি তোমাদের কাছে আমার রাসূল প্রেরণ করব। সে (রাসূল) তোমাদেরকে আমার ওয়াদা সম্পর্কে সতর্ক করবে। আর তোমাদের প্রতি আমার কিতাবও নাযিল করব। তখন সবাই (একই কণ্ঠে) বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আমাদের রব, আপনিই আমাদের মা'বূদ। আপনি ছাড়া আমাদের কোনো মাবূদ নেই। সেদিন এভাবে তারা (আদম সন্তানরা) আনুগত্যের ওয়াদা করেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে উপরে উঠান। তিনি উপরে বসে তাঁর সমস্ত সন্তানদেরকে দেখতে পান। ধনী-গরিব, সুশ্রী-কুশ্রী ও বিভিন্ন ধরনের লোক এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈষম্য দেখে হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! যদি আপনি আপনার সমস্ত বান্দাদেরকে একইভাবে (অভিন্ন) সৃষ্টি করতেন! আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি চাই যে, আমার শোকর আদায় করা হোক। হযরত আদম (আ) তাদের মধ্যে নবীগণকেও দেখতে পান। যারা ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। তাঁরা নূর দ্বারা আবৃত ছিলেন। নবুওয়াত ও রিসালাতের উপর নবীগণ থেকে বিশেষভাবে দ্বিতীয়বার ওয়াদা নেয়া হয়। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا .

অর্থ : (হে নবী!) ঐ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করুন, যা আমি সমস্ত নবীর কাছ থেকেই নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও (নিয়েছি)। সবার কাছ থেকেই আমি পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছি। –সূরা আহযাব : ৭

(প্রথমবারে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল এই যে, আমিই একমাত্র তোমাদের পালনকর্তা এবং মা'বূদ। এ কারণে প্রত্যেক মানুষই স্বভাবগতভাবে জন্মগতভাবেই তাওহীদে বিশ্বাসী।) এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط

"কাজেই (হে নবী ও নবীর অনুসারীরা) একমুখী হয়ে আপনার লক্ষ্যকে এ দীনের উপর কায়েম রাখুন। আল্লাহ মানুষকে যে স্বভাবের উপর পয়দা করেছেন তারই উপর দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর তৈরি কাঠামো বদলানো যায় না।[১]" –সূরা রূম : ৩০

১. *অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার জন্য নিজের দাসরূপে সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিধারা কারো পক্ষেই বদলানো সম্ভব নয়। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর দাস। এ অবস্থা থেকে সে 'আল্লাহর দাস নয়' এমন অবস্থায় বদলে যেতে পারে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে কেউ আল্লাহ মেনে নিলেও আসলে সে 'আল্লাহ' হয়ে যেতে পারে না। মানুষ নিজের জন্য যত মা'বূদই গ্রহণ করুক না কেন, এক আল্লাহ ছাড়া মানুষ অন্য কারোরই বান্দাহ নয়। এ আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে যে, 'আল্লাহ সৃষ্টিধারায় যেন পরিবর্তন করা না হয়।' অর্থাৎ, যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত করা ঠিক নয়।*

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এ (কুরআন) আগের সাবধানবাণীর মতোই এক সতর্কবাণী।" -সূরা নাজম : ৫৬

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.

অর্থ : আমি তাদের বেশির ভাগ লোককেই ওয়াদা পালনকারী পাই নি; বরং অনেককেই ফাসিক পেয়েছি। -সূরা আ'রাফ : ১০২

বিতাড়িত ও অপমানিত ইবলীস

হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য যখন সমস্ত ফেরেশতাকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তখন সকলেই এ আদেশ পালন করেছেন। কিন্তু ইবলীস অমান্য করেছে। কারণ, হযরত আদম (আ)-এর উপর ইবলীসের হিংসা ছিল এবং শত্রুতাও ছিল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে তাড়িয়ে দেন এবং তাঁর নিজ রহমত থেকেও চিরদিনের জন্য দূরে সরিয়ে দেন। আর তাঁর মহান দরবার থেকে বহিষ্কৃত করে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান বলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন।

ইমাম আহমদ "মুসনাদে আহমদে" বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আদম সন্তানেরা সিজদার আয়াত পাঠ করে যখন সিজদা করে, তখন শয়তান আলাদা এক জায়গায় গিয়ে কাঁদতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানদেরকে সিজদার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা সিজদা করে জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেল। আর আমি সিজদার নির্দেশ অমান্য করেছি। ফলে আমি হলাম জাহান্নামী। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ)-ও বর্ণনা করেছেন।

বেহেশতে আদম (আ)-এর অবস্থানকাল

আল্লাহ তা'আলার আদেশে হযরত আদম (আ) বেহেশতে বসবাস করেন। চাই সে বেহেশত মতপার্থক্য অনুযায়ী পৃথিবীতেই হোক বা আকাশেই হোক অথবা যে কোনো স্থানেই হোক। সে বেহেশতে বসে হযরত আদম ও হাওয়া (আ) দু' জনেই অত্যন্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ও প্রশান্ত মনে নিজ ইচ্ছানুযায়ী আহারাদি করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদেরকে যে ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, সে নিষিদ্ধ ফল খাওয়াতে তাঁদের সম্মানিত পোষাক তাঁদের থেকে খুলে নেওয়া হয় এবং তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। অবতরণের ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেহেশতে অবস্থানকাল সম্পর্কে মতান্তর

বেহেশতে হযরত আদম (আ) কতকাল ছিলেন এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। এক বর্ণনা মতে তাঁর বেহেশতে বসবাসের সময় ছিল পৃথিবীর হিসেবের একদিনের কিছু অংশ। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত এক মারফু হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সে হাদীসখানা এই যে, আদম (আ) জুমআর দিনের এক শুভক্ষণে সৃষ্টি হন। আবূ হুরায়রা (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, জুমআর দিনে আদম (আ) সৃষ্টি হন, ঠিক সেদিনেই আবার বেহেশত থেকে বের হয়েছেন। সুতরাং যে দিন আদম (আ) সৃষ্টি হন, ঠিক সেদিনেই যদি আবার জান্নাত থেকে বের হন এবং সেদিন যদি হয় এই পৃথিবীর দিনের মতই, তবে প্রমানিত হয় যে, আদম (আ) একদিনের কিছু অংশ (সময়) বেহেশতে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটিও যে একেবারে সঠিক ও বিশুদ্ধ তাও বলা যায় না। যদি আদম (আ)-এর জান্নাত থেকে অপসারণ হওয়াটা তার সেই (সৃষ্টির) দিন ব্যতীত ভিন্ন কোনো দিনে হয়ে থাকে, আর যদি ছয় দিন পৃথিবীর ছয় হাজার বছরের সময়ের বরাবর হয়ে থাকে, যা ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যিহাক, ও ইবনে জারীর (রহ) থেকে বর্ণিত, সে ক্ষেত্রে হযরত আদম (আ)-এর বেহেশতে অবস্থানকাল দীর্ঘ সময়ই প্রমাণিত হয়ে থাকে। আল্লামা জারীর (রহ) বলেন, এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম (আ) জুমআর দিনের শেষ মুহূর্তে সৃষ্টি হন। আর সেখানকার এক মুহূর্ত পৃথিবীর তিরাশি বছর চার মাসের সমান। আদম (আ) সৃষ্টির পূর্বে শুধু মাটির

কায়ারূপে (মাথাহীন অবস্থায়) চল্লিশ বছর পড়ে থাকেন এবং (সৃষ্টির পরে) পৃথিবীতে আসার পূর্বে জান্নাতে তিনি তেতাল্লিশ বছর চার মাস অবস্থান করেছেন। এদিক থেকে আদম (আ)-এর জান্নাতে অবস্থানকাল ছিল দীর্ঘ সময়। আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞ।

আব্দুর রাযযাক (রহ) থেকে বর্ণিত, হযরত আতা ইবনে রিবাহ (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আদম (আ) যখন পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তাঁর পদযুগল ছিল ভূপৃষ্ঠে আর মাথা ছিল আকাশে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেহের উচ্চতা কমিয়ে ষাট হাতে আনেন। হযরত আব্বাস (রা) থেকেও এরূপ একটি বর্ণিত আছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কথা আছে। কারণ এর পূর্বে হযরত আবু হুরায়রা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে ষাট হাত উঁচু করে সৃষ্টি করেন। এরপর মানুষ (উচ্চতায়) কম হতে হতে (এ পর্যন্ত) আসছে। এ হাদীসটি সর্বসম্মতভাবে সহীহ।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমেই হযরত আদম (আ)-এর দেহের উচ্চতা ষাট হাত ছিল। এর অধিক ছিল না। আর মানুষও সেই (দেহের উচ্চতার দিক দিয়ে) ক্রমান্বয়ে ছোট হতে হতে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে।

ইবনে জারীর (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! আমার আরশের ঠিক বরাবর নিচে (পৃথিবীতে) আমার সম্মানিত ঘর রয়েছে। সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে আমার জন্য একখানা ঘর নির্মাণ কর এবং তা তাওয়াফ কর, যেভাবে আমার ফেরেশতারা এ আরশ তাওয়াফ করে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাও হযরত আদম (আ)-এর সাথে দিয়ে দেন, যিনি (ফেরেশতা) আদম (আ)-কে সেই স্থানটি দেখিয়ে দেন এবং হজ্বের নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। ফেরেশতা আদম (আ)-কে বললেন, এখানে তাওয়াফসহ যে কোনো কাজ নেক আমল কাজ করবেন, সবআমল আপনাকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দিবে।

পৃথিবীতে আদম (আ)-এর সর্বপ্রথম খাদ্য ও বস্ত্র

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে আগমন করে সর্বপ্রথম যে খাদ্য খেয়েছিলেন, তা ছিল গম। হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত আদম (আ)-এর কাছে গমের সাতটি বীজ নিয়ে উপস্থিত হন। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, এগুলো সেই গাছের ফল, যা খেতে আপনাকে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তা খেয়েছিলেন। আদম (আ) বললেন, এখন আমি এগুলো কি করব? জিবরাঈল (আ) বললেন, এ বীজগুলো ভূপৃষ্টে রোপণ করে দিবেন। হযরত আদম (আ) বীজগুলো রোপণ করলেন। আর সাতটি বীজের ওজন ছিল পৃথিবীর এক লক্ষ বীজের ওজনের চেয়েও বেশি। তারপর সে বীজগুলো থেকে ফসল উৎপন্ন হলো। হযরত আদম (আ) বহু পরিশ্রম ও কষ্ট করে সে ফসলগুলো কেটে দানাগুলো পিষিয়ে আটা বানিয়ে খামির তৈরি করে তা দিয়ে রুটি তৈরি করেন এবং এক কামরায় গিয়ে তা আহার করেন। এ প্রসঙ্গই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى .

অর্থ : সে আপনাদের দুজনকে বেহেশত থেকে বের করে দেয়। আর আপনারা বিপদে পড়ে যান।

–সূরা ত্বাহা : ১১৭

পৃথিবীতে আগমনের পর হযরত আদম (আ)-এর প্রথম পোষাক ছিল ভেড়ার পশমের তৈরি পোষাক। প্রথমত তাঁরা দু'জনে (স্বামী-স্ত্রী) পশমগুলো কেটে সূতা তৈরি করেন। তারপর হযরত আদম (আ) তা দিয়ে নিজের জন্য একটি জুব্বা ও হাওয়া (আ)-এর জন্য একটি কামীস ও ওড়না তৈরি করেন। জান্নাতে তাঁদের কোনো সন্তান-সন্ততি হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে আলেমদের মত-পার্থক্য রয়েছে।

এক বর্ণনা মতে জানা যায়– জান্নাতে বসে তাঁদের কোনো সন্তান-সন্ততি হয় নি। পৃথিবীতে আগমনের পর হয়েছে। আর এক দুর্বল বর্ণনা মতে কাবীল এবং তার বোনের জন্ম জান্নাতে বসেই হয়েছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আলেমগণ বর্ণনা করেছেন, হযরত হাওয়া (আ)-এর প্রতিটি গর্ভ থেকেই অর্থাৎ একই বারে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করত। আর প্রতিটি জোড়ার সাথে পরবর্তী জোড়ার সাথে পরস্পরে বিবাহ দেয়ার বিধান ছিল। অর্থাৎ, এ নিয়ম ছিল যে, এক গর্ভ হতে একত্রে যে পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম নিবে, পরবর্তী গর্ভের পুত্রের সাথে প্রথম কন্যার এবং দ্বিতীয় গর্ভের কন্যার সাথে প্রথম গর্ভের পুত্রের বিবাহ হবে। একই গর্ভের দু' ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল।

কাবীল ও হাবীলের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ۘ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ۚ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

অর্থ : তাদেরকে আদমের দু'ছেলের কাহিনীটি সঠিকভাবে শুনিয়ে দিন। যখন দু'জনে কুরবানী করল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপর জনেরটি কবুল হলো না। সে বলল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো মুত্তাকিদেরই কুরবানী কবুল করেন। যদি তুমি আমাকে মারার জন্য আমার উপর হাত তোল, (তবুও) আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত তুলব না।[১] আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। আমি চাই, আমার ও তোমার গুনাহ তুমিই নিয়ে নাও এবং দোযখবাসী হয়েই থাক। যালিমদের যুলুমের এটাই উপযুক্ত বদলা। অবশেষে তার নাফস তার ভাইয়ের হত্যাকে তার জন্য আসান করে দিলো এবং সে তাকে মেরে ফেলল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ একটা কাক পাঠিয়ে দিলেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে লুকাবে তা দেখিয়ে দিলো। এটা দেখে সে বলল, আমার জন্য আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারতাম। এরপর সে অনুতাপ করতে লাগল।[২] –সূরা মায়িদা : ২৭–৩১

এ ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে কাছীর গ্রন্থে সূরা মায়িদার উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু পূর্ববর্তী আলেমগণ এ ব্যাপারে যা বলেছেন, তার সারাংশ আলোচনা করব (ইনশাআল্লাহ)।

১. *এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি নিহত হওয়ার জন্য তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেব; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে মারার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমাকে মারার চেষ্টা করব না।*

২. *এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবীদেরকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেজন্য তাদেরকে মন্দ বলা। উভয় ঘটনার মধ্যে মিল সুস্পষ্ট। ইহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আ)-এর এক পুত্রও হিংসার দরুণই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।*

সুদ্দী (রহ) বর্ণনা করেন– ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা (রা) বললেন যে, হযরত আদম (আ) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সাথে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। এ কারণে হাবীল কাবীলের আপন বোনকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। কাবীল হাবীলের চেয়ে বয়সে বড় ছিল। কাবীলের বোনটি অত্যন্ত সুন্দরী হওয়ায় কাবীল তার আপন সুন্দরী বোনকে নিজেই বিবাহ করতে ইচ্ছা করল। কিন্তু হযরত আদম (আ) শরীয়াত মোতাবেক কাবীলকে বললেন যে, তোমার আপন বোনকে হাবীলের সাথে বিবাহ হতে দাও। এতে হস্তক্ষেপ কর না। কিন্তু কাবীল পিতার কথাকে অমান্য করল। তখন হযরত আদম (আ) উভয় পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আদেশ দিয়ে তিনি মক্কার হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। রওয়ানা দেয়ার পূর্বে তিনি তাঁর সন্তানদের দেখাশুনার জন্য আকাশকে বললেন, আকাশ অস্বীকার করল। তারপর তিনি পৃথিবী এবং পাহাড়ের কাছে এ দায়িত্ব দিতে চাইলেন। কিন্তু তারাও অস্বীকার করল। অবশেষে বড় ভাই কাবীল এ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

হযরত আদম (আ) হজ্বের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পরে তারা দু'ভাই আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করল। হাবীল একটি উত্তম ও দোষমুক্ত বকরী কুরবানী করেন। কারণ, তিনি অনেকগুলো বকরীর মালিক ছিলেন। আর কাবীল যেহেতু কৃষি কাজ করতো, তাই সে তার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ কুরবানী করে। এরপর আগুন এসে হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে গেল এবং কাবীলের কুরবানী রেখে গেল। অর্থাৎ, হাবীলের কুরবানী কবুল হলো না। এতে কাবীল ক্রোধান্বিত হয়ে হাবীলকে বলল, যদি তুমি আমার বোনকে বিবাহ করা থেকে বিরত না থাক, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করবই। তখন হাবীল বলল, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম! নিহত হাবীল কাবীলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তিনি এত লাজুক ছিলেন যে, তাঁর লাজুকতা তাঁকে নিজ ভাইয়ের প্রতি হত্যা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ানো থেকে বিরত রাখে।

আবূ জাফর (রহ) বলেছেন, হযরত আদম (আ) উভয় পুত্রের কুরবানী (কবুল হওয়া না হওয়া) সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। কাবীল হযরত আদম (আ)-কে বলল, আপনি হাবীলের জন্য দোয়া করেছিলেন, এজন্য তার কুরবানী কবুল হয়েছে। আর আমার জন্য আপনি দোয়া করেন নি। তারপর কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিল।

তারপর কিছুদিন পরে কোনো এক রাতে হাবীলের বকরীর পাল নিয়ে মাঠ থেকে আসতে দেরি হচ্ছিলো। এ কারণে আদম (আ) কাবীলকে হাবীলের তালাশে পাঠিয়ে দিলেন। কাবীল গিয়ে হাবীলকে সুযোগমত পেয়ে গেল। এ সময় কাবীল হাবীলকে বলল, তোমার কুরবানী কবুল হলো, আমার কুরবানী কেন কবুল হলো না? হাবীল বললো, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করে থাকেন। এ কথা শুনে কাবীল রাগন্বিত হয়ে তার কাছে থাকা লোহা দিয়ে হাবীলকে আঘাত করে তাকে হত্যা করে। অন্য এক বর্ণনা মতে কাবীল পাথরের একটি টুকরা ঘুমন্ত অবস্থায় হাবীলের মাথার উপর মেরে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে তাঁকে হত্যা করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে– কাবীল হাবীলের গলা টিপে ধরে হিংস্র পশুর মতো তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল। ফলে তিনি নিহত হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

কাবীল যখন হাবীলকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল, তখন সে (হাবীল) তার ভাইকে হুমকির জবাবে যা বলেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন—

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ج اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : যদি তুমি আমাকে মারার জন্য আমার উপর হাত তোল, (তবুও) আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত তুলব না।[১] আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি। –সূরা মায়িদা : ২৮

হাবীলের এ কথাটিই, তাঁর উত্তম চরিত্র, উদারতা ও আল্লাহ-ভীতির সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, হাবীলের প্রতি কাবীল অন্যায়ভাবে আক্রমণ করতে চাইলেও, তার প্রতিশোধে নিজ ভাইয়ের প্রতি কোনোরূপ আক্রমণ বা অসদাচরণ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

এ কারণেই বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "দু' মুসলমান নিজ তরবারী উঁচিয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হলে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দু' জনেই জাহান্নামে যাবে।" সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়াতো ঠিক আছে। কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ (নিহত) ব্যক্তিও তার সাথীয় (হত্যাকারী) লোকটিকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হাবীলের উক্তিটি উল্লেখ করেন, "আমি চাই তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোযখবাসী হও এবং এটা যালিমদের কর্মফল।" –সূরা মায়িদা : ২৯

অর্থাৎ, আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না। যদিও আমি তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সাহসী। কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, (এভাবে) তুমি আমার পাপ ও তোমার পাপ নিজে বহন করবে। মুজাহিদ, সুদ্দী, ইবনে জারীর (রহ) প্রমুখ এর তাফসীরে বলেন, আমার পাপ অর্থাৎ, আমাকে হত্যা করার পাপ এবং তোমার পাপ অর্থাৎ, তোমার পূর্ববর্তী পাপসমূহ।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এটা নয় যে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাকারীর উপর শুধু তাকে হত্যা করার কারণেই বর্তিবে। যা কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। কারণ, ইবনে জারীর (রহ) এ মতের বিপরীত মতকে সর্বসম্মত মত বলে বর্ণনা করেছেন।

কিছু অনভিজ্ঞ লোক একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির উপর কোনো পাপ বাকি রাখে না। তবে এ হাদীসের কোনো ভিত্তি নেই এবং হাদীস গ্রন্থের কোথাও সহীহ, হাসান বা যায়ীফ সূত্রে এর উল্লেখ নেই।

তবে কিয়ামতের দিন কিছু লোকের ব্যাপারে এমন ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে, নিহত ব্যক্তি, হত্যাকারী থেকে এ অপরাধের বদলা দাবি করবে। কিন্তু হত্যাকারী নিজের সকল নেক দিয়েও এই বিনিময় পূরণ করতে পারবে না। তারপর নিহত ব্যক্তির পাপসমূহ সেই হত্যাকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমন সকল অন্যায় ও অবিচারের ব্যাপারে সহীহ হাদীসে এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আর অন্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে মহা অন্যায় হচ্ছে হত্যা। এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা আমি আমার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্যই। মুসনাদে আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী গ্রন্থে হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে শত্রু কর্তৃক সৃষ্ট গোলমালের সময় হযরত আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর একটি কথা বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "অতিশিঘ্রই একটি ফিতনা (গোলমাল) সৃষ্টি হবে। এ গোলমালের সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চেয়ে এবং চলন্ত ব্যক্তি দ্রুত গমনকারী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে।" এ কথা শুনে আদ (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি আমার ঘরে কেউ প্রবেশ করে এবং আমাকে মারার উদ্দেশ্যে আমার দিকে (অন্যায়ভাবে) এগিয়ে আসে, তখন আমার করণীয় কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, (তোমার তখন কর্তব্য হবে) আদম (আ)-এর সন্তান (হাবীল)-এর মতো হয়ে যাওয়া। অন্য এক বর্ণনায় হুযায়ফা ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "আদম (আ)-এর দু'পুত্রের উত্তম পুত্রের মতো হয়ে যাও।"

১. *এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি নিহত হওয়ার জন্য তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেব; বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে মারার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমাকে মারার চেষ্টা করব না।*

উক্ত হাদীসে নিহত হাবীল সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। কাবীলের ব্যাপারে মুসনাদে আহমদের, ইবনে মাসউদ (রা) থেকে একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "অন্যায়ভাবে যে লোকটিই নিহত হয়, তার এ হত্যার ভার আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তায়। করণ, সেই লোকটিই (কাবীল) সর্বপ্রথম হত্যা কাণ্ড চালু করে।"

দামেশকের উত্তরে অবস্থিত "কাসিউন" নামক পাহাড়ে একটি গুহা আছে। সেটিকে "মাগরাতুদ দাম" বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, এখানে বসেই কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করেছিল। এ তথ্যটি আহলে কিতাবগণ থেকে পাওয়া গেছে। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। হাফিজ ইবনে আসাকির (রহ) তাঁর গ্রন্থে আহমদ ইবনে কাছীর (রহ)-এর জীবনী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একজন সৎ লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা) ও হযরত হাবীলকে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি (আহমদ ইবনে কাছীর) হাবীলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ জায়গাই বসেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল কিনা? হাবীল কসম করে জায়গার কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি (হাবীল) আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, এই স্থানটিকে দোয়া কবুলের স্থান হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাটি সত্যায়ন করেন। এবং বলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা) প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এ স্থানটি যিয়ারত করেন। -আহমদ

কিন্তু কথা হলো, এটি নিছক একটি স্বপ্ন। আহমদ ইবনে কাছীর (রহ) হতে ঘটনাটি সত্য হলেও, এটা স্বপ্নই। এর উপর ভিত্তি করে শরীআতের বিধান কখনই কার্যকর হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ط قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ج فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ۝

অর্থ : তারপর আল্লাহ একটা কাক পাঠিয়ে দিলেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগল এবং তার ভাইয়ের লাশ কীভাবে লুকাবে তা দেখিয়ে দিল। এটা দেখে সে বলল, আমার জন্য আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারতাম। এরপর সে অনুতাপ করতে লাগল।[১] -সূরা মায়িদা : ৩১

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন যে, কাবীল নিজ ভাইকে হত্যা করে এক বছর পর্যন্ত হাবীলকে নিজ পিঠে বহন করে রাখে। আবার কেউ বলেন, একশত বছর পর্যন্ত বহন করে রাখে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা দুটি কাক প্রেরণ করেন। সুদ্দী (রহ) সনদসহ কয়েকজন সাহাবী (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, সে কাক দুটি (সম্পর্কে) ভাই ছিল। কাক দুটি মারামারি করে একটি অন্যটিকে হত্যা করে। তারপর জীবিত কাকটি মাটি খুঁড়ে মৃত কাকটিকে দাফন করে ঢেকে রাখে। কাবীল এ দৃশ্য দেখে বলে উঠল, হায় আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যে, আমি আমার ভাইয়ের লাশটিকে ঢেকে রাখব। তারপর কাবীল কাকটির অনুসরণে ভাইকে দাফন করে রাখে।

ইতিহাস বিশারদ ও জীবনী রচয়িতাগণ বলেন যে, হযরত আদম (আ) নিজ পুত্র হাবীলের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকাতুর হয়ে পড়েন এবং তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যা ইবনে জারীর ইবনে হোমায়েদ হতে বর্ণনা করেন। তা হলো এই—

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا * فَوَجْهُ الْاَرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيْحٌ.

تَغَيَّرَ كُلُّ ذِىْ لَوْنٍ وَطَعْمٍ * وَقَلَّ بَشَاشَةُ الْوَجْهِ الْمَلِيْحِ.

---

১. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীরা নবী কারীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেজন্য তাদেরকে মন্দ বলা। উভয় ঘটনার মধ্যে মিল সুস্পষ্ট। ইহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আ)-এর এক পুত্রও হিংসার দরুণই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

"জনপদ আর জনগণ সব ওলট পালট হয়ে গেছে, ভূপৃষ্ঠের চেহারাও ধূলি মলিন হয়ে গেছে। সবকিছুরই বর্ণ ও স্বাদ একেবারে বদলে গেছে, চেহারারও লাবণ্যতা আগের চেয়ে কমে গেছে।"

এর জবাবে আদম (আ)-কে বলা হলো—

آبَا هَابِيْلَ قَدْ قُتِلَا جَمِيْعًا * وَصَارَ الْحَيُّ كَالْمَيِّتِ الْبَشِيْعِ.

وَجَاءَ بِشَرَّةٍ قَدْ كَانَ مِنْهَا * عَلَى خَوْفٍ تَجَاءَ بِهَا بَعِيْعُ.

অর্থ : হাবীলের পিতা ওগো! শুনে রেখ নিশ্চয়, মারা গেছে তারা দু'জনেই একই সাথে। তাদের মধ্যে যে লোকটিও শুধু প্রাণে বেঁচে আছে, সে লোকটিও মৃতের মতো হয়ে গেছে। তার দ্বারা এমনই পাপ সংঘটিত হয়ে গেল, যার ফলে নিজেও সে আতঙ্কতে ভুগছে।

উক্ত কবিতাগুলো হযরত আদম (আ) থেকেই যে রচিত তা সুস্পষ্ট নয়। এরূপ হতে পারে যে, হযরত আদম (আ) তাঁর শোক-দুঃখ ও বেদনা নিজ ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর কোনো ব্যক্তি তাঁর কথাগুলোকে এভাবে কবিতায় রূপ দেন। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

মুজাহিদ (রহ) বলেন, কাবীল তার কৃতকর্মের শাস্তি সাথে সাথেই পেয়ে যায়। তার পায়ের গোছা তার উরুর সাথে মিশে গেল এবং তার মুখমণ্ডল সর্বদাই সূর্যমুখী হয়ে থাকত। নিজ ভাইয়ের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও অসদাচরণ করা এবং পাপের কারণে (কাবীল) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "এরকম কোনো পাপ নেই যে, আল্লাহ তার শাস্তি পৃথিবীতে অতিদ্রুত (নগদ) দিয়ে দেবেন এবং পরকালেও পাপীর জন্য পাপ জমা করে রাখবেন। কিন্তু বিদ্রোহ (অন্যায়ভাবে বিরোধিতা) ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতীত।"

অর্থাৎ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা এমনই এক মহা ন্যায়, যার শাস্তি পরকালে তো আছেই, পৃথিবীতেও পাপী এর শাস্তি ভোগ করে থাকে।

হযরত আদম (আ)-এর সন্তানদের স্তার লাভ

মূল লেখক বলেছেন, এ (কিতাব লেখার) সময় আহলে কিতাবদের হাতে যে তাওরাত কিতাব ছিল, তাতে আমি দেখেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কাবীলকে (পৃথিবীতে কিছু কাল থাকার) সুযোগ দিয়েছিলেন। কাবীল আদন (এডেন) নগরীর[১] পূর্ব দিকে অবস্থিত "নূদ" নামক স্থানে কিছুদিন বসবাস করেছিল। সেখানকার লোকদের কাছে "নূদ" অঞ্চলটির নাম ছিল "কিন্নীন"। সেখানে বসে কাবীলের একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়েছিল। যার নাম ছিল "খানূখ"। এ খানূকের ঔরসে উনদুর, উনদূরের ঔরসে মাহাওয়ীল এবং মাহাওয়ীলের ঔরসে মুতাওয়াসীল জন্ম গ্রহণ করে। তারপর মুতাওয়াসীল দু' মহিলাকে বিবাহ করেন। এক জনার নাম হলো আদা, আর অন্য জনার নাম হলো সালা। আদার গর্ভ থেকে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তার নাম ছিল ইবলি। এ ইবলি-ই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি খোলা আকাশের তলে তাবু লটকিয়ে নির্মিত ছাদের ছায়ায় বসবাস করেন এবং সম্পদ সঞ্চার করেন। এ আদা নামক মহিলা গর্ভ থেকে আর একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যার নামই ছিল নাওবেল। এ (নাওবেল)-ও প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সারিন্দা ও তবলা (বাদ্যযন্ত্র) তৈরি করেন। মুতাওয়াসীলের দ্বিতীয় স্ত্রী 'সালা'-এর গর্ভ থেকে একটি পুত্র জন্ম হয়। যার নাম ছিল 'তুবলাকীন"। এ (তুবলাকীন)-ও সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি 'নো'মা'।

১. আদন (এডেন) নগরী ইয়ামান ও হাযরী মাওতের সীমান্তে অবস্থিত। এ নগরীটি এখনো সুপ্রসিদ্ধ।

তাওরাত কিতাবের মধ্যে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, হযরত আদম (আ) একবার তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন। এতে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। মা, এ সন্তানটির নাম শীস রেখে বলেন, এ সন্তানটির নাম শীস এজন্য রেখেছি যে, আমার প্রথম পুত্র হাবীলের পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলা এটি আমাকে দান করেছেন। এ শীসের ঔরসেই আনুশ এর জন্ম হয়।

আলেমগণ বলেছেন যে, তখন হযরত শীসের জন্ম হয়, তখন হযরত আদম (আ)-এর বয়স ছিল একশ ত্রিশ বছর। এরপর তিনি আটশ বছর বেঁচেছিলেন। হযরত শীসের ঔরসে যেদিন আনুশ জন্ম হয়, সেদিন হযরত শীসের বয়স ছিল একশ পয়ষট্টি বছর। হযরত শীস এরপর আটশ সাত বছর জীবিত ছিলেন। আনুশ ছাড়া তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম ছিল কীনান। অতঃপরে তিনি (আনুশ) আটশ পনের বছর বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকজন পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম হয়। কীনানের বয়স যখন সত্তর বছর, তখন তাঁর ঔরসে সৎ পুত্র মাহ্লাইল এর জন্ম হয়। এরপর কীনান আটশ চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় তাঁর ঔরসে অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়। মাহ্লাইল-এর বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যার নাম ছিল ইয়ারাদ। মাহ্লাইল এরপর আটশ ত্রিশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর আরো অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করে। তারপর ইয়ারদের বয়স যখন একশত বাষট্টি বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যার নাম ছিল জুনুখ। এরপরে য়ারদ আটশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং এ সময়ের মধ্যে তাঁর ঔরসে অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়। তারপর পুত্র জুনুখের বয়স যখন পঁয়ষট্টি বছর হয়, তখন তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তার নাম ছিল মুতাওয়াশালাহ। এরপর জুনুখ আটশ বছর জীবিত থাকেন এবং এ সময়ে তাঁর থেকে অনেক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়। মুতাওয়াশালাহের বয়স একশ সাতাশি বছর হলে তাঁর ঔরসে একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁর নাম ছিল লামাক। মুতাওয়াশালাহ এরপর সাতশ বিরাশি বছর জীবিত ছিলেন। এ সময় তাঁর ঔরসে অনেক সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়। লামক-এর বয়স যখন একশ বিরাশি বছর, তখন তাঁর ঔরসে নূহ (আ)-এর জন্ম হয়। হযরত নূহ (আ)-এর জন্মের পর পিতা লামক আরো পাঁচশ পঁচানব্বই বছর জীবিত ছিলেন এবং এ সময়ের মধ্যে তাঁর ঔরসে আরো অনেক সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর হযরত নূহ (আ)-এর বয়স পাঁচশ বছর হলে তাঁর ঔরসে সাম, হাম ও ইয়াফিসের জন্ম হয়। এ বর্ণনা আহলে কিতাবদের কাছে সংরক্ষিত তাওরাত কিতাবে বিদ্যমান ছিল। তবে এ বর্ণনাগুলো মূল আসমানী কিতাবে ছিল কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। যেমন, আলেমগণের অনেকেই উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন, আহলে কিতাবদের সমালোচনাও করেছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কয়েকজন আহলে কিতাবের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ)-এর ঔরসে হাওয়া (আ)-এর বিশ গর্ভে চল্লিশ জন সন্তান-সন্ততি প্রসব করেন। ইবনে ইসহাক এ কথাটি উল্লেখ করে তাঁদের নামও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত। অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত হাওয়া (আ) একশ' বিশ বার গর্ভ হন। প্রত্যেক গর্ভেই একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সর্বপ্রথম কাবীল ও তার বোন কালীমা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আর সর্বশেষে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আব্দুল গায়স ও তার বোন উম্মুল মুগায়স। তারপর থেকেই পৃথিবীতে মানুষের বিস্তার ঘটে ও সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তাঁরা বসবাস করতে শুরু করে। এভাবেই মানুষের বংশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

যেরূপ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ج

অর্থ : হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং এ দু'জন থেকে বহু পুরুষ ও নারী দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। –সূরা নিসা : ১

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, হযরত আদম (আ) জীবিত থাকাকালীন তাঁর নিজ সন্তানগণ এবং সে সন্তানগণের সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা চার লক্ষ নিজ চোখে দেখে গিয়েছেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ج فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ۞ فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ج فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۞

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে একটি জান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার জুড়ি বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন পুরুষ স্ত্রীকে ঢেকে নিল, তখন হালকাভাবে গর্ভধারণ করল, যা নিয়ে সে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন সে ভারী হয়ে গেল তখন (স্বামী ও স্ত্রী) দুজনেই রব আল্লাহর নিকট দোআ করল, যদি আমাদেরকে একটি সুসন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞতাশীল বান্দাহ হব। কিন্তু যখন আল্লাহ তাদেরকে নিখুঁত বাচ্চা দিলেন তখন এ দানের মধ্যে অন্যদেরকে শরীক করতে লাগল। লোকেরা যেসব শিরকী কথাবার্তা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উপরে রয়েছেন। -সূরা আ'রাফ : ১৮৯-১৯০

এক হযরত আদম (আ) থেকেই গোটা মানবজাতির বিস্তার লাভ। যেমন, আল্লাহ কুরআনে বলেন—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۞

অর্থ : আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তাকে এক হেফাযত করা জায়গায় বীর্য হিসেবে রেখেছি। -সূরা মুমিনূন : ১২-১৩

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ)-কে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে পরে মানুষ সৃষ্টির কথা বলা বলেছেন। এখানে ব্যক্তিসত্তা থেকে জাতিগতসত্তার দিকে প্রবর্তিত। অর্থাৎ নির্দিষ্টকরণের পরে সার্বজনীন করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ.

অর্থ : আমি (তোমাদের) কাছের আসমানকে[২] বড় বড় বাতি দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছি এবং এ সমস্ত দিয়ে শয়তানকে মেরে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছি। -সূরা মুলক : ৫

এ আয়াতেও শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের হাতিয়ার দ্বারা সেই প্রদীপকে বুঝানো হয় নি, যা আকাশকে সুন্দররূপ দান করে, বরং এর দ্বারা প্রদীপের শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে।

---

১. *অর্থাৎ, সন্তান দান করার মালিক তো আল্লাহ তা'আলা। যদি আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীলোকের গর্ভে বানর, সাপ বা অন্য কোনো আজব জন্তু সৃষ্টি করে দেন কিংবা শিশুকে পেটের মধ্যেই অন্ধ, বধির, খঞ্জ ও পঙ্গু করে দেন কিংবা তার দৈহিক, মানসিক ও প্রবৃত্তিগত শক্তির মধ্যে কোনো ত্রুটি রেখে দেন- তবে কারো মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার এই গঠনকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। এক আল্লাহ তা'আলার উপাসকদের মতো ঠিক একই রূপে দেব-দেবী পূজারীরাও এ সত্য জানে। এ কারণেই গর্ভকালে সব আশা-ভরসা একমাত্র আল্লাহর উপরই করা হয়- তিনিই সুস্থ-সঠিক শিশুসন্তান সৃষ্টি করবেন; কিন্তু যখন আশা পূরণ হয় এবং চাঁদের মতো সুন্দর শিশু জাগো জোটে, তখন শুকরিয়া প্রকাশের জন্য কোনো দেবী, কোনো অবতার, কোনো ওলী ও কোনো হযরত-এর নামেই মান্নত ও শিরনী দেওয়া হয় এবং শিশুর এরূপ নামকরণ করা হয়, যার দ্বারা সে যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দয়ার দান।*

২. *অর্থাৎ, ঐ আসমান, যার তারকা ও গ্রহ-উপগ্রহ আমরা দূরবীন ছাড়া খালি চোখে দেখে থাকি।*

এ ব্যাপারে একখানা হাদীসও বর্ণিত আছে। হযরত সামুরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাওয়া (আ)-এর কোনো সন্তানই বেঁচে থাকত না। একবার তাঁর একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, ইবলীস তাঁর কাছে গিয়ে বলল, এ সন্তানটির নাম যদি আব্দুল হারিস রাখ, তবে তোমার সন্তানটি বেঁচে থাকবে। (হারিস যেহেতু শয়তানের নাম।) হাওয়া (আ) এ কথা অনুযায়ী সন্তানটির নাম রাখলেন আব্দুল হারিস (হারিসের বান্দা)। সন্তানটি বেঁচে থাকল। এটা ছিল শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্টতা।

তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনে আবু হাতিম ও ইবনে মারদুয়াহ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরিকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এরা সকলেই আব্দুস সামাদ ইবনে আব্দুল ওয়ারেসের সূত্র দিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন, এর সনদ (সূত্র) বিশুদ্ধ। তবে বুখারী ও মুসলিম (রহ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। তিরমিযী (রহ) বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। এ হদীসটি শুধু ওমর ইবনে ইবরাহীমের থেকেই আমি জানতে পেরেছি। কয়েকজন হাদীস বিশারদ এ হাদীসটি আব্দুস সামাদ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদ (সূত্র) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছান নি। অর্থাৎ হাদীসটি মারফূ নয়। আর এ হাদীসটি সাহাবাগণ পর্যন্ত মাওকূফ হিসেবে বর্ণিত হওয়ার কারণেই ত্রুটিমুক্ত নয়। আর এটি অতীব সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটি ইসরাঈলগণ থেকে প্রাপ্ত। এরূপে ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও মাওকূফ হিসেবে হাদীসটি বর্ণিত আছে। আর এ কথাটিও সুস্পষ্ট যে, এ হাদীসটি কাব আহবার এবং তাঁর সাথীদের থেকে বর্ণিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত।

এ কথাটি অবশ্যই প্রমাণিত যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাসান বসরী (রহ)। অথচ (বর্ণনাকারী) তিনি নিজেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন। যদি তাঁর থেকে এ হাদীসখানা বর্ণিতই হতো, তবে তিনি কোনো সময়ই এর বিরোধিতা করতেন না। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের থেকে মানব বংশ বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে। সুতরাং উল্লিখিত কথাটি (যে হাওয়া (আ)-এর কোনো সন্তান জীবিত থাকত না) হাদীস থেকে কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে? সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হলো যে, এ হাদীসটির সনদ (সূত্র) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছানো ভুল। বরং তাফসীরের কিতাবেও এ সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

এ কথাটিও গবেষণার যোগ্য যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) অত্যন্ত আল্লাহভীরু (পরহেযগার) ছিলেন। কারণ, আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করে তাতে নিজ রূহ প্রদান করেন। তারপর ফেরেশতাদের দ্বারা তাঁকে সিজদা করান এবং সকল বস্তুর নাম তাঁকে শিক্ষা দেয়। তাঁকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আদম (আ) এতকিছু নেয়ামত লাভ করার পরেও কিভাবে তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করতে পারেন? এছাড়া সবকিছুই তো আল্লাহ তা'আলার জানা আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা এত বড় সম্মান ও মর্যাদায় তাঁকে কিভাবে আসীন করলেন?

ইবনে হিব্বান (রহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে, আবু যর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আবু যর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! নবীদের সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি পুনরায় আরয করলাম, হে আল্লাহ রাসূল ﷺ! এদের মধ্যে রাসূল কতজন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনশ তের জন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাঁদের মধ্যে প্রথম কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আদম (আ)। তারপর আরয করলাম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তিনি কি প্রেরিতত নবী? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তা'আলা নিজ হাত দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ রূহ প্রদান করেছেন। তারপর তাঁকে নিজেই সুঠাম, সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব বিশিষ্ট) করেছেন।

সুতরাং একজন মর্যাদাপূর্ণ ও বিশিষ্ট নবী ও রাসূল থেকে এরূপ শিরক কাজ কিভাবে সংঘটিত হতে পারে?

তাবরানী (রহ) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে ফেরেশতাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর কথা জানিয়ে দিচ্ছি, তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)।

আর (এ কথাও জানিয়ে দিচ্ছি যে,) নবীদের মধ্যে সেরা হলেন আদম (আ)। দিবসসমূহের মধ্যে সেরা দিবস হচ্ছে জুমুআর দিন। মাসসমূহের মধ্যে সেরা মাস হচ্ছে রমযান মাস। রাতসমূহের মধ্যে সেরা রাত হচ্ছে কদরের রাত। আর নারীদের মধ্যে সেরা নারী হচ্ছেন মারইয়াম বিনতে ইমরান। কিন্তু সনদ (সূত্র) এর দিক দিয়ে এ হাদীসটি দুর্বল।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ মুহাদ্দিস এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবূ হারমূযকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

কা'ব আহবার বলেছেন, একমাত্র আদম (আ) ব্যতীত জান্নাতে আর কারো দাড়ি থাকবে না। তাঁর দাড়ি থাকবে কালো। আর জান্নাতে কারো উপনাম থাকবে না। একমাত্র আদম (আ)-এর উপনাম থাকবে। তাঁর উপনাম ছিলো পৃথিবীতে আবুল বাশার। আর জান্নাতে হবে আবূ মুহাম্মাদ। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জান্নাতে সকল জান্নাতীগণকেই স্ব স্ব নাম ধরে ডাকা হবে। একমাত্র হযরত আদম (আ)-কে তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মাদ বলে ডাকা হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের 'মে'রাজ' সংক্রান্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, (মে'রাজের রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আদম (আ)-এর কাছ থেকে গমন করেন। হযরত আদম (আ) প্রথম আকাশে ছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পেলেন যে, হযরত আদম (আ)-এর ডান দিকে একদল লোক এবং বাম দিকেও অনুরূপ একদল লোক। হযরত আদম (আ) যখন ডান দিকে দৃষ্টি করেন, তখন হেসে দেন। আর বাম দিকে যখন দৃষ্টি করেন, তখন কেঁদে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এর কারণ কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি হচ্ছেন হযরত আদম (আ)। আর তাঁর ডান ও বামে যারা আছেন তারা হচ্ছে তাঁর সকল সন্তান-সন্ততির (বংশধরদের) আত্মা। ডান দিকের লোকগুলো হচ্ছে বেহেশতী। তাই তিনি সেদিকে তাকিয়ে হেসে দেন। আর বাম দিকের লোকগুলো দোযখী। তাই তিনি সেদিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলেন।

হাস্সান ইবনে হাসান (রহ) বলেছে, হযরত আদম (আ)-এর বুদ্ধি জ্ঞান, তাঁর সমস্ত সন্তান-সন্ততির বুদ্ধিজ্ঞানের সমান ছিল।

মে'রাজের রাতে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে গমন করার রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপে বর্ণনা করেন যে, আমি (মে'রাজের রাতে) ইউসুফ (আ)-এর কাছে গমন করি। আমি তাঁকে দেখতে পেলাম যে, "তাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হয়েছে"। আলেমগণ এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এ অর্ধেক সৌন্দর্য, হযরত আদম (আ)-এর সৌন্দর্যের অর্ধেক ছিল। আর এ কথাটি যুক্তিসংগত। কারণ হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর আকৃতিও গঠন করেছেন এবং তাতে নিজ রূহ প্রদান করেছেন। সুতরাং তিনি সর্বসুন্দর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এবং ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশত তৈরি করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করেন, হে রাব্বুল আলামীন! আপনি এ বেহেশত আমাদেরকে দিয়ে দিন। বনী আদম (আ)-এর জন্য তো আপনি পৃথিবীই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যেখানে বসে তারা ইচ্ছামতো আহার ও পানাহার করবে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের শপথ! না, (তা কখনই হবে না)। আমি এটি তৈরি করেছি আদম (আ)-এর নেক সন্তানদের জন্য। যে আদম (আ)-কে আমি আমার নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা পালন করে থাকে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের কয়েকটি সূত্রে একখানা হাদীস এভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। আলেমগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের সব কথার বিশ্লেষণ করার সুযোগ এখানে নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকাল ও নিজ পুত্র হযরত শীস (আ)-কে ওসীয়ত

শীস শব্দের অর্থ আল্লাহর দান। নিহত হাবীলের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা এ পুত্র সন্তানটি প্রদান করেছেন বলে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এ সন্তানটির নাম শীস (আল্লাহর দান) রেখেছিলেন। শীস (আ) বড় মর্যাদাসম্পন্ন নবী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তাঁর আপন পুত্র শীস (আ)-কে কাছে ডেকে নসীহত ও ওসীয়ত করেন। তিনি পুত্র শীস (আ)-কে দিন ও রাতের সময়গুলোর পরিচয় করিয়ে দেন এবং এ সময়ের ইবাদতসমূহের শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে যে এক মহা তুফান সংঘটিত হবে, তিনি সে সংবাদও তাঁকে জানিয়ে দেন।

কথিত আছে যে, বর্তমান সমস্ত মানুষের বংশধারা শীস (আ) পর্যন্ত পৌছেই শেষ হয়ে যায়। কারণ, শীস (আ) ছাড়া আদম (আ) এর অন্য কোনো সন্তানই বেঁচে থাকেন নি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। কোনো এক জুমআর দিনে হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকাল হয়। এ সময় ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বেহেশত থেকে সুগন্ধি ও কাফন নিয়ে আদম (আ)-এর কাছে আগমন করেন। তারপর হযরত শীস (আ) সেই বেহেশতী কাফন দ্বারা আদম (আ)-কে কাফন পরান। ইসহাক (রহ) বলেছেন, আদম (আ)-এর ইন্তেকালে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সাত দিন ও সাত রাত পর্যন্ত লেগে থাকে।

ইবনে যামরা সাদী (রহ) বলেছেন, আমি মদীনায় এক বৃযুর্গ লোককে ওয়াজ করতে দেখে লোকদের কাছে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম। লোকেরা জবাবে বলল যে, ইনি উবাই ইবনে কা'ব। তখন তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) বললেন, "আদম (আ)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, হে আমার সন্তানেরা! আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছা হয়। সন্তানরা ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। পথে তাঁদের সাথে ফেরেশতাদের দেখা হয়। যাদের সাথে জান্নাতী কাফন, সুগন্ধি ও কবর খননের হাতিয়ার কোদাল, বেলচা, টুকরি ইত্যাদি ছিল। ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, হে আদম সন্তানগণ! তোমরা কোথায়, কিসের সন্ধানে যাচ্ছ? তাঁরা বললেন, আমাদের পিতা রোগাক্রান্ত, তিনি জান্নাতের ফল খেতে চাচ্ছেন। ফেরেশতাগণ বললেন, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের পিতার পৃথিবীতে থাকার সময় ফুরিয়ে গেছে। তখন তাঁরা সকলে ফিরে গেলেন। হযরত আদম (আ) ফেরেশতাগণকে দেখে চিনতে পারলেন এবং তিনি বুঝতেও পারলেন যে, তাঁরা কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন। হাওয়া (আ) হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে তাঁর সাথে মিশে দাঁড়ালেন, যাতে ফেরেশতাগণ তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তখন হযরত আদম (আ) হাওয়া (আ)-কে বললেন, তুমি আমার বাহু থেকে সরে দাঁড়াও। আমি তোমার পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছি। সুতরাং তুমি আমার ও আমার রবের ফেরেশতাদের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ো না। তারপর ফেরেশতাগণ তাঁর রূহ কবয করেন। এরপর ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করিয়ে কাফন পরান ও সুগন্ধি লাগান। অতঃপর কবর খনন করেন। তারপর জানাযার নামায পড়িয়ে তাঁকে সেই কবরে দাফন করেন। অতঃপর তাঁরা (ফেরেশতাগণ) বললেন, হে আদম সন্তানরা! মৃতব্যক্তিকে কবরস্থ করার এটাই হলো নিয়ম। এ হাদীসের সনদ (সূত্র) সঠিক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফেরেশতাগণ হযরত আদম (আ)-এর জানাযার নামাযে চার তাকবীর বলেছিলেন। আর হযরত আবু বকর (রা) হযরত ফাতিমা (রা)-এর জানাযার নামাযে চার তাকবীর এবং হযরত সোহায়ব (রা) হযরত ওমর (রা)-এর জানাযার নামাযে চার তাকবীর।[১]

হযরত আদম (আ)-এর কবর কোন্ স্থানে হয়েছিল, সে ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত এই যে, আদম (আ)-কে সে পাহাড়ের কাছে দাফন করা হয়েছে, তাঁকে ভারতবর্ষে যে পাহাড়ে নামিয়ে

১. *আবু বকর (রা), ফাতেমা (রা) ও ওমর (রা)-এর জানাযার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ আগাম বলেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।*

দেয়া হয়েছিল। আর এক বর্ণনা মতে, মক্কার আবূ কুবায়স পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর যুগে যখন মহা প্লাবনের সময় ঘনিয়ে আসল, তখন হযরত নূহ (আ) হযরত হাওয়া ও হযরত আদম (আ)-এর পবিত্র মৃত দেহ উঠিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করিয়েছিলেন। ইবনে জারীর (রা) থেকে এ কথাটি বর্ণিত আছে।

ইবনে আসাকির (রহ) কয়েকজন আহলে কিতাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আদম (আ)-এর মাথা হলো মসজিদে ইবরাহীমের কাছে এবং পদদ্বয় হলো বায়তুল মুকাদ্দাস প্রান্তরে। হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের এক বছর পরেই হাওয়া (আ) ইন্তেকাল করেন। হযরত হাওয়া (আ)-এর বয়স সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, লাওহে মাহফূজে হযরত আদম (আ)-এর বয়স এক হাজার বছর লেখা হয়েছিল। আর হযরত আদম (আ) নয়শ ত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন বলে তাওরাতে যে উল্লেখ রয়েছে, এ বর্ণনার দ্বারা উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনায় কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। কারণ, তারা তাওরাত কিতাবের মধ্যে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। তাদের এই পরিবর্তন এবং আমাদের কাছে যে সত্য সংরক্ষিত রয়েছে, তার মাঝে বিরোধ হওয়ার কারণে তাদের এ বক্তব্য উপহাস্য ও বাতিলযোগ্য।

তবে ইয়াহুদীদের বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করাও সম্ভব। কারণ, তাওরাতের বর্ণনা সঠিক রয়েছে বলে যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে এ সময় দ্বারা সে সময়কেই বুঝানো হয়েছে, যে সময়কাল তিনি জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের পর অবগত করেছেন। আর সে সময়কাল সূর্যের সময় হিসেবে নয়শ ত্রিশ বছর। আর চন্দ্রের হিসেবে নয়শ সাতান্ন বছর। এর মাঝে তেতত্রিশ বছর সময়কাল তিনি বেহেশতে বসবাস করেছিলেন, তা যোগ করলে হয় এক হাজার বছর। এ হিসেবে হাদীসের এক হাজার বছর এবং তাওরাতে বর্ণিত নয়শত ত্রিশ বছর উভয় বর্ণনাই সঠিক হয়ে যায়।

আতা খুরাসানী (রহ) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালে গোটা সৃষ্টি জগত সাত দিবস ক্রন্দনের মধ্যেই কাটিয়ে দেন। ইবনে আসাকির (রহ) থেকেও এ কথাটি বর্ণিত আছে।

হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকালের পরে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র হযরত শীস (আ)। তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। এ সম্পর্কিত হাদীস পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শীস (আ)-এর উপর পঞ্চান্নখানা সহীফা নাযিল করেছেন।

হযরত শীস (আ)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলে, তিনি তাঁর পুত্র আনুশকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। আনুশের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র কীনান। এরপর কীনানের পুত্র মাহলাইল স্থলাভিষিক্ত হন। ইরানী লোকেরা মনে করেন যে, (মাহলাইল) প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথমে বন-জঙ্গলসমূহ মূলোৎপাটন করে সেখানে শহর ও দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি "বাবেল" ও "সুস" শহর আবাদ করেন। তিনি ইবলীস ও তার সঙ্গীদেরকে মারধর করে বসতি এলাকা থেকে অনাবাদ ও নির্জন এলাকায় বিতাড়িত করেন। আর তিনি একদল দুষ্ট জ্বিনকে হত্যা করেন। তাঁর বাদশাহীর সময়কাল ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে, তিনি তাঁর পুত্র খানুখকে তাঁর পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ওসীয়ত করেন। অনেকের অভিমত অনুযায়ী এই ইনি-ই হচ্ছেন হযরত ইদ্রীস (আ)।

হযরত ইদরীস (আ)-এর ঘটনা

হযরত ইদরীস (আ) সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ز اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۞ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

অর্থ : এ কিতাবে ইদরীসের কথাও বর্ণনা করুন। তিনি একজন সত্যপন্থী নবী ছিলেন এবং তাকে আমি উচ্চস্থানে উঠিয়েছিলাম। –সূরা মারইয়াম : ৫৬-৫৭

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইদরীস (আ)-কে নবী ও সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর ইনিই হচ্ছেন উল্লিখিত 'খানুখ'। কোন কোন আলেমের বর্ণনা মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশ তালিকা এখানে গিয়ে মিলে যায়। হযরত আদম (আ) ও শীস (আ)-এর পরে তাঁকেই সর্বপ্রথম নবুওয়াত প্রদান করা হয়। আল্লামা ইসহাক (রহ) বর্ণনা করেন যে, পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লেখা শুরু করেন, তিনিই হলেন হযরত ইদরীস (আ)। তিনি হযরত আদম (আ)-এর সময়কার তিনশত আট বছর পেয়েছিলেন। কতিপয় লোকের বর্ণনা মতে, মুআবিয়া ইবনে হাকাম মুলামী এর হাদীসে যে নবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিই ছিলেন এ নবী। হাদীসখানা এই যে, একবার হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গণনার রেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। (যা হলো, বালুর উপর কতকগুলো বিশেষ কিছু রেখা টেনে বিভিন্ন বিষয় গণনা করা হতো।) রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, একজন পয়গম্বর ছিলেন। যিনি এ গণনার রেখা (বালুর উপর) টানতেন। সুতরাং যে ব্যক্তির রেখা সেই (নবীর) রেখার মতো হবে সেটা সঠিক।

অধিকাংশ মুফাসসিরের বক্তব্য এই যে, সর্বপ্রথম যিনি ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ধর্মের প্রচার কাজ আরম্ভ করেন, তিনিই হলেন এ নবী। এ কারণেই তাঁর প্রতি অনেক মিথ্যা ও মনগড়া কথা আরোপ করা হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল অন্যান্য নবী, ওলী ও বিশিষ্ট আলেম ও পণ্ডিতগণের প্রতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا "এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।" –সূরা মারইয়াম : ৫৭

এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে মে'রাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মে'রাজের রাতে চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস (আ)-এর কাছ থেকে গমন করেছিলেন।

হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত কা'ব (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, উল্লিখিত এ আয়াত এর ব্যাখ্যা কি? হযরত কা'ব (রা) উত্তরে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইদরীস (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন যে, "আমি তোমাকে প্রত্যহ সমস্ত আদম সন্তানের আমলের সমপরিমাণ ছাওয়াব দান করব।" সম্ভবত এর দ্বারা তাঁর সময়ের সকল আদম সন্তানদেরকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইদরীস (আ) চাইলেন যে, তাঁর আমলে আরো বৃদ্ধি করা হোক। তারপর যখন তাঁর বন্ধু ফিরিশতা তাঁর কাছে আগমন করেন, তখন তিনি তাঁর কাছে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে এরূপ ওহী প্রেরণ করেছেন। আমি মালাকুল মওতের সাথে কথা বলতে আগ্রহী। (তাঁর কাছে আমি জিজ্ঞেস করব যে, আমার আয়ুকাল আর কত বছর আছে?) আগত ফেরেশতা তাঁকে তার ডানায় উঠায়ে চতুর্থ আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর সাথে মালাকুল মউতের সাক্ষাৎ হলো। ফেরেশতা মালাকুল মউতের সাথে হযরত ইদরীস (আ)-এর সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, ইদ্রীস (আ) কোথায়? ফেরেশতা বললেন, তিনি আমার পৃষ্ঠের উপরে আছেন। মালাকুল মউত বললেন, বিস্ময়কর ব্যাপার! আমাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ দিয়ে চতুর্থ আকাশে প্রেরণ করা হয়েছে যে, ইদ্রীসের রূহ চতুর্থ আকাশে বসে কবয করব? তারপর মালাকুল মউত সেখানে

বসেই তাঁর রূহ কবয করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী "আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম"-এর ব্যাখ্যা এটাই।

ইবনে আবু হাতিম (রহ) এ আয়াতের তাফসীরে এ হাদীসটি আলোচনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় তিনি এতটুকু যুক্ত করেছেন যে, হযরত ইদরীস (আ) তাঁর বন্ধু ফেরেশতাকে বলেছিলেন যে, মালাকুল মউতের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যে, আমার আয়ু আর কতদিন বাকি আছে? ফেরেশতা মালাকুল মউতের কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করলেন। এ সময় ইদ্রীস (আ)-ও ফিরিশতার সাথে ছিলেন। মালাকুল মউত বললেন, আমি না দেখে তা বলতে পারব না। তারপর মালাকুল মউত হযরত ইদ্রীস (আ)-কে দেখে ফেরেশতাকে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক ব্যক্তির হায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, যার হায়াত (আয়ু) এক পলক ব্যতীত আর বাকী নেই। তারপর ফেরেশতারা তাঁর ডানার নিচে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। অথচ তাঁর সঙ্গীয় ফেরেশতা কিছুই অনুভব করেন নি। এ হাদীসটি ইসরাঈলীদের থেকে সংগৃহীত। এর কিছু কিছু বর্ণনাকারী মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) এ আয়াত (وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا)-এর ব্যাখ্যা মুজাহিদ (রহ) ইবনে আবু নাজীহ (রহ)-এর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে বসে তাঁর ইন্তেকাল হয় নি। যেমন তুলে নেওয়া হয়েছিল হযরত ঈসা (আ)-কে। যদি এর অর্থ এই হয় যে, এখন পর্যন্ত তাঁর ইন্তেকাল হয় নি তা হলে এ কথার মধ্যে কিছু সংশয় থেকে যায়। কারণ, প্রথম বর্ণনার সাথে মতপার্থক্য হয়ে যায়। আর যদি এর অর্থ এরূপ করা হয় যে, পৃথিবী থেকে তাঁকে আকাশে জীবিত অবস্থায় তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে বসে তাঁর রূহ কবয করা হয়েছে, তবে প্রথম বর্ণনা যা হযরত কা'ব আহবার হতে বর্ণিত আছে, এর সাথে এ কথার কোনই মম পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আওফী (রহ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ষষ্ঠ আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং সেখানে বসেই তাঁর ওফাত হয়। হযরত যিহাক (রহ) এরও এই অভিমত। কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ)-এর হাদীসে আছে যে, "তিনি চতুর্থ আকাশে আছেন",এটিই অধিক বিশুদ্ধ। মুজাহিদ (রহ) এবং অনেক আলেমেরও এ অভিমত। হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এ আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তাঁকে জান্নাতে তুলে নেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, তাঁকে তার পিতা ইয়ারদ ইবনে মাহলাইলের বেঁচে থাকা অবস্থায়ই তুলে নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আলেমের মতে তিনি হযরত নূহ (আ)-এর আগের লোক নন। বরং তিনি বনী ইসরাঈলের আমলের লোক। ইমাম বুখারী (রহ) ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইলিয়াস (আ)-ই হচ্ছেন হযরত ইদ্রীস (আ)। এ কথার স্বপক্ষে তিনি যুহরী (রহ)-এর সে হাদীসখানা পেশ করেন, যা মে'রাজের হাদীসে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, (মে'রাজের রাতে) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইদরীস (আ)-এর কাছ থেকে গমন করেছিলেন, তখন হযরত ইদ্রীস (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন "নেককার ভাই ও নেককার নবীকে স্বাগতম"। অতএব, যদি ইদরীস (আ) হযরত নূহ (আ)-এর আগের হতেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশ তাঁর সাথে গিয়ে মিলত এবং তিনি তাঁকে সন্তান বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু তাদের এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ, কখনো বর্ণনাকারীর স্মরণে শক্তি হ্রাস পেয়ে যেতে পারে। এ কারণে অবিকল হাদীস স্মরণে না-ও থাকতে পারে। বা যদি এ বর্ণনা সঠিকই হয়ে থাকে, তবে হযরত ইদরীস (আ) তাঁর বিনয় ও নম্র স্বভাবের কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে "ভাই" বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পিতৃত্বের পরিচয় দেয়াটাকে পছন্দ করেন নি। আর অন্য দু'জন পয়গম্বর হযরত আদম (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদের কথা ভিন্ন। কেননা, হযরত আদম (আ) তো সকল মানুষের পিতা। তিনি হলেন, "আবুল বাশার" (মানব জাতির পিতা)। আর হযরত ইবরাহীম (আ), তিনি হলেন আল্লাহর বন্ধু, খলীলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তাঁরা দু'জন হলেন বড় এবং মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর। সুতরাং তাঁদের সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না।

হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা

বংশ পরিচয়

হযরত নূহ (আ)-এর বংশ তালিকা হল–নূহ ইবনে লামাক ইবনে মুতাওয়াশ শালিখ ইবনে খানুখ। খানুখ হলেন হযরত ইদরীস (আ) ইবনে ইয়ারদ ইবনে মাহলাইল ইবনে কীনান ইবনে আনুশ ইবনে শীস ইবনে আদম (আবুল বাশার) আলাইহিমুস সাল্লাম। ইবনে জারীর প্রমুখদের বর্ণনা মতে, হযরত নূহ (আ)-এর জন্ম হয় হযরত আদম (আ)-এর ওফাতের একশ ছাব্বিশ বছর পরে। আহলে কিতাবদের মতে, হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকাল পর থেকে হযরত নূহ (আ)-এর জন্মের মধ্যে সময়ের দূরত্ব ছিল একশ ছিচল্লিশ বছর। ইবনে হিব্বান (রহ)-এর বর্ণনা মতে, হযরত আদম (আ)-এর ইন্তেকাল ও হযরত নূহ (আ)-এর জন্মের মধ্যে দশ যুগের ব্যবধান ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি একখানা হাদীসও পেশ করেন। যায়েদ ইবনে সালাম (রা)-থেকে বর্ণিত, আবু উমামা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আদম (আ) কি নবী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ (তিনি নবী ছিলেন এবং) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলারও তাঁর সৌভাগ্য হয়েছে। পুনরায় লোকটি আরয করল, আচ্ছা, হযরত আদম (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর মধ্যে কত সময় ব্যবধান ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দশ যুগের ব্যবধান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, তাদের মাঝখানে ব্যবধান ছিল দশ যুগের। –বুখারী

তাঁরা সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে 'করন' (যুগ) দ্বারা যদি একশ বছর বুঝায়, যেটা ভাষাবিদ ও অধিকাংশ আলেমের কাছে গ্রহযোগ্য, তবে অবশ্যই এ দু'জন নবীর মাঝখানে ব্যবধান ছিল এক হাজার বছর। 'তাঁরা ইসলামের উপর ছিলেন'। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ বর্ণনা অনুযায়ী এটা হওয়া যরুরী নয় যে, এ দশ যুগের লোকেরা সকলে ইসলামের অনুসারী-ই ছিল। কারণ, এ দু' নবীর সময়ের মাঝখানে কিছু লোক এমন ছিল যে, তারা ইসলামের অনুসারী ছিল না। কুরআন মাজীদের বাণী অনুযায়ী বুঝা যায়, হযরত নূহ (আ)-এর আবির্ভাবের সময় অনেক মুশরিকও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত উমামা (রা)-এর হাদীস শুধু দশ যুগের মধ্যে সীমিত বলে প্রমাণ বহন করে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) "তারা ইসলামের উপর ছিলেন" এ কথাটি বাড়িয়ে বলেছেন। তবে ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা, সে সব আহলে কিতাব ও ঐতিহাসিকদের ধারাকে বাতিল করে দিয়েছে, তাদের ধারণা যে, কাবীল এবং তার বংশধরগণ অগ্নিপূজক ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, 'করন' (যুগ) দ্বারা যদি মানবগোষ্ঠীকে বুঝানো হয়ে থাকে, যেমন– কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ .

অর্থ : (লক্ষ্য করে দেখুন) নূহের পর আমি কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছি। –সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ .

অর্থ : এদের পর আমি অপর এক যুগের কওমকে উঠালাম। –সূরা মুমিনূন : ৩১

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ .

অর্থ : অথচ এদের আগে আমি এমন কত কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি। –সূরা মারইয়াম : ৭৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যুগসমূহের মধ্যে আমার যুগই সর্বোত্তম।" যদি অর্থ এরূপ-ই হয়ে থাকে, তবে দশ যুগ দ্বারা কয়েক হাজার বছর বুঝা যাবে। আর এ অনুযায়ী এ দু' নবীর মধ্যে কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান হয়ে

যায়। কারণ, এ সময়-কালে মানুষ অনেক বছর বয়স পেত। যেমন, হযরত আদম (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে কালে প্রায় সকল মানুষ হাজার হাজার বছর আয়ু পেত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

নূহ (আ)-এর আবির্ভাব

পৃথিবীতে যখন মূর্তি ও শয়তানের পূজা-উপাসনা আরম্ভ হয়ে গেল, মানুষ যখন বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে বান্দার মঙ্গলের জন্য হযরত নূহ (আ)-কে "রাসূল" হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। বিশ্বের সকল মানুষের কাছে ইনিই সর্বপ্রথম রাসূল। যেমন কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরাও তাঁকে প্রথম রাসূল বলে সম্বোধন করবে। তাঁর পূর্বে হযরত আদম (আ), শীস (আ) ও ইদ্রীস (আ) তাঁরা পয়গম্বর ও নবী ছিলেন।

ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখের বর্ণনা অনুসারে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে 'বনু রাসিব' বলা হতো।

হযরত নূহ (আ)-এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি সময় তাঁর বয়স কত ছিল, সে ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, এ সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। অন্য এক বর্ণনা মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল, তিনশ পঞ্চাশ বছর। কারো বর্ণনা মতে, তখন তাঁর বয়স ছিল, চারশ আশি বছর। এ তৃতীয় অভিমতটি ইবনে জারীর (রা) বর্ণনা করেন এবং এটি ইবনে আব্বাস (রা)-এরও অভিমত বলে তিনি বলেন।

হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে কুরআনের বাণী

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অনেক ঘটনা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে, তাদের উপর শাস্তির কথা, তাদেরকে প্লাবন দ্বারা ধ্বংসের কথা এবং নৌকা নির্মাণ ও তাতে আরোহণের কাহিনী ইত্যাদি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সূরা আ'রাফ, হূদ, আম্বিয়া, মু'মিনূন, শু'আরা, আনকাবূত, সাফফাত ও সূরা ক্বামারে এ সব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ۝

অর্থ : আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠালাম।[১] তিনি বললেন, হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি। কওমের সরদাররা জবাব দিল, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ। নূহ বললেন, হে আমার কওম! আমি কোনো গোমরাহীতে পড়ি নি; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। তোমরা কি এ কারণে অবাক হয়েছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ

১. আজকের যুগে 'ইরাক' নামে পরিচিত এলাকায়ই হযরত নূহ (আ)-এর জাতির বাসস্থান ছিল।

এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে এবং তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে যাও। হয়তো তোমাদের উপর রহমত (নাযিল) করা হবে। কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অবশ্যই তারা অন্ধ লোক ছিল। -সূরা আ'রাফ : ৫৯-৬৪

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۝ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰۗىِٕفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

অর্থ : তাদেরকে নূহের কাহিনী শুনিয়ে দিন। ঐ সময়কার কথা, যখন তিনি তার কওমকে বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে আমার থাকা ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদেরকে সচেতন করা তোমাদের নিকট অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে (জেনে রাখ) একমাত্র আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করি। তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সাথে নিয়ে একসাথে ফায়সালা করে নাও এবং তোমরা যে পরিকল্পনাই করেছ তা ভালো করে ভেবে দেখ, যাতে কোনো দিক দিয়ে তা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিরুদ্ধে কাজে পরিণত কর এবং আমাকে মোটেই কোনো অবকাশ দিও না। তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (এতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে?) আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো মজুরি চাই নি। আমার মজুরি তো আল্লাহর কাছেই আছে। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, (কেউ আমাকে মানুক, আর না-ই মানুক) আমি নিজে যেন মুসলিম হয়ে থাকি। তারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করল। এর ফলে আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানালাম। আর যারা আমার আয়াতকে মানতে অস্বীকার করেছিল, তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল (তবু যারা মেনে নিল না) তাদের কী দশা হয়েছে। -সূরা ইউনুস : ৭১-৭৩

সূরা হুদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۡ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍۢ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ۭ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔـلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ

وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۞ وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ ۞ وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۫ وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۞ قَالَ سَاٰوِيْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۞ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۞ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ؕ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞

অর্থ : (যখন এমন অবস্থা ছিল তখনই) আমি নূহকে তার কাওমের নিকট পাঠালাম। (তিনি বললেন) "আমি তোমাদেরকে সাফ সাফ সাবধান করে দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করো না। আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে।" (এ কথার জবাবে) তার কওমের সরদারদের মধ্যে যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল, আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের কাওমের মধ্যে এমন কোনো কিছুই পাচ্ছি না, যেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ যে, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম থেকে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর খাস রহমত দিয়ে আমাকে ধন্য করে থাকেন, কিন্তু তা তোমাদেরকে দেখতে দেওয়া না হয়ে থাকে (তাহলে আমার কী করার আছে?)। তোমরা মানতে না চাইলে আমি কি জোর করে তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি? হে আমার কওম! আমি তো এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো মাল চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহরই দায়িত্বে আছে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারি না। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছে হাজির হবে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা জাহেল কাওম। হে আমার কাওম! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কে আমাকে বাঁচাতে আসবে? এতটুকু কথাও কি তোমাদের বুঝে আসে না? আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী ইলম রাখি। আমি এ দাবিও করি না যে, আমি ফেরেশতা। আর আমি এ কথাও বলতে পারি না যে, তোমাদের চোখ যাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে দেখে, আল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গলই রাখেননি। তাদের মনের অবস্থা আল্লাহই ভালো জানেন। আমি যদি এমন কথা বলি, তাহলে অবশ্যই যালিম হব। অবশেষে তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং অনেক বেশি ঝগড়া করে ফেলেছ। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ধমক দিচ্ছ তা নিয়ে এস। (নূহ) জবাবে বললেন, তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান। তোমাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমরা বাধা দেবে। আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে পথহারা করার ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে যদি আমি তোমাদের কোনো মঙ্গল করতেও চাই তবুও আমার কল্যাণ-কামনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না।[১] তিনিই তোমাদের রব। তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (হে নবী!) এরা কি বলে যে, এ লোকটি সবকিছু নিজেই রচনা করে নিয়েছে? তাদেরকে বলুন, আমি যদি নিজেই এ সব রচনা করে থাকি, তাহলে এ অপরাধের দায়িত্ব আমার উপরই থাকবে। আর তোমরা যে অপরাধ করছ এর জিম্মাদারি থেকে আমি মুক্ত। নূহের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে যে, আপনার কাওমের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা যা কিছু করেছে এর জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। (হে নূহ!) আমার ওহী মোতাবেক আমার চোখের সামনে একটা নৌকা তৈরি করুন। যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে। নূহ নৌকা তৈরি করছিলেন। তাঁর কাওমের সরদারদের মধ্যে যারাই এ দিক দিয়ে যাতায়াত করছিল তারাই তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। নূহ বললেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ঠাট্টা কর, তাহলে আমরাও তোমাদের প্রতি তেমনি বিদ্রূপ করছি যেমন তোমরা করছ। শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, কার উপর ঐ আযাব আসবে, যা তাদেরকে অপদস্ত করবে এবং কার উপর ঐ বিপদ এসে পড়বে যা স্থায়ী হয়ে থাকবে।[২] তারপর যখন আমার আদেশ এল এবং ঐ চুলা ফেটে টগবগ করে উঠল,[৩] তখন আমি বললাম, প্রত্যেক

---

১. *অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হঠকারিতা, কুস্বভাব এবং ভালো ও সততার প্রতি অবহেলা দেখে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন যে, তোমাদেরকে তিনি সঠিক পথ পাওয়ার সৌভাগ্য ও সুযোগ দেবেন না এবং যে সব ভুল পথে তোমরা যেতে চাচ্ছ সে সব পথেই তোমাদেরকে যেতে দেবেন; তবে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমার কোনো চেষ্টাই কাজে লাগবে না।*

২. *এ এক আজব ব্যাপার– এ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক অবস্থা দেখে কীভাবে ধোঁকা খায়। নূহ (আ) যখন নদী থেকে বহু দূরে শুকনা জায়গায় নৌকা বানাচ্ছিলেন তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল এবং তারা ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, বড় মিঞার পাগলামি এবার এত দূর পৌঁছেছে যে, ...* *[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

জাতের এক এক জোড়া প্রাণী নৌকায় তুলে নিন এবং আপনার পরিবারকেও (নিন)। অবশ্য তারা ছাড়া, যাদের সম্পর্কে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।[৪] যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (নৌকায় উঠিয়ে নিন)। অবশ্য খুব কম লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছে। নূহ বললেন, এর মধ্যে উঠে পড়। আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং এক একটি ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আসছিল। নূহের ছেলে আলাদা জায়গায় ছিল। নূহ তার ছেলেকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে উঠে এস, কাফিরদের সাথে থেকো না। সে জবাবে বলল, এখনি আমি এক পাহাড়ে চড়ে যাব, যা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে। নূহ বললেন, আল্লাহ কারো উপর রহম করলে আলাদা কথা। তা না হলে আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচানোর মতো কোনো জিনিস নেই। এর মধ্যে এক ঢেউ এসে দু'জনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল এবং সে ডুবন্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। হুকুম হলো, হে যমীন! তোমার সকল পানি গিলে ফেল। হে আসমান! থেমে যাও। সুতরাং পানি মাটিতে বসে গেল এবং ফয়সালা হয়ে গেল। নৌকা জুদি[৫] পাহাড়ে এসে ভিড়ল এবং বলা হলো, যালিমদের কওম দূর হয়ে গেল। নূহ তাঁর রবকে ডেকে বললেন, হে আমার রব! আমার ছেলে আমার পরিবারেরই একজন এবং তোমার ওয়াদা সত্য। আর তুমি সকল বিচারকের চেয়ে বড় বিচারক। জবাবে বলা হলো, হে নূহ! সে আপনার পরিবারের মধ্যে শামিল নয়। সে তো এক বদ কাজের নমুনা।[৬] তাই আপনি যার আসল কথা জানেন না সে বিষয়ে আমার কাছে দরখাস্ত করবেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি জাহেলদের মধ্যে শামিল হবেন না। নূহ সাথে সাথেই আরয করলেন, হে আমার রব! যে বিষয়ে আমার ইলম নেই তা তোমার কাছে চাওয়া থেকে তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই।[৭] যদি তুমি আমাকে মাফ না কর এবং আমার উপর দয়া না কর তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। হুকুম হলো, হে নূহ! (নৌকা থেকে) নেমে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ও যে সব লোক আপনার সাথে রয়েছে তাদের উপর শান্তি ও বরকত রইল। আর কতক লোক এমনও রয়েছে, যাদের আমি কিছুদিন জীবিকা দান করব। এরপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছবে। (হে নবী!) এ সবই গায়েবী খবর, যা আমি আপনার নিকট ওহী করে পাঠাচ্ছি। এর আগে এ সব কথা আপনিও জানতেন না, আপনার কওমও জানত না। সুতরাং আপনি সবর করুন, নিশ্চয়ই শেষ ফলাফল মুত্তাকীদের পক্ষেই হবে।[৮] –সূরা হুদ : ২৫–৪৯

..... তিনি এখন শুকনো জায়গায়ই জাহাজ চালাবেন! তখন কেউ স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি যে, কয়েক দিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে। কিন্তু যিনি জানতেন, কাল এখানে জাহাজের কী দরকার হবে, তিনি তাদের ঠাট্টা ও হাসি-তামাশা দেখে তাদের বোকামী, বে-খবরি ও মূর্খতায় নিশ্চিন্তই হেসেছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এ লোকেরা কতই না বোকা! শমন তাদের মাথার উপর এসে হাজির। আমি আগেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি যে, তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তাদেরকে বাঁচানোর জন্য তদবিরও আমি করেছি; তবুও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এবং উল্টো আমাকেই পাগল মনে করছে।

৩. এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাকেই সঠিক বলে মনে করি, যা কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়– তুফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লি থেকে হয়; চুল্লির তলা থেকে পানির ফোয়ারা ফুটে পড়ে, সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, অন্যদিকে জমিন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝরনা ফুটে বের হয়।

৪. অর্থাৎ, তোমার বাড়ির যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফির এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না।

৫. জুদী' পর্বত কুর্দিস্তানের ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে এবং আজো তা এই জুদী নামেই পরিচিত।

৬. এটা হচ্ছে সেই রকম, যেমন কোনো লোকের শরীরের অংশবিশেষ পচে যাওয়ার কারণে ডাক্তার সে অংশটিকে কেটে ফেলতে চাইলে রোগী বলল, এটা তো আমার শরীরেরই একটি অংশ, এটাকে কেটে ফেলছেন কেন? উত্তরে ডাক্তার বললেন, এটা আর তোমার শরীরের অংশ নয়, এটা পচে গেছে। সুতরাং এক সৎ পিতাকে তার অযোগ্য পুত্র সম্পর্কে যখন বলা হয়েছে, 'এটা এমন আমল, যা নষ্ট হয়ে গেছে তখন তার অর্থ হচ্ছে– তুমি একে লালন-পালন করতে যে পরিশ্রম করেছ তা সফল হয় নি, এর ফল নষ্ট হয়ে গেছে।

৭. অর্থাৎ, এ রকম দোয়া করা থেকে, যা সঠিক হওয়া সম্পর্কে আমার ধারণা নেই।

৮. অর্থাৎ, যেভাবে নূহ (আ) ও তাঁর সাথীদের অবশেষে বিজয় হয়েছিল, সেভাবে তোমার ও তোমার সাথীদেরও বিজয় হবে। সুতরাং এখন যে বিপদ ও কষ্ট তোমাদের উপর হচ্ছে, তার জন্য মন খারাপ করো না। সাহস ও সবরের সাথে নিজের কাজ করে যাও।

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞

অর্থ : আমি নূহকেও এ নিয়ামতই দিয়েছিলাম। যখন নূহ এসবের আগে আমাকে ডাকলেন, তখন আমি তাঁর দো'আ কবুল করলাম। তারপর তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে মহা বিপদ থেকে নাজাত দিলাম। নূহকে আমি ঐ কাওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, যে কওম আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ লোক ছিল। তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। –সূরা আম্বিয়া : ৭৬–৭৭

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ۖ مَّا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۞ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞

অর্থ : আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না? তার কাওমের সরদারদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, এ লোকটি তোমাদের মতোই একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। সে তোমাদের উপর নেতা হতে চায়। আল্লাহ যদি কাউকে পাঠাতে চাইতেনই তাহলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। (মানুষ রাসূল হয়ে আসে) এমন কথা তো আমরা বাপ-দাদাদের সময়েও শুনি নি। আসলে কিছুই নয়, লোকটিকে একটু পাগলামিতে পেয়েছে। কিছু সময় অপেক্ষা কর (হয়তো ভালো হয়ে যাবে)। নূহ বললেন, হে আমার রব! এরা যে আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল, এখন আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আমি তার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, আমার তদারকিতে ও আমার ওহী মোতাবেক একটা নৌকা তৈরি করুন। তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলায় পানি উথলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে যান। আপনার পরিবার-পরিজনকে সাথে নিন, একজন ছাড়া, যার বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। আর যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না। তারা অবশ্যই ডুবে মরবে। তারপর যখন আপনি ও আপনার সাথীগণ নৌকায় সওয়ার হয়ে যাবেন, তখন বলবেন সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কওম থেকে নাজাত দিয়েছেন। আরো বলুন, হে আমার রব! আমাকে বরকতময় জায়গায় নামিয়ে দিন এবং আপনিই নামার জন্য ভালো জায়গা দিতে পারেন। নিশ্চয়ই এ কাহিনীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে আর আমি তো পরীক্ষা করতেই থাকি। –সূরা মুমিনূন : ২৩–৩০

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ۚ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۞ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۞ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۞ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۞ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞

অর্থ : নূহের কওম রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছে, যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তারা জবাবে বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে চলব? অথচ অতি নীচু মানের লোকেরা তোমাকে মেনে চলছে। নূহ বললেন, তাদের আমল কেমন তা আমি কী জানি? তাদের হিসাব নেবার দায়িত্ব তো আমার রবের। হায়, যদি তোমাদের চেতনা থাকত! মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মানুষ। তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া হবে। নূহ দো'আ করলেন, হে আমার রব! আমার কওম আমাকে মিথ্যা মনে করছে। কাজেই এখন আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন আছে তাদেরকে নাজাত দাও। অবশেষে আমি তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে দিলাম।[১] এরপর বাকি লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান। –সূরা শু'আরা : ১০৫–১২২

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۞

অর্থ : আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল। তারপর আমি নূহকে এবং নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং (ঐ নৌকাটিকে) আমি দুনিয়াবাসীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।[২] –সূরা আনকাবূত : ১৪–১৫

---

১. *এটা সেই ভরা নৌকা, যা ঈমানদার মানুষ ও ঐ সব পশু দিয়ে ভরা হয়েছিল, যাদের এক-এক জোড়া সঙ্গে নেওয়ার জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছিল। সূরা হূদের ৪০নং আয়াতে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।*

২. *অর্থাৎ, সেই নৌকাকে অথবা নূহ (আ)-এর কওমের উপর আযাবের এ ঘটনাকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য নিদর্শন বানানো হয়েছে।*

সূরা সাফ্ফাতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۞ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۞ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۞ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۞

অর্থ : আমাকে (এর আগে) নূহ ডেকেছিলেন। (তোমরা লক্ষ্য কর) আমি কত ভালো জবাবদাতা ছিলাম। আমি তাকে ও তার পরিবারকে মহাবিপদ থেকে নাজাত দিলাম। শুধু তার বংশধরদেরকেই বাকি রাখলাম। আর তার পরের বংশধরদের মধ্যে তারই প্রশংসা ও গুণের চর্চা জারি রাখলাম। সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে নূহের প্রতি সালাম। আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই বদলা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তিনি আমার মু'মিন বান্দাহদের মধ্যে শামিল রয়েছেন। তারপর আমি অন্য সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। -সূরা সাফ্ফাত : ৭৫-৮২

সূরা ক্বামারে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۞ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۞ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۞ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

অর্থ : এর আগে নূহের কওম মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। তারা আমার বান্দাহকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং বলেছিল, এ (লোকটি) তো পাগল। আর তাকে ধমক দেওয়া হয়েছিল। তখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও। তারপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম। এবং যমীনকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝরনায় পরিণত করলাম। আর এ সব পানি ঐ কাজটি পুরা করার জন্য একত্র হয়ে গেল, যা (আগেই) ঠিক করে রাখা হয়েছিল। আর নূহকে আমি কাঠ ও পেরেক দিয়ে তৈরি বস্তুর উপর সওয়ার করে দিলাম।[১] নৌকাটি আমার দেখাশোনার মধ্যেই ভেসে চলছিল। যাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, (সে নূহের) খাতিরে এটা ওদের উপর বদলা নেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। ঐ নৌকাটিকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। (এ থেকে) উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে? (দেখে নাও), আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল। আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?[২] -সূরা কামার : ৯-১৭

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের সূরা নূহে হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনী বর্ণনায় বলেন—

اِنَّآ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ

১. অর্থাৎ তুফান আসার আগেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত নূহ (আ) যে নৌকা তৈরি করেছিলেন।

২. অর্থাৎ অবাধ্য জাতিদের উপর আল্লাহর যে শিক্ষণীয় আযাব নাযিল হয়েছে, তা তো উপদেশ দেওয়ার একটা ধরন যা বড়ই কঠিন। কিন্তু উপদেশের আরেকটি ধরন হচ্ছে এ কুরআন, যা যুক্তি-প্রমাণ, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদেরকে সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ধরনের তুলনায় দ্বিতীয়টা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্য জিদ ধরে আছ।

لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ
لَيْلًا وَّنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ۞ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا
اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۞ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ
جِهَارًا ۞ ثُمَّ اِنِّىْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا
۞ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ
لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۞ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۞ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۞ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ
الْاَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۞ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۞
لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗٓ
اِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۚ وَّلَا
يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۞ مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ
اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ
مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ
وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۞

অর্থ : আমি নূহকে (এ হেদায়েতসহ) তার কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তার কওমের লোকদেরকে তাদের নিকট এক কঠিন আযাব আসার আগেই সাবধান করে দেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী (রাসূল)। (তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলছি,) তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে মেনে চলো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে (দুনিয়ায়) বাঁচিয়ে রাখবেন।১ আসল কথা এই যে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সময় যখন এসে যায়, তখন আর দেরি করা হয় না।২ তোমরা যদি এ কথা জানতে (তবে কতই না ভালো হতো)! তিনি (নূহ) বললেন,৩ হে আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আমার দেশবাসীকে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি;

১. *যদি তোমরা এ তিনটি কথা মেনে নাও, তাহলে তোমাদেরকে দুনিয়ায় ঐ সময় পর্যন্ত বাঁচার সুযোগ দেওয়া হবে, যা আল্লাহ তোমাদের স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য নির্ধারণ করেছেন।*

২. *এখানে যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তা ঐ সময়, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো কওমের উপর আযাব নাযিলের জন্য নির্দিষ্ট করেন। এ বিষয়ে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন কোনো কওমের উপর আযাব নাযিলের ফায়সালা হয়ে যায় তখন ঈমান আনলেও তাদেরকে মাফ করা হয় না।*

৩. *মাঝখানে এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস বাদ দিয়ে এখানে নূহ (আ)-এর ঐ আবেদন বর্ণনা করা হয়েছে, যা তিনি তাঁর নবুওয়াতের শেষ পর্যায়ে আল্লাহর দরবারে পেশ করেছিলেন।*

কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের মধ্যে শুধু পালানোর মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যখনই আমি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি– যাতে আপনি তাদেরকে মাফ করে দেন, তারা তাদের কানে আঙ্গুল ঠেসে দিয়েছে, তাদের কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে,[৪] তাদের আচরণে তারা জিদ ধরে রয়েছে এবং খুব বেশি অহংকার করেছে। এরপর আমি তাদেরকে উঁচু আওয়াজে দাওয়াত দিয়েছি। তারপর আমি তাদের কাছে প্রকাশ্যেও তাবলীগ করেছি এবং চুপে চুপেও বুঝিয়েছি। আমি বলেছি, তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও; নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আসমান থেকে প্রচুর বৃষ্টি দেবেন। তোমাদেরকে সম্পদ ও সন্তানাদি দান করবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদী-নালা প্রবাহিত করে দেবেন। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর জন্য কোনো মান-মর্যাদার আশা করো না?[৫] অথচ তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।[৬] তোমরা কি দেখতে পাও না, আল্লাহ কীভাবে থরে থরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন? এবং তাতে চাঁদকে আলো ও সূর্যকে বাতি বানিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে অদ্ভুতভাবে বানিয়েছেন।[৭] এরপর তোমাদেরকে এ মাটিতেই ফিরিয়ে নেবেন এবং (তা থেকেই) তোমাদেরকে হঠাৎ বের করে আনবেন। আল্লাহ যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানার মতো বিছিয়ে দিয়েছেন। যাতে তোমরা এর মধ্যে খোলা রাস্তায় চলাফেরা করতে পার। নূহ বললেন, হে আমার রব! এরা আমার কথা অমান্য করেছে এবং (ঐ নেতাদের) কথামতো চলেছে, যারা মাল ও সন্তান পেয়ে আরো বেশি ব্যর্থ হয়েছে। এরা বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে রেখেছে। এরা বলেছে, তোমাদের মা'বুদদেরকে কখনো ত্যাগ করো না। আর ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে[৮] তোমরা ত্যাগ করো না। এরা বহু লোককে গুমরাহ করেছে এবং (এ আল্লাহ!) আপনিও গোমরাহি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এ যালিমদের উন্নতি দেবেন না।[৯] তাদের নিজেদের দোষের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো সাহায্যকারী পায় নি। নূহ বললেন, হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে। হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মু'মিন হিসেবে আমার ঘরে দাখিল হয়েছে, তাদেরকে এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীকে মাফ করুন। আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়েই তাদেরকে বাড়তে দেবেন না। –সূরা নূহ : ১–২৮

আমি (ইবনে কাছীর) আমার তাফসীরে সকল আয়াত সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছি। উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এবং এ আয়াত সংশ্লিষ্ট হাদীস ও বুযুর্গদের বাণীগুলো পরে বিশদভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

৪. *মুখ ঢাকার উদ্দেশ্য– হয় তারা নূহ (আ)-এর কথা শোনা তো দূরের কথা, তাঁর চেহারা পর্যন্ত দেখা পছন্দ করতো না, আর না হয় তাঁর সামনে থেকে মুখ ঢেকে চলে যেতে চাইত, যাতে তিনি তাদেরকে চিনতে পেরে তাদের সাথে কথা বলার সুযোগই না পান।*

৫. *অর্থাৎ, দুনিয়ার ছোট ছোট বাদশাহ ও সরদারদের সম্পর্কে তো তোমরা মনে কর যে, তাদের সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে কিছু করলে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার প্রকৃত বাদশাহ আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা খেয়ালই কর না যে, তিনিও কোনো মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা বিদ্রোহ করছ। তাঁর প্রভুত্বের মধ্যে অন্যকে শরীক বানাচ্ছ। তাঁর হুকুম অমান্য করছ, আর এতে তোমাদের ভয় হয় না যে, তিনি এসবের জন্য শাস্তি দিতে পারেন।*

৬. *অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় পার করে তোমাদেরকে বর্তমান অবস্থায় আনা হয়েছে।*

৭. *এখানে যমীনের উপাদান থেকে মানুষকে সৃষ্টি করাকে তৃণলতা উৎপাদনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন এক সময় পৃথিবীতে গাছপালা ছিল না, তারপর আল্লাহ তা'আলা এখানে তা উৎপন্ন করেছেন। তেমনি এক সময় ছিল, যখন দুনিয়ায় মানুষের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তারপর আল্লাহ এখানে মানুষের চারা লাগালেন।*

৮. *নূহ (আ)-এর কাওমের উপাস্য দেব-দেবীদের মধ্য থেকে এখানে ঐ সব দেবতার নাম নেওয়া হয়েছে, যে সবকে পরবর্তীকালে আরবরাও পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় আরবের জায়গায় জায়গায় ওসবের মন্দির ছিল।*

৯. *অধৈর্য হয়ে নূহ (আ) এ বদ-দো'আ করেন নি; বরং এ বদ-দো'আ তাঁর মুখ থেকে তখনই বের হয়েছিল, যখন শত শত বছর তাবলীগের হক আদায় করার পর তিনি নিজের কওমের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে গেলেন।*

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে হযরত নূহ (আ)-এর প্রশংসা এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীদের সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنۢ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسٰى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهٰرُونَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيمًا ۞ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞

অর্থ : (হে রাসূল!) আমি আপনার উপর তেমনিভাবে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের উপর পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইয়াকূবের সন্তানগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকট ওহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যাবূর দিয়েছি। আমি ঐ সব রাসূলের উপরও ওহী পাঠিয়েছি, যাদের কথা ইতোপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি এবং যাদের কথা আপনার কাছে বর্ণনা করি নি। আর আল্লাহ মূসার সাথে তেমনিভাবে কথা বলেছেন, যেমনভাবে কথা বলা হয়ে থাকে। এসব রাসূলকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যাতে রাসূলুল্লাহর পাঠানোর পর মানুষের কাছে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি না থাকে।[১] আল্লাহ অবশ্যই শক্তিমান ও অতিশয় জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী। -সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৫

সূরা আনআমে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ إِبْرٰهِيمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ۚ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۞ وَإِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِينَ ۞ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞

অর্থ : এটাই ছিল আমার (পক্ষ থেকে) দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার কওমের মুকাবিলার জন্যে দিয়েছি। আমি যাকে চাই উচ্চমর্যাদা দিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কি, তোমার রব বড়ই কুশলী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। তারপর আমি (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই হেদায়াত দিয়েছি। (তাদেরকে আমি) ঐ হেদায়াতই দিয়েছি, যা এর আগে নূহকে দিয়েছিলাম। আমি তাঁরই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হেদায়াত দিয়েছি)। এভাবেই আমি নেক লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দিয়ে থাকি। (তাঁরই বংশের) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে (পথ দেখিয়েছি)- তাদের প্রত্যেকেই নেককারদের মধ্যে শামিল ছিল। (ঐ বংশেরই) ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে

১. অর্থাৎ, এ সব পয়গাম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্য ছিল, তা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির প্রতি পূর্ণ যুক্তির মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরে তাদেরকে সতর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। যেন শেষ বিচারের সময় কোনো পথভ্রষ্ট অপরাধী আল্লাহ তা'আলার সামনে এই ওযর পেশ করতে না পারে যে, "আমি জানতাম না এবং আসল সত্য আমাকে জানানোর জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থা করেন নি।"

(পথ দেখিয়েছি)। এদের প্রত্যেককে আমি দুনিয়ার সবার উপর ফযীলত দান করেছি। এমনকি তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বেরাদরদের মধ্যে অনেককেই আমি ফযীলত দিয়েছি। তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছি ও সরল-সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করেছি। -সূরা আন'আম : ৮৩-৮৭

সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۙ وَقَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ ۭ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

অর্থ : তাদের কাছে কি তাদের আগের লোকদের খবর পৌঁছে নি- নূহের কওম, আ'দ ও সামূদ, ইবরাহীমের কওম, মাদায়েনের বাসিন্দা ও ঐ সব বস্তি, যা উল্টিয়ে ফেলা হয়েছে?[১] তাদের কাছে রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং তাদের উপর যুলুম করা আল্লাহর কাজ ছিল না, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে। -সূরা তাওবা : ৭০

সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۭ جَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْٓا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ۝

অর্থ : তোমাদের কাছে[২] ঐ সব কওমের খবর কি পৌঁছে নি, যারা তোমাদের আগে গত হয়ে গেছে? নূহের কওম, 'আদ ও সামূদ এবং তাদের পরও অনেক কওম, যাদের (সংখ্যা) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে স্পষ্ট কথা ও নিদর্শন নিয়ে এলেন, তখন তারা হাত দিয়ে তাদের মুখ ঢেকে নিল।[৩] আর তারা বলল, তোমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং তুমি আমাদেরকে যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছ, সে সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্তিপূর্ণ সন্দেহে পড়ে আছি। -সূরা ইবরাহীম : ৯

সূরা বানী ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۔

অর্থ : তোমরা ঐ লোকদের সন্তান, যাদেরকে নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই নূহ এক শোকর-গোজার বান্দাহ ছিলেন। -সূরা বনী ইসরাঈল : ৩

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا ۔

অর্থ : (লক্ষ্য করে দেখুন) নূহের পর আমি কত যুগের মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছি। আপনার রব তাঁর বান্দাহদের গুনাহের পুরোপুরি খবর রাখেন ও তিনি সবকিছু দেখেন। -সূরা বনী ইসরাঈল : ১৭

---

১. অর্থাৎ লূতের কওমের বস্তিগুলো, যা উল্টিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

২. হযরত মূসা (আ)-এর ভাষণ উক্ত সূরার পূর্বের আয়াতগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ সরাসরি মক্কার কাফিরদেরকে সম্বোধন করে কথা বলেছেন।

৩. এটা এমন কথা, যেমন আমরা (উর্দুতে/বাংলায়) বলে থাকি- 'কানে হাত দেওয়া বা দাঁতে আঙুল কাটা'। অর্থাৎ কথা শুনতে অস্বীকার করা।

সূরা আম্বিয়া, সূরা মু'মিনূন, সূরা শুরা ও সূরা আনকাবূতে তাঁর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۔

অর্থ : (হে নবী!) ঐ ওয়াদার কথা স্মরণ করুন, যা আমি সকল নবীর কাছ থেকেই নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও (নিয়েছি)। সবার কাছ থেকেই আমি পাকা-পোক্ত ওয়াদা[১] নিয়েছি। -সূরা আহযাব : ৭

সূরা সোয়াদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۞ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّأَصْحٰبُ الْأَيْكَةِ ط أُولٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۞ إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۞

অর্থ : এদের আগে নূহের কওম, 'আদ জাতি, পেরেকওয়ালা ফিরাউন, সামূদ জাতি, লূতের কওম ও আইকাবাসীরা মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছিল। তারাই ছিল বড় দল। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। ফলে এদের উপর শাস্তির ফায়সালা জারি হয়ে গেছে। -সূরা সোয়াদ : ১২-১৪

সূরা মু'মিনে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ص وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجٰدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ز فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحٰبُ النَّارِ ۞

অর্থ : এদের আগে নূহের কওমও মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করেছে এবং তাদের পর অন্যান্য বহু দলও এ কর্ম করেছে। প্রত্যেক উম্মত তাদের রাসূলকে গ্রেফতার করার জন্য হামলা করেছে। তারা সবাই বাতিলের হাতিয়ার দিয়ে হককে দমন করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। দেখে নাও, আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল। (হে নবী!) এভাবেই যারা কুফরী করেছে তাদের উপর আপনার রবের এ ফায়সালাও জারি হয়ে গেছে যে, তারা দোযখের বাসিন্দা হয়ে থাকবে। -সূরা মু'মিন : ৫-৬

সূরা শূরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصّٰى بِهِ نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط اَللّٰهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيبُ ۞

---

১. *এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে এইকথা মনে করিয়ে দেন যে, সকল নবী (আ)-এর মতো তাঁর কাছ থেকেও আল্লাহ তা'আলা মযবূত ওয়াদা নিয়েছেন, যা কঠোরভাবে পালন করা তাঁর কর্তব্য। উপর থেকে যে আলোচনা চলছে তা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, ঐ ওয়াদার মানে হলো- নবী আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি হুকুম নিজে পালন করবেন ও অন্যদের পালন করাবেন, আল্লাহর কথা কিছুমাত্র কম-বেশি না করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন ও সে কথাগুলো কাজে রূপায়িত করার ব্যাপারে চেষ্টার কোনো ত্রুটি ও দ্বিধা করবেন না। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় এ ওয়াদার উল্লেখ করা হয়েছে। যথা- সূরা বাকারার আয়াত ৮৩, আলে ইমরানের আয়াত ১৮৭, মায়িদার ৭, আ'রাফের ১৭১ ও ১৭৯ আয়াত এবং সূরা শুরার ১৩ নং আয়াত।*

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য দীনের ঐ সব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে নবী!) এখন আপনার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদসহ দিয়েছিলাম যে, এ দীনকে কায়েম করুন। আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবেন না। (হে নবী!) এ কথাটিই এ মুশরিকদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়, যার দিকে আপনি তাদেরকে ডাকছেন। আল্লাহ যাকে চান তাকে আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে আসার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে রুজু হয়। -সূরা শূরা : ১৩

সূরা ক্বাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۞ وَعَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۞ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۞

অর্থ : এদের আগে নূহের কওম, রাস্‌সের অধিবাসী, সামূদ, 'আদ, ফিরাউন ও লূতের কওম এবং আইকাবাসী ও তুব্বা জাতি (রাসূলদেরকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। অবশেষে (তাদের উপর) আমার শাস্তি সত্য হয়ে দেখা দিল। -সূরা ক্বাফ : ১২-১৪

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۔

অর্থ : আর এ সবের আগে আমি নূহের কওমকে (ধ্বংস করেছি), কেননা তারা ফাসিক ছিল। -সূরা যারিয়াত : ৪৬

সূরা নাজমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۔

অর্থ : আর এর আগে নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা বড়ই যালিম ও অবাধ্য লোক ছিল। -সূরা নাজম : ৫২

সূরা হাদীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۔

অর্থ : আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে কিতাব ও নবুওয়াত দান করেছি। অতঃপর তাদের সন্তানদের মধ্যে কেউ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অনেক লোক ফাসিক হয়ে গেছে। -সূরা হাদীদ : ২৬

সূরা তাহ্‌রীমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۞

অর্থ : আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করেছেন। তারা আমার দুজন নেক বান্দার অধীনে ছিল; কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।[১] ফলে (তাদের স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও) আল্লাহর (হাত থেকে বাঁচানোর জন্য) তাদের কোনো উপকারে আসতে পারে নি। তাদের দু'জনকে বলে দেওয়া হলো যে, দোযখের দিকে যারা যাচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। -সূরা তাহরীম : ১০

১. *এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এ অর্থে নয় যে, তারা ব্যভিচার করেছিল; বরং এ অর্থে যে, তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-কে সহযোগিতা তো করেই নি; বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দীনের শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।*

হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর জাতির কাহিনী ও বিবরণ কুরআন ও হাদীস থেকে লওয়া হয়েছে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝে ব্যবধান ছিল দশ যুগের এবং তাঁরা সকলেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যা ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেছেন।

এখানে 'কুরন' দ্বারা মানবগোষ্ঠী কিংবা (দশ) যুগ বুঝানো হয়েছে। তারপর এ দশ যুগের পর এমন কিছু লোক সৃষ্টি হয়, যারা মূর্তিপূজায় মশগুল হয়ে পড়ে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۔

অর্থ : এরা বলেছে, তোমাদের মা'বুদদেরকে কখনো ত্যাগ করো না। আর ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাসরকে[১] তোমরা ত্যাগ করো না। -সূরা নূহ : ২৩

এই (দেব-দেবীর) নামগুলো ছিল তাদের সম্প্রদায়ের পূর্ববর্তী কয়েকজন পূণ্যবান ব্যক্তিদের নামে। তাদের ইন্তেকালের পরে শয়তান এ সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় যে, এ সব পূণ্যবান ব্যক্তিদের স্মরণে উপাসনা করো, তাদের সদৃশ মূর্তি নির্মাণ করো, তাদের নামে সে মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। লোকেরা শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুযায়ী সে কাজ-ই করল। কিন্তু তারা মূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীকালে এই মূর্তি পূজার প্রচলন আরবেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ইকরামা, কাতাদাহ, যিহাক ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ)-গণও এরূপ মত পেশ করেছেন।

ইবনে জারীর (রহ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইবনে কায়েসের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এ পূণ্যবান ব্যক্তিরা হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ) এ দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে লোক ছিলেন এবং তারা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের অনুগত ছিল। এ পুণ্যবান লোকদের মৃত্যুর পরে তাঁদের অনুসারীগণ বলল, যদি আমরা তাঁদের মূর্তি বানিয়ে রাখি, তবে তাদের স্মরণ করে আমরা (আমাদের পরওয়ারদেগারের) একনিষ্ঠভাবে উপাসনা করতে পারব। এ খেয়ালে তারা তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করল। তাদের ইন্তেকালের পরে যখন অন্য লোকেরা আসে, তখন ইবলিস তাদেরকে এ কথা বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে, পূর্বপুরুষরা, যারা এ মূর্তিগুলো তৈরি করেছে, তারা এগুলোর পূজা করতো। এ মূর্তিগুলোর কাছে বৃষ্টি ও অন্যান্য জিনিস প্রার্থনা করতো। এ কুমন্ত্রণায় পড়ে তারা এগুলোর অর্চনা করা শুরু করে দেয়।

ইবনে আবী হাতিম, হযরত ওরওয়াহ ইবনে যোবায়ের হতে বর্ণনা করেন যে, (কুরআনের আয়াতে তাদের দেব-দেবীর যে নামগুলো রয়েছে) ওয়াদ, ইয়াগুছ, ইয়াউক, সুওয়া'আ ও নাস্‌র এরা হযরত আদম (আ)-এর সন্তান ছিলেন। এদের মধ্যে বড় ও সঠিক পূণ্যবান ছিলেন ওয়াদ।

ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন যে, আহমদ ইবনে মানসূর আবূ মুতাহার বলেন, একবার হযরত আবূ জাফর বাকের নামায পড়ছিল; এ সময় তাঁর চার পাশে উপস্থিত লোকেরা ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাব সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। হযরত আবূ জাফর বাকের নামায শেষে বললেন, তোমরা ইয়াযীদ ইবনে মুহাল্লাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করছ? অথচ তিনি এমন এক জায়গায় মারা যান, যেখানে সর্বপ্রথম "গায়রুল্লাহর" পূজা হয়েছিল। আর যার পূজা হয়েছিল তার নাম ছিল ওয়াদ, (যা সূরা নূহে বর্ণিত হয়েছে।) এই ওয়াদ অধিক পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জাতির লোকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে, সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কবরের চারপাশে ঝুঁকে পড়ে। বাবেল শহরে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। লোকেরা তাঁর কবরে সম্মিলিত হয়ে শোক প্রকাশ করতে থাকে। ওয়াদের ইন্তেকালে লোকদের এ শোক ও দুঃখ বেদনা দেখে অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের আকৃতিতে শোকার্ত লোকদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি দেখতেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রিয় ব্যক্তির ইন্তেকালে অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছ। আমি কি তোমাদের জন্য এ পুণ্যবান ব্যক্তির প্রতিকৃতি তৈরি

১. *নূহ (আ)-এর কওমের উপাস্য দেব-দেবীদের মধ্য থেকে এখানে ঐ সব দেবতার নাম নেওয়া হয়েছে, যে সবকে পরবর্তীকালে আরবরাও পূজা করতে শুরু করেছিল এবং ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক অবস্থায় আরবের বিভিন্ন জায়গায় ওসবের মন্দির ছিল।*

করে দেব? সুন্দরভাবে রেখে দেবে এবং তা দেখে তাঁর স্মরণ করে তোমরা শান্তি লাভ করবে। সকলে বলল, কেন নয়? অবশ্যই তা আপনি বানিয়ে দেবেন। অভিশপ্ত শয়তান তাঁর প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিল। লোকেরা তা নিয়ে তাদের সমাবেশে স্থাপন করল এবং তাঁর স্মরণ করতে থাকল।

যখন শয়তান দেখল যে, প্রতিমূর্তি দেখে লোকেরা তাদের প্রিয় ব্যক্তির স্মরণে অধিক আসক্ত হয়ে পড়েছে, তখন সে (শয়তান) সকলকে বলল, আমি কি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করে এই প্রতিমূর্তি তৈরি করে দেব, যাতে তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে তা রেখে দিতে পার? সকলে বলল, হ্যাঁ, তৈরি করে দিন। তখন শয়তান প্রত্যেককে একটি করে প্রতিমূর্তি তৈরি করে দিল। তারপর প্রতিটি ঘরে ঘরে তাঁর স্মরণ হতে লাগল। পিতাগণ তাদের সন্তানদেরকে মৃত্যুর পূর্বে ওসিয়্যত করে যেত, যাতে তারা তাঁর (ওয়াদের) স্মরণ জারী রাখে। পরবর্তীতে তাদের সন্তানগণ তাঁকে স্মরণ করতে লাগল। এক পর্যায়ে তারা তাঁকে তাদের মা'বূদ (উপাস্য) হিসেবে গ্রহণ করল। এভাবেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এই "ওয়াদকে" মিথ্যা উপাস্য বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে তার পূজা করা হয়। অথচ এ "ওয়াদ" যিনি নিজকে আল্লাহ তা'আলার একজন সাধারণ বান্দা বলে মনে করতেন। এ ঘটনা দ্বারা এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, লোকেরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করে থাকে, তার সূচনা হয় এ প্রতিমূর্তি থেকেই। বর্ণিত আছে যে, এভাবে কিছুকাল অতিক্রম হওয়ার পর এই বংশধরেরা সে প্রতিকৃতিগুলোকে দেহধারী মূর্তিরূপে তৈরি করে। তারা তাদের মিথ্যা উপাস্য মূর্তিগুলোকে বিভিন্নভাবে সুসজ্জিত করতে থাকে। প্রথমে প্রতিমূর্তি ছিল, পরে তারা সেটাকে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দেহবিশিষ্ট রূপে গঠন করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বর্জন করে সেগুলোর উপাসনা শুরু করে। (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের পূজা করার বহু রীতি রয়েছে। যা আমি আমার প্রণীত তাফসীরে উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনে হযরত উম্মে সালমা (রা) ও হযরত উম্মে হাবীবা (রা) 'মারিয়া' নামক একটি গির্জার প্রশংসা করলেন। যে গির্জাটি তাঁরা হাবশায় দেখে এসেছিলেন। তাঁরা দু'জনেই সেই গির্জাটির সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে স্থাপিত প্রতিমূর্তির কথা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে (দেশের) লোকদের নিয়ম এই ছিল যে, তাদের মধ্যকার কোনো সৎ ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তারা সেই মৃতব্যক্তির কবরের উপর একটি উপাসনালয় নির্মাণ করতো এবং সেই ব্যক্তির প্রতিমূর্তি তৈরি করে সেখানে রেখে দিত। এ লোকেরা আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি। –বুখারী ও মুসলিম

পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ (আ)

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রাসূল হিসেবে যিনি আগমন করেন, তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ)। বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নবর্ণিত হাদীস তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা হযরত আদম (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করবে, আপনি আবুল বাশার (মানবজাতির পিতা), আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজ কুদরতী হাতের সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রূহ প্রদান করেছেন। তারপর তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছেন এবং তিনি (আল্লাহ) আপনাকে জান্নাতে বসবাসের জন্য স্থান দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট একটু সুপারিশ করবেন? আমরা যে কঠিন মসীবতের মধ্যে আছি, তা তো আপনি নিজেই দেখছেন। হযরত আদম (আ) বলবেন, আমার পরওয়ারদেগার, আজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় আছেন। এত রাগান্বিত এর পূর্বে আর কখনো হননি, আর পরেও হবেন না। আমার রব, আমাকে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি সে আদেশ অমান্য করেছি। হায়! আজ আমি নিজকে নিয়েই চিন্তিত, নিজকে নিয়েই চিন্তিত! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও। অতঃপর তারা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হবে এবং আরয করবে, হে নূহ (আ)! আপনি পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে "আব্দুশ শাকুর" (কৃতজ্ঞ বান্দা) উপাধি দিয়েছেন।

আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা কঠিন মসীবতের মধ্যে ডুবে আছি? আপনি কি দেখছেন না যে, আমরা ভীষণ কষ্টের মধ্যে পড়ে রয়েছি? আমাদের এ কঠিন মসীবতের সময় আপনি কি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবেন না? হযরত নূহ (আ) বলবেন, আজকের দিনে আমার পরওয়ারদেগার ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় আছেন। এত রাগ ইতোপূর্বে তিনি আর কখনো হন নি আর পরেও কখনো হবেন না। আমি আমার নিজের চিন্তায়-ই অস্থির, নিজের চিন্তায়-ই বিভোর! দীর্ঘ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণিত হয়েছে যেভাবে ইমাম বুখারী (রহ) হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হযরত নূহ (আ) সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন। তাঁর পূর্বে হযরত আদম (আ), হযরত শীস (আ) ও হযরত ইদরীস (আ) তাঁরা সকলে ছিলেন নবী ও পয়গম্বর।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে পৃথিবীতে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার পর, তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং (জাতিকে) বললেন, আল্লাহর সাথে কোনো প্রতিমা, কোনো প্রতিকৃতি ও কোনো শয়তানের উপাসনা কর না। আল্লাহ তা'আলার একত্বকে স্বীকার কর এবং একান্ত আন্তরিকভাবে স্বীকার কর যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই অনুরূপভাবে অন্যান্য পয়গম্বরগণও তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ের দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই (পয়গম্বর ও রাসূলগণ) তাঁরই বংশধর ছিলেন। যেমন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে—

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۔ "শুধু তার বংশধরদেরকেই বাকি রাখলাম।" –সূরা সাফ্ফাত : ৭৭

কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে হযরত নূহ (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে—

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ ۔

অর্থাৎ, হযরত নূহ (আ)-এর পরে প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলগণ সকলেই তাঁর বংশধর ছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-ও। অর্থাৎ, তিনি নিজেও হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এরপর থেকে সকল নবী ও রাসূল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। তাঁর মাধ্যমে তাঁরা সকলে হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর।

তাওহীদ বা একত্ববাদের দাওয়াত

সমস্ত নবীদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ ছিল, সূরা নাহলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۔

অর্থ : আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁর মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছি যে, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাগূতের দাসত্ব থেকে দূরে থাক। –সূরা নাহল : ৩৬

সূরা যুখরুফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ۔

অর্থ : আপনার আগে আমি যত রাসূল পাঠিয়েছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি রাহমান ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদও নির্ধারিত করেছিলাম, যার দাসত্ব করা যায়? –সূরা যুখরুফ : ৪৫

অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ) ও তাঁর জাতিকে বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۔

অর্থ : হে আমার দেশবাসী! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়াবহ দিনের আযাবের ভয় করি। –সূরা আ'রাফ : ৫৯

হযরত নূহ (আ) বলেছেন—

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۔

অর্থ : তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করো না। আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর একদিন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসবে। -সূরা হূদ : ২৬

তিনি আরো বলেছেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۔

অর্থ : আমি নূহকে তার কওমের নিকট পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না? -সূরা মু'মিনূন : ২৩

তিনি আরো বলেছেন—

قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۙ

অর্থ : তিনি বলেছিলেন, হে আমার দেশবাসী! আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সাবধানকারী (রাসূল)। (তোমাদের স্পষ্টভাবে বলছি,) তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব করো, তাঁকে ভয় করো এবং আমাকে মেনে চলো। -সূরা নূহ : ২-৩

হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে যে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তা বর্ণনা করেন। বিশেষ করে সূরা নূহে, হযরত নূহ (আ)-এর জাতির প্রতি তাঁর দাওয়াতের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি কখনো উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আবার কখনো সতর্কবাণী প্রদানের মাধ্যমে লোকদেরকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, গোত্রের লোকেরা কোনো অবস্থাতেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিল না। বরং অধিকাংশ লোক হযরত নূহ (আ)-এর প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করল। তারা গোমরাহীতে আরো নিমজ্জিত হয়ে হযরত নূহ (আ)-এর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে গেল। তারা হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তাঁদেরকে মেরে ফেলার এবং দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ভয় দেখাতে থাকে। শুধু ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং তাঁদের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনও চালিয়েছিল।

কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

অর্থ : কওমের সরদাররা জবাব দিলো, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, তুমি স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়ে আছ। নূহ বললেন, হে আমার কাওম! আমি কোনো গোমরাহীতে পড়ি নি; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতকামী। আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না। -সূরা আ'রাফ : ৬০-৬২

একজন রাসূলের বৈশিষ্ট্য এটাই হয়ে থাকে যে, তিনি আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং তিনি অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ও সুন্দর এবং নরম ভাষায় লোকদের সাথে কথা বলবেন।

হযরত নূহ (আ)-এর অনুসারীদের ব্যাপারে কাফির নেতৃবৃন্দ এ মন্তব্য করেছিল যে, ওরা অধম ও নীচু শ্রেণীর মানুষ। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۔

অর্থ : (এ কথার জবাবে) তার কওমের সরদারদের মধ্যে যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল, আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি আমাদের মতই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের কওমের শুধু ছোট লোকেরাই না বুঝে-শুনে তোমাকে মেনে চলছে। আমরা তোমাদের মধ্যে এমন কোনো কিছুই পাচ্ছি না, যেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। –সূরা হূদ : ২৭

নূহ (আ)-এর গোত্রের লোকেরা বিস্মিত হলো যে, একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হতে পারে। তারা হযরত নূহ (আ)-এর অনুসারীদের বিভিন্ন দোষ বর্ণনা করতো এবং তাঁদেরকে তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও নীচু শ্রেণীর লোক বলে মনে করতো। কথিত আছে যে, নূহ (আ)-এর অনুসারীরা ছিল অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও দুর্বল।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে বসে যখন কোনো এক লোক ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে বলেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগতরা দুর্বল ও অক্ষম। তখন সম্রাট জবাবে বলেছিলেন, হ্যাঁ, ঘটনা এরূপই হবে। (অর্থাৎ, তাঁরা দুর্বল ও অক্ষম-ই হবেন।) কেননা, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁদের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে না। (অর্থাৎ, প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য ধন-সম্পদ, আত্মসম্মান ও মর্যাদা ইসলাম গ্রহণের জন্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ইসলাম গ্রহণের ফলে এগুলো চলে যাওয়ার ভয় থাকে। আর দুর্বল ও অক্ষম লোকদের এ ভয় থাকে না।)

কাফির নেতারা হযরত নূহ (আ)-এর অনুসারীদেরকে "বিবেকহীন" বলে যে মন্তব্য করেছিল, এর অর্থ হলো এই যে, তাঁরা নূহ (আ)-এর দাওয়াত শুনেই তা গ্রহণ করে নিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনাই করে নি। কাফিরেরা যেটাকে নূহ (আ)-এর অনুসারীদের ত্রুটি বলে মনে করেছে। মূলত সেটা তাঁদের এমনই একটি গুণ যা প্রশংসনীয়। কারণ, সত্য তো সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনার দরকার হয় না। বরং তা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই তার অনুসরণ করা এবং তা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া জরুরী হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রশংসা করে বলেছিলেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি প্রত্যেকেই (কমপক্ষে) একবার ইতস্তত করেছিল, কিন্তু আবূ বকর (রা) এমনই এক ব্যক্তি, যিনি ইসলামের দাওয়াত কবূলে একটু বিলম্ব করেন নি বা ইতস্তত করেন নি। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরে খলীফা হিসেবে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম প্রস্তাব হলে সকলেই এক বাক্যে বিনা চিন্তা ও ভাবনায় তাঁর হাতে তাড়াতাড়ি বাই'আত গ্রহণ করেন। কারণ, অন্য সকল লোকদের উপর হযরত আবূ বকরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ছিল সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্ট। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ খেলাফতের জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর নাম স্পষ্টভাবে লিখে দেয়ার চিন্তা করেও এই বলে বিরত রইলেন যে, "আল্লাহ ও মু'মিনগণ হযরত আবূ বকর (রা) ব্যতীত (খেলাফতের জন্য) অন্য কাউকে পছন্দ করবেন না।" (সুতরাং লেখার প্রয়োজন কি?)

হযরত নূহ (আ) ও তাঁর অনুগতদের সম্পর্কে নূহ (আ)-এর জাতির কাফিরদের উক্তি যে, "আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না।" এর অর্থ হলো এই যে, যখন তোমরা ঈমান গ্রহণ করেছ, এরপর থেকে আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না। আর তোমাদের কোনো ব্যক্তিত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশও পায় নি। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ۞ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ

اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ط اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ۞

অর্থ : (এ কথার জবাবে) তার কওমের সরদারদের মধ্যে যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা বলল, আমরা তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি আমাদের মতই মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের কওমের শুধু ছোট লোকেরাই না বুঝে-শুনে তোমাকে মেনে চলছে। আমরা তোমাদের মধ্যে এমন কোনো কিছুই পাচ্ছি না, যেদিক দিয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ যে, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম থেকে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর খাস রহমত দিয়ে আমাকে ধন্য করে থাকেন, কিন্তু তা তোমাদেরকে দেখতে দেওয়া না হয়ে থাকে (তাহলে আমার কী করার আছে?)। তোমরা মানতে না চাইলে আমি কি জোর করে তা তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি? -সূরা হূদ : ২৭-২৮

হযরত নূহ (আ) অতি নম্র ও বিনয়ের সাথে তাঁর গোত্রের লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন এবং সত্যের দাওয়াতে হৃদ্যতার সাথে কাজ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ)-কে ফিরাউনের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছিলেন যে—

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ۔

অর্থ : তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পাবে। -সূরা ত্বা-হা : ৪৪

কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কেও এভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط

অর্থ : (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন। আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। -সূরা নাহল : ১২৫

(নবীগণ কিভাবে মানুষকে হৃদ্যতা, ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে দাওয়াত দিবেন, তার সুস্পষ্ট নির্দেশ উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে।)

অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ) তাঁর গোত্রের লোকদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে কি বল? আমি যদি আমার রবের-প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি। আর তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ দয়া দান করে থাকেন। আর তোমরা এ বিষয়ে অবগত না হও। (অর্থাৎ, তোমরা নবুওয়াতকে বুঝতে না পার এবং সৎপথ প্রাপ্ত না হও)। আমি কি তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ কর? (অর্থাৎ, আমি জোরপূর্বক তোমাদেরকে কি সৎপথে নিয়ে আসতে পারি, যখন তোমরা তা পছন্দ কর না? এটা কখনো সম্ভব নয়।)

হযরত নূহ (আ) বলেছেন—

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ط اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۔

অর্থ : হে আমার কওম! আমি তো এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোনো মাল চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহরই দায়িত্বে আছে। -সূরা হূদ : ২৯

অর্থাৎ, আমার এই দ্বীনের দাওয়াতের কাজের জন্য আমি তোমাদের থেকে কোনো প্রকার পারিশ্রমিক চাই না। আমার এ উপদেশ তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ ۔

এর পরেই হযরত নূহ (আ) বলেছেন,

অর্থ : আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে পারি না। তারা নিজেরাই তাদের রবের কাছ হাজির হবে। -সূরা হূদ : ২৯

উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথাটি প্রনিত হয় যে, প্রভাবশালী ও সম্পদশালী কাফিরেরা হযরত নূহ (আ)-এর কাছে এ দাবি করেছিল যে, তুমি যদি তোমার নিকট হতে অসহায় ও দুর্বল ব্যক্তিদেরকে তাড়িয়ে দাও, তবে তোমার কথা আমরা শুনতে পারি। হযরত নূহ (আ) তাদের জবাবে বলেছিলেন যে, "মুমিনগণকে দূরে সরিয়ে দেয়া আমার কাজ নয়, তাঁরা নিশ্চিতভাবে তাঁদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

অনুরূপভাবে কুরাইশের দাম্ভিক কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল যে, আপনার দরবার থেকে হযরত আম্মার, সোহায়েব, বেলাল, খাব্বাব (রা) প্রমুখের ন্যায় গরীব, দুর্বল ও অসহায় লোকদেরকে দূরে সরিয়ে দিন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ কাজ করতে বাধা দেন। এমনকি মুমিনদের থেকে তাঁর দৃষ্টিকেও সরাতে নিষেধ করেন। অর্থাৎ, মু'মিনগণের দিকেই একেবারে নিবিষ্ট থাকবে।

হযরত নূহ (আ) বলেন—

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েবী ইলম রাখি। আমি এ দাবিও করি না যে, আমি ফেরেশতা। আর আমি এ কথাও বলতে পারি না যে, তোমাদের চোখ যাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে দেখে, আল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো মঙ্গলই রাখেননি। আমি যদি এমন কথা বলি, তাহলে অবশ্যই যালিম হব। -সূরা হূদ : ৩১

অর্থাৎ, তোমাদের ধারণায় যারা অধম আমি তাদের ব্যাপারে এটা বলতে পারি না যে, কিয়ামতে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের কোনই মঙ্গল হবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এবং তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তার বিনিময় আল্লাহ তাদেরকে দেবেন। যদি ভাল কিছু হয় তবে উত্তম বিনিময় দিবেন। আর মন্দ কিছু হলে তার শাস্তি তারা পাবে।

অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ) ও তাঁর জাতির লোকদের মাঝে আরো কথাবার্তা হয়েছিল, যা নিম্নরূপ—

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۞ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ۞ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞

অর্থ : তারা জবাবে বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে চলব? অথচ অতি নীচু মানের লোকেরা তোমাকে মেনে চলছে। নূহ বললেন, তাদের আমল কেমন তা আমি কী জানি? তাদের হিসাব নেবার দায়িত্ব তো আমার রবের। হায়, যদি তোমাদের চেতনা থাকত! মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মানুষ। -সূরা শু'আরা : ১১১-১১৫

এভাবে হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۞

অর্থ : আমি নূহকে তার কওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল। -সূরা 'আনকাবূত : ১৪

এত লম্বা সময়ের মধ্যে মাত্র নির্ধারিত কিছু সংখ্যক লোক হযরত নূহ (আ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। তাঁর গোত্রে কাফিরেরা নূহ (আ)-এর বিরোধিতায় এতই কঠোর ছিল যে, তারা প্রত্যেকে মৃত্যুর পূর্বে তাদের সন্তান-সন্ততিকে এ বলে ওসীয়ত করে যেত যে, তারা যেন কখনই এ নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনে। বরং সর্বদাই যেন তার বিরোধিতা করে। এ কাফিরদের সন্তানরা একটু বোধ শক্তিসম্পন্ন হলেই, কাফির পিতা তাদেরকে এ বলে নির্দেশ দিত যে, তারা যেন কখনই নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনে এবং এ নির্দেশের ওপর যেন জীবনভর কায়েম থকে।

কাফির সন্তানরা অভ্যাসগতভাবেই ঈমান ও সত্য থেকে বিমুখ ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে গ্রহণ করতো না। আর এ কারণেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, . وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

অর্থ : আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে। -সূরা নূহ : ২৭

হযরত নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা নূহ (আ)-কে বলেছিল—

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۞

অর্থ : অবশেষে তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং অনেক বেশি ঝগড়া করে ফেলছ। তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ধমক দিচ্ছ তা নিয়ে এস। (নূহ) জবাবে বললেন, তা তো আল্লাহই আনবেন যদি তিনি চান। তোমাদের এমন ক্ষমতা নেই যে, তোমরা বাধা দেবে। -সূরা হূদ : ৩২-৩৩

অর্থাৎ, আমি যে শাস্তির কথা তোমাদেরকে জানাচ্ছি সে শাস্তি প্রেরণ করতে আল্লাহ ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছুর উপরই মহা ক্ষমতাবান। কোনো কিছুই তাঁকে অপারগ করতে পারে না। তিনি কারো পরওয়া করেন না; বরং তিনি (আল্লাহ) এমন মহা শক্তির অধিকারী যে, যখন তিনি কোনো বস্তুকে বলেন, "(সৃষ্টি) হয়ে যাও" সাথে সাথে তা (সৃষ্টি) হয়ে যায়।

হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে বলেন—

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ط هُوَ رَبُّكُمْ ق وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

অর্থ : আল্লাহ নিজেই যদি তোমাদেরকে পথহারা করার ইচ্ছা করে থাকেন, তাহলে যদি আমি তোমাদের কোনো মঙ্গল করতেও চাই, তবুও আমার কল্যাণ-কামনা তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না। তিনিই তোমাদের রব। তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। -সূরা হূদ : ৩৪

অর্থাৎ, আল্লাহ যদি কাউকে সৎপথের দিশা দিতে ইচ্ছা না করেন, তবে তাকে কেউ-ই সৎপথ প্রদর্শন করতে পারবে না। তিনি যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই করতে সক্ষম। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়; কে সৎপথ পাওয়ার যোগ্য, আর কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে তিনিই সর্বজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলার হিকমত অতি সুনিপুণ এবং তাঁর প্রমাণ অত্যন্ত মজবূত।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, . وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ

অর্থ : নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল 'যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না।

অর্থাৎ, কাফিরদের যুলুম ও কষ্টদায়ক আচরণের জন্য নূহ (আ)-কে এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে যে, যারা ঈমান আনেনি, তাদের ঈমানের পরওয়া তুমি কর না; বরং যারা ঈমান এনেছে তাদের উপরই সন্তুষ্ট থাক। তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, . فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

এটা হযরত নূহ (আ)-কে সান্ত্বনা প্রদান যে, তুমি কারো ঈমান নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা কর না এবং তোমার গোত্রের লোকদের শত্রুতারও পরওয়া কর না। কারণ, আল্লাহ তোমার নিকটেই আছেন এবং তাঁর সাহায্যের সু-সংবাদ খুবই আশ্চর্যজনক। সেটা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ج اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ .

অর্থ : (হে নূহ!) আমার ওহী মোতাবেক আমার চোখের সামনে একটা নৌকা তৈরি করুন। যারা যুলুম করেছে, তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে। -সূরা হূদ : ৩৭

নৌকা নির্মাণের আদেশ এবং কাফিরদের উপর শাস্তির প্রস্তুতি তখনই হলো, যখন হযরত নূহ (আ) তাদের ঈমান সম্পর্কে নিরাশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হযরত নূহ (আ) দেখলেন যে, তাঁর গোত্রের লোকদের মধ্যে কল্যাণকর কিছুই নেই। তারা তাঁর চরমভাবে বিরোধিতা শুরু করে দিল। যুলুম, নির্যাতন ও অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে তারা পৌছে গেল। অর্থাৎ, শত্রুতার আর কোনো দিক বাকি রইল না। হযরত নূহ (আ) নিরাশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাঁর জাতির অবিশ্বাসী লোকদের ব্যাপারে বদদো'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্যাতিত ও নিষ্পাপ বান্দার ডাকে সাড়া দেন এবং তাঁর আবেদন কবূল করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ .

অর্থ : আমি নূহকেও এ নিয়ামতই দিয়েছিলাম। যখন নূহ এ সবের আগে আমাকে ডাকলেন, তখন আমি তাঁর ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে মহাবিপদ থেকে নাজাত দিলাম। -সূরা আম্বিয়া : ৭৬

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ۞ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : নূহ দো'আ করলেন, হে আমার রব! আমার কাওম আমাকে মিথ্যা মনে করছে। কাজেই এখন আমার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন আছে তাদেরকে নাজাত দাও। -সূরা শু'আরা : ১১৭-১১৮

কুরআন মাজীদে আরো বর্ণিত হয়েছে—

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ .

অর্থ : তখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও। -সূরা কামার : ১০

"নূহ (আ) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে।"

-সূরা মু'মিনূন : ৩৯

উক্ত আয়াতসমূহে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ) অসহায় হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ তা কবূল করে নেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞

অর্থ : তাদের নিজেদের দোষের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো সাহায্যকারী পায় নি। নূহ বললেন, হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্যে ছেড়ে দেবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে। –সূরা নূহ : ২৫–২৭

হযরত নূহ (আ)-এর বদদো'আয় তাঁর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী লোকদের উপর কুফরী ও অত্যাচারের বিনিময়ে শাস্তি এসে আপতিত হয়। এ সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে একটি নৌকা তৈরি করার জন্যে আদেশ করেন। সে নৌকা এত বড় যে, ইতোপূর্বে এ ধরনের নৌকা কখনো নির্মিত হয় নি, আর পরেও হবে না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে পূর্বেই বলে রেখেছেন যে, যখন আল্লাহর শাস্তি অবিশ্বাসীদের উপর এসে যাবে, তখন সে শাস্তি সে অপরাধীদের থেকে আর দূর করা যাবে না। সুতরাং এ সময় যেন আপনি দয়া পরবশ হয়ে শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্যে প্রার্থনা না করেন এবং আপনার আবেদনকে প্রত্যাখ্যান না করেন। কারণ, সম্প্রদায়ের লোকদের উপর ভয়াল শাস্তির রূপ থেকে হযরত নূহ (আ)-এর মনে দয়ার উদ্রেক হতে পারে। কারণ, সংবাদ কখনো প্রত্যক্ষ দর্শনের সমান হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۚ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۞

অর্থ : যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে। নূহ নৌকা তৈরি করছিলেন। তাঁর কাওমের সরদারদের মধ্যে যারাই এ দিক দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারাই তাঁর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। নূহ বললেন, তোমরা যদি আমাদের প্রতি ঠাট্টা কর, তাহলে আমরাও তোমাদের প্রতি তেমনি বিদ্রূপ করছি যেমন তোমরা করছ। শিগ্‌গিরই জানতে পারবে, কার উপর ঐ আযাব আসবে, যা তাদেরকে অপদস্ত করবে এবং কার উপর ঐ বিপদ এসে পড়বে যা স্থায়ী হয়ে থাকবে।[১] –সূরা হূদ : ৩৭–৩৯

---

১. *এক আজব ব্যাপার– এ সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়, মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক অবস্থা দেখে কীভাবে ধোঁকা খায়। নূহ (আ) যখন নদী থেকে বহু দূরে শুকনা জায়গায় নৌকা বানাচ্ছিলেন, তখন বাস্তবিকই লোকদের কাছে ব্যাপারটি খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল এবং তারা ঠাট্টার হাসি হেসে বলেছিল, বড় মিঞার পাগলামি এবার এত দূর পৌঁছেছে যে, তিনি এখন শুকনো জায়গায়ই জাহাজ চালাবেন! তখন কেউ স্বপ্নেও ধারণা করতে পারে নি যে, কয়েক দিন পর বাস্তবিকই এখানে জাহাজ চলবে। কিন্তু যিনি জানতেন, কাল এখানে জাহাজের কী দরকার হবে, তিনি তাদের ঠাট্টা ও হাসি-তামাশা দেখে তাদের বোকামি, বে-খবরি ও মূর্খতায় নিশ্চয়ই হেসেছিলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এ লোকেরা কতই না বোকা! শমন তাদের মাথার উপর এসে হাজির। আমি আগেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছি যে, তোমাদের শমন এসে গেছে এবং তাদের চোখের সামনেই তাদেরকে বাঁচানোর জন্যে তদবিরও আমি করেছি; তবুও তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে এবং উল্টো আমাকেই পাগল মনে করছে।*

এ বেঈমানরা যেমন পৃথিবীতে বসে কুফরী ও অবাধ্যতার চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং এ অবাধ্যতা ও অন্যায়সমূহ তাদের স্বভাবগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুরূপভাবে পরকালেও তারা তাদের এ স্বভাব অনুযায়ী তাদের কাছে রাসূল আগমনের কথা অস্বীকার করে বসবে। যেমন, বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন যখন হযরত নূহ (আ) ও তাঁর উম্মতগণ হাজির হবেন তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার রিসালাত (আল্লাহ প্রদত্ত বাণী) সকলের কাছে পৌঁছিয়েছিল? হযরত নূহ (আ) উত্তরে বলবে, জী হ্যাঁ, হে আমার পরওয়ারদেগার! এরপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর জাতির লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ (আ) কি তোমাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়েছিল? (অর্থাৎ, দ্বীনের প্রতি আহবান করেছিল?) তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোনো নবীই আসে নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে বলবেন, তোমার দাওয়াতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে কে? তিনি বলবেন, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন, মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর উম্মতগণ। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) তখন, আমরা এ সাক্ষ্য দিব যে, "নিশ্চয়ই হযরত নূহ (আ) তাঁর উম্মতের কাছে দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন।"

এ প্রসঙ্গেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ

অর্থ : এভাবেই তো আমি তোমাদেরকে এক 'মধ্যমপন্থি উম্মত' বানিয়েছি,১ যাতে তোমরা দুনিয়ার মানুষের জন্য সাক্ষী হও।২ –সূরা বাকারা : ১৪৩

উক্ত আয়াতে وَسَطًا (মধ্যপন্থী) অর্থ হলো, ন্যায়নিষ্ঠ। কিয়ামতের দিন উম্মত (স্বীয় উচ্চমর্যাদার ভিত্তিতে) এ সত্যবাদী নবীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। উম্মতে মুহাম্মদী ﷺ এ সাক্ষ্য দেবেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে সত্যসহ নবী করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁর উপর সত্য বিধান জারি করেছেন এবং তা প্রচার করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ আদেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এ আদেশ পালনে তিনি একটুও ত্রুটি করেন নি। ধর্মীয় দিক থেকে তাদের জন্য যা কিছুই কল্যাণকর, সেগুলো তিনি তাদের কাছে সুন্দরভাবে পেশ করেছেন এবং তা পালনের জন্যে নির্দেশও দিয়েছেন। আর যে বিষয়গুলো তাদের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো থেকে তাদেরকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন এবং সাবধানও করে দিয়েছেন। সমস্ত রাসূলগণের আদর্শ এরূপ। এমনকি হযরত ঈসা (আ)-ও তাঁর নিজ জাতির লোকদেরকে "দাজ্জাল" এর ফিত্না ও আবির্ভাব সম্পর্কে অবগত করিয়েছে এবং এ ব্যাপারে সতর্কও করে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর সময়ে দাজ্জালের আগমনের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এর পরেও তাঁর গোত্রে লোকদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তিনি এরূপ করেছিলেন।

ইমাম বুখারী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু সংখ্যক লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করেন। তারপর দাজ্জালের কথা বর্ণনা করে বলেন যে, "তোমাদের (সকল)-কে আমি এর থেকে সাবধান করি নি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে এর অত্যাচার থেকে

---

১. *উম্মতে ওয়াসাত' তথা মধ্যমপন্থি বা মধ্যম মর্যাদাসম্পন্ন জাতি ও দলের অর্থ হচ্ছে– এমন একটি আদর্শ ও মর্যাদাবান দল, যারা ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও মধ্যমপন্থার অনুসারী; যাদের আচার-আচরণে বাড়াবাড়ি নেই; যারা দুনিয়ার সব জাতির মধ্যমণি বা নেতৃত্বের আসনে থাকবে; সবার সাথে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে যাদের সম্বন্ধ কায়েম থাকবে এবং কারো সাথেই অন্যায় ও অনুচিত ব্যবহার যারা করবে না।*

২. *এর অর্থ– পরকালে আমি যখন একত্রে গোটা মানবজাতির হিসাব নেব তখন আমার দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রাসূল ﷺ তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি তাঁকে যে নির্ভুল চিন্তা, সৎকাজ ও ইনসাফপূর্ণ বিধান শিক্ষা দিয়েছিলাম তা তিনি কিছুমাত্র কম-বেশি না করে সবটুকু তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এবং বাস্তবে সে অনুসারে কাজ করে তোমাদের দেখিয়েছেন। এরপর রাসূলের প্রতিনিধি হিসেবে তোমাদের সাধারণ মানুষের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে ও তোমাদের এই সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রাসূল ﷺ তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছে দিয়েছেন ও কাজ করে যা কিছু দেখিয়ে গিয়েছেন মানুষের কাছে তা তোমাদের সাধ্যমতো পৌঁছে দিতে ও কাজ করে দেখিয়ে দিতে কোনোরূপ অবজ্ঞা-অবহেলা তোমরা কর নি!*

সাবধান করেছেন। তবে আমি দাজ্জালের ব্যাপারে এমন একটি বিশেষ কথা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, যা কোনো নবী তাঁর উম্মতগণকে বলেন নি। সেটি হলো এই যে, সে দাজ্জাল এক চক্ষুবিশিষ্ট হবে। (আর সে খাদায়ী দাবি করবে)। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক চক্ষুবিশিষ্ট নন।" -বুখারী

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে একখানা হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জেনে রেখো! আমি তোমাদেরকে দাজ্জালের ব্যাপারে এমন এক তথ্য দেব, যা ইতিপূর্বে কোনো নবী তাঁর উম্মতগণকে দেন নি। সেটি হলো এই যে, দাজ্জাল এক চক্ষুবিশিষ্ট হবে। সে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ কিছু সাথে করে নিয়ে আসবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে, মূলত সেটাই হবে জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিচ্ছি, যেভাবে সাবধান করেছিলেন হযরত নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে।

এখানে "দাজ্জাল" সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে দাজ্জালের ফিতনাসহ সবকিছুই বলেছিলেন। কিন্তু এর পরেও তারা পৃথিবীর মতো পরকালে বসেও মিথ্যার আশ্রয় নেবে ও সবকিছুই অস্বীকার করবে।

যা হোক হযরত নূহ (আ)-এর বদদোয়া কবুল হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে নৌকা নির্মাণের নির্দেশ দিলেন।

কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, হযরত নূহ (আ)-কে নৌকা তৈরির আদেশের সময় এ আদেশও দিয়েছিলেন যে, "অমুক বৃক্ষটি রোপণ কর, যা দ্বারা নৌকা তৈরি করা হবে।" হযরত নূহ (আ) বৃক্ষ রোপণ করে একশ বছর অপেক্ষা করেন। তারপর তা কেটে কাঠ করে নেন। এতেও মতভেদ রয়েছে। এক বর্ণনা মতে একশ বছর, অন্য এক বর্ণনা মতে চল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহীত।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) হযরত সাওরী (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সে নৌকাটি ছিল শাল কাঠের। অপর এক বর্ণনায় আছে সে কাঠ ছিল দেবদার বৃক্ষের। আর তাওরাতের বর্ণনাও এটি।

হযরত সাওরী (রহ) বলেছেন, হযরত নূহ (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, নৌকাটির দৈর্ঘ যেন আশি গজ করা হয় এবং নৌকাটির ভেতর ও বাইরের অংশে যেন সুন্দর করে আলকাতরা লাগিয়ে দেয়া হয়। তার সামনের অংশটি যেন এত উঁচু করে বানান হয়, যাতে সেটি পানি চিরতে পারে। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী নৌকাটির দৈর্ঘ তিনশ গজ ছিল এবং প্রস্থ ছিল তিনশ গজ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নূহ (আ)-এর নির্মিত নৌকাটির দৈর্ঘ ছিল বারশ গজ এবং প্রস্থ ছিল ছয়শ গজ। আর এক বর্ণনা মতে নৌকাটির দৈর্ঘ ছিল দু' হাজার গজ এবং প্রস্থ একশ গজ। এ মত পার্থক্য শুধু (নৌকাটির দৈর্ঘ ও প্রস্থের ব্যাপারে) কিন্তু উচ্চতা সম্পর্কে সকলেই বলেন যে, নৌকাটির উচ্চতা ছিল ত্রিশ গজ। এর মধ্যে তিনটি তলা ছিল। প্রতিটি তলা দশ হাত করে। নীচতলা ছিল (গৃহপালিত) জীব-জন্তু ও বন্য জানোয়ারের জন্যে। দ্বিতীয় তলা ছিল মানুষের জন্যে। আর উপর তলা ছিল পাখিদের জন্য। তার দরজা ছিল এক প্রান্তে এবং তার উপর ঢাকনা দ্বারা আবৃত ছিল। যা দ্বারা দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হতো।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴾

অর্থ : নূহ বললেন, হে আমার রব! এরা যে আমাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিলো, এখন আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। -সূরা মুমিনুন : ২৬

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ "অবশ্যই মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে।" -সূরা মু'মিনুন : ১

অর্থাৎ, নূহ আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, আমি তাকে সাহায্য করেছি, যাতে সে সফলকাম হয়েছে। সেটা এভাবে যে, আমি তাকে মসীবত থেকে রক্ষা করার জন্য আমার তত্ত্বাবধানে নৌকা নির্মাণের আদেশ দিয়েছি। যাতে আমি তাকে সঠিকভাবে আদেশ দিতে পারি। এর দ্বারাই তাকে আমি প্লাবন থেকে রক্ষা করেছি।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ .

অর্থ : তারপর যখন আমার হুকুম এসে যাবে এবং চুলায় পানি উথলে উঠবে, তখন প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে যান। আপনার পরিবার পরিজনকে সাথে নিন, একজন ছাড়া, যার বিরুদ্ধে আগেই ফায়সালা হয়ে গেছে। আর যালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন না। তারা অবশ্যই ডুবে মরবে। –সূরা মুমিনূন : ২৭

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে এ শাস্তি আপতিত হওয়ার আগেই বলে রেখেছেন যে, যখন শাস্তি (প্লাবন) এসে যাবে, তখন তুমি তোমার সাথে করে নৌকায় সকল প্রাণী থেকে এক এক জোড়া তুলে নেবে এবং সর্ব প্রকারের খাদ্যদ্রব্যও সাথে করে নেবে। যাতে এগুলোর বংশধারা অবশিষ্ট থাকে। আর তোমার পরিবার-পরিজনদেরকেও সাথে করে তুলে নেবে। তবে যাদের সম্পর্কে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ কাফির, তাদের ব্যাপারে তুমি কোনো সুপারিশ করবে না। সে যদি তোমার পরিবার-পরিজনের মধ্যেও হয়। কাফিরের উপর শাস্তি আপতিত হওয়া অতীব প্রয়োজন। এ শাস্তি থেকে তারা (কাফিরেরা) বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে পুনরায় খুব তাকীদ করে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কাফির যালিমদের ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু বলো না, (অর্থাৎ, সুপারিশ কর না।) তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি আপতিত হবেই।

অধিকাংশ আলেমের মতে 'উনুন' দ্বারা ভূপৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের সর্বদিক থেকে পানি প্রস্রবণের ন্যায় নির্গত হতে লাগল। এমনকি যে উনুন থেকে অগ্নি উৎসারিত হয়ে থাকে, সে উনুন থেকেও সেদিন পানি উথলে উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, (কুরআনে বর্ণিত) উনুন দ্বারা হিন্দুস্থানের একটি ঝর্ণাকে বুঝানো হয়েছে। শাবী (রহ) বলেছেন, এটি কূফার একটি ঝর্ণা। কাতাদাহ (রা) বলেছেন, এ 'উনুন' হচ্ছে আরব উপত্যকার ঝর্ণা।

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) বলেছেন, এখানে উনুন দ্বারা উষার আলো বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ হে নূহ! সকালবেলা যখন আকাশ আলোকিত হয়ে যাবে, তখন তুমি নৌকায় আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তবে এ বর্ণনাটি 'গরীব'। (অর্থাৎ, এর বর্ণনাকারী একজন।)

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ .

অর্থ : তারপর যখন আমার আদেশ এল এবং ঐ চুলা ফেটে টগবগ করে উঠল,[১] তখন আমি বললাম, প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া প্রাণী নৌকায় তুলে নিন এবং আপনার পরিবারকেও (নিন)। অবশ্য তারা ছাড়া, যাদের সম্পর্কে আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।[২] যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (নৌকায় উঠিয়ে নিন)। অবশ্য খুব কম লোকই নূহের সাথে ঈমান এনেছে। –সূরা হূদ : ৪০

১. এ সম্পর্কে মুফাস্সিরীনে কেরাম বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি সেটাকেই সঠিক বলে মনে করি, যা কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়– তুফানের সূচনা একটি বিশেষ চুল্লি থেকে হয়; চুল্লির তলা থেকে পানির ফোয়ারা ফুটে পড়ে, সাথে সাথে একদিকে আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, অন্যদিকে যমীন থেকে বিভিন্ন জায়গায় পানির ঝরনা ফুটে বের হয়।

২. অর্থাৎ, তোমার বাড়ির যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফির এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না।

প্রথম আদেশ ছিল শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। আর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, প্রতিটি প্রাণী থেকে এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে লও।

আহলে কিতাবের গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে সব পশু-পক্ষী ভক্ষণ করা বৈধ, সেসব পশু-পক্ষী সাত জোড়া করে আর যেগুলো ভক্ষণ করা বৈধ নয় সেগুলো থেকে এক এক জোড়া করে উঠিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার আদেশ "এতে উঠিয়ে লও প্রত্যেক শ্রেণীর এক জোড়া" এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। আর এটা অসঙ্গতিপূর্ণ তখনই হবে, যদি আমরা একে অর্থাৎ "ইছনাইন" (জোড়া) শব্দটিকে (ক্রিয়ায়) কর্মপদ হিসেবে গণ্য করি। আর যদি "ইছনাইন" (জোড়া)-কে "যাওজাইন" (প্রতিটি শ্রেণী) শব্দের তাকীদরূপে গণ্য করি এবং (ক্রিয়ার) সরাসরি কর্মপদ সাব্যস্ত করি, তবে কোনো বিরোধ থাকে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নৌকায় সর্বপ্রথম পাখী প্রবেশ করেছিল। আর জীব-জানোয়ারের মধ্যে সবশেষে প্রবেশ করেছিল গাধা। ইবলীস এ গাধার লেজের সাথে ঝুলে নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। আরো অনেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন নূহ (আ) নৌকায় প্রত্যেক প্রাণী থেকে এক জোড়া করে উঠিয়ে নিলেন, তখন নূহ (আ)-এর সাথীরা বলল, আমাদের সাথে তো সিংহও রয়েছে। সুতরাং এর থেকে অন্যান্য প্রাণীরা কিভাবে নিরাপদে থাকবে? তখন আল্লাহ তা'আলা সিংহকে জ্বরে আক্রান্ত করে দেন (ফলে তার শক্তি কমে যায়)। এটাই ছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম জ্বরের উৎপত্তি। এরপরে নূহ (আ)-এর সাথীরা "ইদুর' সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করে বলল, এ ইদুরগুলো আমাদের আসবাবপত্র এবং খাদ্যদ্রব্যসমূহ নষ্ট করছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সিংহের অন্তরে হাঁচি দেয়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দিলেন। সে হাঁচি দিল। এতে এক বিড়াল বের হয়ে আছে। বিড়াল বের হয়ে আসার কারণে ইদুরের অনিষ্ট বন্ধ হয়ে যায়। এ হাদীসটি মুরসাল। (হাদীসের বর্ণনায় বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা সংরক্ষিত হয় নি) আল্লাহ তা'আলার বাণী—

إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ.

অর্থ : যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত [তাদের ব্যাপারে কোনো আবেদন (সুপারিশ) কর না]।

অর্থাৎ, কাফিরদের সম্পর্কে কোনো সুপারিশ কবূল হবে না। এদের মধ্যে হযরত নূহ (আ)-এর নিজ ছেলে 'ইয়াম'-ও ছিল। যে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- "যারা ঈমান এনেছে" তাদেরকে নৌকায় তুলে লও। তারপরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ "আর অল্পসংখ্যক ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি।"

হযরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল পর্যন্ত দিন রাত কষ্ট পরিশ্রম করে তাঁর জাতির লোকদেরকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে, কখনো শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে, কখনো সুসংবাদের কথা শুনিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দাওয়াত দেয়ার পরেও তাদের মধ্য থেকে মাত্র অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় কতজন ছিলেন এবং হযরত নূহ (আ)-এর সাথে নৌকায় কতজন আরোহণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত যে, তাঁরা (পুরুষ) ছিলেন আশি জন এবং তাঁদের সাথে তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন। কা'ব ইবনে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ছিলেন বাহাত্তর জন। এক বর্ণনা মতে তাঁদের সংখ্যা ছিল শুধু দশ জন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, যারা নৌকায় ছিলেন তাঁরা হলেন, হযরত নূহ (আ), তাঁর তিন পুত্র ও তাদের স্ত্রীগণ এবং ইয়ামের স্ত্রী। ইয়াম নিজে কাফিরদের সাথে নৌকার বাইরে ছিল। তবে উপরোক্ত কথাটি কুরআন মাজীদের আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে,

اِحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ .

অর্থ : প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া প্রাণী নৌকায় তুলে নিন এবং আপনার পরিবারকেও (নিন)। অবশ্যই তারা ছাড়া, যাদের সম্পর্কে আগেই বলে দেয়া হয়েছে।[১] যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও (নৌকায় উঠিয়ে নিন)।

–সূরা হুদ : ৪০

উক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে পমাণিত হয় যে, নৌকায় নূহ (আ)-এর পরিবার-পরিজন ছাড়াও অন্যান্য মু'মিনগণও ছিলেন। আর এক বর্ণনাতে তাঁরা মোট সাত জন ছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র ছিলেন হাম, সাম, ইয়াফিস ও ইয়াম।

আহলে কিতাবগণ ইয়ামকে কিনান নামে পরিচিত ছিল। এ কিনান (ইয়াম)-ই কাফিরদের সাথে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। কথিত আছে যে, এদের মা হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রী সে প্লাবনের পূর্বেই মারা গিয়েছিল। আর এক বর্ণনা মতে সে নিমজ্জিতদের সাথে ডুবে মারা গিয়েছিল। সে [নূহ (আ)-এর স্ত্রী] সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল যে দল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ .

অর্থ : যারা যুলুম করেছে তাদের পক্ষে আমার কাছে সুপারিশ করবেন না। এরা সবাই এখন ডুবে মরবে।

–সূরা হুদ : ৩৭

আহলে কিতাবদের মতে, সে নৌকার মধ্যে ছিল। যদি তাই হয়, তবে সম্ভবত সে প্লাবনের পরে কাফির হয়ে গিয়েছিল। কিংবা তাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, সেখানে বসে তার ফয়সালা হবে। কিন্তু "সে ডুবে মরেছিল" এ প্রথম বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। কারণ, হযরত নূহ (আ) দো'আ করেছিলেন যে—

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا .

অর্থ : হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্যে ছেড়ে দেবেন না। –সূরা নূহ : ২৬

তারপর নৌকায় আরোহণ করে, দোয়া পাঠ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۞

অর্থ : তারপর যখন আপনি ও আপনার সাথীগণ নৌকায় সওয়ার হয়ে যাবেন, তখন বলবেন সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যালিম কওম থেকে নাজাত দিয়েছেন। আরো বলুন, হে আমার রব! আমাকে বরকতময় জায়গায় নামিয়ে দিন এবং আপনিই নামার জন্য ভালো জায়গা দিতে পারেন। –সূরা মুমিনূন : ২৮–২৯

এ আয়াতে হযরত নূহ (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করার জন্যে আছে দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা নৌকাকে হযরত নূহ (আ)-এর অনুগত করে দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাঁকে (মহা প্লাবন থেকে) রক্ষা করেছেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর ও তাঁর অত্যাচারী ও অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে কঠোর আযাব প্রদান করে তাঁর প্রাণকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

১. অর্থাৎ, তোমার বাড়ির যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কাফির এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দয়া পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদেরকে নৌকায় ওঠাবে না।

وَالَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۞ لِتَسْتَوُوْا عَلَى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۞ وَإِنَّآ إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۞

অর্থ : যিনি সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য নৌকা-জাহাজ ও পশু তৈরি করেছেন, যার উপর তোমরা সওয়ার হয়ে থাক, যাতে তোমরা যখন তাদের পিঠে চড়ে বেড়াও তখন তোমাদের রবের নিয়ামতের কথা স্মরণ কর এবং এ দোয়া কর, পাক-পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্য এ জিনিসগুলোকে অনুগত করে দিয়েছেন। তা না হলে এ সবকে আয়ত্তে আনার সাধ্য আমাদের ছিল না। একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের দিকেই ফিরে যেতে হবে। –সূরা যুখরুফ : ১২–১৪

এরূপে সকল কাজের শুরুতে দো'আ করার এবং আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম নেয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে। যাতে সে কাজে মঙ্গল ও বরকত হয় এবং সেটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ দো'আ করতে বলেছিলেন—

وَقُلْ رَّبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا .

অর্থ : এবং দোআ করুন, হে আমার রব! আমাকে যেখানেই নিয়ে যাও, সত্যতার সাথেই নিয়ে যাও এবং যেখান থেকে বের কর সত্যতার সাথেই বের কর। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে এমন কোনো শক্তি দান কর, যে আমার সাহায্যকারী হবে।[১] –সূরা বানী ইসরাঈল : ৮০

হযরত নূহ (আ)-কেও এভাবে দো'আ করার জন্য বলা হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ۚ إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থ : নূহ বললেন, এর মধ্যে উঠে পড়। আল্লাহর নামেই এর চলা ও থামা। আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। –সূরা হূদ : ৪১

এখানে দো'আ করার জন্যে তাকীদ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ হলো এই যে, এ চলার শুরুও আল্লাহর নামে এবং সফরের শেষও আল্লাহর নামে। আমার রব আমাদের (মুমিনদের) উপর অত্যন্ত মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। আর তিনি (আল্লাহ) অবাধ্য সম্প্রদায় থেকে তাঁর শাস্তি সরিয়ে নেন না বরং তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

তিনি (আল্লাহ) ঐ কাফিরদের থেকে শাস্তি রহিত করেন না, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করেছে।

তুফানের মধ্যে নৌকা চলা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ...

অর্থ : নৌকা তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং এক একটি ঢেউ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আসছিল। –সূরা হূদ : ৪২

আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে এত মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন যে, পৃথিবীতে এর পূর্বে এ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ কখনো দেখা যায় নি আর পরেও দেখা যাবে না। বৃষ্টির পানি এমন অবিরাম ধারায় পড়েছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন, আকাশ মশকের মুখে ঢালা হচ্ছে। অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ভূমিও সর্বদিক থেকে পানির ফোয়ারা উৎসারণ করেছিল।

---

১. *অর্থাৎ, হয় আমাকে ক্ষমতা দাও, নতুবা কোনো রাষ্ট্রশক্তিকে আমার সাহায্যকারী করে দাও, যেন আমি সেই শক্তির সাহায্যে দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদকে সংশোধন করতে পারি, পাপ ও ব্যভিচারের এ বন্যাকে রোধ করতে পারি এবং তোমার ইনসাফের আইনকে জারি করতে পারি।*

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

نَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۞ فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۞ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُیُوْنًا فَالْتَقَی الْمَآءُ عَلٰٓی اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰی ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۞ تَجْرِیْ بِاَعْیُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۞

অর্থ : তখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, আমি তো অপারগ হয়ে পড়েছি। তাই তুমিই এদের উপর প্রতিশোধ নাও। তারপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি দিয়ে আসমানের দরজাগুলো খুলে দিলাম। এবং যমীনকে ফাটিয়ে দিয়ে ঝরনায় পরিণত করলাম। আর এসব পানি ঐ কাজটি পুরা করার জন্য একত্র হয়ে গেল, যা (আগেই) ঠিক করে রাখা হয়েছিল। আর নূহকে আমি কাঠ ও পেরেক দিয়ে তৈরি বস্তুর উপর সওয়ার করে দিলাম।[১] নৌকাটি আমার দেখাশোনার মধ্যেই ভেসে চলছিল। যাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল, (সে নূহের) খাতিরে এটা ওদের উপর বদলা নেওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছিল। –সূরা কামার : ১০–১৪

অর্থাৎ নৌকা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে ভ্রমণ করছিল। এ কারণে তাঁরা নিরাপদে ও শান্তিতে ছিল।

ইবনে জারীর (রহ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, কিবতী (মিশরের খৃষ্টানদের একটি দল) এর হিসাব অনুযায়ী মাসের তের তারিখ এই মহাপ্লাবন শুরু হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِی الْجَارِیَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِیَهَآ اُذُنٌ وَّاعِیَةٌ ۞

অর্থ : যখন পানির বন্যা সীমা পার হয়ে গিয়েছিল,[২] তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় চড়িয়ে দিয়েছিলাম।[৩] যাতে এ ঘটনাকে তোমাদের জন্যে আমি উপদেশপূর্ণ বানাতে পারি এবং মনে রাখার যোগ্য কান এটাকে হেফাযত করতে পারে। –সূরা হা-ক্কাহ : ১১–১২

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেন যে, বন্যার পানি পর্বতের চূড়ায় এবং ভূপৃষ্ঠের ১৫ গজ উঁচু পর্যন্ত উঠেছিল। আহলে কিতাবদের অভিমতও এটি। এক বর্ণনা মতে, পানি ভূপৃষ্ঠের উপর ৮০ গজ উঁচু পর্যন্ত হয়েছিল। এ বন্যা গোটা পৃথিবী ও পাহাড় পর্বত প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। ভূপৃষ্ঠে ছোট বড় এমন কোনো প্রাণী বাকি ছিল না, যারা এ দৃশ্য অবলোকন করে নি। ইমাম মালেক (রহ) যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় (প্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) সকল মানুষ নিরাপদ জায়গায় এবং পাহাড়-পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেছেন যে, (প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য) বসবাসের সমস্ত নিরাপদ জায়গাসমূহ মানুষে ভরপুর হয়ে গিয়েছিল। কোনো জায়গা-ই খালি ছিল না। ইবনে আবু হাতিম এ দুটি বর্ণনা করেছেন। প্লাবনের মধ্যে হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে কিনানও ছিল।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

وَنَادٰی نُوْحُ ِ ابْنَهٗ وَكَانَ فِیْ مَعْزِلٍ یّٰبُنَیَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِیْنَ ۞ قَالَ سَاٰوِیْٓ اِلٰی جَبَلٍ یَّعْصِمُنِیْ مِنَ الْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَیْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِیْنَ ۞

---

১. অর্থাৎ তুফান আসার আগেই আল্লাহ তা'আলার হুকুমে হযরত নূহ (আ) যে নৌকা তৈরি করেছিলেন।
২. এখানে নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
৩. যদিও ঐ সব লোককেই নৌকায় চড়ানো হয়েছিল, যারা হাজার হাজার বছর আগে ছিল, তবুও যেহেতু মানববংশ ঐ লোকদেরই সন্তান, সেহেতু বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে নৌকায় চড়ানো হয়েছিল।

অর্থ : নূহের ছেলে আলাদা জায়গায় ছিল। নূহ তার ছেলেকে ডেকে বললেন, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে উঠে এস, কাফিরদের সাথে থেকো না। সে জবাবে বলল, এখনি আমি এক পাহাড়ে চড়ে যাব, যা আমাকে পানি থেকে বাঁচিয়ে দেবে। নূহ বললেন, আল্লাহ কারো উপর রহম করলে আলাদা কথা। তা-না-হলে আজ আল্লাহর হুকুম থেকে বাঁচানোর মতো কোনো জিনিস নেই। এর মধ্যে এক ঢেউ এসে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল এবং সে ডুবন্তদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল। –সূরা হূদ : ৪২-৪৩

পানিতে নিমজ্জিত পুত্রটি ছিল ইয়াম। যে ছিল হাম, সাম ও ইয়াফিসের ভাই। ইয়ামের আর এক নাম ছিল কিনান। সে (কিনান) কাফির ও মহাপাপী ছিল। সুতরাং সে তার পিতার দ্বীন ও শরীঅতের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে সে নিমজ্জিতদের সাথে নিমজ্জিত হয়েছিল অন্যদিকে তার পিতার আত্মীয় নন, এমন অনেক লোকেরাও এ প্লাবন থেকে নিরাপদে ছিলেন। কারণ, এ লোকগুলো দ্বীন ও ধর্মের দিক দিয়ে তার পিতার সমর্থক ছিল।

এরপর বলা হলো, (অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা বললেন)–

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

অর্থ : হুকুম হলো, হে যমীন! তোমার সকল পানি গিলে ফেল। হে আসমান! থেমে যাও। সুতরাং পানি মাটিতে বসে গেল এবং ফয়সালা হয়ে গেল। নৌকা জুদি[১] পাহাড়ে এসে ভিড়ল এবং বলা হলো, যালিমদের কওম দূর হয়ে গেল। –সূরাহ হূদ : ৪৪

অর্থাৎ, যখন পৃথিবী আল্লাহর শত্রুমুক্ত হয়ে গেল এবং ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করার লোক অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ পৃথিবীকে পানি গ্রাস করার এবং আকাশকে ক্ষান্ত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পানি কমে গেল এবং অবিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর পরিকল্পিত শাস্তি পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর কুদরতী ভাষায় তাদেরকে লা'নত দেয়া হলো যে, তোমাদেরকে (আল্লাহর) দয়া ও ক্ষমা থেকে অনেক দূরে রাখা হলো।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ .

অর্থ : কিন্তু তারা মানতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার সাথীদেরকে একটি নৌকায় রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করল, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। অবশ্যই তারা অন্ধ লোক ছিল। –সূরা আ'রাফ : ৬৪

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ .

অর্থ : তারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করল। এর ফলে আমি তাঁকে ও তাঁর সাথে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানালাম। আর যারা আমার আয়াতকে মানতে অস্বীকার করেছিল, তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। এখন দেখ, যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল (তবু যারা মেনে নিল না) তাদের কী দশা হয়েছে। –সূরা ইউনুস : ৭৩

১. 'জুদী' পর্বত কুর্দিস্তানের ইবনে ওমর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে এবং আজো তা এই জুদী নামেই পরিচিত।

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ : নূহকে আমি ঐ কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম, যে কওম আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত মন্দ লোক ছিল। তাই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। –সূরাহ আম্বিয়া : ৭৭

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۞ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۞ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

অর্থ : অবশেষে আমি তাকে ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে একটি জাহাজে তুলে বাঁচিয়ে দিলাম। এরপর বাকি লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান। –সূরাহ শু'আরা : ১১৯-১২২

সূরা আনকাবুতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَاۤ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : তারপর আমি নূহকে এবং নৌকার আরোহীদেরকে রক্ষা করলাম এবং (ঐ নৌকাটিকে) আমি দুনিয়াবাসীদের জন্যে একটি শিক্ষামূলক নিদর্শন বানিয়ে রাখলাম।[১] –সূরা আনকাবুত : ১৫

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ. "তারপর অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।" –সূরা শু'আরা : ৬৬

সূরা ক্বামারে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

অর্থ : ঐ নৌকাটিকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। (এ থেকে) উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে? (দেখে নাও.) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল। আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?[২] –সূরা কামার : ১৫-১৭

সূরা নূহে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۞ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞

---

১. অর্থাৎ, সেই নৌকাকে অথবা নূহ (আ)-এর কওমের আযাবের এ ঘটনাকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে নিদর্শন বানানো হয়েছে।

২. অর্থাৎ, অবাধ্য জাতিদের উপর আল্লাহর যে শিক্ষণীয় আযাব নাযিল হয়েছে, তা তো উপদেশ দেওয়ার একটা ধরন, যা বড়ই কঠিন। কিন্তু উপদেশের আরেকটি ধরন হচ্ছে এ কুরআন, যা যুক্তি-প্রমাণ, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তোমাদেরকে সোজা-সরল পথ দেখাচ্ছে। প্রথম ধরনের তুলনায় দ্বিতীয়টা খুবই সহজ। তবে কেন তোমরা এর থেকে উপকার গ্রহণ না করে আল্লাহর আযাব দেখার জন্য জিদ ধরে আছ।

অর্থ : তাদের নিজেদের দোষের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তারপর তারা নিজেদেরকে আল্লাহ থেকে বাঁচানোর জন্য কোনো সাহায্যকারী পায় নি। নূহ বললেন, হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন, তাহলে তারা আপনার বান্দাহদেরকে গুমরাহ করবে। আর এদের বংশে যারাই জন্ম নেবে তারা পাপী ও কট্টর কাফিরই হবে। –সূরা নূহ : ২৫–২৭

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর দো'আ কবুল করলেন। কোনো কাফির আর বেঁচে রইল না পৃথিবীতে। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই।

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, নূহ (আ) তাঁর গোত্রে লোকদের মাঝে (পঞ্চাশ কম) এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন এবং বৃক্ষ রোপণ করে তা বড় হওয়ার জন্য একশ বছর অপেক্ষা করেন। সে বৃক্ষ বড় হওয়ার পরে সেটি কেটে তা দিয়ে নৌকা তৈরি করেন। এ (নৌকা তৈরি করার) সময় কাফিরেরা তাঁর নিকট দিয়ে গমনকালে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাঁকে বলত, তুমি তো শুষ্ক ভূমিতে নৌকা নির্মাণ করছ। অর্থাৎ, তুমি কি শুষ্ক ভূমিতে নৌকা চালাবে? এটা কিভাবে চলবে? হযরত নূহ (আ) উত্তরে বলতেন, অতি শীঘ্রই তোমরা এ বিষয়টি জানতে পারবে। নূহ (আ)-এর নৌকা তৈরির কাজ যখন শেষ হয়ে গেল এবং পানি উৎসারিত হলো ও অবিশ্বাসীরা পানিতে নিমজ্জিত হচ্ছিল, তখন এক শিশুর মা তার নিজ শিশু সন্তানের নিমজ্জিত হয়ে মারা যাওয়ার খুব আশঙ্কা বোধ করছিল। সে (মা) তার শিশুটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এই মা তার শিশু সন্তানটিকে সাথে নিয়ে এক পাহাড়ে যায় এবং পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উঁচুতে গিয়ে উঠে। পানি যখন সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছল তখন মা শিশুটিকে নিয়ে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে গেল। কিন্তু পানি পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে গেলে মা সন্তানের মায়ায় ব্যাকুল হয়ে শিশু সন্তানটিকে দু' হাতে করে উপরে তুলে ধরে। (অর্থাৎ, মাথার উপরে উঠিয়ে নেয়) কিন্তু এতেও তারা রক্ষা পায় নি। তারা দু' জনই (মা ও শিশু) ডুবে যায়। আল্লাহ যদি সেই অবিশ্বাসীদের মধ্যে কারও প্রতি দয়া করতেন, তবে এ শিশুটির মায়ের প্রতিই দয়া করতেন। এ হাদীসটি গরীব। (অর্থাৎ, বর্ণনাকারী একজন।)

হযরত কাব আহবার, মুজাহিদ এবং আরো কয়েকজন থেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার ব্যাপারেও কথা আছে। (অর্থাৎ, এর বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে।)

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে কাফিরদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখেননি। সুতরাং মুফাসসিরগণের এ অভিমত কিরূপে সঠিক হতে পারে যে, আউজ ইবনে উনুক অন্য এক বর্ণনা মতে ইবনে আনাক, হযরত নূহ (আ)-এর পূর্ব থেকে হযরত মূসা (আ)-এর যমানা পর্যন্ত বেঁচেছিল এবং তারা ছিল কাফির, বিদ্রোহী ও অহঙ্কারী। এমনকি মুফাসসিরগণ আরো বলেছেন যে, তার মা আদম-এর কন্যা ছিল। অবৈধ পন্থায় ব্যভিচারের মাধ্যমে তার জন্ম হয়েছিল। তার দেহের উচ্চতা এত লম্বা ছিল যে, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরে এনে সূর্যের তাপে তা ভুনা করতো। নূহ (আ) যখন নৌকায় ছিলেন, তখন সে তাঁকে উপহাস করে বলত, এটি (নৌকাটি তোমার কেমন পাত্র? কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, তার দেহের উচ্চতা ছিল তিন হাজার তিনশ পয়ত্রিশ গজ। এরূপ অযৌক্তিক ও অবাস্তব ঘটনার কথা বিভিন্ন তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত আছে বলে আমরা এগুলো আলোচনা করেছি। অন্যথায় এ ধরনের অযৌক্তিক ঘটনা আমরা আলোচনা করতাম না। একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র কাফির হওয়ার কারণে ধ্বংস হবে। অথচ তার সম্মানিত পিতা হলেন উম্মতের নবী ও মু'মিনগণের নেতা। আর আওজ ইবনে আনাক যথা আনাক অত্যাচারী, বিদ্রোহী ও অবিশ্বাসী হওয়াতেও নিরাপদে থাকবে তা কখনই সম্ভব নয়। আল্লাহ তাদের মধ্য হতে কোনো শিশু ও শিশুর মাকে পর্যন্ত যেখানে রক্ষা করেন নি। আর সেখানে সেই অহঙ্কারী-পাপী ও অবাধ্য শয়তানকে তিনি ছেড়ে দেবেন, এটা হতে পারে না। এটা অযৌক্তিক ও বাস্তব কথা।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, . وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

অর্থ : নূহ বললেন, হে আমার রব! এ কাফিরদের একজনকেও দুনিয়ায় থাকার জন্য ছেড়ে দেবেন না। –সূরা নূহ : ২৬

উনুকের দেহের উচ্চতা প্রসঙ্গে আলেমগণ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত হাদীসের পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত উচ্চতা করে সৃষ্টি করেছেন। এর পর থেকে সে উচ্চতা কমতে কমতে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছে। এটি এমন একজন সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও নিষ্পাপ ব্যক্তির কথা যিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না; বরং তাঁর প্রতি যা কিছু ওহী হয় কেবল সেটাই বলেন। সে সত্যবাদী ও নিষ্পাপ ব্যক্তি বলেন যে, "মানুষের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে আসছে" অর্থাৎ, তাঁর এ কথা বলা পর্যন্ত এভাবে হ্রাস পেতে পেতে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই হ্রাস পেতে থাকবে। সুতরাং উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ তাঁর চেয়ে অধিক দীর্ঘ (লম্বা) হতে পারে না।

এমতাবস্থায় এ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির তথ্য বর্জন করে আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কাফির ও মিথ্যাবাদী তাদের কথাকে কিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে, যারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন করেছে এবং তার অপব্যাখ্যা করেছে? আল্লাহর কিতাবের সাথেই যাদের এ আচরণ, তাদের কথাগুলো কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? তারা বিশ্বাসঘাতক ও মিথ্যাবাদী। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ বর্ষণ হতে থাকবে। আমার ধারণা এই যে, এ আওজ ইবনে আনাক সম্পর্কে কিছু সংখ্যক খোদাদ্রোহী ও পাপাচারী লোকদের মনগড়া উক্তি। যারা প্রথমত থেকেই নবী রাসূলগণের শত্রু ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত।

নিজ পুত্র সম্পর্কে নূহ (আ)-এর আল্লাহর কাছে আবেদন

হযরত নূহ (আ) তাঁর নিজ পুত্রের গুনাহ মাফ ও মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এভাবে আরয করেছিলেন যে, হে আমার রব! আপনি আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজনকে (মসীবত থেকে) রক্ষা করার ওয়াদা করেছেন। আর এ পুত্রটিও তো আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অথচ সে তো এখন ডুবে যাচ্ছে। এখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে, এ ছেলেটি কি আমার পরিবারভুক্ত, না আমার থেকে বিচ্ছিন্ন? (এজন্যই আমি এই আরয করেছি।) উত্তরে বলা হলো, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। অর্থাৎ, যাদেরকে রক্ষার জন্য আমি অঙ্গীকার করেছি, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, তোমার পরিবার পরিজনকে (নৌকায় তুলে লও) কিন্তু তাকে নয় যার ব্যাপারে পূর্বেই আমার শাস্তির ফয়সালা হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, কাফির) সুতরাং তোমার পুত্র কিনান তোমার পরিবারভুক্ত নয়। তার ব্যাপারে পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে, সে নিমজ্জিত হবে এবং কুফরীর স্বাদ উপভোগ করবে। কারণ, ভাগ্য তাকে মু'মিনদের দল থেকে সরিয়ে কাফিরদের দলভুক্ত করেছে। ফলে তাদের সাথে সে নিমজ্জিত গিয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ط وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

অর্থ : হুকুম হলো, হে নূহ! (নৌকা থেকে) নেমে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ও যেসব লোক আপনার সাথে রয়েছে, তাদের উপর শান্তি ও বরকত রইল। আর কতক লোক এমনো রয়েছে, যাদের আমি কিছুদিন জীবিকা দান করব। এরপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছবে। –সূরা হূদ : ৪৮

যখন ভূপৃষ্ঠের পানি কমে গেল এবং তা (ভূপৃষ্ঠ) চলাফেরা ও বসবাসের উপযোগী হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, "নৌকা থেকে (ভূপৃষ্ঠে) অবতরণ কর।" দীর্ঘ সফরের পর নৌকাটি "জূদী" পাহাড়ের উপর এসে থেমে যায়। এটি আরব উপদ্বীপের একটি বিখ্যাত পাহাড়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী "হে নবী! নীচে অবতরণ কর আমার প্রদত্ত শান্তিসহ" অর্থাৎ, তোমার উপর ও তোমার পরে তোমার বংশধরদের থেকে যেসব উম্মত আসবে সকলের প্রতিই শান্তি। এখানে নূহ (আ)-এর

বংশধর বলার কারণ, পৃথিবীর সমস্ত লোকই হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর। (তাই বলা হয়েছে যে, পরবর্তীকালেও নূহ (আ)-এর বংশের মধ্যে যারাই ঈমানদার হবে তাদের প্রতি শান্তি।)

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ .

অর্থ : তার [নূহ (আ)-এর] বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায়। -সূরা সাফফাত : ৭৭

অতএব, আজ পৃথিবীতে যত মানুষই আছে, তারা সকলেই হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও ইয়াফিসের কারও না কারও সন্তান।

হযরত সামরাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সাম আরবের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়ার আদি পিতা এবং ইয়াফিস রোমের আদি পিতা। অর্থাৎ, এ দেশসমূহে অবস্থানরত মানুষদের আদি পিতা।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমরান বলেন যে, রোম দ্বারা এখানে প্রথম রোম বুঝানো হয়েছে। যারা ইউনানী অর্থাৎ, গ্রিক জাতি। এদের বংশ তালিকা নিম্নরূপ—

রোমী ইবনে সাবতী ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফিস ইবনে নূহ (আ)।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। সাম, ইয়াফিস ও হাম। পৃথিবীর অবশিষ্ট সকল মানুষের জন্ম এই তিনজন থেকেই। সামের সন্তানগণ হচ্ছে আরব, ইরান (পারস্য) ও রোম দেশীয় লোকেরা। ইয়াফিসের সন্তানগণ হচ্ছে সাকালিবা ও ইয়াজূজ মাজূজ। আর হামের সন্তাগণ হলো কিবতী (প্রবীণ মিশরী জাতি, যারা ফিরআউনের সঙ্গী ছিল।) সুদানী এবং তাতারীগণ।

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নূহ (আ)-এর তিনটি সন্তান ছিল। যাদের নাম হলো সাম, হাম ও ইয়াফিস। সামের থেকে আরব, ইরান (পারস্য) ও রোম দেশীয় লোকেরা জন্মগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ছিল কল্যাণ নিহিত ছিল। ইয়াফিস থেকে ইয়াজূজ মাজূজ, তুর্ক ও সাকালিবাদের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কোনই সঙ্গী নিহিত ছিল না। আর হাম থেকে কিবতী, তাতারী ও সুদানী লোকদের জন্ম হয়।

অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত নূহ (আ)-এর এ তিন পুত্রের জন্ম নূহ (আ)-এর প্লাবনের পরেই হয়েছিল। আর কিনানের জন্ম হয়েছিল প্লাবনের পূর্বে। প্লাবনের সময় কিনান নিমজ্জিত হয়ে যায়। আবের নামে নূহ (আ)-এর আর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সে কিনানের পূর্বেই মারা গিয়েছিল।

বিশুদ্ধ মত হলো এই যে, নূহ (আ)-এর তিন পুত্র তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিসহ নৌকার মধ্যে ছিলেন।

তাওরাত কিতাবেও এ কথাটি উল্লেখ আছে। আরো বর্ণিত আছে যে, হাম নৌকায় অবস্থানকালে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন। এ ঘটনায় নূহ (আ) তার জন্য বদদোয়া করেন, যেন তার সন্তানের আকৃতি কুৎসিত হয়। তার সে সহবাসে একটি কালো, কুৎসিত সন্তানের জন্ম হয়। সে সুদানীদের আদি পিতা। তার নামও ছিল কিন্আন ইবনে হাম ইবনে নূহ (আ)। আর এভাবেও একটি বর্ণনা আছে যে, হাম তার পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর সতরের কিছু অংশ অনাবৃত দেখেও তা আবৃত করে দেন নি; কিন্তু অন্য দু' ভাই তাদের পিতাকে এ অবস্থায় দেখে তাঁর অনাবৃত সতরের অংশটুকু আবৃত করে দেন। হযরত নূহ (আ) এতে হামের জন্য বদদোয়া করেন যে, তার সন্তানদের মধ্যে যেন পরিবর্তন ঘটে এবং তার সন্তানরা যেন তার দু-ভাইয়ের দাস হয়ে থাকে। অতঃপর হামের সন্তান থেকেই সুদানী বংশের উদ্ভব হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে, বর্ণিত তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ তাঁকে বললেন, কতইনা উত্তম হতো, যদি আপনি এমন এক ব্যক্তিকে জীবিত করে দিতেন, যিনি নূহ (আ)-এর নৌকার বিস্তারিত ঘটনা আমাদেরকে বলে দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তারপর হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে নিয়ে মাটির একটি টিলার কাছে চলে যান এবং সে ডিবি (স্তূপ) থেকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে অনুসারীদেরকে বলেন, তোমরা কি জান, এ মাটি কার? তাঁরা জবাব দিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে সঠিক অবগত। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, এ মাটি হচ্ছে নূহ (আ) এর পুত্র হামের পায়ের গিঠ! বর্ণনাকারী হযরত আব্বাস (রা) বললেন, অতঃপর হযরত ঈসা (আ)

সেই মাটির স্তূপের উপর তাঁর নিজ হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করে বললেন, "আল্লাহর নির্দেশে দাঁড়িয়ে যাও" সাথে সাথে তিনি (হাম) তার মাথার সাদাচুল থেকে মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে যান। হযরত ঈসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ (সাদাচুল) অবস্থায়ই মারা গিয়েছিলেন? তিনি জবাব দিলেন যে, না আমি যুবক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছি। কিন্তু আমি মনে করেছিলাম যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। কিয়ামতের ভয়ে আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি। তারপর হযরত ঈসা (আ) তাঁকে বললেন, আমাদেরকে হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা সম্পর্কে কিছু অবগত করুন। তিনি বললেন, হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা লম্বায় ছিল বারশত গজ এবং পাশে ছিল ছয়শ গজ। এতে তিনটি তলা ছিল। প্রথম তলায় ছিল মানুষ। আর সর্বশেষ তলায় ছিল, পাখ-পাখালী।

নৌকাটিতে যখন জীব-জন্তুদের মল ইত্যাদি বেশি জমা হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, "তুমি হাতির লেজটি স্পর্শ কর"। এর ফলে হাতি থেকে একটি শূকর ও একটি শূকরী জন্ম হয়। তারা সাথে সাথে জীব-জন্তুর ময়লাগুলো খেতে আরম্ভ করে। ইঁদুরগুলো যখন নৌকার কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, "তুমি সিংহের নাকের উপর আঘাত কর। নূহ (আ) ওহী মোতাবেক সিংহের আঘাত করলেন, সিংহের নাক হতে একটি বিড়াল ও একটি বিড়ালী বেরিয়ে আসে। তারা সাথে সাথে ইঁদুরগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হযরত ঈসা (আ) তাঁকে আরয করলেন যে, হযরত নূহ (আ) কিভাবে জানতে পারলেন যে, গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়ে গেছে? হাম জবাব দিলেন যে, হযরত নূহ (আ) পৃথিবীর অবস্থা জানার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেছিলেন। কাকটি একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। [নূহ (আ) তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে কথা সে ভুলে যায়।] এতে হযরত নূহ (আ) কাকটির জন্য বদদো'আ করেন যে, সে (কাকটি) যেন সর্বদা ভয়-ভীতির মধ্যে থাকে। এ কারণেই কাক মানুষের ভয়ে, কোনো ঘর-বাড়ীতে বাসা বাঁধে না। (হাম বলেন) এরপর হযরত নূহ (আ) কবুতরকে অবস্থা জানার জন্য পাঠান। কবুতর তার ঠোঁটে করে যয়তুন বৃক্ষের একটি পাতা এবং নিজ পায়ে করে কিছু কাদামাটি নিয়ে ফিরে আসে। হযরত নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, সমস্ত শহর প্লাবিত হয়ে গেছে। তখন হযরত নূহ (আ) কবুতরের গলায় একখানা সবুজ হার পরিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোআ করলেন, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরাপদে ও আদরের সাথে থাকে।

বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি? আমাদের ঘরে বসে এর সাথে আরো কথাবার্তা বলতাম। হযরত ঈসা (আ) (তাদের আবেদন কবুল না করে) হামকে বললেন, আপনি আল্লাহর নির্দেশে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান। সাথে সাথে তিনি (হাম) মাটি হয়ে গেলেন। আলবা ইবনে আহমদ, ইকরিমা (রা) থেকে এবং তিনি (ইকরিমা) হযরত আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় আশি জন লোক ছিলেন এবং প্রত্যেকের সাথে তাঁদের পরিবারের লোকজনও ছিলেন। তাঁরা নৌকায় তাঁরা প্রায় একশ পঁচিশ দিন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নৌকার রোখ (গতি) মক্কা শরীফের দিকে ফিরিয়ে দেন। এরপর এর রোখ (গতি) জূদী পাহাড়ের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সেখানে পৌঁছে নৌকা থেমে যায়। তারপর হযরত নূহ (আ) ভূপৃষ্ঠের খবর জানার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কাক একটি মৃতদেহ দেখে তার উপর দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ফিরে যেতে দেরি করে। এ বিলম্বের কারণে হযরত নূহ (আ) কবুতরকে প্রেরণ করেন। কবুতর পায়ে কাদা মাখা অবস্থায় যয়তুন বৃক্ষের একটি পাতা নিয়ে নূহ (আ)-এর কাছে চলে আসে। এতে হযরত নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি সরে গিয়েছে। তারপর হযরত নূহ (আ) জূদী পাহাড় থেকে ভূপৃষ্ঠে আগমন করে একটি জনপদ গড়ে তোলেন এবং সে জনপদের নাম রাখেন "ছামানীন" (আশিটি)। অর্থাৎ আশি জন মানুষের জনপদ। এ সময় হঠাৎ একদিন সকাল বেলা তাদের সকলের মুখের ভাষা পরিবর্তন হয়ে আশিটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ভাষা ছিল আরবী। কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারত না। হযরত নূহ (আ) প্রত্যেকের ভাষা অন্যকে বুঝিয়ে দিতেন।

হযরত কাতাদাহ (রহ) প্রমুখ বলেছেন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের এ বিশ্বাসী দলটি রজব মাসের দশ তারিখে নৌকায় আরোহণ করে একশ বিশ দিন তাতে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁরা একমাস জূদী পাহাড়ের উপর অবস্থান করেন। তারপর পবিত্র মুহাররম মাসের দশ তারিখে তাঁরা নৌকা থেকে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে আসেন।

ইবনে জারীর (রহ)-এর এক মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ দিনে তাঁরা মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পাওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় ইয়াহুদীদের নিকট দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা (ইয়াহুদীরা) আশুরার রোযা রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিসের রোযা রাখছ? তারা বলল, এদিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে হেফাযত করেন এবং ফিরাআউনকে নিমজ্জিত করেন। এ দিনে নূহ (আ)-এর নৌকা জূদী পাহাড়ে গিয়ে থেমে যায়। এ কারণে হযরত মূসা (আ) ও হযরত নূহ (আ) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মূসা (আ)-এর মহব্বতে রোযা রাখার ব্যাপারে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা সোবহে সাদেকের পরে কিছুই আহার কর নি, তারা রোযার নিয়ত করে নেবে। আর যারা (সোবহে সাদেকের পর) কিছু আহার করেছ, তারা যেন দিনের বাকি সময়টুকু (অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত) কিছু পানাহার না করে।

কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকেরা বলে থাকে যে, সেদিন তাদের কাছে গমের দানাসহ যেসব শস্যাদি বাকি ছিল, সেগুলো পিষে তাঁরা খেয়েছিলেন এবং নৌকার মধ্যে কিছুদিন অন্ধকারে থাকার পরে, বাইরে এসে সবকিছু যাতে স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন সেজন্য চোখে সুরমা করেছিলেন। এসব কথা আদৌ ঠিক নয়। বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণিত এ কথাগুলোকে বিশ্বাস করা যায় না এবং এগুলোর অনুসরণও করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন প্লাবন বন্ধ করে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন পৃথিবীতে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করলেন। যাতে পানির প্রবাহ থেমে যায় এবং ঝরনাগুলো থেকে পানি উৎসারণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানি কমতে কমতে ভূপৃষ্ঠ শুকিয়ে গেল। তাওরাত কিতাবধারীদের মতে, নূহ (আ)-এর নৌকা জূদী পাহাড়ের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর, হযরত নূহ (আ) নৌকার জানালা খোলেন এবং ভূপৃষ্ঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কাক পাঠালেন। কিন্তু কাকটি বাইরে এসে একটি লাশ দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা খেতে আরম্ভ করে। এ কারণে কাকটি ফিরে আসতে বিলম্ব করল। কাকটির ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়াতে নূহ (আ) একটি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসল। সেটি ভূপৃষ্ঠের কোথায় বসেছে, তার পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তার কিছু আলামত দেখতে পাওয়া যায় নি; যাতে বুঝা গেল যে, ভূপৃষ্ঠের পানি এখনো সরে নি। নূহ (আ) জানালা থেকে হাত পেতে কবুতরটিকে ধরে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করান। এরপর সাতদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নূহ (আ) কবুতরটি দ্বিতীয়বার ভূপৃষ্ঠের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠালেন। কবুতরটি এবার গিয়ে ফিরে আসতে অনেক দেরি করে ফেলল। সন্ধ্যার সময় মুখে যয়তুন বৃক্ষের একটি পাতা নিয়ে ফিরে আসল। এতে হযরত নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে এখন পানি সরে গেছে। এর সাতদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর নূহ (আ) আবার কবুতরটিকে প্রেরণ করলেন। এবার কবুতরটি আর ফিরে আসল না। এতে তিনি অনুধাবন করলেন যে, পানি সম্পূর্ণভাবে সরে গিয়ে ভূমি প্রকাশ পেয়েছে এবং জঙ্গলসমূহও প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে কবুতরটি হয়তো কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। মোটকথা প্লাবনের প্রারম্ভ থেকে এই কবুতর প্রেরণের মাঝে যখন একটি বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরের দ্বিতীয় তারিখ আরম্ভ হলো, তখন ভূপৃষ্ঠ ও জঙ্গলসমূহও প্রকাশ পেল। এ সবকিছু প্রকাশের পরেই হযরত নূহ (আ) তাঁর নৌকার ঢাকনা খুলে ফেললেন।

ইবনে ইসহাক (রা) বলেছেন, পরবর্তী বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তারিখে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে এ নির্দেশ দেন যে—

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۭ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থ : হুকুম হলো, হে নূহ! (নৌকা থেকে) নেমে যান। আমার পক্ষ থেকে আপনার উপর ও যেসব লোক আপনার সাথে রয়েছে তাদের উপর শান্তি ও বরকত রইল। আর কতক লোক এমনো রয়েছে, যাদের আমি কিছুদিন জীবিকা দান করব। এরপর তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছবে। -সূরা হূদ : ৪৮

আহলে কিতাবগণ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর সাথে কথা বলেন এবং এ আদেশ দেন যে, এখন তুমি তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্রগণ ও তাদের স্ত্রীগণ এবং সকল জীব জানোয়ারসহ নৌকা থেকে ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়, যাতে বংশবৃদ্ধি পায় এবং পৃথিবীতে মানুষের বসতি বৃদ্ধি পায়। তারপর হযরত নূহ (আ) সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং পশু যবাই করার জন্য একটি স্থান ঠিক করে সেখানে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হালাল চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষী যবেহ করেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দেন যে, পরবর্তীতে আর কখনো পৃথিবীতে এরূপ মহাপ্লাবন তিনি আর দেবেন না। এ ওয়াদার জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি আলামত স্থাপন করে দিয়েছেন। যেটিকে "রঙধনু" বলা হয়। (যা আকাশে বিভিন্ন রং এ প্রকাশ পায়)

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে একটি বর্ণনা এভাবে বর্ণিত আছে যে, "এ রঙধনু" নিরাপত্তার একটি আলামত। কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন যে, "রঙধনু" নিরাপত্তার একটি আলামত যে, নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনের মতো প্লাবন আর কখনো আসবে না। (তবে যদি কোথাও কোনো প্লাবন হয়, সেটা এ বর্ণনার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না।)

কিছু সংখ্যক মূর্খ ও অজ্ঞ লোক এবং ভারতবর্ষের কেউ কেউ নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনকে অস্বীকার করেছে। অথচ তাদের মধ্যে আবার কিছু লোক এ কথা স্বীকার করেছেন যে, নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবন "বাবেল" শহরের একটি এলাকায় সংঘটিত হয়েছিল। এ প্লাবনের প্রভাব আমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছে নি। কারণ, আমাদের এ রাজত্ব আমাদের পিতৃ পুরুষ "কায়ূমারশ" (আদম) থেকে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। এ সব কথা হলো খোদাদ্রোহী নাস্তিক, অগ্নিপূজক ও শয়তানের অনুসারীদের। এগুলো হচ্ছে স্পষ্ট মূর্খতা ও কুফরী এবং বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। এটা সুস্পষ্ট কুফরী অথচ সকল ধর্মাবলম্বীরা নূহ (আ)-এর প্লাবন সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে একমত। আর সব ধর্মের লোকদের থেকে সূত্র পরম্পরায় এ কথাটি প্রমাণিত হয়ে আসছে যে, নূহ (আ)-এর প্লাবন সংঘটিত হয়েছিল এবং এ প্লাবন গোটা পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিল। আর এ প্লাবনের ফলে কোনো কাফির বেঁচে থাকে নি। সবগুলোই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল নিষ্পাপ নবী হযরত নূহ (আ)-এর বদদোয়ার-ই ফল। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বহু আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরও যদি কোনো দাম্ভিক, অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহী নূহ (আ)-এর প্লাবনকে অবিশ্বাস করে, তবে সেটা পথভ্রষ্টতা ও কুফরী ছাড়া আর কি হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হযরত নূহ (আ)-এর প্রশংসা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে হযরত নূহ (আ)-এর প্রশংসা করে বর্ণনা করেন—

اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا. "নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা।"

কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন যে, হযরত নূহ (আ) খাওয়া-পান করার ও পোষাক-পরিধানসহ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ তাঁর তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করতেন। হযরত আনাস ইবনে

মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এমন ব্যক্তির প্রতি রয়েছে, যে খাওয়া ও পান করার পরে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে। অনুরূপভাবে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও আবু উসামা (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে "কৃতজ্ঞ" সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ও আনুগত্যে সঞ্চালন হয়ে থাকে। যেমন, কোনো কবি বলেছেন—

اِفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّيْ ثَلَاثٌ * يَدِيْ وَلِسَانِيْ وَالضَّمِيْرُ الْمُحْجَبَا .

অর্থ : আমার পক্ষ থেকে তিনটি নেয়ামত তোমাদেরকে উপকৃত করেছে। আমার হাত, আমার রসনা ও আমার লুক্কায়িত অন্তর।

অর্থাৎ, তোমার অনুগ্রহের কারণে আমার রসনা, আমার হাত ও আমার অন্তর তোমার কৃতজ্ঞতায় লিপ্ত।

হযরত নূহ (আ)-এর রোযা পালন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, হযরত নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন। –ইবনে মাজাহ : নূহ (আ)-এর সিয়াম অধ্যায়।

অনুরূপভাবে মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও আবূ উসামা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "হযরত নূহ (আ) বছরের অর্ধেক সময় রোযা রাখতেন। (অর্থাৎ, একদিন পরপর রোযা রাখতেন।) হযরত ইবরাহীম (আ) প্রত্যেক মাসে তিন দিন করে রোযা রাখতেন। কখনও রোযা রাখতেন, কখনো রোযা ভাঙতেন।"

–তাবরানী

হযরত নূহ (আ)-এর হজ্জ আদায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ "উসপান" উপত্যকার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ বকর এটা কোন উপত্যকা? এভাবে দুবার জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, এটি এমন একটি জায়গা, যেখান থেকে হযরত নূহ (আ), হুদ (আ) ও ইবরাহীম (আ) তাঁদের লাল উষ্ট্রীতে চড়ে অতিক্রম করেছিলেন। এ উষ্ট্রীগুলোর লাগাম ছিল খেজুর পাতার তৈরি। এ সময় তাঁদের পরনে থাকতো পশমীর তৈরিকৃত লম্বা জুব্বা ও চাদর। এ অবস্থায় তাঁরা পবিত্র গৃহের হজ্জ আদায় করতেন।

ছেলের প্রতি হযরত নূহ (আ)-এর ওসিয়ত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বসা ছিলাম। এ সময় এক বেদুঈন এসে উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল ইবাদতকারীদের একটি জুব্বা। কিন্তু সে জুব্বাটি ছিল রেশমী কাপড়ের নকশাযুক্ত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান যে, তোমাদের এই সাথীটি অশ্বারোহীর পুত্র অশ্বারোহীদেরকে হীন করে দিয়েছে। অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন যে, এ ব্যক্তি অশ্বারোহীর পুত্র অশ্বারোহীদেরকে নীচ করতে চাচ্ছে। আর রাখালের পুত্র রাখালকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করতে চাচ্ছে।

বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে বেদুঈন লোকটিকে জুব্বার আঁচল ধরে বললেন, হে বেদুঈন! আমি তোমার পরনে নির্বোধদের পোষাক দেখছি। এরপর তিনি ﷺ বললেন, আল্লাহর নবী নূহ (আ) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর নিজ পুত্রকে এ বলে ওসিয়ত করেছিলেন যে, "আমি তোমাকে দুটি কাজ করার জন্য এবং দুটি কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য ওসীয়্যত করছি। আমি তোমাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর (তাসবীহ পাঠ করার জন্য) আদেশ করছি। জেনে রেখ, যদি সাত আসমান ও সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় কালিমা রাখা হয়, তবে কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর পাল্লাটি অবশ্যই বেশি ভারী হবে। আর যদি সাত

আসমান ও সাত জমিন একটি লোহার গোলাকার ধনুকও হয়ে যায়, তবুও কালিমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তার উপর বেশি ভারী হবে। আর (দ্বিতীয় আদেশ করছি এই যে,) "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী"। সমস্ত কিছু পাওয়ার জন্য এ তসবীহই যথেষ্ট এবং এর ওসীলায়-ই গোটা সৃষ্টি রিযিক লাভ করে থাকে।

আর আমি তোমাকে দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। একটি হলো শিরক, দ্বিতীয়টি হলো অহঙ্কার। বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম অথবা অন্য কেউ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! শিরক সম্পর্কে তো আমাদের জানা আছে। কিন্তু অহঙ্কার কাকে বলে? আমাদের কারো কাছে সুন্দর জুতা এবং এর উপর সুন্দর চামড়ার ফিতাও রয়েছে, এগুলো কি অহঙ্কার? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না।

অতঃপর আরয করা হলো, তবে কি আমাদের কারো কাছে যে সুন্দর পোষাক আছে, যেগুলো তারা পরিধান করে থাকে, সেটি কি অহঙ্কার? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। এরপর বলা হলো, তবে কি কারো অনেক বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথী হওয়া, যারা তার নিকট এসে বসে, সেটা কি অহঙ্কার? (অর্থাৎ, নেতা হওয়ার কারণে তার চারপাশে বহু লোকের সমবেত হওয়াটা কি অহঙ্কার?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, না। তারপর আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অহঙ্কার কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা"।

হযরত নূহ (আ)-এর বয়স

হযরত নূহ (আ)-এর বয়স আহলে কিতাবগণ বলেছেন যে, তিনি যখন নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছয়শ বছর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে। তবে তাঁর বর্ণনার মধ্যে এ কথাটি সংযুক্ত রয়েছে যে, নৌকা থেকে অবতরণের পরে তিনি তিনশ পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু এ বক্তব্যটিকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। কারণ, যদি এ বর্ণনা এবং কুরআনের ভাষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা করা না যায়, তবে (আহলে কিতাবদের) এ বর্ণনাটি অবশ্যই ভ্রান্ত। কুরআনের ভাষ্যমতে হযরত নূহ (আ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে এবং প্লাবনের পূর্বে তাঁর নিজ জাতির মধ্যে নয়শ পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا ط فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ـ

অর্থ : আমি নূহকে তার কাওমের কাছে পাঠালাম। তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে এমন অবস্থায় ঘেরাও করে ফেলল, যখন তারা যালিম ছিল। –সূরা আনকাবূত : ১৪

(আয়াত মতে গ্রন্থকারের দাবি একেবারেই সঠিক ও বিশুদ্ধ।) নৌকা থেকে বেরিয়ে আসার পর হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতির মাঝে কত বছর জীবিত ছিলেন তা আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন।

আর যদি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে যে, হযরত নূহ (আ) বারশ বছর বয়সে নবুওয়াতলাভ করেন এবং প্লাবনের পর তিনি তিনশ পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন, তবে এ হিসাব মতে তাঁর বয়স এক হাজার সাতশ আশি বছর।

হযরত নূহ (আ)-এর রওযা শরীফ

ইবনে জারীর, আযরাকী, আব্দুর রহমান ইবনে ছাবিত (রহ) এবং অন্যান্য তাবেঈন থেকে বর্ণিত আছে যে, নূহ (আ)-এর রওযা মসজিদে হারামে। এ বর্ণনাটি, পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেমের অভিমত অপেক্ষা জোরালো ও স্পষ্ট। যারা বলে থাকেন যে, নূহ (আ)-এর কবর বিকা শহরে অবস্থিত। যেটি বর্তমান "কারক-ই-নূহ" নামে সুপরিচিত। এ কবর থাকার কারণেই সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছে।

হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনা

বংশ পরম্পরা ঃ হযরত হূদ (আ)-এর বংশ পরম্পরা দু'ভাবে বর্ণিত হয়েছে—

১. হূদ ইবনে শালিখ ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)। এ বংশ পরম্পরা এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, আবের (হূদ) ইবনে শালিখ ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)।

২. হূদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রিবাহ ইবনুল জারূদ ইবনে আয ইবনে আওস ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)। এরূপ বংশ পরম্পরা ইবনে জারীর (রহ) বর্ণনা করেছেন। হূদ (আ) আদ গোত্রভুক্ত ছিলেন। যার বংশ পরম্পরা হচ্ছে আদ ইবনে আওস ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)। তারা ছিল বেদুঈন (গ্রামবাসী)। তারা ইয়ামানের বিভিন্ন উপত্যকায় বসবাস করতো। যা ওমান ও হাযারা মাওতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এটি শাহ্‌র নামেও অভিহিত। তাদের উপত্যকার নাম ছিল মুগীস। তাদের অধিকাংশ লোক এমন তাবুতে বসবাস করতো, যার খুটিগুলো ছিল অত্যন্ত উঁচু, মজবুত ও ভারী।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞

অর্থ : (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি, আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় 'আদ জাতির সাথে? -সূরা ফাজর : ৬-৭

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আদ গোত্র দ্বারা প্রথম আদ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যারা "ইরাম" নামেও পরিচিত ছিল। আর দ্বিতীয় "আদ গোত্রের উদ্ভব হয় পরবর্তীতে। এর বর্ণনা পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।" প্রথম আদ গোত্রের কথা কুরআন মাজীদে এভাবে বলা হয়েছে যে—

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۞ "যাদের মতো জাতি দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয় নি?" -সূরা ফাজর : ৮

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দু-ভাবে হতে পারে। যথা–

১. প্রথম অর্থ আদ (ইরাম) গোত্রের লোকের সমতুল্য কোনো লোক এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয় নি। অর্থাৎ, সে গোত্রের লোকেরা স্তম্ভের মতো দীর্ঘকায় বা শক্তিশালী ছিল।

২. দ্বিতীয় অর্থ এটা হতে পারে যে, এদের প্রাসাদের পিলারগুলো ছিল দীর্ঘকায়। (যার সমতুল্য কোনো দেশে নির্মাণ করা হয় নি।)

কারো করো মতে "ইরামের" অবস্থান হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। কখনো সিরিয়ায়, কখনো ইয়ামানে, কখনো হিজাজে বা কখনো অন্য স্থানে। কিন্তু এদের ধ্যান-ধারণা অবাস্তব ও অযৌক্তিক। এ ধারণার স্বপক্ষে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই যাতে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

হযরত হূদ (আ)-এর ভাষা কি ছিল, এ ব্যাপারে হাদীস গ্রন্থ সহীহ ইবনে হিব্বানে হযরত আবূ যর (রা) হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখানা দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যাতে নবী ও রাসূলগণের আলোচনা রয়েছে। এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নবীগণের মধ্যে চরজন নবী আরবী (আরবী ভাষী), হূদ, সালিহ, শুআয়েব (আ) এবং হে আবূ যর! তোমার নবী। (অর্থাৎ, মুহাম্মদ ﷺ।)

কেউ কেউ বলেন, হযরত হূদ (আ)-ই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ এর মতে, তার পিতাই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। অনেকের মতে, হযরত নূহ (আ) সর্বপ্রথম আরবী ভাষায়

কথা বলেন। আর এক বর্ণনা মতে হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। এ অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে আরো অভিমত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই বেশি অবগত।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পূর্বের আরবের লোকদেরকে "আল-আরাবুল আরিবা" (খাঁটি আরব) বলা হতো। তারা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। আদ, জুরহাম, তাসাম, জুদায়স, উমায়স, মাদইয়ান, আমলাক, আবীল, জাসিম, কাহতান, বানূ ইয়াকতান প্রভৃতি। এ গোত্রের লোকেরা খাঁটি আরব ছিল। এদের ভাষা ছিল আরবী। এসব গোত্র ব্যতীত যারা আরবে প্রবেশ করে আরবদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তারা ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) বিশুদ্ধ আরবী ভাষী ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এবং তাঁর মাকে যখন মক্কার মরুভূমির বিজন প্রান্তরে রেখে আসা হয়েছিল, তখন শিশু ইসমাঈল (আ) সেখানে অবস্থানরত জুরহাম সম্প্রদায় থেকে এ আরবী ভাষা শিখেছিলেন। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আরবী ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলার বিশেষ এক যোগ্যতা দান করেছিলেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আরবী ভাষায় বিশুদ্ধভাবে সুন্দর কথন ভঙ্গিতে বলতেন। মোটকথা হযরত হূদ (আ) আরবী ভাষী ছিলেন। তাঁর জাতি আ'দ নূহ (আ)-এর প্লাবনের পরে সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা শুরু করে। তারা তিনটি মূর্তির পূজা করতো। সেগুলো হচ্ছে– সাদ্দা, সামূদা ও হাররা।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাই হযরত হূদ (আ)-কে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি এসে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

অর্থ : আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম।[১] তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে চলবে না? কওমের সরদাররা, যারা এ কথা মানতে অস্বীকার করছিল, এর জবাবে বলল, আমরা তো দেখছি তুমি বোকামিতে পড়ে আছ। আর আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী। (হূদ) বললেন, হে আমার কওম! আমি

১. 'হিজায', 'ইয়ামান' ও 'ইয়ামামা'র মধ্যবর্তী 'আহকাফ' এলাকায় 'আ'দ' জাতির মূল বাসস্থান ছিল। এখান থেকেই বিস্তৃত হয়ে তারা 'ইয়ামান'-এর পশ্চিম উপকূল এবং ওমান ও হাযরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের শক্তির প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বোকামিতে পড়ি নেই; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতকামী, যার উপর ভরসা করা যায়। তোমরা কি এ কারণে অবাক হচ্ছ যে, তোমাদের কাওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সাবধান করে দেয়? একথা ভুলে যেও না যে, তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদের খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ।[১] হয়তো তোমরা সফল হবে। তারা জবাব দিলো, তুমি কি আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছ, যাতে আমরা শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বাদ দিই? আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের উপর ঐ 'আযাব নিয়ে এসো দেখি, যার ধমকি আমাদেরকে তুমি দিয়ে থাক। (হূদ) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের রবের লা'নত ও গযব পড়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে?[২] এ সবের জন্য আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেন নি। ঠিক আছে, তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। অবশেষে আমার মেহেরবানীতে হূদ ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ সব লোকের মূল কেটে দিলাম, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল ও যারা মু'মিন ছিল না। –সূরা আ'রাফ : ৬৫–৭২

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ)-এর কাহিনীর শেষে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۞ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۗ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۚ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۞

১. মূলে 'আলা'– শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ নিয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার নিদর্শনসমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলিও হতে পারে।

২. অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ধন-দৌলতের আবার কাউকে রোগব্যাধির দেবতা বল; কিন্তু আসলে তাদের কেউ-ই কোনো জিনিসের মালিক নয়। এগুলো তোমাদের মনগড়া নিছক কতক 'নাম' মাত্র। যারা এসব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে, তারা আসলে কতক নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে; কোনো বাস্তব জিনিস নিয়ে তাদের বিবাদ নয়।

অর্থ : আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বূদ নেই। তোমরা তো শুধু মিথ্যা রচনা করে রেখেছ। হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার মজুরি তাঁরই জিম্মায় রয়েছে। তোমরা কি বিবেককে একটুও কাজে লাগাও না? হে আমার কওম! তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর দিকে ফিরে এস। তাহলে তিনি তোমাদের উপর আসমানের দরজা খুলে দেবেন এবং তোমাদের বর্তমান শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দেবেন। অপরাধী হয়ে (দাসত্ব করা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রেখ না। তারা জবাব দিলো, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস নি। আর তোমার কথায় আমরা আমাদের মা'বূদদেরকে বাদ দিতে পারি না। আমরা তোমার উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই। আমরা তো মনে করি, তোমার উপর আমাদের মা'বূদদের কারো গযব পড়ে গেছে।[১] হূদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী হয়ে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে রেখেছ, এ থেকে আমি মুক্ত আছি। তোমরা সবাই এক সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার আছে কর এবং আমাকে একটুও ছাড় দিও না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। কোনো প্রাণী নেই যার মাথা তার হাতে নেই। নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথে আছেন। তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাকলে থাক। তোমাদের কাছে আমাকে যে বাণী দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এখন আমার রব তোমাদের বদলে অন্য কাওমকে আনবেন। তখন তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। আমার রব সবকিছুরই হেফাযতকারী। তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দ্বারা হূদকে ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দিয়ে দিলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। এরাই হলো আ'দ জাতি। তারা তাদের রবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং সত্যের প্রত্যেক শক্তিমান দুশমনকে মেনে চলেছে। অবশেষে এ দুনিয়াতেও তাদের উপর লা'নত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও। শুনে রাখ, আ'দ জাতি তাদের রবের প্রতি কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হূদের কাওম আ'দ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। –সূরা হূদ : ৫০-৬০

সূরা মু'মিনূনে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা শেষে বলেন—

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۙ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۙ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۞ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۞ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞

১. অর্থাৎ, তুমি সম্ভবত কোনো দেব-দেবীর বা হযরতের আস্তানায় বেআদবী করেছ, তাই তুমি তারই ফল ভোগ করছ। যে জন্য তুমি এ সব বেহুদা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ; আর যেসব এলাকায় কাল তুমি সম্মানের সঙ্গে বাস করতে, সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে সমাদর করা হচ্ছে।

অর্থ : এদের পর আমি অপর এক যুগের কওমকে উঠালাম। তারপর তাদের মধ্য থেকেই তাদের প্রতি এক রাসূল পাঠালাম (যিনি তাদেরকে দাওয়াত দিলেন) আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তোমরা কি ভয় করো না? তার কওমের নেতাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল এবং আখিরাতে হাজির হওয়ার কথা মিথ্যা মনে করেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে সুখে রেখেছিলাম, তারা বলল, এ লোক তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও সে-ও তাই খায়, তোমরা যা কিছু পান কর সে-ও তাই পান করে। এখন যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষেরই কথামতো চল, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে বলে যে, যখন তোমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে? বহু দূরের কথা। অসম্ভব কথা যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে। দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আমাদেরকে এখানেই বাঁচতে হবে ও মরতে হবে। আমাদেরকে আবার উঠানো হবে না। এ লোকটি আল্লাহর নামে ডাহা মিথ্যা রচনা করে চলেছে। আমরা কখনো তার প্রতি ঈমান আনব না। রাসূল বললেন, হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ জবাব দিলেন, ঐ সময় কাছেই আছে, যখন তারা তাদের এ কাজের জন্য আফসোস করবে। –সূরা মুমিনূন : ৩১–৪১

সূরা শু'আরা'য় আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পরে বলেন—

كَذَّبَتْ عَادُ ۨ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۞ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۞ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۞ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّ بَنِيْنَ ۞ وَجَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۞ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۞ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ۞ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۞ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

অর্থ : 'আদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বললেন, তোমরা ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তোমাদের এ কি অবস্থা যে, তোমরা প্রতিটি উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মারক হিসেবে দালান বানিয়ে ফেলছ এবং বড় বড় দালানা-কোঠা বানাচ্ছ, যেন তোমরা চিরকালই থাকবে? যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও কর, তখন তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাও। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তোমরা তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদেরকে গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও ঝরনাসমূহ সাহায্য হিসেবে দিয়েছেন। আমি তোমাদের উপর একটি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি। জবাবে তারা বলল, তুমি নসীহত কর বা না কর, আমাদের জন্য সবই সমান। এ সব কথা তো এভাবেই চলে এসেছে। আমাদের উপর কোনো আযাব আসবে না। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা মনে করল। আর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। আসল সত্য এটাই যে, আপনার রব বড়ই শক্তিশালী ও দয়াবান। –সূরা শু'আরা : ১২৩–১৪০

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আরও বলেন—

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ۝

অর্থ : 'আদ জাতির অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোনো অধিকার ছাড়াই নিজেদেরকে বড় মনে করে বসেছিল এবং বলল, 'আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কে আছে?' তারা কি এটুকু কথাও বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী? তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকারই করতে থাকল। অবশেষে আমি কতক অশুভ দিনে তাদের উপর কঠিন ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম, যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমানকর আযাবের যন্ত্রণা ভোগ করাতে পারি। আর আখিরাতের আযাব তো এর চেয়েও বেশি লাঞ্ছনাময়। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। –সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১৫–১৬

কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۖ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۖ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝

অর্থ : এদেরকে 'আদ জাতির ভাই {হূদ (আ)}-এর কাহিনী একটু শোনাও। যখন তিনি আহকাফে তাঁর কওমকে সাবধান করেছিলেন– এ ধরনের সাবধানকারী এর আগেও এসেছে এবং পরেও এসেছে, (এ কথা বলে) যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না; আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়ানক আযাবের দিনের আশঙ্কাবোধ করছি।" তারা বলল, তুমি কি আমাদের মা'বূদদের থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো না দেখি। তিনি {হূদ (আ)} বললেন, এ বিষয়ে ইলম তো আল্লাহর কাছেই আছে।[১] আমি তো শুধু ঐ বাণী তোমাদের কাছে পৌছাচ্ছি, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা এক জাহেল কাওম। তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয়, বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[২] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার

১. অর্থাৎ, তোমাদের উপর যখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে তার জ্ঞান।

২. এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, কে তাদের এই উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।

ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। এর রবের হুকুমে সে প্রত্যেক জিনিসকে ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা হলো যে, তাদের থাকার জায়গাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে বদলা দিয়ে থাকি। -সূরা আহকাফ : ২১-২৫

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলেন—

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۞ مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ۞

অর্থ : আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) 'আদ জাতির মধ্যে- যখন তাদের উপর এমন ক্ষতিকর বাতাস পাঠালাম, যা যে জিনিসের উপর দিয়েই বয়ে গেল তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে গেল। -সূরা যারিয়াত : ৪১-৪২

সূরা নাজমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন-

وَاَنَّهٗٓ اَهْلَكَ عَادَا ۨ الْاُوْلٰى ۞ وَثَمُوْدَا فَمَآ اَبْقٰى ۞ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۞ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ۞ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ۞

অর্থ : আর তিনিই আদি আদ জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন এবং সামূদ জাতিকে এমনভাবে ধ্বংস করেছেন, তাদের কাউকে বাকি রাখেন নি। আর এর আগে নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা বড়ই যালিম ও অবাধ্য লোক ছিল। আর উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বস্তিগুলোকে উপরে তুলে ছুড়ে ফেললেন। তারপর তাদের উপর ঐ জিনিস ছড়িয়ে দিলেন, যা (তোমরা জান যে) কী ছড়িয়ে দিলেন।[১] অতএব (হে মানুষ!) তোমার রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের উপর তুমি সন্দেহ পোষণ করবে?

সূরা ক্বামারে আল্লাহ তা'আলা অনুরূপভাবে বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۞ تَنْزِعُ النَّاسَ لا كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

অর্থ : আদ জাতি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। (দেখ,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল। আমি অবিরাম চলতে থাকা এক অশুভ দিনে কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম। যা লোকগুলোকে উপরে তুলে এমনভাবে ছুড়ে ফেলেছিল, যেন তারা উপড়িয়ে ফেলা খেজুর গাছের গুঁড়ি। (দেখে নাও,) আমার আযাব ও সাবধানবাণী কেমন ছিল। আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে? -সূরা কামার : ১৮-২২

সূরা আল-হাক্কায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۞

---

১. *উপুড় হয়ে থাকা জনবসতি' অর্থাৎ, লূত (আ)-এর কওমের বসতি। আর 'ছড়িয়ে দিলেন তাদের উপর ঐ জিনিস' মানে সম্ভবত মৃতসাগরের জলরাশি যা জমিন ধসে যাওয়ার পর তাদের বসতিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত ঐ এলাকাকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।*

অর্থ : আর 'আদ (জাতি)-কে এক ভয়ানক তূফানি বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (আল্লাহ) তাদের উপর একটানা সাত রাত ও আট দিন (এ মহাবিপদে) চাপিয়ে রেখেছিলেন। তুমি (ওখানে থাকলে) দেখতে যে, তারা খেজুর গাছের পচা কাণ্ডের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে। এখন তাদের কাউকে তুমি বেঁচে আছে দেখতে পাও?

–সূরা হা-ক্কাহ : ৬-৮

সূরা ফাজ্‌রে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۞
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۞ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۞
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۞ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞

অর্থ : (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি, আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় 'আদ জাতির সাথে? যাদের মতো জাতি দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয় নি? আর (কী ব্যবহার করেছেন) সামূদ জাতির সাথে, যারা পাথর খোদাই করেছিল? আর কিলকধারী[১] ফিরাউনের সাথে (কী ব্যবহার করেছেন)? এরা ঐ সব লোক, যারা দেশে দেশে বিদ্রোহ ও সীমা লঙ্ঘন করেছিল। এবং সেখানে ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল। শেষে আপনার রব তাদের উপর আযাবের চাবুক মেরেছিলেন। আসলে আপনার রব ঘাঁটিতে ওঁতপেতে আছেন।[২]

–সূরা ফাজ্‌র : ৬-১৪

এরূপভাবে কুরআন মাজীদের সূরা বারাআত, ইবরাহীম, ফুরক্বান, আনকাবূত, সোয়াদ ও ক্বাফে যথাক্রমে- ৭০, ৯, ৩৮, ৩৮, ১২ ও ১৩ নং আয়াতে হযরত হূদ (আ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বিশদ আলোচনা করেছি। এরপরও আমি এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং এ সব কাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু কথা এখানে পেশ করব।

হযরত হূদ (আ)-এর গোত্র (আদ)-গণই হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবনের পরে সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা আরম্ভ করে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদেও বর্ণিত হয়েছে, হযরত হূদ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

অর্থ : স্মরণ কর! তোমাদের রব নূহের কাওমের পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং তোমাদেরকে খুব শক্তিশালী করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ।[৩] হয়তো তোমরা সফল হবে। –সূরা আ'রাফ : ৬৯

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সময়কালে তোমাদেরকে সবার চেয়ে দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী করেছেন।

অনুরূপভাবে সূরা মু'মিনূনে হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

---

১. ফিরাউনের সেনাবাহিনী তাকে এমন শক্তিশালী করেছিল, যেমন খুঁটি, পেরেক বা কিলক দিয়ে কোনো জিনিসকে মযবুত করে রাখা হয়।

২. ঘাঁটি ঐ জায়গাকে বলে, যেখানে কোনো লোক এজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, দুশমন এলেই যেন হামলা করতে পারে, অথচ দুশমন জানে না যে, তার উপর আক্রমণ করার জন্য কেউ ওঁতপেতে আছে। যারা যুলুম ও ফাসাদ করে, তাদের জন্যও আল্লাহ তা'আলা এভাবেই ওঁতপেতে আছেন। এরা একটুও অনুভব করে না যে, আল্লাহ তাদের সব কীর্তি দেখছেন। এরা নির্ভয়ে একের পর এক শয়তানি করে চলে। শেষ পর্যন্ত এরা যখন অন্যায়ের এমন সীমায় এসে পৌঁছে, যার পর আল্লাহ এদেরকে আর সহ্য করতে চান না, তখন হঠাৎ আল্লাহর আযাবের বেত তাদের উপর মারা হয়।

৩. মূলে 'আলা-' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ নিয়ামতসমূহও হয় এবং ক্ষমতার নিদর্শনসমূহও হয়, আবার উত্তম গুণাবলিও হতে পারে।

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. "এদের পর আমি অপর এক যুগের কওমকে উঠালাম।" -সূরা মুমিনূন : ৩১

বিশুদ্ধ মতে এ সম্প্রদায়টি হযরত হূদ (আ)-এরই সম্প্রদায় ছিল। কতক তাফসীরকারের মতে এটি ছিল ছামূদ সম্প্রদায়। তারা সূরা মু'মিনূনের উল্লিখিত আয়াতের পরেই এ আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন—

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً.

অর্থ : অবশেষে সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমি তাদেরকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম। -সূরা মুমিনূন : ৪১

তারা বলেন, বিকট শব্দ দ্বারা হযরত ছামূদ (আ)-এর জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। আর হযরত সালেহ (আ)-এর জাতি (আদ)-কে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.

অর্থ : আর 'আদ (জাতি)-কে এক ভয়ানক তুফানি বাতাস দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। -সূরা হা-ক্কাহ্ : ৬

এর উত্তর এই যে, আদ জাতির উপর যে প্রচণ্ড বায়ু (শাস্তিস্বরূপ) প্রবাহিত হয়েছিল, তার সাথে বিকট আওয়াজও ছিল। আর এটা অস্বাভাবিকও কিছু না। যেমন– মাদায়েনের আইকার অধিবাসীদের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি একই সময় আপতিত হয়েছিল। আর ছামূদ সম্প্রদায়ের পূর্বে আদ জাতির যে আবির্ভাব হয়েছিল, এতে কোনো মতভেদ নেই। এ আদ জাতি, অবাধ্য, অহংকারী কাফির সম্প্রদায় ছিল। এরা ছিল মূর্তি পূজারি ও সীমালঙ্ঘনকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকাছে তাদের মধ্য হতেই একজনকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন। যিনি তাদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দেন। আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর বিরোধিতা করে তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং তাঁর সাথে অন্যায় আচরণ করে। পরে মহাশক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন।

যখন হযরত হূদ (আ) তাদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্য বললেন ও নিজ অপরাধের জন্য মাফ চাইতে বললেন এবং এভাবে করলে তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আল্লাহর নাফরমানী করলে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে সাবধান করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা যা বলেছিল তা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ.

অর্থ : কওমের সরদাররা, যারা এ কথা মানতে অস্বীকার করছিল, এর জবাবে বলল, আমরা তো দেখছি তুমি বোকামিতে পড়ে আছ। আর আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদী। -সূরা আ'রাফ : ৬৬

অর্থাৎ, আমরা মূর্তিগুলোর পূজা করে থাকি ও সেগুলোর কাছে রিযিক ও সাহায্য কামনা করে থাকি। তুমি তা ত্যাগ করার জন্য যে বলছ, তা তোমার নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আমাদের ধারণা যে, তোমার এ দাবি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, আল্লাহ তোমাকে রাসূল হিসেবে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন।

হযরত হূদ (আ) উত্তরে বললেন—

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থ : (হূদ) বললেন, হে আমার কাওম! আমি বোকামিতে পড়ে নেই; বরং আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে রাসূল। -সূরা আ'রাফ : ৬৭

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের এমন হিতকামী, যার উপর ভরসা করা যায়। -সূরা আ'রাফ : ৬৮

আর আল্লাহ তা'আলার উপদেশ পৌঁছে দেয়াটা এমন ছিল না যে, শুধু দায়িত্ব পালন করা; বরং তিনি সহজ সরল ও বিশুদ্ধ ভাষায় সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপকভাবে তাদেরকে বুঝিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন এক কথার প্রতি আহ্বান করেছেন, যাতে নেই কোনো মতভেদ, জটিলতা, সংশয় ও অস্পষ্টতা। বরং তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে সত্য ও সরল পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর জাতির প্রতি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক, বিনয়ী ও দরদী। তিনি তাঁর এ দাওয়াতের জন্য তাদের থেকে কোনো বিনিময় বা পারিশ্রমিক দাবি করেননি। বরং তাঁর একমাত্র কামনা ছিল, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নিজ জাতির কল্যাণ। তিনি তাঁর কাজের বিনিময় বা পারিশ্রমিকের আশা করতেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে। কারণ, ইহাকাল ও পরকালের সর্বপ্রকার মঙ্গল আল্লাহ তা'আলারই কুদরতী হাতে। তাঁর ইচ্ছা মতে সবকিছু পরিচালিত হয়। এ কারণেই হযরত হূদ (আ) তাঁর নিজ জাতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۔

অর্থ : হে আমার কওম! এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমার মজুরি তাঁরই জিম্মায় রয়েছে। তোমরা কি বিবেককে একটুও কাজে লাগাও না? -সূরা হূদ : ৫১

অর্থাৎ, তোমাদের কি এতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি নেই যে, কোন্‌টা সঠিক, কোন্‌টা ভুল (ভ্রান্ত) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পার আর বুঝতে পার যে, তোমাদের এমন এক সুস্পষ্ট সত্যের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যার সাক্ষ্য তোমাদের প্রকৃত স্বভাবও দিচ্ছে। আর এটাই সে দ্বীন, যা নিয়ে হযরত নূহ (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সমস্ত বিরুদ্ধবাদীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং জেনে রেখো! আমি তোমাদেরকে সেই ধর্মের প্রতি আহ্বান করছি এবং আমি তোমাদের কাছে এর কোনো বিনিময় চাই না; বরং এর বিনিময়ের প্রত্যাশা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে। যিনি হলেন মঙ্গল ও অমঙ্গল-এর একমাত্র মালিক।

অন্য এক নবীর স্বপক্ষে একজন মুমিনের উক্তি কুরআন মাজীদের বর্ণিত হয়েছে—

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔـلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞

অর্থ : মেনে চল তাদেরকে, যারা তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চায় না। আর তারা সঠিক পথে আছে। কেন আমি ঐ সত্তার দাসত্ব করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে? -সূরা ইয়া-সীন : ২১-২২

হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁকে উত্তর দিল—

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْۗءٍ ۭ

نَقُوْلُ بَلْ هُوَ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস নি। আর তোমার কথায় আমরা আমাদের মা'বূদদেরকে বাদ দিতে পারি না। আমরা তোমার উপর ঈমান আনতে প্রস্তুত নই। আমরা তো মনে করি, তোমার উপর আমাদের মা'বূদদের কারো গযব পড়ে গেছে।[১] -সূরা হূদ : ৫৩-৫৪

১. অর্থাৎ তুমি সম্ভবত কোনো দেব-দেবী বা হযরতের আস্তানায় বেআদবি করেছ, তাই তুমি তারই ফল ভোগ করছ। যে জন্য তুমি এ সব বেহুদা কথাবার্তা বলতে শুরু করেছ; আর যেসব এলাকায় কাল তুমি সম্মানের সঙ্গে বাস করতে, সেখানে আজ তোমাকে গালি ও পাথর দিয়ে সমাদর করা হচ্ছে।

অর্থাৎ, হে হূদ! তুমি আমাদের সম্মুখে কোনো অস্বাভাবিক ও আশ্চর্য ধরনের কিছু উপস্থাপন করতে পার নি, যা তোমার (নবুওয়াতের) সত্যতার সাক্ষ্য হতে পারে। সুতরাং আমরা এমন লোক নই যে, শুধু তোমার মুখের কথায়-ই আমাদের নিজ উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার কথার উপর কোনো স্পষ্ট দলীল পেশ করতে না পারবে, আমরা তোমাকে পাগল (উন্মাদ) বলেই ধারণা করছি। আর তোমার এ পাগল হয়ে যাওয়ার কারণ এটাই মনে হচ্ছে যে, আমাদের কোনো উপাস্য তোমার উপর ক্রদ্ধ হওয়াতে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যে কারণে তুমি এভাবে পাগল হয়ে গেছ।

হযরত হূদ (আ) তাদের জবাবে বললেন—

إِنِّيٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِن دُونِهِۦ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۝

অর্থ : আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি এবং তোমরাও সাক্ষী হয়ে থাক যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকেও তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক করে রেখেছো, এ থেকে আমি মুক্ত আছি। তোমরা সবাই এক সাথে মিলে আমার বিরুদ্ধে যা করার আছে কর এবং আমাকে একটুও ছাড় দিও না। -সূরা হূদ : ৫৪-৫৫

এটা ছিল হযরত হূদ (আ)-এর পক্ষ হতে তাঁর জাতির জন্য চূড়ান্ত ঘোষণা। তিনি তাঁর এ কথায়, বাতিল উপাস্যগুলো থেকে নিজে সম্পর্কহীন থাকার কথা প্রকাশ করেছেন এবং এ উপাস্যগুলোর নিকৃষ্টতা, কদর্যতা ও অনিষ্টতা বর্ণনা করেছেন। আর তিনি এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ উপাস্যগুলো কাউকে কোনো উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। এগুলো পাথর দ্বারা নির্মিত জড় পদার্থ। পাথরের যে বৈশিষ্ট্য, এগুলোর মধ্যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য। পাথর যেসব কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এগুলোও সে সব কাজে ব্যবহার করা যায়। এরপরও যদি তোমাদের ধারণায় সে পাথর দ্বারা নির্মিত উপাস্যগুলো তোমাদের সাহায্যকারী, অনিষ্টকারী ও মুক্তিদাতা হয়, তবে জেনে রেখো! আমার সাথে এগুলোর সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। আমি এগুলোর উপর লা'নত করি। সুতরাং তোমরা সকলে মিলে তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যগুলোকেও সাথে নিয়ে, আমার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র করতে চাও তা করতে পার। আমার বিরোধিতা করার জন্য তোমরা তোমাদের সর্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করতে পার। যার থেকে চাও সাহায্য নিতে পার। এ ব্যাপারে আমাকে এক মুহূর্তও সুযোগ দিও না। আমি তোমাদের কোনই পরওয়া করি না। আর তোমাদের শক্তির ব্যাপারে আমি কোনই চিন্তা করি না এবং তোমাদের এ সব ষড়যন্ত্রের দিকে আমি ফিরেও তাকাই না। বরং—

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۔

অর্থ : আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আছি যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। কোনো জীব-জন্তু নেই, যার মাথা তার হাতে নেই। নিশ্চয়ই আমার রব সঠিক পথে আছেন। -সূরা হূদ : ৫৬

অর্থাৎ, আমি ভরসা করি একমাত্র আল্লাহ উপর। তাঁর সাহায্য, দয়া ও সহায়তারই আমি প্রত্যাশী। তাঁর উপরই আমি নির্ভরশীল। যে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থী হয়, সে ধ্বংস হয় না। সুতরাং সে মহান সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আমি কোনো সৃষ্টির পরওয়া করি না। আমি তাঁকে ব্যতীত আর কারো উপর নির্ভর করি না এবং একমাত্র তাঁর সামনেই আমি আমার মস্তক নত করি। আমি শুধু তাঁরই ইবাদত করি।

হযরত হূদ (আ)-এর এ স্পষ্ট ঘোষণাই প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আর তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ভ্রষ্টতার কারণে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। তারা হযরত হূদ (আ)-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে পারে নি। এটাই ছিল হযরত হূদ (আ)-এর নবী হওয়ার সত্যতার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের (অবিশ্বাসীদের)

পথ ও মত ভ্রান্ত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। হূদ (আ)-এর পূর্বে হযরত নূহ (আ)-ও তাঁর জাতির নিকট ঠিক অনুরূপ প্রমাণ পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ـ

অর্থ : হে আমার দেশবাসী! যদি তোমাদের মধ্যে আমার থাকা ও আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদেরকে সচেতন করা তোমাদের নিকট অসহ্য হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে (জেনে রাখ) একমাত্র আল্লাহরই উপর আমি ভরসা করি। তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে সাথে নিয়ে একসাথে ফায়সালা করে নাও এবং তোমরা যে পরিকল্পনাই করেছ তা ভালো করে ভেবে দেখ, যাতে কোনো দিক দিয়ে তা তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর তোমরা তা আমার বিরুদ্ধে কাজে পরিণত কর এবং আমাকে মোটেই কোনো অবকাশ দিও না।

–সূরা ইউনুস : ৭১

এরূপভাবে আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-ও তাঁর জাতির লোকদেরকে প্রকাশ্যে বলেছিলেন—

وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ـ وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ـ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ـ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ـ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ـ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ـ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞

অর্থ : তোমরা যে সবকে শরীক কর সে সবকে আমি ভয় পাই না। তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে তা হতে পারে। আমার রবের ইলম সব জিনিসের উপর ছেয়ে আছে। তবুও কি তোমাদের হুঁশ হবে না?[১] তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর তাদেরকে কী করে আমি ভয় পাব? অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে ঐ সব জিনিসকে শরীক করতে ভয় পাও না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কোনো সনদ নাযিল করেন নি। (তোমরা ভেবে দেখ) আমাদের দু' পক্ষের মধ্যে কে বেশি নিরাপদে থাকার হকদার? এ বিষয়ে যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে তাহলে বল। আসলে তো তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে (শিরকের) যুলুমের সাথে মেশায় নি। এটাই ছিল আমার (পক্ষ থেকে) দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলার জন্যে দিয়েছি। আমি যাকে চাই উচ্চমর্যাদা দিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কি, তোমার রব বড়ই কুশলী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। –সূরা আনআ'ম : ৮০-৮৩

যা হোক, হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীরা যে জবাব দিয়েছিল, তা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ مَا هٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۞ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۞ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۞

১. মূলে এখানে 'তাযাক্কার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঠিক অর্থ– কোনো বিষয়ে গাফলতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ করা।

অর্থ : তার কওমের নেতাদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছিল এবং আখিরাতে হাজির হওয়ার কথা মিথ্যা মনে করেছিল, যাদেরকে আমি দুনিয়ার জীবনে সুখে রেখেছিলাম, তারা বলল, এ লোক তো তোমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যা খাও সে-ও তাই খায়, তোমরা যা কিছু পান কর সে-ও তাই পান করে। এখন যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষেরই কথামতো চল, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে বলে যে, যখন তোমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে? -সূরা মুমিনূন : ৩৩-৩৫

তাদের ধারণা মতে এটা একটা অসম্ভব ও বিস্ময়ের বিষয় ছিল যে, একজন মানুষ কিভাবে রাসূল হতে পারে? তার আধুনিক ও প্রাচীন যুগের অধিকাংশ নির্বোধ লোকেরাও এ সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে ছিল এবং তার প্রতিবাদও করেছিল। যেমন কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে—

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ .

অর্থ : মানুষের জন্য কি এটা অবাক হওয়ার বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকেই একজনের উপর ওহী পাঠিয়েছি, যাতে (ভুলের মধ্যে পড়ে থাকা) লোকদেরকে সাবধান করে দেয়। -সূরা ইউনুস : ২

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۞ قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ۞

অর্থ : যখনই কোনো নবী হেদায়েত নিয়ে এসেছেন, তখন একটি কথাই মানুষকে ঈমান আনতে নিষেধ করেছে। আর সে কথাটি হলো, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন? তাদেরকে বলুন, যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতো তাহলে অবশ্যই আমি তাদের নিকট ফেরেশতাকেই রাসূল হিসেবে পাঠাতাম। -সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৪-৯৫

এভাবে হূদ (আ)-ও তাদেরকে বলেছিলেন—

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ .

অর্থ : তোমরা কি এ কারণে অবাক হয়েছ যে, তোমাদের কওমেরই এক লোকের মারফতে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে। -সূরা আ'রাফ : ৬৩

অর্থাৎ, এটা কোনো বিস্ময়কর বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা ভালভাবেই জানেন যে, কাকে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

হযরত হূদ (আ)-এর গোত্রের (অবিশ্বাসী) লোকেরা বলল—

اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ ۞ اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۞ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ ۨ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۞

অর্থ : সে কি তোমাদেরকে বলে যে, যখন তোমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং হাড়ে পরিণত হবে, তখন তোমাদেরকে (কবর থেকে আবার) বের করা হবে? বহু দূরের কথা। অসম্ভব কথা যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হচ্ছে। দুনিয়ার এ জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। আমাদেরকে এখানেই বাঁচতে হবে ও মরতে হবে। আমাদেরকে আবার উঠানো হবে না। এ লোকটি আল্লাহর নামে ডাহা মিথ্যা রচনা করে চলছে। আমরা

কখনো তার প্রতি ঈমান আনব না। রাসূল বললেন, হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। -সূরা মু'মিনূন : ৩৫-৩৯

উক্ত আয়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তারা পরকালকে অবিশ্বাস করতো এবং এটাকে অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে করতো। মৃত্যুর পরে দেহ মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরে পুনরায় পুনরুত্থিত হওয়াকে তারা বিশ্বাস করতো না। তারা বলত যে, এটা অবাস্তব ও অসম্ভব। অর্থাৎ, হুদ (আ)-এর] এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। বরং এ পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন। আমরা এখানে মারা যাব, কিন্তু আর পুনরুত্থিত হব না। অর্থাৎ, এ পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যই হলো এই যে, এখানে এক গোষ্ঠী মারা যাবে অন্য আর এক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে। এ ধারণা ও বিশ্বাস ধর্মদ্রোহী নাস্তিকদেরও। কতিপয় নির্বোধ ও মূর্খ খোদাদ্রোহী নাস্তিকেরা এ কথাও বলে থাকে যে, "মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসে আর ভূমিগর্ভ তাদেরকে গ্রাস করে। পুনর্জন্মবাদীরা এ ধারণা পোষণ করে যে, "মৃত্যুর সাথে আত্মা চলে যায়। ছত্রিশ বছর পরে পুণরায় তা আবার এ পৃথিবীতে ফিরে আসে। এসব মনোভাব একেবারেই মিথ্যা, কুফরী, মূর্খতা, ভ্রান্ত ও অমূলক। এর স্বপক্ষে কোনই যুক্তি প্রমাণ নেই। এগুলো সব অসত্য ও ভিত্তিহীন বুলী। এ ভ্রান্ত মতাবলম্বীরা তাদের কুফরী ও ভ্রান্ত কথা দ্বারা শুধু তাদেরকেই প্ররোচিত করতে পারে, যারা মূখ, পাপী ও পথভ্রষ্ট। যেমন কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ -

অর্থ : (আমি তাদেরকে এ সব কিছু এজন্যই করতে দিচ্ছি যেন) যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দিল এর (মনোহর ধোঁকার) প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। আর যেসব কুকাজ তারা করতে চায় তা-ই যেন তারা করতে থাকে। -সূরা আনআ'ম : ১১৩

মোটকথা, হযরত হুদ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর কথার কোনই গুরুত্ব দিল না। তারা তাদের প্রাসাদ নির্মাণে ও কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ۞ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ۞

অর্থ : তোমাদের এ কি অবস্থা যে, তোমরা প্রতিটি উঁচু জায়গায় অনর্থক স্মারক হিসেবে দালান বানিয়ে ফেলছ এবং বড় বড় দালান-কোঠা বানাচ্ছ, যেন তোমরা চিরকালই থাকবে? -সূরা শু'আরা : ১২৮-১২৯

তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে রাজ ভবনের প্রাসাদ (বড় অট্টালিকা) নির্মাণ করছ? অথচ তোমাদের এ কাজগুলো অযথা ও নিরর্থক। কারণ, তোমাদের বসবাসের জন্য এগুলো আদৌ প্রয়োজন নেই। এগুলো তোমরা নির্মাণ করছ শুধু নিজেদের গর্ব প্রকাশ করার জন্য এবং জাঁক-জমক ও বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য।

হযরত হুদ (আ) এ ব্যাপারে তাদেরকে সাবধান করেছিলেন। আর সে তাবুগুলোর স্তম্ভও ছিল অতি উচ্চ ও মজবুত। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ۞

অর্থ : (হে রাসূল!) আপনি কি দেখেন নি, আপনার রব কী ব্যবহার করেছেন উঁচু থামওয়ালা ইরাম বংশীয় 'আদ জাতির সাথে? যাদের মতো জাতি দুনিয়ায় সৃষ্টি করা হয় নি?-সূরা ফাজর : ৬-৮

এ আদ জাতি প্রথম আদ, যাদেরকে ইরামও বলা হতো। তারা সুউচ্চ পিলার বিশিষ্ট তাবুতে বসবাস করতো। কেউ কেউ বলেন "ইরাম" স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত একটি অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ শহর। তাদের এ বক্তব্য ধারণা প্রসূত ও অযৌক্তিক। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোনই দলীল-প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ -

অর্থ : এবং বড় বড় দালান-কোঠা বানাচ্ছ, যেন তোমরা চিরকালই থাকবে? -সূরা শু'আরা : ১২৯

এ কথা বলা হয়েছে হযরত হূদ (আ)-এর জাতিসম্পর্কে। উক্ত আয়াতে বর্ণিত مصانع অর্থ কেউ বলেছেন প্রাসাদ, কেউ বলেছেন জলাশয় (জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্মিত অতি বিশাল চৌবাচ্চা), কেউ বলেছেন মৃত্যু থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে নির্মিত সুরক্ষিত মজবুত দুর্গ। অর্থাৎ তোমরা স্থায়ীভাবে থাকার উদ্দেশ্যেই এগুলো নির্মাণ করেছিলো। এরপরেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۞ وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۞ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۞ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۞ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : যখন তোমরা কাউকে পাকড়াও কর তখন তোমরা স্বেচ্ছাচারী হয়ে যাও। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। তোমরা তাঁকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। তিনি তোমাদেরকে গৃহপালিত পশু, সন্তান-সন্ততি, বাগান ও ঝরনাসমূহ সাহায্য হিসেবে দিয়েছেন। আমি তোমাদের উপর একটি বড় দিনের আযাবের ভয় করছি। -সূরা শু'আরা : ১৩০-১৩৫

আদ জাতি [হযরত হূদ (আ)-কে এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাও] বলেছে যে—

أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

অর্থ : তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যই এসেছ, যাতে আমরা শুধু এক আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বাদ দিই? আচ্ছা, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আমাদের উপর ঐ আযাব নিয়ে এসো দেখি, যার ধমকি আমাদেরকে তুমি দিয়ে থাক। -সূরা আ'রাফ : ৭০

অর্থাৎ, তুমি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিতে এসেছ যে, যাতে আমরা আমাদের দেব-দেবীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের মত ও পথের বিরোধিতা করি? আমাদের দ্বারা একাজ কখনই সম্ভব হবে না। যদি তোমার কথা সত্য হয়ে থাকে, তবে তোমার ওয়াদা অনুযায়ী আমাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আনয়ন কর। আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না এবং তোমার অনুসরণও করব না। আর তোমার কোনো প্রকার সহায়তাও করব না। অনুরূপভাবে তারা এ কথাও বলেছে যে—

سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ۞ إِنْ هٰذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ۞ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۞

অর্থ : তুমি নসীহত কর বা না কর, আমাদের জন্য সবই সমান। এসব কথা তো এভাবেই চলে এসেছে। আমাদের উপর কোনো আযাব আসবে না। -সূরা শু'আরা : ১৩৬-১৩৮

আদ জাতির উক্তি "এটা তো পূর্ববর্তী নবীগণের স্বভাব" এটা উল্লিখিত আয়াতের অনুবাদ। এ আয়াতে خُلُقُ শব্দটির خ ও ل অক্ষর দু'টিতে যদি যবর দিয়ে পড়া হয়, তবে এর অর্থ হবে এই যে—

"এ কথাসমস্ত তোমার সৃষ্ট এবং পূর্ববর্তীগণের কিতাব থেকে সংগৃহীত।" কতক সাহাবী এবং তাবেঈ এরূপ তাফসীর করেছেন। আর যদি خُلُقُ শব্দটির خ ও ل অক্ষর দু'টির উপর পেশ দিয়ে পড়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে- "এই ধর্ম যে ধর্মের উপর আমরা রয়েছি, এটা আমাদের পিতৃপুরু থেকে চলে আসছে। আর তাদের সে ধর্ম কখনই বাদ দিতে পারব না। আর এর মধ্যে কোনো পরিবর্তনও করতে পারব না। আমরা এ ধর্মের উপর অটল ও অবিচল থাকব- إِنْ هٰذَآ إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ এ আয়াতের উভয় অর্থের সাথেই পরবর্তী আয়াত- وَمَا نَحْنُ

بِمُعَذَّبِيْنَ "আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্গত নই) এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। তারপর হযরত হুদ (আ) তাদেরকে সুন্দর ভাষায় যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۔

অর্থ : (হুদ) বললেন, তোমাদের উপর তোমাদের রবের লা'নত ও গযব পড়ে গেছে। তোমরা কি আমার সাথে ঐ নামগুলো নিয়ে ঝগড়া করছ, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছ?[১] এ সবের জন্য আল্লাহ কোনো সনদ নাযিল করেন নি। ঠিক আছে, তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। –সূরা আ'রাফ : ৭১

অর্থাৎ, তোমরা উল্লিখিত কুফরী কার্যক্রমের কারণে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষ, ক্রোধ ও শাস্তির পাত্র হয়ে গেছ। তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণে যে কর্মগুলো করছ, এর স্বপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলীল অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা কি লা-শারীক এক আল্লাহর সাথে এমন কতকগুলো দেব-দেবীকে শরীক করছ, যেগুলো তোমরা নিজেদের হাত দ্বারা নির্মাণ করে সেগুলোকে নিজেরাই উপাস্য বলে ঘোষণা করেছ? আর তোমরা একত্ববাদের সত্য দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছ এবং মিথ্যা ও শিরকের উপর অটল রয়েছ। তোমাদের কৃতকর্ম থেকে তোমাদেরকে সাবধান করা, আর না করা এখন সমান হয়ে গেছে। অতএব তোমরা আল্লাহর আযাবে অপেক্ষায় থাক। যে শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। এ শাস্তি তোমাদের থেকে কখনই সরিয়ে নেয়া হবে না। আর এ শাস্তি হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ ۞ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

অর্থ : রাসূল বললেন, হে আমার রব! এ লোকেরা যে আমাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল, এ ব্যাপারে আপনিই আমাকে সাহায্য করুন। আল্লাহ জবাব দিলেন, ঐ সময় কাছেই আছে, যখন তারা তাদের এ কাজের জন্য আফসোস করবে। অবশেষে সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমি তাদেরকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম। দূর হও যালিম কাওম। –সূরা মুমিনূন : ৩৯-৪১

আল্লাহ তা'আলা হুদ (আ)-এর জাতি সম্পর্কে আরো বলেন—

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۫ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ؕ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۭ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

১. অর্থাৎ, তোমরা কাউকে বৃষ্টির, কাউকে বাতাসের, কাউকে ধন-দৌলতের আবার কাউকে রোগব্যাধির দেবতা বল; কিন্তু আসলে তাদের কেউ-ই কোনো জিনিসের মালিক নয়। এগুলো তোমাদের মনগড়া নিছক কতক 'নাম' মাত্র। যারা এ সব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করে, তারা আসলে কতক নাম নিয়ে মাত্র বিবাদ করে; কোনো বস্তুক জিনিস নিয়ে তাদের বিবাদ নয়।

অর্থ : তারা বলল, তুমি কি আমাদের মা'বুদদের থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো না দেখি। তিনি (হূদ (আ)) বললেন, এ বিষয়ে ইলম তো আল্লাহর কাছেই আছে।[১] আমি তো শুধু ঐ বাণী তোমাদের কাছে পৌছাচ্ছি, যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি যে, তোমরা এক জাহেল কাওম। তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয়, বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[২] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। এর রবের হুকুমে সে প্রত্যেক জিনিসকে ধ্বংস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা হলো যে, তাদের থাকার জায়গাটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে বদলা দিয়ে থাকি। -সূরা আহকাফ : ২২-২৫

হযরত হূদ (আ)-এর জাতির (অবিশ্বাসীদের) ধ্বংসের কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে বলেন। যা সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَأَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : অবশেষে আমার মেহেরবাণীতে হূদ ও তার সাথীদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ সব লোকের মূল কেটে দিলাম, যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করেছিল ও যারা মু'মিন ছিল না। -সূরা আ'রাফ : ৭২

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন—

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ ۗ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۞ وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۞

অর্থ : তারপর যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দ্বারা হূদকে ও যারা তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে নাজাত দিয়ে দিলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। এরাই হলো আ'দ জাতি। তারা তাদের রবের আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাঁর রাসূলগণকে অমান্য করেছে এবং সত্যের প্রত্যেক শক্তিমান দুশমনকে মেনে চলেছে। অবশেষে এ দুনিয়াতেও তাদের উপর লা'নত পড়েছে এবং কিয়ামতের দিনও। শুনে রাখ, আ'দ জাতি তাদের রবের প্রতি কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হূদের কওম আ'দ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। -সূরা হূদ : ৫৮-৬০

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۞

অর্থ : অবশেষে সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমি তাদেরকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম। দূর হও যালিম কওম। -সূরা মু'মিনূন : ৪১

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বললেন—

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

---

১. অর্থাৎ, তোমাদের উপর যখন আযাব পাঠানো হবে এবং কতদিন পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে তার জ্ঞান।

২. এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, কে তাদের এ উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।

অর্থ : শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মিথ্যা মনে করল। আর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটি নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। আসল সত্য এটাই যে, আপনার রব বড়ই শক্তিশালী ও দয়াবান। -সূরা শু'আরা : ১৩৯-১৪০

হযরত হুদ (আ)-এর জাতির উপর শাস্তি প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۔

অর্থ : তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয়, বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[১] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। -সূরা আহকাফ : ২৪

এটা ছিল তাদের উপর প্রথম পর্যায়ের শাস্তি। কঠিন দুর্ভিক্ষ, অভাব অনটন ও অনাবৃষ্টিসহ তারা বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখীন হয়। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা বৃষ্টির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। হঠাৎ আকাশে মেঘ দেখতে পেয়ে তারা ধারণা করল যে, এ মেঘ তাদের জন্যে রহমতের বৃষ্টি নিয়ে এসেছে। মূলত এ মেঘ ছিল ভয়ানক আযাবের বৃষ্টি বহনকারী।

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۔ "বরং ওটা ঐ জিনিস, যার জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।" -সূরা আহকাফ : ২৪

এ কথাটি হলো তাদের সে কথার পরিবর্তে যে, [হে হুদ (আ)!] "তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা আনয়ন কর।"

আদ জাতির উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হওয়া প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ইবনে ইয়াসারের বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই যে, হযরত হুদ (আ)-এর জাতির লোকেরা যখন তাঁর দাওয়াতকে সরাসরি ত্যাগ করে কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন তাদের উপর তিন বছর যাবত রহমতী বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হলো। ফলে তারা ভীষণ অভাব-অনটন ও কষ্টের মধ্যে পতিত হয়। সে যুগে নিয়ম ছিল যে, তখনকার কাফিরেরাও যদি কোনো মসীবতের সম্মুখীন হতো, তখন তারা সে মসীবত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের সম্মানিত ঘর "বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করতো। সে সময় এ প্রচলন ছিল অতি প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে সবাই ছিল জ্ঞাত। তখন হারম শরীফে আমালিক জাতি বাস করতো। এ আমালিক সম্প্রদায় হলো আমালিক। ইবনে লাওজ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)-এর বংশধর। তখন তাদের সর্দার ছিল মু'আবিয়া ইবনে বকর। আর মু'আবিয়ার মা ছিলেন আদ বংশোদ্ভূত। তার নাম ছিল জালহাযা বিনতে খায়বারী। আদ সম্প্রদায় এ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রায় সত্তর জন লোকের একটি প্রতিনিধি দলকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রেরণ করে। এ দলটি মক্কার নিকটস্থ মু'আবিয়া ইবনে বকরের বাড়ীতে গিয়ে ওঠে এবং সেখানে একমাস অবস্থান করে। সেখানে বসে তারা মদ পান করতো এবং বিভিন্ন ধরনের আমোদ-প্রমোদ করতো। মু'আবিয়া ইবনে বকরের দু'টি অসঙ্কচিত্রা নর্তকী ছিল। সে নর্তকী দু'জন বিবস্ত্র অবস্থায় তাদের সামনে নাচ গান করতো। এভাবে আনন্দ উল্লাসের মধ্যে তাদের একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল। প্রতিনিধি দলটির এরূপ দীর্ঘদিন অবস্থানে মু'আবিয়া ইবনে বকরের মনে তাদের ফিরে যাওয়া সম্পর্কে চিন্তার উদ্ভব হলো। অর্থাৎ, তারা যে কাজের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফে আগমন করেছে, সে কাজটি করে দ্রুত তাদের স্বদেশ ফিরে যাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করলেন। কিন্তু তিনি তার সম্প্রদায়ের ভালবাসায় তাদেরকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করেন। তাই তিনি উক্ত প্রতিনিধি দলের আগমনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য একটি কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারেও

১. এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, কে তাদের এ উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।

ইঙ্গিত ছিল। মু'আবিয়া কবিতাটি রচনা করে তার নর্তকীদের কাছে দেন এবং কবিতাগুলো প্রতিনিধি দলকে সংগীতের মধ্যে শুনানোর জন্য বলেন।

কবিতাগুলোর ভাবার্থ ছিল এরূপ– হে প্রতিনিধি দল! তোমাদের উপর আফসোস! তোমরা বিনয়ের সাথে (প্রার্থনার জন্যে) দাঁড়িয়ে যাও। আশা করা যায় আল্লাহ মেঘ দ্বারা আমাদের প্রতি দয়া করবেন। আর সে মেঘ আদ সম্প্রদায়ের জমিনকে পানিতে পরিপূর্ণ করে দিবে। অনাবৃষ্টি ও অভাব-অনটনের কারণে আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, যার ফলে তারা কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। এদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ ও শিশু, তাদের জীবনের কোনই আশা-ভরসা পাচ্ছি না। তাদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মহিলারাও এখন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এখন তাদের ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেছে। তাদের গবাদি পশুগুলো কৃষকায় হয়ে গেছে। আদ সম্প্রদায়ের উপর এখন মহাবিপদ। অথচ দিন রাত তোমরা এখানে বসে আমোদ-প্রমোদ করছ। তোমাদের কোনই চিন্তা নেই। তোমরা আদ জাতির প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছ। কিন্তু তোমরা প্রশংসা ও নিরাপত্তা পাওয়ার উপযুক্ত নও।"

এ কবিতাটি শ্রবণ করে প্রতিনিধি দল তাদের আগমন সম্পর্কে সচেতন হলো এবং হারাম শরীফে গিয়ে নিজ গোত্রের জন্য প্রার্থনা করল। এ প্রার্থনা মজলিসের পরিচালক ছিল তাদের দলপতি কায়ল ইবনে আনায। এ সময় আল্লাহ তাদের উপর সাদা, কালো ও লাল এ তিন রংয়ের মেঘ প্রেরণ করেন। তারপর আকাশ থেকে একজন অদৃশ্য ঘোষক এ ঘোষণা দেন যে, "তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে এ মেঘসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি মেঘ পছন্দ কর। তখন কায়ল ইবনে আনায কালো রং এর মেঘ পছন্দ করে নিল। সে মনে করেছিল, কালো মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তারপর অদৃশ্য ঘোষক বললেন, হে কায়ল! তুমি যে মেঘখণ্ড পছন্দ করেছ, সেটি হচ্ছে ধ্বংস ও বিনাশকারী। তুমি এ পছন্দ দ্বারা বনূ লুদিয়া ব্যতীত আদ সম্প্রদায়ের অন্য সকলকেই ধ্বংস করে দিয়েছ। অর্থাৎ, এ মেঘ শুধু বনূ লুদিয়া ছাড়া আদ সম্প্রদায়ের অন্য সকলকেই ধ্বংস করে দেবে। পিতা পুত্র কাউকেই ছেড়ে দেবে না। বনূ লুদিয়া আদ সম্প্রদায়ের-ই একটি গোত্র। তারা মক্কায় অবস্থান করতো। তাদের (আদ) জাতির উপর যে আযাব আপতিত হয়েছিল, (মক্কা শরীফে অবস্থান করার কারণে) তারা (বনূ লুদিয়া) সে আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া এ (বনূ লুদিয়া) সম্প্রদায়েরই বংশধর হলো পরবর্তী আদ, অর্থাৎ, দ্বিতীয় আদ। তারপর আল্লাহ তা'আলা সে কালো মেঘটি আদ সম্প্রদায়ের দিকে দ্রুত গতিতে অগ্রসর করলেন, যেটি প্রতিনিধি দলের নেতা কায়ল ইবনে আনায পছন্দ করেছিল। মেঘটি আদ সম্প্রদায়ের "মুগীস" নামক জনপদে পৌঁছে গেল। সেখানকার লোকেরা মেঘ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং একে অপরকে বলতে লাগল যে, "এ মেঘ আজ বৃষ্টি বর্ষণ করবে।" আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন—

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ـ

অর্থ : (হূদ (আ) বললেন,) বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[১] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। এর রবের হুকুমে সে প্রত্যেক জিনিসকে ধ্বংস করে দেবে।

–সূরা আহকাফ : ২৪–২৫

এ মেঘ যে তাদের জন্য আযাব বহনকারী, তা ফাহাদ নামী একজন মহিলা সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছে। সে মেঘের প্রকৃত অবস্থা দেখেই চীৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে। যখন হুশ ফিরে আসে, তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, ফাহাদ তুমি কি দেখেছিলে? সে (ফাহাদ) বলল, আমি (এ মেঘের অন্তরালে) অগ্নি শিখার মতো ঝঞ্ঝাবায়ু দেখতে পেয়েছি। কয়েকজন লোক যার অগ্রভাগে থেকে তা হাকিয়ে নিয়ে আসছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সেই ঝঞ্ঝারূপী শাস্তি সাত রাত সাত দিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চালু রাখেন। এ

১. *এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, কে তাদের এ উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।*

ঝড়ঝঞ্ঝা আদ সম্প্রদায়ের কাউকেই ছেড়ে দেয় নি। এ সময় হযরত হূদ (আ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে 'খাঈরা' নামক একটি জনপদে প্রবেশ করেন। সেখানে তারা নিরাপদেই ছিলেন। এ ঝড়ে তাঁদের বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি হয় নি। বরং সে প্রবল ঝড়ো বায়ুর পরশে তাঁদের ত্বকের লাবন্যতা আরো বৃদ্ধি পেল এবং (আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে) তাঁদের মনটা আনন্দে ভরে গেল। আকাশ ও পৃথিবীময় এ প্রলয়ঙ্কারী ঝড় আদ জাতির উপর আঘাত হেনে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল।

ইমাম আহমদ (রহ)-ও তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হারিস ইবনে হাসান (রা)-এর সূত্রে উক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা আলোচনা করেছেন। হারিস ইবনে হাসান (রা) বলেন, আমি একবার আলা ইবনে হাযরামীর বিরুদ্ধে কোনো একটি ব্যাপারে অভিযোগ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে রওয়ানা হলাম। 'রাবযা' নামক স্থানে পৌঁছে দেখতে পাই যে, সেখানে বনী তামীমের এক বৃদ্ধা পথ হারিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখে সে (বৃদ্ধা) বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমি বিশেষ প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে যেতে চাই। আপনি কি আমাকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন? (হারিস বলেন) তখন আমি তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় মসজিদে নববীতে এসে পৌঁছলাম। এ সময় মসজিদে অসংখ্য লোক সমবেত ছিল। সেখানে একটি কালো পতাকা উড়ছিল। হযরত বিলাল (রা) কোষবদ্ধ তলোয়ার হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে এত লোকের সমাবেশ কি কারণে? লোকেরা বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত "আমর ইবনে আস (রা)-এর নেতৃত্বে একদল মুসলিম বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য পাঠাচ্ছেন। হারিস (রা) বলেছেন, তখন আমি বসে পড়লাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হুজরা মোবারকে প্রবেশ করেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়। তারপর আমি হুজরা মোবারকে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, বনূ তামীম ও তোমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে নাকি? আমি (হারিস) আরয করলাম, জী হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছি। আপনার পবিত্র খেদমতে আসার পথে (রাবয নামক স্থানে) বনূ তামীমের এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে (বৃদ্ধা) পথ হারিয়ে রাস্তায় একা বসে রয়েছিল। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে, আমি তাকে সাথে করে আপনার দরবারে নিয়ে এসেছি। সে এখন আপনার দরজার সামনেই আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে সে (বৃদ্ধা) ভেতরে প্রবেশ করল। অতঃপর (বৃদ্ধার সামনেই) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি যদি আমাদের ও বনূ তামীমের মধ্যে একটি সীমানা নির্ধারণ করে দিতেন, তবে এ যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যেত এবং তাদের এলাকাও নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কেননা তারা (বনূ তামীম) আমাদের মধ্যেই বসবাস করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হারিস ইবনে হাসানকে বললেন, তুমি যে বৃদ্ধাকে সাথে নিয়ে এসেছ, তার সাথেই এর মিমাংশা করে নাও। অর্থাৎ তাকেই আমি এর মিমাংশাকারী নির্ধারণ করে দিলাম। তখন বৃদ্ধা হারিস ইবনে হাসানের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এমন একটি কথা বলল, যাতে হারিস মনে খুব কষ্ট পেলেন। হারিস (রা) বললেন, আমি বৃদ্ধার এ কথা শুনে বললাম, আমি এ বৃদ্ধার প্রতি সম্মান দেখালাম। তাকে নিভৃত এলাকা থেকে সাওয়ারীতে উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নিয়ে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিলাম। তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করলাম। আমি তাকে যখন উঠিয়ে নিয়েছি, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি যে, সে আমার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করবে।

আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করছি, যেন আমি আদ গোত্রের প্রতিনিধির ন্যায় না হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে হারিস! আদ জাতির প্রতিনিধি আবার কিরূপ ছিল? হারিস (রা) বলেন, যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের চেয়েও এ সম্পর্কে বেশি জানতেন। তবুও একটু রসাস্বাদন করার উদ্দেশ্যে আমাকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। তখন আমি আরয করলাম, আদ জাতি একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষের মধ্যে পতিত হয়। তারা কায়লের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দলটি মু'আবিয়া ইবনে বকরের বাড়ীতে এসে ওঠে

এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করে। এ সময় জারদাতান নামী মু'আবিয়ার দু গায়িকা তাদেরকে গান শুনাত। এভাবে এক মাস গত হয়ে যাবার পরে, তারা "তেহমা" পর্বতের কাছে এসে প্রার্থনা করল, হে আল্লাহ! আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আমরা কোনো রোগীর চিকিৎসার জন্যে আসি নি এবং কোনো কয়েদীর ব্যাপারেও আসি নি যে, তাকে ছেড়ে দেবে। হে আল্লাহ! আদ জাতির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন, যেভাবে প্রথমে আপনি করেছিলেন।" দলপতি কায়ল এ প্রার্থনা যখন করল, তখন আকাশে মেঘে ছেয়ে গেল। অদৃশ্য থেকে ঘোষণা এল, (হে কায়ল) এ মেঘের মধ্য থেকে একখানি মেঘকে তুমি পছন্দ কর। তখন সে (কায়ল) কালো মেঘ খণ্ড করল। তখন আবার অদৃশ্যভাবে তাকে বলা হলো, ধ্বংস ও বিনষ্টতাকেই তুমি বেছে নিয়েছ। তোমার এ পছন্দ দ্বারা আদ জাতির একটি লোকও বেঁচে থাকবে না। অর্থাৎ, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি এতটুকু পর্যন্ত তথ্য পেয়েছি যে, আমার হাতের এ আংটির ফাঁকা জায়গা থেকে যে পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হতে পারে, ততটুকুই ঝঞ্ঝাবায়ু আদ সম্প্রদায়ের উপর প্রেরিত হয়েছিল। আর এতেই তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।

আবূ ওয়ায়েল বলেছেন, এ হাদীসটি সত্য। এ সময় (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে) আরবের লোকেরা কোনো পুরুষ ও নারীকে তাদের প্রতিনিধি করে কোথাও পাঠালে বলে দিত যে, "তোমরা আদ জাতির প্রতিনিধির মতো হয়ো না।" তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর এবং অনেক মুফাসসিরগণ তাদের তাফসীর গ্রন্থেও এ হাদীসটি ও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথাও বুঝা যায়। (কারণ, এ বর্ণনার মধ্যে কোথাও মক্কা এবং সেখানে আদ সম্প্রদায়ের অবস্থান এবং আল্লাহর আযাব থেকে তাদের রক্ষা পাওয়ার কথা উল্লেখ নেই।) এছাড়া এটি বুঝার আরো কারণ রয়েছে যে, ইবনে ইসহাক (রহ) আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনায় মক্কা শরীফের কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-কে রেখে আসেন তখন সেখানে মক্কা শহর বলতে কিছুই ছিল না। পরবর্তীতে জুরহাম গোত্র তাদের কাছে এসে বসতি প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরে বর্ণিত হবে। আর প্রথম আদ হলো হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বের জাতি। এছাড়াও প্রথম বর্ণনায় আদ সম্পর্কে মু'আবিয়া ইবনে বকরের রচিত একটি কবিতার উল্লেখ রয়েছে। যে কবিতাটি তাদের পরবর্তী সময়ে রচিত। প্রথম যমানা লোকদের ভাষার সাথে এ কবিতার কোনই মিল নেই। আর এ ঘটনার বর্ণনায় যে মেঘের কথা বলা হয়েছে, সেখানে অগ্নিশিখার উল্লেখ রয়েছে। অথচ প্রথম তাদের ধ্বংস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা (প্রথম আদ) তীব্র ঠাণ্ডা বায়ুতে ধ্বংস হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ (রা)-ও বলেছেন যে, প্রথম আদের উপর শাস্তিরূপে যে বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল, তা ছিল কঠিন ঠাণ্ডা ও ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণি বায়ু। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۔

অর্থ : (আল্লাহ) তাদের উপর একটানা সাত রাত ও আট দিন (এ মহাবিপদ) চাপিয়ে রেখেছিলেন।

–সূরা হা-ক্কাহ : ৭

অর্থাৎ, একাধারে সাত রাত ও সাত দিন পর্যন্ত এ তীব্র ঠাণ্ডা ও ধ্বংসকারী বায়ু তাদের উপর প্রবাহিত হয়েছিল। এক বর্ণনা অনুসারে, এ শাস্তি আরম্ভ হয়েছিল শুক্রবার দিনে। অপর এক বর্ণনা মতে বুধবারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۔

অর্থ : তুমি (ওখানে থাকলে) দেখতে যে, তারা খেজুর গাছের পচা কাণ্ডের মতো লুটিয়ে পড়ে আছে।

–সূরা হা-ক্কাহ : ৭

এ আয়াতে, তাদের মৃতদেহগুলোকে মাথাবিহীন খেজুর কাণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, প্রবল ঘূর্ণিবায়ু আদ জাতির উপর এসে তাদেরকে প্রথম শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে মুখমণ্ডল নীচের দিকে করে খুব জোরে নিক্ষেপ করে। ফলে মাথা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে মাথাবিহীন অবস্থায় তাদের লাশগুলো পড়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ.

অর্থ : আমি অবিরাম চলতে থাকা এক অশুভ দিনে কঠিন ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম।
–সূরা কামার : ১৯

অর্থাৎ, অবিরাম ধারায় তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি বর্ষণ হয়েছিল। এ শাস্তির কারণে শেষ পর্যন্ত তারা মাথাবিহীন লাশ অবস্থায় পড়ে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন—

تَنْزِعُ النَّاسَ ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ.

অর্থ : যা মানুষগুলোকে উপরে তুলে এমনভাবে ছুড়ে ফেলেছিল, যেন তারা উপড়িয়ে ফেলা খেজুর গাছের গুঁড়ি। –সূরা কামার : ২০

কুরআন মাজীদে যে বলা হয়েছে, "অশুভ দিনে আমি বায়ু প্রেরণ করি", কেউ কেউ বলেন, এ অশুভ দিনটি বুধবার। আর এ কারণে তারা এ দিনটিকে অশুভ দিন বলে মনে করে থাকেন। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা। আর এরূপ মনে করা কুরআন মাজীদের পরিপন্থী। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই বর্ণনা করেছেন—

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ.

অর্থ : অবশেষে আমি কতক অশুভ দিনে তাদের উপর কঠিন ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়ে দিলাম।
–সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১৬

এ আয়াতে বর্ণিত, "অশুভ দিনে" শব্দটি বহু বচন। এ আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, অবিরামভাবে আট দিন এ ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের উপর প্রবাহিত হয়েছিল। তাহলে এ সব দিনগুলোই অশুভ হয়ে যায়। কিন্তু এমন অযৌক্তিক ও অবাস্তব কথা কেউ বলে নি।

উই আয়াতে যে দিনগুলোকে অশুভ বলা হয়েছে, সে দিনগুলো শুধু আদ সম্প্রদায়ের জন্যই নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ, এ দিনগুলো আদ জাতির জন্যই অশুভ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা বলেন—

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ.

অর্থ : আর (তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে) 'আদ জাতির মধ্যে– যখন তাদের উপর এমন ক্ষতিকর বাতাস পাঠালাম। –সূরা যারিয়াত : ৪১

অর্থাৎ, এমন বায়ু, যা কোনো মঙ্গল বয়ে আনে না। সে বায়ু না বৃষ্টির মেঘ বয়ে আনতে পারে, আর না কোনো বৃক্ষ, তরুলতা ও শস্যাদি ফলাতে পারে। বরং সে মেঘ ছিল ভয়ংকর অনুর্বর। এর মধ্যে কোনো প্রকার মঙ্গল ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন—

وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۗ اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ বানাবে না, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।১ –সূরা যারিয়াত : ৫১

অর্থাৎ, এ বায়ু সবকিছুই ধ্বংসাবশেষ ও বিধ্বস্ত জীর্ণ বস্তুর মতো করে দিয়েছে। যা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। যার দ্বারা উপকৃত হবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে পুবাল হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পশ্চাত থেকে প্রবাহিত বিধ্বংসী হাওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। -বুখারী ও মুসলিম

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ ۗ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۔

অর্থ : এদেরকে 'আদ জাতির ভাই [হূদ (আ)]-এর কাহিনী একটু শোনাও। যখন তিনি আহকাফে তাঁর কওমকে সাবধান করেছিলেন- এ ধরনের সাবধানকারী এর আগেও এসেছে এবং পরেও এসেছে, (এ কথা বলে) যে, "আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না; আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়ানক আযাবের দিনের আশঙ্কাবোধ করছি"। -সূরা আহ্কাফ : ২১

এ স্থানে "আদ" দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রথম তাদের কথা বুঝা যায়। কারণ, এর পূর্বে ও পরের আলোচনা ছামূদ সম্প্রদায়ের আলোচনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ ঘটনায় যে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হলো দ্বিতীয় আদ। এ সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়ার জন্য হযরত আয়েশা (রা)-এর একখানা হাদীস পরে উপস্থাপন করব। সে হাদীসের দ্বারাই এ বিষয়ে কিছুটা অবগত হওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۔

অর্থ : তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। -সূরা আহ্কাফ : ২৪

আদ জাতির লোকেরা যখন আকাশের ঘন কালো মেঘ দেখল, তখন তারা ধারণা করল যে, এ মেঘ বৃষ্টি দান করবে। অথচ তা ছিল শাস্তির মেঘ। তারা এ মেঘকে তাদের জন্য মঙ্গলময় মনে করেছিল। অথচ সে মেঘ তাদের জন্য আযাব বয়ে এনেছিল। তারা মনে করেছিল, এ মেঘ শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনবে। কিন্তু এ মেঘ দ্বারা তারা পেয়েছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের অশান্তি ও অমঙ্গল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۔

অর্থ : তা নয় বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করেছিলে।[১] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। -সূরা আহ্কাফ : ২৪

এখানে শাস্তি দ্বারা সেই ঘূর্ণিবায়ুকে বুঝানো হয়েছে, যা ছিল কঠিন ঠাণ্ডা ও বিধ্বংসী। যা সাতদিন ও আটরাত পর্যন্ত অবিরামভাবে তাদের উপর বয়েছিল। এ ঝড় থেকে কেউই রক্ষা পায় নি। এমনকি গুহায়, পাহাড়ের অভ্যন্তরে পর্যন্ত এ বায়ু প্রবেশ করে সেখানকার আশ্রয়ীদেরকে বের করে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্গ সদৃশ সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ উৎপাটন করে তাদের মৃতদেহের উপর ফেলে রেখেছে। তারা নিজেদেরকে খুব শক্তিমান মনে করে অহংকার করে বলত, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে হতে পারে? এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আযাব নিপতিত করলেন এ বিধ্বংসী ঝড়ঝঞ্ঝা, যা ছিল তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। এমনও হতে

---

১. *এ কথাগুলো যদিও আল্লাহ তা'আলার বাণী, তবুও এখানে বক্তা আল্লাহ তা'আলা নিজে নন; বরং নবী করীম ﷺ। প্রকৃতপক্ষে যেন আল্লাহ তা'আলা নবীর যবানে বলাচ্ছেন, "আল্লাহর দিকে ধাবিত হও, আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছি।"*

২. *এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, কে তাদের এ উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।*

পারে যে, সেই প্রবল বায়ু মেঘের সৃষ্টি করে। যে মেঘ দেখে বেঁচে থাকা লোকগুলো মনে করেছিল, এই মেঘ আমাদের উপর শাস্তিদায়ক রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবে। এ বৃষ্টির ফলে হয়তো আমরা কিছু সংখ্যক লোক বেঁচে থাকব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর অগ্নি শিখা বর্ষণ করলেন। কিছু সংখ্যক মুফাসসির এরূপ অভিমত পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে মাদায়েনবাসী (শূআয়েব (আ)-এর সম্প্রদায়)-দের সাথেও হয়েছিল। তাদেরকেও ঠাণ্ডা বায়ু ও পরে আগুনের বর্ষণ দ্বারা কঠিন শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সেই শাস্তি ছিল খুবই কঠিন, যে শাস্তি দেয়া হয় বিপরীতধর্মী বস্তু দ্বারা এবং যে শাস্তির সাথে নিপতিত হয় বিকট ও ভয়ংকর ধ্বনি। যা সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থ : অবশেষে সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমি তাদেরকে আবর্জনার মতো ফেলে দিলাম। দূর হও যালিম কওম। –সূরা মু'মিনূন : ৪১

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ঘূর্ণি বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল, সে বায়ু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আংটি পরিমাণ স্থান দিয়ে খুলে দিয়েছিলেন। সে বায়ু প্রথমে পল্লী এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেখানকার লোকজন, জীব-জন্তু ও ধন-সম্পদ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ ঘূর্ণিবায়ুর দৃশ্য দেখে আদ সম্প্রদায়ের শহরবাসীরা বলতে লাগল যে, এই তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি দান করবে। তারপর এ ঘূর্ণি বায়ু পল্লী এলাকার উঁচু স্থানের অধিবাসীদেরকে নিম্নঅঞ্চলে অবস্থিত শহরবাসীদের উপর ভূপাতিত করল।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদ জাতির উপর অতটুকু বায়ু খুলে দিয়েছিলেন, যতটুকু বায়ু একটি আংটির মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে নির্গমন হয়। সে বায়ু আদ জাতির উঁচুস্থানের পল্লীবাসীদেরকে নিচে শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করেছিল। শহরবাসীরা যখন এই মেঘ দেখেছিল, তখন বলতে লাগল যে, যেই মেঘ আমাদের দিকে আসছে। তা আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে। তারপর গোটা পল্লীবাসীকে শহরবাসীর উপর নিক্ষেপ করা হলো। ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল।

বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রবল বায়ু তাদের আলমারি, দরজা, ও জানালা পর্যন্ত ধ্বংস করেছিল। কয়েকজন মুফাসসিরের মতে এ ঝড়বায়ু তাদের উপর প্রবাহিত হয়েছিল এমন প্রবল ও প্রচণ্ড বেগে, যার কোনো পরিমাণ ছিল না। তবে উপরোক্ত হাদীসের সূত্র (সনদ) রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এছাড়া এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মুসলিম-মালাঈর ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং হাদীসটি মুযতারিব পর্যায়ের। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দু'আ পাঠ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهٖ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! এ বায়ুর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এ বায়ুর সাথে যে কল্যাণ প্রেরিত হয়েছে আপনার কাছে তার আমি প্রার্থনা করি এবং এর মধ্যে যে অকল্যাণ ও অসম্মান নিহিত রয়েছে তার থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। –মুসলিম

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত। এ সময় তিনি ﷺ কখনো ঘর থেকে বাইরে বের হতেন, আবার কখনো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেন। আবার কখনো সম্মুখে যেতেন, আবার পিছনে যেতেন। মোটকথা তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়তেন। যখন বৃষ্টি পড়ত তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হতেন।

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে তাঁর এরূপ অস্থির হয়ে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, হে আয়েশা! আদ সম্প্রদায় যে মন্তব্য করেছিল, আবার সেরূপ না হয়ে পড়ে। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন—

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۖ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ .

অর্থ : তারপর যখন তারা আযাবকে তাদের এলাকার দিকে আসতে দেখল তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। তা নয়, বরং এটা ঐ জিনিস, যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করেছিলে।[১] এটা এমন তুফানি বাতাস, যার ভেতর কষ্টদায়ক আযাব রয়েছে। –সূরা আহকাফ : ২৪

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো এমনভাবে হাসতে দেখি নি যে, তাঁর পবিত্র মুখ গহ্বর দেখা যেত। যখন তিনি হাসতেন, তখন শুধু মুচকি হাসি দিতেন। যখন তিনি আকাশে মেঘ অথবা ঘূর্ণিঝড় দেখতেন, তখন অস্থিরতার চিহ্ন তাঁর চেহারা মোবারকে দেখা যেত।

আমি একবার আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! লোকেরা যখন মেঘ দেখে, তখন এ আশায় খুব খুশি হয় যে, এই মেঘে বৃষ্টি হবে। অথচ আপনাকে দেখতেছি যে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে, আপনার চেহারা মোবারকে অস্থিরতার চিহ্ন দেখা যায়। অর্থাৎ আপনি খুব অস্থির হয়ে পড়েন। (এর কারণ কি?) রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, হে আয়েশা! "এ মেঘ যে শাস্তির মেঘ" সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কেও তুফানি বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। আর এক এই মেঘ দেখে বলেছিল যে, "এ মেঘ আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে"। এ হাদীস স্পষ্টভাবে এ ইঙ্গিত করেছে যে, সূরা আহকাফে বর্ণিত "স্মরণ কর! আদ জাতি ভ্রাতার কথা" দ্বারা যে ঘটনাটির কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি দ্বিতীয় আদের কথা। এর পূর্বের ও পরের বর্ণিত ঘটনা প্রথম আদম সম্পর্কে।

ইমাম মুসলিম (রহ) হারূন ইবনে মারূফ থেকে এবং ইমাম বুখারী (রহ) ও আবূ দাউদ (রহ) ইবনে ওহাব থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত হূদ (আ)-এর হজ্জের বর্ণনা প্রথমেই হযরত নূহ (আ)-এর আলোচনায় করা হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) বলেন, হযরত হূদ (আ)-এর কবর ইয়ামান দেশে অবস্থিত। কারো কারো মতে, তাঁর কবর দামেশকে অবস্থিত। দামেশকের জামে মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম পাশে একটি দেয়াল রয়েছে। সেটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে বেষ্টিত। অনেকে মনে করে, সেটিই হযরত হূদ (আ)-এর কবর।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا أَبَدًا .

---

১. *এখানে এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলা হয় নি যে, কে তাদের এ উত্তর দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, এ হচ্ছে মেঘ, যা তাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ছিল এক ভয়ানক তুফান, যা তাদেরকে ধ্বংস করতে এসেছিল।*

হযরত সালেহ (আ)-এর কাহিনী

হযরত সালেহ (আ) ছামূদ জাতির পয়গম্বর ছিলেন। ছামূদ একটি প্রসিদ্ধ জাতির তাদের পূর্বপুরুষের একজনের নাম ছিল ছামূদ। এর নাম অনুপাতেই তারা ছামূদ জাতি নামে অভিহিত হয়। বর্ণিত আছে, ছামূদ-এর এক ভাই ছিল জুদায়স। তারা উভয়ই ছিল আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ-এর পুত্র। ছামূদ জাতি ছিল বাঁটি আরবভাষী। হিজায ও তাবূকের মধ্যবর্তী স্থান 'হিজর'-এ তারা বসবাস করতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধে গমনের সময় এই পথ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে মুসলিম বাহিনীরাও ছিল। ছামূদ জাতির আবির্ভাব হয় আদ জাতির পরে। এরাও আদ জাতির মতো মূর্তি পূজা করতো। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকেই তাঁর এক প্রিয় বান্দাকে রাসূল করে তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ছিলেন সালেহ (আ)। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপ—

সালেহ ইবনে আবদ ইবনে মাসিহ্ ইবনে ওবায়দ ইবনে হাজির ইবনে ছামূদ ইবনে আবির ইবনে ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)।

হযরত সালেহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে এক আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, মূর্তি পূজা ছেড়ে দাও, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক কর না। কিছু সংখ্যক লোক তাঁর এ সাড়া দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনল। কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই তাঁর কথায় ঈমান আনল না। বরং তারা কথা ও কাজ দ্বারা তাঁকে অসম্মান করলো। এমনকি তারা তাঁকে হত্যা করারও পরিকল্পনা করে। আল্লাহ তা'আলা যে উষ্ট্রীটিকে তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন, সেটিকে তারা হত্যা করে। ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেন।

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن
سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟
إِنَّا بِٱلَّذِىٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ۞ فَعَقَرُوا۟ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ ٱئْتِنَا بِمَا
تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دَارِهِمْ جَٰثِمِينَ ۞ فَتَوَلَّىٰ
عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ ۞

অর্থ : আমি সামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।[১] তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বূদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হলো।[২] একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। কোনো বদ নিয়তে একে ধরবে না। তাহলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তোমরা আজ সমতল যমীনে বিরাট দালান বানাচ্ছ এবং পাহাড় খোদাই করে বাড়ি তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর কুদরতী মহিমার কথা মনে রেখ এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। তাঁর কওমের ঐসব সরদার যারা বড়াই করতো, তারা ঐ দুর্বল লোক যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে বলল, তোমরা কি সত্যিই এ কথা জানো যে, সালেহ তার রবেরই রাসূল? তারা জবাবে বলল, নিশ্চয়ই, যে বাণীসহ তাকে পাঠানো হয়েছে এর উপর আমরা ঈমান এনেছি। বড়াইয়ের দাবিদাররা বলল, তোমরা যে জিনিসের উপর ঈমান এনেছ আমরা তা মানতে অস্বীকার করি। তারপর তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল[৩] এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল, যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এসো, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ। শেষ পর্যন্ত এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। সালেহ এ কথা বলে তাদের বস্তি থেকে বের হয়ে গেলেন যে, হে আমার কাওম! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের (যথেষ্ট) কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু (আমি আর কী করব) তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকেই পছন্দ করো না। -সূরা আ'রাফ : ৭৩-৭৯

সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ قَالُوا۟ يَٰصَٰلِحُ
قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَآ ۖ أَتَنْهَىٰنَآ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ وَإِنَّنَا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ
إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَ يَٰقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَءَاتَىٰنِى مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِى
مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُۥ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِى غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝ وَيَٰقَوْمِ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً
فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِىٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ
تَمَتَّعُوا۟ فِى دَارِكُمْ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۝ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَٰلِحًا

১. সামূদ জাতির বাসস্থান উত্তর-পশ্চিম আরবের সেই এলাকায় ছিল, যা আজো 'আল হিজর' নামে খ্যাত। বর্তমান যমানায় মদীনা ও তাবূকের মধ্যবর্তী একটি জায়গা আছে, যাকে 'মাদায়নে সালেহ' বলা হয়। এ জায়গাই সামূদ জাতির সদর জায়গা ছিল এবং প্রাচীনকালে এ স্থান 'হিজর' নামে পরিচিত ছিল। আজো এখানে সামূদ জাতির কিছু দালান আছে, যা তারা পাহাড় কেটে তৈরি করেছিল।

২. এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, সামূদ জাতি নিজেরা হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবি করেছিল, যা থেকে প্রমাণ হবে যে, তিনি আল্লাহর নবী। এ দাবির জবাবে হযরত সালেহ (আ) এই উটনীকে পেশ করেছিলেন।

৩. যদিও একজন ব্যক্তি উটনীকে হত্যা করেছিল- সূরা 'কামার' ও 'শামসে' যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গোটা জাতিই এই অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী লোকটি ঐ অপরাধী জাতির ইচ্ছাই পূরণ করেছিল, সেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধে শরীক ছিল।

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا۟ فِى دِيَٰرِهِمْ جَٰثِمِينَ ﴿٦٧﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا۟ كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ ﴿٦٨﴾

অর্থ : আর সামূদ জাতির নিকট আমি তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বূদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন। তাই তোমরা তাঁর কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দোয়া কবুল করেন।১ তারা বলল, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যে সব মা'বূদদের পূজা করতো তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করা থেকে নিষেধ করতে চাও? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছ, সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ রয়েছে যা আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। সালেহ বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম হয়ে থাকি এবং তিনি তাঁর খাস রহমত দিয়ে যদি আমাকে ধন্য করে থাকেন, এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি তাহলে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবে? আমাকে আরো বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে আসতে পার? হে আমার কওম! এই দেখ, আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দাও। একে তোমরা বাধা দিও না। তা না হলে খুব শিগ্‌গিরই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। কিন্তু তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। তখন সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে, আর মাত্র তিন দিন তোমাদের বাড়িতে মজা করে নাও। এটা এমন এক মেয়াদ, যা মিথ্যা হবে না। শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, তখন আমার রহমত দিয়ে সালেহকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমি বাঁচিয়ে দিলাম এবং ঐ দিনের অপমান থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। নিশ্চয়ই আপনার রবই আসলে ক্ষমতাশালী ও মহাশক্তিমান। আর যারা যুলুম করেছিল, তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ ধরে ফেলল এবং তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরে এমনভাবে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা সেখানে কখানো বসবাসই করে নি। শুনে রাখ, সামূদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামূদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। –সূরা হূদ : ৬১–৬৮

---

১. *এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে হযরত সালেহ (আ) শিরকের গোটা কারবারের মূল কেটে দিয়েছেন। মুশরিকরা মনে করে এবং চালাক লোকেরা তাদেরকে এ রকম বোঝানোর চেষ্টাও করেছে যে, আল্লাহর পবিত্র আস্তানা সাধারণ মানুষের নাগাল থেকে খুব দূরে, উচ্চ দরবারে সাধারণ লোকের কেমন করে পৌঁছানো সম্ভব সেখান পর্যন্ত দোয়া পৌঁছানো তারপর তার জবাব পাওয়া কখনোই সম্ভব হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র রূহসমূহের ওসীলা তালাশ করা যায় এবং উপর পর্যন্ত নযর-নিয়ায ও আর্জি পৌঁছানোর কৌশল যাদের জানা আছে, সেই ধর্মীয় পদাধিকারী ব্যক্তিদের খিদমত হাসিল করা হয়। এ ভুল ধারণার কারণেই বান্দাহ ও আল্লাহর মাঝে অসংখ্য ছোট-বড় দেব-দেবী-উপাস্য ও সুপারিশকারী এক বিরাট তালিকা গড়ে উঠেছে। হযরত সালেহ (আ) মূর্খতার এই গোটা জাদুকে মাত্র দুটি শব্দ দ্বারা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। প্রথমত, 'আল্লাহ তা'আলা নিকটেই আছেন, আর দ্বিতীয়টি হলো– তিনি নিজেই দোয়ার উত্তর দেন। অর্থাৎ, তোমাদের ধারণা ভুল যে, তিনি দূরে আছেন এবং তোমাদের এ ধারণাও ভুল যে, তোমরা সরাসরি তাঁকে ডেকে নিজেদের দো'আর উত্তর লাভ করতে পার না। তোমাদের প্রত্যেকেই তাঁকে তোমাদের কাছে পেতে পার, তাঁর সঙ্গে গোপন কথা বলতে পার, সরাসরি তোমাদের আবেদন-নিবেদন তাঁর দরবারে পেশ করতে পার এবং তিনিও সরাসরি নিজে তাঁর প্রত্যেক বান্দাহর দো'আর উত্তর দেন। সুতরাং যখন দুনিয়ার বাদশাহর সাধারণ দরবার সব সময় সবার জন্য খোলা ও তিনি সকলেরই কথা আছেন, তখন তোমরা কীরূপ মূর্খতার মধ্যে পড়ে আছ যে, তাঁর জন্যে মাধ্যম, ওসীলা ও সুপারিশকারী খুঁজে খুঁজে মরছ?*

সূরা হিজরে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۞ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۞ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۞ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞

অর্থ : হিজরের অধিবাসীরাও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। আমি তাদের কাছে আমার আয়াত পাঠিয়েছি, আমার নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু তারা এ সব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা পাহাড় খোদাই করে বাড়ি বানাত এবং এতে তারা নিশ্চিন্ত ছিল। অবশেষে এক বিকট শব্দ তাদেরকে সকাল হতে হতেই পাকড়াও করল। তারা যা কামাই করেছিল তা তাদের কোনো কাজেই এল না। –সূরা হিজর : ৮০-৮৪

সূরা বানী-ইসরাঈলে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ۭ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۭ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ۔

অর্থ : নিদর্শন পাঠাতে কেউ আমাকে নিষেধ করে নি। শুধু এ কারণে আমি পাঠাই না যে, এর আগের লোকেরা তা মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করেছে।[১] যেমন, সামূদ জাতিকে আমি দৃশ্যমান উটনী এনে দিলাম আর তারা এর উপর যুলুম করল। আমি তো এজন্যই নিদর্শন পাঠাই, যাতে মানুষ তা দেখে ভয় পায়। –সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৯

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ۞ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۞ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۞ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۞ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۞ مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ۞ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

---

১. কাফিররা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে তাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখানোর যে দাবি জানতো, এটা হচ্ছে সেই দাবির জবাব। এর মর্ম হচ্ছে, এরূপ মু'জিযা দেখার পরও যখন লোকেরা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, তখন অবশ্যই তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে এবং এমন কাওমকে ধ্বংস না করে ছেড়ে দেওয়া হয় না। এটা আল্লাহর একান্ত দয়া যে, তিনি এরূপ কোনো মু'জিযা পাঠাচ্ছেন না। কিন্তু তোমরা এমন বোকা যে, মু'জিযা দাবি করে সামূদ জাতির মতো পরিণতি লাভ করতে চাচ্ছ।

অর্থ : সামূদ জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এখানে যে সব জিনিস আছে এর মধ্যে তোমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে? এ সব বাগান ও ঝরনাগুলো এবং ফসলের ক্ষেত ও রসভরা ছড়াসহ খেজুরের বাগানে (এভাবেই থাকতে দেওয়া হবে)? তোমরা পাহাড় কেটে গর্বের সাথে তাতে ইমারত বানাচ্ছ। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। ঐ সব লাগামহীন লোক, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ও কোনো সংশোধনমূলক কাজ করে না তাদের আনুগত্য করো না। তারা জবাবে বলল, তুমি একজন জাদুগ্রস্ত লোক। তুমি আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া আর কী? তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে কোনো নিদর্শন আন দেখি। সালেহ বললেন, এ উটনীটি রইল। একদিন সে পানি খাবে, আর একদিন তোমরা সবাই নেবে। তোমরা এর প্রতি খারাপ আচরণ করবে না। তাহলে তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাব এসে পড়বে। তারা উটনীটিকে মেরে ফেলল। শেষ পর্যন্ত তারা আফসোস করতে থাকল। তারপর তাদের উপর আযাব এসে পড়ল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান। –সূরা শু'আরা : ১৪১-১৫৯

সূরা নামলে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝ وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً ۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

অর্থ : আমি সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে (এ বাণী দিয়ে) পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। এমন সময় তারা হঠাৎ দুটো বিবদমান দলে ভাগ হয়ে গেল। সালেহ বললেন, হে আমার কওম! ভালোর আগে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করছ কেন? আল্লাহর কাছে মাফ চাও না কেন? হয়তো তোমাদের উপর রহম করা হবে। তারা বলল, আমরা তো তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে কুলক্ষণ মনে করি। জবাবে সালেহ বললেন, তোমাদের সুলক্ষণ ও কুলক্ষণ তো আল্লাহর হাতে। আসলে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতো, কোনো গঠনমূলক কাজ করতো না। তারা বলল, আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা রাতের বেলায়ই সালেহ ও তার পরিবারের উপর হামলা করব। তারপর তার

অভিভাবককে বলে দেবো[১] যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় হাজির ছিলাম না এবং আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। তারা তো এ চক্রান্ত করল; আমি এমন এক চাল চাললাম, যা টেরও পেল না। এখন দেখে নাও, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হলো। আমি তাদেরকে ও তাদের কওমের সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। তারা যে যুলুম করতো এর পরিণামে ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘরগুলো বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। যাদের ইলম আছে তাদের জন্য এর মধ্যে এক শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম। -সূরা নামল : ৪৫-৫৩

সূরা হা-মীম-আস সাজদায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞

অর্থ : এখন সামূদদের কথা। তাদের সামনে আমি সঠিক পথ পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা রাস্তা দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকাই বেশি পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তারা যা কিছু করেছিল এরই কারণে তাদের উপর অপমানকর আযাব ভেঙে পড়ল। আমি তাদেরকে নাজাত দিলাম, যারা ঈমান এনেছিল এবং (গোমরাহী ও বদ আমল থেকে) দূরে ছিল। -সূরা হা-মীম সাজদাহ : ১৭-১৮

সূরা ক্বামারে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۞ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ۞ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۞ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۞

অর্থ : সামূদ জাতি সাবধানবাণীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আর তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই একজন লোকের পেছনে চলব? যদি তা করি তাহলে এর মানে এ হবে যে, আমরা বিপথগামী হয়ে গেছি অথবা আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে কি শুধু এ লোকটিই ছিল, যার উপর হেদায়াত নাযিল করা হলো? না বরং সে বড়ই মিথ্যাবাদী ও ভয়ানক দুষ্ট। (তখন আমি আমার রাসূলকে বললাম,) কালই তারা জানতে পারবে যে, কে বড় মিথ্যাবাদী ও ভয়ানক দুষ্ট। আমি একটি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা হিসেবে পাঠাচ্ছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে দেখুন যে, তাদের কী দশা হয়। তাদেরকে জানিয়ে দিন, তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি

১. *অর্থাৎ, হযরত সালেহ (আ)-এর গোত্রের প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবির হকদার বলে যে সরদারকে গণ্য করা হতো, নবী করীম ﷺ-এর জামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল এটা সেইরূপ পজিশন। কুরাইশ কাফিররাও এই আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে দমন করে রেখেছিল যে, যদি তারা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবূ তালেব নিজের গোত্রের পক্ষ থেকে দাবি নিয়ে উঠবেন।*

ভাগ করা হবে। প্রত্যেকেই যার যেদিন পালা সেদিন (পানির কাছে) হাজির হবে।[১] শেষ পর্যন্ত তারা তাদের লোকটিকে ডাকল। সে এ কাজের ভার নিল এবং উটনীকে মেরে ফেলল। (দেখে নাও,) আমার আযাব ও সাবধান বাণী কেমন ছিল। আমি তাদের উপর একটি মাত্র বিকট আওয়াজ ছুড়ে মেরেছিলাম। ফলে তারা খোঁয়াড়ে পিষে ফেলা ভুসির মতো হয়ে গেল।[২] আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে? -সূরা কামার : ২৩-৩২

সূরা শামসে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۞ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۞ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۚ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۞

অর্থ : ছামূদ (জাতি) নিজেদের বিদ্রোহের কারণে (নবীকে) মিথ্যা বলে অমান্য করেছে। যখন ঐ জাতির সবচেয়ে হতভাগা দুষ্ট লোকটা খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনীর উপর হাত তোলো না এবং তাকে পানি খেতে (বাধা দিও না)। কিন্তু তারা তার কথাকে মিথ্যা গণ্য করল এবং উটনীকে মেরে ফেলল; অবশেষে তাদের পাপের ফলে তাদের রব তাদের উপর মহাবিপদ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের সবাইকে একসাথে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।[৩] আর (আল্লাহ তাঁর এ কাজের) কোনো খারাপ পরিণতির ভয় করেন না। -সূরা শামস : ১১-১৫

কুরআন মাজীদের অধিকাংশ স্থানেই আল্লাহ তা'আলা আদ সম্প্রদায় ও ছামূদ সম্প্রদায়ের কথা বর্ণনা পাশাপাশি করেছেন। যেমন- সূরা আত-তাওবা, সূরা ইবরাহীম, সূরা ফুরকান, সূরা আদ, সূরা কাফ, সূরা নাজম ও সূরা ফাজর- যথাক্রমে ৭০, ৯, ৩৮, ১২-১৩, ১২, ৫১ ও ৮-৯ আয়াতে। বলা হয়ে থাকে যে, এ দু'জাতি প্রসঙ্গে আহলে কিতাব (বানী ইসরাঈল)-গণ কিছুই জানত না। আর তাদের তাওরাত কিতাবেও এ বিষয়ের কোনই উল্লেখ নেই। কিন্তু কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে যে, হযরত মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এ দু' জাতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। যেমন- সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۞ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ ۛ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ۛ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۔

অর্থ : আর মূসা বললেন, তোমরা যদি কুফরী কর এবং পৃথিবীর সবাইও যদি কাফির হয়ে যায়, তাহলে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নেই এবং তিনি নিজে নিজেই প্রশংসার পাত্র (তিনি কারো প্রশংসার ধার

১. এটা আল্লাহর ঐ কথার ব্যাখ্যা যে- "আমি উটনীকে তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে পাঠাচ্ছি।" পরীক্ষাটি এই- হঠাৎ একটি উটনী এসে তাদের সামনে হাজির করে দিয়ে তাদেরকে বলা হলো- "একদিন একা এ উটনী পানি পান করবে, এবং দ্বিতীয় দিন তোমরা সব লোক নিজেদের জন্য ও নিজেদের পশুদের জন্য পানি নেবে। যেদিন উটনী পানি খাবে সেদিন তোমরা ও তোমাদের পশু যেন কখনো বা কূপে না আসে।" এ চ্যালেঞ্জ ঐ লোকের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল, যার সম্পর্কে তারা বলত যে, এ লোকটির কোনো সৈন্যবাহিনীও নেই, কোনো বড় দলও নেই।

২. তারা বাড়িতে পশু পালন করে তারা পশুদের থাকার জায়গায় বেড়া দিয়ে তাতে ঘাস খেতে দেয়। ঐ সব ঘাস এক সময় শুকিয়ে যায়। তখন পশুদের পায়ের চাপে তা ভুসি হয়ে যায়। সামূদ জাতির লাশগুলোকে ঐ ভুসির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৩. এ ঝগড়াটে লোকটি জনগণের ইচ্ছা ও দাবি অনুযায়ী উটনীকে মেরে ফেলেছিল বলে গোটা দেশবাসীর উপরই আযাব নাযিল হয়েছিল। সূরা কামারের ২৯ নং আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে।

ধারেন না)। তোমাদের কাছে[১] ঐ সব কাওমের খবর কি পৌঁছেনি, যারা তোমাদের আগে গত হয়ে গেছে? নূহের কাওম, 'আদ ও সামূদ এবং তাদের পরেও অনেক কাওম, যাদের (সংখ্যা) আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের রাসূল যখন তাদের কাছে স্পষ্ট কথা ও নিদর্শন নিয়ে এলেন। –সূরা ইবরাহীম : ৮–৯

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এখানের সব কথাগুলোই হযরত মূসা (আ)-এর। তিনি এ কথাগুলো তাঁর নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিলেন। কিন্তু আদ ও ছামূদ এ দু'জাতি আরববাসী হওয়ার কারণে তারা (আহলে কিতাবগণ) তাদের ঘটনাগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেনি এবং সেগুলো স্মরণ রাখার ব্যাপারেও কোনো গুরুত্ব দেয় নি। যদিও মূসা (আ)-এর যুগে তাদের ঘটনা প্রসিদ্ধ ছিল। আমি এ সম্পর্কে আমার প্রণীত তাফসীর (ইবনে কাছীর) গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসাই আল্লাহ তা'আলার জন্য।

এখানে ছামূদ জাতির ঘটনা ও তাদের অবস্থা এবং তাদের পরিণতি বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর সালেহ (আ)-কে এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে কিভাবে (শাস্তি থেকে) রক্ষা করেছিলেন এবং যারা কুফরী করেছে ও মু'মিনগণের উপর অত্যাচার করেছে এবং তাদের রাসূলের বিরোধিতা করেছে তাদেরকে কিভাবে সমূলে ধ্বংস করেছিলেন। সে বিষয়ে আমি এখন আলোচনা করব।

প্রথমেই এ কথা বলা হয়েছে যে, ছামূদ জাতি খাঁটি আরবভাষী ছিল। আদ জাতির পরে ছামূদ জাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু আদ জাতির ভয়াবহ পরিণাম থেকে তারা কোনই উপদেশ গ্রহণ করে নি। এ কারণেই তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অর্থ : হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বূদ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হলো।[২] একে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াতে দাও। কোনো বদ নিয়তে একে ধরবে না। তাহলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ, যখন আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের জায়গায় বসিয়েছেন এবং দুনিয়াতে তোমাদেরকে এ মর্যাদা দান করেছেন যে, তোমরা আজ সমতল যমীনে বিরাট দালান বানাচ্ছ এবং পাহাড় খোদাই করে বাড়ি তৈরি করছ। সুতরাং আল্লাহর কুদরতের মহিমার কথা মনে রেখ এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। –সূরা আ'রাফ : ৭৩–৭৪

অর্থাৎ, আল্লাহ আদ জাতির পরে তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যাতে তোমরা তাদের ভয়াবহ পরিণাম থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পার এবং তাদের মতো জঘন্য অপরাধ না কর, নেক কাজ করতে পার। আর আল্লাহ তাআলা যমীনকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা যমীনের নরম অংশে বড় বড় বালাখানা নির্মাণ করছ এবং পাহাড়গুলোকে কেটে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে সেখানে নিজেদের বাসস্থানের ঘর-বাড়ী নির্মাণ করছ। অর্থাৎ, শিল্প ও কারিগরী বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ

১. হযরত মূসা (আ)-এর ভাষণ উপরে শেষ হয়েছে। এখন আল্লাহ সরাসরি মক্কার কাফিরদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছেন।

২. এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, সামূদ জাতি নিজেরা হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবি করেছিল, যা থেকে প্রমাণ হবে যে, তিনি আল্লাহর নবী। এ দাবির জবাবে হযরত সালেহ (আ) এই উটনীকে পেশ করেছিলেন।

তা'আলার এ নেয়ামতের শোকর আদায় কর এবং নেক কাজ কর। আল্লাহ তা'আলারই একমাত্র ইবাদত কর, যার কোনই অংশীদার নেই। তাঁর অবাধ্যতা, বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর নির্দেশের অমান্যতা থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখ। অর্থাৎ, তাঁর আদেশ অনুগত হও এবং তাঁর আদেশ মেনে চল। অন্যথায় তাঁর ভয়াবহ পরিণাম আপতিত হবেই। এ কারণে নবী তাদেরকে এ উপদেশ দিলেন—

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هٰهُنَا آمِنِينَ ۞ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۞ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ۞ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞

অর্থ : তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, এখানে যে সব জিনিস আছে এর মধ্যে তোমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেওয়া হবে? এ সব বাগান ও ঝরনাগুলো এবং ফসলের ক্ষেত ও রসভরা ছড়াসহ খেজুরের বাগানে (এভাবেই থাকতে দেওয়া হবে)? তোমরা পাহাড় কেটে কেটে গর্বের সাথে তাতে ইমারত বানাচ্ছ। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। ঐ সব লাগামহীন লোক, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ও কোনো সংশোধনমূলক কাজ করে না তাদের আনুগত্য করো না। –সূরা শু'আরা : ১৪৬-১৫২

নবী তাদেরকে এ কথাও বললেন যে—

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

অর্থ : হে আমার কওম! একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে তোমাদেরকে আবাদ করেছেন তাই তোমরা তাঁর কাছে মাফ চাও। তারপর তাঁর কাছে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই আছেন এবং তিনি দোয়া কবুল করেন। –সূরা হুদ : ৬১

অর্থাৎ, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ সৃষ্টি করেছেন এ ভূমি থেকেই। তারপর তোমাদেরকে এখানেই আবাদকারী বানিয়েছেন। আর এ পৃথিবীর মাল-দৌলত, অর্থাৎ ক্ষেত-বাগান, ফল, ফসলাদিসহ সব কিছুই তোমাদেরকে দান করেছেন। সুতরাং যিনি তোমাদেরকে এ সব কিছু দান করেছেন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। (তিনি ব্যতীত অন্য আর কেউ নয়)। সুতরাং তাঁরই নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই। তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

অর্থাৎ যে সমস্ত মূর্তির উপাসনায় তোমরা লিপ্ত, সে মূর্তিগুলোকে আন্তরিকভাবে ত্যাগ কর এবং এক আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ কর কর। তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করবেন এবং তোমাদের সমস্ত অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন। হযরত সালেহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে যখন এ সুন্দর উপদেশ দিলেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তরে বলল—

قَالُوا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.

অর্থ : হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলে, যার উপর আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদর বাপ-দাদা যে সব মা'বুদদের পূজা করতো তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করা থেকে নিষেধ

করতে চাও? তুমি আমাদেরকে যেদিকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের খুব সন্দেহ রয়েছে যা আমাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। -সূরা হুদ : ৬২

হযরত সালেহ (আ) বললেন—

يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ .

অর্থ : হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের কাছ থেকে এক স্পষ্ট সাক্ষ্যের উপর কায়েম হয়ে থাকি এবং তিনি তাঁর খাস রহমত দিয়ে যদি আমাকে ধন্য করে থাকেন, এ অবস্থায় আমি যদি তাঁর নাফরমানী করি, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবে? আমাকে আরো বেশি ক্ষতির মধ্যে ফেলা ছাড়া তোমরা আমার আর কোন্ কাজে আসতে পার? -সূরা হুদ : ৬৩

হযরত সালেহ (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে এরূপ বিনয় ও নম্রতার সাথে সম্বোধন করে অত্যন্ত কোমল ও নরম ভাষায় আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন। তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে দাওয়াত দেয়ার এটা ছিল উত্তম পদ্ধতি। অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, আমি যেরূপ কথাগুলো তোমাদেরকে বলছি, সে কথাগুলো যদি প্রকৃতপক্ষে সত্যই হয়ে থাকে, তবে (তা লঙ্ঘনে জন্য) আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের কি ওজর থাকবে এবং তোমাদেরকে কোন্ জিনিস (কঠিন শাস্তি থেকে) মুক্তি দেবে? অথচ তোমরা বলছ যে, আমি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকি। তোমরা জেনে রাখো! এ সত্যের দাওয়াত থেকে আমি কোনোভাবেই বিরত থাকব না। এ কাজ আমি অবিরাম চালিয়ে যাব। কারণ, এ দায়িত্ব পালন করা আমার অপরিহার্য কর্তব্য। যদি আমি এ দাওয়াত থেকে বিরত থাকি, তবে তাঁর শাস্তি থেকে না তোমাদের কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে, না তোমাদের সাহায্য করতে পারবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে কোনো ফয়সালা না করে দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সর্বদা তোমাদেরকে সেই আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব, যিনি এক ও একক, যার কোনো শরীক নেই।

হযরত সালেহ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী লোকেরা এ কথাও বলেছিল যে, اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ। "তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম।" অর্থাৎ, তোমার উপর যাদু করা হয়েছে। কারণ, তুমি আমাদেরকে তাওহীদের অভিনব দাওয়াত দিচ্ছ, এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। কোনো বিবেকবান লোকের দ্বারা এ কাজ হতে পারে না। সুতরাং আমাদের ধারণা, তোমাকে যাদু করা হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلْمُسَحَّرِيْنَ এর অর্থ হবে, তুমি যাদুগ্রস্ত। অর্থাৎ তোমাকে যাদু করা হয়েছে। আর অনেকে বলেন- এর অর্থ হবে, তোমার কাছে যাদু রয়েছে। অর্থাৎ, তুমি যাদুকর। হয়তো কোনো জ্বিন বা অন্য কিছুকে আয়ত্তাধীন করে রেখেছ। কিন্তু এখানে প্রথম অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, এ কথার পরেই অবিশ্বাসীরা বলেছিল, 'তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে একটি নিদর্শন উপস্থিত কর।'

-সূরা শু'আরা : ১৫৪

তারা নবীর কাছে এরূপ একটি অলৌকিক বস্তু চাইল, যা তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। যদি তারা হযরত সালেহ (আ)-কে যাদুকর-ই মনে করতো, তবে তাঁর কাছে তারা এরূপ দাবি করতো না। কারণ, একজন যাদুকরের কাছে এটি কোনো ব্যাপারই নয়। যখন হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ অলৌকিক নিদর্শন পেশ করতে বলল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এক বিস্ময়কর উষ্ট্রী প্রেরণ করেন। এ ব্যাপারে হযরত সালেহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে এ উপদেশ দিয়েছিলেন—

هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ۞ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : এই উটনীটি রইল। একদিন সে পানি খাবে, আর একদিন তোমরা সবাই নেবে। তোমরা এর প্রতি খারাপ আচরণ করবে না। তাহলে তোমাদের উপর এক মহাদিনের আযাব এসে পড়বে। -সূরা শু'আরা : ১৫৫-১৫৬

অনুরূপভাবে সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন-

قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۚ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

অর্থ : তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হলো।[১] একে আল্লাহর জমিনে চরে বেড়াতে দাও। কোনো বদ নিয়তে একে ধরবে না। তাহলে এক বেদনাদায়ক আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। -সূরা আ'রাফ : ৭৩

সূরা বনী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ـ

অর্থ : আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম। তারপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল আমি তো এ জন্যই নিদর্শন পাঠাই, যাতে মানুষ তা দেখে ভয় পায়। -সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৯

পাথর থেকে উষ্ট্রী বের হওয়া ও ছামূদ জাতির ধ্বংস

মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন কোনো একদিন ছামূদ জাতির লোকেরা এক সভায় সমবেত হয়। সেখানে আল্লাহর রাসূল হযরত সালেহ (আ) হাজির হয়ে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং সত্য পথে চলার জন্য উপদেশ দেন। তিনি তাদেরকে (জাহান্নামের ও আল্লাহর শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করেন এবং সৎ কাজ করার জন্য আদেশ দেন। এ কথা শুনে গোত্রের লোকেরা তাদের নিকটস্থ একটি পাথরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তুমি যদি এই পাথর থেকে এরূপ একটি উষ্ট্রী বের করে দিতে পার যেটি হবে অমুক অমুক গুণ বিশিষ্ট এবং দশ মাসের গর্ভবতী এবং দীর্ঘকায় তবে এনে দেখাও। তারা বাড়াবাড়ি করল এবং কঠিন শর্ত আরোপ করল। তারপর হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, আমি যদি এ পাথর থেকে তোমাদের বর্ণিত সেই গুণবিশিষ্ট উষ্ট্রী বের করে এনে তোমাদের আবেদন পূর্ণ করি, তবে কি তোমরা আমার আনীত বিষয়ের উপর ঈমান আনবে এবং আমার নবুওয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে? গোত্রের লোকেরা বলল- হ্যাঁ বিশ্বাস করব। হযরত সালেহ (আ) এ কথার উপর তাদের থেকে ওয়াদা নেন। তারপর হযরত সালেহ (আ) জায়নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নামায পড়েন। নামায শেষ করে তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের আবেদন পূর্ণ করার জন্য দো'আ করেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশে সেই পাথরটি ফেটে যায় এবং তা থেকে তারা যেরূপ উষ্ট্রী চেয়েছিল সেরূপ উষ্ট্রী বেরিয়ে আসে। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের শান তো এই যে, যখন তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, 'কুন' (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। এরূপভাবে উষ্ট্রীও পাথর থেকে বেরিয়ে আসে। যখন গোত্রের লোকেরা সেই গুণবিশিষ্ট উষ্ট্রী দেখতে পেল, তখন তারা এর মধ্যে দেখতে পেলো অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও ভীতিপ্রদ দৃশ্য এবং আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত ও সালেহ (আ)-এর নবুওয়াতের স্পষ্ট প্রমাণ। আলহামদু লিল্লাহ! এ কুদরতী দৃশ্য দেখার পর উপস্থিত লোকদের অনেকে ঈমান আনল। কিন্তু আফসোস! অধিকাংশ লোক তাদের কুফরী ও গোমরাহীর উপর অবিচল থাকল।

---

১. *এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, সামূদ জাতি নিজেরা হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে এমন এক নিদর্শনের দাবি করেছিল, যা থেকে প্রমাণ হবে যে, তিনি আল্লাহর নবী। এ দাবির জবাবে হযরত সালেহ (আ) এই উটনীকে পেশ করেছিলেন।*

যারা ঈমান এনেছিল তাদের নেতা ছিলেন হযরত জান্দা ইবনে আমার ইবনে মুহাল্লাত ইবনে লাবীদ ইবনে জাওয়াস। ইনি ছিলেন ছামুদ জাতির শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের একজন। সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করে উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন এবং বাকি লোকেরাও ঈমান আনার জন্য আগ্রহী হলেন। পরে যাওয়াব ইবনে উমর ইবনে লাবীদ, খাব্বাব ও রিহাব ইবনে সায়ার ইবনে জালীম এ তিন প্রধান মূর্তিপূজক এদের অনেককে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে। জান্দা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিহাব ইবনে খলীফাকে ঈমানের প্রতি দাওয়াত দেন। ইনিও গোত্রের একজন সর্দার ছিলেন। সে ঈমান আনার জন্য আন্তরিকভাবেই আগ্রহী হয়। কিন্তু এতে কাফিরেরা বাধা দান করলে সে (শিহাব) তাদের উপরে স্থির থাকে এবং কুফরীর উপরই থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে মিহ্‌রাশ ইবনে গানামা ইবনে যামীল নামক জনৈক মুসলমান কবি নিম্নোক্ত কবিতাটি উপস্থাপন করেন—

"আমর বংশের একটি দল ডেকেছিল শিহাবকে, মনে প্রাণে কবুল করতে সালেহ নবীর দ্বীনকে।
নিয়ত করে ফেলল শিহাব কবুল করবে এ দ্বীনকে, সামূদ গোত্রের সব লোকেরা ভালবাসত শিহাবকে।
দ্বীনকে কবুল করলে শিহাব কত ভাল হতো, নবী সালেহ মোদের মাঝে শক্তি অনেক পেত।
জুওয়াব তার সাথীর সাথে করল অত্যাচার, এ কাজটি করা কভু ঠিক হয় নি তার।
হিজরবাসীর বিদ্রোহী আর মূর্তি পূজক যারা, হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে ভেগে গেল তারা।"

যখন পাথর ফেটে বিশাল দেহ ও আকৃতিবিশিষ্ট উষ্ট্রী বের হয়ে আসল, তখন হযরত সালেহ (আ) সামূদ গোত্রের লোকদেরকে বললেন– هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ "এটি আল্লাহর উষ্ট্রী"। উষ্ট্রীটির মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং এটি যে নবুওয়াতের নিদর্শন, তা বুঝানোর জন্যই এ উষ্ট্রীকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন 'বায়তুল্লাহ' (আল্লাহর ঘর)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী ও রাসূলগণকেও (আব্দুহু) "তাঁর বান্দা" বলেছেন। নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা বিশেষভাবে প্রকাশ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে "তাঁর বান্দা" বলে সম্বোধন করেছেন।

সালেহ (আ) তাঁর গোত্রের লোকদেরকে বললেন—

يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ـ

অর্থ : হে আমার কওম! এই দেখ, আল্লাহর উটনী তোমাদের জন্য এক নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দাও। একে তোমরা বাধা দিও না। তা না হলে খুব শিগ্‌গিরই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে। –সূরা হূদ : ৬৪

নবীর এ কথার উপর সবাই রাজি হয়ে গেল যে, এ উষ্ট্রী সবার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করবে। এটি যে যমীনে ইচ্ছা সে যমীনে বিচরণ করে বেড়াবে এবং একদিন পর একদিন পানি পান করার জন্য কূপের নিকট আসবে। যেদিন সেটি কূপের নিকট আসত, সেদিন কূপের সব পানিটুকু পান করে ফেলত। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা আগের দিন অর্থাৎ, তাদের পালার দিন, প্রয়োজনীয় পানি উঠিয়ে রাখত। কথিত আছে যে, এ উটনীটি এত পরিমাণ দুধ দিত, যা সম্প্রদায়ের সব লোকেরা তৃপ্তিসহকারে পান করতো। উটনীটির পানি পান করার পালা আল্লাহ তা'আলা ভাগ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

অর্থ : সালেহ বললেন, এ উটনীটি রইল। একদিন সে পানি খাবে, আর একদিন তোমরা সবাই নেবে।
–সূরা শু'আরা : ১৫৫

আসলে এটি ছিল তাদের জন্য একটি পরীক্ষা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝

অর্থ : আমি একটি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা হিসেবে পাঠাচ্ছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে দেখুন যে, তাদের কী দশা হয়। তাদেরকে জানিয়ে দিন, তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ করা হবে। প্রত্যেকেই যার যেদিন পালা সেদিন (পানির কাছে) হাজির হবে।[১] –সূরা কামার : ২৭–২৮

অর্থাৎ, এ উটনীটি ছামূদ জাতির লোকদের পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছিল যে, তারা ঈমান আনে কিনা? তারা নবীকে যতই কষ্ট দিক না কেন, এতে তিনি ধৈর্যধারণ করবেন। পরিণতি অতিশীঘ্রই তারা দেখতে পাবে। এরূপভাবে কিছুদিন চলার পরে সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ করে উটনীটিকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যাতে তারা কূপ থেকে নিজ ইচ্ছামতো পানি সংগ্রহ করতে পারে এবং উটনীটির কবল থেকে রক্ষা পাবে। শয়তান তাদের অন্তরে এ কু-মন্ত্রণা সৃষ্টি করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ .

অর্থ : তারপর তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল[১] এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল, যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক, তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এসো, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ। –সূরা আ'রাফ : ৭৭

এ উটনীটি হত্যা করার দায়িত্ব নিল তাদের এক নেতা কিদার ইবনে সালিফ ইবনে জানদা। সে ছিল লালবর্ণ বিশিষ্ট। তার শরীরে ছিল নীল বর্ণের দাগ। কথিত আছে সে ছিল জারয সন্তান। সে (কিদার) সালিফ ইবনে জানদার ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে সালিফের পুত্র বলে সবার কাছে পরিচিত ছিল। মূলত তার জন্ম হয় সায়বান নামক এক ব্যক্তির ঔরসে। যদিও উটনীটিকে হত্যাকারী ছিল কিদার। কিন্তু এতে সম্প্রদায়ের সকল লোকের সম্মতি ছিল বলে, এ অপরাধে সকলেই অপরাধী। তাই এ হত্যা করার দায়িত্ব সকলের প্রতিই আরোপিত করা হয়েছে যে, "ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা উটনীকে হত্যা করছে।"

ইবনে জারীর (রহ) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, ছামূদ গোত্রের দু'মহিলা ছিল। একজনার নাম ছিল সাদুক বিনতে মাহ্ইয়া ইবনে যোহারের। এ মহিলা ছিল উচ্চ বংশীয় এবং প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী। তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে। এতে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং তার চাচাতো ভাই মিসরা ইবনে মিহ্রাজ ইবনে মাহ্ইয়াকে এ প্রস্তাব দেয় যে, যদি তুমি এ উটনীটিকে হত্যা করতে পার, তবে আমি তোমার সাথে বিবাহ বসব। মহিলাটি ছিল খুবই সুন্দরী ও রূপসী। অপর মহিলাটি ছিল ওনায়যা বিনতে গুনায়ম ইবনে মিজলায। উপাধি ছিল উসমান। এ নামেই তাকে ডাকা হতো। এ মহিলাটি ছিল কাফির বৃদ্ধা। তার স্বামী ছিল সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সর্দার যুয়াব ইবনে আমর। এ স্বামীর ঔরসে তার কয়েকটি কন্যা সন্তান ছিল। কন্যাগুলো ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। মহিলাটি কিদার ইবনে সালিফকে এই প্রস্তাব দেয় যে, যদি তুমি এ উটনীটি হত্যা করতে পার, তবে আমার এ সুন্দরী মেয়েদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে তুমি গ্রহণ করতে পারবে। তখন এ দু যুবক উটনীটিকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প করে। তারা এ ব্যাপারে গোত্রের লোকদের সহযোগিতা সমর্থন পাওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালায়। সম্প্রদায়ের আরো সাত ব্যক্তি এ অন্যায় কাজে সহযোগিতা করার জন্য তাদের সাথে একত্রিত হলো। তখন তারা সংখ্যায় নয় জন হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

---

১. *যদিও একজন ব্যক্তি উটনীকে হত্যা করেছিল– সূরা 'কামার' ও 'শামসে' যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী লোকটি ঐ অপরাধী জাতির ইচ্ছাই পূরণ করেছিল, সেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধে শরীক ছিল।*

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ .

অর্থ : সেই শহরে নয়জন দলপতি ছিল, যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতো, কোনো গঠনমূলক কাজ করতো না। -সূরা নামল : ৪৮

এরপর এ নয় জন সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। তারাও তাদের এ পাপ কাজকে অর্থাৎ, উটনীটিকে হত্যা করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করে এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করে। তারপর এই নয় পাপী উটনীটিকে হত্যা করার জন্য উটনীর পানি পান করার পালার দিন পথে ওঁৎপেতে বসে থাকে। উটনীটি যখন পানি পান করে কূপ থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসছিল, তখন তাদের মধ্য হতে মিসরা নামক এক ব্যক্তি অতি কাছ থেকে উটনীটির দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করে। তীরটি উটনীটির পায়ের গোছা ভেদ করে চলে যায়। মহিলারা উটনীটিকে হত্যা করার ব্যাপারে গোত্রের লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগল যে, অতি দ্রুত এটিকে হত্যা কর। আর তারা (মহিলারা) তাদের নিজ মুখমণ্ডলকে চপেটাঘাত করতে থাকে। তখন সেই নয় জনের মধ্য হতে কিদার ইবনে সালিফ সামনে অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দ্বারা উষ্ট্রীটির পিছনের পায়ের উপরি অংশ (অর্থাৎ, গোড়ালির উপরে হাঁটুর নিম্নাংশ) কেটে ফেলল। সাথে সাথে উটনীটি যমীনে লুটিয়ে পড়ে এবং খুব জোরে এক চিৎকার মারে। তারপর অত্যাচারী কিদার অন্যায় ও অত্যাচারের চরম পর্যায়ে গিয়ে উটনীটির বুকের উপর তীর দিয়ে আঘাত করে এবং সেটিকে যবেহ করে। এদিকে উষ্ট্রীটির বাচ্চাটি পালিয়ে উঁচু পাহাড়ে গিয়ে উঠল এবং জোরে একটি ডাক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাসান (রহ) বলেছেন যে, উটনীর বাচ্চাটি ডাক দিয়ে এই বলেছিল যে, "হে পরওয়ারদেগার! আমার মা কোথায়?" এরপর সে (বাচ্চা) পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে তাতেই অদৃশ্য হয়ে যায়। কারো কারো মতে, যালিমরা সেই বাচ্চাটিকে পশ্চাদ্ধাবন করে সেটিকে হত্যা করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۞ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۞ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۚ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا ۞ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۞

অর্থ : যখন ঐ জাতির সবচেয়ে হতভাগা দুষ্ট লোকটা খেপে গিয়ে উঠে দাঁড়াল, তখন রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনীর উপর হাত তোলো না এবং তাকে পানি খেতে (বাধা দিও না)। কিন্তু তারা তার কথাকে মিথ্যা গণ্য করল এবং উটনীকে মেরে ফেলল; অবশেষে তাদের পাপের ফলে তাদের রব তাদের উপর মহাবিপদ চাপিয়ে দিলেন এবং তাদের সবাইকে একসাথে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।[১] আর (আল্লাহ তাঁর এ কাজের জন্য) কোনো খারাপ পরিণতির ভয় করেন না। -সূরা শামস : ১২-১৫

আব্দুল্লাহ ইবনে যিমআ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার তাঁর ভাষণে, {সালেহ (আ)-এর উটনীর কথা এবং উটনীটিকে যে হত্যা করেছে তার কথা প্রথমে} বলেছিলেন যে, "যখন তাদের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগা (হত্যার উদ্দেশ্যে) তৎপর হয়ে উঠল।" অর্থাৎ উটনীকে হত্যা করার জন্য যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তৎপর হয়ে উঠেছিল, সে ছিল তার কওমের সর্দার এবং নির্দয় নির্মম কঠোর প্রকৃতির। -মুসনাদে আহমদ

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আলী! আমি কি তোমাকে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যারা দুর্ভাগা, তাদের কথা বলে দিব? হযরত আলী (রা) বললেন, মেহেরবানী করে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরা হচ্ছে দু'ব্যক্তি। একজন দুর্ভাগা হচ্ছে, ছামূদ সম্প্রদায়ের সেই লালবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি,

১. *এ ঝগড়াটে লোকটি জনগণের ইচ্ছা ও দাবি অনুযায়ী উটনীকে মেরে ফেলেছিল বলে গোটা দেশবাসীর উপরই আযাব নাযিল হয়েছিল। সূরা কামারের ২৯ নং আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে।*

যে উটনীটি হত্যা করেছিল। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে, হে আলী! সেই ব্যক্তি যে তোমার এই খানে (অর্থাৎ, মস্তকে) তলোয়ার দ্বারা আঘাত করবে, যাতে মস্তক (দেহ থেকে) পৃথক হয়ে যাবে। ইবনে আবী হাতিম (রহ) এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ : তারপর তারা ঐ উটনীকে মেরে ফেলল[১] এবং গর্বের সাথে তাদের রবের হুকুম অমান্য করল। তারা সালেহকে বলল, যদি তুমি সত্য রাসূলদের কেউ হয়ে থাক, তাহলে ঐ আযাব নিয়ে এসো, যার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছ। -সূরা আ'রাফ : ৭৭

অবিশ্বাসীদের এই কথার মধ্যে দু' প্রকারের কুফরী পরিলক্ষিত হয়।

১. আল্লাহ তা'আলা এ উটনীটিকে তাঁর পক্ষ থেকে নিদর্শনস্বরূপ প্রেরণ করে এটিকে কোনো ধরনের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে উষ্ট্রীটিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

২. এ জঘন্য অপরাধ করার পরে, আবার তারা অতি তাড়াতাড়ি শাস্তি আনয়নের জন্যও বলে।

তারা দু' কারণে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়েছে—

১. আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন যে, "এই উটনীটিকে তোমরা কোনো প্রকার কষ্ট দেবে না। অন্যথায় অতিদ্রুতই শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।" এক জায়গায় বলেছেন, 'মহাশাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।' আবার অন্য জায়গায় বলেছেন, "মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।" উভয় প্রকারের শাস্তিই তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

২. তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি অতি তাড়াতাড়ি আনয়নের জন্য নবীকে বলা এবং এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা।

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কথা এই যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও নিদর্শন গোত্রের লোকদের কাছে স্পষ্টভাবে পেশ করার পরেও তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাঁকে অস্বীকার করে। তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, ইনি (সালেহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য নবী। কিন্তু তাদের অবাধ্যতা, পথভ্রষ্টতা ও হঠকারিতা তাদেরকে কুফরীর উপর দৃঢ়পদ রাখে এবং সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং আল্লাহর শাস্তি আপতিত হওয়া সম্পর্কে অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ ، ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ.

অর্থ : কিন্তু তারা উটনীকে মেরে ফেলল। তখন সালেহ তাদেরকে সাবধান করে দিলেন যে, আর মাত্র তিন দিন তোমাদের বাড়িতে মজা করে নাও। এটা এমন এক মেয়াদ, যা মিথ্যা হবে না। -সূরা হূদ : ৬৫

বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম অভিশপ্ত কিদার ইবনে সালিফ উটনীটির পায়ের গোছা কেটে ফেলে। ফলে সেটি যমীনে শুয়ে পড়ে। তারপর উপস্থিত সমস্ত লোকেরা তলোয়ার দ্বারা অসহায় উটনীটির উপর আঘাত করে সেটিকে হত্যা করে। উটনীটির বাচ্চা এ করুণ দৃশ্য দেখে অত্যাচারীদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি উঁচু পাহাড়ে গিয়ে উঠে এবং তিনবার খুব জোরে চিৎকার দেয়। বাচ্চাটি যেহেতু তিনবার আওয়াজ দিয়েছিল, এ কারণে হযরত সালেহ (আ) তাঁর অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কেও আযাব আসার ব্যাপারে তিনদিনের সময় দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, উটনীটিকে হত্যা করার দিন ব্যতীত তিনদিন তাদেরকে সময় দিয়েছিলেন যে, তারা যেন এই তিনদিন নিজ

১. যদিও একজন ব্যক্তি উটনীকে হত্যা করেছিল- সূরা 'কামার' ও 'শামসে' যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধের সহায়ক ছিল এবং হত্যাকারী লোকটি ঐ অপরাধী জাতির ইচ্ছাই পূরণ করেছিল, সেহেতু গোটা জাতিই এ অপরাধে শরীক ছিল।

গৃহে বসে জীবন উপভোগ করে নেয়। কিন্তু অবিশ্বাসীরা নবীর এ কথাকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করল না। বরং সন্ধ্যার সময় তারা তাদের কুফরী কার্যক্রমে সীমালঙ্ঘন করে হযরত সালেহ (আ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং উটনী মতো তাঁকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে—

"তারা বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ কর 'আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব।" –সূরা নামল

অর্থাৎ, রাতে সালেহ (আ)-এর গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করব। এরপর তাঁর অভিভাবকগণ যদি এ হত্যার বদলায় রক্তপণ (হত্যার পরিবর্তে হত্যা) দাবি করে, তখন আমরা এ হত্যার কথা অস্বীকার করব। তাদের এ কথাটিই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.

অর্থ : তারপর তার অভিভাবককে বলে দেবো[১] যে, আমরা তার পরিবারের ধ্বংসের সময় হাজির ছিলাম না এবং আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। –সূরা নামল : ৪৯

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ط إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞

অর্থ : তারা তো এ চক্রান্ত করল; আমি এমন এক চাল চাললাম, যা তারা টেরও পেল না। এখন দেখে নাও, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কেমন হলো। আমি তাদেরকে ও তাদের কওমের সবাইকে ধ্বংস করে দিলাম। তারা যে যুলুম করতো এর পরিণামে ঐ যে তাদের বাড়ি-ঘরগুলো বিরান অবস্থায় পড়ে আছে। যাদের ইলম আছে তাদের জন্য এর মধ্যে এক শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদেরকে আমি নাজাত দিলাম। –সূরা নামল : ৫০-৫৩

ছামূদ জাতির লোকেরা উটনীটিকে হত্যা করা শেষ করে সে রাতেই হযরত সালেহ (আ)-কে হত্যা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

গোত্রের মধ্যে যারা উটনীটিকে হত্যা করেছিল এবং নবীকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল, আল্লাহ তিনদিনের পূর্বেই তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করে দেন। বুধবার দিনের বেলা উষ্ট্রীটি পাপীদের হাতে শহীদ হয়। আর রাতে এ অপরাধীরা ধ্বংস হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার ছিল, ছামূদ জাতিকে তিনদিন সুযোগ দেয়ার প্রথম দিন। এ প্রথম দিন, ছামূদ জাতির সকলের চেহারা পাণ্ডু বর্ণের হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলা তারা পরস্পরে বলতে লাগল, বাহ! তিনদিন সুযোগ দেয়ার একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারা এ চেহারার পরিবর্তন দেখে ঈমান আনার পরিবর্তে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা শুরু করে দিল। দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার) সকাল বেলা তাদের সকলের চেহারা লাল বর্ণের হয়ে গেল। যখন সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখন তারা (কাফিরেরা) পরস্পরে বলতে লাগল যে, বাহ! তিনদিন থেকে দু'দিন শেষ হয়ে গেল। তৃতীয় দিন (শনিবার) সকাল বেলা, তাদের সবার চেহারা কালো বর্ণের হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলা, কাফিররা পরস্পরে বলাবলি করতে

১. অর্থাৎ, হযরত সালেহ (আ)-এর গোত্রের প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা অনুযায়ী তাদের রক্তের দাবির হকদার বলে যে সরদারকে গণ্য করা হতো, নবী করীম ﷺ-এর জামানায় তাঁর চাচার যে পজিশন ছিল এটা সেইরূপ পজিশন। কুরাইশ কাফিররাও এই আশঙ্কায় নিজেদের হাতকে দমন করে রেখেছিল যে, যদি তারা রাসূল ﷺ-কে হত্যা করে তবে বনী হাশেমের সরদার আবূ তালেব নিজেদের গোত্রের পক্ষ থেকে দাবি নিয়ে উঠবেন।

লাগল যে, বাহ! আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। তারা অত্যন্ত ভীত ও আতঙ্ক অবস্থায় শাস্তির অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাদের আদৌ ধারণা ছিল না যে, তাদের প্রতি কিরূপ শাস্তি পাঠানো হবে এবং কোন দিক থেকে সে শাস্তি আসবে? সূর্য উদয় হওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে বিকট এক আওয়াজ এলো এবং তলদেশ থেকে প্রবল ভূমি কম্পন শুরু হলো। এ বিকট শব্দে তাদের প্রাণ নির্গত হলো, শরীরের নড়াচড়া ও মুখের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল এবং শাস্তির ঘোষণা যথাসময়ে প্রকাশ হয়ে গেল। তারা তাদের নিজঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। প্রাণহীন দেহের স্তূপ ব্যতীত সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ঐতিহাসিকগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শাস্তি থেকে ছামূদ সম্প্রদায়ের এক মহিলা ব্যতীত আর কেউ রক্ষা পায়নি। সে মহিলাটি ছিল খোঁড়া। তার নাম কালবা বিনতে সালাকা। যারীয়া নামেও তাকে ডাকা হতো। এ মহিলা হযরত সালেহ (আ)-এর ঘোর শত্রু ছিল এবং কুফরীর উপর খুব অবিচ্ছল ছিল। শাস্তি আসতে দেখেই সে দ্রুত দৌড়ে আরবের এক গোত্রের কাছে গিয়ে উঠল এবং তার গোত্রে উপর যে শাস্তি আসতে সে দেখেছে, তাদের কাছে তা বর্ণনা করল। অতঃপর মহিলাটি তাদের কাছে পান করার জন্য পানি চাইল। পানি পান করার সময় মহিলাটি মারা গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ، أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ، أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ.

অর্থ : যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নি। শুনে রাখ, ছামূদ তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামূদ জাতিকে দূরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। -সূরা হূদ : ৬৮

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার 'হিজর' অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করার সময় (সংগীয় লোকদেরকে) বলেন, 'তোমরা আল্লাহর নিদর্শন (মু'যেজা) তোমাদের কাছে পেশ করার জন্য বলবে না? সালেহ (আ)-এর গোত্রের লোকেরা এরূপ দাবি করেছিল। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে হিসেবে উটনীটিকে নিদর্শন পেশ করা হয়েছিল। সেই উটনীটি পানি পান করার জন্যে কূপের কাছে এখান থেকে (এ হিজর এলাকা থেকে) যেত এবং পানি পান করে সেই পথ দিয়েই ফিরে যেত। ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশকে অমান্য করল এবং উটনীটির পায়ের গোছা কেটে ফেলল এবং সেটিকে হত্যা করল। ফলে এক বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ বিকট শব্দ ছামূদ সম্প্রদায়ের শুধু একটি লোক ব্যতীত পৃথিবীর বুকে তাদের আর যত লোক ছিল সব ধ্বংস হয়ে গেল। এ বেঁচে যাওয়া লোকটি তখন হারাম শরীফে (মক্কায়) অবস্থান করছিল। সাহাবাগণ আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ লোকটি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে লোকটির নাম ছিল আবূ রাগাল। পরে যখন সে লোকটি হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে আসে, তখন তাকেও সেই শাস্তি গ্রাস করে, যে শাস্তি গ্রাস করেছিল তার সম্প্রদায়ের লোকদের।[১]

আব্দুর রাযযাক (রহ) বলেছেন, ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে মুয়াম্মার (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো একদিন আবূ রাগালের কবরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর সাথীর সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, এ কবর কার? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি ﷺ বললেন, এ কবর আবূ রাগালের। সে ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের লোক। এ লোকটি আল্লাহর হারমে (মক্কায়) অবস্থান করেছিল। যখন সে হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে সেই শাস্তি পাকড়াও করে, যে শাস্তি পাকড়াও করেছিল তার গোত্রে লোকদেরকে। তারপর তাকে এখানে দাফন করা হয়। কবরের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত একটি ডালও পুঁতে রাখা হয়। তখনই লোকেরা তলোয়ার দ্বারা কবর খুঁড়ে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত ডালটি বের করে নিয়ে আসে।

যুহরী (রহ) বলেছেন, আবূ রাগাল সাকীফের পিতা ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যখন তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, তখন একটি কবরের পাশ দিয়ে

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ)-এর শর্ত অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সিহাহ সিত্তা (হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব)-এর মধ্যে এ হাদীসটির উল্লেখ নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

অতিক্রম করার সময় তিনি ﷺ বললেন, এটি আবূ রাগালের কবর। সে আবূ সাকীফ (সাকীফের পিতা) নামেও অভিহিত। সে ছামূদ গোত্রের লোক।

হারাম শরীফে থাকার কারণে সে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। পরে যখন সে হারাম শরীফ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার উপর সেই শাস্তি আপতিত হয়, যা আপতিত হয়েছিল তার গোত্রের লোকের উপর। তারপর তাকে এখানে দাফন করা হয়। তার নিদর্শন হলো এই যে, তার কবরের মধ্যে স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একখানা ডাল পুঁতে দেয়া হয়েছিল। যদি তোমরা এ কবর খুঁড়তে, তবে সেটি পেয়ে যেতে। তখনই লোকজন অতি দ্রুত কবরটি খুঁড়ে স্বর্ণ নির্মিত ডালটি বের করে নিয়ে আসে।

আবূ দাউদ (রহ) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (লেখক বলেন) তবে আমার মতে এ হাদীসটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্বোধন করা সম্পর্কে দ্বিধা সংশয় রয়েছে। তবে মনে হয় এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এরই উক্তি। প্রথমে বর্ণিত মুরসাল ও জাবের (রা)-এর হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

অর্থ : সালেহ এ কথা বলে তাদের বস্তি থেকে বের হয়ে গেলেন যে, হে আমার কওম! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের (যথেষ্ট) কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু (আমি আর কী করব) তোমরা তো কল্যাণকামীদেরকেই পছন্দ করো না। –সূরা আ'রাফ : ৭৯

এ আয়াতে হযরত সালেহ (আ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁর জাতি ধ্বংসের পর তিনি তাঁর নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যান। নিজ এলাকা ত্যাগ করার সময় তিনি সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, "হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশও দিয়েছিলাম।" (অর্থাৎ, তোমাদের হেদায়েতের ব্যাপারে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলাম এবং আমি তোমাদের হেদায়েতের ব্যাপারে খুব আশান্বিত ও আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু তোমাদের অবাধ্যতা ও ধৃষ্টতা আমাকে নিরাশ করেছে।) "কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীদের তোমরা পছন্দ কর না।" অর্থাৎ, তোমাদের চরিত্র ও মন-মানসিকতা সত্যকে গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। এ কারণেই তোমরা কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছ। আর এ শাস্তি তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী। এ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি কোনো পথও দেখছি না। আমি কোনোভাবেই তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না।

আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করেছি। তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমার যা উপদেশ দেয়ার তা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ যা চান তা অবশ্যই করেন।

বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরদের মধ্যে যাদেরকে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছিল, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ও অনুরূপ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি ﷺ বদর প্রান্তর থেকে তিন দিন পর শেষ রাতে রওয়ানা দেয়ার সময় উক্ত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে কাফিরদের মৃতদেহগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে কূপবাসীরা। তোমাদের সাথে তোমাদের প্রতিপালক (কুফরীর বিনিময় শাস্তির) যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা কি তোমরা সঠিকভাবে পেয়েছ? আমার প্রতিপালক আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা আমি সঠিকভাবে সত্যসহ পেয়েছি।"

তিনি ﷺ এ সময় নিহত কাফিরদের লক্ষ্য করে এ কথাও বলেছিলেন যে, "তোমরা নবীর বংশের নিকৃষ্টতম মানুষ। তোমরা তোমাদের নবীকে মিথ্যাবাদী বলেছ। আর অন্য (গোত্রের) লোকেরা আমাকে সত্য নবী বলে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি (মক্কা) থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছ। আর অন্য লোকেরা আমাকে (মদীনায়) সম্মানের সাথে গ্রহণ আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, আর অন্য গোত্রের লোকেরা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। তোমরা তোমাদের নবীর দুশমন ছিলে।"

এ ভাষণ দেয়ার সময়, হযরত ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি এমন এক জাতিকে সম্বোধন করে ভাষণ দিচ্ছেন, যারা ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাদের সম্বোধন করে আমি যা বলেছি, তা তাদের চেয়ে বেশি তুমি শুনতে পাও নি। কিন্তু তারা কোনো উত্তর দিতে পারছে না।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সালেহ (আ) পরবর্তী সময়ে হারাম শরীফে এসে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক হজ্জের মওসূমে উসফান উপত্যকা অতিক্রম করেন। এ সময় তিনি ﷺ হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ বকর! এটি কোন উপত্যকা? আবূ বকর (রা) বললেন, এটা উসফান উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এখান থেকে হুদ ও সালেহ (আ)-ও অতিবাহিত হয়েছিলেন। তারা উষ্ট্রীর উপর সওয়ার ছিলেন, উষ্ট্রীটির লাগাম ছিল খেজুর পাতার তৈরিকৃত রশি। পরিধানে ছিল আচকান এবং গায়ে ছিল কালো ও সাদা রং এর চাদর। তাঁরা তালবীয়া (আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক....) পাঠ করতে করতে হজ্জ করার জন্যে বায়তুল্লাহ শরীফ গিয়ে পৌঁছেছিলেন।

এ হাদীসের সনদ (সূত্র) সহীহ। তাবারীর বর্ণনা থেকে, হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনাতে এটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নূহ, হূদ ও ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা রয়েছে।

তবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় হিজর উপত্যকায় রাসূল ﷺ-এর অবতরণ

হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিম বাহিনীসহ তাবূক অভিযানকালে ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাস ভূমি হিজর উপত্যকায় অবস্থান করেন। ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা যে সব কূপ থেকে পানি পান করতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী সাহাবাগণ সেই কূপ থেকে পানি তুলে তা ব্যবহার করা আরম্ভ করেন। তাঁরা সেই পানি দ্বারা আটার খামির তৈরি করেন এবং পাক করার জন্য ডেকচি উনুনে চড়িয়ে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে সাহাবাগণ ডেকচি উল্টিয়ে ফেলেন এবং পানি দ্বারা তৈরিকৃত খামির উটকে খেতে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে নিয়ে সামনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সেই কূপের কাছে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন, যে কূপ থেকে আল্লাহর উষ্ট্রী পানি পান করেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামূদ জাতির বসতবাড়ীতে যেতে নিষেধ করেন। তিনি ﷺ বলেন, আমি এ আশঙ্কা করছি যে, আবার কখন যেন তোমাদের উপর সেই শাস্তি আপতিত না হয়, যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের বাসস্থানে যেও না।

মুসনাদে আহমদে অন্য এক সূত্রে হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকেও এভাবে বর্ণিত আছে যে, হিজর উপত্যকায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁর সঙ্গীয় সাহাবাগণকে) বলেছিলেন যে, এ শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের কাছে যেও না। তবে ক্রন্দনরত অবস্থায় যেতে পার। সুতরাং ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া তাদের কাছে যেও না। (এই ভয়ে যে) তোমাদের উপরও আবার সেই শাস্তি পতিত না হয়ে যায়, যে শাস্তি পতিত হয়েছিল তাদের উপর।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ হাদীসখানা কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ছামূদ জাতির বসতি এলাকা অতিক্রম করেন, তখন তাঁর নিজ মাথা ঢেকে রাখেন এবং সওয়ারী অতিদ্রুত চালান। আর সাহাবাগণকে তাদের আবাসগৃহে ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, যদি কান্না একান্তই না আসে, তবে সে এলাকায় প্রবেশ কর না। (এই ভয়ে যে) আবার তোমাদের উপর সেই শাস্তি পতিত না হয়ে যায়, যে শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

এ হাদীসখানাও বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, "যদি তোমার কান্না না আসে, তবে কান্নার ভান কর। এই ভয়ে যে, আবার কখন না যেন তোমাদের উপর সেই শাস্তি পতিত হয়, যে শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

মুসনাদে আহমদে আমার ইবনে সা'দ অথবা আমের ইবনে সা'দ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধে গমনকালে লোকজন অতি দ্রুত হিজরবাসীদের বাসস্থানের দিকে যেতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ খবর শুনে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করিয়ে দেন যে—

'আস্সালাতু জামেয়া' (নামায সমবেতকারী)। লোকদেরকে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি ﷺ তাঁর সওয়ারী উষ্ট্রীটি থামিয়ে বলছিলেন, 'তোমরা কি এমন এক সম্প্রদায়ের এলাকায় প্রবেশ করছ, যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয়েছে? তখন সম্মিলিত লোকদের মধ্যে এক লোক আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের উদ্দেশ্য শুধু সেখানের বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বস্তুগুলো দেখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে বিস্ময়কর এক ব্যক্তির কথা বলব না? তা হচ্ছে এই যে, তোমাদের মধ্য হতেই এক ব্যক্তি, তোমাদের কাছে সেসব ঘটনা বলে দেয়, যা তোমাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতের কথাও (ওহীর মাধ্যমে) তিনি জানিয়ে দেন। (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই)। সুতরাং তোমরা সত্য পথের উপর অবিচল থাক। কারণ, আল্লাহ তোমাদেরকেও তাঁর আযাব দিতে কোনো পরোওয়া করবেন না। শীঘ্রই এমন এক জাতির আবির্ভাব ঘটবে, যারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে আদৌ রক্ষা করতে পারবে না।

এ হাদীসের সনদ (সূত্র) বিশুদ্ধ। কিন্তু হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। বর্ণিত আছে যে, সালেহ (আ)-এর জাতির লোকেরা দীর্ঘায়ু পেত। তারা বসবাসের জন্য মাটির ঘর তৈরি করতো। এ ঘর স্থায়ী হতো না। তাদের মৃত্যুর পূর্বেই এসব ঘর বিনষ্ট হয়ে যেত। এর পরে তারা পাহাড় কেটে কেটে বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করা শুরু করে।

মুফাস্সিরগণ বলেন, ছামুদ জাতির লোকেরা যখন হযরত সালেহ (আ)-এর কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন দবি করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিদর্শন স্বরূপ উটনী প্রেরণ করেন। সালেহ (আ) গোত্রে লোকদেরকে বললেন, তোমরা এই উটনীটকে এবং এর গর্ভে যে বাচ্চাটি আছে সেটিকে কোনো প্রকার ক্লেশ দিবে না। যদি ক্লেশ দাও তবে আল্লাহর শাস্তি তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।

হযরত সালেহ (আ) তাদেরকে এ খবর জানিয়ে দেন যে, শীঘ্রই তারা উটনীটিকে হত্যা করবে। আর এ কারণেই তারা ধ্বংস হবে। এমনকি উটনীটিকে যে হত্যা করবে, তার আকার ও আকৃতি কিরূপ হবে, তাও তিনি বলে দেন। তিনি জানিয়ে দেন যে, সেই (পাপী) লোকটি হবে লাল ও নীল বর্ণের। সম্প্রদায়ের (মুমিন) লোকেরা ধাত্রীদেরকে গোটা শহরে এ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করেন, যাতে তারা এরূপ বৈশিষ্ট্য ও আকৃতির কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করে। একটি যুগ অতিবাহিত হলো, কিন্তু এরূপ আকৃতির কোনো শিশুই পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, এরূপ আকৃতির কোনো শিশু জন্মগ্রহণ করে নি। আর কাউকে হত্যাও করা হয় নি। এভাবে একটি পুরুষ খতম হয়ে অন্য আর একটি পুরুষের আবির্ভাব ঘটে।

তারপর, কোনো এক সময় এক শহরের নেতা অন্য এক শহরের নেতা কন্যাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেয়। উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করে এ উষ্ট্রীর হত্যাকারী। এ শিশুটির নাম রাখা হয়, কিদার ইবনে সালিফ। এ শিশুটির মাতা-পিতা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও নেতা হওয়ার কারণে ধাত্রী তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। এ পাপী অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বড় হতে লাগল।

শিশু এক মাসে যতটুকু বড় হয়, এ শিশুটি এক সপ্তাহে ততটুকু বড় হয়ে গেল। সে অল্পদিনের মধ্যে সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তার অন্তরে এ উটনীটি হত্যার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সম্প্রদায়ের আরো নেতৃস্থানীয় আট ব্যক্তি তার অনুসরণ করে। এ পাপীরাই হযরত সালেহ (আ)-কেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা উটনীটিকে হত্যা করল। হত্যার খবর যখন হযরত সালেহ (আ) শুনলেন, তখন তিনি উটনীটির শোকে কাঁদতে কাঁদতে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আসেন। সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী ও নেতৃস্থানীয় লোকের

সালেহ (আ)-এর কাছে মিথ্যা অজুহাত ও কৃত্রিম অপারগতা প্রকাশ করে বলল, এ কাজটি আমাদের কারো থেকে সংঘটিত হয় নি। বরং এটি কিছু সংখ্যক যুবক ঘটিয়েছে। শেষ পর্যন্ত হযরত সালেহ (আ) (ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে) বললেন, আচ্ছা, তবে তোমরা এর বিনিময় স্বরূপ উটনীটির বাচ্চাটিকে নিয়ে এসো এবং সেটির সাথে সদ্ব্যবহার কর। লোকেরা বাচ্চাটিকে নিয়ে আসার জন্য তার কাছে গেলে, বাচ্চাটি নিকটস্থ একটি পাহাড়ের দিকে চলে যায়। লোকেরা তখন সেটির পিছে পিছে পাহাড়ে গিয়ে উঠল, তখন বাচ্চাটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে যায়। পাখীরা তাকে স্পর্শ করতে লাগল। সেখানে তাদের উঠা সম্ভব হলো না। বাচ্চাটির দু-চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। এরপর বাচ্চাটি হযরত সালেহ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার জোরে ডাক দেয়। এ সময় সালেহ (আ) তার সম্প্রদায়ের লোকদের বললেন—

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ط ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ـ

অর্থ : তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করে লও। এটি একটি প্রতিশ্রুতি, যা মিথ্যা হবার নয়। –সূরা হূদ : ৬৫

হযরত সালেহ (আ) গোত্রের লোকদের একথাও জানিয়ে দিলেন যে, আগামীকাল প্রথমদিন তাদের চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দিন তাদের চেহারা লাল বর্ণের হয়ে যাবে। আর তৃতীয়দিন তাদের চেহারা কালো রং এর হয়ে যাবে। তিনদিন শেষ হয়ে যাবার পরে চতুর্থ দিন ভয়ঙ্কর বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করবে, যাতে তারা তাদের নিজ গৃহে মুখ উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে।

এ বর্ণনার কিছু কিছু কথার সাথে কুরআন মাজীদের সাথে অমিল পরিলক্ষিত হয়। যা ইতোপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহর বন্ধু
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা

বংশ পরম্পরা

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ পরম্পরা এরূপ– ইবরাহীম ইবনে তারেখ (ব: ২৫০) ইবনে লাহূর (ব: ১৪৮) ইবনে ছারুগ (ব: ২৩০) ইবনে রাউ (ব: ২৩৯) ইবনে ফালিগ (ব: ৪৩৯) ইবনে আবির (ব: ৪৪৬) ইবনে শারিহ (ব: ৪৩৩) ইবনে ফাখশাদ (ব: ৪৩৮) ইবনে সাম (ব: ৬০০) ইবনে নূহ (আ:)।

আহলে কিতাবদের গ্রন্থে তাঁর বয়সসহ এরূপ বংশ তালিকা উল্লেখ রয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর বয়সের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয় নি। হযরত নূহ (আ) সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা ইতোপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে।

হাফিজ ইবনে আসাকির (রহ) হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর মায়ের নাম ছিল উমায়লা। তাঁর জন্ম সম্পর্কিত পরবর্তী আলোচনা অতি দীর্ঘ। ফালবী (রহ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর মায়ের নাম ছিল বুনা বিনতে কারবানা ইবনে কুরসী। ইনি ছিলেন আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ)-এর বংশধর। ইবনে আসাকির (রহ)-এর উপাধি ছিল 'আবুয্ যায়ফান' (অর্থাৎ, অতিথিদের পিতা)। তিনি ছিলেন খুবই অতিথিপরায়ণ। এ আদর্শের কারণেই তিনি 'আবু যায়ফ' (অতিথিদের পিতা) উপধিতে আখ্যা লাভ করেন।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, তারেখের বয়স যখন পঁচাত্তর বছর, তখন তার ঔরসে হযরত ইবরাহীম (আ) ভূমিষ্ঠ হন। ইবরাহীম (আ) ছাড়া তারেখের ঔরসে আরো দুটি সন্তান জন্ম হয়। তাদের নাম, নাহূর ও হারন। হারানের ঔরসে জন্ম হন হযরত লূত (আ)। এ দিক থেকে হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হন। আহলে কিতাবদের মতে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তিন ভাইয়ের মধ্যে মেঝো। হারান তার পিতার জীবদ্দশায়ই নিজ জন্মভূমি কালদানিনে মারা যান। এখানে কালদানিন দ্বারা বাবেল শহরকে বুঝানো হয়েছে।

সীরাত ও ইতিহাস বিশ্লেষক গণের কাছে এ তথ্যটিই অধিক বিশুদ্ধ। হাফেজ ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) গওতায়ে দামেশকের 'বুরযা' নামক পল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। যেটি কাসিয়ুন পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু পরবর্তীতে আসাকির (রহ) বলেছেন যে, বিশুদ্ধ মত এই যে, হযরত ইবরাহীম আ) বাবেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বাবেল শহরে জন্ম হওয়ার কথা এজন্য বলা হয় যে, যখন তিনি (ইবরাহীম (আ) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ)-কে সাহায্য করার জন্য এখানে তাশরীফ এনেছিলেন, তখন তিনি এখানে নামায পড়েছিলেন। মোটকথা, বড় ভাই নাহূর এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত ইবরাহীম (আ) এ বাবেল নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহকে এবং নাহূর কতার নিজ ভাই হারুনের কন্যা মালেকাকে বিবাহ করেন। হযরত সারাহ (আ) ছিলেন বন্ধ্যা। তাঁর কোনই সন্তান হতো না।

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, তারেখ তার নিজ পুত্র ইবরাহীম (আ) ও পুত্রবধূ সারাহ এবং লূত ইবনে হারানকে নিয়ে কালদানীদের এলাকা বাবেল শহর থেকে কিনআনীদের এলাকায় চলে যান। সেখানে পৌঁছে তারা হারান নামক স্থানে অবস্থান করেন। তারেখ সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল দু'শ পঞ্চাশ বছর। এতে প্রমানিত হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হারান এলাকায় হয় নি। বরং তাঁর জন্ম হয়েছে কালদানীদের দেশ বাবেল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তারপর তাঁরা সেখান থেকে কিনআনীদের জন্মভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এখানে এসে তাঁরা 'হারান' নামক স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। তখন এই

'হারান' এলাকাটি এবং জাযীরা ও শাম এলাকাটিও কালদানীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানের অধিবাসীরা সাতটি নক্ষত্রের অর্চনা করতো। যে সব লোকেরা দামেশক শহরকে সর্বপ্রথম আবাদ করেছিল, তারাও এ ধর্মের অনুসারী ছিল। আমরা যেমন বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে ইবাদত করি, তখন তারা উত্তর মেরুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সাতটি নক্ষত্রের অর্চনা করতো। এ কারণেই প্রাচীন দামেশকের প্রধান সাতটি দরজার প্রতিটিতে উক্ত নক্ষত্রের এক একটি নক্ষত্রের চিত্র অঙ্কিত ছিল। এই নক্ষত্রগুলোকে সম্মুখে রেখে তারা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করতো। হারান শহরের অধিবাসীরাও এ নক্ষত্রগুলোর উপাসনা করতো। এ সময় পৃথিবীতে যারা ছিল, তাদের মধ্য থেকে হযরত ইবরাহীম (আ), তাঁর স্ত্রী সারাহ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ)-এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা এ ফিতনা, ফাসাদ ও অন্যায় কাজগুলো বিদূরিত করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবকালেই সত্য পথ প্রদর্শন করেন, তাঁকে তাঁর রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আপন বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ـ

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ط اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞ وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ط وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۞ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۞ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاءُ ج وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۞ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ز وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۞ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا لا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ز وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۞ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ز وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ج وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

অর্থ : আর আমি ইবরাহীমকে পাঠালাম, যখন তিনি তার কওমকে বললেন, আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁকে ভয় কর। তোমরা যদি জান তাহলে এটাই তোমাদের জন্যে ভালো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করছ তারা তো শুধু মূর্তি। আর এটা তোমরা একটা মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছ। আসলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের পূজা করছ, তারা তোমাদেরকে রিযক দেওয়ারও ক্ষমতা রাখে না। কাজেই আল্লাহরই কাছে রিযক চাও, তাঁরই দাসত্ব কর এবং তাঁকেই শুকরিয়া জানাও। তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। আর যদি তোমরা মানতে অস্বীকার কর, তাহলে জেনে রাখ, তোমাদের আগেও অনেক জাতি মানতে অস্বীকার করেছে। রাসূলের উপর স্পষ্টভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌছিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব নেই। তারা কি লক্ষ্য করে নি যে, আল্লাহ কীভাবে সৃষ্টির কাজ শুরু করেন, তারপর আবার সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই তা (আবার সৃষ্টি করা তো) আল্লাহর জন্য আরো সহজ। (হে নবী!) এদেরকে বলুন, তোমরা পৃথিবীর বুকে ঘুরাফিরা করে দেখ, কীভাবে তিনি সৃষ্টির কাজ শুরু করলেন। তারপর আল্লাহ আবারো জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর ক্ষমতা রাখেন। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন, যার উপর চান রহম করেন। তোমাদেরকে তার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে। তোমরা পৃথিবীতেও তাকে অক্ষম করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখ না, আসমানেও না। আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার মতো কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারীই তোমাদের নেই। যারা আল্লাহর আয়াত ও তাঁর সাথে দেখা হওয়ার কথা অস্বীকার করে, তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে।[১] তারাই ঐ সব লোক, যাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে। তারপর ইবরাহীমের কওমের এ ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিল না যে, তারা বলল, তাকে মেরে ফেল বা পুড়িয়ে দাও। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আগুন থেকে নাজাত দান করেন। যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। ইবরাহীম বললেন, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ।[২] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের প্রতি লা'নত করবে। আগুনই হবে তোমাদের ঠিকানা এবং তোমাদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। সে সময় লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তখন ইবরাহীম বললেন, "আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি।" নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তারই বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছি। আর আমি দুনিয়াতেই তাকে তার বদলা দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি আখিরাতে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। –সূরা 'আনকাবূত : ১৬–২৭

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর পিতার ও জাতির বাদানুবাদের কথা বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা একটু পরেই করব ইনশাআল্লাহ। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম দাওয়াত দিয়েছিলেন তাঁর পিতাকে। তাঁর পিতা মূর্তি পূজা করতো। এ কারণে সে-ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত পাওয়ার সবার চেয়ে বেশি হকদার। যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۞ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا ۞ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَآءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ

১. *অর্থাৎ, আমার রহমতের মধ্যে তাদের কোনো অংশ নেই। তাদের জন্যে এ বিষয়ে কোনো অবকাশ নেই যে, তারা আমার রহমত থেকে অংশ পাওয়ার আশা করতে পারে। যখন তারা আখিরাতকেই অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে এক সময় আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে- এ কথা স্বীকারই করে না, তখন তার অর্থই হচ্ছে, তারা আল্লাহর দয়া, দান ও ক্ষমার সঙ্গে কোনো আশার সম্পর্কই রাখে নি।*

২. *অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দাসত্বের বদলে নাফসের গোলামির ভিত্তির উপর তোমাদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ, যা পার্থিব জীবনে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কারণ, এখানে যেকোনো আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের উপর তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মানুষ সংগঠিত হতে পারে। সমাজ যত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার উপরই কায়েম হোক না কেন, দুনিয়ার পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংগঠনের মাধ্যম হতে পারে।*

فَاتَّبِعْنِيْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۞ يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ط اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۞ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ج سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ج اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۞ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ ز عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۞

অর্থ : হে নবী! এ কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি সত্যপন্থি ও নবী ছিলেন। (তাদেরকে একটু ঐ কথা মনে করিয়ে দিন) যখন তিনি তাঁর পিতাকে বললেন, আব্বাজান! আপনি কেন ঐ সবের ইবাদত করেন, যারা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না এবং যারা আপনার কোনো উপকারেও আসে না? আব্বাজান! আমার নিকট এমন এক ইলম এসেছে, যা আপনার কাছে আসে নি। তাই আপনি আমার অনুরসণ করুন। আমি আপনাকে সোজা পথ দেখাব। আব্বাজান! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। নিশ্চয়ই শয়তান রাহমানের নাফরমান। আব্বাজান! আমার ভয় হয়, না জানি আপনার উপর রাহমানের আযাব এসে পড়ে এবং আপনি শয়তানের সাথী হয়ে যান। (ইবরাহীমের পিতা) বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মা'বুদদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে ধ্বংস করে দেব। তুমি চিরদিনের জন্য আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। ইবরাহীম বললেন, আপনাকে সালাম। আমার রবের নিকট আপনার জন্য গুনাহ মাফ চাইব। আমার রব আমার উপর বড়ই মেহেরবান। আমি আপনাদেরকেও ত্যাগ করলাম এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনারা যাদের ডাকেন তাদেরকেও ত্যাগ করলাম। আমি তো আমার রবকেই ডাকব। আশা করি, আমার রবকে ডেকে আমি ব্যর্থ হব না। –সূরা মারইয়াম : ৪১–৪৮

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু যখন এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আল্লাহ বিরোধী, কাফির (এবং এ কুফরী অবস্থায়ই থাকবে) তখন পুত্র ইবরাহীম (আ)-ও তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ط اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۔

অর্থ : ইবরাহীম তার পিতার জন্য যে মাগফিরাতের দো'আ করেছিলেন তা এ কারণে যে, তিনি তার পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু যখন তার কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তার দিক থেকে ফিরে আসলেন। সত্য কথা হলো, ইবরাহীম বড়ই রহম দিল ও সহনশীল ছিলেন।

–সূরা তাওবা : ১১৪

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাথে সাক্ষাৎ হবে। এ সময় আযরের চেহারা থাকবে ধূলি ধূসরিত ও কর্দমাক্ত। পিতার এ অবস্থা দেখে, ইবরাহীম (আ) তাকে বলবেন, হে পিতা! পৃথিবীতে বসে আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার বিরোধিতা করবেন না? পিতা তখন বলবে, হে পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্য হব না। তখন ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আবেদন করবেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে) আমাকে অপদস্থ করবেন না। আমার পিতাকে অপদস্থ করার পর, আমার জন্যে এর চেয়ে আর বড় কি অপদস্থ হতে পারে? তখন আল্লাহ তা'আলা

বলবেন, "নিশ্চয়ই আমি কাফিরদের জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।" তারপর বলা হবে, হে ইবরাহীম! একটু চেয়ে দেখ, তোমার পদতলে কি আছে? তিনি পায়ের নীচে তাকিয়ে দেখবেন, একটি অপবিত্র (নোংরা) লাশ পড়ে আছে। তারপর সেটার পা ধরে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞

অর্থ : ইবরাহীমের ঘটনা খেয়াল করে দেখ, যখন তিনি তাঁর পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ বানিয়েছেন? আমি আপনাকে ও আপনার কওমকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। -সূরা আনআম : ৭৪

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম ছিল আযর। কিন্তু অধিকাংশ বংশ বিশ্লেষকদের অভিমত এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারেখ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এরও এ অভিমত। এখানে একটি প্রশ্ন এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম যদি তারেখ হয়, তবে আযর নামে তিনি পরিচিত কেন?

এক বর্ণনা অনুযায়ী, ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর নামক একটি মূর্তির উপাসনা করতো। এ কারণেই সে আযর উপনামে ভূষিত হয়। মুফাসসির ইবনে জারীর (রহ) বলেছেন, আযর তার প্রকৃত নাম। অথবা আযর ও তারেখ এ দুটোই তার নাম। অথবা এ দুটোর মধ্যে একটি প্রকৃত নাম, আর একটি তার উপনাম। ইবনে জারীর (রহ)-এর এই অভিমতটি বেশি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَكَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ
الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ
هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ۞ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ
بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۞ اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ۚ قَالَ
اَتُحَآجُّوْٓنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ۚ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّيْ
كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ
مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۚ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ
عَلٰى قَوْمِهٖ ۚ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞

অর্থ : এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের বাদশাহী দেখিয়েছি, যাতে তিনি তাদের মধ্যে শামিল হন, যারা ইয়াকীন করে। যখন তার উপর রাত ছেয়ে গেল, তখন তিনি একটা তারকা দেখতে পেলেন। বললেন, এটা কি আমার রব? কিন্তু যখন তা ডুবে গেল তিনি বললেন, যা ডুবে যায় তাকে তো আমি পছন্দ করি না।

তারপর যখন তিনি চাঁদকে আলোকিত দেখলেন, তখন বললেন, এটাই (মনে হয়) আমার রব। কিন্তু যখন সেটাও ডুবে গেল, তখন বললেন, যদি আমার রব আমাকে হেদায়াত না করতেন, তাহলে আমি গোমরাহ কওমের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম। তারপর যখন তিনি সূর্যকে আলোকময় অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার রব (হতে পারে), এটা সবচেয়ে বড়। কিন্তু যখন এটাও ডুবল তখন (কওমকে) ডেকে বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা যে সবের (আল্লাহর সাথে) শরীক কর, সে সবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১] আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। তাঁর কাওম তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগল। তিনি কাওমকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই তো আমাকে হেদায়াত করেছেন। তোমরা যেসবকে শরীক কর সেসবকে আমি ভয় পাই না। তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে তা হতে পারে। আমার রবের ইলম সব জিনিসের উপর ছেয়ে আছে। তবুও কি তোমাদের হুঁশ হবে না।[২] তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর তাদেরকে কী করে আমি ভয় পাব? অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে ঐসব জিনিসকে শরীক করতে ভয় পাও না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদের উপর কোনো সনদ নাযিল করেন নি। (তোমরা ভেবে দেখ) আমাদের দুপক্ষের মধ্যে কে বেশি নিরাপদে থাকার হকদার? এ বিষয়ে যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে তাহলে বল। আসলে তো তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে (শিরকের) যুলুমের সাথে মেশায়নি। এটাই ছিল আমার (পক্ষ থেকে) দলীল-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার কাওমের মুকাবিলার জন্য দিয়েছি। আমি যাকে চাই উচ্চ মর্যাদা দিয়ে থাকি। সত্যি বলতে কি, তোমার রব বড়ই কুশলী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। -সূরা আনআ'ম : ৭৫-৮৩

ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর জাতির লোকদের সাথে এরূপ বাদানুবাদ হয়েছিল। ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতিকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি মা'বূদ বা উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এগুলো কখনই আল্লাহর শরীক হতে পারে না। কারণ এগুলো নিজেরাই সৃষ্ট, নিয়ন্ত্রিত ও মানুষের কাজে নিয়োজিত। এরা কখনো উদিত হয়, কখনো অস্ত যায়। আবার কখনো পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর মহান আল্লাহ তা'আলা, যার থেকে কোনো কিছুই অদৃশ্য হতে পারে না এবং কোনো কিছুই গোপন থাকতে পারে না, যিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ নেই। আর তিনি ছাড়া অন্য কোনো পালনকর্তাও নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথমে তাঁর জাতির কাছে গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির মা'বুদ হওয়ার যোগ্য নয় বলে প্রমাণ পেশ করেন। এক বর্ণনা মতে, ইবরাহীম (আ) প্রথমে যে উজ্জ্বল বস্তু দেখেছিলেন, সেটি ছিল যোহরা সেতারা (অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র)। এরপরে তাঁর দৃষ্টি পড়ে এর চেয়েও অধিক উজ্জ্বল ও দীপ্তমান বস্তু চন্দ্রের দিকে। পরবর্তীতে এ চন্দ্র অপেক্ষাও অধিকতর উজ্জ্বল ও দীপ্তশালী বস্তু সূর্যকে তিনি দেখতে পান। যে সূর্যের উজ্জ্বলতা ও প্রখরতা এই ধরণীতে গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্রের অপেক্ষাও অধিক। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এগুলো অবশ্য কারো সৃষ্টি এবং সেই স্রষ্টার নির্দেশেই এগুলো পরিভ্রমণ। এগুলোর উদয়, অস্ত ও পরিভ্রমণ সবই তাঁরই নির্দেশ। তিনিই এগুলোকে (মানুষের জন্য) কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন-

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

১. হযরত ইবরাহীম (আ) নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এ আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শিরকের পরিবেশে জন্মলাভ করেও একজন সুস্থ বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধির মানুষ কেমন করে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞানলাভে সফল হয়েছিলেন।

২. মূলে এখানে 'তাযাক্কার' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর সঠিক অর্থ- কোনো বিষয়ে গাফলতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ কর।

অর্থ : এ রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে শামিল। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা কর না। ঐ আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা সত্যিই তাঁর ইবাদতকারী হও। (সিজদার আয়াত) -সূরা হা-মীম সাজদাহ্ : ৩৭

এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّیْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۞ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۞ وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّیْ فِی اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ یَّشَآءَ رَبِّیْ شَیْـًٔا ۞

অর্থ : তারপর যখন তিনি সূর্যকে আলোকময় অবস্থায় দেখলেন, তখন বললেন, এটা আমার রব (হতে পারে), এটা সবচেয়ে বড়। কিন্তু যখন এটাও ডুবল তখন (কওমকে) ডেকে বললেন, হে আমার দেশবাসী! তোমরা যেসবকে (আল্লাহর সাথে) শরীক কর, সে সবের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১] আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। তাঁর কওম তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগল। তিনি কাওমকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনিই তো আমাকে হেদায়াত করেছেন। তোমরা যেসবকে শরীক কর সেসবকে আমি ভয় পাই না। তবে আমার রব যদি কিছু চান তাহলে তা হতে পারে। -সূরা আনআ'ম : ৭৮-৮০

অর্থাৎ, আমি তোমাদের সেই উপাস্যের ভয় করি না, আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা উপাসনা কর। কারণ, তোমাদের সেই উপাস্যগুলো কোনো উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং তাদের না আছে শ্রবণ শক্তি, আর না আছে কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান। বরং এগুলো গ্রহ, নক্ষত্রের মতো সৃষ্ট বস্তু। এগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের কাজের জন্য। এছাড়া এই উপাস্যগুলো তোমাদেরই নিজেদের হাতের বানানো। এগুলোকে তোমরা পাথর দ্বারা নির্মাণ করেছ।

উক্ত আলোচনায় স্পষ্টভাবে এটি বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) নক্ষত্র দ্বারা হারানের অধিবাসীদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ তারা নক্ষত্রের পূজা করতো। সুতরাং এর দ্বারা ইবনে ইসহাক (রহ) প্রমুখ মুফাসসিরগণের এই অভিমত অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় যে, "হযরত ইবরাহীম (আ) শৈশবে যখন 'সারব' নামক গুহা থেকে বের হয়ে আসেন, তখন তিনি এ কথা বলেছিলেন।" এ তথ্যটি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে লওয়া হয়েছে। যার কোনই নির্ভরযোগ্যতা নেই। বিশেষ করে, এটি সত্য বর্ণনারও পরিপন্থী হয়ে যায়। আর বাবেল অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করতো। এদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের উপাস্য মূর্তিগুলো প্রসঙ্গে বিতর্ক করেছিলেন। তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলেন এবং সেগুলোকে অপমান করেন এবং সেগুলো উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় বলে যুক্তি পেশ করেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَیْنِكُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ ثُمَّ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِیْنَ ۞

১. হযরত ইবরাহীম (আ) নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের জ্ঞান লাভ করেছিলেন এ আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শিরকের নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞানলাভে সফল হয়েছিলেন।

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, তোমরা দুনিয়ার জীবনে তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোকে তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছ।[১] কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের প্রতি লা'নত করবে। আগুনই হবে তোমাদের ঠিকানা এবং তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। –সূরা 'আনকাবূত : ২৫

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۞ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ۞ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ز وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۞ وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۞ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ۞ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۞ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ق كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ج لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ ۞ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۞ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۞ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ۞ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ۞

অর্থ : এর আগেও আমি ইবরাহীমকে হেদায়েত দান করেছিলাম। আমি তাকে খুব ভালোভাবে জানতাম। ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কওমকে বলেছিলেন, এ মূর্তিগুলো কেমন, যার প্রেমে তোমরা পাগল হয়ে আছ? তারা জবাবে বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এসবের ইবাদত করতে দেখেছি। ইবরাহীম বললেন, তোমরাও গোমরাহ, তোমাদের বাপ-দাদারাও স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়েছিল। তারা বলল, তুমি কি কোনো সত্য নিয়ে আমাদের কাছে এসেছ? না তুমি আমাদের সাথে খেলার ছলে ঠাট্টা করছ? ইবরাহীম জবাবে বলল, না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই, যিনি আসমান ও যমীনের রব এবং যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহর কসম, তোমরা যখন উপস্থিত থাকবে না তখন আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোকে দেখে নেব। তারপর তিনি (মূর্তিগুলোকে) টুকরো টুকরো করে দিলেন। শুধু

১. *অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর দাসত্বের বদলে নাফসের গোলামির ভিত্তির উপর তোমাদের সমষ্টিগত জীবনের সংগঠন করেছ, যা পার্থিব জীবনে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কারণ, এখানে যেকোনো আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের উপর তা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, মানুষ সংগঠিত হতে পারে। সমাজ যত ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণার উপরই কায়েম হোক না কেন, দুনিয়ায় পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ভ্রাতৃত্ব এবং অন্য সকল প্রকারে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংগঠনের মাধ্যম হতে পারে।*

বড়টাকে রেখে দিলেন, যাতে তারা এর নিকট ফিরে আসে। (তারা এসে মূর্তিগুলোর এ দশা দেখে) বলল, কে আমাদের মা'বুদদের এ অবস্থা করেছে? নিশ্চয়ই সে কোনো বড় যালিমই ছিল।

কতক লোক বলল, আমরা ইবরাহীম নামের এক যুবককে এদের কথা বলাবলি করতে শুনেছি। তারা বলল, তাহলে সবার সামনে তাকে ধরে আন, যাতে লোকেরা দেখতে পায় (যে তাকে কেমন শাস্তি দেওয়া হয়)। (ইবরাহীম আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বুদদের সাথে এ ব্যবহার করেছ? তিনি জবাবে বললেন, এ সব কিছু এদের মধ্যে যে বড় সে-ই করে থাকবে। এরা যদি কথা বলতে পারে তাহলে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?[১] এ কথা শুনে তারা তাদের বিবেকের কাছে ফিরে গেল এবং (মনে মনে) বলল, আসলে স্বয়ং তোমরাই যালিম। কিন্তু এরপরই তাদের মত বদলে গেল। তখন তারা বলল, তুমি তো জানো, এরা কথা বলে না। ইবরাহীম বললেন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (এমন সব মা'বুদের) ইবাদত করছ, যারা তোমাদের কোনো উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না? তোমাদের ধিক! আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তাদের প্রতিও ধিক। তোমাদের কি কোনো আকল নেই? তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও। তোমাদের মা'বুদদেরকে সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও।[২] তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে চরমভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।" –সূরা আম্বিয়া : ৫১-৭০

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِينَ ۞ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۞ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيٓـَٔتِي يَوْمَ الدِّينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ۞

অর্থ : (হে নবী!) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কওমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিসের পূজা কর? তারা বলল, আমরা কতক মূর্তির পূজা করি এবং তাদের সেবায় লেগে থাকি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক তখন তারা কি শুনতে পায়? অথবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা জবাব দিলো, না; বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি। এ কথায় ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি কখনো (চোখ খুলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছ, যাদের পূজা তোমরা ও তোমাদের আগের বাপ-দাদারা করে এসেছে? রাব্বুল আলামীন ছাড়া

১. এ শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথাগুলো এজন্যই বলেছিলেন, যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, তাদের মা'বুদগুলোর কোনো ক্ষমতাই নেই এবং তাদের কাছ থেকে কোনো কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় যুক্তির খাতিরে যদি কেউ আসল ঘটনার খেলাফ কোনো কথা বলে, তবে ঐ কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। কারণ, সে মিথ্যা বলার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে না; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয় সেও ঐ কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের কথাকে সত্য হিসেবে সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শুনে সে-ও ঐ অর্থেই তা বুঝে।

২. এ শব্দগুলো দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং আগে-পরের প্রসঙ্গও এই অর্থের সমর্থন করছে যে, তারা নিজেদের ফায়সালা অনুযায়ী আগুনের বিরাট কুণ্ড তৈরি করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আগুনকে ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাওয়ার আদেশ দেন। কুরআনে উল্লিখিত মু'জিযাগুলোর মধ্যে এটি অবশ্যই অন্যতম।

এরা সব অবশ্যই আমার দুশমন। যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আমাকে পথ দেখিয়েছেন। যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই সুস্থ করে দেন। যিনি আমাকে মউত দেবেন এবং আবার আমাকে জীবিত করবেন। যার কাছে আমি আশা করি যে, বদলা দেওয়ার দিন তিনি আমার অপরাধ মাফ করবেন। (ইবরাহীম দোয়া করলেন) হে আমার রব! আমাকে হুকুম (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান করো এবং আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত করো। –সূরা শু'আরা : ৬৯-৮৩

সূরা সাফফাতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرٰهِيمَ ۞ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۞ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۞ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই নূহেরই পথের অনুসারী ছিলেন ইবরাহীম। যখন তিনি তার পিতা ও তার কওমকে বললেন, এ সব কী জিনিস, যাদের ইবাদত তোমরা করছ? আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা কি মিথ্যা বানোয়াট মা'বুদ চাও? তাহলে রাব্বুল আলামীন সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? তারপর (ইবরাহীম) তারকাগুলোর দিকে একবার তাকালেন।[১] তারপর তিনি বললেন, আমার শরীর ভালো নয়।[২] সুতরাং তাকে ছেড়ে চলে গেল। তিনি চুপে চুপে তাদের মা'বুদদের মন্দিরে ঢুকে পড়লেন এবং বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? আপনাদের কী হয়েছে? আপনারা যে কথাও বলছেন না? এরপর তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ডান হাতে খুব করে আঘাত করলেন। (ফিরে এসে) ঐ লোকেরা দৌড়ে ইবরাহীমের কাছে এল। তিনি বললেন, তোমরা কি নিজেদেরই খোদাই করা জিনিসের পূজা কর? অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং যে সব জিনিস তোমরা বানাও তা সৃষ্টি করেছেন। (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল) এর জন্য একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং একে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও। তারা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছেড়ে দিলাম।

–সূরা সাফ্ফাত : ৮৩-৯৮

এ আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর জাতিকে মূর্তির উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের কাছে মূর্তিগুলোর নিকৃষ্টতা ও অক্ষমতা তুলে ধরেছেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, ۞ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُونَ

অর্থ : এ মূর্তিগুলো কেমন, যার প্রেমে তোমরা পাগল হয়ে আছ? –সূরা আম্বিয়া : ৫২

অর্থাৎ, কেন তোমরা এ মূর্তিগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছ এবং সেগুলোর সামনে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ভাবে বসে থাক? এ কথার উত্তরে সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এগুলোর উপাসনা করতে দেখেছি।"

১. *আরবী ভাষার প্রচলন অনুযায়ী এ কথার অর্থ- সে চিন্তা করল বা সে ভাবতে শুরু করল।*

২. *সে সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোনো রকম অসুখ-বিসুখ ছিল না- এ কথা আমরা জানি না। সুতরাং ইবরাহীম (আ) এটা দ্বারা মিথ্যা বাহানা করেছিলেন- এ কথা বলা যায় না।*

তাদের মূর্তি পূজার দলীল শুধু তাদের পিতৃপুরুষরা এগুলোর পূজা করতো। এছাড়া তাদের কাছে এর আর কোনো দলীল ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও রয়েছো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।"

আল্লাহ তা'আলা সূরা সাফফাতে বর্ণনা করেন—

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۞ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ۞ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অর্থ : যখন তিনি তার পিতা ও তার কওমকে বললেন, এ সব কী জিনিস, যাদের ইবাদত তোমরা করছ? আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা কি মিথ্যা বানোয়াট মা'বুদ চাও? তাহলে রাব্বুল আলামীন সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? -সূরা সাফফাত : ৮৫-৮৭

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, যেদিন তার সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তিনি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন বলে তোমরা ধারণা কর?

ইবরাহীম (আ) তাদেরকে বলেছেন—

هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ۞ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۞ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۞

অর্থ : তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি শুনতে পায়? অথবা এরা কি তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে? তারা জবাব দিলো, না; বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এ রকম করতে দেখেছি।

-সূরা শু'আরা : ৭২-৭৪

এমনিভাবে ইবরাহীম (আ)-এর জাতি তাঁর সামনে এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, তারা যে মূর্তিগুলোর উপাসনা করে, সেগুলো কোনো প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শোনে না। মূর্তিগুলো কারো কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। তারা শুধু তাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণেই এ মূর্তিগুলোর পূজা করছে। এ পূজা দ্বারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু তাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ করা।

এজন্য ইবরাহীম (আ) তাদেরকে বলেন যে—

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۞ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ۞ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অর্থ : তোমরা কি কখনো (চোখ খুলে) সেই জিনিসগুলো দেখেছ, যাদের পূজা তোমরা ও তোমাদের আগের বাপ-দাদারা করে এসেছে? রাব্বুল আলামীন ছাড়া এরা সব অবশ্যই আমার দুশমন। -সূরা শু'আরা : ৭৫-৭৭

ইবরাহীম (আ)-এর জাতি যে মূর্তিগুলোর পূজা করতো, ইবরাহীম (আ) সে মূর্তিগুলোকে মিথ্যা ও বাতিল উপাস্য বলে ঘোষণা করেন এবং এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন। তিনি এ মূর্তিগুলোর অপকীর্তি ও দোষ-ত্রুটিগুলো প্রকাশ করেন। সুতরাং যদি এ মূর্তিগুলোর ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা থাকত, তবে তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষতি করতো। অনুরূপভাবে যদি তাদের বশীভূত করার কোনো ক্ষমতা থাকত, তবে ইবরাহীম (আ)-কে অবশ্যই অনুগত করতো। কিন্তু তারা এসব কিছুরই ক্ষমতা রাখে না। এসবগুলো হলো মিথ্যা ও তাদের কল্পিত বিষয়।

ইবরাহীম (আ)-এর জবাবে তারা বলল— قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

অর্থ : তুমি কি কোনো সত্য নিয়ে আমাদের কাছে এসেছ? না তুমি আমাদের সাথে খেলার ছলে ঠাট্টা করছ?

-সূরা আম্বিয়া : ৫৫

অর্থাৎ, তুমি আমাদের সম্মুখে আমাদের দেবতাদের যে অসারতা বর্ণনা করছ এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে ঠাট্টা করছ এবং ভ্রান্ত বলছ, এগুলো কি তুমি সত্যিই বলছ, না তুমি আমাদের সাথে রহস্য করছ?

ইবরাহীম (আ) উত্তরে বললেন,

بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِیْ فَطَرَهُنَّ ۫ وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِیْنَ ۞

অর্থ : না, বরং আসলে তোমাদের রব তিনিই, যিনি আসমান ও যমীনের রব এবং যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি। –সূরা আম্বিয়া : ৫৬

অর্থাৎ, আমি যা কিছু তোমাদেরকে বলছি সবই সঠিক। তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ (উপাস্য) সেই মহান আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোনো মা'বুদ (উপাস্য) নেই। তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং গোটা সৃষ্টিরও পালনকর্তা। তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কোন পূর্বনমুনা ব্যতীতই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনিই এক আল্লাহ ইবাদতের যোগ্য তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি এর সাক্ষী। একপর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতিকে এ বলে ধমক দিয়েছেন যে—

لَاَكِیْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِیْنَ ۞

অর্থ : তোমরা যখন উপস্থিত থাকবে না, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোকে দেখে নেব। –সূরা আম্বিয়া : ৫৭

অর্থাৎ, যখন তোমরা তোমাদের মেলায় বা ধর্মীয় উৎসবে চলে যাবে, সেই ফাঁকে আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

এক বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথা মনে মনে বলেছিলেন। কাউকে তিনি শুনিয়ে বলেন নি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক শুনেছিল।

শহরতলিতে ইবরাহীম (আ)-এর জাতির একটি ময়দান ছিল। সেখানে তারা প্রত্যেক বছর তাদের নির্ধারিত বাৎসরিক মেলা উপলক্ষে সমবেত হতো। নির্দিষ্ট তারিখে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা ইবরাহীম (আ)-কে মেলায় যাওয়ার জন্যে বললে তিনি কৌশল গ্রহণ করে বলেছেন যে, 'আমি অসুস্থ।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُوْمِ ۞ فَقَالَ اِنِّیْ سَقِیْمٌ ۞

অর্থ : তারপর (ইবরাহীম) তারকাগুলোর দিকে একবার তাকালেন।১ তারপর তিনি বললেন, আমার শরীর ভালো নয়।২ –সূরা সাফ্ফাত : ৮৮–৮৯

হযরত ইবরাহীম (আ) এমনভাবে কথা বলে তাকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে সবার অগোচরে তিনি তাদের উপাস্যকে চরম শিক্ষা দিয়ে দিতে পারেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করা এবং মূর্তিগুলোকে টুকরা-টুকরা করে দেয়া। আর মূর্তিগুলোর প্রাপ্যও হলো এরূপ ধ্বংস হওয়া এবং লাঞ্ছনা ও অপমানিত হওয়া।

জাতির লোকেরা মেলার নির্দিষ্ট দিনে ময়দানের দিকে চলে গেলে তিনি একা শুধু শহরে থেকে যান। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, ۞ فَرَاغَ اِلٰی اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ

অর্থ : তিনি চুপে চুপে তাদের মা'বুদদের মন্দিরে ঢুকে পড়লেন এবং বললেন, আপনারা খাচ্ছেন না কেন? –সূরা সাফ্ফাত : ৯১

---

১. *আরবী ভাষার প্রচলন অনুযায়ী এ কথার অর্থ- সে চিন্তা করল বা সে ভাবতে শুরু করল।*

২. *সে সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কোনো রকম অসুখ-বিসুখ ছিল না- এ কথা আমরা জানি না। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) এটা দ্বারা মিথ্যা বাহানা করেছিলেন- এ কথা বলা যায় না।*

অর্থাৎ, তিনি চুপে চুপে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মূর্তিগুলোর কাছে গেলেন। তিনি দেখলেন যে, মূর্তিগুলো অত্যন্ত সু-সজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। তাদের সামনে বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের খাদ্যদ্রব্য রাখা আছে। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) উপহাস করে বললেন—

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ۞

অর্থ : আপনাদের কী হয়েছে? আপনারা যে কথাও বলছেন না? এরপর তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ডান হাতে খুব করে আঘাত করলেন। –সূরা সাফ্ফাত : ৯২–৯৩

ডান হাত দ্বারা আঘাত করার কারণ, ডান হাত সাধারণত বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। তাই তিনি তাঁর নিজ হাতের কুঠার দ্বারা মূর্তিগুলোকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۞

অর্থ : তারপর তিনি (মূর্তিগুলোকে) টুকরো টুকরো করে দিলেন। শুধু বড়টাকে রেখে দিলেন, যাতে তারা এর নিকট ফিরে আসে। –সূরা আম্বিয়া : ৫৮

অর্থাৎ, মূর্তিগুলোর মধ্যে যেটা বড়, সেটা ব্যতীত আর সবগুলোকে ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন। এক বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) কুঠারখানা বাকি বড় মূর্তিটির হাতে রেখে দিলেন। এতে এ ইঙ্গিত ছিল যে, গোত্রের লোকেরা যাতে মনে করে, বড় মূর্তিটি এ ছোট মূর্তিগুলোর উপাসনা করার কারণে, তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বড় মূর্তিটি এ ছোট মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করেছে। লোকেরা মেলা থেকে ফিরে এসে এদের উপাস্যদের করুণ অবস্থা দেখে, বলল 'আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ (আচরণ) করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারী।'

–সূরা আম্বিয়া : ৫৯

যদি তারা অনুধাবন করত, তবে তাদের উপাস্যদের চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার এ ঘটনাতেই তাদের জন্য হেদায়েতের স্পষ্ট প্রমাণ ছিল। তাদের মূর্তিগুলো যদি সত্যিই উপাস্য হতো, তবে অন্তত নিজেদেরকে তারা রক্ষা করতো। কিন্তু জাতির লোকেরা মূর্খ, অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত থাকার কারণে বলল—

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ ۞

অর্থ : কে আমাদের মা'বুদদের এ অবস্থা করেছে? নিশ্চয়ই সে কোনো বড় যালিমই ছিল। কতক লোক বলল, আমরা ইবরাহীম নামের এক যুবককে এদের কথা বলাবলি করতে শুনেছি। –সূরা আম্বিয়া : ৫৯–৬০

অর্থাৎ, সে (ইবরাহীম) এ মূর্তিগুলোর দোষত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করেছে। সম্ভবত সেই এগুলো ভেঙেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক বলেছিল, আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে—

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۞

অর্থ : আল্লাহর কসম, তোমরা যখন উপস্থিত থাকবে না, তখন আমি অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোকে দেখে নেব। –সূরা আম্বিয়া : ৫৭

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ)-কে জনসম্মুখে হাজির করা হোক। যাতে সকল মানুষ সবার সামনে তাঁর প্রথম কথার সাক্ষ্য দেয় এবং ভালরূপে তার বক্তব্য শুনতে পারে এবং সে আমাদের উপাস্যদের প্রতি যে আচরণ করেছে, তার বিনিময় তাঁকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা যেন সবাই প্রত্যক্ষ করতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এরও মনের বাসনা ও উদ্দেশ্য সামনে তাদের মূর্তিগুলোর অক্ষমতা ও নিকৃষ্টতা বর্ণনা করবেন। যেমন হযরত মূসা (আ)-ও ফিরাআউনের সাথে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক করার দিন ধার্য করেছিলেন।

যখন ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা সমবেত হলো, তখন ইবরাহীম (আ)-কেও সেখানে উপস্থিত করা হলো। তখন তারা বলল, ﴿ قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ﴾

অর্থ : (ইবরাহীম আসার পর) তারা জিজ্ঞেস করল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের মা'বূদদের সাথে এ ব্যবহার করেছ? –সূরা আম্বিয়া : ৬২

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এরূপ কথা বলার অর্থ এই ছিল যে, বড় মূর্তিটিই, আমাকে এ ছোট মূর্তিগুলোকে ভাঙার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। এদিক থেকে মূলত- বড় মূর্তিটিই এগুলোর ভাঙ্গচুরকারী। অর্থাৎ, তার কারণেই এগুলো ভাঙা হয়েছে।

﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۚ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْـَٔلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ﴾

অর্থ : তিনি জবাবে বললেন, এ সব কিছু এদের মধ্যে যে বড় সে-ই করে থাকবে। এরা যদি কথা বলতে পারে, তাহলে তাদেরকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?[১] –সূরা আম্বিয়া : ৬৩

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এরূপ বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁর এ কথার দ্বারা তাদের চিন্তা-চেতনায় এ কথাটি বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, তারা যে মূর্তিগুলোর উপাসনা করছে, সেগুলো কোনো কথাও বলতে পারে না। এরপর তারা স্বীকার করে নিবে যে, এ মূর্তিগুলো সাধারণ পাথরের মতই এক প্রকার পাথর। এর মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। ইবরাহীম (আ)-এর কথায় তাদের মনে এসব চিন্তার উদয় হয়। যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে-

﴿ فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ ﴾

অর্থ : এ কথা শুনে তারা তাদের বিবেকের কাছে ফিরে গেল এবং (মনে মনে) বলল, আসলে স্বয়ং তোমরাই যালিম। কিন্তু এরপরই তাদের মত বদলে গেল। –সূরা আম্বিয়া : ৬৫

অর্থাৎ, তারা নিজেরা নিজেদেরকে তিরস্কার ও গালমন্দ করতে লাগল এবং বলল, তোমরাই যালিম। তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কাছে কোনো রক্ষক ও পাহারাদার রেখে গেলে না?

হযরত সুদ্দী (রহ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, অতঃপর তারা তাদের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার দিকে পুনরায় প্রবর্তিত হলো। প্রথম আয়াতে তারা তাদের নিজেদেরকে যে বলেছিল, 'তোমরাই যালিম' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা এদের ইবাদত করার কারণে যালিম। কিন্তু তারা তাদের কথার উপর অটল থাকতে পারে নি। বরং পুনরায় বিদ্রোহ ও ঝগড়া-ফাসাদের দিকে ফিরে গেছে। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নে তারা আশ্চর্যান্বিত হলো এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারপর তারা মস্তক অনবত করে বলল, "(হে ইবরাহীম!) তুমিই তো জান যে, এরা কথা বলে না।" –সূরা আম্বিয়া : ১৫

অর্থাৎ, হে ইবরাহীম! তোমার তো জানা আছে যে, এ মূর্তিগুলো কথা বলতে পারে না। এরপরেও তুমি এরূপ প্রশ্ন কেন করছ? তখন ইবরাহীম (আ) তাদেরকে সুন্দর উত্তর দিলেন। তিনি বললেন—

﴿ قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ ۝ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴾

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, তাহলে তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (এমন সব মা'বূদের) ইবাদত করছ, যার তোমাদের কোনো উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না? তোমাদের ধিক! আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তাদের প্রতিও ধিক। তোমাদের কি কোনো আকল নেই? –সূরা আম্বিয়া : ৬৬-৬৭

১. এ শব্দগুলো থেকে বোঝা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) এ কথাগুলো এজন্যেই বলেছিলেন, যাতে তারা এর উত্তরে নিজেরাই এ কথা স্বীকার করে নেয় যে, তাদের মা'বূদগুলোর কোনো ক্ষমতাই নেই এবং তাদের কাছ থেকে কোনো কাজেরই আশা করা যেতে পারে না। এ অবস্থায় যুক্তির খাতিরে যদি কেউ আসল ঘটনার খেলাফ কোনো কথা বলে তবে ঐ কথাকে মিথ্যা বলা যেতে পারে না। কারণ, সে মিথ্যা বলার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে না; বরং যাকে সম্বোধন করে বলা হয়, সে-ও ঐ কথাকে মিথ্যা বলে মনে করে না। যে বলে সে নিজের কথাকে সত্য হিসেবে সাব্যস্ত করতেই বলে এবং যে শুনে সে-ও ঐ অর্থেই তা বুঝে।

কোরআন মাজিদে উল্লেখ আছে, ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾

অর্থ : (ফিরে এসে) ঐ লোকেরা দৌড়ে ইবরাহীমের কাছে এল। –সূরা সাফ্ফাত : ৯৪

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, "দৌড়ে আসার" অর্থ দ্রুত চলে আসা। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, "তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর তোমরা কি তাদেরকে পূজা কর? (অর্থাৎ, তোমরা তোমরা মস্তক অবনত করে থাক? তোমাদের বিবেক বলতে কি কিছুই নেই?) প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে এবং যা নির্মাণ কর তাও।"

শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তোমরা যার উপাসনা করছ এগুলো হলো সৃষ্টি। আর তোমরাও সৃষ্টি। সুতরাং এক সৃষ্টি অন্য আর এক সৃষ্টির উপাসনা (পূজা) কিরূপে করতে পারে? তোমরা তাদের উপাসনা (পূজা) কর অথবা ওরা তোমাদের উপাসনা করুক, উভয়ই সমান কথা। সুতরাং এক সৃষ্টি অন্য সৃষ্টির উপাসনা করা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক ভ্রান্ত। ইবাদত হলো একমাত্র লা-শারীক এক আল্লাহর জন্য। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۞ ﴾

অর্থ : (তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল) এর জন্যে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর এবং একে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দাও। তারা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছেড়ে দিলাম।

–সূরা সাফ্ফাত : ৯৭–৯৮

যখন তারা ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তর্ক-বিতর্কে পরাজিত হলো এবং তাদের মূর্তিদের পক্ষে প্রমাণ দিতে অপারগ হয়ে গেল এবং তাদের কাছে এমন কিছুই দলীল প্রমাণ থাকল না, যা তারা তাদের কুফরী ও ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে পেশ করতে পারে, তখন তারা অত্যাচারের পথ বেছে নিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীকে সমুন্নত করেন এবং ইবরাহীম (আ)-কে বিজয় দান করেন। পরবর্তী ঘটনা নিম্নরূপ—

﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۞ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۞ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ ﴾

অর্থ : তারা বলল, তাকে পুড়িয়ে দাও। তোমাদের মা'বুদদেরকে সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহীমের জন্য শান্তিময় হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের সাথে অন্যায় ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে চরমভাবে ব্যর্থ করে দিলাম।

–সূরা আম্বিয়া : ৬৮–৭০

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পুড়িয়ে শেষ করার জন্য তাদের কার্যক্রম আরম্ভ হলো। কাফিরেরা সবাই মিলে জ্বালানি কাঠ যোগার করতে লাগল। এ জ্বালানি কাঠ যোগার করতে করতে দীর্ঘদিন লেগে গেল। কোনো মহিলা রোগে আক্রান্ত হলে এ বলে মানত করতো যে, যদি সে আরোগ্য লাভ করে তবে ইবরাহীম (আ)-কে জ্বালানোর জন্য কাষ্ট যোগার করে দেবে। কাষ্ঠ যোগার হয়ে যাওয়ার পরে তারা বিরাট এক গর্ত খনন করে তাতে কাষ্ঠগুলো ফেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অগ্নিশিখা এত উর্ধ্বে উঠে গেল যে, এরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা আর কোনোদিন কেউ দেখে নি। অতঃপর কাফিরেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'মিনজানীক' নামক একটি নিক্ষেপ যন্ত্রের দিকে নিয়ে গেল। এ যন্ত্রটি তৈরি করেছিল হাযান নামক এক ব্যক্তি। সে-ই সর্বপ্রথম এ 'মিনজানীক' নামক যন্ত্রটি তৈরি করে। আল্লাহ তা'আলা একে যমীনে ধসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত যে ধসে যেতেই থাকবে। এরপর কাফিরেরা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যন্ত্রটির উপর বসিয়ে দিল। এ সময় হযরত

ইবরাহীম (আ) এ দোয়া পাঠ করতে থাকেন—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

অর্থ : আপনি ব্যতীত আর কোনো মা'বূদ নেই। আপনি অতি পবিত্র, দু' জাহানের প্রতিপালক। সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য, বাদশাহী আপনার জন্যই। আপনার কোনো শরীক নেই।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাত, পা রশি দিয়ে বেঁধে 'মিনজানীক' যন্ত্রটির সাহায্যে তাঁকে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। এ সময় ইবরাহীম (আ) বললেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমার উত্তম ব্যবস্থাপক।

ইমাম বুখারী (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেওয়া হলো, তখন তিনি এ কথাই বলেছিলেন।

যেরূপভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-কে কাফিরেরা যখন ভয় দেখিয়েছিল, তখন তিনি ﷺ এ বাক্যটিই বলেছিলেন। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাবাহিনী একত্র হয়েছে, তাই তাদেরকে ভয় কর,– এ কথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলল, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না ভালো কাজ সমাধাকারী। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর নিয়ামত ও দয়াসহ ফিরে এল এবং তাদের কোনো রকম ক্ষতিই হলো না। আর আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল। আল্লাহ বড়ই মেহেরবান।[১] –সূরা আলে ইমরান : ১৭৩-১৭৪

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেছিলেন—

"হে আল্লাহ! আপনি আকাশমণ্ডলীতে একা, আর এ পৃথিবীতে আমি একাই আপনার ইবাদতকারী।"

কিছু সংখ্যক বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) শূন্যে এসে হাজির। তিনি শূন্যে বসে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, আপনার কি কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে? জবাবে তিনি বললেন, আপনার পক্ষ থেকে কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, ঐ সময় বৃষ্টির ফেরেশতা মীকাঈল (আ) অত্যন্ত পেরেশান হয়ে বললেন, আমার প্রতি কখন বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ আসবে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আদেশ (ফেরেশতার মাধ্যম

১. *উহুদ থেকে ফেরার সময় আবূ সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছিল, আগামী বছর বদরে তোমাদের ও আমাদের মুকাবিলা হবে; কিন্তু সময় যখন কাছে এল তখন তার আর সাহস হলো না। অতএব, মুখ রক্ষার জন্য সে একটু চালাকি করল। সে গোপনে এক ব্যক্তিকে মদীনায় পাঠাল। ঐ ব্যক্তি মদীনায় এসে মুসলমানদের মধ্যে এই সংবাদ রটানো শুরু করল যে, এ বছর কুরাইশরা আক্রমণের জন্য বিরাট প্রস্তুতি নিয়েছে এবং এমন শক্তিশালী বাহিনী জোগাড় করেছে, সারা আরবে কারো পক্ষে তাদের মুকাবিলা করার সাধ্য নেই। এ অপপ্রচারে মুসলমানরা কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহর রাসূল (স) পূর্ণ মজলিসে ঘোষণা করলেন, "যদি আর কেউ এগিয়ে না যায় তাহলে আমি একাই যাব।" এ কথা শুনে ১৫০০ জানবাজ সাহাবী তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নবী করীম (স) বদরের ময়দানে তাঁদেরকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। আবূ সুফিয়ান মোকাবিলার জন্য এল না। মুসলমানরা আট দিন পর্যন্ত সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর লাভ নিয়ে ফিরে আসেন।*

ছড়াই) সরাসরি অগ্নির প্রতি অতি দ্রুত পৌঁছে গিয়েছিল। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন–

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ـ

অর্থ : আমি (অগ্নিকে) বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।

–সূরা আম্বিয়া : ৬৯

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) বলেছেন, উক্ত আয়াতের অর্থ এই যে, হে অগ্নি! তুমি এরূপ ঠাণ্ডা হয়ে যাও যে, যাতে ইবরাহীম (আ)-এর কোনো কষ্ট না হয়। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও আবুল আলীয়া (রহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আগুনকে আদেশ না দিতেন যে, হে অগ্নি! ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও, তবে অগ্নি এরূপ ঠাণ্ডা হয়ে যেত, যাতে ইবরাহীম (আ)-এর কষ্ট হতো। হযরত কা'ব আহবার (রা) বলেছেন, যেদিন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেদিন কোনো লোকই আগুন দ্বারা কোনো কাজ করতে পারে নি। (অর্থাৎ, আগুনের উত্তপ্ততা, উষ্ণতা ও কার্যকারিতা সবকিছুই বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। যে কারণে সেদিন লোকেরা উনান পর্যন্ত গরম করতে পারে নি।) তিনি বলেছেন, সেদিন আগুন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বন্ধনের রশি ছাড়া আর কিছুই জ্বালায় নি। হযরত যাহাক (রহ) বলেন, সেদিন হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাথে ছিলেন এবং তাঁর পেশানী মোবারক হতে ঘাম মুছে দিচ্ছিলেন। এই ঘাম নির্গত হওয়া ব্যতীত আর কিছুই তাঁর শরীরে প্রকাশ পায় নি। হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ছায়া প্রদানকারী ফেরেশতাও ছিলেন। এক মাইল পর্যন্ত ছিল ছায়া ও শীতলতা। এ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটি পরিণত হয়েছিল ফুলের বাগানে ও শান্তি নিকেতনে। লোকজন ইবরাহীম (আ)-এর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু এর মধ্যে প্রবেশ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-ও তাদের কাছে আসতে পারছিলেন না। সুবহানাল্লাহ! হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার সুন্দর কথা শুধু সেটাই ছিল, যা তিনি নিজ পুত্রকে আগুনের মধ্যে এরূপ অবস্থায় দেখে বলেছিলেন, তা হলো—

نِعْمَ الرَّبُّ رَبُّكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ ـ

অর্থ : হে ইবরাহীম! তোমার প্রতিপালক অতি উত্তম প্রতিপালক।

ইবনে আসাকির (রহ) হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মা তাঁর কলিজার টুকরা পুত্রকে (এ পুষ্প উদ্যানে) এরূপ অবস্থায় দেখে ডাক দিয়ে বলেছিলেন, হে আমার পুত্র! আমি তোমার কাছে আসতে চাই। আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ কর, তিনি যেন তোমার চারপাশের প্রজ্বলিত অগ্নির উষ্ণতা ও উত্তপ্ততা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, জী, আম্মা, আমি দো'আ করছি। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মা তাঁর কাছে চলে গেলেন। আগুন তাঁকে আদৌ স্পর্শ করে নি। পুত্রের কাছে পৌঁছে মা পুত্রকে গলার সাথে লাগিয়ে চুমু দিলেন। এরপর তথা হতে নিরাপদে চলে আসেন।

হযরত মিনহাল ইবনে আমার (রা) বর্ণনা করেন, আমি এ তথ্য পেয়েছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সেখানে ফুলের বাগানে চল্লিশ দিন অথবা পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলেছেন, সেখানে আমি যে শান্তিতে ছিলাম, এরূপ শান্তির জীবন আমি আর কোথাও ভোগ করি নি। আমার মনের একান্ত কামনা ও বাসনা এই যে, আমার সারা জীবন যেন এরূপ সুখময় ও শান্তিময় হয়। ইবরাহীম (আ)-এর দুশমন কাফির মুশরিকরা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হলো। উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু হেয় ও নিন্দিত হলো। বিজয়ী হতে চেয়েছিল, কিন্তু পরাজিত হলো।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۞

অর্থ : তারা তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে হেয় করে ছেড়ে দিলাম

–সূরা সাফফাত : ৯৮

এরূপে পৃথিবীতে তারা অত্যন্ত অপদস্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরকালে তাদের জন্যে আগুন না শীতলও হবে, না আরামদায়কও হবে। আর না তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য হবে। বরং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا ـ

অর্থ : (তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম) আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসেবে সেটা কত নিকৃষ্ট। -সূরা ফুরকান : ৬৬

হযরত উম্মে শুরায়ক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ গিরগিটি (টিকটিকি জাতীয় সরীসৃপ বিশেষ) মারতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি ইবরাহীম (আ)-এর উপর (জ্বলন্ত অগ্নিতে) ফুঁক দিয়েছিল। -বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ

হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গিরগিটিকে হত্যা কর। কারণ, সে ইবরাহীম (আ)-এর উপর জ্বলন্ত আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর থেকে হযরত আয়েশা (রা)-ও গিরগিটি মেরে ফেলতেন। -মুসনাদে আহমদ

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে এক মহিলা আগমন করল। সে (মহিলা) সেখানে একটি বর্শা দেখে জিজ্ঞেস করল, এ বর্শাটি আপনি কিসের জন্য রেখেছেন? হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, আমি এটি দ্বারা গিরগিটি হত্যা করি। তারপর হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে ফেলে দেয়া হলো, তখন সকল প্রাণীরাই আগুন নিভাতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু গিরগিটি ছাড়া, সে জ্বলন্ত আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। (যাতে আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।)

ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, ফাকীহ ইবনে মগীরার বাঁদি সুমামা বলেন, আমি একদিন হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গমন করে সেখানে একটি বর্শা দেখতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এ বর্শা দ্বারা আপনি কি করেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এর দ্বারা গিরগিটি হত্যা করি। কারণ, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ইবরাহীম (আ)-কে যখন জ্বলন্ত অগ্নিতে ফেলা হয়, তখন পৃথিবীর সকল প্রাণী তা নিভাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু গিরগিটি ব্যতীত। সে এ জ্বলন্ত আগুনের উপর ফুঁক দিয়েছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ (গিরগিটি) প্রাণী হত্যা করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। -মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে খোদা দাবিদার এক যালিম বাদশাহর বাকবিতণ্ডা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرٰهِمَ فِي رَبِّهٖٓ أَنْ ءَاتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ أَنَا أُحْيٖ وَأُمِيْتُ ۖ قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

অর্থ : তুমি কি ঐ লোকের[১] অবস্থা চিন্তা কর নি, যে ইবরাহীমের সাথে এ কথার উপর ঝগড়া করেছিল যে, ইবরাহীমের রব কে? আর এ জন্যে যে, তাকে তার রব রাজত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। যখন ইবরাহীম বললেন, তিনিই আমার রব, যার হাতে হায়াত ও মউতের ক্ষমতা আছে। তখন সে জবাব দিলো, হায়াত-মউত তো আমার হাতে। ইবরাহীম তখন বললেন, আচ্ছা, তাহলে আল্লাহ তো পূর্বদিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি একটু তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও তো। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ দেখান না। -সূরা বাকারা : ২৫৮

১. *'ঐ লোক বলতে এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মভূমি ইরাকের বাদশাহ নমরুদকে বোঝানো হয়েছে।*

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সেই যালিম ও অহংকারী বাদশাহর বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন, যে নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল। আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আ) এ যালিম বাদশাহর দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন এবং তার মূর্খতা ও অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেন।

মুফাসসির ও বিশিষ্ট আলিমগণ বলেছেন, এ বাদশাহ ছিল ব্যাবিলনের বাদশাহ, নাম ছিল তার নমরুদ। তার বংশ পরম্পরা ছিল নিম্নরূপ—

নমরুদ ইবনে কিনআন ইবনে কাওশ ইবনে সাম ইবনে নূহ। মুজাহিদ (রহ) প্রমুখ বলেছেন, এ (নমরুদ) ছিল সেই বাদশাহদের একজন, যাদের আধিপত্য ছিল গোটা পৃথিবী জোড়া। ঐতিহাসিকগণের মতে এরূপ বাদশাহ ছিল চারজন। দু' জন মু'মিন ও দু' জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন– ১) হযরত যুলকারনাইন ও ২) হযরত সোলায়মান (আ)। আর কাফির দু'জন হলো– ১) নমরুদ ও ২) বুখত নাসার। তাদের মতে বাদশাহ নমরুদ চারশ বছর পর্যন্ত তার রাজত্ব চালিয়েছিল। এ বাদশাহ নমরুদ ছিল ভীষণ অত্যাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী। পার্থিব জীবনকেই সে প্রাধান্য দিত। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তাকে লা-শারীক এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য দাওয়াত দিলেন, তখন তার অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা ও বাদশাহী তাকে আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। তারপর আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তার এ ব্যাপারে বিতর্ক শুরু হয়। এ পর্যায়ে সে (নমরুদ) অবাধ্যতা ও দাম্ভিকতার চরম পর্যায়ে পৌছে নিজকে খোদা বলে দাবি করে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) খোদার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বললেন, আমার পালনকর্তা তো তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তখন সে বলল, আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। হযরত কাতাদাহ, সুদ্দী ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বললেন, নমরুদ তার কথার বাস্তবতা প্রমাণস্বরূপ জেলখানা থেকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দু'ব্যক্তিকে ডেকে এনে, একজনকে হত্যা করার আদেশ দেয় এবং অন্যজনকে ক্ষমা করে দেয়। এর দ্বারা সে বুঝাতে চেয়েছে যে, সে একজনকে (ক্ষমা করে দিয়ে) জীবন দান করেছে। আর একজনকে (হত্যা করার আদেশ দিয়ে) মৃত্যু ঘটিয়েছে। নমরুদের এ পন্থটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার বিপরীতে সঠিক উত্তর ছিল না। বরং এটি ছিল বিতর্ক বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন একটি কাজ। এ উত্তর দ্বারা নমরুদের অজ্ঞতা ও মূর্খতাই প্রকাশ পেয়েছে। মূল কথার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আ) এই পৃথিবীতে কারো মৃত্যু হওয়া, কারও জন্ম হওয়া দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ পেশ করেছিলেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, এই পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু আপনা-আপনিই হয় না। সবকিছুরই একজন পরিচালক রয়েছেন। যিনি এগুলোর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারী। এ সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টিকে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে থাকেন। যেমন– গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি। এ সমস্ত জিনিস তিনি কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। তিনি সৃষ্টি করেন বিভিন্ন ধরনের পশু, পক্ষী ও জীব-জন্তু। আবার এগুলোর তিনি মৃত্যুও ঘটিয়ে থাকেন। এ জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর জন্য শুধু তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট। বাহ্যিক কোনো আসবাব যেমন তলোয়ার ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, "আমার রব যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" এর জবাবে মূর্খ বাদশাহ নমরুদ বলেছিল, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' সে ধারণা করেছিল যে, এ পৃথিবী জোড়া আমার রাজত্ব। এ ভ্রান্ত ধারণাই তাকে অবাধ্যতা, গর্ব ও অহংকারের চরম পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে।

আর "আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।" এ কথার ব্যাখ্যা যদি এরূপই করা হয়, যেরূপ হযরত কাতাদাহ, সুদ্দী ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, নমরুদ এ কথাটি নিজ মুখ দ্বারা বলে নি। বরং সে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দু' ব্যক্তিকে ডেকে এনে, একজনকে মুক্ত করে দিয়েছে, আর একজনকে হত্যা করেছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, নমরুদ এমন কোনো কথা বলে নি, যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথার উত্তর হতে পারে। কারণ, সে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম কথাকে না খণ্ডন করেছে, না তাঁর কথার বিপরীত কোনো দলীল পেশ করেছে। বরং সে মূর্খের মতো একটি বাহ্যিক জবাব দিয়েছে। এ অজ্ঞতাপূর্ণ জবাব দ্বারা নমরুদ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পেশকৃত দলীলকে খণ্ডন করে দিয়েছে বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু তার

এ ধারণা ছিল ভ্রান্ত ও কল্পিত। এরপরেও হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদের বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও শক্ত করে তুলে ধরার জন্যে দ্বিতীয় প্রমাণ পেশ করেন। যেন নমরুদের দাবি যে মিথ্যা ও কল্পিত, তা সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

অর্থ : ইবরাহীম তখন বললেন, আচ্ছা, তাহলে আল্লাহ তো পূর্বদিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি একটু তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও তো। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন চুপ হয়ে গেল। আল্লাহ যালিমদেরকে সঠিক পথ দেখান না। -সূরা বাকারা : ২৫৮

অর্থাৎ, সূর্য প্রতিদিন পূর্বদিকে উদয় হওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অদিষ্ট। সূর্য প্রতিদিন সে কাজেই নিয়োজিত থাকে, যে কাজের জন্য তার স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এ স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক হলেন একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তিনিই গোটা সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা।

সুতরাং হে নমরুদ! তুমি যদি তোমার ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী জীবন দান করার ও মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতাই রাখ, তবে এ সূর্যকেও পশ্চিম দিক থেকে উদয় করে দেখাও। কেননা, যে জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর মতো মহাশক্তির অধিকারী, সে অবশ্যই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তার জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। সে সবার উপরে ক্ষমতাবান। সব সৃষ্টির উপর তার আদেশ চলে। যদি তুমি তোমার অলীক ধারণায় সত্যই হয়ে থাক, তবে এ সব করে আমাদেরকে দেখাও। আর যদি তুমি এসব কিছু করতে অক্ষম হও তবে তোমার দাবি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর তুমি ভালভাবে জেনে রেখো যে, তুমি কিছু করতেই সক্ষম হবে না। বরং তুমি একটি ক্ষুদ্র মশা সৃষ্টি করতেও সক্ষম নয়। সৃষ্টি করা তো দূরের কথা বরং তুমি একটি মশা থেকে প্রতিশোধ নেওয়ারও শক্তি রাখ না। আল্লাহ তা'আলা বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ) এরূপ দাতভাঙা উত্তর দিয়ে মূর্খ ও ভ্রান্ত বাদশাহর খোদায়ী দাবি যে মিথ্যা ও কল্পিত তা সবার কাছে সুস্পষ্ট করে দিলেন। নমরুদের কাছে এরূপ কোনই প্রমাণ যুক্তি বা কথা রইল না, যা দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর কথার উত্তর দিতে পারে। বরং নমরুদ নিশ্চুপ ও নিরুত্তর হয়ে গেল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ إِبْرٰهِمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

অর্থ : ইবরাহীম তখন বললেন, আচ্ছা, তাহলে আল্লাহ তো পূর্বদিক থেকে সূর্য ওঠান, তুমি একটু তাকে পশ্চিম দিক থেকে ওঠাও তো। এ কথা শুনে সত্যের দুশমন চুপ হয়ে গেল। -সূরা বাকারা : ২৫৮

বিতর্কের তারিখ

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে নমরুদের কোন সময় বিতর্ক হয়েছিল, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে নমরুদের সাথে সেই দিন তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল, যেই দিন ইবরাহীম (আ) নিরাপদে জ্বলন্ত অগ্নি থেকে বের হয়ে আসেন। আর এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের দু' জনার মধ্যেই।

আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, বাদশাহ নমরুদের কাছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী মওজুদ ছিল। মানুষ দলে দলে তার কাছে খাদ্য আনার জন্য যেত। হযরত ইবরাহীম

(আ)-ও খাদ্য আনার নাম দিয়ে তার কাছে যান। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে নমরুদের শুধু এ দিনেই সাক্ষাৎ হয়েছিল। অতঃপর সেখানে বসেই উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হয়। নমরুদ সবাইকে খাদ্য দিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ)-কে কিছুই দিল না। হযরত ইবরাহীম (আ) নমরুদের নিকট হতে একেবারে শূন্য হাতে ফিরে আসেন। বাড়ীর কাছে এসে একটি মাটির ডিপো থেকে দুটি থলিতে মাটি ভর্তি করেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন যে, বাড়ীতে পৌঁছে কাজে লেগে যাবেন। ইবরাহীম (আ) বাড়ী পৌঁছে সওয়ারী হতে নেমেই ঘরে প্রবেশ করে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে তিনি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত সারাহ (রা) থলি দুটোর কাছে গিয়ে দেখতে পান, থলি দুটো উত্তম খাদ্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ। হযরত সারাহ এগুলো দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) নিদ্রা থেকে উঠে দেখেন যে, খানা প্রস্তুত। তিনি (বিস্মিত হয়ে) স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খানা তোমার কাছে কোথা হতে এসেছে? হযরত সারাহ (আ) বললেন, আপনি যে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছেন, তা থেকে তৈরি করেছি। ইবরাহীম (আ) বুঝতে পারলেন যে এই রিযিক (খাদ্য) আল্লাহ তা'আলা তাদের দান করেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এ অবাধ্য ও অত্যাচারি বাদশাহর কাছে ঈমানের দাওয়াত নিয়ে ফেরেশতাকেও প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু নমরুদ সে দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এভাবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার দাওয়াত দিলে প্রত্যেক বারেই সে অহংকার বশতঃ অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে, তুমি তোমার বাহিনী একত্রিত কর, আর আমি আমার বাহিনী একত্রিত করি। নমরুদ সূর্যোদয়ের সময় তার সৈন্য বাহিনী একত্রিত করল। আর আল্লাহ তা'আলা (তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী) এক ঝাঁক মশা প্রেরণ করলো। মশায় এমনভাবে ছেয়ে গেল যে, সূর্যের আলো পর্যন্ত দেখা গেল না। আল্লাহ তা'আলা এই মশাগুলোকে নমরুদের সৈন্য বাহিনীর উপর আক্রমণ করার জন্যে আদেশ দেন। ফলে মশাগুলো নমরুদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং রক্ত-মাংস খেয়ে তাদের সাদা হাড্ডি বের করে ফেলে। একটি মশা যালিম ও অহংকারী বাদশাহ নমরুদের নাকের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

আল্লাহ তা'আলা সেই মশাটির দ্বারা তাকে শাস্তি ভোগ করিয়েছিলেন। সে মশা চারশ বছর পর্যন্ত নমরুদের নাকের মধ্যে থেকে তাকে দংশন করতে থাকে। এ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সে (নমরুদ) যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নিজের মাথা আঘাত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এভাবে নমরুদ সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরত এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّیْ مُهَاجِرٌ اِلٰی رَبِّیْ ۘ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَیَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِیْ ذُرِّیَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَاٰتَیْنٰهُ اَجْرَهٗ فِی الدُّنْیَا ۚ وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

অর্থ : সে সময় লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তখন ইবরাহীম বললেন, "আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি"। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও মহাকুশলী। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তারই বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছি। আর আমি দুনিয়াতেই তাকে তার বদলা দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি আখিরাতে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। –সূরা 'আনকাবূত : ২৬-২৭

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَنَجَّیْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ ۘ وَیَعْقُوْبَ

نَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۝ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۝ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۝

অর্থ : আমি তাঁকে ও লূতকে নাজাত দিয়ে ঐ এলাকায় নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি দুনিয়াবাসীদের জন্যে বরকত রেখেছি। তারপর আমি ইসহাককে (তার পুত্র হিসেবে) দিয়েছি। এর উপর অতিরিক্ত দিয়েছি ইয়াকূবকে।[১] আর আমি তাদের প্রত্যেককে নেককার বানিয়েছি। তাদেরকে আমি ইমাম বানিয়েছি, যারা আমার হুকুমে মানুষকে হেদায়াত করতেন। আর আমি তাদের প্রতি নেক কাজ করা, নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার জন্য ওহী পাঠিয়েছি। তারা আমারই ইবাদতকারী ছিল। –সূরা আম্বিয়া : ৭১-৭৩

হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ জাতি ও জন্মভূমিকে ত্যাগ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহ (আ)-এর সাথে যে বালকটি ছিল, সে ছিল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূত ইবনে হারান ইবনে আযর। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে নেক সন্তান দান করেন এবং তাঁর সন্তানগণের জন্য কিতাব ও নবুওয়াত নির্ধারণ করে রাখেন। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে যিনিই নবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন এবং তাঁর পরে আসমানী কিতাব যার প্রতিই নাযিল হয়েছে, তিনি অবশ্যই তাঁর বংশের থেকে ছিলেন। এটা ছিল তাঁর উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত ও পুরস্কার। কারণ, ইবরাহীম (আ.) নিজ বন্ধু (আল্লাহ তা'আলা)-এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজ জন্মভূমি, পরিবার পরিজন ও আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে এমন এক শহরের দিকে হিজরত করলেন, যে শহরে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার ও দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্যে কোনো প্রকার অসুবিধা ছিল না। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত করার ও দ্বীন প্রচার করার একটি সুন্দর অনুকূল পরিবেশ সেখানে ছিল। হিজরত করার জন্য যে দেশটি তিনি মনে মনে বেছে নিয়েছিলেন, সে দেশ ছিল সিরিয়া।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "(আমি ইবরাহীম ও লূতকে) উদ্ধার করে সেই দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্য।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব, কাতাদাহ ও আবুল আলীয়া প্রমুখ (রহ) এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত আওফী (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত আয়াতে যে "দেশ" দ্বারা মক্কা ভূমিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর এ বর্ণনার সমর্থনে নিম্নের আয়াত উপস্থাপন করেন—

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষের জন্যে প্রথম যে ইবাদত ঘর তৈরি হয় তা ঐ (ঘরই), যা মক্কায় আছে। তাকে বরকত দান করা হয়েছিল এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়েতের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল। –সূরা আলে ইমরান : ৯৬

কা'ব আহবার (রহ)-এর বলেছেন, এর দ্বারা 'হারান' দেশকে বুঝানো হয়েছে। আমরা আহলে কিতাবদের বরাত দিয়ে এর পূর্বে বলে এসেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ), তাঁর ভাই নাহুর, তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহ (রা) এবং তাঁর ভাবী অর্থাৎ, নাহুর স্ত্রী মালকিয়াদের সবসহ বাবেল নগরী ত্যাগ করে হারান নামক এলাকায় পৌঁছেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাঁর পিতা তারেখের মৃত্যু হয়।

হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ) উভয়ই সিরিয়ার দিকে হিজরত করেন। প্রতিমধ্যে হারানের বাদশাহর কন্যা সারাহ (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। হযরত সারাহ (রা) তাঁর নিজ জাতির ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহকে এ শর্তে বিবাহ করেন যে, তাঁর আত্ম মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারবে না। ইবনে জারীর এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটির মধ্যে কিছুটা

১. অর্থাৎ, ছেলের পর নাতিকেও নুবওয়াতের মর্যাদা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল।

সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, এটি প্রসিদ্ধ মত যে, হযরত সারাহ ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর চাচাতো বোন। অর্থাৎ হারানের কন্যা। আর হীরান শহরটি হারানের দিকেই সম্বন্ধযুক্ত।

কারো কারো মতে হযরত সারাহ (রা) ইবরাহীম (আ)-এর ভাই হারানের কন্যা ও লূত (আ)-এর বোন ছিল। সম্ভবত ইবরাহীম (আ) তাঁর ভাতিজীকে বিবাহ করেছিলেন। যদিও এ বর্ণনাটি সুহায়ল ও কুতাইবি নাফফান হতে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ কথাটি অবাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত নয়। এ সম্পর্কে না জেনেই বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে এ মত পোষণকারী এ কথা বলেছেন যে, তখন ভাতিজী বিয়ে করা বৈধ ছিল। তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে কোনো সুস্পষ্ট দলীল পেশ করতে পারে নি। তাদের এ কথাটি যদি মেনেও নেয়া হয় যে, কোনো এক সময় এরূপ (ভাতিজীকে বিবাহ করা) বৈধ ছিল। যেমন– ইয়াহুদী আলেমগণ হতে বর্ণিত আছে। এর পরেও নবী-রাসূলগণ থেকে এরূপ কাজ কখনই সংঘটিত হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন সিরিয়ায় গমন করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে (এই সু-সংবাদ) জানিয়ে দেন যে, আপনার পরে এ দেশটির কর্তৃত্ব আপনার বংশধরদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করব। হযরত ইবরাহীম (আ) এতে সন্তুষ্ট হয়ে এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি সেখানে কুরবানী করার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্ব প্রান্তে একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় অত্যন্ত অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষ থাকায় ইবরাহীম (আ) মিশরে চলে যান। বাদশাহর সাথে হযরত সারাহ (আ)-এর যে ঘটনা ঘটেছিল, আলেমগণ এখানে তা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সারাহ (রা)-কে বলেছিলেন, যদি বাদশাহ তোমার আমার ব্যাপারে কথা জিজ্ঞেস করে, তবে বলবে যে, আমি ইবরাহীম (আ)-এর বোন। বাদশাহর খাদেমগণ বলেন, তারপর বাদশাহ সারাহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর বাদশাহ, ইবরাহীম (আ)-সহ তাঁদের সবাইকে তার এলাকা থেকে বের করে দেয়। তাঁরা দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশ এলাকায় আগমন করেন। দ্বিতীয়বারে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসার সময় হযরত ইবরাহীম (আ) বহু জীব-জন্তু ও দাস-দাসী সাথে করে নিয়ে আসেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) কখনো মিথ্যা কথা বলেন নি। কিন্তু বিশেষ তিনটি ক্ষেত্রে তিনবার মিথ্যা কথা বলেছিলেন। দুটি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য। আর একটি নিজের জন্যে। আল্লাহর জন্য যে দুটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন, তার একটি হচ্ছে এই যে, যখন তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যাবার জন্যে বলল, তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি পীড়িত"। ইবরাহীম (আ)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, গোত্রের লোকেরা অনুষ্ঠান চলে গেলে সে মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই যে, যখন গোত্রের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের উপাস্যগুলোকে এরূপ কে করেছে? উত্তরে ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন, "এ মূর্তিটিই এরূপ করেছে"। আর নিজের জন্য যে মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন, সেটির ঘটনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সারাহ (রা) এক যালিম বাদশাহর এলাকা হয়ে যাচ্ছিলেন। বাদশাহর কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, এখানে একটি লোক এসেছে। তাঁর সাথে আছে অতি সুন্দরী এক নারী। বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে এ মহিলার পরিচয় জানতে চাইলেন। ইবরাহীম (আ) আগত লোকটির কাছে বললেন যে, এ আমার বোন। তারপর ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহ (রা)-এর কাছে এসে বললেন, হে সারাহ! এ পৃথিবীতে তুমি আর আমি ব্যতীত আর কোনো মু'মিন নেই। এ বাদশাহ আমার কাছে তোমার সম্পর্ক জানতে চেয়েছে। আমি বলে দিয়েছি যে, সে আমার বোন। সুতরাং তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে না। তারপর যালিম বাদশাহর আদেশে হযরত সারাহকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। বাদশাহ অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁকে স্পর্শ করতে চাইলে সাথে সাথে বাদশাহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে যায়। বাদশাহ সারাহ (রা)-কে বলল, আপনি আমার জন্য আল্লাহ কাছে একটু দোয়া করুন। আমি আপনার কোনই অনিষ্ট করব না। হযরত সারাহ (রা) দো'আ করলেন। ফলে সে শাস্তি থেকে রক্ষা পেল। কিন্তু ওয়াদা ভঙ্গ করে সে বাদশাহ আবার অসৎ উদ্দেশ্যে সারাহ (রা)-এর প্রতি এগিয়ে গেল। এবারেও

আল্লাহ তা'আলার শাস্তি পূর্বের চেয়েও কঠিনভাবে তাকে পাকড়াও করল। বাদশাহ পুনরায় সারাহ (রা)-কে বলল, আমার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন। আমি সত্যিই এবার আপনার অন্যায় আচরণ করব না। সারাহ (রা) দো'আ করলেন। দো'আর বরকতে বাদশাহ এবারও রক্ষা পেল। তারপর সে বাদশাহ তার বিশেষ খাদেমকে ডেকে বলল, তুমি আমার কাছে কোনো মানুষ তো নিয়ে আসনি, নিয়ে এসেছ জ্বিন। অতঃপর বাদশাহ, হযরত সারাহকে একজন সেবিকাসহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। এ সেবিকা ছিলেন হযরত মা হাজেরা (আ)।

হযরত সারাহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যখন প্রত্যাবর্তন করে আসেন, তখন তিনি নামাযে রত ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এ নামাযরত অবস্থাতেই হাতের ইশারায়, তাঁর অবস্থা জানতে চাইলেন। সারাহ (রা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারি ও কাফির বাদশাহর ষড়যন্ত্র ও অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ ও নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এরপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, হে লোকেরা! এ হাজেরাই তোমাদের মাতা। ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন, উল্লিখিত বর্ণনাটি মাওকুফ ছিল। অর্থাৎ এটি সাহাবীর বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত এর যোগসূত্র ছিল না। কিন্তু বাযযার (রহ) এক বর্ণনায় এটি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত এর যোগসূত্র ছিল। তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হযরত ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। আর এ তিনটি মিথ্যা কথাও ছিল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য।

সে তিনটি কথার প্রথম কথাটি হলো– 'আমি পীড়িত', দ্বিতীয় কথা হচ্ছে– এই বড় মূর্তিটিই এ কর্মটি করেছে'। আর তৃতীয় কথাটি হচ্ছে এই যে– ইবরাহীম (আ) কোনো এক অত্যাচারী বাদশাহর এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় পথে এক জায়গায় অবস্থান করেছিলেন। তাঁর এ অবস্থানের খবর বাদশাহর কাছে পৌঁছে গেল। বাদশাহকে বলা হলো যে, এখানে একজন লোক এসেছে এবং তাঁর সাথে আছে এক সুন্দরী ও রূপসী নারী। তখন বাদশাহ ইবরাহীম (আ)-এর সাথীয় মহিলার তথ্য নেয়ার জন্য একজন লোক প্রেরণ করল। সে এসে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে মহিলার পরিচয় জিজ্ঞেস করল। উত্তরে ইবরাহীম (আ) বললেন, 'এ আমার বোন'। ইবরাহীম (আ) এ উত্তর দিয়ে হযরত সারার কাছে চলে গেলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আমি উত্তরে বলেছি, 'তুমি আমার বোন'। আজ এখানে তুমিই আমার (দ্বীনী) বোন। সুতরাং তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না। তারপর হযরত সারাহ (রা) বাদশাহর কাছে পৌঁছলে যালিম বাদশাহ অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটবর্তী হলো। সাথে সাথে বাদশাহর হাত পা অবশ হয়ে গেল। বাদশাহ হযরত সারাহকে বলল, তুমি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর। আমি তোমার সাথে কোনো অনাচার করব না। হযরত সারাহ দো'আ করলেন। দো'আর বরকতে বাদশাহ শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। এরপর সে (বাদশাহ) আবার (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে) তাঁর দিকে এগিয়ে আসে। তখন পূর্বের চেয়েও কঠিন শাস্তি তাকে পাকড়াও করে। বাদশাহ বলল, হে সারাহ! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। আমি সত্যিই তোমার সাথে কোনো অনাচার করব না। হযরত সারাহ (আ) দোয়া করলেন। ফলে সে এবারেও শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। তৃতীয়বারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। অতঃপর বাদশাহ তার খাদেমকে ডেকে বলল, তুমি আমার কাছে কোনো মানুষ নিয়ে আস নি; বরং নিয়ে এসেছ এক জ্বিন। তাকে এখান থেকে সরিয়ে দাও এবং তাঁর সাথে সেবিকা হিসেবে হাজেরাকেও দিয়ে দাও।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার ব্যতীত কখনো মিথ্যা বলেন নি। অর্থাৎ, তাঁর জীবনে তিনি শুধু তিনবার বিশেষ কারণে মিথ্যা কথা বলেছিলেন। প্রথমবার যখন তাঁর জাতির কাফিরেরা তাকে বাৎসরিক মেলায় যাওয়ার জন্য বলেছিল, তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "আমি পীড়িত"। দ্বিতীয়বার, তিনি মূর্তি ভাঙা সম্পর্কে বলেছিলেন, "এ বড় মূর্তিটিই এ কাজটি করেছে"। তৃতীয়বার, তিনি হযরত সারাহ (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন, "এ আমার বোন"। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরকমও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) একবার কোনো এক লোকালয়ে প্রবেশ

করেন। সেখানে এক বাদশাহ ছিল। অথবা তিনি (আ) বলেছেন যে, সেখানে এক অত্যাচারী কাফির (বাদশাহ) ছিল। তাকে জানানো হলো যে, ইবরাহীম (আ) অতি সুন্দুরী ও রূপসী এক নারীকে নিয়ে আমাদের জনপদে প্রবেশ করেছেন। বাদশাহ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করল যে, আপনার সাথে এ মহিলা কে? ইবরাহীম (আ) উত্তরে বললেন, এ আমার বোন। বাদশাহ বলল, তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে, হে সারাহ! এ পৃথিবীতে তুমি আর আমি ব্যতীত আর কোনো মু'মিন নেই। সে দৃষ্টিতে আমি বাদশাহর নিকট বলে এসেছি যে, তুমি আমার বোন। সুতরাং তুমি আমার এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে না। হযরত সারাহ (রা) বাদশাহর কাছে পৌঁছলে, সে তাঁর দিকে (অসৎ উদ্দেশ্যে) এগিয়ে আসে। এ সময় হযরত সারাহ (রা) ওযূ করে নামাযে মাশগুল হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন—

"হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আমি আপনার প্রতি ও আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আর আমি আমার লজ্জাস্থানকে (আমার স্বামী ব্যতীত) অন্যের থেকে হেফাযতে রেখেছি। অতএব, কাফিরের অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আমাকে রক্ষা করুন।"

(এ দো'আর ফলে) কাফির বাদশাহ ভূমিতে ধসে যেতে লাগল এবং পা মাটি ঢুকেই গেল। আবু যিনাদ (রহ) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এ কথাও বর্ণনা করেন যে, এ সময় হযরত সারাহ (রা) এ দো'আ করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! যদি অত্যাচারি বাদশাহ এরূপ অবস্থায় মারা যায়, তবে এ কথা বলা হবে যে, 'আমিই তাকে হত্যা করেছি'।" সুতরাং বাদশাহ শাস্তি থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু পুনরায় বাদশাহ অসৎ উদ্দেশ্যে সারাহ (রা)-এর দিকে এগিয়ে আসে। হযরত সারাহ পূর্বের মতো ওযূ করে নামাযে মাশগুল হয়ে পড়েন এবং অনুরূপ দো'আ করেন, "হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি আপনার ও আপনার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি আমার লজ্জাস্থানকে আমার স্বামী ব্যতীত অন্যের থেকে হেফাযত রেখেছি। আপনি কাফিরের অসৎ উদ্দেশ্য থেকে আমাকে রক্ষা করুন।" দোয়ার সাথে সাথে কাফির বাদশাহ ভূমিতে ঢুকে যেতে শুরু করল। পা দুটো মাটিতে ঢুকেই গেল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, এ সময় সারাহ (রা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আবেদন করলেন, "হে আল্লাহ! যদি বাদশাহ এরূপ অবস্থায় মারা যায়, তবে লোকেরা বলবে যে, আমিই তাকে হত্যা করেছি।" এবারেও সে (বাদশাহ) রক্ষা পেল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বাদশাহ তৃতীয় অথবা চতুর্থবারের সময় খাদিমদের লক্ষ্য করে বলে উঠল, ওগো! তোমরা আমার কাছে একটি জ্বিনকে নিয়ে এসেছ। একে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর হাজেরাকেও উপহার স্বরূপ তাঁর সাথে দিয়ে দাও। হযরত সারাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আপনি কি জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহ কাফির বাদশাহর ষড়যন্ত্র ও অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং সে (বাদশাহ) উপহার স্বরূপ একটি দাসীও দান করেছেন? ইমাম আহমদ (রহ) সহীহ বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ) অন্য এক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবী হাতিম হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ তিনটি (মিথ্যা) কথা এরূপ ছিল না যে, যাতে তাঁর থেকে দ্বীনের ব্যাপারে কিছুটা দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সে তিনটির প্রথম কথাটি ছিল, 'আমি পীড়িত'। দ্বিতীয় কথা হলো, "বরং এদের বড় (মূর্তি)-টিই এ কাজটি করেছে"। আর তৃতীয় কথাটি হলো এই যে, "বাদশাহ যখন সারাহকে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী ধারণা করেছিল, তখন তিনি বাদশাহকে বলেছিলেন যে, এ আমার বোন।"

উক্ত হাদীসসমূহে বারবার যে কথাটি আসছে যে, ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহ (রা) সম্পর্কে বাদশাহকে বলেছিলেন, "এ আমার বোন" এ কথাটির দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ (সারাহ) আল্লাহর দ্বীনের দিক দিয়ে আমার বোন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহকে যে বলেছিলেন, এ সময় এ বিশ্বে তুমি ও

আমি ব্যতীত আর কোনো মুমিন নেই। এ কথার অর্থ ছিল এই যে, তুমি ও আমি ব্যতীত এই পৃতিবীতে কোনো মুমিন দম্পতি নেই। কারণ, তাদের সাথে হযরত লূত (আ)-ও ছিলেন। আর তিনি ছিলেন একজন নবী। সুতরাং ইবরাহীম (আ) মুমিন শব্দ বলা দ্বারা মু'মিন দম্পতি বুঝিয়েছেন।

হযরত সারাহ (রা) যখন যালিম বাদশাহর কাছে রওয়ানা হয়ে যান, তখন থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ) নামাযে মাশগুল হয়ে পড়েন এবং এ দো'আ করতে থাকেন, "হে আল্লাহ! আমার স্ত্রীকে, এ যালিম বাদশাহর ষড়যন্ত্র ও অসৎ উদ্দেশ্য থেকে রক্ষা করুন।" হযরত সারাহ (রা)-ও অনুরূপ সেখানে বসে নামাযে মাশগুল হয়ে যান। আল্লাহর দুশমন এ কাফির ও যালিম বাদশাহ হযরত সারাহ (রা)-কে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করতে চাইলে, তিনি ওযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান এবং উল্লিখিত দোয়া করেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী—

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۝

অর্থ : সবর ও নামায দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামায খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়। –সূরা বাকারা : ৪৫

আল্লাহ তা'আলা হযরত সারাহ (রা)-কে কাফির বাদশাহর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে তাঁর প্রিয় বান্দা, রাসূল ও বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করলেন।

কিছু সংখ্যক আলিমের মতে তিনজন মহিলা নবুওয়াত লাভ করেছিলেন। যথা– ১) হযরত সারাহ (রা), ২) হযরত মূসা (আ)-এর মাতা ও ৩) মরিয়াম (আ)। তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে উল্লিখিত তিনজন মহিলা সিদ্দীকা (সত্যবাদীনী) ছিলেন। তাঁরা নবী ছিলেন না।

বিভিন্ন বুযুর্গদের বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত সারাহ (রা) হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেন। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) সার্বক্ষণিকভাবে হযরত সারাহ (রা)-কে দেখছিলেন। হযরত সারাহ (রা)-এর সাথে যালিম বাদশাহ যে অসদাচরণ করেছিল এবং বাদশাহ যে শাস্তির মুখোমুখি হয়েছিল, তা সবকিছুই তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্ত্রীকে হেফাযত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যবস্থা এজন্য করেছিলেন, যাতে তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ) অন্তরে প্রশান্তি লাভ করেন ও তাঁর অন্তর পবিত্রতার উপর দৃঢ় থাকে। অর্থাৎ, যাতে অন্তরে খারাপ কোনো ধারণা সৃষ্টি না হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহ (রা)-কে ধর্মপরায়ণা আত্মীয়া ও পরম রূপসী হওয়ার জন্য অত্যন্ত ভালবাসতেন। বর্ণিত আছে, হযরত হাওয়া (আ)-এর পর থেকে হযরত সারাহ (রা) পর্যন্ত সারাহ (রা)-এর চাইতে কোনো সুন্দরী ও রূপসীর আগমন ঘটে নি। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

ইতিহাস বিশ্লেষক বলেছেন, এ সময় মিশরের ফিরাউন (বাদশাহ) ছিল যিহাকের ভাই। তার অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের কথা সর্বত্র ছিল খ্যাত। কারো কারো মতে তার নাম ও বংশ তালিকা হচ্ছে, সিনান ইবনে আলওয়ান ইবনে ওবায়দ ইবনে ওয়াইজ ইবনে আমলাক ইবনে লাওদ ইবনে সাম ইবনে নূহ। ইবনে হিশাম (রহ) বলেছেন, হযরত সারাহকে অসৎ উদ্দেশ্যে যে বাদশাহ স্পর্শ করতে চেয়েছিল, তার নাম ছিল আমার ইবনে ইমরুল কায়স ইবনে মায়লত ইবনে সাবা। সে ছিল মিশরের সম্রাট। আল্লামা সুহায়লী (রহ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার পরে হযরত ইবরাহীম (আ) মিশর ত্যাগ করে ইয়ামানে চলে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আ) মিশর থেকে চলে আসার সময় সাথে করে প্রচুর পরিমাণ ধন-সম্পদ ও গৃহপালিত পশু নিয়ে আসেন। এছাড়াও তাঁর সাথে গোলাম, বাঁদি, হযরত হাজেরাও ছিলেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদেশ হযরত লূত (আ) ধন-সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে ইয়ামান থেকে 'গাওর' নামক দেশে চলে যান। 'গাওর' এলাকাটি 'গাওরে-যাগার' নামে বিখ্যাত ছিল। তিনি সেখানে পৌঁছে ঐ দেশের প্রসিদ্ধ শহর, 'সাদ্দুমে' বসতি স্থাপন করেন। এ শহরটিকে 'উম্মুল-বিলাদ' (শহরসমূহের মা) বলা হতো। কিন্তু এই শহরের জনগণ ছিল অসৎ, দুরাচার ও কাফির। তারপর

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই নির্দেশ দেন যে, দৃষ্টি অনেক দূর প্রসারিত করে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তাকাও। তারপর তাঁকে সুসংবাদ দেন যে, (যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে) এসব দেশসমূহের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তোমার বংশের মানুষের উপরই ন্যস্ত করব। আরো বলেছেন যে, তোমাকে এত অধিক সন্তান দান করব, যাদের সংখ্যা পৃথিবীর বালুকণার সমান হয়ে যাবে। উম্মতে মুহাম্মাদীরা ﷺ ও এই সুসংবাদের শামিল। বরং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল সন্তানদের মধ্যে এ উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর সংখ্যা-ই বেশি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই সুসংবাদ উম্মতে মুহাম্মাদীরা ﷺ ছাড়া প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ আমার জন্য বিশ্বকে সংকুচিত করে (সামনে এনে) দিয়েছেন। আমি বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তসমূহ অবলোকন করেছি। অতিশীঘ্রই আমার উম্মতের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব সে পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে, যে পর্যন্ত আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, শহরের কিছু সংখ্যক যালিম ও পাপিষ্ঠ লোক হযরত লূত (আ)-এর উপর আক্রমণ করে বসে এবং তাঁকে বন্দি করে। তারা তাঁর ধন-সম্পদও পশুগুলো লুট করে নিয়ে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি তিনশ' আঠার জন সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌছেন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে হযরত লূত (আ)-কে মুক্ত করেন। ধন-সম্পদ ও পশুগুলো তাদের থেকে ফিরিয়ে আনেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুকে পরাজিত করেন ও অনেককে হত্যা করেন। এখানেই তিনি থেমে যান নি। বরং তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে দামেশকের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে গেলেন। সেখানে 'বারযা' নামক এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। সম্ভবত সেখানে 'মাকামে ইবরাহীম' নামক যে জায়গাটি আছে, সে নামকরণ এ কারণেই যে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সৈন্যবাহিনী শিবির স্থাপন করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যেই সৈন্যদেরকে পরাজিত করেছিলেন, তারা ছিল 'আয়লাম' বাদশাহর সৈন্য। আয়লাম সাদ্‌দুম রাজ্যের বাদশাহ ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) তাকে পশ্চাদ্ধাবন করে পাহাড় পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। বাদশাহ নিরুপায় হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে নিবেদন করলেন যে, আপনি আমার থেকে পশু ও ধন-সম্পদ গ্রহণ করে আমাকে ছেড়ে দিন। হযরত ইবরাহীম (আ) জবাবে বললেন, আমি আমাকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছেই সোপর্দ করেছি। আমি তোমার থেকে একটি সুতা অথবা জুতার একটা ফিতাও গ্রহণ করব না। যাতে তুমি পরবর্তীতে এ কথা বলতে না পার যে, আমি ইবরাহীমকে সম্পদশালী করে দিয়েছি। পরিশেষে হযরত ইবরাহীম (আ) বিজয়ের বেশে নিজ দেশে ফিরে গেলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসকগণ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ও সম্মানের সাথে ইবরাহীম (আ)-কে স্বাগতম জানান। তিনি তাঁর নিজ এলাকা বায়তুল মুকাদ্দাসেই বসতি গড়ে তুললেন।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে নেক সন্তানের জন্য দো'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নেক-সন্তানের সুসংবাদ দান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন করার পরে ২০ বছর এখানে অতিবাহিত করেন। এ সময় একদিন হযরত সারাহ (রা) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললেন, আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা সন্তান থেকে বঞ্চিতই রেখেছেন। সুতরাং আমি আমার এ (হাজেরা) বাঁদিকে আপনাকে প্রদান করলাম। আপনি একে আপনার কাছে নিয়ে নেন। হতে পারে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাকে সন্তান দান করতে পারেন। হযরত সারাহ (রা) তাঁর বাঁদি হাজেরাকে ইবরাহীম (আ)-কে দান করে দিলে, তিনি তাঁর সাথে মিলিত হন। এতে হাজেরা (আ) অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। লোকজন বলতে শুরু করলেন, এ বাঁদি (হাজেরা) তো, তাঁর নিজ মালিক (সারাহ) থেকেও অনেক মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে গেছেন।

এ কথায় স্বভাবগতভাবেই হযরত সারাহ (রা)-এর আত্মমর্যাদায় খুব আঘাত লাগল। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে অভিযোগ করলেন। ইবরাহীম (আ) জবাবে তাঁকে বললেন, "তুমি হাজেরার সাথে যেরূপ

ব্যবহার করতে চাও, তা করতে পার।" হাজেরা (রা) এ খবর শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পলায়ন করেন এবং একটি কূপের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ সময় একজন ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন, আপনি ভীত হবেন না। আপনার গর্ভে যে সন্তান এসেছে, এ সন্তান দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করবেন। তারপর ফেরেশতা তাঁকে নিজ ঘরে ফিরে যেতে বললেন এবং সুসংবাদ দিলেন যে, "আপনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবেন।" তাঁর নাম রাখবেন, ইসমাঈল। তিনি হবেন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর হাত (প্রভাব) সবার উপর থাকবে এবং সবাই তাঁর সাথে থাকবেন। তিনি তাঁর (সৎ) ভাইদের রাজত্বসমূহের একচ্ছত্র রাজত্ব করবেন। এ কথা শুনে হযরত হাজেরা (রা) আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করেন।

এ সুসংবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর বেলায় পূর্ণভাবে সত্য ও যথাযথ।

কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই আরবগণ সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব লাভ করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেশসমূহের মালিক হয়ে যান। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে কল্যাণকর জ্ঞান ও নেক আমল (করার তাওফীক) দান করেন, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোনো নবীকে প্রদান করা হয় নি। রাসলুল্লাহ ﷺ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও সমস্ত নবীর সর্দার, তাঁর রিসালাত, নবুওয়াত ও সুসংবাদ অত্যন্ত বরকতময়। তিনি সারা বিশ্ববাসীর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই গোটা আরবজাতি ও উম্মতে মুহাম্মাদীরা বিশেষ সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হন।

হযরত হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের তের বছর পরে হযরত সারাহ (আ)-এর গর্ভে হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। যখন হযরত সারাহকেও ইসহাক নামক একটি নেক সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সিজদা আদায় করেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি অধিক দয়াপরবশ হয়ে বলেন, হে দোস্ত ইবরাহীম! ইসমাঈলের সম্পর্কে আমি তোমার দো'আ কবুল করেছি। তার উপর আমি বরকত নাযিল করেছি এবং তাকে অনেক সন্তান দান করেছি। এদের মধ্য হতে অধিকাংশই বরকতপ্রাপ্ত। তার সন্তানদের মধ্য হতে অতি মর্যাদাসম্পন্ন বারজন ব্যক্তির আগমণঘটবে। আমি তাকে বিরাট দলের নেতা করব। এ সুসংবাদ বাস্তবায়িত হয় উম্মতে মুহাম্মাদীয়া ﷺ-এর বেলায়। এ বারজন সম্মানিত ব্যক্তি হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন, যাদের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে আব্দুল মালেক ইবনে ওয়ায়েরের বর্ণিত হাদীসে। তিনি হযরত জাবের ইবনে সামুরা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বারজন আমীর হবে।" বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপরও কিছু বলেছিলেন কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি নি। তাই আমি আমার পিতার কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরপর এই কথা বলেছিলেন যে, "তারা সবাই হবে কুরাইশ বংশ থেকে"। -বুখারী, মুসলিম

অন্য এক হাদীসে আছে, "এই খেলাফত বারজন খলীফা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এ খেলাফত ১২ জন খলীফা পর্যন্ত প্রভাবশালী থাকবে। আর এরা সব হবে কুরাইশ থেকে।'

এই বারজনের মধ্যে চারজন হলেন খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবূ বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)। এরপর হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা), হযরত হাসান ইবনে আলী (রা), হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রা)-ও এদের অন্তর্ভুক্ত। কিছু সংখ্যক খলীফা বনী আব্বাসীয়ার। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সুসংবাদ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অনুপাতে এই বারজন ধারাবাহিকভাবে হতে হবে এটা বুঝা যায় না। বরং শুধু বারজন হওয়াটাই বুঝানো হয়েছে।

রাফেজীগণ "বারজন আমীর" দ্বারা যে ১২ জন ইমামের কথা বলেছে, তা আদৌ ঠিক নয়। তাদের মতে, এ বারজনের প্রথম জন হচ্ছেন- হযরত আলী (রা) ও শেষোক্ত ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আসকারী। এ ধারণা ভ্রান্ত ও ধোঁকা। কারণ, সেই ১২ জনের মধ্যে হযরত আলী (রা) ও তাঁর সন্তান হাসান ইবনে আলী (রা) ছাড়া আর কেউই খলীফা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নি। হযরত আলী (রা) ও হাসান ইবনে আলী (রা) এ দু'জনের সম্পর্কে তাদের দাবি সত্য ও সঠিক। আর শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনে আসকারী, শী'আ সম্প্রদায়গণ

দীর্ঘদিন ধরে যার আগমণের প্রতীক্ষা করছে, সেটা তাদের শুধু ধোকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইনি ব্যতীত বাকি সবাই আমাদের সকল মুসলমানের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু তাদের ব্যাপারে শী'আগণের ধারণা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও কল্পিত। হযরত আলী (রা) এবং হযরত হাসান (রা) এ ১২ জনের অন্তর্গত। হযরত হাসান (রা) খেলাফত সম্পর্কিত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এতে ফিতরার আগুন নিভে যায় এবং মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়। বাকি খেলাফতের আসনে কেউ উপবিষ্ট ছিল না। (আমাদেরও পথ-প্রদর্শক ও নেতা অবশ্যই আছেন। কিন্তু সাহাবাগণের মর্যাদার চেয়ে তাঁদের মর্যাদা কম। শী'আদের কল্পিত ধারণার মতো আমাদের ধারণা নয়।)

সর্বশেষ ইমাম অর্থাৎ, মুহাম্মদ ইবনে আসকারী সম্পর্কে রাফেজীদের ধারণা ও বিশ্বাস শুধু ভ্রান্ত ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের দাবির কোনই ভিত্তি নেই।

নির্জন মরু অঞ্চলে হাজেরা (রা) ও শিশু ইসমাঈল (আ)

হযরত হাজেরা (রা)-এর গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম হওয়াতে হযরত সারাহ (রা) অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললেন, 'হাজেরা (রা)-কে আমার নিকট থেকে অন্যত্র নিয়ে যান।' সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) হাজেরা (রা) ও শিশু ইসমাঈল (আ)-কে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং চলতে চলতে এমন এক নির্জন জায়গায় গিয়ে অবস্থান করেন, যেখানে বর্তমানে মক্কা শহর অবস্থিত। হযরত ইসমাঈল (আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে সেখানে রেখে যখন চলে আসতে লাগলেন, তখন হযরত হাজেরা (রা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাপড় জড়িয়ে ধরে বললেন, হে ইবরাহীম (আ)! আপনি এই জনমানব শূন্য ভূমিতে আমাকে একা রেখে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে আমার কাছে (থাকা ও খাওয়ার জন্য) এমন কোনই আসবাবপত্র ও খাদ্য সামগ্রী নেই, যার দ্বারা আমি জীবন অতিবাহিত করতে পারি। হাজেরা (রা) অত্যন্ত পেরেশানীর সাথে তাঁর কাছে এ কথাটি বলার পরেও তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে কোনই উত্তর না পেয়ে হাজেরা (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আপনাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়েছেন? হযরত ইবরাহীম (আ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ। তারপর হযরত হাজেরা (রা) বললেন, "তাহলে কোনই ভয় নেই। আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করবেন না।"

শায়েখ আবূ মুহাম্মদ ইবনে আবী যায়েদ (রা) 'নাওয়াদের' কিতাবে বর্ণনা করেছেন, হযরত সারাহ (রা) হযরত হাজেরা (রা)-এর প্রতি ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিতা হয়ে কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, "আমি হাজেরা (রা)-এর তিনটি অঙ্গ কর্তন করবই।" ইবরাহীম (আ) হযরত সারাহ (রা)-কে বললেন, কসম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য "তুমি হাজেরার দুটি কান ছিদ্র করে দাও এবং খাৎনা করিয়ে দাও।" এরূপ করলে তোমার কসম আদায় হয়ে যাবে।

হযরত সুহাইলী (রহ) বলেছেন, হাজেরা পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহিলা যার খাৎনা হয়েছিল। অনুরূপ তিনিই সর্বপ্রথম নারী, যার উভয় কান ছিদ্র করা হয় এবং তা নারীদের জন্য সৌন্দর্যের জিনিস হয়ে যায়। আর তিনিই সর্বপ্রথম নারী, যিনি সর্বপ্রথম তাঁর আঁচল লম্বা করে ব্যবহার করেন। যাতে পথ চলার সময় পায়ের চিহ্ন মুছে যায় এবং সারাহ (রা) তাঁর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না হতে পারে।

ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মা হাজেরা (রা)-কে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ফারান পাহাড়ে হিজরত এবং কা'বা ঘর নির্মাণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইসমাঈল (আ)-এর মাতা (হাজেরা আ.) সর্বপ্রথম নারী, যিনি (দীর্ঘ) কোমরবন্ধ ব্যবহার করতেন, যাতে তাঁর চলার পথের পদচিহ্ন মুছে যায় এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে হযরত সারাহ (রা) অবগত না হতে পারেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা (রা) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল (আ)-কে নিয়ে মক্কায় (বায়তুল্লাহ শরীফের কাছে) যান এবং মসজিদের উঁচু অংশে

যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত, সেখানে তখন একটি বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের নীচে তাঁদেরকে রেখে আসেন। এ সময় মক্কা অঞ্চলটি ছিল জনশূন্য, নিভৃত মরুভূমি এলাকা। সেখানে তাঁদের ব্যতীত আর কোনো লোকের বসতি ছিল না এবং বায়তুল্লাহ শরীফেরও কোনো দেয়াল ছিল না। সেখানে খাদ্যসামগ্রী তো দূরের কথা পিপাসা নিবারণের জন্য একটু পানি পর্যন্ত ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ) সেই নির্জন মরুভূমিতে তাঁদেরকে রেখে আসেন। শুধু তাঁদের কাছে রেখে আসেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং এক মশক পানি। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) (তাদের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলেই) সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত হাজেরা (আ) ইবরাহীম (আ)-এর পেছনে পেছনে দ্রুত ছুটে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহীম (আ)! আমাদেরকে এ নির্জন, জনশূন্য মরুভূমিতে রেখে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যেখানে না আছে কোনো মানুষের বসতি, না আছে জীবন বাঁচানোর সামগ্রী। হাজেরা (আ) অত্যন্ত পেরেশানির সাথে বার বার এ কথা বলছিলেন। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কথার প্রতি কোনই কর্ণপাত করলেন না। (অর্থাৎ কোনই জবাব দিলেন না।) পরিশেষে হাজেরা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহীম (আ)! আপনাকে এরূপ করার জন্য কি আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন? ইবরাহীম (আ) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত হাজেরা (রা) বললেন, "তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধ্বংস করবেন না।" এ কথা বলে হাজেরা (আ) তাঁর জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-ও চলে গেলেন। যখন ইবরাহীম (আ) একটি টিলা (উপত্যকা) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন, যেখান থেকে হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-কে আর দেখা গেল না, তখন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাত উঠিয়ে এ দো'আ করলেন—

رَبَّنَآ اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْٓ اِلَیْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ ۝

অর্থ : হে আমার রব! আমি আমার সন্তানদের এক অংশকে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এক অনাবাদি জায়গায় এনে বসতি স্থাপন করেছি। আমি এজন্যে এটা করেছি, যাতে এরা এখানে নামায কায়েম করে। তাই তুমি জনগণের দিলকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে খাবার জন্য ফল দাও। হয়তো তারা শুকরিয়া আদায় করবে। -সূরা ইবরাহীম : ৩৭

হযরত হাজেরা (আ) সেই মশকের পানি নিজেও পান করতেন ও নিজ সন্তানকেও পান করাতেন। একসময় মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। হাজেরা (আ) অত্যন্ত পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। আর দুগ্ধপোষ্য শিশুটি তো পিপাসায় আরো পেরেশান হয়ে পড়েন। মা হাজেরা (আ) সন্তানের মমতা ও ভালবাসায় নিজের পিপাসার কথা ভুলে গিয়ে অস্থিরতার সাথে বারবার সন্তানের মুখের দিকে তাকাতে থাকেন।

শিশু ইসমাঈল (আ) পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগল। সন্তানের এ করুণ অবস্থা দেখে মা হাজেরা (আ) অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন যে, কোথাও কোনো লোক দেখা পাওয়া যায় কিনা বা পানির কোনো সন্ধান মিলে কিনা। কিন্তু তিনি কোনো লোকই দেখতে পেলেন না এবং পানিরও কোনো সন্ধান পেলেন না। পরিশেষে নিরাশ হয়ে অস্থির মনে সাফা পাহাড় থেকে নিচে নেমে তিনি তাঁর জামার নিম্নাংশের এক পার্শ্ব হাত দ্বারা উঠিয়ে পালিয়ে যাওয়া লোকের মতো অত্যন্ত ব্যাকুলতার সাথে দ্রুত ছুটে চললেন। কিছু দূর অতিক্রম করে তিনি 'মারওয়া' পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে লাগলেন যে, কোথাও কোন লোক দেখা যায় কিনা বা পানির কোনো সন্ধান মিলে কিনা। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হলেন। মা হাজেরা (আ) সন্তানের মায়া-মমতায় অত্যন্ত ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার সাথে এরূপ সাতবার সায়ী (দ্রুত বেগে আসা যাওয়া) করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কারণেই লোকজন (হজ্জ ও ওমরা করার সময়) এ দু' পাহাড়ের মাঝে (সাতবার) দৌড়ে থাকেন।

হযরত হাজেরা (আ) শেষবার যখন 'মারওয়া' পাহাড়ে উঠেন, তখন তিনি একটি গায়েবী ধ্বনি শুনতে পান। এ ধ্বনি শুনে তিনি (হাজেরা) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, 'থেমে যাও'! তারপর মনোযোগ দিয়ে কান লাগিয়ে অনুরূপ একই আওয়াজ শুনতে পান। এবার তিনি নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, "হয়তো তোমার নিকট কোনো সাহায্যকারী এসে গেছেন।" এরপর তিনি যমযম কূপের স্থানের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি (ফেরেশতা) তাঁর নিজ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন। ফলে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়ে সেখান থেকে পানি বেরিয়ে আসে। তখন হযরত হাজেরা (আ) সেই গর্তটির চারপাশ বেষ্টন করে, হাউজের মতো পানি জমা করে রাখেন আর বলতে থাকেন, 'যমযম, যমযম', অর্থাৎ থেমে যাও, থেমে যাও। তারপর হাজেরা (আ) অঞ্জলি ভরে ভরে নিজ মশকে পানি তুলতে লাগলেন। এরপরও পানি ঝর্ণার মত উপচে পড়তে লাগল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হাজেরা (আ)-এর প্রতি দয়া করুন। তিনি যদি পানি উৎসারিত হওয়ার সময় "যমযম, যমযম" (থেমে যাও, থেমে যাও) কথাটি বলা থেকে বিরত থাকতেন কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনি যদি অঞ্জলি ভরে পানি মশকে তুলে না নিতেন, তবে এ কূপটি প্রবাহিত ঝর্ণা হয়ে যেত। (অর্থাৎ সর্বদাই স্রোতের মতো বহমান থাকত)। হযরত হাজেরা (আ) সে পানি নিজেও পান করেছেন এবং কলিজার টুকরা ইসমাঈল (আ)-কেও পান করিয়েছেন। ফেরেশতা হযরত হাজেরা (আ)-কে বললেন, আপনি এ নির্জন ভূমিতে কোনো ভয় করবেন না। এখানেই আছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ঘর। এ শিশু ইসমাঈল (আ) ও তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ) উভয় মিলে এ ঘর নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের অধিবাসীদেরকে বিনাশ করবেন না। এ সময় আল্লাহ তা'আলার এ গৃহটি মাটির উপর কিছুটা জাগানো ছিল। কোনো এক প্লাবনে এর ডান ও বামের অংশ ধসে গিয়েছিল। হযরত হাজেরা (আ) তাঁর শিশু সন্তানকে নিয়ে এরূপে এ নির্জন ভূমিতে বসবাস করছিলেন। এ সময় একবার জুরহাম সম্প্রদায়ের একটি (বাণিজ্যিক) কাফেলা তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল। তারা হাজেরা (আ) থেকে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে মক্কার নিম্নভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তারা একটি পাখিকে উড়তে দেখে বলল, এ পাখি তো সাধারণতঃ পানির উপরে উড়ে থাকে। এ উপত্যকাটি তো আমাদের কাছে অতি পরিচিত। এখানে কোথায় কি আছে তা আমাদের জানা আছে। এখানে তো কোনো পানি নেই। বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য তাদের থেকে একজন অথবা দু' জন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পানির কূপ দেখতে পেলো। তারা সেখান থেকে ফিরে এসে কাফেলার লোকদেরকে পানির সংবাদ দিল। এ খবর শুনে তারা সবাই সেখানে (পানির কাছে) চলে গেল। পানির কাছে হযরত হাজেরা (আ) উপস্থিত ছিলেন।

কাফেলার লোকেরা হযরত হাজেরার কাছে আরয করল, "আপনি কি আমাদেরকে এখানে (আপনার নিকট) কিছু দিন থাকার জন্য অনুমতি দেবেন? হযরত হাজেরা (আ) জবাবে বললেন, হ্যাঁ, অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে এই পানির উপর তোমাদের কোনো অধিকার থাকবে না। তারা এ কথা মেনে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এরূপই হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইসমাঈল (আ)-এর মা হযরত হাজেরা (আ) এ নির্জন ভূমিতে মানুষের বসতি ও সাহচর্য উভয়ই পেয়ে গেলেন। অনুমতি পেয়ে জুরহাম সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়। পরিবারের লোকেরা এ খবর পেয়ে তারাও তাদের কাছে এসে বসবাস করতে থাকে। সব পরিবারের লোকজন মিলেমিশে সেখানে বসবাস করতে আরম্ভ করল। এদিকে ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করলেন। যুবক

ইসমাঈল (আ) সবার প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হন, তখন জুরহাম গোত্রের লোকেরা তাদের গোত্রের একটি কন্যাকে তাঁর সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। এর মধ্যেই ইসমাঈল (আ)-এর মা হযরত হাজেরা (আ) আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে যান। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বিবাহের পর একবার হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য (মক্কায়) আগমন করেন। এ সময় ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে ঘরে না পেয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বললেন, তিনি আমাদের জন্যে খাদ্য সংগ্রহ করতে বাইরে চলে গেছেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ) তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন স্ত্রী অভিযোগ করে বললেন, আমরা খুব কষ্টের মধ্যে আছি। ইবরাহীম (আ) তাকে বললেন, আপনার স্বামী যখন ঘরে ফিরবেন, তখন তাঁকে আমার সালাম দেবেন এবং তাঁকে বলবেন, তিনি যেন তাঁর দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করেন। হযরত ইসমাঈল (আ) ঘরে আসামাত্র কিছু অনুভব করে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো লোক কি এসেছিল? স্ত্রী জবাবে বললেন, জী-হ্যাঁ, একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিল। তিনি আপনার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি যে, তিনি খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাইরে চলে গেছেন। তারপর তিনি আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি যে, আমরা খুব কষ্টের মধ্যে আছি। তারপর ইসমাঈল (আ) স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কোনো উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বললেন, জী-হ্যাঁ। তিনি আপনাকে তার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাতে বলেছেন এবং আপনার দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করতে বলেছেন। তারপর হযরত ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি হচ্ছেন আমার সম্মানিত পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনি আমাকে আদেশ করে গেছেন যে, আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করি। সুতরাং তুমি তোমার পিত্রালয়ে চলে যাও। তারপর ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দেন এবং সেই জুরহাম গোত্র থেকেই অপর এক মহিলাকে বিবাহ করেন। অনেকদিন পর পুনরায় ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয়বার সেখানে গমন করেন। এবারেও তিনি ইসমাঈল (আ)-কে ঘরে পেলেন না। ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রীকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় স্ত্রী উত্তরে বললেন, তিনি আমাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে বাইরে চলে গেছেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাংসারিক জীবন কিরূপ চলছে? পুত্রবধূ জবাবে বললেন, আমরা খুব শান্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছি। তারপর পুত্রবধূ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কি দিয়ে আহার কর? জবাবে পুত্রবধূ বললেন, গোস্ত দিয়ে। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পানীয় কি? জবাবে তিনি বললেন, পানি। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তাদের জন্য গোস্ত ও পানিতে বরকত দিন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেদিন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কাছে (গোস্ত ও পানি ব্যতীত) অন্য আর কিছু ছিল না। যদি থাকত তবে হযরত ইবরাহীম (আ) সেগুলোর বরকতের জন্যও দো'আ করতেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন থেকে মক্কাতে গোস্ত ও পানি উভয়ই প্রচুর পরিমাণ মওজুদ থাকে। ইবরাহীম (আ) তাঁর নেককার পুত্রবধূকে বললেন, তোমার স্বামী যখন ঘরে আসবেন, তখন তাঁর কাছে আমার সালাম দিবে এবং তাঁকে বলবে, সে যেন তাঁর দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে। ইসমাঈল (আ) ঘরে এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি কোনো লোক এসেছিল? স্ত্রী বললেন, জী-হ্যাঁ। একজন সুন্দর চেহারার বুযুর্গ তাশরীফ এনেছিলেন। স্ত্রী বুযুর্গের প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তিনি (বুযুর্গ লোকটি) আমাকে আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি বলেছি, তিনি খাদ্য সংগ্রহের জন্য বাইরে চলে গেছেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাংসারিক জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, কিরূপে চলছে আমাদের সাংসারিক জীবন? আমি বলেছি, সুন্দরভাবেই চলছে। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি কোনো উপদেশ দিয়ে গেছেন? স্ত্রী বললেন, জী-হ্যাঁ, আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনাকে দরজার চৌকাঠ বহাল রাখার জন্য বলেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা। চৌকাঠ দ্বারা তোমাকে বুঝিয়েছেন। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমাকে যেন আমি স্ত্রী রূপে বহাল রাখি। (অর্থাৎ তোমাকে যেন ত্যাগ না করি।) এর

দীর্ঘদিন পর ইবরাহীম (আ) পুনরায় ইসমাঈল (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। এবার তিনি ইসমাঈল (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি যমযম কূপের কাছে একটি টিলার উপর বসে তীর পরিষ্কার করছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁর সম্মানিত পিতাকে দেখে অত্যন্ত বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে পরস্পরকে করমর্দন ও আলিঙ্গন করলেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পুত্রকে বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে এক আদেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, হে পিতা! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে পালন করুন। পিতা বললেন, এ ব্যাপারে তোমার সাহায্য প্রয়োজন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আমি আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। অতঃপর ইবরাহীম (আ) পার্শ্ববর্তী একটি উঁচু জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ উঁচু জায়গাটিতে একখানা ঘর নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছেন। তখন তাঁরা পিতা-পুত্র দু' জনে মিলে বায়তুল্লাহর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেন। পুত্র ইসমাঈল (আ) পাথর এনে দিতেন। আর পিতা ইবরাহীম (আ) দেয়ালের নির্মাণ কাজ করতেন। যখন দেয়াল (তাঁর উচ্চতার চেয়ে) উঁচু হয়ে গেল, তখন তিনি একখানা বিশেষ পাথর আনেন এবং তাঁর উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল নির্মাণের কাজ করতে থাকেন। আর ইসমাঈল (আ) পাথর এনে দিতে থাকেন। এই পাথরখানা-ই 'মাকামে ইবরাহীম' নামে পরিচিত। এ ঘর নির্মাণের সময় তাদের উভয়ের মুখে এ দো'আটি উচ্চারিত হচ্ছিল—

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এ খিদমত কবুল করো। তুমি সবকিছু শোন ও দেখ।

তাঁরা দু'জনে এভাবে ঘুরে ঘুরে চারদিকে প্রচীর গড়ে তুলেন এবং উপরোক্ত দো'আটি পাঠরত অবস্থায় দেয়ালের চারপাশ প্রদক্ষিণ করেন। উক্ত বর্ণনাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্য এক বর্ণনায় এরূপেও বর্ণিত আছে যে—

"যখন ইবরাহীম (আ) ও স্ত্রী সারাহ (রা)-এর মধ্যে (হযরত হাজেরাকে কেন্দ্র করে) সমস্যা সৃষ্টি হলো, তখন হযরত ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতা হাজেরা (আ)-কে নিয়ে এক মশক পানিসহ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। এরপর পূর্বোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসখানা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা। এর কিছু অংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্তও সম্বন্ধযুক্ত। আর কিছু অংশ গরিব পর্যায়ের। (অর্থাৎ, বর্ণনাকারী দুর্বল) ইবনে আব্বাস (রা) সম্ভবত এ বর্ণনাটি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। সেখানে এ কথাও আছে যে, ইসমাঈল (আ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন।

তাওরাতপন্থিগণ বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে এবং তার নিকট যে সব গোলাম (দাস) রয়েছেন, তাদেরকে খাৎনা করিয়ে দেন।" এ ঘটনা ঘটেছিল ইবরাহীম (আ)-এর বয়স নিরানব্বই বছর হয়ে যাওয়ার পরে। এ সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশকে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আ) এ কাজটি ফরয (অবশ্য কর্তব্য) মনে করেই পালন করেন। এ কারণে আলেমগণ বলেছেন, "এ খাৎনা করা পুরুষগণের জন্য ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)।" হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, ইবরাহীম (আ)-এর বয়স আশি বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর, তিনি 'কুঠার' দ্বারা নিজ খাৎনা করেন।"

এক বর্ণনা মতে, হাদীসে বর্ণিত 'কুদুম' শব্দটির অর্থ কুঠার নয়। বরং এটি একটি স্থানের নাম। তবে এ কথাটি গ্রহণযোগ্য যে, উল্লিখিত বর্ণনাসমূহে এ কথাটি বর্ণিত হয়েছে যে, "ইবরাহীম (আ) আশি বছর বয়সের

পরে খাৎনা করেন। এতে খাৎনার ব্যাপারে বয়সের অতিরিক্ততা নিয়ে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয় না। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওফাত এর বর্ণনায় একখানা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স যখন ১২০ বছর তখন তিনি খাৎনা করেছিলেন। এরপরও তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। ইবনে হিব্বান (রহ) এটি তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। তবে উক্ত হাদীসে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট নয়। প্রথমত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারে 'যাবীহুল্লাহ' (আল্লাহর রাস্তায় যবেহকৃত) কথাটির উল্লেখ নেই। (বনী ইসরাঈলদের নিকট তিনি হলেন হযরত ইসহাক (আ)। এ কারণে তারা হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে এ কথা উল্লেখ করেন নি।) দ্বিতীয়ত এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা (আ) ও তাঁর কলিজার টুকরা ইসমাঈল (আ)-কে নির্জন মরুভূমিতে রেখে আসার পর শুধু তিনবার সেখানে গিয়েছিলেন। প্রথমবার গিয়েছিলেন হযরত হাজেরা (আ)-এর ওফাতের পর যখন হযরত ইসমাঈল (আ) প্রথম বিবাহ করেন। এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর নিজ সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে শিশুকাল থেকে শুরু করে যৌবনকাল পর্যন্ত (যখন বিবাহ করেছিলেন) কিভাবে ভুলে রয়েছেন? এ দীর্ঘকাল তাঁদের কোনো খবরও রাখেন নি। বলা হয় যে, এ দীর্ঘ পথকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়েছিল, (অর্থাৎ তিনি দীর্ঘ পথ এক মুহূর্তে অতিক্রম করতেন।) কিতাবে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) বোরাকে আরোহণ করে তাদের কাছে তাশরীফ নিতেন। এতে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে, যখন শিশু ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মা নির্জন মরুভূমিতে কঠিন অবস্থায় দিন অতিহাবিত করছিলেন, সে অবস্থায় ইবরাহীম (আ) কিভাবে তাঁদের খোঁজ-খবর না নিয়ে পারলেন?

উক্ত বর্ণনাসমূহের কিছু অংশ ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কিছু কিছু কথা বিশুদ্ধ হাদীস (মারফূ) থেকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইসরাঈলী বর্ণনায় 'যাবীহ' এর ঘটনা যদিও উল্লেখ নেই। কিন্তু সূরা সাফফাতে যেখানে 'যাবীর' এর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, সে তাফসীরে আমি বিশদভাবে যুক্তি-প্রমাণসহ আলোচনা করেছি যে, হযরত ইসমাঈল (আ) হলেন 'যাবীহুল্লাহ'।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন—

وَ قَالَ اِنِّیْ ذَاهِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۞ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِیْمٍ ۞
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یٰبُنَیَّ اِنِّیْٓ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰی ؕ قَالَ
یٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِیْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِیْنَ ۞ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِیْنِ ۞
وَنَادَیْنٰهُ اَنْ یّٰٓاِبْرٰهِیْمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۞ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا
الْمُبِیْنُ ۞ وَفَدَیْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِیْمٍ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۞ سَلٰمٌ عَلٰٓی اِبْرٰهِیْمَ ۞ كَذٰلِكَ
نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۞ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ ۞ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِیًّا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۞
وَبٰرَكْنَا عَلَیْهِ وَعَلٰٓی اِسْحٰقَ ؕ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِیْنٌ ۞

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।১ তিনি দো'আ করলেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নেক ছেলে দান করুন। (এ দো'আর জবাবে) আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুখবর দিলাম।২ সেই ছেলে যখন তার সাথে দৌড়ঝাঁপ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললেন, বাবা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করেছি। এখন তুমি বল, তুমি কী মনে কর। ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন। শেষ পর্যন্ত যখন দুজনই অনুগত হয়ে মাথা নত করে দিলেন এবং ইবরাহীম তার ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন, তখন আমি আওয়াজ দিলাম, হে ইবরাহীম! আপনি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন।৩ আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটা স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। এক বড় কুরবানী৪ ফিদইয়া হিসেবে দিয়ে আমি ঐ ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম এবং তার প্রশংসা ও গুণচর্চা চিরকালের জন্য পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে দিলাম। ইবরাহীমের উপর সালাম। আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তিনি আমার মু'মিন বান্দাহদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী। আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম।৫ এখন এ দু'জনের বংশধরদের মধ্যে কেউ নেক, আবার কেউ নিজের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী।

–সূরা সাফফাত : ৯৯-১১৩

---

১. অর্থাৎ, আমার রবের খাতিরে বাড়ি ও দেশ ত্যাগ করেছি।

২. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)।

৩. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন এমন দেখানো হয়নি। এ জন্য যখন হযরত ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বলা হলো, 'তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে'।

৪. 'বড় কুরবানী' অর্থ একটি ভেড়া, যাকে ফেরেশতা ইসমাঈলের বদলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সামনে যবেহ করার জন্য পেশ করেছিলেন। একে 'বড় কুরবানী' এই কারণে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দার জন্য তাঁর পুত্রের মতো সবরকারী ও জান কুরবানকারীর বদলে এটা ফিদইয়া (উদ্ধার-মূল্য) ছিল। এটাকে এ কারণেও বড় কুরবানী বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নাত জারি করে দিলেন যে, মুমিনরা ঐ দিনেই সারা দুনিয়ায় পশু কুরবানী করুক এবং পিতা-পুত্রের এ মহান ঘটনা নতুন করে স্মরণ করুক।

৫. অর্থাৎ কুরবানীর এ ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন, "যখন ইবরাহীম (আ) তাঁর নিজ এলাকা ছেড়েছেন, তখন তিনি একটি নেক সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা কাছে আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুসংবাদ শুনিয়ে দেন যে, তাঁর ঔরসে একটি ধৈর্যশালী (জ্ঞানবান) সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। আর তিনিই হলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান ইনিই। ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স হয়েছিল ছিয়াশী বছর। হযরত ইসমাঈল (আ) যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান, এ সম্পর্কে কারও কোনো মতভেদ নেই। হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মতো বয়সে উপনীত হলো", অর্থাৎ যৌবন লাভ করল এবং পিতার সাথে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করল। হযরত মুজাহিদ (রহ)-ও অনুরূপ তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ, যখন তিনি (ইসমাঈল আ.) যুবক হলেন এবং নিজ পিতার সাথে কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করলেন।"

হযরত ইসমাঈল (আ) যখন যৌবনে উপনীত হন, তখন সম্মানিত পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর কলিজার টুকরোকে যবেহ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, "নবীগণের স্বপ্ন ওহী"। ওবায়েদ ইবনে ওমায়েরও এরূপ অভিমত পেশ করেছেন। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বন্ধুর প্রতি এক মহা পরীক্ষা। বহু দো'আর পরে বৃদ্ধ বয়সেই এ কলিজার টুকরাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তিনি কুরবানী করতে প্রস্তুত কিনা। এর পূর্বেও তিনি আরো একটি মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেটা হলো এই যে, তিনি তাঁর প্রিয় স্ত্রী হযরত হাজেরা (আ) ও তাঁর শিশু পুত্রকে নিভৃত নির্জন মরুভূমিতে একাকী অসহায় অবস্থায় রেখে এসেছিলেন। যেখানে না ছিল কোনো মানুষের যাতায়াত, না ছিল কোনো গাছ-পালা ও তরুলতা, না ছিল কোনো নয়ন জুড়ানো বস্তু, না ছিল কোনো ক্ষেত-খামার ও খাদ্য-শস্য এবং না ছিল কোনো দুগ্ধদানকারী পশু। এ অবস্থায় ইবরাহীম (আ) কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁর প্রিয় স্ত্রী ও আদরের সন্তানকে আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানে রেখে আসেন। আল্লাহ তা'আলা সেই নির্জন মরুভূমিতে হযরত হাজেরা ও শিশু ইসমাঈল (আ)-এর খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন এবং তাঁদের বসবাসের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন। যা ছিল তাঁদের কল্পনাতীত। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর জন্য প্রথম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় তিনি পূর্ণ কামিয়াব হলেন। এবার শুরু হলো দ্বিতীয় পরীক্ষা। ইবরাহীম (আ) তাঁর বৃদ্ধ বয়সের অতি আদরের একমাত্র সন্তানকে আল্লাহর রাহে কুরবানী করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হলেন। ইবরাহীম (আ) পুত্রের মায়া মহব্বত সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশ পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে জানালেন। যাতে ইসমাঈল (আ) অত্যন্ত সহজভাবে ও খুশি মনে নিজকে কুরবানীর জন্যে রাজি হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলার এ আদেশের কথা না জানালে হয়তো চাপ প্রয়োগ করে যবেহ করতে হতো। যেটা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রকে বললেন—

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ.

অর্থ : বাবা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি বল, তুমি কী মনে কর। –সূরা সাফ্ফাত : ১০২

ধৈর্যশীল ও জ্ঞানবান পুত্র ইসমাঈল (আ) পিতার আদেশ পালনের জন্যে এগিয়ে আসেন এবং আরয করেন–

يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۞

অর্থ : আব্বাজান! আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন। –সূরা সাফফাত : ১০২

পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের জন্য আন্তরিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। (অর্থাৎ, পিতা পুত্রকে কুরবানী করতে এবং পুত্র নিজে কুরবানী হতে আন্তরিকভাবে মনের খুশিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ۞

অর্থ : শেষ পর্যন্ত যখন দুজনই অনুগত হয়ে মাথা নত করে দিলেন এবং ইবরাহীম তার ছেলেকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। –সূরা সাফ্ফাত : ১০৩

আয়াতে বর্ণিত اَسْلَمَا (তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল)-এর ব্যাখ্যা দু'ধরনের করা হয়েছে। এক প্রকার ব্যাখ্যা হলো, "তারা উভয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে গেল এবং কুরবানীর জন্য দৃঢ় সংকল্প করল।" দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তারা উভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ (ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শুয়ে দিল।)-এর ব্যাখ্যা হলো, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে উপুড় করে শোয়ালেন। এরূপ এ জন্যে করা হলো, যাতে যবেহ করার সময় তাঁর চেহারার উপর দৃষ্টি না পড়ে এবং পুত্রের মায়ায় আবেগাপ্লুত না হয়ে পড়েন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, কাতাদাহ ও যিহাব (রা) তাঁরা সবাই এ মত পোষণ করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এরূপ কাত করে শোয়ায়ে দিয়েছিলেন, মনভাবে কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য কাত করানো হয়। এ সময় তাঁর কপাল মাটির সাথে মিশে রাখা হয়েছিল। এক বর্ণনায় اَسْلَمَا এর ব্যাখ্যা এরূপ করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নাম স্মরণ করেছেন এবং তাকবীর (বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার) বলেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) ও ইবরাহীম (আ) উভয়ে আল্লাহ তা'আলার আদেশ আন্তরিকভাবে পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু ছুরিতে গলা আদৌ কাটল না। এমনকি চামড়ার উপর বিন্দু পরিমাণ দাগও লাগল না। কথিত আছে যে, ছুরি এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গর্দান, এ দুয়ের মাঝে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তামার পাত এসে বাধা হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। এ সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলা হলো—

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞

অর্থ : হে ইবরাহীম! আপনি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই পুরস্কার দিয়ে থাকি। –সূরা সাফ্ফাত : ১০৪–১০৫

অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যে তোমাকে পরীক্ষা করেছি, তা পরিপূর্ণ হয়েছে। তুমি পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি আল্লাহর আদেশ পালন করতে মোটেই দেরি কর নি। তুমি তোমার কলিজার টুকরাকে আল্লাহর রাস্তায় আন্তরিকতার সাথে পেশ করেছ। যেভাবে এর পূর্বে তুমি নিজকে প্রজ্বলিত আগুনে সমর্পণ করেছিলে এবং মেহমানদের জন্য উদার হাতে ব্যয় করেছিলে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই এটা একটা স্পষ্ট পরীক্ষা ছিল। –সূরা সাফ্ফাত : ১০৬

অর্থাৎ, এটা ছিল এমন পরীক্ষা, যার বাহ্যিক বিপদ ও কঠিন সমস্যা ছিল অতীব সুস্পষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। –সূরা সাফ্ফাত : ১০৭

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর পুত্রের কুরবানীর পরিবর্তে একটি অন্য প্রাণী প্রেরণ করলাম। অধিকাংশ আলেমগণ বলেছেন যে, সেটি ছিল সুন্দর চোখ ও শিংবিশিষ্ট একটি সাদা ভেড়া। হযরত ইবরাহীম (আ) সেটিকে সাবীর নামক পর্বতে বাবুল বৃক্ষের সাথে বাঁধা দেখেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, সেই ভেড়াটি বেহেশতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিচরণ করেছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, সে ভেড়াটি বেহেশতে বিচরণ করছিল। এক সময় এটি সাবীর পর্বতে আসে। তার শরীরে ছিল লাল বর্ণের পশম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সেই ভেড়াটি সাবীর পর্বত থেকে বের হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসে। আর এটি ছিল সুন্দর চোখ ও শিংবিশিষ্ট। ইবরাহীম (আ) সেটিকে যবেহ করেন। এই ভেড়াটি হযরত হাবীল (আ)-ও কুরবানী করেছিলেন এবং আল্লাহ তা কবূল করেছিলেন। ইবনে আবী হাতীম এটি বর্ণনা করেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এটিকে মীনায় বসে যবেহ করেছিলেন। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) এটিকে মীনায় বসে যবেহ করেছিলেন। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহ) বলেছেন, মাকামে ইবরাহীমে বসে এটিকে যবেহ করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, এটি ছিল জংলী বকরী।

হযরত হাসান (রা)-এর বর্ণনা মতে সেটি ছিল পাহাড়ী বকরী। সেটির নাম ছিল জাবীর। তবে উল্লিখিত বর্ণনা সঠিক ও বিশুদ্ধ নয়। কারণ উক্ত বর্ণনা অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত।

এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বর্ণনাই যথেষ্ট যে, এটি ছিল একটি মহৎ কাজ ও কঠিন পরীক্ষা। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর মেহেরবাণীতে ভেড়াটি কুরবানী করেন। হাদীসের বর্ণনা অনুপাতে সে পশুটি ছিল ভেড়া।

সাফিয়া বিনতে শায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, বনী সুলায়মার এক মহিলা আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উসমান ইবনে তালহা (রা)-কে ডেকে আনেন। মহিলাটি বলেছেন, আমি হযরত উসামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে কেন স্মরণ করেছেন? হযরত উসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, "আমি যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করি, তখন সেখানে আমি দুটি শিং দেখেছিলাম। আমি সেটাকে ঢেকে রাখার জন্য তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ, মসজিদে এরূপ কিছু থাকা ঠিক নয়, যা নামাযীদের একাগ্রতা নষ্ট করে।"

হযরত সুফিয়ান (রহ) বলেছেন, শিং দুটি কা'বা ঘরে লটকান ছিল। যখন কা'বা ঘরে আগুন লেগেছিল, তখন সে দু'টি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়।

হযরত আব্বাস (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, ভেড়াটির মাথা সর্বদা কা'বা ঘরের এক পাশে ঝুলান থাকত এবং সেটি রৌদ্রের তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল।

কে ছিলেন যাবীহুল্লাহ

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু' পুত্র, ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)। এ দু'জনের মধ্যে ইসমাঈল (আ) যে যাবীহুল্লাহ ছিলেন, তা উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কারণ, তিনি মক্কা শরীফের বাস করতেন। আর হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে কারো জানা নেই যে, তিনি শিশুকালে মক্কা শরীফে তাশরীফ এনেছেন। আর কুরআন মাজীদ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে যাবীহ (কুরবানী) এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন—

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

অর্থ : আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী।

–সূরা সাফ্ফাত : ১১২

এখানে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে 'যাবীহ' বা কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরপর বলেছেন, আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হযরত ইসহাকে জন্মের সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছি। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক বলেছেন—

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

অর্থ : আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী। -সূরা সাফ্ফাত : ১১২

এ ব্যাখ্যার সাথে আয়াত প্রথম ঘটনার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। তাদের এরূপ ব্যাখ্যা ও বৈকরণিক যুক্তি মনগড়া ও বানোয়াট বৈ আর কিছুই নয়। তাদের এ কথাগুলো যে, ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত এবং মনগড়া তা এ কারণেই স্পষ্ট যে, তাদের কিতাবেও বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে তো পরিবর্তন করা হয়েছেই। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর একক পুত্রকে যবেহ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন।

তাদের পরিবর্তনীকৃত তাওরাত কিতাবের এক বর্ণনা মতে আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর প্রথম পুত্র ইসহাককে যবেহ করার জন্য আদেশ দেন। এখানে "ইসহাক" শব্দটি তারা নিজেরা সংযুক্ত করে দিয়েছে। যা একেবারে মিথ্যা ও অপব্যাখ্যা। কারণ, ইসহাক (আ) একক ছিলেন না এবং প্রথমও ছিলেন না। একক বা প্রথম ছিলেন শুধু ইসমাঈল (আ)। কারণ তিনি ছিলেন প্রথম পুত্র ও একক। অতঃপর হযরত ইসহাক (আ) ভূমিষ্ঠ হন। আহলে কিতাবগণ আরবদের প্রতিবশতঃ এরূপ মন্তব্য করেছিল। কারণ, হযরত ইসমাঈল (আ) আরবদের পিতৃপুরুষ। যে আরবগণ পবিত্র হেজাযের অধিবাসী। তাঁদের থেকেই জন্মগ্রহণ করেন আমাদের নবী জনাব সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ। আর হযরত ইসহাক (আ) হলেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর উপাধি ছিল "ইসরাঈল"। যার প্রতি বনী ইসরাঈলগণ নিজেদেরকে সম্বন্ধযুক্ত করে থাকে। এ কারণেই বনী ইসরাঈলগণ চান যে, এ মর্যাদা ও সম্মান নিজেদের পক্ষে আসুক। তারা তাদের এ অসৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়রূপ দেওয়ার জন্য আল্লাহর কালামের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং এতে নিজেদের মনগড়া মিথ্যা উক্তি সংযুক্ত করেছে।

এ মিথ্যা অপবাদকারী বনী ইসরাঈল জাতি একটুও বুঝতে পারল না যে, সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর (কুদরতী) হাতে। তিনি যাকে চান, তাকে তা দান করেন। যারা ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলেন, তারা এ মত সম্ভবত হযরত কা'ব ইবনে আহবার (রা)-এর বর্ণনা থেকে কিংবা আহলে কিতাবের সহীফা থেকে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

"যাবীহুল্লাহ" যে হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের বর্ণনাই যথেষ্ট ও সুস্পষ্ট। কুরআন মাজীদের বর্ণনায় এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'যাবীহুল্লাহ' হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন না। বরং যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

হযরত ইসহাক (আ)-এর আগমন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ ۭ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۝

অর্থ : নিশ্চয়ই তিনি আমার মুমিন বান্দাহদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী। আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম। এখন এ দুজনের বংশধরদের মধ্যে কেউ নেক, আবার কেউ নিজের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী। -সূরা সাফ্ফাত : ১১২-১১৩

লূত জাতির কুফরী ও মহা অপরাধের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ যখন মাদায়েনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সারাহ (আ)-কে হযরত ইসহাকের জন্মের সুখবর জানিয়ে দেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হবে। ইনশাআল্লাহ ॥

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۞ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۞ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۞ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۞ قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ۞

অর্থ : ইবরাহীমের নিকট আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে এল। (ফেরেশতারা) বলল, তোমার প্রতি সালাম। ইবরাহীম জবাব দিলেন, তোমাদের প্রতিও সালাম। তারপর ইবরাহীম তাড়াতাড়ি একটা ভাজা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলেন।১ যখন ইবরাহীম লক্ষ্য করলেন, তাদের হাত খাবারের দিকে এগুচ্ছে না,২ তখন তাদের সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেলেন এবং মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় অনুভব করলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমাদেরকে লূতের কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছে। ইবরাহীমের বিবিও দাঁড়িয়েছিল। এ কথা শুনে সে হাসল। এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কূব সম্পর্কে সুখবর দিলাম। (ইবরাহীমের বিবি) বলল, হায় আমার পোড়া কপাল!৩ আমার কি সন্তান হবে? আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আর আমার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। এটা তো বড়ই আজব কথা। (ফেরেশতারা) বলল, তুমি আল্লাহর হুকুমের উপর অবাক হচ্ছ? হে ইবরীমের পরিবার! তোমাদের উপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত মহান। তারপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুখবরে) তার মন খুশি হলো, তখন তিনি লূতের কাওমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করলেন।৪ –সূরা হূদ : ৬৯-৭৪

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন,

نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۞ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۞ قَالُوْا

---

১. *এ থেকে জানা গেল, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাড়ীতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেন নি। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন এবং তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন।*

২. *এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা।*

৩. *এর অর্থ এই যে, হযরত সারা বন্ধুত এ কথায় খুশি না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, এটা তেমনই একটি কথা।*

৪. *'ঝগড়া করা' শব্দটি এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে যে একান্ত মহব্বতের সম্পর্ক রাখতেন তারই প্রমাণ। এ পর্ব যেন চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে ওঠে যেমন– বান্দাহ ও তার মা'বূদের মধ্যে অনেক সময় ধরে পীড়াপীড়ি চলছে। বান্দাহ জেদ করে বলে, যেভাবেই হোক লূতের কাওমের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেওয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলেন, এ জাতির মধ্যে ভালো বলতে আর কিছু বাকি নেই এবং তাদের অপরাধ এত বেশি যে, তাদের প্রতি কোনো দয়া করা চলে না। কিন্তু বান্দাহ এরপরও বলতে থাকে, "হে প্রভু! যদি সামান্য কিছু ভালোও তাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে আরো কিছু সময় দিন।"*

لَاتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۞ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۞ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۞

অর্থ : (হে মুহাম্মাদ ﷺ)! তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা তার কাছে এল, তখন তাঁকে 'সালাম' বলল। তিনি বললেন, তোমাদেরকে দেখে আমার ভয় লাগছে। তারা বলল, আপনি ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুখবর দিচ্ছি।১ ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি আমাকে এ বুড়া বয়সে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু ভেবেই দেখ, তোমরা আমাকে এ কেমন সুখবর দিচ্ছ? তারা জবাব দিল, আমরা আপনাকে সত্য সুখবরই দিচ্ছি। আপনি নিরাশ হবেন না। ইবরাহীম বললেন, গোমরাহ মানুষ ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়? -সূরা হিজর : ৫১-৫৬

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন—

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۞ فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ۞ فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ۞ فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۞ فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ۞ قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۔

অর্থ : (হে রাসূল!) ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি আপনার কাছে পৌঁছেছে? তারা যখন তাঁর কাছে আসলেন, তখন বললেন, "আপনাকে সালাম জানাই।" তিনি জবাব দিলেন, 'আপনাদের প্রতিও সালাম।" এ লোকেরা অপরিচিত মনে হচ্ছে।২ তারপর তিনি চুপ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং একটা (ভাজা) মোটাতাজা বাছুর এনে তাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, "আপনারা যে খাচ্ছেন না?" তখন তিনি তাদের ব্যাপারে মনে মনে ভয় পেলেন। তারা বললেন "আপনি ভয় পাবেন না"। তারা তাঁকে একটি জ্ঞানী-গুণী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন।৩ এ কথা শুনে তাঁর স্ত্রী চিৎকার দিতে দিতে সামনে এলেন এবং নিজের গাল চাপড়িয়ে বললেন, "এই বুড়ি ও বন্ধ্যার (ছেলে তবে)?"৪ তারা বললেন, তোমার রব তা-ই বলেছেন। তিনি সুকৌশলী এবং মহাজ্ঞানী। -সূরা যারিয়াত : ২৪-৩০

এ ফেরেশতা ছিলেন তিনজন। হযরত জিবরাঈল (আ), হযরত মীকাঈল (আ) ও হযরত ইস্রাফীল (আ)। তাঁরা যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করেন, তখন ইবরাহীম (আ) তাদেরকে দেখেই মনে করেন যে, এরা কোন বিশিষ্ট মেহমান। সুতরাং ইবরাহীম (আ) তাঁদের মেহমানদারীর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন এবং তাঁদের সাথে সেরা আচরণ করেন, যেরূপ আচরণ করা হয়ে থাকে বিশেষ মেহমানের সাথে। ইবরাহীম (আ) নিজ গোয়ালের থেকে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট বাছুর যবেহ করেন। অতঃপর তা ভুনা করে মেহমানদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেটি আহারের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কোনো আগ্রহই দেখতে পান

১. অর্থাৎ, হযরত ইসহাক (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ। সূরা হূদে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এ কথাটির দু' রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে মেহমানদের বলেছিলেন, "আপনাদের সঙ্গে এর আগে কখনো পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, আপনারা বোধ করি এ এলাকায় নতুন তাশরীফ এনেছেন'। দ্বিতীয়ত, তাদের সালামের উত্তর দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) মনে মনে বলেছেন অথবা মেহমানদের খাবার ব্যবস্থা করতে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে নিজের খাদেমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'এরা অচেনা লোক, আগে কখনো এ এলাকায় এ ধরনের শরীফ চেহারা ও চালচলনের লোক দেখা যায়নি'।

৩. সূরা হূদে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, এটা হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ।

৪. অর্থাৎ একে তো আমি বৃদ্ধা, তার উপর বন্ধ্যা। এখন আমার সন্তান কী করে হবে? বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ এবং হযরত সারার বয়স নব্বই বছর ছিল।

নি। কারণ, ফেরেশতা তো মানবীয় চাহিদা থেকে মুক্ত। এতে ইবরাহীম (আ)-এর মনে তাঁদের সম্পর্কে আশংকা হলো। (তিনি চিন্তা করলেন এরা তো আবার দুশমন নয়। কারণ, সে যুগে এক দুশমন অন্য দুশমনের কোনো খাদ্য গ্রহণ করতো না।) ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর আশংকা দূর করার জন্য বললেন, "(হে ইবরাহীম!) ভয় পাবেন না। আমরা (ফেরেশতা) লূত জাতিকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি। -সূরা হুদ : ৭০

এ সময় হযরত সারাহ (আ)-ও মেহমানদের সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন। আরবে তখন মেহমানদের মেহমানদারীর ব্যাপারে এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। হযরত সারাহ (আ) শাস্তির কথা শুনে অত্যন্ত ভয় পেলেন। এতে ফেরেশতাগণ তাঁকে দ্বিতীয় সুখবর শুনালেন। যাতে ভয় দূর হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۔

অর্থ : এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কুব সম্পর্কে সুখবর দিলাম। -সূরা হুদ : ৭১

অর্থাৎ, আমি ফেরেশতাদের মাধ্যমে সারাহ (আ)-কে সুখবর দিলে তিনি চিৎকার করে উঠলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۔

অর্থ : (ইবরাহীমের বিবি) বলল, হায় আমার পোড়া কপাল![১] আমার কি সন্তান হবে? আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আর আমার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। এটা তো বড়ই আজব কথা। -সূরা হুদ : ৭২

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۭ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

অর্থ : (ফেরেশতারা) বলল, তুমি আল্লাহর হুকুমের উপর অবাক হচ্ছ? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের উপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত মহান। -সূরা হুদ : ৭৩

এ সুখবর অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও বিস্মিত করেছিলেন। যে সন্তানের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে দো'আ করেছিলেন, সে সন্তানের সুখবর শুনে ইবরাহীম (আ) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এরূপ আকাঙ্ক্ষিত সুখবর দ্বিতীয়বার শোনার জন্যে মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি বিস্মিত হয়ে ফেরেশতাগণকে বললেন—

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۞ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۞

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি আমাকে এ বুড়ো বয়সে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু ভেবেই দেখ, তোমরা আমাকে এ কেমন সুখবর দিচ্ছ? তারা জবাব দিলো, আমরা আপনাকে সত্য সুখবরই দিচ্ছি। আপনি নিরাশ হবেন না। -সূরা হিজর : ৫৪-৫৫

এরূপে ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দু'বার সুখবর দিয়ে সুসংবাদটিকে মযবূত করেছেন এবং উভয়টিকেই খুশি করেছেন। এই শিশু ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ভাই হযরত ইসহাক (আ)। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা "জ্ঞানী" শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "আমি জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ

১. *এর অর্থ এই নয় যে, হযরত সারা বস্তুত এ কথায় খুশি না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, এটা তেমনই একটি কথা।*

দিলাম।" এ বর্ণনা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসহাক (আ)-এর ধৈর্য ও উচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও ধৈর্যশীলতার কথাও এখানে বলা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলা হয়েছে—

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۔

অর্থ : এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কূব সম্পর্কে সুখবর দিলাম। -সূরা হূদ : ৭১

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাজী (রহ) তাঁর মতের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলেন, "যাবীহুল্লাহ" অবশ্যই হযরত ইসমাঈল (আ)। কারণ, ইসহাক (আ)-কে যবেহ করার নির্দেশ ঠিক নয়। কারণ, তাঁর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ পূর্বেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে। যে সম্পর্কে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

ফেরেশতাদের আতিথেয়তা ও মেহমানদারী সম্পর্কে আহলে কিতাবগণের কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। যেমন তারা বলে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ভুনা বাছুরের সাথে মক্কা থেকে আনীত রুটি, ঘী এবং দুধও ফেরেশতাদের সামনে দিয়েছিলেন। আর তাঁরা (ফেরেশতাগণ) তা খেয়েও ছিলেন। কুরআন মাজীদে যেখানে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা (ফেরেশতাগণ) কিছুই খান নি। সেখানে তাদের এ মন্তব্য মিথ্যা ও কল্পিত ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা এ কথাও বলে থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ধারনা করছিলেন যে, তাঁরা (ফেরেশতাগণ) খানা খাচ্ছেন। কিন্তু সে খানা বাতাসে উড়ে যাচ্ছিল। (এরূপে খানা শেষ হয়ে যায়।) আহলে কিতাবগণের মতে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেন, "তোমার স্ত্রীকে সারা বলে ডেক না। বরং তাঁর নাম হলো সারাহ। আমি তাঁর মাধ্যমে তোমাকে বরকত দিব। তা এরূপ যে, তাঁকে পুত্র সন্তান দান করব। সে পুত্রকেও বরকতময় করব। তাঁর থেকে অনেক জাতির সৃষ্টি হবে এবং সে জাতি থেকে অনেক বাদশাহও হবেন।" হযরত ইবরাহীম (আ) এ খবর শুনে সিজদায় পড়ে যান এবং মনের আনন্দে বললেন, "একশত বছর বয়সের পরে কি আমার (ঔরসে) সন্তান হবে? আর আমার স্ত্রী (সারাহ)-এর থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, এমন সময় যখন তাঁর বয়স নব্বই বছর? হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করেন, হে রাব্বুল আলামীন! আমার পুত্র ইসমাঈল (আ)-ও যদি এরূপ হতো! ইসহাক (আ) থেকে বংশবিস্তারের যেরূপ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, অনুরূপ সুখবর যদি ইসমাঈল (আ)-এর জন্যে হলেও খুব ভাল হতো। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেন, "অবশ্যই তোমার স্ত্রী সারাহ একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, তার নাম হবে ইসহাক। সে এবং তার পরবর্তী বংশধরগণ আমারই অনুগত হবে। (অর্থাৎ আমারই ইবাদত করবে।) ইসমাঈলের ব্যাপারেও আমি তোমার দো'আ কবুল করেছি। তার প্রতি বরকত নাযিল করেছি। তাকে এবং তার সন্তানদেরকেও উচ্চ সম্মান দান করব। তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী বারজন মহা মানব (নেতা) সৃষ্টি হবে। তাঁর বৃহৎ দল (উম্মতে মুহাম্মাদী) হবে। সেই বারজন সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। (যারা হলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন এবং পরবর্তী খলীফাগণ।) আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۔

অর্থ : এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কুব সম্পর্কে সুখবর দিলাম। -সূরা হূদ : ৭১

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও সারাহ (আ) তাঁরা উভয়ে তাঁদের পুত্র ইসহাক (আ) ও ইসহাকের পুত্র ইয়াকুব (আ) দ্বারা সন্তুষ্ট হবেন। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) ও সারাহ (আ)-এর জীবদ্দশাতেই ইয়াকূব (আ)-এর জন্ম হবে এবং তাঁকে দেখে তাঁদের উভয়ের (দাদা-দাদীর) চোখ শীতল হয়ে যাবে ও মন আনন্দে ভরে যাবে। যেরূপ তাঁদের চোখ শীতল হবে পুত্র ইসহাককে দেখে। যদি এরূপ

না হয়, (অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) তাঁর দাদা-দাদীর জীবদ্দশায় জন্ম না হন) তবে তাঁর বংশের সকলের নাম বাদ দিয়ে শুধু ইয়াকূব (আ)-এর নাম বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন, এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর দাদা-দাদী অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ) ও সারাহ (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্ম হবেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ

অর্থ : তারপর আমি (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই হেদায়াত দিয়েছি। –সূরা আনআ'ম : ৮৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۙ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ

অর্থ : যখন ইবরাহীম তাদের থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া তারা যাদের ইবাদত করে তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন, আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি নবী বানালাম।

–সূরা মারইয়াম : ৪৯

হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর দাদা ইবরাহীম (আ) ও দাদী সারাহ (আ)-এর জীবদ্দশায় যে জন্মগ্রহণ করেছেন, তার স্পষ্ট সমর্থন পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীস থেকে।

হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি আরয করলাম, এরপর কোন মসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি আরয করলাম, এ দু' মসজিদের তৈরির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত ছিল? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম, (মর্যাদার দিক দিয়ে) এরপর কোন মসজিদ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যায়, সেখানেই নামায পড়ে নাও। উক্ত মসজিদ ছাড়া সকল মসজিদগুলোই সমান। (তৃতীয় নম্বরে মসজিদে নববী, অন্য হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে।) আহলে কিতাবগণের মতে, বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ)। এ বায়তুল মুকাদ্দাস "ইলিয়া" নামেও পরিচিত। আল্লাহ তা'আলা এ বায়তুল মুকাদ্দাসের মর্যাদা দান করেন।

উক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে তাঁর পৌত্র বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াকূব (আ) ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনা মতে, এটিও স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) (যিনি ইসরাঈল নামেও পরিচিত) হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর কা'বা নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে বায়তুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। আর এ উভয় নির্মাণের সময় হযরত ইসহাক (আ) জীবিত ছিলেন। কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ۝ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ

تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۚ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۞

অর্থ : ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম দো'আ করেছিলেন, "হে আমার রব! এ শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ শহর বানাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও।" হে আমার রব! এ সব মূর্তি বহু লোককে গোমরাহ করে ফেলেছে (হয়তো আমার সন্তানদেরকেও গোমরাহ করে দিতে পারে, তাই তাদের মধ্যে) যারা আমার পথে চলে তারাই আমার মধ্যে গণ্য। আর যারা আমাকে অমান্য করে (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে আমার রব! আমি আমার সন্তানদের এক অংশকে তোমার সম্মানিত ঘরের পাশে এক অনাবাদি জায়গায় এনে বসতি স্থাপন করেছি। আমি এজন্যে এটা করেছি, যাতে এরা এখানে নামায কায়েম করে। তাই তুমি জনগণের দিলকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে খাবার জন্যে ফল দাও। হয়তো তারা শুকরিয়া আদায় করবে। হে আমার রব! আমরা যা গোপনে করি ও প্রকাশ্যে করি সবই তুমি জানো। আর বাস্তবে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই আল্লাহর কাছ থেকে গোপন নেই। আমি ঐ আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাকে এ বুড়ো বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাকের মতো ছেলে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দো'আ শুনেন। হে আমার রব! আমাকে নামায কায়েমকারী বানাও এবং আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও (এমন লোক সৃষ্টি কর, যারা এ কাজ করবে)। হে আমার রব! তুমি আমার দো'আ কবুল কর। হে আমাদের রব! যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে[১] এবং সকল ঈমানদার লোকদেরকে মাফ করে দিও। –সূরা ইবারাহীম : ৩৫–৪১

বৃদ্ধ বয়সে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা যে দু'টি পুত্র সন্তান [ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-কে দান করেছেন, তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলার কাছে তিনি এ দো'আ করেছিলেন।]

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ) যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন, তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন। যার বিশদ আলোচনা আমি নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় করেছি।

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ) আপন জন্মভূমি থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর পিতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, "আমি আপনার জন্য আমার রবের কাছে মাফ চাইব।" (সূরা মারইয়াম : ৪৭) সেই ওয়াদার কারণে তিনি নিজের গুনাহ মাফ চাওয়ার সাথে তাঁর পিতার জন্যও মাফ চাইলেন। পরে যখন তিনি জানলেন, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন ছিল, তখন তিনি তাঁর পিতার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। (সূরা তাওবা : ১১৪)

২. আগে থেকে চলে আসা কথা থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর মতো নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েন নি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার এমন কোনো সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই, যে সম্পর্কে তাফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ)-এর দো'আর এই ভাষা "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও, যা আমার পরে কারো জন্য শোভনীয় হবে না' থেকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা অনুমান করা যায়– যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, তবে স্পষ্টত মনে হবে তাঁর মনে হয়তো এ ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর পুত্র যেন তাঁর রাজত্বের ওয়ারিশ হয় এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশধারার মধ্যে থাকে। এটাকেই আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য 'পরীক্ষা ছিল' বলেছেন। এ সম্পর্কে তিনি তখনই টের পেয়েছেন ও সতর্ক হয়েছেন, যখন তাঁর ছেলে রোবআম এমন এক না-লায়েক অযোগ্য নওজোয়ান হিসেবে গড়ে উঠল, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কাররূপে বোঝা গেল, সে দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না। তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ রাখার অর্থ সম্ভবত এই যে, যে পুত্রকে তিনি নিজ সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল বোকা, অযোগ্য ও কাঠের পুতুল মাত্র।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۔

অর্থ : হে আমার রব! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারো থাকা উচিত হবে না। নিশ্চয়ই আপনি আসল[১] দাতা। -সূরা সোয়াদ : ৩৫

এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ঘটনায় বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ।

"হযরত সোলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ নির্মাণ করেন।" হাদীসের মধ্যে যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়, এর অর্থ এই যে, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন। এর পূর্বে এটি নির্মিত ছিল। যেমন হাদীসে পূর্বেই বর্ণিত আছে যে, উভয় মসজিদের নির্মাণের মধ্যে সময়ের দূরত্ব ছিল চল্লিশ বছর। কিন্তু এ কথা কেউ বলেন না যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও সোলায়মান (আ) এ দু' জনের মধ্যে চল্লিশ বছর ব্যবধান ছিল। শুধু হযরত ইবনে হিব্বান (রহ) তাঁর তাকসীম ও আনওয়া গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। আর অন্য কেউই এ মত সমর্থন করেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, হযরত সোলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মাণ করেছিলেন।

কা'বা ঘর নির্মাণ

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۞ وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ۞

অর্থ : (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে এ ঘরের (কা'বাঘর) জায়গা ঠিক করে দিয়েছিলাম (এই হেদায়েতের সাথে যে) আমার সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, নামাযে দাঁড়ানো লোক ও রুকু'-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন। আর আপনি সকল মানুষকে হজ্জের জন্য ডাক দিন। তারা (এ ডাকে সাড়া দিয়ে) দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে আসবে।

-সূরা হাজ্জ : ২৬-২৭

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ইবাদত ঘর তৈরি হয় তা ঐ (ঘরই), যা মক্কায় আছে। তাকে বরকত দান করা হয়েছেন এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানানো হয়েছেন। এর মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে[১] ও ইবরাহীমের ইবাদতের জায়গা রয়েছে। আর এর অবস্থা এমন, যে এর মধ্যে ঢুকল সে-ই নিরাপদ হয়ে

১. অর্থাৎ, এ ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ ঘরটি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে এবং এ ঘরকে আল্লাহ তাআলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। ধূসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে কায়েম করে আল্লাহ তাআলা এর চারপাশের মানুষের রুজি-রোজগারের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত জাহেলী যুগে সারা আরব দেশে চরম অশান্তি ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশেও কা'বা ও কা'বার চারদিকে এমন একটি এলাকা ছিল, যেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকত। এটা কা'বারই বরকত ছিল যে, বছরে চার মাস কাল এ ঘরেরই উসিলায় সারাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকত। এছাড়া মাত্র ৫০ বছর আগে সবাই দেখেছে, আবরাহা যখন কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শহর আক্রমণ করেছিল তখন তার, সেনাবাহিনী কীভাবে আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা জানত এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় এ ঘটনার বহু সাক্ষী আরবে মওজুদ ছিল।

গেল। মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার আছে, যে এ ঘরে পৌঁছার ক্ষমতা রাখে সে যেন হজ্জ করে। আর যে হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে তার জানা উচিত, আল্লাহ দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী নন। আপনি বলুন, আহলে কিতাব! তোমরা কেন আল্লাহর কথা মানতে অস্বীকার করছ? তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ সব দেখছেন। –সূরা আলে ইমরান : ৯৬–৯৮

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় বর্ণনা করেন—

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

অর্থ : মনে করে দেখ, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কতক বিষয়ে যাচাই করলেন এবং সব বিষয়েই তিনি সফলকাম হলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি আপনাকে সব মানুষের নেতা বানাতে চাই।" ইবরাহীম বললেন, "আমার সন্তানদের বেলায়ও কি এ ওয়াদা রয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে নয়।"[১] আরো মনে কর, যখন আমি এই (কা'বা) ঘরকে জনগণের জন্য কেন্দ্র ও নিরাপদ জায়গা বানিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে হুকুম দিলাম, "ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ান সে জায়গাকে স্থায়ী জায়নামায বানিয়ে নাও।" আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ দিয়েছিলাম যে, "আমার এ ঘরকে তাওয়াফ, ই'তিকাফ, রুকু' ও সিজদাকারীদের জন্য পাক-পবিত্র করে রাখুন।" এ কথা মনে কর, যখন ইবরাহীম দোআ করলেন, "হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ বানাও এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে মানে তাদেরকে সবরকম ফল রিযক হিসেবে দান কর।" তখন এর জবাবে তার রব বলেন, যে কুফরী করবে তাকেও আমি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের জীবিকা দান করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে দোযখের আযাবের দিকে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব। আর তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা। আরো মনে কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের দেয়াল তৈরি করছিলেন, তখন তারা দোআ করেছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের এ খিদমত কবুল করো। তুমি সবকিছু শোন ও জান। হে আমাদের রব! আমাদের দু'জন তোমার অনুগত বানাও। আমাদের বংশ থেকে এমন এক জাতি বানাও, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদতের নিয়ম শেখাও এবং আমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ কর। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। হে আমাদের রব! তাদের জন্য তাদেরই জাতির মধ্য থেকে এমন

১. অর্থাৎ এ ওয়াদা তোমার বংশের শুধু সে সব লোকদের পক্ষে দেওয়া হয়েছে, যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা যালিম, এ ওয়াদা তাদের জন্য নয়। এখানে 'যালিম' শব্দের অর্থ শুধু মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়, এর দ্বারা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার বিরোধীকেও বোঝানো হয়েছে।

এক রাসূল পাঠিয়ে দিও, যিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন এবং তাদের জীবনকে পবিত্র করে গড়ে তুলবেন। তুমি বড়ই শক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। -সূরা বাকারা : ১২৪-১২৯

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা, রাসূল ও প্রিয় বন্ধু এবং নবীর পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি এই প্রাচীন ঘর (বায়তুল্লাহ) নির্মাণ করেন। যে গৃহটি পৃথিবীর সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রথম মসজিদ ও পবিত্র ঘর হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। যাতে সকল মানুষ এ পবিত্র ঘরে এসে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হযরত ইবরাহীম (আ) এ ঘর নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। আকাশ ও যমীন সৃষ্টির বর্ণনায়, আমি উল্লেখ করেছি যে, হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন যে, কা'বা ঘর 'বায়তুল মামূর' বরাবর নীচে অবস্থিত।

(বায়তুল মামূর হচ্ছে ফেরেশতাদের জন্য বায়তুল্লাহ সদৃশ। প্রতিবার সত্তর হাজার ফেরেশতা সে ঘরের {বায়তুল মামূরের} তাওয়াফ করে। একবার যারা তাওয়াফ করে দ্বিতীয়বার তারা তাওয়াফ করার সুযোগ পাবে না।) এ বায়তুল মামূরের বরাবর নিচে যমীনে বায়তুল্লাহ (কা'বা ঘর) এরূপে অবস্থিত যে, যদি বায়তুল মামূর নিচে পতিত হয়, তবে তা সোজা বায়তুল্লাহর উপরই পতিত হবে।

এরূপভাবে, সাত আসমানের প্রতিটি আসমানে এ বরাবর একটি ইবাদতখানা (মসজিদ) রয়েছে। কোনো কোনো বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, প্রতিটি আকাশে একটি ঘর রয়েছে। আকাশের অধিবাসীরা সেই ঘরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। আর বায়তুল মামূর আকাশের এমন একটি পবিত্র ঘর, যেমন বায়তুল্লাহ (কা'বা ঘর) পৃথিবীর পবিত্র ঘর। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এ নির্দেশ দেন যে, "আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতের তজন্য যেরূপ একটি ঘর রয়েছে, অনুরূপ একখানা ঘর যমীনবাসীদের জন্য যমীনে নির্মাণ কর।" তারপর পূর্বনির্ধারিত জায়গার কথা জানিয়ে দেন। এ জায়গায় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় বায়তুল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছিল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার দিবসে এ ঘর (বায়তুল্লাহ)-কে মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের কারণে এ ঘর (বায়তুল্লাহ) কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত ঘর হিসেবেই থাকবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় নি যে, বায়তুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে নির্মিত হয়েছে। যারা এরূপ মত ব্যক্ত করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। তারা সূরা হজ্জের ২৬ নং আয়াতের 'ঘরের স্থান' দ্বারা দলীল পেশ করে থাকে। তারা এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, প্রথমতঃ সেখানে ঘর বা ভিত্তি ছিল। তার উপরে হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ কাজ করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আদৌ ঠিক নয়। কারণ, এর ব্যাখ্যা এরূপ যে, 'ঘর' নির্মাণের স্থান প্রথমেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত করে রেখেছেন। কিন্তু তা নির্মিত ছিল না। উল্লিখিত আয়াতে 'ঘরের স্থান' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সেই (বায়তুল্লাহর) স্থানটি আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে নির্ধারিত করা ছিল এবং হযরত আদম (আ) থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত সকলেই এ পবিত্র স্থানটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। পরবর্তীতে কা'বা ঘর নির্মিত হওয়ার পরে এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত আদম (আ) সেখানে একটি গম্বুজ নির্মাণ করেছেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁকে বলেছিলেন যে, আমরা আপনার পূর্বে এ ঘরের তাওয়াফ করেছি। হযরত নূহ (আ)-এর কিস্তিও প্রায় চল্লিশদিন এ ঘরের চার পাশ প্রদক্ষিণ করেছে। কিন্তু এ সমস্ত বর্ণনা বনী ইসরাঈলের বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে আমাদের অভিমত হলো এই যে, তাদের কথা (বর্ণনা) আমরা মিথ্যাও বলব না ও সত্যও জানব না। তাদের বর্ণনা থেকে কোনো দলীল গ্রহণ করাও যাবে না। তবে কুরআন ও হাদীসের মোকাবিলায় তাদের বর্ণনা ও দলীল সবকিছুই পরিত্যাজ্য। (অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনার বিপরীত যদি তাদের কোনো বর্ণনা হয়, তবে তা অবশ্যই মিথ্যা এবং তা পরিত্যাজ্য।)

প্রসঙ্গত : আলোচনা ঃ আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ইবাদত ঘর তৈরি হয় তা ঐ (ঘরই), যা মক্কায় আছে। তাকে বরকত ন করা হয়েছিল এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানানো হয়েছিল। –সূরা আলে ইমরান : ৯৬

অর্থাৎ, সকল মানুষের সত্য পথপ্রদর্শন ও বরকতের জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি তৈরি করা হয়েছিল, তা মক্কায় বস্থিত। এক বর্ণনা মতে 'বাক্কা' দ্বারা কা'বা ঘরকে বুঝানো হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ

অর্থ : এর মধ্যে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে[১] ও ইবরাহীমের ইবাদতের জায়গা রয়েছে। –সূরা আলে ইমরান : ৯৭

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত কা'বা ঘরে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। তার মধ্যে একটি নিদর্শন হলো, 'মাকামে ইবরাহীম'। মাকামে ইবরাহীম হলো সেই পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বার প্রাচীর উঁচু করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিচে দাঁড়িয়ে কা'বার প্রাচীরের নির্মাণ কাজ করেন। এ পাথরখানা হযরত ইসমাঈল (আ) এনে দিলেন, যাতে পিতা ইবরাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে প্রাচীর উঁচু করতে পারেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে– এ পাথরখানা সেই সময় থেকে হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর শাসনকাল পর্যন্ত কা'বার প্রাচীরের সাথে লাগান ছিল। হযরত ওমর (রা) তাওয়াফকারীদের তাওয়াফ করার সুবিধার্থে পাথরখানা সেখান থেকে একটু সরিয়ে দেন।

হযরত ওমর (রা)-এর যতগুলো কাজের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সম্মতি ছিল, তন্মধ্যে এটিও একটি। যেমন– একবার হযরত ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যদি আমরা "মাকামে ইবরাহীমকে" নামাযের স্থানরূপে বানিয়ে নিতাম, তবে ভালই হতো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ রইলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন—

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى.

অর্থ : তোমরা ইবরাহীম যেখানে ইবাদতের জন্য দাঁড়ান সে জায়গাকে স্থায়ী জায়নামায বনিয়ে নাও।

–সূরা বাকারা : ১২৫

এ "মাকামে ইবরাহীমের" পাথরের উপর আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের চিহ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে এখন পর্যন্ত বাকি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে জনাব আবূ তালিব "কাসিদায়ে লামিয়া" নামে দীর্ঘ এক কবিতা লিখেছেন। সে কবিতার একটি লাইন এই যে—

وَمَوْطِئُ اِبْرَاهِيْمَ فِى الصَّخْرِ رُطْبَةً * عَلٰى قَدَمَيْهِ حَافِيًا غَيْرَ نَاعِلٍ.

১. অর্থাৎ, এই ঘরে এরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ ঘরটি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে এবং এ ঘরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত ও মর্যাদা দান করেছেন। ধূসর মরুভূমির বুকে এ ঘরকে কায়েম করে আল্লাহ তা'আলা এর চারপাশের মানুষের রুজি-রোজগারের চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত জাহেলী যুগে সারা আরব দেশে চরম অশান্তি ছিল। কিন্তু সেই অশান্তি ও হাঙ্গামাময় পরিবেশেও কা'বা ও কা'বার চারদিকে এমন একটি এলাকা ছিল, যেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকত। এটা কা'বারই বরকত ছিল যে, বছরে চার মাস কাল এ ঘরেরই উসিলায় সারাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকত। এছাড়া মাত্র ৫০ বছর আগে সবাই দেখেছে, আবরাহা যখন কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা শহর আক্রমণ করেছিল, তখন তার সেনাবাহিনী কীভাবে আল্লাহর গযবে পড়ে ধ্বংসে হয়ে গিয়েছিল। সে সময় আরবের প্রতিটি শিশুও এ ঘটনা জানত এবং এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় এ ঘটনার বহু সাক্ষী আরবে মওজুদ ছিল।

অর্থ : আর পাথরের উপর ইবরাহীম (আ)-এর জুতাবিহীন নগ্ন পায়ের চিহ্ন এখনো স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ, পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করার সময় ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর পবিত্র পা জুতাবিহীন অবস্থায় পাথরের মধ্যে কিছু প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই চিহ্ন এখনো বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۔

অর্থ : আরো মনে কর, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এ ঘরের দেয়াল তৈরি করেছিলেন, তখন তারা দোআ করেছিলেন, হে আমাদের রব! আমাদের এ খিদমত কবুল করো। তুমি সবকিছু শোন ও দেখ। –সূরা বাকারা : ১২৭

ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর উপরোক্ত আবেদনের মাধ্যমে, তাঁদের আন্তরিকতা ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যতা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের কামনা ও বাসনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তারা কঠোর চেষ্টা পরিশ্রমের সাথে কা'বা ঘরের দেয়াল নির্মাণের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দো'আ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাদের এ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম মেহেরবানী করে গ্রহণ করুন।

তাঁরা এ দো'আর পরেই পুনরায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেন—

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۠ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার অনুগত (মুসলিম) বানাও। আমাদের বংশ থেকে এমন এক জাতি বানাও, যারা তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদতের নিয়ম শেখাও এবং আমাদের দোষত্রুটি মাফ কর। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। –সূরা বাকারা : ১২৮

মোটকথা হযরত ইবরাহীম (আ) ভূপৃষ্ঠে উৎকৃষ্ট স্থানে একখানা অতি মর্যাদাসম্পন্ন বিশাল মসজিদ তৈরি করেন। সে স্থানটি ছিল জনশূন্য মরুভূমি এলাকা। ইবরাহীম (আ) তাঁর সেখানকার পরিবার-পরিজনের জন্য বরকতের দো'আ করেন এবং হালাল রিযিকের জন্যও দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা ফলের দ্বারা তাঁদের রিযিক দান করেন। তিনি আল্লাহর কাছে এ দো'আও করেন যে, হে আল্লাহ! এ নির্জন মরুভূমি অঞ্চলটিকে সম্মানিত ও নিরাপদ স্থানে পরিণত করুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুর দো'আ কবুল করেন। সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার জন্যে, যিনি আহ্বানকারীর আহ্বান শোনেন ও কবুল করেন এবং যিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাঁর কামনা ও বাসনা পুরা করেছেন।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে এর ঘোষণাও দিয়েছেন—

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۔

অর্থ : তারা কি দেখতে পায় না যে, আমি একটি নিরাপদ হারাম বানিয়ে দিয়েছি? অথচ তাদের আশ-পাশের লোকদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।[১] –সূরা 'আনকাবূত : ৬৭

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা দিয়েছেন যে—

---

১. *অর্থাৎ তাদেরই এ শহর মক্কাকে, যার আশ্রয়ে তারা পূর্ণ নিরাপদে আছে– কোনো 'লাত' বা 'হোবল' দেবতা কি হারাম শরীফ বানিয়েছে? আরবের চরম নিরাপত্তাহীন ও অশান্তিপূর্ণ পরিবেশে মক্কাকে সব রকমের ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় থেকে ২৫০০ বছর যাবৎ হেফাযতে রাখা কি কোনো দেব বা দেবীর সাধ্য ছিল? এ জায়গায় পবিত্রতা ও নিরাপত্তা যদি আমি বজায় না রেখে থাকি, তাহলে কে রেখেছে?*

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : (এটা কি সত্য নয় যে) আমি একটি নিরাপদ হারাম (এর এলাকাকে) তাদের বাসস্থান বানিয়ে দিয়েছি, যার দিকে আমার পক্ষ থেকে রিযক হিসেবে সব রকম ফল-ফসল ধেয়ে চলে আসে? কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই জানে না।[১] –সূরা কাসাস : ৫৭

উক্ত দো'আ ব্যতীতও হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি উত্তম ও সুন্দর দো'আ করেছিলেন যে, আল্লাহ যেন তাদের মধ্যে তাদেরই থেকে এরূপ একজন রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি হবেন বিশুদ্ধ আরবী ভাষী। যাতে করে তাঁর উপর দুনিয়া ও আখিরাতের নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুর মনের এ বাসনাটি পুরা করেন। তিনি (আল্লাহ) একজন রাসূল তাঁদের থেকেই তাঁদের মাঝে (অর্থাৎ, মক্কাবাসীদের কাছে) প্রেরণ করেন। যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। যার আবির্ভাবের মাধ্যমে নবী-রাসূল আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তাঁকে দ্বীনে কামেল (পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা) দান করা হয়, যা ইতিপূর্বে কোনো নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয় নি। এ মহানবীর দাওয়াত সর্বকালের, সর্বযুগের ও গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য বিস্তৃত ছিল। এ দাওয়াতের জন্য ছিল না কোনো আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা। অর্থাৎ, এ দাওয়াত কোনো অঞ্চল, বর্ণ, গোত্র এবং দলের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং এ দাওয়াত ছিল বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর এ দাওয়াত পৃথিবীর সর্বত্র চলবে। সমস্ত নবী-রাসূলের মধ্যে এটা ছিল মহানবী ﷺ-এর বিশেষ গুণ। সর্বদিক দিয়েই তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁর উপর প্রেরিত কুরআন মাজীদও ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ। তাঁর ভাষা ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সহীহ বা শুদ্ধ ভাষা। এ মহানবী ﷺ তাঁর পাপী উম্মতদের প্রতি অতীব দয়ালু ও রহম দিল। তাঁর মাতা-পিতাও ছিলেন অতি সম্মানিত এবং তাঁর জন্মভূমিও শ্রেষ্ঠস্থান।

এ কারণেই আল্লাহর ঘর (বায়তুল্লাহ) সর্বপ্রথম নির্মাণকারী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকেই পয়দা করেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত কা'বা ঘর আকাশবাসীদের কা'বা বায়তুল মামূরের মর্যাদা লাভ করে। বায়তুল মামূর আকাশবাসীদের জন্য বায়তুল্লাহ সদৃশ। যে বায়তুল মামূরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে তাওয়াফ করেন ও ইবাদত করেন। এ প্রবেশকারী ফেরেশতাগণ কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর প্রবেশের সুযোগ পাবেন না। বায়তুল্লাহ নির্মাণ সম্পর্কিত আলোচনা আমি সূরা বাকারার তাফসীরে উল্লেখ করেছি এবং এ সম্পর্কিত হাদীস ও বুযুর্গদের বর্ণনাও পেশ করেছি। যারা জানতে আগ্রহী, তারা সেখানে তা দেখে নিতে পারেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্যে।

সুদ্দী (রহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণের আদেশ দেন, তখন তাঁদের জানা ছিল না যে, কা'বা ঘরের স্থান কোনটি। আল্লাহ তখন খাজুজ নামক এক বায়ু প্রেরণ করেন। তার দুটি পাখা এবং সর্পাকৃতির মতো মাথা ছিল। সে (খাজুজ) কা'বা ঘরের চারপাশ পরিষ্কার করে প্রাচীন কা'বার জায়গাটি প্রকাশ করে দেয়। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) সেখানে মাটি খনন করে কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

অর্থ : যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান। –সূরা হাজ্জ : ২৬

১. এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রথম ওযরের জবাব। এখানে বলা হয়েছে, এ হারাম শরীফ যার শান্তি, নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার বদৌলতে আজ তোমরা এতটা যোগ্য বিবেচিত হয়েছ, সারা দুনিয়ায় ব্যবসায়ের পণ্য এ চাষাবাদহীন এলাকায় চলে আসছে, এ শহরের নিরাপত্তা ও কেন্দ্রীয় মর্যাদা কি তোমাদের চেষ্টা-তদবিরের ফলে ঘটেছে?

যখন ভিত্তি উঠে গেল এবং তস্ত তার কাজ শুরু হলো, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে বললেন, হে আমার ছেলে! এখানে রাখার জন্যে তুমি একখানা উৎকৃষ্ট পাথর নিয়ে এস। হযরত ইসমাঈল (আ) অত্যন্ত ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় আরয করেন, পরিশ্রমের কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। পিতা বললেন, চল, আমি এর ব্যবস্থা করব। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে হযরত জিবরাঈল (আ) হিন্দুস্তান থেকে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) নিয়ে আসেন। তখন পাথরটি কালো ছিল না। বরং সাদা ইয়াকূত পাথর ছিল। এটি ছিল "সিগামা" ঘাসের সদৃশ সাদা। হযরত আদম (আ) জান্নাত থেকে এ পাথরখানাসহ যমীনে অবতরণ করেন। মানুষের পাপ ধারণ করার কারণে পাথরটি পরবর্তী সময় কালো হয়ে যায়। এর মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-ও অন্য একখানা পাথর নিয়ে আসেন। পিতার কাছে এ পাথরখানা (হাজরে আসওয়াদ) দেখে জিজ্ঞেস করেন, হে আমার পিতা! এ পাথর কে নিয়ে এসেছে? পিতা উত্তরে বললেন, এ পাথরখানা যিনি নিয়ে এসেছেন, তিনি তোমার চাইতে অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন।

অতঃপর পুনরায় উভয়ে কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজে মগ্ন হয়ে যান এবং নির্মাণের সময় এ দো'আ পাঠ করতে থাকেন--

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে এই খেদমতটুকু কবুল করুন নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

ইবনে আবূ হাতিম (রহ) বলেছেন, কা'বা ঘর পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা তৈয়ার করা হয়েছে। (সে পাহাড়গুলো হলো হেরা, যাইতূন, জাবাল, লুবানান ও তূরে সীনা পর্বত।)

হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসমাঈল (আ) যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন, তখন এ পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন যুলকারনাইন। তিনি (বাদশাহ) একবার কা'বা ঘরের পার্শ্ব দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁরা নির্মাণ কাজে মগ্ন ছিলেন। বাদশাহ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কাজ করার জন্য কে তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছে? হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। বাদশাহ বললেন, তোমাদের কথার সত্যায়ন কে করবে? তখন পাঁচটি ভেড়া সত্যতার সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এ কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। তখন বাদশাহ যুলকারনাইন ঈমান আনেন এবং তাঁদের কথা বিশ্বাস করেন।

আযরাকী (রহ) বলেছেন, হযরত যুলকারনাইন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে কা'বা ঘরের তাওয়াফও করেছিলেন। এরপর দীর্ঘকাল যাবৎ বায়তুল্লাহ অনুরূপভাবেই বিদ্যমান থাকে, যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন। তারপর কুরাইশগণ তা পুনঃনির্মাণ করেন। তারা (কুরাইশগণ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত কা'বা ঘরের উত্তর দিক দিয়ে, যেদিকে সিরিয়া অবস্থিত কিছু ভিত্তি কমিয়ে দেন।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাঁকে) বলেছেন, (হে আয়েশা!) তুমি কি দেখ নি যে, তোমার জাতির লোকেরা যখন কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করবেন, তখন তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে কিছু কমিয়ে দিয়েছেন। (আয়েশা (রা) বলেন) আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ইবরাহীম (আ)-এর সেই ভিত্তির উপর কা'বা ঘরকে কেন আপনি পুণঃনির্মাণ করেন নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার জাতির লোকজন যদি কুফরী যুগের কাছাকাছি না হতো, তবে আমি সেরূপ করে দিতাম। অন্য এক বর্ণনা মতে, যদি তোমার জাতি জাহেলী যুগের কাছাকাছি না হতো অথবা কুফরীর কাছাকাছি না হতো, তবে আমি কা'বা ঘরের ধনভাণ্ডারের সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিতাম এবং ঘরের দরজা যমীন বরাবর করে দিতাম এবং কমিয়ে দেয়া "হিজর" অংশটুকু কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। পরবর্তীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) তাঁর শাসনামলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরকে যেরূপ নির্মাণ করতে চেয়েছেন, অনুরূপভাবেই পুনঃনির্মাণ করেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (কা'বা ঘর বৃদ্ধি করে নির্মাণের) এ ইচ্ছাটি তাঁর খালা হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে জানিয়েছিলেন। হিজরী ৭৩ সালে হাজ্জাজ তাঁকে শহীদ করে খলীফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে পত্র

লিখেন। এরপর খলিফা কা'বা ঘরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে পুনঃনির্মাণের জন্য তাদের আদেশ দেন। এ আদেশ অনুযায়ী দ্বিতীয়বার উত্তর দেয়াল ভেঙে দিয়ে সেখান থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হয় এবং দেয়াল বন্ধ করে দিয়ে পাথরখানা কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে রাখা হয়। তারপর দক্ষিণ দিকের দরজা উঁচু করে দেয়া হয় এবং পশ্চিম দিকে দরজা একেবারে বন্ধ করে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

পরে যখন আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের লোকেরা জানতে পারল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর কাছে হযরত আয়েশা (রা) বলেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘর এভাবে সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। সে বর্ণনা অনুযায়ী আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এ কাজটি করেছিলেন, তখন তারা খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো এবং তারা এ বলে আফসোস করল যে, "আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) যেভাবে সংস্কার করেছিলেন, সেভাবে কা'বা ঘর রেখে দিলেই ভাল হতো।

তারপর যখন মাহদী ইবনে মানসূর খলীফা হন, তখন তিনি হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাসের (রা) কাছে পরামর্শ চান যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) যেভাবে কা'বা ঘর সংস্কার করেছিলেন, অনুরূপ কা'বা ঘর পুণঃনির্মাণ করলে কেমন হয়? হযরত ইবনে মালেক ইবনে আনাস (রা) বললেন, এতে আমার আশংকা হয় যে, রাজা বাদশাহগণ কা'বা ঘরকে খেলার বস্তুতে পরিণত করবে। অর্থাৎ, যখনই কোনো বাদশাহ আসবে, সে নিজ ইচ্ছামতো কা'বা ঘর সংস্কার করবে। সুতরাং ইমাম সাহেব সেই অবস্থায়ই কা'বা ঘর রেখে দিতে বললেন। তারপর কা'বা ঘর সে অবস্থায়ই রাখা হয় এবং আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ও রাসূল ﷺ-এর হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذِ ابْتَلٰٓى إِبْرٰهِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِينَ ۔

অর্থ : মনে করে দেখ, যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কতক বিষয়ে যাচাই করলেন এবং সব বিষয়েই তিনি সফলকাম হলেন, তখন তিনি বললেন, "আমি আপনাকে সব মানুষের নেতা বানাতে চাই"। ইবরাহীম বললেন, "আমার সন্তানদের বেলায়ও কি এ ওয়াদা রয়েছে?" তিনি জবাব দিলেন, "আমার ওয়াদা যালিমদের ব্যাপারে নয়।"[১] –সূরা বাকারা : ১২৪

হযরত ইবরাহীম (আ) যখন তাঁর রবের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং তাঁর আদেশ যথাযথভাবে পালন করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মানবজাতির নেতা ও পথ প্রদর্শক বানিয়েছেন। তারপর ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেন যে, এ নেতৃত্ব ও মর্যাদা তাঁর বংশধরদের মধ্যেও যেন জারি থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দো'আও কবুল করেন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এই নেতৃত্ব দান করেন। কিন্তু এ নেয়ামত থেকে অত্যাচারী লোকদেরকে বঞ্চিত রাখেন। কেবল তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার আলেম, তাঁদেরকেই এ মর্যাদাসম্পন্ন নেতৃত্বের জন্য মনোনয়ন করেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَءَاتَيْنٰهُ أَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهٗ فِى الْءَاخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ۔

১. অর্থাৎ এ ওয়াদা তোমার বংশের শুধু সেসব লোকদের পক্ষে দেওয়া হয়েছে, যারা সৎ। তাদের মধ্যে যারা যালিম এ ওয়াদা তাদের জন্যে নয়। এখানে 'যালিম' শব্দের অর্থ শুধু মানুষের উপর অত্যাচারকারী নয়, এর দ্বারা সত্য ন্যায়পরায়ণতার বিরোধীদেরকেও বোঝানো হয়েছে।

অর্থ : আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব (এর মতো সন্তান) দান করেছি এবং তারই বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছি। আর আমি দুনিয়াতেই তাকে তার বদলা দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি আখিরাতে নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। -সূরা 'আনকাবূত : ২৭

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۭ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ۭ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ۭ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَمِنْ اٰبَاۗىِٕهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অর্থ : তারপর আমি (ইবরাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকুবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই হেদায়াত দিয়েছি। (তাদেরকে আমি) ঐ হেদায়াতই দিয়েছি, যা এর আগে নূহকে দিয়েছিলাম। আমি তাঁরই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে (হেদায়াত দিয়েছি)। এভাবেই আমি নেক লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দিয়ে থাকি। (তাঁরই বংশের) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলইয়াসকে (পথ দেখিয়েছি)- তাদের প্রত্যেকেই নেককারদের মধ্যে শামিল ছিল। (ঐ বংশেরই) ইসমাঈল, আল ইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। এদের প্রত্যেককে আমি দুনিয়ার সবার উপর ফযীলত দান করেছি। এমনকি তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোনদের মধ্যে অনেককেই আমি ফযীলত দিয়েছি। তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছি ও সরল-সঠিক পথের দিকে হেদায়াত করেছি। -সূরা আন'আম : ৮৪-৮৭

নূহ (আ)-এর পরে যে সমস্ত পয়গম্বর এসেছেন, সকলেই তাঁর বংশধর ছিলেন। এর পূর্বে বহু নবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "যারা তাঁর বংশধর" এখানে 'তাঁর' দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে লূত (আ) যদিও ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদের অন্তর্গত নন। কিন্তু তাঁর ভাতিজা হওয়ার কারণে সবার উপর প্রাধান্য দিয়ে তাঁকেও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যারা "তাঁর" (সর্বনাম)-কে হযরত নূহ (আ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁদের দলীল হচ্ছে এই যে, বংশধরদের মধ্যে হযরত লূত (আ)-এর কথাও উল্লেখ আছে। সুতরাং এখানে হযরত লূত (আ)-কেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ ۔

অর্থ : আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে কিতাব ও নবুওয়াত দান করেছি। -সূরা হাদীদ : ২৬

সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে যত নবীর উপর যত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, সকলেই তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে এমন এক সুমর্যাদা ও উৎকৃষ্ট নেয়ামত দান করেছেন, যা তুলনাহীন ও অনন্য। যেমন- আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে দু'জন মহান ও সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করেছেন। হাজেরা (আ)-এর গর্ভে ইসমাঈল (আ) ও সারাহ (আ)-এর গর্ভে ইসহাক (আ)। পরবর্তীতে ইসহাক (আ)-এর ঔরসে ইয়াকুব (আ) ভূমিষ্ট হন। তাঁর উপাধি হচ্ছে ইসরাঈল। তাঁর থেকেই অধিকাংশ নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটে। এঁদের সংখ্যা কত, তা তাঁদের প্রেরক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত নয়। বনী ইসরাঈলের এ নবীগণের ধারাবাহিকতা হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এসে পৌঁছে সমাপ্ত হয়ে যায়।

অন্যদিকে হযরত ইসমাঈল (আ)। তাঁর বংশ থেকে আরবের বিভিন্ন দল ও গোত্রের উদ্ভব হয়। যার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে ইনশাআল্লাহ। তাঁর বংশের থেকেই একজনের দ্বারা নবী-রাসূলের আগমনের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটে। তিনি হলেন গোটা আদম সন্তানের সর্দার সন্তান এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বনী আদমের গৌরব। জনাব মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হিশাম কুরায়শী। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মক্কী পরে মাদানী নামে খ্যাত।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে এরূপ মহামানব ও সিরাজুম্ মুনীর তিনি ছাড়া আর কেউই আগমন করেন নি। ইনিই হলেন সকল মানবের নেতা। যার উপর কিয়ামতের দিন প্রথম ও শেষের সকল মানুষ ঈর্ষা করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে দণ্ডায়মান হব, যা দেখে প্রত্যেকেই ঈর্ষা করবে। (অর্থাৎ এ মর্যাদা লাভ করতে আগ্রহী হবে) এমনকি ইবরাহীম (আ)-ও। -মুসলিম

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদি পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বেশি পরিমাণে প্রশংসা করেছেন। এতে প্রমানিত হয় যে, সৃষ্টির মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরেই সম্মানিত ও শ্রেষ্ট মানুষ। তাঁর এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ইহাকলেও এবং পরকালেও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কলিজার টুকরা হযরত হাসান ও হুসাইন (রা)-কে একটি নিরাপত্তা বাণী শিখিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আ)-ও ইসমাঈল ও ইসহাককে নিরাপত্তার বাণী শিখিয়েছিলেন। সে বাণীটি হলে এই যে—

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ .

অর্থ : আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণী দ্বারা প্রত্যেক শয়তান ও অনিষ্ট প্রাণী থেকে এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টিকারীর দৃষ্টি থেকে। -বুখারী

আহলে সুন্নাতগণ মানসূর থেকে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ رَبِّ أَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ ۚ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۚ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ : ঐ ঘটনাটাও মনে রেখ, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দাও কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ বললেন, তুমি কি তা বিশ্বাস করো না? তিনি বললেন, বিশ্বাস তো আমি করি, কিন্তু আমার মনকে বুঝ দেওয়া দরকার।[১] আল্লাহ বললেন, তাহলে চারটা পাখি ধর এবং ওদেরকে তোমার সাথে পরিচিত কর। তারপর ওদের এক এক টুকরা এক এক পাহাড়ে রেখে দাও। এরপর ওদেরকে ডাক, ওরা তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসবে। খুব জেনে রাখ যে, আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। -সূরা বাকারা : ২৬০

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এ প্রশ্ন কেন করেছিলেন? মুফাস্সিরগণ এ প্রশ্নের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যা আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মূলকথা হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আবেদন কবুল করেন এবং চার প্রকারের চারটি পাখী সংগ্রহ করার জন্য নির্দেশ দেন। এ চার প্রকারের পাখী কি কি ছিল, তা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে মতপার্থক্য হলেও মূল বিষয়ে কোনো জটিলতার সৃষ্টি হয় না। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে সেই পাখী চারটিকে কেটে টুকরা টুকরা করে, সেগুলোকে ডাকার জন্যে আদেশ দেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার আদেশ

১. অর্থাৎ, সেটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস ও পরম প্রশান্তি, যা নিজ চোখে দেখে লাভ করা যায়।

অনুযায়ী পাখীগুলো কেটে খণ্ড বিখণ্ড করে ডাক দিলেন। ডাক দেয়ার সাথে সাথে প্রতিটি পাখীর খণ্ডিত অংশগুলো এসে একসাথে মিলে গিয়ে পূর্বের মতো পূর্ণাঙ্গ পাখীতে পরিণত হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলা কুদরত প্রত্যক্ষ করেন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে 'কুন' বলার সাথে সাথে তা হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের আর একটি নিদর্শন হলো এই যে, সে পাখীগুলো উড়ে না এসে দৌড়িয়ে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসে। যাতে ইবরাহীম (আ) পাখীগুলোর অবস্থা ভালরূপে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ইবরাহীম (আ) পাখীগুলোকে টুকরা টুকরা করে প্রত্যেকটির মাথা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর ডাক দেয়ার সাথে সাথে খণ্ডিত অংশগুলো মিলিত হয়ে মাথাবিহীন দেহ তাঁর সামনে উপস্থিত হলে তিনি মাথা যমীনে ফেলে দিলেন। ফলে দেহগুলো মাথার সাথে এসে যথাযথভাবে লেগে যায় এবং পূর্বের মতো পূর্ণাঙ্গ পাখি হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। যিনি এ সব কিছু করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ তা'আলার কুদরতের উপর এবং তিনি যে মৃতকে জীবিত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, তার উপর ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ণ বিশ্বাস অবশ্যই আছে। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য এ আবেদন করেছিলেন। যাতে তিনি ইলমুল ইয়াকীন (শুনে বিশ্বাস) এর স্তর থেকে "আইনুল ইয়াকীন" (দেখে বিশ্বাস)-এর স্তরে উন্নীত হতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁর আবেদন কবুল করেন এবং তাঁর আশা পূরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَاۗءِ حٰجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاۗجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۭ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

অর্থ : হে আহলে কিতাব! তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে আমার সাথে কেন ঝগড়া কর? তাওরাত ও ইনজীল তো ইবরাহীমের উপরই নাযিল হয়েছে। তোমরা কি এটুকু কথাও বুঝ না? যেসব বিষয়ে তোমাদের ইলম আছে তা নিয়ে তো তোমরা খুব তর্ক করেছ, এখন ঐসব বিষয়ে কেন তর্ক করছ, যে বিষয়ে তোমাদের কাছে কোনো ইলম নেই? আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না। ইবরাহীম ইহুদীও ছিলেন না, নাসারাও ছিলেন না। তিনি তো একজন মুখলিস[১] মুসলিম ছিলেন। আর তিনি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না। ইবরাহীমের সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে তারাই বেশি হকদার, যারা তাকে অনুসরণ করেছে। আর এখন এ নবী এবং যারা তাকে মেনে নিয়েছে তারাই এ সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী। যারা ঈমানদার আল্লাহ শুধু তাদেরই অভিভাবক ও সহায়ক। –সূরা আলে ইমরান : ৬৫–৬৮

ইয়াহুদী ও নাসারারা দাবি করতো যে, ইবরাহীম (আ) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারাদের এ দাবিকে বাতিল করে দিয়ে তাদের দল থেকে তাঁকে মুক্ত করেছেন। তাদের চরম মূর্খতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা আল্লাহ তা'আলা এভাবে প্রকাশ করেন যে—

وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۔

---

১. মূলে 'হানীফ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যেসব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলে। এর মর্ম বুঝানোর জন্য আমরা অনুবাদ করেছি 'মুখলিস মুসলমান'।

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তো তাওরাত ও ইঞ্জীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে অবতীর্ণ করেন।

–সূরা আলে ইমরান : ৬৫

এটা কিরূপে হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের ধর্মের উপর ছিলেন। অথচ তাদেরকে শরী'অত দেওয়া হয়েছে? হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনেক যুগ পরে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "তোমরা কি সামান্য বিষয়টুকুও বুঝ না?

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ : ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

আল্লাহ তা'আলার এ স্পষ্ট ঘোষণার পরেও ইয়াহুদী ও নাসারাদের উক্ত– "ইবরাহীম (আ) তাদের দলভুক্ত" এটা চরম পর্যায়ের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ তা'আলা এ কথাও বলেছেন যে, ইবরাহীম (আ) ছিলেন দ্বীনে হানীফের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বীনে হানীফ বলা হয়, জেনে শুনে আন্তরিকভাবে বাতিল মতবাদকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করা। আর এ "দ্বীনে হানীফ" ইয়াহুদী, নাসারা ও মুশরিকদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় বর্ণনা করেন—

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۞ فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۞ قُلْ اَتُحَآجُّوْٓنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ

وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۞ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا
أَوْ نَصٰرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ
بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ
عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞

অর্থ : এমন কে আছে যে, ইবরাহীমের তরীকাকে ঘৃণা করে? যে নিজেকে বোকা ও মূর্খ বানিয়ে রেখেছে, সে ছাড়া আর কে এমন কাজ করতে পারে? ইবরাহীম তো ঐ লোক, যাকে আমি দুনিয়ার মধ্যে আমার কাজের জন্য বাছাই করে নিয়েছি। আর আখিরাতে তিনি নেক লোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। তার অবস্থা তো এমন ছিল, যখন তার রব তাকে বললেন, "তুমি মুসলিম (অনুগত) হয়ে যাও",[১] তখনই তিনি বললেন, আমি সারা জাহানের রবের অনুগত হয়ে গেলাম। তিনি তার সন্তানদের ঐ তরীকায় চলার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ইয়াকুবও তার সন্তানদের ঐ উপদেশই দিয়ে গেছেন। তারা বলেছিলেন, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ দ্বীনই পছন্দ করেছেন। তাই মৃত্যু পর্যন্ত তোমরা মুসলিম হয়েই থাকবে। তোমরা কি ঐ সময় হাজির ছিলে, যখন ইয়াকুব দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছিলেন? তিনি মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, "বাবারা! আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?" তারা সবাই জবাব দিলো, আমরা ঐ এক আল্লাহর দাসত্ব করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক মা'বূদ মেনে গেছেন। আমরা তাঁরই অনুগত আছি। তারা এক উম্মত ছিলেন, যারা অতীত হয়ে গেছেন। তারা যা কামাই করে গেছেন, তা তাদেরই; আর যা তোমরা কামাই করবে তা তোমাদের। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কী আমল করেছিলেন। ইহুদীরা বলত, "তোমরা ইহুদী হয়ে যাও, তাহলে হেদায়াত পেয়ে যাবে"। খ্রিস্টানরা বলত, "তোমরা খ্রিস্টান হয়ে যাও তাহলে হেদায়াত পাবে।" তাদেরকে বলে দিন, না (তোমাদের কথা ঠিক নয়) ইবরাহীমের পথই ঠিক, আর ইবরাহীম মুশরিক ছিলেন না। (হে মুসলিম সমাজ!) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর; ঐ হেদায়াতের উপর, যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে; আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকুবের সন্তানদের উপর নাযিল হয়েছে এবং যা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাঁদের রবের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং আমরা শুধু আল্লাহরই অনুগত। তোমরা যেমন ঈমান এনেছ, তারাও যদি তেমনি ঈমান আনে তাহলে তারা হেদায়াত পেল। আর যদি তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তো অবশ্যই তারা হঠকারিতায় লিপ্ত। তাই নিশ্চিত থাক, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সবকিছুই শুনেন ও জানেন। আপনি বলুন, আল্লাহর রং ধারণ কর। তাঁর রং থেকে আর কার রং বেশি ভালো হতে পারে? আমরা তাঁরই দাসত্ব করে চলেছি। হে নবী! তাদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আর আমরা খাঁটিভাবে একমাত্র আল্লাহরই দাসত্ব করছি। অথবা তোমরা কি বলতে চাও, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার সন্তানগণ ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন? আপনি বলুন, তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন? তার চেয়ে বড় যালিম কে হতে পারে, যার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে, অথচ সে তা গোপন রাখে? তোমাদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আল্লাহ মোটেই

১. *মুসলিম অর্থ– যে আল্লাহর নিকট বিনয়ে মাথানত করে; শুধু আল্লাহকেই নিজের মালিক, প্রভু, শাসক, বিধান ও হুকুমদাতা এবং উপাস্য বলে গণ্য ও মান্য করে; যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে ও আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া হেদায়াত ও নির্দেশ অনুসারে জীবনযাপন করে। এ বিশ্বাস ও কর্মধারার নামই 'ইসলাম'। আর এটাই হচ্ছে সকল নবীর দ্বীন বা জীবনধারা, যা সৃষ্টির শুরু থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এসেছে।*

অমনোযোগী নন। তারা এমন কিছু লোক ছিল, যারা অতীত হয়ে গেছে। তাদের কামাই তাদেরই জন্য, আর তোমাদের কামাই তোমাদের জন্য। তোমাদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না।

–সূরা বাকারা : ১৩০–১৪১

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইয়াহুদী ও নাসারা থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা ও পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ) ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ .

অর্থ : মানুষের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর ঘনিষ্ঠতম তারা যারা তাকে অনুসরণ করে। –সূরা আল ইমরান : ৬৮

অর্থাৎ, যে সমস্ত মানুষ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের উপর আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। চাই তারা তার সময়ে হোক বা তার পরে হোক। এরূপ লোকেরাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলা এ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর জন্যও নির্ধারণ করেছিলেন। বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবী জনাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাতে এ দ্বীনে শরীয়াতকে পরিপূর্ণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলা এমন কিছু নেয়ামত দান করেন, যা অন্য আর কোনো নবী রাসূলকে দান করেন নি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قُلْ إِنَّنِيْ هَدٰنِيْ رَبِّيْٓ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞

অর্থ : (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তা সম্পূর্ণ সঠিক দীন, যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পথ যা তিনি নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি মুশরিকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না। (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার সবরকম ইবাদাত,[১] আমার হায়াত, আমার মউত সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর সর্বপ্রথম আমিই আত্মসমর্পণকারী। –সূরা আনআ'ম : ১৬১–১৬৪

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ط وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ط اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞

অর্থ : নিশ্চয় ইবরাহীম নিজের সত্তায় পুরো এক উম্মত ছিলেন। তিনি আল্লাহর অতি নিষ্ঠাবান অনুগত ছিলেন। তিনি কখনো মুশরিক ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং তাকে সোজা ও মযবুত পথ দেখালেন। –সূরা নাহল : ১২০–১২১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা ঘরে প্রাণীর ছবি দেখে তার মধ্যে প্রবেশ করেন নি। তিনি সেগুলো মুছে ফেলতে আদেশ দেন। তাঁর আদেশ সেগুলো মুছে ফেলা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা ঘরে হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর হাতে লটারীর তীর

১. এখানে 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে ইবাদাত-বন্দেগীর সকল প্রকার তরীকার জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়।

দেখতে পান। যা মূর্তি আকারে বানিয়ে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ (এরূপ মূর্তি নির্মাণকারী) লোকদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসমাঈল (আ) কখনো তীর দ্বারা বন্টন করেন নি। -বুখারী

হাদীস শরীফে "তীর দ্বারা বন্টনের" কথা যে উল্লেখ আছে তার ব্যাখ্যা হলো এই যে, মুশরিকরা যখন কোনো পশু যবেহ করতো, তখন তার অনেক অংশীদার হয়ে যেত। তখন এ তীরের মাধ্যমে অংশ নির্ধারণ হতো।

কা'বা ঘরে রক্ষিত এ তীরগুলোতে পূর্ব থেকেই অংশ নির্ধারণ করা থাকত। কোনোটার বেশি অংশ নির্ধারণ করা থাকত। আবার কোনোটার কম থাকত। আর কোনোটার কোনো অংশ নির্ধারণ করা থাকত না।

কুরাইশরা এ তীরগুলো একটি থলের মধ্যে জমা করে প্রত্যেকের নামে একটি করে তীর উঠাত। যার নামে বেশি অংশ নির্ধারণ করা তীরটি উঠত, সে খুব ভাগ্যবান বলে বিবেচিত হতো। আর যার নামে সেই তীরটি উঠত, যেটির কোনো অংশই নির্ধারণ ছিল না, তাকে সবাই 'হতভাগা' বলে মনে করতো। তাকে সবাই তিরস্কার করতো। এই বিদআত ও শিরক কাজটিকে মুশরিকরা খুবই গুরুত্ব দিত। এ কারণে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর হাতে তীর রেখে তারা মূর্তি নির্মাণ করে তা কা'বা ঘরে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। (নাউযুবিল্লাহ)।

হযরত ইবরাহীম (আ) তীর দ্বারা যে কখনই বন্টন করেননি, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপরোক্ত বাণী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। -অনুবাদক

বুখারী শরীফে এরূপও বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন", তারা ভালরূপেই জানে যে, আমাদের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নেতা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.) কখনই তীর দ্বারা বন্টন করেন নি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ۚ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

অর্থ : নিশ্চয় ইবরাহীম নিজের সত্তায় পুরো এক উম্মত ছিলেন। তিনি আল্লাহর অতি নিষ্ঠাবান অনুগত ছিলেন। তিনি কখনো মুশরিক ছিলেন না। তিনি আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়কারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং তাকে সোজা ও মযবুত পথ দেখালেন। -সূরা নাহল : ১২০-১২১

এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যে "উম্মত" শব্দটির উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ হলো নেতা, পথপ্রদর্শক এবং সত্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং যার আদর্শের অনুসরণ করা হয়। আর "আল্লাহর অনুগত" এর অর্থ হচ্ছে, সর্বাবস্থায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ভয় করে চলা।

"একনিষ্ঠ" এর অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানে ও অন্তর্দৃষ্টিতে আন্তরিক হওয়া। "সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" এ কথার অর্থ হচ্ছে, নিজের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কাজ-কর্ম ও কথাবার্তা দ্বারা নিজ প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। "তাকে মনোনীত করেছিলেন" এ কথার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর রিসালাত ও নবুওয়াতের জন্য বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ দান করেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝

অর্থ : দীনের দিক দিয়ে ঐ লোকের চেয়ে কে বেশি ভালো হতে পারে, যে নেক নিয়তে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং একমুখী হয়ে ইবরাহীমের তরীকা মেনে চলেছে। ঐ ইবরাহীমের তরীকা (মেনে চলেছে), যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। -সূরা নিসা : ১২৫

এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর প্রিয় বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শ অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। কারণ তিনি সঠিক ও সত্য ধর্মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সকল নির্দেশাবলীর যথাযথ পালনকারী। এ কথা আল্লাহ নিজেই কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে—

وَإِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى -

অর্থ : এবং ইবরাহীমের কিতাবেও আছে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। –সূরা নাজম : ৩৭

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ইবরাহীম (আ)-এর ব্যাপারে বলেছেন যে, "আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে খলীল (বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করেছেন।" "খলীল" শব্দটি সেই বন্ধুর বেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার সাথে প্রগাঢ় ভালবাসা। যেমন, কোনো কবি বলেছেন—

قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوْحِ مِنِّيْ
وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيْلُ خَلِيْلًا -

"বন্ধু তুমি, প্রবেশ করেছ আমার হৃদয়ে,
এ কারণেই খলীলকে খলীল বলা হয়।"

অনুরূপভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বন্ধু হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে জুনদুব আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"

আর একবার এক ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

হে মানুষেরা! (জেনে রাখ!) আমি যদি পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে কাউকে বন্ধু (খলীল)-রূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকর (রা)-কেই বানাতাম। কিন্তু (তোমরা ভাগ্যবান যে,) তোমাদের এ সাথী আল্লাহর খলীল (বন্ধু)। এ হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ) আবূ সাঈদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হযরত ইবনে যোবায়ের (রা) ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা)-এর থেকে ইমাম বুখারী (রহ) তাঁর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত মু'আয (রা) যখন ইয়ামানে গমন করেন, তখন সেখানের লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়েন। তখন তিনি কেরাতে এ আয়াত পাঠ করেছেন—

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا -

অর্থ : আল্লাহ ইবরাহীমকে খলীল (বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করেছেন।

একদা সেই মজলিসের একজন বললেন, "নিশ্চয়ই ইবরাহীমের মায়ের চোখ শীতল হয়েছিল।"

হযরত আব্বাস (রা) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবা তাঁর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করলেন। যখন তিনি সাহাবাদের নিকট এসে পৌঁছেন, তখন তিনি সাহাবাগণকে পরস্পরে কথাবার্তা বলতে শুনতে পান। একজন বলছেন, বিস্ময়ের ব্যাপার! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকেই তাঁর বন্ধু মনোনয়ন করেছেন। আর তিনি হচ্ছেন, হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ। দ্বিতীয় একজন বললেন, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। অন্য আর একজন বললেন, ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ এবং তাঁর নিদর্শন। একজন বললেন, আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে পছন্দ করেছেন। এরই মধ্যে রাসূল (স) তাদের কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, (হে সাহাবাগণ!) আমি তোমাদের পারস্পরিক কথাবার্তা শুনেছি। তোমাদের কাছে এ বিষয়গুলো বিস্ময়ের যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহর বন্ধু (খলীল), মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা

বলেছেন, ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ এবং তাঁর নিদর্শন এবং আদম (আ)-কে আল্লাহ পছন্দ করেছেন। মূলত এসবগুলোই ঠিক। (তোমাদের সকলের মন্তব্য সঠিক ও যথার্থ)। তোমরা জেনে রেখো! আমি আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। এতে আমার কোনো গর্ব বা অহংকার নেই। আরো জেনে রেখো যে, আমিই সর্বপ্রথম সুপারিশকারী হব এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল হবে। এতেও আমার কোনো গর্ব বা অহংকার নেই। আমিই সে প্রথম ব্যক্তি, যে (ব্যক্তি) বেহেশতের দরজার কড়া নাড়া দিবে। তারপর আল্লাহ দরজা খুলে দেবেন। এরপর আমাকে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। আমার সাথে প্রথমে গরিব (দরিদ্র) মু'মিনগণ থাকবে। কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম ও শেষ সৃষ্টির সবার চাইতে সম্মানিত হব। এতে আমার কোনো অহংকার নেই।

এ সূত্রে হাদীসখানা গরিব। কিন্তু এর স্বপক্ষে অন্য হাদীস পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

রাসূল ﷺ নিজকে (আল্লাহর) হাবীব বলে ঘোষণা করেছেন এবং জান্নাতে এটিই হবে অতি সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন পদ। "হাবীব" পদমর্যাদা কত যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তা একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) নিজে তাঁর বন্ধু আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছেন- وَالَّذِيْ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ "সেই আল্লাহ যার কাছে আমি মাগফিরাত কামনা করছি।" আর আল্লাহর হাবীব রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ নিজে ঘোষণা করেন যে—

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

অর্থ : যাতে আল্লাহ তা'আলা অতীতের ও পরবর্তী সময়ের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

অনুরূপ দুনিয়াতেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে "বন্ধুর" চেয়ে "প্রেমাস্পদ" (মাহবুব) অগ্রগামী হয়ে থাকে। -অনুবাদক

ইমাম হাকিম (রহ) তাঁর মুস্তাদরিকে কাতাদাহ (রা)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যে ইবরাহীম (আ)-কে খলীল (বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করেছেন, তা কি তোমরা অস্বীকার করতে পারবে? আল্লাহ তা'আলার সাথে যে মূসা (আ)-এর সরাসরি কথা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার যে দীদার হয়েছে, তা কি তোমরা অস্বীকার করতে পারবে? ইবনে আবী হাতিম (রহ) বলেন, ইসহাক ইবনে ইয়াসার (রহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। এমনকি দূরে বসে তাঁর অন্তর থেকে এরূপ আতঙ্কে শব্দ শোনা গেল, যেরূপ আকাশে পাখী উড়ার সময় তার ডানা ঝাপটানো শব্দ শোনা যায়।

হযরত উবায়দা ইবনে উমায়ের (রা) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) ছিলেন অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। তিনি লোকদের খুব মেহমানদারী করতেন। একদিন মেহমানের তালাশে বাইরে বের হলেন। কিন্তু কোনো মেহমান পেলেন না। সর্বশেষে বাড়ীতে ফিরে এসে দেখলেন যে, একজন অপরিচিত লোক তাঁর ঘরের সম্মুখে দাঁড়ানো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আমার অনুমতি ছাড়া কিভাবে তুমি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করলে? সে বলল, আমি এ ঘরের (প্রকৃত) মালিক (আল্লাহ তা'আলা)-এর অনুমতিতে প্রবেশ করেছি। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি "মালাকুল মাউত"। আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দার কাছে এজন্যে প্রেরণ করেছেন যে, তাঁকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ দেব যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে "খলীল"-রূপে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, সে লোকটি কে? তাঁর পরিচয় যদি আমি জানতে পারতাম, তবে তিনি যেখানেই অবস্থান করেন না কেন, সেখানে আমি যেতাম এবং তাঁর সংসর্গ লাভ করতাম। মালাকুল মাউত বললেন, সে লোকটি হলেন আপনি নিজেই। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে কি জন্যে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন, কারণ এই যে, আপনি নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহরওয়াস্তে মানুষকে দান করে থাকেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় তাঁর বন্ধু ইবরাহীম (আ)-এর

কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে শুধুমাত্র সূরা বাকারায় পনের জায়গায় উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও পাঁচজন "উলুল আযম" পয়গম্বরের মধ্যে ইবরাহীম (আ) অন্যতম একজন। যারা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের কথা আলাদাভাবে পবিত্র কুরআনে সূরা আহযাব ও সূরা শুরায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا .

অর্থ : (হে নবী!) ঐ ওয়াদার কথা স্মরণ করুন, যা আমি সকল নবীর কাছ থেকেই নিয়েছি। আপনার কাছ থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইবনে মারইয়াম থেকেও (নিয়েছি)। সবার কাছ থেকেই আমি পাকা-পোক্তা ওয়াদা নিয়েছি। -সূরা আহযাব : ৭

সূরা শূরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ .

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য দীনের ঐ সব নিয়ম-কানুনই ঠিক করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহকে দিয়েছিলেন ও যা আমি (হে নবী!) এখন আপনার কাছে ওহী করে পাঠিয়েছি এবং যার হেদায়াত আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ তাকীদসহ দিয়েছিলাম যে, এ দীনকে কায়েম করুন। আর এ ব্যাপারে একে অপর থেকে আলাদা হয়ে যাবেন না। -সূরা শূরা : ১৩

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে গোটা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর (বায়তুল্লাহ) নির্মাণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে আকাশে এমন এক সম্মানিত স্থান দান করেছেন, যে স্থানটি নির্মিত হয়েছে বায়তুল্লাহ সদৃশ। অর্থাৎ, বায়তুল মামূর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মে'রাজে গমন করেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছেন যে, তিনি সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতখানা আল্লাহর ঘর 'বায়তুল মামূরের' দেয়ালের সাথে ঠেস লাগিয়ে খুব আরামে বসা আছেন। সুবহানাল্লাহ! সে বায়তুল মামূরের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এবং তাওয়াফ করেন। কিন্তু এ প্রবেশকারী ফেরেশতাগণ কিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় দ্বিতীয়বার ঐ ঘরে (বায়তুল মামূরে) প্রবেশের এবং তাওয়াফ করার সুযোগ পাবেন না।

শুরায়ক ইবনে নোমায়ের হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে "মে'রাজ সম্পর্কিত" হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, "হযরত ইবরাহীম (আ) ষষ্ঠ আকাশে এবং হযরত মূসা (আ) সপ্তম আকাশে ছিলেন। তাঁর এ হাদীসখানা সমালোচিত এবং সন্দেহযুক্ত, এটি বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটিই সঠিক ও সহীহ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন "সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত। তাঁর পুত্রও সম্মানিত এবং তাঁর পুত্রও সম্মানিত। এরা হলেন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর পুত্র ইসহাক (আ), তাঁর পুত্র ইয়াকূব (আ) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)। ইমাম আহমদ (রহ) হাদীসটি একাই বর্ণনা করেছেন।

হযরত মূসা (আ) হতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব যে অধিক তা নিম্নের হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তৃতীয় নেয়ামতটি সেই দিনের জন্য রেখে দিয়েছি, যে দিনের সকল মানুষ আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে এমনকি ইবরাহীম (আ)-ও" আর সেটি হচ্ছে, "মাকামে মাহমূদ"। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানদের নেতা হব। এতে আমার কোনো অহংকার

নেই। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আদম (আ)-এর সুপারিশ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, লোকেরা সুপারিশের জন্য প্রথমে আদম (আ)-এর কাছে যাবে, তারপর ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। তাঁরা সকলেই (আল্লাহর মহান দরবারে) সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানবেন। অবশেষে লোকেরা শেষনবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসবে। যখন তারা সুপারিশের জন্য আরয করবে, সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলবেন, হ্যাঁ আমি সুপারিশ করব। ইমাম বুখারী (রহ) বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি সঠিকতর মুত্তাকী (পরহেযগার)। আরয করা হলো, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তোমাদের মধ্যে সঠিক সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)। যার পিতা (ইয়াকূব (আ)) আল্লাহর নবী। তাঁর পিতা (ইসহাক (আ))-ও আল্লাহ নবী, তাঁর পিতা [ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)]-ও আল্লাহর নবী। লোকেরা পুনরায় আরয করলেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করি নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে কি তোমরা আরবের গোত্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ? বলা হলো, জী। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শোন! "তাদের মধ্যে জাহেলী যামানায় যারা উত্তম ছিল, তারা ইসলামের যামানায়ও উত্তম। তবে তারা জ্ঞানসম্পন্ন হবে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে কিছু পার্থক্যসহ অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"সম্মানিত ব্যক্তির সন্তান সম্মানিত, তাঁর সন্তান সম্মানিত এবং তাঁর সন্তান সম্মানিত। তাঁরা হলেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। ইমাম আহমদ এভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফেও অন্য সূত্রে অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে—

"হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র সম্মানিত, তাঁর পুত্র সম্মানিত এবং তাঁর পুত্র সম্মানিত। তাঁরা হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)।

ইমাম আহমদ (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে বস্ত্রহীন (উলঙ্গ) অবস্থায় উঠান হবে। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরান হবে। এ কথা বলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের আয়াতখানা পাঠ করেন—

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ .

অর্থ : যে অবস্থায় আমি প্রথমে সৃষ্টি করেছি, ঐ অবস্থাতেই পুনরায় উঠাব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। -সূরা আম্বিয়া : ১০৪

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ) এ হাদীসখানা তাঁদের হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীসের বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাইতে ইবরাহীম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অধিক বলে কিছুটা প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু এর সুস্পষ্ট উত্তর হলো এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ), অনেক আদর্শ, মর্যাদা ও গুণাবলীর অধিকারী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে যাননি। যে মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাকামে মাহমূদ দান। কিয়ামতের দিন প্রথম ও শেষ যুগের সকল লোকেরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর ঈর্ষা করবেন। (অর্থাৎ তাঁরাও পেতে আগ্রহী হবেন।) অনুরূপ এক হাদীস মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসের উত্তর হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্মানিত পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানের প্রতি খেয়াল করে বিনয় প্রকাশার্থে এ কথা বলেছিলেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য এক জায়গায়

বলেছেন, তোমরা আমাকে নবীগণের উপর প্রাধান্য দিও না।" তিনি আরো বলেছেন, "আমাকে মূসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন (কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে) সমস্ত মানুষই বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে। আমিই প্রথম হুশে আসব। তারপর মূসা (আ)-কে দেখতে পাব যে, তিনি আরশের খুঁটি ধরে (দাঁড়িয়ে) আছেন। আমার জানা নেই যে, মূসা (আ) আমার পূর্বেই হুশে আসবেন, না তূর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার পরিবর্তে তিনি এর থেকে মুক্তি পাবেন।

এরূপ বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টিকুলের সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তার কোনই ব্যত্যয় ঘটে না। নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের সর্দার হবেন।

এরূপে সহীহ মুসলিম শরীফে উবাই ইবনে কা'ব (রা) হতে একখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সে হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে দিবসে সমস্ত মানুষ (আমার পদমর্যাদা দেখে) আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-ও।" এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার পরে গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এরপরে ইবরাহীম (আ)-এর পদমর্যাদা। এ কারণেই, নামাযের তাশাহ্হুদে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি দুরূদ পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। যা বুখারী ও মুসলিম শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত কাব ইবনে আজুরা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের নিয়ম আমরা জেনে নিয়েছি। কিন্তু আমরা আপনার প্রতি দুরূদ কিভাবে প্রেরণ করব? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপে বলবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর বংশধরগণের উপর সেরূপ শান্তি বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরগণের উপর বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর বংশধরগণের উপর বরকত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (আ)-এর উপর ও তাঁর বংশধরগণের উপর বরকত বর্ষণ করেছিলেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিও দুরূদ প্রেরণ করা হয়। এ দুরূদ পাঠ দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। এ কারণে যে, সমস্ত নবীগণকে বাদ দিয়ে শুধু ইবরাহীম (আ)-এর নাম দুরূদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসায় বলেছেন—

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى.

অর্থ : এবং ইবরাহীমের কিতাবেও আছে, যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। -সূরা নাজম : ৩৭

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে সব আদেশ দিয়েছেন, তিনি সবগুলোই যথাযথভাবে একনিষ্ঠতার সাথে পালন করেছেন এবং ঈমানের সকল দিকগুলোর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহ সম্পাদন করতে গিয়ে তিনি ছোট ছোট নির্দেশগুলোকে এড়িয়ে যাননি। বরং সেগুলোও মনোযোগ ও একনিষ্ঠতার সাথে সম্পাদন করেছেন। বড় কাজ তাঁকে ছোট কাজগুলো থেকে ভুলিয়ে রাখে নি।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ.

অর্থ : এবং স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিলেন। -সূরা বাকারা : ১২৪

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে দশটি জিনিসের পবিত্রতার নির্দেশ দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার মাথা সংক্রান্ত এবং পাঁচ প্রকার বাকি শরীর সংক্রান্ত। মাথা সংক্রান্ত পাঁচ প্রকার হচ্ছে এই যে- ১) গোঁফ কাটা, ২) কুলি করা, ৩) মিসওয়াক করা, ৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, ৫) মাথায় সিঁথি করা। শরীর সংক্রান্ত পাঁচ প্রকার হচ্ছে এই যে- ১) নখ কাটা, ২. নাভীর নিচের পশম কাটা, ৩) খাতনা করা, ৪) বগলের পশম উঠান, ৫) পেশাব-পায়খানার পরে পানি দ্বারা পবিত্র ও পরিষ্কার হওয়া। ইবনে আবু হাতিম (রহ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, মুজাহিদ, শা'বী, নখয়ী, আবূ সালেহ ও আবূ জালদ (রহ)-ও এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে স্বভাবগত পাঁচটি। ১) খাতনা করা, ২) নাভীর নিচের পশম কাটা, ৩) গোঁফ কাটা, ৪) নখ কাটা ও ৫) বগলের পশম উঠান।

সহীহ মুসলিম ও সুনান কিতাবে হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দশটি বিষয় হলো স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা।

১) গোঁফ ছেঁটে রাখা, ২) দাড়িকে ছেড়ে দেয়া, (অর্থাৎ না ছাঁটা), ৩) মিসওয়াক করা, ৪) নাকের মধ্যে ভালরূপে পানি পৌছান, (যাতে পরিষ্কার হয়) ৫) নখ কাটা, ৬) আঙ্গুলসমূহের গ্রন্থি পানি দ্বারা ধৌত করা, ৭) বগলের পশম উঠান, ৮) নাভীর নিচের পশম কাটা, ৯) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা ও ১০) খাতনা করা।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ও খাতনার ব্যাপারে আলোচনা এর পরেই করব। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়গুলো আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) একনিষ্ঠতা, মনোযোগ ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মাশগুল থেকেও নিজ শরীরের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছিলেন। তিনি শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। এগুলোর যথাযথ যত্ন নিতেন। যে জিনিসগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর ও অসুন্দর তা থেকে বেঁচে থাকতেন। যথা- চুল লম্বা করে রাখা, নখ না কাটা ইত্যাদি। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলো আল্লাহর নির্দেশেরই বিশ্লেষণ। যা ইবরাহীম (আ) যথাযথভাবে পালন করেছিলেন।

বেহেশতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাসাদ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বেহেশতে একটি প্রাসাদ রয়েছে। সে প্রাসাদটি মোতির নির্মিত। সে প্রাসাদে কোনো চির নেই। সেটি আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর থাকার জন্য তৈরি করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শারীরিক অবয়ব

হযরত ইবনে জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সামনে নবীগণকে উপস্থিত করা হয়। মূসা (আ)-কে (আমার সাহাবী) উরওয়াহ ইবনে মাসউদের মতো এবং ইবরাহীম (আ)-কে (আমার সাহাবী) দাহইয়ায়ে কালবীর অনুরূপ দেখতে পাই।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থেই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঈসা ইবনে মারিয়ম, মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের, চুল কালো ঘন এবং বক্ষ ছিল প্রশস্ত। মূসা (আ)-এর দেহের উচ্চতা ছিল আদম (আ)-এর মতো এবং তিনি দৈহিকভাবে শক্তিশালী ছিলেন। তারপর লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতি কিরূপ ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন, তোমাদের সাথীকে দেখে নাও, অর্থাৎ আমাকে দেখে নাও। তিনি ছিলেন আমার মতো। -মুসনাদে আহমদ

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, লোকেরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সামনে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, দাজ্জালের কপালের ওপর "কাফির" অথবা কাফ, ফা, রা, (কা-ফি-র) এ অক্ষর তিনটি লেখা থাকবে? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ কথা শুনি নি। (তবে কিছু সংখ্যক নবীর আকৃতি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি।) তিনি বলেছেন, "তোমরা যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে চাও, তবে তোমাদের এ সাথীকে দেখ। অর্থাৎ, আমাকে দেখ। আর হযরত মূসা (আ) ছিলেন ঘন কালো চুলবিশিষ্ট এবং তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল আদম (আ)-এর মতো। আমি যেন দেখতেছি যে, তিনি একটি লাল বর্ণের উটের উপর আরোহণ করে যার লাগাম (নাকের রশি) খেজুরের ছাল দ্বারা তৈরি উপত্যকায় অবতরণ করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তেকাল ও তাঁর বয়স

ইবনে জারীর (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মগ্রহণ করেন কিনানের পুত্র নমরুদের যুগে। এক বর্ণনা মতে এই নমরুদই ছিল বিখ্যাত বাদশাহ যাহ্হাক। যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে এক হাজার বছর পর্যন্ত বাদশাহী করেছিল। এ ছিল অত্যাচারী স্বৈরাচারী বাদশাহ। কারো মতে, এ নমরুদ ছিল বনূ রাসিব। তার শাসনামলে আকাশে একটি তারকা উদয় হয়। যার উজ্জ্বলতা চাঁদ সূর্যের আলোর চাইতেও অনেক বেশি ছিল। এতে নমরুদসহ সকল লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ে। বাদশাহ নমরুদ জ্যোতিষী ও গণকদেরকে একত্র করে এর কারণ জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আপনার রাজ্যে একটি মানব শিশু জন্ম গ্রহণ করবে এবং তার হাতেই আপনার রাজত্বের অবসান ঘটবে। নমরুদ এ কথা শুনে, সর্বত্র আদেশ জারি করে দিল যে, কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না। এখন থেকে যে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে, তাকে হত্যা করা হবে। এতসব বাধার মধ্যেও তখন হযরত ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেফাযত করেন ও কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি নিরাপদেই যৌবনে পদার্পণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম পন্থায় দ্রুত বর্ধিত করেন। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মস্থান

হযরত ইবরাহীম (আ) 'সুস' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য এক বর্ণনা আছে, 'কছায়' এলাকার 'সাওয়াদ' নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। ইতঃপূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, দামেশকের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত "বারযা" নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর হাতে নমরুদকে বিনাশ করানোর পর তিনি প্রথমে "হারান" নামক এলাকায় বসবাস করেন। পরে "সিরিয়ায়" হিজরত করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের শহর ইলিয়ায় বসবাস করেন। (সেখানেই) তাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)। তারপর কিনআনের অন্তর্গত "হিবরূন" নামক স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেই হযরত সারাহ (আ) ইন্তেকাল করেন। আহলে কিতাবের মতে, ইন্তেকালের সময় হযরত সারাহ (আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতাশ বছর। হযরত সারাহ (আ)-এর ইন্তেকালে হযরত ইবরাহীম (আ) অত্যন্ত ব্যথিত ও শোকার্ত হয়ে পড়েন। ইবরাহীম (আ) বনু হিস্ গোত্রের আফরূন ইবনে সাখার নামক এক ব্যক্তির থেকে চারশ দীনারে এক খণ্ড জমিন ক্রয় করে, সেখানে হযরত সারাহ (আ)-কে তাঁর ইন্তেকালের পর দাফন করেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর ছেলে হযরত ইসহাক (আ)-কে "রুফাকা" এর সাথে বিবাহ করান। তাঁর বংশতালিকা হলো রুফাকা বিনতে বাতুঈল ইবনে নাহুর ইবনে তারিহ। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর নিজ গোলামকে পুত্রবধূকে আনার জন্য পাঠিয়ে দেন। সে গোলাম পুত্রবধূ রুফাকাকে এবং তাঁর দাসীদেরকে ও দুধ মাকে উষ্ট্রের পিঠে সওয়ার করিয়ে নিয়ে আসেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) নিজে "কানতুরা" নামী এক

মহিলাকে বিবাহ করেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে কানতুরার গর্ভে ছটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের নাম হচ্ছে যামরান, ইয়াকশান, মাদান, মাদায়েন, শীয়াক ও শূহ।

আহলে কিতাবগণ, "কানতুরের" প্রত্যেক সন্তান-সন্ততির পূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। ইবনে আসাকির (রহ) কিছু সংখ্যক বুযুর্গের বরাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে "মালাকুল মওত" আগমন সম্পর্কে আহলে কিতাবদের বর্ণনা থেকে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

এক বর্ণনা অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তেকাল হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সোলায়মান (আ)-এর মতো আকস্মিক হয়েছে। কিন্তু আহলে কিতাবগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একশ পঁচাত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং আফারুন থেকে ক্রয়কৃত সেই জমিনেই তাঁর স্ত্রী হযরত সারাহ (রা)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর দাফন-কাফন কার্য সমাপন করেন তাঁর দুই ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ)।

ইবনে কালবীর এক বর্ণনায় আছে, হযরত ইবরাহীম (আ) দু'শ বছর বেঁচে ছিলেন। ইবনে হিব্বান হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হযরত ইবরাহীম (আ) কাদুম (কুঠার) দ্বারা খাতনা করিয়েছেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর। এর পরেও তিনি আশি বছর বেঁচেছিলেন। ইবনে হিব্বান আব্দুর রায্যাক থেকে বর্ণনা করেন যে, হাদীসে উল্লিখিত "কাদুম" হচ্ছে একটি এলাকার নাম। সেখানে বসে ইবরাহীম (আ)-এর খাতনা হয়েছিল। আমার জানা মতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর খাতনা আশি বছর বয়সের সময় হয়েছিল। হাদীসের এ বর্ণনাটিই সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। অন্য এক হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এ সময় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স আশি বছর ছিল। উভয় হাদীসের মধ্যে এ নিয়ে কোনো মতভেদ বা জটিলতা নেই যে, তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন এবং মাথায় সিঁথি করেন, নাভীর নিচের পশম কাটেন এবং কাদুম (কুঠার) দ্বারা খাতনা করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর। এরপর তিনি আশি বছর জীবিত ছিলেন। তিনিই (ইবরাহীম আ.) সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রচলন শুরু করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যার চুল সাদা হয়। অর্থাৎ তাঁর পূর্বে আর কারো চুল সাদা হয় নি।

এ হাদীসটি যদিও মাওকূফ। কিন্তু মারফূ হাদীসেরই মতই। এ ব্যাপারে ইবনে হিব্বান (রহ)-এর মতামত ভিন্ন। মালিক (রহ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রথম মেহমানদারীর প্রচলন শুরু করেন এবং সর্বপ্রথম খাতনা করান এবং সর্বপ্রথম গোঁফ ছাটেন। সর্বপ্রথম তিনিই প্রৌঢ়ত্বকে (শুভ্র কেশ আকারে) দেখেন। তিনি তাঁর চুলের শুভ্রতাকে দেখতে পেয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আবেদন করেন, হে পরওয়ারদেগার! এর রহস্য কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটি হলো সম্মান (অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদার নিদর্শন)। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমার এ সম্মান ও মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দিন। এর পূর্ববর্তী বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণ এর সাথে আরো তিনটি বিষয় যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইয়াকূব (আ) এ তিনজনের কবর সেই কবরস্থানে যে কবরস্থান হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ) হিবরূন এলাকায় তৈরি করেছিলেন। সে "হিবরূন" শহরটি আজ পর্যন্ত "খলীল" নামে প্রসিদ্ধ। বনী ইসরাঈলদের যুগ হতে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত এ কথাটি বংশধারাক্রমে নির্ভরযোগ্য সূত্রে চলে আসছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবর "খলীল" শহরে। তবে এ (খলীল) শহরের

কোন জায়গায় তাঁর কবর তার সঠিক কোনো তথ্য বর্ণিত হয় নি। সুতরাং এ পুরো শহরটির সংরক্ষণ করা ও সম্মান করা একান্ত কর্তব্য এবং এ স্থানে চাষাবাদসহ অন্য কিছু করা উচিত নয়। কেননা, হতে পারে যে স্থানে চাষাবাদ করা হচ্ছে, সে স্থানের নিচেই হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ অনেক নবীদের কবর রয়েছে।

ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবরের পাশে একখানা পাথর রয়েছে। তাতে লিখিত আছে—

الهى جهولا امله * يموت من حا اجله .

ومن دنا من حتفه * لم تغن عنه حيله .

و كيف يبقى آخرا * من مات عنه اوله .

والمرء لا يصحبه * فى القبر الا عمله .

"নির্দিষ্ট সময় যখন আসে কারো পরে, সকল আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যু বরণ করে।
আগের লোক সব চলে গেছে এ দুনিয়া ছেড়ে, পরের লোক এ দুনিয়ায় থাকবে কেমন করে?
এ দুনিয়ায় বসে মানুষ যাহা আমল করে, সেই আমলই হবে সাথী তারই নিজ কবরে।"

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে হযরত হাজেরা (আ)-এর গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মলাভ করেন। এরপর ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তাঁর চাচাতো বোন হযরত সারাহ (আ)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইসহাক (আ)। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে কানতুরা বিনতে ইয়াক্তানের গর্ভে ছয়টি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন– ১) মাদয়ান, ২) যামরান, ৩) সারাজ, ৪) ইয়াকশান, ৫) নাশুক ও ষষ্ঠ জনের নাম উল্লেখ নেই। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) হাজুত বিনতে আমীনকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। তাঁরা হচ্ছেন– ১) কায়সান, ২) সুরাজ, ৩) উমায়স, ৪) লুতান ও ৫) লাফিস।

হযরত আবুল কাসেম সুহায়লী (রহ) তাঁর লিখিত "তারীফ ওয়াল আলাম" গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবনে যে সব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, তন্মধ্যে হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা এবং তাঁর সম্প্রদায়ের উপর অবতীর্ণ আল্লাহর শাস্তির ঘটনা অন্যতম। হযরত লূত (আ)-এর পিতার নাম হারান ইবনে তারাহ। এ তারাহ আযর নামে বিখ্যাত। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা। হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাতিজা। ইবরাহীম (আ), হারান ও নাজুর এরা ছিল তিন ভাই। বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ)-এর পিতা হারান সেই ব্যক্তি, যিনি "হারান" শহরকে সর্বপ্রথম আবাদ করেন। তবে আহলে কিতাবদের ইতিহাসে এধরনের কোনো বর্ণনা নেই। হযরত লূত (আ) তাঁর চাচা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদেশে ও অনুমতিক্রমে তাঁর এলাকা ত্যাগ করে "সাদুম" শহরে গিয়ে অবস্থান করেন।

এ শহরটি ছিল উন্নত, সমৃদ্ধ ও জনবহুল এলাকা। কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা ছিল সবচেয়ে বেশি চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল, বখাটে ও নিকৃষ্ট কাফির। পৃথিবীর মধ্যে তারা ছিল বেশি দুশ্চরিত্র। তারা পথিকদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিত এবং মজলিসে বসে প্রকাশ্যে অশ্লীল ও জঘন্য আচরণ প্রদর্শন করতো। কোনো অশ্লীল ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতো না। এ পাপীরা পৃথিবীতে এমন এক অশ্লীল ও পাপ কাজের উদ্ভাবন করেছিল, যা ইতঃপূর্বে কোনো আদম সন্তান করারও চিন্তা করে নি। তা হলো, স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করে বালকদের সাথে কু-কাজে লিপ্ত হতো। হযরত লূত (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্যে আহ্বান করেন। তাদেরকে এ খারাপ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন। কিন্তু এ দাওয়াত কবুল করার পরিবর্তে, তারা তাদের ভ্রষ্টতা, অবাধ্যতা, অশ্লীলতা ও কুফরীর উপর দৃঢ় থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি শাস্তি বর্ষণ করেন। এরূপ শাস্তি ইতোপূর্বে কারও উপর নাযিল হয় নি। আর এরূপ ভয়ঙ্কর শাস্তি তাদের উপর আসবে, তা ছিল তাদের কল্পনাতীত। তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার এ শাস্তি পৃথিবীর মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য এক চরম শিক্ষা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۞ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ز كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞

অর্থ : আমি লূতকে নবী বানিয়ে পাঠালাম। যখন তিনি তার কওমকে বললেন,১ তোমরা কি এমন বেহায়া হয়ে গেছ যে, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা দুনিয়াতেতোমাদের আগে কেউ করে নি? তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষ থেকে তোমাদের যৌন ক্ষুধা মিটাও। আসলে তোমরা একেবারেই সীমা লঙ্ঘনকারী লোক। কিন্তু তার কওমের জবাব এছাড়া আর কিছু ছিল না যে, তোমাদের এলাকা থেকে এদেরকে বের করে দাও। এরা বড়ই পবিত্রতার (বাহাদুরী) দেখাচ্ছে। অবশেষে আমি লূত ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে দিলাম, তার স্ত্রীকে ছাড়া, যে

১. *হযরত লূত (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাইয়ের ছেলে ছিলেন এবং তাঁকে যে জাতির হেদায়েতের জন্যে পাঠানো হয়েছিল, তাদের বাসস্থান ছিল ঐ জায়গায়– যেখানে আজ মৃত সাগর (Dead sea) রয়েছে।*

তাদের মধ্যে শামিল ছিল যারা পেছনে পড়ে রইল। ঐ কাওমের উপর আমি এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম।১ তারপর দেখ যে ঐ অপরাধীদের কেমন দশা হলো। –সূরা আ'রাফ : ৮৩-৮৪

সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۞ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۞ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۞ قَالَتْ يٰوَيْلَتٰٓى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ۞ قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ۞ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۞ وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۞ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۞ قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۞ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ۞

অর্থ : ইবরাহীমের নিকট আমার ফেরেশতারা সুখবর নিয়ে এল। (ফেরেশতারা) বলল, তোমার প্রতি সালাম। ইবরাহীম জবাব দিলেন, তোমাদের প্রতিও সালাম। তারপর ইবরাহীম তাড়াতাড়ি একটা ভাজা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলেন।২ যখন ইবরাহীম লক্ষ্য করলেন, তাদের হাত খাবারের দিকে এগুচ্ছে না,৩ তখন তাদের সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেলেন এবং মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় অনুভব করলেন। তারা বলল,

১. 'বর্ষণ' বলতে এখানে পানি বর্ষণ বোঝানো হচ্ছে না; এখানে 'বর্ষণ' অর্থ– পাথর বর্ষণ। কুরআনের অন্য জায়গায় পাথর বর্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

২. এ থেকে জানা গেল, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাড়িতে মানুষের রূপ ধরে এসেছিলেন এবং প্রথমে তাঁরা নিজেদের পরিচয় দান করেন নি। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁদেরকে অপরিচিত অতিথি মনে করেছিলেন এবং তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের জন্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

৩. এ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) জানতে পারলেন যে, তাঁরা ফেরেশতা।

ভয় পাবেন না। আমাদেরকে লূতের কাওমের নিকট পাঠানো হয়েছে। ইবরাহীমের বিবিও দাঁড়িয়েছিল। এ কথা শুনে সে হাসলো। এরপর আমি তাকে ইসহাক সম্পর্কে এবং ইসহাকের পর ইয়া'কুব সম্পর্কে সুখবর দিলাম। (ইবরাহীমের বিবি) বলল, হায় আমার পোড়া কপাল![১] আমার কি সন্তান হবে? আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি, আর আমার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। এটা তো বড়ই আজব কথা। (ফেরেশতারা) বলল, তুমি আল্লাহর হুকুমের উপর অবাক হচ্ছ? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের উপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত মহান। তারপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুখবরে) তার মন খুশি হলো, তখন তিনি লূতের কওমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করলেন।[২] আসলে ইবরাহীম বড়ই সহনশীল ও নরম মনের মানুষ ছিলেন এবং সব অবস্থায়ই আমার দিকে ফিরে থাকতেন। (অবশেষে আমার ফেরেশতারা তাঁকে বলল) হে ইবরাহীম, আপনি এ থেকে বিরত থাকুন। আপনার রবের হুকুম এসে গেছে। এখন তাদের উপর ঐ আযাব অবশ্যই আসবে। কেউ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাদের আগমণে খুব ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মন ছোট হয়ে গেল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আজ বড়ই বিপদের দিন।[৩] (ঐ মেহমানদেরকে দেখে) ঐ কওমের লোকেরা দৌড়ে আসতে লাগল। এর আগেও এরা এ রকম মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললেন, হে আমার কওম! এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র।[৪] আল্লাহকে তো কিছু ভয় কর। আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো মানুষ নেই? তারা জবাব দিলো, তুমি জানো যে, তোমার মেয়েদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা কী চাই তুমি তা অবশ্যই জানো। লূত বললেন, হায় তোমাদেরকে সোজা করে দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত! অথবা আশ্রয় নেবার মতো কোনো মযবুত শক্তি যদি পেতাম। তখন ফেরেশতারা বলল, হে লূত! আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতা। এরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। আপনি কিছু রাত বাকি থাকতেই আপনার পরিবার নিয়ে বের হয়ে যান। আর লক্ষ্য রাখুন আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী (আপনার সাথে যাবে না)। কারণ তাদের উপর যা ঘটবে তার উপরও তা-ই ঘটবে। তাদের ধ্বংসের জন্য সকালের সময়টা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সকাল হতে আর কতইবা দেরি? যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেল, তখন আমি ঐ এলাকার উপরভাগকে নিচে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বৃষ্টির মতো বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি পাথর আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল।[৫] আর যালিমদের থেকে এ সাজা মোটেই দূরে নয়। -সূরা হূদ : ৬৯-৮৩

---

১. *এর অর্থ এই নয় যে, হযরত সারা বস্তুত এ কথায় খুশি না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, এটা তেমনই একটি কথা।*

২. *'ঝগড়া করা' শব্দটি এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে যে একান্ত মহব্বতের সম্পর্ক রাখতেন তারই প্রমাণ। এ শব্দ দ্বারা চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে ওঠে যেমন- বান্দাহ ও তার মা'বূদের মধ্যে অনেক সময় ধরে পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। বান্দাহ জেদ করে বলে, যেভাবেই হোক লূতের কওমের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেওয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলেন, এ জাতির মধ্যে ভালো বলতে আর কিছু বাকি নেই এবং তাদের অপরাধ এত বেশি যে, তাদের প্রতি কোনো দয়া করা চলে না। কিন্তু বান্দাহ এরপরও বলতে থাকে, 'হে প্রভু! যদি সামান্য কিছু ভালোও তাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে আরো কিছু সময় দিন।"*

৩. *ফেরেশতারা সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লূত (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এরা ফেরেশতা। এ কারণেই এ অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানী বোধ করেছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে, তারা কতটা বেহায়া হয়ে গিয়েছিল।*

৪. *এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত (আ) তাদের সামনে নিজের কন্যাদেরকে বিয়ে করার জন্য পেশ করেছিলেন। 'তোমাদের জন্য এ পবিত্র' বাক্যাংশটি এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোনো অবকাশ রাখে নি। হযরত লূতের কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের নাফসের খাহেশ আল্লাহর দেওয়া জায়েয উপায়ে পূরণ কর। এর জন্য মেয়েলোকের কোনো অভাব নেই।*

৫. *অর্থাৎ প্রতিটি পাথরের টুকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত ছিল যে, কোন্ পাথরটি কী কী ধ্বংসকার্য সাধন করবে ও কোনটি কোন্ অপরাধীর উপর পড়বে।*

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُوا
لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞
قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۞
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۞ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ إِنَّا
لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا ۙ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ
الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۞ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأَتَيْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ۞ وَجَاءَ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ۞
قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ۞ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ
فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۞

অর্থ : তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা তার কাছে এলো, তখন তাঁকে 'সালাম' বলল। তিনি বললেন, তোমাদেরকে দেখে আমার ভয় লাগছে। তারা বলল, আপনি ভয় করবেন না। আমরা আপনাকে এক বড় জ্ঞানী ছেলের সুখবর দিচ্ছি।[১] ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি আমাকে এ বুড়ো বয়সে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ? একটু ভেবেই দেখ, তোমরা আমাকে এ কেমন সুখবর দিচ্ছ? তারা জবাব দিলো, আমরা আপনাকে সত্য সুখবরই দিচ্ছি। আপনি নিরাশ হবেন না। ইবরাহীম বললেন, গোমরাহ মানুষ ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়? এরপর ইবরাহীম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর পাঠানো দূতগণ! আপনারা কোন অভিযানে এসেছেন? তারা জবাব দিলো, নিশ্চয়ই এক অপরাধী কওমের নিকট আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে; শুধু লূতের পরিবার ছাড়া। আমরা অবশ্যই তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাদের সবাইকে রক্ষা করব। (তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ বলেন) আমি ফায়সালা করে দিয়েছি যে, সে তাদের মধ্যে শামিল থাকবে, যারা পেছনে পড়েছে। তারপর যখন (ফেরেশতারা) লূতের কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, আপনাদের তো অপরিচিত মনে হচ্ছে। তারা জবাব দিলো, আমরা বরং ঐ জিনিস নিয়েই আপনার কাছে এসেছি, যা আসার ব্যাপারে এ লোকেরা সন্দেহ করছিল। আমরা আপনাকে সত্যই বলছি। আমরা আপনার নিকট হক সহই এসেছি। তাই রাত কিছু বাকি থাকতেই আপনি আপনার পরিবারকে নিয়ে বের হয়ে যান এবং নিজে তাদের পেছনে চলুন। আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পেছনে ফিরে না দেখে। যেদিকে যেতে হুকুম করা হচ্ছে সোজা সেদিকে চলে যান। আর আমরা তাকে আমাদের

১. অর্থাৎ নবীবর ইসহাক (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ। সূরা হূদে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ফায়সালা জানিয়ে দিয়েছি যে, সকাল হতে না হতেই এদের শিকড় কেটে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে শহরবাসী খুশি হয়ে লূতের বাড়িতে চড়াও হলো। লূত বললেন, দেখ, এরা আমার মেহমান, আমাকে অপমানিত করো না, তারা বলল, আমরা কি বারবার তোমাকে নিষেধ করি নি যে, দুনিয়ার সবকিছুর দায়িত্ব নিও না? লূত কাতর হয়ে বলল, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয় তাহলে এই যে আমার মেয়েরা আছে। (হে নবী!) আপনার জীবনের কসম, ঐ সময় তাদের উপর এক নেশা চেপে বসেছিল, যার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত পূর্বদিক আলোকিত হতেই একই বিকট শব্দ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমরা ঐ জনপদটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। এ ঘটনায় চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর ঐ এলাকাটি মানুষের চলাচলের পথের পাশেই রয়েছে।[১] নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য শিক্ষার খোরাক রয়েছে। -সূরা হিজর : ৫১-৭৭

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۞ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۞ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۞ قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ۞ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۞ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۞ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ط وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

অর্থ : লূতের কওম রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করেছিল, যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। সৃষ্টি জগতে শুধু তোমরাই কি (যৌন উদ্দেশ্যে) পুরুষদের কাছে যাও? আর তোমাদের রব তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কি বাদ দিয়ে থাক? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী কওম। তারা বলল, হে লূত! যদি তুমি এ সব কথা বলা বন্ধ না কর, তাহলে আমাদের এলাকা থেকে যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে তোমাকেও তাদের মধ্যে শামিল হতে হবে। লূত বললেন, তোমাদের কাজের জন্য যারা অসন্তুষ্ট আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে শামিল আছি। হে আমার রব! এরা যা কিছু করছে তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে নাজাত দাও। অবশেষে তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম, শুধু এক বুড়ি (তার স্ত্রী) ছাড়া যে তাদের মধ্যে গণ্য ছিল যারা পেছনে থেকে যায়।[২] তারপর আমি বাকি লোকদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। তাদের উপর আমি এক বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করলাম। যাদেরকে এর ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের উপর বর্ষিত এ বৃষ্টি খুবই মন্দ ছিল। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের বেশির ভাগ লোকই মুমিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব অত্যন্ত শক্তিশালী ও মেহেরবান। -সূরা শু'আরা :১৬০-১৭৫

১. হিজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরান এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণত কাফেলাসমূহের লোক এই পুরো এলাকার যেসব ধ্বংসের চিহ্ন আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে, তা দেখে থাকে।

২. অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায় প্রসঙ্গে সূরা নামলেও আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۞ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۞ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۞

অর্থ : আমি লূতকে পাঠালাম। যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা কি চোখে দেখে অশ্লীল কাজ করছ?১ তোমাদের এটাই কি চালচলন যে, তোমরা যৌন লালসা মিটানোর জন্য মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে যাও? আসলে তোমরা চরম মূর্খতায় পড়ে থাকা এক জাতি। কিন্তু তার কাওমের এছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, তারা বলল, লূতের পরিবারকে তোমাদের এলাকা থেকে বের করে দাও। এরা বড় পাক-পবিত্র সেজে আছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার পরিবারকে নাজাত দিলাম। তার স্ত্রীকে নয়, কারণ তার পেছনে পড়ে থাকাই আমার সিদ্ধান্ত। তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের জন্য সেই বৃষ্টি বড়ই মন্দ ছিল। -সূরা নাম্‌ল : ৫৪-৫৮

এ প্রসঙ্গেই সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ ۫ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۞ اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۙ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ ؕ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ؕ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۫ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞ وَلَمَّآ اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِىْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۫ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰٓى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۞ وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۞

অর্থ : আমি লূতকে পাঠালাম। যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের আগে দুনিয়াবাসীর মধ্যে কেউ করে নি। তোমাদের অবস্থা কি এই যে, (যৌন উদ্দেশ্যে) তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছ, রাহাজানি করছ এবং তোমাদের মজলিসে তোমরা মন্দ কাজ করছ? তারপর তার কাওমের পক্ষ থেকে এ কথা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিল না যে, "যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহর আযাব

১. অর্থাৎ "একে অপরের সামনে কুকর্ম করে থাক"। এর স্পষ্ট বিবরণ সূরা 'আনকাবূতের ২৯নং আয়াতেও দেওয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠকখানায়ও এ কুকর্ম করতো।

নিয়ে এসো দেখি।" লূত বললেন, হে আমার রব! এ ফাসাদীদের কওমের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। আমার পাঠানো (ফেরেশতারা) যখন সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌছল, তারা তাকে বলল, আমরা এ এলাকার লোকদের ধ্বংস করে দেবো।১ নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা বড়ই যালিম হয়ে গেছে। ইবরাহীম বললেন, "সেখানে তো লূত আছে"। তারা বলল, আমরা জানি যে, সেখানে কারা কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব। তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে তাদের মধ্যে গণ্য, যারা পেছনে পড়ে থাকে। তারপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌছল, তখন লূত খুব পেরেশান হলেন এবং তাঁর মন খুব ছোট হয়ে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে রক্ষা করব। আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য। আমরা এ জনপদের অধিবাসীদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করতে যাচ্ছি, ঐ সব ফাসেকী কাজের জন্য, যা তারা করে আসছে। আমি ঐ এলাকাটিকে তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি,২ যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। -সূরা 'আনকাবুত : ২৮-৩৫

সূরা সাফফাতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۞ وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই লূতও তাদেরই একজন, যাদেরকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়। স্মরণ কর, যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে নাজাত দিয়েছি, এক বুড়ি ছাড়া, যে তাদের মধ্যে শামিল ছিল, যারা পেছনে থেকে যায়। তারপর বাকি সবাইকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। এখন তোমরা রাতদিন ঐসব (উজাড় হয়ে যাওয়া) এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক। তোমরা কি বুঝ না? -সূরা সাফফাত : ১৩৩-১৩৮

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের ঘটনা বর্ণনার পরে সূরা যারিয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আপনারা কোন্ অভিযানে এসেছেন? তারা বললেন, আমাদেরকে এক অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।৩ যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি। যা আপনার

১. 'এই জনপদ' বলে কাওমে লূতের এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সে সময় হেবরন শহরে (বর্তমানে আল খলীল) বসবাস করতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেড-সি বা মৃত সাগরের সেই অংশ রয়েছে, যেখানে কাওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর উপর ডেড-সির পানি রয়েছে। এ এলাকা নিচের দিকে আছে। হেবরনের পাহাড়ি এলাকা থেকে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সুতরাং ফেরেশতারা এর দিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছেন, "আমরা এ বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি"।

২. এ 'সুস্পষ্ট প্রকাশো নিদর্শন' বলতে ডেড-সিকে বোঝানো হয়েছে, যাকে লূত সাগরও বলা হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদের কয়েক স্থানে মক্কার কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, এই যালিম কওমের উপর তাদের অপকর্মের ফলে যে আযাব এসেছিল তার এক নিদর্শন আজও প্রকাশ্য রাজপথে দেখা যায়। সিরিয়ার দিকে তোমরা যখন ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সফরে যাও তখন রাত-দিন তোমরা তা দেখতে পাও।

৩. অর্থাৎ লূত (আ)-এর জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, শুধু 'অপরাধী জাতি' শব্দটি বলা দ্বারাই কোন্ জাতির কথা বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

রবের নিকট সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে।১ তারপর ঐ বস্তির মধ্যে যারা মু'মিন ছিল তাদেরকে আমি বের করে আনলাম।১ আমি সেখানে একটি বাড়ি ছাড়া মুসলমানদের কোনো বাড়ি পাই নি। এরপর আমি সেখানে শুধু একটা নিদর্শন ঐ সব লোকদের জন্য রেখে দিলাম, যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।৩

–সূরা যারিয়াত : ৩১–৩৭

সূরা কামারে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ ۢ بِالنُّذُرِ ۞ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۞ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۞

"লূতের কওম সাবধানবাণীকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তাদের উপর পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠিয়েছিলাম। শুধু লূতের পরিবার তা থেকে রক্ষা পেয়েছে। আমার বিশেষ নিয়ামত হিসেবে আমি তাদেরকে শেষ রাতে উদ্ধার করে এনেছিলাম। এভাবেই আমি তাদেরকে বদলা দিয়ে থাকি, যারা শোকর আদায় করে। লূত নিজের কওমকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা যাবতীয় সাবধানবাণীকে সন্দেহজনক মনে করে কথায় কথায় উড়িয়ে দিচ্ছিল। তারপর তারা তাঁকে তাঁর মেহমানদেরকে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম। এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ। সকাল সকালই এক বিরামহীন আযাব তাদেরকে ধরে ফেলল। অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ। আমি উপদেশ নেওয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেওয়ার মতো কি কেউ আছে?" –সূরা কামার : ৩৩–৪০

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে হযরত লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত নূহ (আ), হূদ (আ) ও সালেহ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার সাথেও এর আলোচনা করা হয়েছে। আমি উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং বুযুর্গদের বর্ণনার আলোকে হযরত লূত (আ)-এর কাহিনী বিশদভাবে আলোচনা করব। আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

হযরত লূত (আ) যখন তাঁর জাতির লোকদেরকে লা-শারীক এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্যে বললেন এবং অসৎ ও অশ্লীল কাজসমূহ না করতে বললেন, তখন তারা হযরত লূত (আ)-এর কথাকে উপেক্ষা করল এবং একটি লোকও তাঁর প্রতি ঈমান আনল না। তাদেরকে যে অন্যায় ও অশ্লীল কাজগুলো করতে নিষেধ করা হলো, সেগুলো থেকেও তারা বেঁচে থাকল না। বরং তারা তাদের সেই অন্যায় কাজের উপরই অটল থাকল এবং অবাধ্যতা ও অশ্লীলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। বরং তারা সবাই মিলে হযরত লূত (আ)-কে নিজ দেশ থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করে এবং তাকে উপহাস করে। লূত (আ) যখন তাদেরকে সত্য পথের দিকে দাওয়াত দেন, তখন এ মূর্খ-পাপীরা এ কথাই বলে থাকে যে, "লূত ও তার পরিবারকে দেশ থেকে বের করে দাও। তারা পবিত্র সাজতে চায়।" তারা হযরত লূত (আ)-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যাতে তিনি নিজ ইচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে চলে যান। শুধু তাদের কুফরী ও হিংসা তাদেরকে এরূপ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ

১. অর্থাৎ প্রতিটি পাথরকে আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, কোনটি কোন্ অপরাধীর মাথা ভেঙে দেবে।
২. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কীভাবে হযরত লূত (আ)-এর কাছে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে লূত (আ)-এর কাওম ও তাদের মধ্যে কী সব ব্যাপার ঘটেছিল সে কাহিনী মাঝে বাদ দেওয়া হয়েছে।
৩. 'একটি নিদর্শন' অর্থ মৃত সাগর। আজও যার দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে পবিত্র রাখলেন এবং তাঁদেরকে সম্মানের সাথে সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন। তবে তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত। আল্লাহ তা'আলা চিরস্থায়ীভাবে গোটা জনপদ উল্টিয়ে দিয়ে দুর্গন্ধময় সমুদ্র বানিয়ে দিলেন। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে কওমে লূতের উপর আপতিত আগুন ও তাপ প্রবাহ। সেই (সমুদ্রের) পানি আজ পর্যন্ত তিক্ত ও লবণাক্ত।

হযরত লূত (আ)-এর জাতির লোকেরা তাদের নবীকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার হুমকী তখনই দিয়েছে, যখন তিনি তাদেরকে সেই অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা ইতঃপূর্বে এ বিশ্বে আর কেউ করে নি। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশটিকে বিশ্বের মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন। তারা শুধু এ জঘন্য কাজই করতো না, বরং ছিনতাই, রাহাজানি, প্রতারণা, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাতকরণ, প্রকাশ্য মজলিসে নির্লজ্জ কথাবার্তা এবং অশ্লীল আচরণ প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকত। এমনকি তারা ইচ্ছা করে মজলিসে বসে স-শব্দে বায়ু ত্যাগ করতো। এটাকে তারা কোনো খারাপ কাজ মনে করতো না। এছাড়াও প্রকাশ্য সভায় তারা এর চেয়েও বড় বড় অপরাধের কাজ করতো। এগুলো তারা কোনো খারাপ কাজ বলে মনেই করতো না। তারা কোনো উপদেশের ভ্রুক্ষেপ করতো না। জ্ঞানী ও সৎলোকদের উপদেশসমূহকে উপেক্ষা করতো। এরূপ কাজ ও আচরণের দ্বারা তারা প্রস্তর সদৃশ হয়ে গিয়েছিল; বরং ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের এ অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত থাকে নি এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়নি। ভবিষ্যতে এসব জঘন্য ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে, এ ধরনের কোনো চিন্তাও তাদের মনে উদয় হয় নি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তি দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করেন। এ শাস্তি তারা নিজেরাই চেয়েছিল। তারা নবী (আ)-কে বলেছিল, "তুমি সত্যবাদী হলে আল্লাহর শাস্তি আমাদের জন্যে নিয়ে এসো।" –সূরা আনকাবূত : ২৯

আল্লাহ যে কঠিন শাস্তি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, সে শাস্তি তারা নিজেরাই চেয়েছিল। এ সময় তাদের নবী হযরত লূত (আ) নিরাশ ও অসহায় হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এ বলে আবেদন জানান যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সাহায্য করুন এবং এ পাপী ও অনাচারী জাতি থেকে আমাকে রক্ষা করুন। নবীর প্রতি তার জাতির এরূপ আচরণে আল্লাহ তা'আলা ভীষণ ক্রোধান্বিত হন। তিনি (আল্লাহ) নবীর দো'আ কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা পূর্ণ করেন। আল্লাহ তাঁর বিশেষ ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করেন। তাঁরা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে এক জ্ঞানবান পুত্রের সুসংবাদ দেন। তারপর ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-কে লূত (আ)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কেও অবহীত করেন যে, তাঁরা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞

অর্থ : ইবরাহীম বললেন, হে ফেরেশতাগণ! আপনারা কোন্ অভিযানে এসেছেন? তাঁরা বললেন, আমাদেরকে এক অপরাধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।[১] যেন তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষণ করি। যা আপনার রবের নিকট সীমা লঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে।[২] –সূরা যারিয়াত : ৩১–৩৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ۙ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا

১. অর্থাৎ লূত (আ)-এর জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, শুধু 'অপরাধী জাতি' শব্দটি বলা দ্বারাই কোন্ জাতির কথা বলা হচ্ছে তা বোঝার জন্য যথেষ্ট ছিল।

২. অর্থাৎ প্রতিটি পাথরকে আপনার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল যে, কোন্‌টি কোন্ অপরাধীর মাথা ভেঙে দেবে।

ظٰلِمِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۡ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞ وَلَمَّآ اَنْ جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ۡ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۞

অর্থ : আমার পাঠানো (ফেরেশতারা) যখন সুখবর নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌঁছল, তারা তাকে বলল, আমরা এ এলাকার লোকদের ধ্বংস করে দেবো।[১] নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা বড়ই যালিম হয়ে গেছে। ইবরাহীম বললেন, "সেখানে তো লূত আছে"। তারা বলল, আমরা জানি যে, সেখানে কারা কারা আছে। আমরা তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব। তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে তাদের মধ্যে গণ্য, যারা পেছনে পড়ে থাকে। তারপর যখন আমার পাঠানো ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌঁছল, তখন লূত খুব পেরেশান হলেন এবং তাঁর মন খুব ছোট হয়ে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারকে রক্ষা করব। আপনার স্ত্রীকে ছাড়া। সে পেছনে পড়ে থাকা লোকদের মধ্যে গণ্য। –সূরা 'আনকাবুত : ৩১–৩৩

এরপর ইবরাহীম (আ) তাঁর ভাতিজা লূত (আ) সম্পর্কে যে ভূমিকা রাখেন তা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاۗءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۞

অর্থ : তারপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হয়ে গেল এবং (সন্তানের সুখবরে) তার মন খুশি হলো, তখন তিনি লূতের কওমের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া শুরু করলেন।[২] –সূরা হুদ : ৭৪

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আ) লূত (আ)-এর জাতির মুক্তির জন্য তাঁদের কাছে জোর সুপারিশ করলেন। কারণ, ইবরাহীম (আ)-এর মনে করতেন যে, তাঁর কথা মানবেন এবং তাদের শাস্তি না দিয়ে ফিরে যাবেন।

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۞ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَاۗءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۞

অর্থ : আসলে ইবরাহীম বড়ই সহনশীল ও নরম মনের মানুষ ছিলেন এবং সর্ব অবস্থায়ই আমার দিকে ফিরে থাকতেন। (অবশেষে আমার ফেরেশতারা তাঁকে বলল) হে ইবরাহীম, আপনি এ থেকে বিরত থাকুন। আপনার রবের হুকুম এসে গেছে। এখন তাদের উপর ঐ আযাব অবশ্যই আসবে, কেউ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

–সূরা হুদ : ৭৫–৭৬

১. *'এই এলাকা' বলে কওমে লূতের এলাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সে সময় হেবরন (বর্তমানে আল খলীল) শহরে বসবাস করতেন। এ শহরের দক্ষিণ–পূর্বে কয়েক মাইল দূরে ডেড-সি বা মৃত সাগরের সেই অংশ রয়েছে, যেখানে কাওমে লূতের বাসভূমি ছিল। এখন এর উপর ডেড-সির পানি রয়েছে। এ এলাকা নিচের দিকে আছে। হেবরনের পাহাড়ি এলাকা থেকে তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সুতরাং ফেরেশতারা এর দিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছেন, "আমরা এ বস্তিকে ধ্বংস করতে এসেছি"।*

২. *'ঝগড়া করা' শব্দটি এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর সাথে যে একান্ত মহব্বতের সম্পর্ক রাখতেন তারই প্রমাণ। এ শব্দ দ্বারা চোখের সামনে এমন একটি চিত্র ফুটে ওঠে যেমন– বান্দাহ ও তার মা'বুদের মধ্যে অনেক সময় ধরে পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। বান্দাহ জেদ করে বলে, যেভাবেই হোক লূতের কাওমের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দেওয়া হোক। আল্লাহ উত্তরে বলেন, এ জাতির মধ্যে ভালো বলতে আর কিছু বাকি নেই এবং তাদের অপরাধ এত বেশি যে, তাদের প্রতি কোনো দয়া করা চলে না। কিন্তু বান্দাহ এরপরও বলতে থাকে, 'হে প্রভু! যদি সামান্য কিছু ভালোও তাদের মধ্যে থেকে থাকে, তবে আরো কিছু সময় দিন।'*

অর্থাৎ, হে ইবরাহীম! তুমি এমন কথা বল না, এছাড়া অন্য কথা বল। কারণ, তাদের পালনকর্তারই নির্দেশ, যা অপরিবর্তনীয়। এ শাস্তি তাদের উপর আসবেই।

হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের, সুদ্দী, কাতাদাহ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাগণকে এ কথা বলেছিলেন যে, "তোমরা কি এরূপ এক জনপদকে ধ্বংস করবে, যার মধ্যে রয়েছে তিনশ' মু'মিন।" ফেরেশতাগণ বললেন, না। (অর্থাৎ সেখানে তিনশ' মু'মিন নেই।)

হযরত ইবরাহীম (আ) বললেন, তবে কি দু'শ মু'মিন রয়েছে? তাঁরা বললেন, না। তিনি বললেন, তবে চল্লিশজন মু'মিন রয়েছে? তাঁরা বলল, না। তিনি বললেন, তবে চৌদ্দজন মু'মিন রয়েছে? তাঁরা বললেন না। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, তাঁদের পারস্পরিক কথোপকথন এ পর্যন্ত গিয়ে পৌছল যে, শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, যদি সেখানে একজন মু'মিনও থাকে, তবে সে এলাকা ধ্বংস করার ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? তাঁরা জবাবে বললেন, না। অর্থাৎ, আমরা তাঁদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়ে সেই এলাকাকে ধ্বংস করব।

এ কথাটি কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে যে—

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ۭ قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا ۡ لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۡ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ۔

অর্থ : ইবরাহীম বলল, এ জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি। –সূরা আনকাবূত : ৩২

আহলে কিতাবরা এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করেছিলেন যে, হে পরওয়ারদেগার! সেই এলাকায় পঞ্চাশজন পুণ্যবান (নেককার) লোক থাকলেও আপনি কি তাদের নিপাত করবেন? আল্লাহ বললেন, না। যখন সেখানে পঞ্চাশজন পুণ্যবান (নেককার) লোক থাকবে, আমি তাদেরকে নিপাত করব না। এভাবে ইবরাহীম (আ) দশজন পর্যন্ত নেমে এসে আরয করেন, দশজন থাকলেও কি আপনি তাদের নিপাত করবেন? আল্লাহ বললেন, না, তাদের মধ্যে দশজন পুণ্যবান (নেককার) লোক থাকলেও আমি তাদের নিপাত করব না। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَمَّا جَاۗءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْۗءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ۔

অর্থ : যখন আমার ফেরেশতারা লূতের কাছে পৌছল, তখন তিনি তাদের আগমনে খুব ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মন ছোট হয়ে গেল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আজ বড়ই বিপদের দিন।১ –সূরা হূদ : ৭৭

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ প্রেরিত ফেরেশতাগণ ছিলেন, জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ)। এ ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে বিদায় নিয়ে হযরত লূত (আ)-এর এলাকা সুদ্দুম নগরে চলে আসেন। ফেরেশতাগণ সুদর্শন বালকরূপে উপস্থিত হন। আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর জাতির পরীক্ষাস্বরূপ এবং প্রকাশ্য দলীলস্বরূপ বালকরূপে তাদের প্রেরণ করেছিলেন। এ বালকরূপী ফেরেশতাগণ সূর্যাস্তের মুহূর্তে হযরত লূত (আ)-এর কাছে মেহমানরূপে উপস্থিত হন। হযরত লূত (আ) তাঁদের দেখে ভীত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি যদি এঁদেরকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ না করি, তবে তাঁরা আমার এ জনপদের কোনো এক জায়গায় গিয়ে মেহমান হবেন। হযরত লূত (আ) এদেরকে সাধারণ মানুষই মনে করেছিলেন। এদেরকে তিনি ফেরেশতা ধারণা করেননি।

১. *ফেরেশতারা সুন্দর বালকদের রূপে হযরত লূত (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। তিনি জানতেন না যে, এরা ফেরেশতা। এ কারণেই এই অতিথিদের আগমনে তিনি অত্যন্ত পেরেশানি বোধ করেছিলেন। তিনি নিজ জাতি সম্পর্কে জানতেন যে, তারা কতটা বেহায়া হয়ে গিয়েছিল।*

এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, হযরত লূত (আ)-এর উপর ছিল এটি একটি কঠিন পরীক্ষা। কারণ, তিনি জানতেন যে, এ মেহমানদেরকে গ্রহণ না করলে, তাঁরা নিশ্চয়ই কোনো অসৎ ও অশ্লীল লোকদের হাতে পড়ে যাবে। আর যদি তাঁদেরকে রাখা হয়, তবে তাঁদেরকে দুষ্টদের হাত থেকে নিরাপদে রাখা যাবে না। আর গোত্রের লোকেরা হযরত লূত (আ)-কে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে যে, কোনো মেহমান যেন তাঁর কাছে না রাখা হয়। বরং মেহমান তাদের দায়িত্বেই থাকবে। মোটকথা হযরত লূত (আ) এক মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। তিনি এর থেকে বাঁচার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, ফেরেশতাগণ অতীব সুদর্শন বালকরূপে যখন হযরত লূত (আ)-এর কাছে আসেন, তখন লূত (আ) জনপদের বাইরে নিজ ক্ষেতে কাজ করছিলেন। তাঁরা মেহমান হওয়ার কথা বললে, লূত (আ) তা প্রত্যাখ্যান করতে খুবই লজ্জাবোধ করলেন। তিনি তাঁদের আগে আগে চললেন এবং তাদের সাথে ইঙ্গিতে এরূপ কথা বলেছিলেন, যতে তারা বুঝতে পারে যে, এ স্থানটি তাঁদের জন্য নিরাপদ নয় এবং এ চিন্তা করে তারা যাতে অন্য (নিরাপদ) এলাকায় চলে যায়। লূত (আ) তাঁদের সাথে এ কথাও কয়েকবার বলেছিলেন যে, "আল্লাহর কসম! এ এলাকার লোকের চাইতে অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোক পৃথিবীতে আর কেউ নেই।" এ কথাটি তিনি চার বার বলেছিলেন। মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফেরেশতাগণকে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, জনপদকে ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নবী তাঁদের জাতির অশ্লীল ও অসৎ কাজের কথা নিজ যবানে সাক্ষ্য না দেন। হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে বিদায় নিয়ে হযরত লূত (আ)-এর জাতির কাছে রওয়ানা হন এবং দুপুর বেলা সেখানে পৌঁছেন। সুদ্দুম শহরে পৌঁছার পর তাঁদের সাথে হযরত লূত (আ)-এর এক কন্যার সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সুদ্দুম নদীর পারে এসেছিলেন। হযরত লূত (আ)-এর দু'টি মেয়ে ছিল। বড় মেয়ের নাম ছিল 'রায়ছা', আর ছোট মেয়ের নাম ছিল, 'যাগরা'। ফেরেশতাগণ সেই মেয়ের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এখানে মেহমান হিসেবে কোথায় অবস্থান করতে পারি? মেয়েটি জবাব দিল, আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে এসে আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। মূলত মেয়েটি এ আশঙ্কা করছিলেন যে, যদি এ মেহমানগণ সম্প্রদায়ের হাতে পড়ে যায়, তবে তাঁরা খুব অসম্মানিত হবে। কন্যা তাঁর পিতা হযরত লূত (আ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আব্বাজান! শহরের বাইরে কিছু সংখ্যক অপরিচিত সুদর্শন বালক মেহমান হিসেবে আগমন করেছেন। তাঁরা আপনার কাছে আসতে চান। তাঁদের মতো সুঠাম ও সুদর্শন লোক এ জাতির মধ্যে নেই। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদেরকে আবার পাকড়াও না করে এবং অসম্মানিত না করে? ইতপূর্বে হযরত লূত (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা কোনো মেহমান তাঁর নিজ দায়িত্বে রাখতেও নিষেধ করেছিল। কিন্তু হযরত লূত (আ) মেহমানদের সম্মান ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, অতি গোপনে তাঁদেরকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। হযরত লূত (আ)-এর পরিবারের লোকজন ব্যতীত আর কেউই এই মেহমানদের সংবাদ জানতে পারে নি। কিন্তু লূত (আ)-এর স্ত্রী, সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী লোকদেরকে গোপনে এ মেহমানদের সংবাদ জানিয়ে দিল। সে তাদেরকে বলল, লূত (আ)-এর ঘরে এরূপ কিছু সংখ্যক সুদর্শন বালক আগমন করেছে, তাদের ন্যায় সুন্দর ও সুঠাম বালক আমি আর কখনো দেখিনি। গোত্রের লোকেরা এ সংবাদ পেয়ে উদভ্রান্ত হয়ে দ্রুত লূত (আ)-এর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ ۔

অর্থ : (ঐ মেহমানদেরকে দেখে) ঐ কওমের লোকেরা দৌড়ে আসতে লাগল। এর আগেও এরা এ রকম মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললেন, হে আমার কাওম! এই যে আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র।[১]" –সূরা হুদ : ৭৮

অর্থাৎ এটাই শুধু তাদের অন্যায় ও পাপের কাজ ছিল না; বরং এর পূর্বেও তারা বিভিন্ন পাপ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত থাকত। হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যৌন চাহিদা পূর্ণ কর। বালকদের সাথে অশ্লীল ও অন্যায় আচরণ করা থেকে বিরত থাক। হযরত লূত (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে যে বলেছিলেন, "এরা আমার কন্যা", এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, নবী স্বীয় উম্মতের জন্য পিতৃসদৃশ। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "নবী মু'মিনদের কাছে তাদের নিজদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তার পত্নিগণ তাদের মাতা। –সূরা আহযাব : ৬

উক্ত আয়াতে এ কথাটি অতীব স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী মু'মিনদের পিতা। হযরত লূত (আ) যে বলেছিলেন, "এরা আমার কন্যা" এর অর্থ হলো এই যে, তোমরা নিজ জাতির মহিলাগণকে বিবাহ করে তোমাদের যৌন চাহিদা পূর্ণ কর। গোত্রের লোকদের প্রতি হযরত লূত (আ)-এর কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন—

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

অর্থ : সৃষ্টি জগতে শুধু তোমরাই কি (যৌন উদ্দেশ্যে) পুরুষদের কাছে যাও? আর তোমাদের রব তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কি বাদ দিয়ে থাক? বরং তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী কাওম।

–সূরা শু'আরা :১৬৫-১৬৬

যৌন চাহিদা পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকেই ক্ষেত্র বানিয়েছেন। সুতরাং হযরত লূত (আ)-এর কথায়ও এ স্ত্রীদেরকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কামবাসনা পূর্ণ করার জন্যে তোমাদের স্ত্রীরাই তোমাদের জন্য শুধু বৈধ।

হযরত মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, রাবী ইবনে আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ) সকলেই উক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক ও বিশুদ্ধ বলেছেন। দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ, নিজের কন্যাকে বুঝানো, এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। আহলে কিতাব থেকে এ মতটি সংগৃহীত। তারা তাদের কিতাবে (সহীফায়) নিজেদের থেকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। অনুরূপভাবে তারা আর একটি ভুল তথ্য বর্ণনা করেছে।

হযরত লূত (আ)-এর কাছে আগমণকারী ফেরেশতার সংখ্যা ছিল দু'জন এবং তাঁরা এসেছিলেন ইশার সময়। তাঁরা রাতের খাবারও লূত (আ)-এর সাথে একত্রে খেয়েছিলেন। অথচ কুরআন মাজীদের বর্ণনায় এসেছে যে, ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর সাথে আহার করেন নি। কারণ, ফেরেশতাগণ এরূপ আহার ও পানাহার থেকে পবিত্র। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণ বহু মিথ্যা ও বানোয়াট কথা এ ঘটনায় সংযুক্ত করেছে।

অবশেষে হযরত লূত (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে বললেন—

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ۚ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝

১. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত লূত (আ) তাদের সামনে নিজের কন্যাদেরকে বিয়ে করার জন্য পেশ করেছিলেন। 'তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র' বাক্যাংশটির এরূপ ভুল অর্থ গ্রহণের কোনো অবকাশ রাখেনি। হযরত লূতের কথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের নাফসের খাহেশ আল্লাহর দেওয়া জায়েয উপায়ে পূরণ কর। এর জন্য মেয়েলোকের কোনো অভাব নেই।

অর্থ : (ঐ মেহমানদেরকে দেখে) ঐ কওমের লোকেরা দৌড়ে আসতে লাগল। এর আগেও এরা এ রকম মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল। লূত তাদেরকে বললেন, হে আমার কওম! এ যে আমার মেয়েরা রয়েছে। তোমাদের জন্য এরা বেশি পবিত্র। আল্লাহকে তো কিছু ভয় কর। আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপদস্থ করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভালো মানুষ নেই? -সূরা হুদ : ৭৮

হযরত লূত (আ)-এর দুটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটি হলো, জাতির লোকদেরকে হযরত লূত (আ) এরূপ অসৎ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। দ্বিতীয় হলো, ফেরেশতাদের কাছে তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো সৎ ও পুণ্যবান লোক নেই। এ গোত্রের সকল লোকেরাই পাপী, মূর্খ, চরম অবাধ্য ও অপরাধী। ফেরেশতাগণেরও ইচ্ছা ছিল যে, তাঁদের জিজ্ঞেসা করার পূর্বেই লূত (আ) নিজেই ইচ্ছা করে যেন তাঁর সম্প্রদায়ের অশ্লীলতা ও পাপাচারের কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন। যাতে তাদের জন্য এটা দলীল হয়ে যায়। হযরত লূত (আ) জাতির লোকদেরকে বলেছিলেন যে, এ মেহমানদের সাথে অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কর না, তখন পাপীষ্ঠরা উত্তরে বলেছিল যে—

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۞

অর্থ : তারা জবাব দিলো, তুমি তো জানো যে, তোমার মেয়েদের উপর আমাদের কোনো অধিকার নেই। আমরা কী চাই তুমি তা অবশ্যই জানো। -সূরা হুদ : ৭৯

তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ! তারা নির্লজ্জভাবে নবীর সামনে বলেছিল, আমাদের স্ত্রীদের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই; বরং আমাদের আকর্ষণ কিসের প্রতি তা তো তুমি জানই। কতখানি তাদের বেআদবী ও নির্লজ্জতা! এ কারণেই তাদের এ কথা শুনে হযরত লূত (আ) বলেছিলেন—

قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۞

অর্থ : লূত বললেন, হায় তোমাদেরকে সোজা করে দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত! কিংবা আশ্রয় নেবার মতো কোনো মযবুত শক্তি যদি পেতাম। -সূরা হুদ : ৮০

লূত (আ)-এর উক্ত কথায় তাঁর নিঃসঙ্গতা ও নিঃসহায়তার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দুঃখের সাথে বলেছেন, যদি আমি আজ শক্তিশালী হতাম, আমার যদি জনবল থাকত এবং তারা আমাকে তোমাদের মোবাবিলায় সাহায্য করতো, তবে আমি আমার মেহমানদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে পারতাম এবং তাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করতাম, যা তাদের জন্যে উপযুক্ত। হযরত লূত (আ) যে বলেছিলেন, "যদি আমি নিতে পারতাম এক শক্তিশালী আশ্রয়" এ কথাটির অর্থ কি? এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সন্দেহ করার ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম (আ)-এর চেয়ে অধিক দাবিদার। আল্লাহ হযরত লূত (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী আশ্রয় (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়) প্রার্থনা করেছিলেন। ইউসুফ (আ) জেলখানায় যতদিন অবস্থান করেছিলেন, আমি যদি ততদিন জেলখানায় অবস্থান করতাম, তবে অবশ্যই আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিতাম।

হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে এরূপ বলার অর্থ এই যে, তিনি শুধু আত্মার প্রশান্তির জন্যে আল্লাহর কাছে আরয করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিরূপে পুনর্জীবিত করবেন, তা একটু আমাকে দেখান। ইবরাহীম (আ)-এর অন্তরে এ ব্যাপারে যদি কোনই সন্দেহ থাকত, তবে আমরা সন্দেহের ব্যাপারে তাঁর চেয়েও অগ্রগামী থাকতাম। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঈমান অত্যন্ত শক্তিশালী ও সন্দেহমুক্ত ছিল। সন্দেহ থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আর হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন, তাঁর অর্থ এই যে, জেলখানায় থাকাকালে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে যখন বাদশাহর পক্ষ থেকে মুক্তির প্রস্তাব আসে, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [ইউসুফ (আ)-এর পরিবর্তে] আমি যদি হতাম তবে আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

অন্য এক হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ লূত (আ)-এর উপর রহম করুন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী আশ্রয় কামনা করেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় কামনা করেছিলেন। সুতরাং তাঁর (প্রার্থনার) পর থেকেই সকল নবীগণকে তাঁর জাতির মধ্যে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী করে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۞ قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ ۞ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنَ ۞ قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۞

অর্থ : ইতোমধ্যে শহরবাসী খুশি হয়ে লূতের বাড়িতে চড়াও হলো। লূত বললেন, দেখ, এরা আমার মেহমান, আমাকে অপমানিত করো না। আল্লাহকে ভয় কর। আমাকে লাঞ্ছিত করো না। তারা বলল, আমরা কি বারবার তোমাকে নিষেধ করি নি যে, দুনিয়ার সব কিছুর দায়িত্ব নিও না? লূত কাতর হয়ে বললেন, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়, তাহলে এই যে আমার মেয়েরা আছে। -সূরা হিজর : ৬৭-৭১

অর্থাৎ, যদি কিছু করতেই চাও, তবে গোত্রের মহিলাদেরকে বিবাহ করে কাম বাসনা পূর্ণ কর।

হযরত লূত (আ) সম্প্রদায়ের লোকদেরকে তাদের স্ত্রীদের কাছে গমন করার জন্যে এবং অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বললেন। কিন্তু তারা যৌন আবেগে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। লূত (আ)-এর কথায় আদৌ ভ্রুক্ষেপ করল না এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরতও রইল না। লূত (আ) যতই তাদেরকে বিরত থাকার জন্যে বললেন, ততই তারা অত্যন্ত লুব্ধ হয়ে সেই মেহমানদের নিকট যাবার জন্যে চেষ্টা করল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনের কসম দিয়ে বলেন—

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞

অর্থ : (হে নবী!) আপনার জীবনের কসম, ঐ সময় তাদের উপর এক নেশা চেপে বসেছিল, যার ফলে তারা দিশেহারা হয়ে গেছে। -সূরা হিজর : ৭২

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۞ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞

অর্থ : লূত নিজের কওমকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল; কিন্তু তারা যাবতীয় সাবধানবাণীকে সন্দেহজনক মনে করে কথায় কথায় উড়িয়ে দিচ্ছিল। তারপর তারা তাঁকে তাঁর মেহমানদেরকে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম। এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ। সকাল সকালই এক বিরামহীন আযাব তাদেরকে ধরে ফেলল। -সূরা কামার : ৩৬-৩৮

মুফাসসির ও আলিমগণ বলেছেন, হযরত লূত (আ) মেহমানদেরকে ঘরের মধ্যে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি নিজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একদিকে গোত্রের লোকদেরকে ঘরে প্রবেশে বাধা দেন এবং অন্যদিকে এরূপ অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যও উপদেশ দিতে থাকেন। কিন্তু গোত্রের দুষ্ট লোকেরা এতে মোটেই নিবৃত্ত হলো না। বরং আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল এবং লূত (আ)-এর সাথে প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করে দিল। অবশেষে লূত (আ) নিরুপায় ও অসহায় হয়ে বললেন—

لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْٓ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۔

অর্থ : হায় তোমাদেরকে সোজা করে দেওয়ার শক্তি যদি আমার থাকত! অথবা আশ্রয় নেবার মতো কোনো সুদৃঢ় শক্তি যদি পেতাম। –সূরা হূদ : ৮০

অর্থাৎ আমার যদি আজ শক্তিশালী হতাম, তবে অবশ্যই আমি মেহমানদেরকে তোমাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতাম এবং তোমাদেরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতাম। তারপর ফেরেশতাগণ লূত (আ)-এর কাছে তাঁদের আসল পরিচয় দিয়ে বললেন—

يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْٓا اِلَيْكَ .

অর্থ : হে লূত! আমরা আপনার রবের পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতা। এরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। –সূরা হূদ : ৮১

মুফাসসিরগণ বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) ঘর থেকে ওদের সম্মুখে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁর নিজ পাখা দ্বারা ওদের মুখমণ্ডলে আঘাত করেন। ফলে ওরা সবাই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল। কথিত আছে যে, ওদের মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ সমান হয়ে গিয়েছিল। চোখের কোনো চিহ্ন বাকি রইল না।

তারপর ওরা চিৎকার করতে করতে প্রাচীর ঘেঁষে ঘেঁষে কোনোভাবে পলায়ন করল। কিন্তু ওরা এ অবস্থায়ও ভীষণ ঔদ্ধত্যের সাথে হযরত লূত (আ)-কে এই হুকমী দিয়ে চলে গেল যে, "আগামীকাল দুপুর বেলা আমরা তোমাকে দেখে নেব"।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞

অর্থ : তারপর তারা তাঁকে তাঁর মেহমানদেরকে রক্ষা করা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ নষ্ট করে দিলাম। এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা বুঝ। সকাল সকালই এক বিরামহীন আযাব তাদেরকে ধরে ফেলল। –সূরা কামার : ৩৭–৩৮

লূত জাতির প্রতি আল্লাহ তা'আলার শাস্তি এরূপে এসেছে যে, প্রথমে ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে বলেছিলেন, আপনি আপনার পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের কোনো এক সময় এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়বেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ পিছন দিকে তাকাবে না। অর্থাৎ, যখন আল্লাহর শাস্তির শব্দ শোনা যাবে, তখন কেউ সেদিকে তাকাবে না। ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে এ কথাও বলেছিলেন যে, আপনি সবার পিছনে চলবেন।

এ অভিশপ্তরা পরবর্তী যুগের অবাধ্য ও অশ্লীল লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। হযরত লূত (আ)-এর পরিবারের মধ্যে ছিল শুধু তাঁর দু' কন্যা। কোনো পুরুষ তাঁর পরিবারে ছিল না। পরিবারের সেই দুই কন্যাকে নিয়ে লূত (আ) বাইরে বেরিয়ে পড়েন। কেউ কেউ বলেন যে, লূত (আ)-এর স্ত্রীও তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

যখন লূত (আ) তাঁর পরিবার-পরিজনসহ নিজ এলাকা ত্যাগ করেন এবং সূর্য উদিত হয়, তখনই লূত (আ)-এর গোত্রের উপর আল্লাহর কঠিন শাস্তি আপতিত হয়। সে শাস্তি ছিল অপ্রতিরোধণীয় ও অসহনীয়।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন যে, হযরত লূত (আ)-কে ফেরেশতাগণ নিজ এলাকা ত্যাগ না করে সেখানে অবস্থিত একটি পাহাড়ের উপরে উঠার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু হযরত লূত (আ) ফেরেশতাগণকে জানান যে, আমি নিকটবর্তী কোনো এক জনপদে চলে যেতে চাচ্ছি। ফেরেশতাগণ বললেন, ঠিক আছে। আপনি আপনার পছন্দমতো এক এলাকায় চলে যান। আমরা আপনার সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আপনি সেই এলাকায়

পৌঁছে সেখানেই অবস্থান করবেন। তারপর আমরা এ সম্প্রদায়ের উপর আযাব বর্ষণ করব। বর্ণিত আছে যে, (রাতের মধ্যেই) হযরত লূত (আ) "সাওয়ার" নামক একটি এলাকায় চলে যান। যে এলাকাটি "গাওর যাগর" নামে সবার কাছে পরিচিত। তারপর যখন সূর্য উদয় হলো তখনই আল্লাহর আযাব তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করল। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন—

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۙ مَّنضُودٍ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞

অর্থ : যখন আমার ফায়সালার সময় এসে গেল, তখন আমি ঐ এলাকার উপরভাগকে নিচে উলটিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বৃষ্টির মতো বর্ষণ করলাম, যার প্রতিটি পাথর আপনার রবের নিকট চিহ্নিত ছিল।[১] আর যালিমদের থেকে এ সাজা মোটেই দূরে নয়। -সূরা হূদ : ৮২-৮৩

এ এলাকাটিতে সাতটি শহর ছিল। (সেই সময় বড় বড় শহরকে এলাকা বলা হতো) সেই এলাকায় লোকের সংখ্যা ছিল এক বর্ণনা মতে চারশ। আর এক বর্ণনা মতে চার হাজার। সেখানে পশুপক্ষী ও জীব-জন্তুও ছিল। হযরত জিবরাঈল (আ) সেই এলাকাটিকে লোকজন, জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষী সবসহ তাঁর ডানার এক পার্শ্ব দ্বারা উপড়িয়ে আকাশের কাছাকাছি নিয়ে যান। এত কাছাকাছি নিয়ে যান যে, আকাশবাসীরা মোরগের আওয়াজ ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনতে পান। তারপর জিবরাঈল (আ) এলাকাটিকে সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে নিক্ষেপ করেন। যাতে এলাকারর উপরিভাগ নিচে উপুর হয়ে পড়ে। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, সর্বপ্রথম নিচে পতিত হয় তাদের সর্দার ও শ্রেষ্ঠয় বক্তিবর্গ। এরপর পাথরের বর্ষণ হয়। যেগুলো ছিল খুবই শক্ত কঙ্কর। আর সে কঙ্কর অবিরত তাদের উপর বর্ষিত হতে ছিল। আর প্রতিটি পাথরের উপর সেই ব্যক্তির নাম লেখা ছিল, যার উপর সেটি পতিত হবে এবং তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ.

অর্থ : (সেই পাথর, কঙ্কর) যা আপনার প্রতিপালক থেকে চিহ্নিত ছিল, সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বর্ণনা করেন— -সূরা যারিয়াত : ৩৪

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.

অর্থ : তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। -সূরা শুআরা : ১৭৩

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ.

অর্থ : সেই (জনপদ) টিকে আচ্ছন্ন করল কি সর্বগ্রাসী শাস্তি। -সূরা নাজম : ৫৪

এলাকাটিকে পাথর দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেয়া হয়েছিল। আর সে পাথরগুলো ছিল অতি শক্ত কঙ্কর। যা ক্রমাগত বর্ষিত হচ্ছিল ওদের উপর, যাদের নাম সে কঙ্করে লেখা ছিল। সে কঙ্কর যারা সে জনপদে ছিল তাদের উপরও গিয়ে পৌঁছল এবং যারা জনপদ থেকে দূরে কোথাও সফরে ছিল, সেখানে গিয়েও তাদের উপর পতিত হলো। অর্থাৎ, সে পাথরে যার নাম লেখা ছিল, সে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই তাকে পাকড়াও করল। হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সে গোত্রের লোকদের সাথে থেকে গিয়েছিল। আর এক বর্ণনা মতে, সে হযরত লূত (আ)-এর সাথে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে (স্ত্রী) যখন শাস্তির শব্দ এবং শহর পতিত

১. অর্থাৎ প্রতিটি পাথরের টুকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে চিহ্নিত ছিল যে, কোন্ পাথরটি কী কী ধ্বংসকার্য সাধন করবে ও কোনটি কোন অপরাধীর উপর পড়বে।

হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেয়ে নিজ জাতির দিকে পিছনে ফিরে তাকায় এবং নিজ প্রতিপালকের অবাধ্য হয়, তখন সে খুব আফসোস করে বলতে থাকে, হায় আমার জাতি! এ সময় তার উপরও একটি পাথর পতিত হয়। যাতে জাতির অন্যান্যের মতো তার মাথাও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, লূত (আ)-এর স্ত্রী তার জাতির মতের অনুসারী ছিল। জাতির পক্ষ থেকে গুপ্তচর হিসেবে সে কাজ করত। হযরত লূত (আ)-এর ঘরে কোনো মেহমান আসলে অথবা তাঁর ঘরে বসে কোনো পরামর্শ হলে সে তার জাতির লোকদেরকে তা জানিয়ে দিত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۞

অর্থ : আল্লাহ কাফিরদের ব্যাপারে নূহ ও লূতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করেছেন। তারা আমার দুজন নেক বান্দার অধীনে ছিল; কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।[১] ফলে (তাদের স্বামীগণ নবী হওয়া সত্ত্বেও) তাদের কোনো উপকারে আসতে পারে নি। তাদের দুজনকে বলে দেওয়া হলো যে, দোযখের দিকে যারা যাচ্ছে তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। –সূরা তাহরীম : ১০

অর্থাৎ, তারা দু'জন স্ত্রী তাদের স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাদেরকে মান্য করে নি। সুতরাং এ মান্য না করার কারণে তারা দু'জন (স্ত্রী) জাহান্নামে যাবে। এখানে এ ধারণা মোটেই করা যাবে না যে, তারা দু'জন স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ও অশ্লীলা হতে পারে। যেমন হযরত আব্বাস (রা) ও বহু বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, নবীর কোনো স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ও অশ্লীলা হতে পারে না। যারা এর সাথে এক মত নয়, তারা চরম ভ্রান্তির মধ্যে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যখন অপবাদ দেয়া হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন এবং অপবাদকারীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর পরবর্তীদের এরূপ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং নবীর পরিবার সম্পর্কে কখনো এরূপ চিন্তা করতেও নিষেধ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۞ وَلَوْلَاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۞

অর্থ : একটু ভেবে দেখ তো, ঐ সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল করছিলে, যখন তোমাদের এক মুখ থেকে আরেক মুখ এই মিথ্যাকে বলে বেড়াচ্ছিল এবং তোমরা নিজেদের মুখে ঐ সব কথা বলে চলেছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা এটাকে সামান্য ব্যাপার মনে করেছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট তা বিরাট ব্যাপার ছিল। ঐ কথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা কেন বললে না যে, এমন কথা মুখ থেকে বের করা আমাদের উচিত হয় নি? সুবহানাল্লাহ! এটা তো গুরুতর অপবাদ। –সূরা নূর : ১৫–১৬

অর্থাৎ, নবীর স্ত্রী এরূপ কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আল্লাহ তা'আলার বাণী "সেটা যালিমদের থেকে দূরে নয়।" এ কথার অর্থ, এই শাস্তি সে সব লোকদের থেকেও দূরে নয়, যারা লূত (আ)-এর জাতির অনুকরণে বালকদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হবে। অর্থাৎ, তাদের উপর অনুরূপ শাস্তি আপতিত হবে। এ কারণে, কোন কোন আলেম বলেছেন যে, এ জঘন্য কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। চাই সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত হোক।

১. *এখানে 'বিশ্বাসঘাতকতা' এই অর্থে নয় যে, তারা ব্যভিচার করেছিল; বরং এই অর্থে যে, তারা ঈমানের পথে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-কে সহযোগিতা তো করেই নি; বরং তাঁদের বিরুদ্ধে দীনের শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল।*

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম শাফেয়ী এবং অধিকাংশ ইমামগণও উক্ত মত পোষণ করেন। তাঁরা হাদীস দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, যে হাদীস, মুসনাদে আহমদে ও সুনান গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কাউকে তোমরা লূত (আ)-এর জাতির অনুরূপ জঘন্য কাজ করতে দেখ তখন পাপকাজে নিয়োজিত উভয়কে হত্যা কর।"

হযরত ইমামে আযম আবূ হানীফা (রহ)-এর এ সম্পর্কে মত হলো এই যে, এ অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিকে পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে ফেলে দেবে। অতঃপর তার উপর পাথর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তাদের প্রতি অনুরূপ শাস্তি প্রয়োগ করা হবে, যেরূপ শাস্তি লূত (আ)-এর জাতির উপর করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতেও এ কথার ইঙ্গিত আছে।

وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ .

অর্থ : এটা যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

আল্লাহ তা'আলা সেই এলাকাকে এক দুর্গন্ধময় সমুদ্রে পরিণত করেছেন। যে সমুদ্রের পানি কোনোভাবেই ব্যবহার করা যেত না এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী মাটিও কোনো কাজে লাগানো যেত না। কারণ, সেখানের যমীন ছিল উঁচু নিচু এবং অপকৃষ্ট। (অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের অযোগ্য।)

আল্লাহ তা'আলা এ ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদটিকে সে সব লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত ও শিক্ষণীয় বানিয়েছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে চলে এবং নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। আর এটি মু'মিনদের জন্য নাজাতের দলীল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন "নিশ্চয়ই তাতে আছে আলামত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। আপনার প্রতিপালক তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" -সূরা শু'আরা : ৮-৯

আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন—

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۞ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۞ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ۞ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : শেষ পর্যন্ত পূর্বদিক আলোকিত হতেই এক বিকট শব্দ তাদেরকে ধরে ফেলল। তারপর আমরা ঐ জনপদটিকে সম্পূর্ণ উল্টিয়ে ফেললাম এবং তাদের উপর পাকা মাটির পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। এ ঘটনায় চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর ঐ এলাকাটি মানুষের চলাচলের পথের পাশেই রয়েছে।[১] নিশ্চয়ই এর মধ্যে মুমিনদের জন্য শিক্ষার খোরাক রয়েছে। -সূরা হিজর : ৭৩-৭৭

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এ শহরকে ও শহরের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস ও নিপাত করে দিলেন এ বিষয়টি যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করবে ও পর্যবেক্ষণ করবে সে এ ঘটনা থেকে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। যেমন, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টিকে তোমরা ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহর নূরের দ্বারা দেখতে পায়।" তারপর হুজুর ﷺ নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করেন, . اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ

অর্থ : পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।

---

১. হিজায থেকে সিরিয়া এবং ইরাক থেকে মিসর যেতে এ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরান এলাকা পথে পড়ে এবং সাধারণত কাফেলাসমূহের লোক এ পুরো এলাকার যে সব ধ্বংসের চিহ্ন আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে, তা দেখে থাকে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, . وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ

অর্থ : সেটা (সেই জনপদের ধ্বংসস্তূপ) লোক চলাচলের পথের পাশে এখনো বিদ্যমান।

এর অর্থ হলো, সে ধ্বংসস্তূপ বস্তুগুলো এখনো রাস্তার পাশে প্রকাশ্যে পড়ে আছে। সকল আগত লোকেরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন- "তোমরা তো তাদের ধ্বংসস্তূপগুলো সকাল-সন্ধ্যায় অতিক্রম করে থাক। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না।" -সূরা সাফফাত : ১৩৭-১৩৮

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন—

وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

অর্থ : আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি। -সূরা আনকাবূত : ৩৫

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বর্ণনা করেন—

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۞

অর্থ : তারপর ঐ বস্তির মধ্যে যারা মু'মিন ছিল তাদেরকে আমি বের করে আনলাম।[১] আমি সেখানে একটি বাড়ি ছাড়া মুসলমানদের কোনো বাড়ি পাই নি। এরপর আমি সেখানে শুধু একটা নিদর্শন ঐ সব লোকদের জন্য রেখে দিলাম, যারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে ভয় করে।[২] -সূরা যারিয়াত : ৩৫-৩৭

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আখেরাতে শাস্তিকে ভয় করে, আল্লাহকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে এবং নিজ পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভীত থাকে এবং নিজ প্রবৃত্তির তাবেদারী থেকে বিরত থাকে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা এ জনপদটিকে শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছেন। যাতে এ লোকেরা হারাম কাজ ও আল্লাহর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে এবং লূত (আ)-এর জাতির সদৃশ হওয়াকে ভয় করে। যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করে, সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিক অবশ্যই হবে।

فَإِن لَّمْ تَكُونُوا أَقْوَامَ لُوطٍ لِّعَنِيهِمْ، فَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بَعِيدٌ .

অর্থ : যদিও তুমি লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নও। কিন্তু লূত-এর সম্প্রদায় তোমার থেকে দূরে নয়।

অর্থাৎ, তাদের অনুসরণকারী হয়ে যেতে পার। প্রকৃত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও আল্লাহভীরু সে ব্যক্তি, যে তাঁর নিজ রবের আদেশ মেনে চলে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসারে জীবন পরিচালনা করে। এবং নিজ স্ত্রী ও বাঁদীদেরকে (হালালভাবে) ভোগ করে এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকে। অন্যথায় তার উপর আযাব আপতিত হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর আওতায় এসে যাবে—

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ .

অর্থ : এটা (শাস্তি) যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়। -সূরা হুদ : ৮৩

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছ থেকে ফেরেশতাগণ কীভাবে হযরত লূত (আ)-এর কাছে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে লূত (আ)-এর কাওম ও তাদের মধ্যে কী সব ব্যাপার ঘটেছিল, সে কাহিনী মাঝে বাদ দেওয়া হয়েছে।

২. 'একটি নিদর্শন' অর্থ মৃত সাগর। আজও যার দক্ষিণাঞ্চলে বিরাট ধ্বংসের নিদর্শনসমূহ বর্তমান আছে।

হযরত শোআইব (আ)-এর কাহিনী

সূরা 'আরাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿٩٢﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٩٣﴾

অর্থ : আমি মাদইয়ানবাসীর১ কাছে তাদের ভাই শোআইবকে পাঠালাম। তিনি বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর স্পষ্ট দলীল এসে গেছে। তাই ওজন ও দাঁড়িপাল্লা পুরা কর। মানুষকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং সংশোধনের পর তোমরা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। তোমরা সত্যি যদি মু'মিন হও, তাহলে এর মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।২ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্যে, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে

১. মাদইয়ানের আসল এলাকা হিজাযের উত্তর-পশ্চিম ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের তীরে ছিল। কিন্তু সিনাই উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেও এ এলাকার কিছু অংশ ছিল। মাদইয়ান জাতি ছিল এক বড় ব্যবসায়ী জাতি। প্রাচীনকালে লোহিত সাগরের তীর বরাবর 'ইয়ামান' থেকে মক্কা ও ইয়াম্বুর মধ্য দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে বাণিজ্যিক রাজপথ প্রসারিত ছিল এবং অন্য একটি বাণিজ্যিক রাজপথ, যা ইরাক থেকে মিসর অভিমুখে প্রসারিত ছিল- এগুলোর ঠিক চৌমাথায় এ জাতির বসতি ছিল।

২. এ কথাটি থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এরা ঈমানদার হওয়ার দাবি করতো।

ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সরল পথকে বাঁকা করার নিয়তে (জীবনের) প্রতিটি পথে ডাকাত সেজে বসবে না। ঐ সময়কার কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা (সংখ্যায়) কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের (সংখ্যা) বেশি করে দিলেন। চোখ খুলে দেখ যে, দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। আমাকে যে শিক্ষাসহ পাঠানো হয়েছে এর প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে এবং আর একদল ঈমান না আনে তাহলে সবরের সাথে দেখতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। (শোআইবের) কওমের সরদারদের (মাঝে) যারা বড়াই করতো, তারা বলল, হে শোআইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শোআইব এর জবাবে বললেন, আমরা রাজি না হলেও (আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে)? (শোআইব আরো বলেন) আল্লাহ আমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেওয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই তাহলে আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ যদি (তা-ই) চান তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম আছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফয়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। তারা কওমের ঐসব সরদার, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, তোমরা যদি শোআইবকে মেনে চল, তাহলে তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে।[৩] (তারপর যা ঘটল তা হলো) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। যারা শোআইবকে মানতে অস্বীকার করল, তারা এমনভাবে মিটে গেল, যেন তারা (তাদের ঘরে) ছিলই না। যারা শোআইবকে মিথ্যা মনে করল তারাই (শেষ পর্যন্ত) বরবাদ হয়ে গেল। তারপর (শোআইব) এ কথা বলে ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন, হে আমার কওম! আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনার হকও আদায় করেছি। এখন যে কওম সত্য কবুল করতেই অস্বীকার করে তার জন্য আমি কী করে আফসোস করি? –সূরা আ'রাফ : ৮৫-৯৩

সূরা হূদেও আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ বর্ণনা করেন—

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾
بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ
أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ
الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي

৩. শুধুমাত্র শোআইব (আ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের দুষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এমন ক্ষতির ভয় করে। প্রত্যেক যুগের মন্দ লোকদের ধারণাই হচ্ছে- ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানী ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারে না। 'ঈমানদারী' অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য তৈরি হওয়া।

إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا
أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ
فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ
مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا
إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا
لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴿٩٥﴾

অর্থ : আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শোআইবকে পাঠালাম। শোআইব বললেন, হে আমার কওম! এক আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মা'বুদ নেই। ওজনে ও দাড়ি পাল্লায় মাপে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। হে আমার কওম! ঠিক ঠিক ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ কর। মানুষকে জিনিসের মধ্যে মাপে কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। আমি তো তোমাদের উপর হেফাযতকারী নই। তারা জবাবে বলল, হে শোআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথাই শেখায় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে সব মা'বুদদের পূজা করতো তা আমরা ত্যাগ করব? অথবা আমাদের মাল আমাদের মর্জি মতো ব্যবহার করতে পারব না? তুমিই কি একমাত্র উঁচু মনের ও সৎ মানুষ? শোআইব বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন১ (তাহলে এরপর তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যে সব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করে বসি। আমার সাধ্য যতটুকু কুলায় আমি তো সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই তা আল্লাহর (দেওয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি। হে আমার কওম! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এতদূর না পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও ঐ আযাবই এসে যায়, যা নূহ, হূদ বা সালেহের কওমের উপর এসেছিল। আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তাঁর দিকে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব বড়ই দয়ালু এবং তাঁর সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন। তারা জবাব দিলো, হে শোআইব! তোমার অনেক কথা তো আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল মানুষ।

১. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন আমাকে সত্য চেনার উপযোগী দৃষ্টিশক্তি ও হালাল রুজি দান করেছেন, তখন আমার পক্ষে এটা কেমন করে বৈধ হতে পারে যে, আল্লাহ আমার উপর দয়া করা সত্ত্বেও হারামখোরীকে হক ও হালাল বলে গণ্য করে আমার আল্লাহর নাশোকরী করব।

তুমি যদি আমাদের বংশের লোক না হতে তাহলে কবেই তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিতাম। তোমার এমন শক্তি নেই যে, আমাদের উপর ক্ষমতা দেখাতে পার। শোআইব বললেন, হে আমার কওম! তোমাদের সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক কি আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মানের বিষয় যে, তোমরা (বংশকে ভয় করলে, আর) আল্লাহকে একেবারেই পেছনে ফেলে রাখলে? জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু করছ, আমার রব এ সবই ঘিরে রেখেছেন। হে আমার কওম! তোমাদের নিয়মে তোমরা কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করে যাব। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর অপমানকর আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমার রহমত দিয়ে শোআইবকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আর যারা যুলুম করেছিল তাদের উপর এমন কঠিন এক আওয়াজ এসে তাদেরকে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করতো না। জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীদেরকেও দূরে ফেলে দেওয়া হলো, যেমন সামুদ জাতিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। -সূরা হূদ : ৮৪-৯৫

কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ۞ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ۞
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ۞ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ ۞ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ وَاتَّقُوا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِيْنَ ۞
قَالُوْٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۞ وَمَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞
فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۞
فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۞

অর্থ : আইকাবাসী[১] রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, যখন শু'আইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? আমি তোমাদের জন্য এক আমানতদার রাসূল। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এ কাজের জন্য তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চাই না। আমার মজুরি তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বে রয়েছে। তোমরা ওজনের পাত্র পুরা করে ভরে দাও। কাউকেও মাপে কম দিও না। আর সঠিক পাল্লায় ওজন কর। লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। ঐ সত্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এবং অতীতের বংশধরদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বলল, তুমি তো নিছক এক জাদুগ্রস্ত মানুষ। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ মাত্র। আমরা তোমাকে একেবারেই মিথ্যুক মনে করি। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের উপর আসমানের কোনো টুকরো ফেলে দাও। শু'আইব বললেন, তোমরা যা কিছু করছ তা আমার রব জানেন। তারা তাকে মিথ্যা মনে করে মানতে

১. *আসহাবুল আইকা অর্থাৎ হযরত শোআইব (আ)-এর গোত্রের লোক। 'আইকা' হচ্ছে তাবুকের প্রাচীন নাম। মাদইয়ান ও আইকার অধিবাসীদের এলাকা ও হিজাজ থেকে ফিলিস্তিন সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে। 'আসহাবুল আইকা'-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ সূরা হিজরের ৭৮-৮৪ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে।*

অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের উপর ছাতার (মেঘাচ্ছন্ন) দিনের আযাব এসে পড়ল।১ আর তা ভয়ানক দিনের আযাব ছিল। এর মধ্যে এক নিদর্শন রয়েছে। তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন ছিল না। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও মেহেরবান। –সূরা শু'আরা : ১৭৬–১৯১

মাদইয়ানবাসীরা ছিল আসল আরব জাতি। মাদইয়ান নগরে তারা বসবাস করতো। মাদইয়ান নগরটি মায়ান এলাকার নিকটবর্তী সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এ মাদইয়ানের অতি নিকটেই রয়েছে হেজাজ এলাকা ও লূত জাতির উপসাগর। মাদইয়ানবাসীর (শোআইব সম্প্রদায়) আবির্ভাব ঘটে লূত জাতির পরেই। মাদইয়ান একটি জাতি নামে পরিচিত। এদের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ—

মাদইয়ান ইবনে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। এদের নবী ছিল হযরত শোআইব (আ) ইবনে মীকল ইবনে ইয়াশজান। ইবনে ইসহাক এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, শোআইব (আ) সুরিয়ানী ভাষী ছিলেন। তবে এ বর্ণনায় কিছুটা সন্দেহ আছে। অর্থাৎ, এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলা যায় না। হযরত শোআইব (আ)-এর বংশ পরম্পরা এরূপও বর্ণনা করা হয়েছে যে, শোআইব ইবনে ইয়াশখার ইবনে লাবায ইবনে ইয়াকূব। কেউ অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন যে, শোআইব ইবনে নুওয়াইব ইবনে আয়ফা ইবনে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)। এরূপও বর্ণিত আছে যে, শোআইব ইবনে দায়ফুর ইবনে আয়ফা ইবনে সাবিত ইবনে আদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আ)। এভাবে তাঁর বংশ পরম্পরা আরো বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ)-এর কন্যা ছিলেন হযরত শোআইব (আ)-এর দাদী অথবা মা। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, হযরত শোআইব (আ)-ও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হিজরত করেন এবং দামেশ্‌কে গমন করেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যেদিন অগ্নিকুণ্ডে ফেলা হয়েছিল, সেদিন হযরত শোআইব (আ) ও মালগাম এরা দুজনে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। এ দু'জনেই ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সিরিয়ায় হিজরত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দু'জনার সাথে হযরত লূত (আ)-এর দু' কন্যাকে বিবাহ করিয়ে দেন। ইবনে কুতায়বা এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উক্ত বর্ণনায় সন্দেহের অবকাশ আছে। আবূ ওমর ইবনে আব্দুল বার (রহ) "ইস্তিয়াব" গ্রন্থে সালমা ইবনে সাদ আল আনাযী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেকে 'আনযা' গোত্রের লোক বলে পরিচয় দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আনযা' উত্তম জাতি, এরা মাজলূম। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরা সাহায্যপ্রাপ্ত। এ জাতিটি শোআইবের জাতি এবং মূসা (আ)-এর শ্বশুর খান্দান।

এ হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হযরত শোআইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শ্বশুর। হযরত শোআইব (আ) খাঁটি আরবীদের অন্তর্গত এবং তাঁর গোত্রের নাম "আনযা"। তবে তিনি সেই 'আনযা' নন, যার বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ—

আনযা ইবনে আসাদ ইবনে বারীয়া ইবনে নায্যার ইবনে সা'দ ইবনে আদনান। কারণ, এ আনযা হযরত শোআইব (আ)-এর আগমনের দীর্ঘ কাল পরে এসেছে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

সহীহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থে আম্বিয়া ও রাসূলগণের বর্ণনা অধ্যায়ে হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারজন নবী আরবীয়। হূদ, সালেহ, শোআইব এবং তোমাদের নবী। কোনো কোনো বুযূর্গ, হযরত শোআইব (আ)-কে "খাতীবুল আম্বিয়া" (নবীদের বক্তা) উপাধি দান করেছেন। কারণ, হযরত শোআইব (আ) বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় এবং সুন্দর বাচন ভঙ্গিতে তাঁর জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

১. *এই শব্দগুলো থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, যেহেতু তারা আসমানি আযাব চেয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেওয়া পর্যন্ত এই মেঘ তাদের উপর ছাতার মতো ছেয়ে ছিল। এ কথাও লক্ষণীয় যে, হযরত শোআইব (আ)-কে মাদইয়ান ও আইকাবাসীর প্রতি পাঠানো হয়েছিল। এ দু' জাতির উপর আল্লাহর আযাব দু' রকমে এসেছিল।*

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হযরত শোআইব (আ)-এর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতেন, তখন বলতেন, তিনি আম্বিয়াদের মধ্যে খতীব (সুবক্তা) ছিলেন। মাদইয়ানবাসীরা কাফির ছিল। তারা লুটতরাজ করতো, পথচারীদের মালামাল ছিনতাই করতো এবং "আইকার" উপাসনা করতো। "আয়কা" মাদইয়ানের পার্শ্ববর্তী এলাকার গহীন অরণ্যে অবস্থিত ডালপালাবিশিষ্ট একটি বৃক্ষের নাম। মাদইয়ানবাসীরা এ বৃক্ষটির উপাসনা করতো। তারা মাপে ও ওজনে কম দিত। দেয়ার সময় মাপে কম দিত, আর নেয়ার সময় বেশি আদায় করে নিত। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হতেই হযরত শোআইব (আ)-কে তাদের নবী করে পাঠান। হযরত শোআইব (আ) তাদেরকে এক আল্লাহর পথে দাওয়াত দেন এবং তাঁর ইবাদত করতে বলেন। মাপে কম দেয়া, কারও থেকে পথচারীদের মালামাল লুট করা ও তাদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা, এ সব অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি তাদেরকে সুন্দর ভাষায় ও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপদেশ দিলেন। আলহামদু লিল্লাহ! নবীর দাওয়াতে কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনলেন। কিন্তু অধিকাংশরাই নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল এবং কুফরী ও অন্যায় কাজের উপর অটল রইল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভ্রাতা শোআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো মা'বূদ নেই। তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।"

-সূরা আরাফ : ৮৫

অর্থাৎ, আমি যা কিছু তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি তা যে সত্য এবং আমি যে আল্লাহর রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে প্রেরিত তার স্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসে গেছে। সেগুলো হলো সে সব মু'জিযা যার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে যদিও পৌঁছে নি, তবে এ আয়াত এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এর পরেই হযরত শোআইব (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "মাপে ও ওজনে পুরোপুরি দাও। মানুষের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না।"

হযরত শোআইব (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ন্যায় কাজ করার আদেশ দেন এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি তাদেরকে সতর্কও করে দেন। অতঃপর তিনি বলেছেন, "তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটা কল্যাণকর এবং ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো পথে বসে থেক না।" অর্থাৎ ছিনতাই-রাহাজানী কর না। পথচারীদের মালামাল লুট করো না এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করো না। উক্ত আয়াত "কোনো রাস্তায় ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে বসে থেকো না"-এর ব্যাখ্যায় হযরত সুদ্দী (রহ) সাহাবা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, মাদইয়ানবাসীরা পথচারীদের থেকে তাদের পণদ্রব্যের এক দশমাংশ আদায় করতো। ইসহাক ইবনে বাশার, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, শোআইব (আ)-এর এ জাতি ছিল অত্যাচারী ও অবাধ্য জাতি। তারা রাস্তায় ওঁৎপেতে বসে থাকত। লোকদের অনিষ্ট করতো। পথচারীদের থেকে ট্যাক্স (কর)-স্বরূপ তাদের মালামালের এক দশমাংশ রেখে দিত। এ কর প্রথা এরাই প্রথম চালু করে। হযরত শোআইব (আ) তাদের সম্বোধন করে বলেন, "আল্লাহর প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিও না। আর আল্লাহর পথের মধ্যে বক্রতা তালাশ কর না।" হযরত শোআইব (আ) তাদেরকে আল্লাহর পথে লোকদেরকে বাধা দিতে বারণ করেছেন এবং দুনিয়ায় ডাকাতি করতেও নিষেধ করেছেন। তারপর শোআইব (আ) তাদেরকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি বর্ণনা করেন—

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۔

অর্থ : যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এবং সরল থেকে বাঁকা করার নিয়তে (জীবনের) প্রতিটি পথে ডাকাত সেজে বসবে না। ঐ সময়কার কথা মনে করে দেখ, যখন তোমরা (সংখ্যায়) কম ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমার (সংখ্যা) বেশি করে দিলেন। চোখ খুলে দেখ যে, দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। -সূরা আরাফ : ৮৬

হযরত শোআইব (আ) তাঁর জাতিকে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা প্রথম সংখ্যায় খুবই দুর্বল ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তারপর তাদেরকে এ বলে ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হবে। অন্য এক ঘটনায় তাদের সম্বোধন করে বলেন—

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْٓ أَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّإِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ۞

অর্থ : ওজনে ও দাড়িপাল্লায় মাপে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভালো অবস্থায় দেখছি। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তোমাদের উপর এমন দিন আসবে, যার আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। -সূরা হুদ : ৮৪

অর্থাৎ, যে কাজে তোমরা লিপ্ত আছ, তা তোমরা বর্জন কর। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কল্যাণ ও অনুগ্রহ তোমাদের থেকে উঠিয়ে নিবেন। অভাব অনটনের মধ্যে তোমাদেরকে নিপতিত করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদগুলো বিনাশ করে দেয়া হবে। এছাড়াও রয়েছে তোমাদের জন্য পরকালের কঠিন আযাব।

হযরত শোআইব (আ) তাদেরকে প্রথমে মাপে ও ওজনে কম করতে নিষেধ করেছেন। তারপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও ধন-সম্পদ এ পৃথিবীতেই তাদের থেকে চলে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছেন ও পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যাপারেও সাবধান করেছেন।

মোটকথা তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। এরপরও তারা বিরোধিতা করা থেকে বিরত রইল না। একবার এ বলে সম্বোধন করে দিলেন—

وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۞

অর্থ : হে আমার কওম! ঠিক ঠিক ইনসাফের সাথে ওজন ও পরিমাপ কর। মানুষকে জিনিসের মধ্যে মাপে কম দিও না এবং পৃথিবীতে ফাসাদী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। আমি তো তোমাদের উপর হেফাযতকারী নই। -সূরা হুদ : ৮৫-৮৬

"আল্লাহর অনুমোদিত যা অবশিষ্ট থাকবে, তোমাদের জন্য তা উত্তম" এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, এর অর্থ আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ঐ সব বস্তুর চেয়ে উত্তম যা তোমরা লোকদের থেকে ছিনিয়ে রাখ। ইবনে জারীর (রহ) এর ব্যাখ্যায় বলেন, মাপ ও ওজন সঠিকভাবে পুরোপুরি দেয়ার পর যা কিছু লাভ অবশিষ্ট থাকে, সেটাই আল্লাহর অনুমোদিত বাকি। সেটা তোমাদের জন্য উত্তম ঐ সব বস্তুর চাইতে যা তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিয়ে লোকদের থেকে জোর-জুলুমে গ্রহণ করে থাক। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এরূপও ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। হযরত হাসান (রহ) যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা নিম্নের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ،

অর্থ : (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, পাক ও নাপাক অবশ্যই এক সমান নয়, যদিও বেশি বেশি নাপাকি তোমাদের আকর্ষণ করে।[১] -সূরা মায়িদা : ১০০

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সুদ যদিও বেশি হয়, ক্রমান্বয়ে তা শেষ হয়ে যায়।" ইমাম আহমদ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ, এ বেশি মধ্যে কোনই বরকত (কল্যাণ) নেই। এগুলো অতি দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি করেন।" -সূরা বাকারা : ২৭৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ক্রয় বিক্রয়ে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য (ক্রয় করা ও বিক্রয় করার) স্বাধীনতা থাকে, যতক্ষণ তারা আলাদা না হয়ে যায়। যদি এ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে সত্য কথা বলে এবং আসল তথ্য প্রকাশ করে, তবে তাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে বরকত (কল্যাণ) দান করা হয়। আর যদি বিক্রয়কৃত বস্তুর আসল তথ্য প্রকাশ না করে মিথ্যা বলে ক্রয় বিক্রয় করে, তবে এরূপ ক্রয় বিক্রয় থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়।"

আসল কথা হলো, হালাল লাভ কম হলেও তাতে বরকত হয়। আর হারাম লাভ অধিক হলেও তাকে বরকত হয় না। এগুলো দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহর নবী শোআইব (আ) বলেছিলেন—

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ.

অর্থ : আল্লাহর দেওয়া উদ্বৃত্ত তোমাদের জন্য ভালো। -সূরা হূদ : ৮৬

তারপরে বলেছিলেন, "আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই"। অর্থাৎ আমি যে কাজগুলো তোমাদেরকে করার জন্য আদেশ দিচ্ছি, সে কাজগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেই কর। আমার মনতুষ্টি বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

অর্থ : তারা জবাবে বলল, হে শোআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথাই শেখায় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যেসব মা'বুদদের পূজা করতো তা আমরা ত্যাগ করব? অথবা আমাদের মাল আমাদের মর্জিমতো ব্যবহার করতে পারব না? তুমিই কি একমাত্র উঁচু মনের ও সৎ মানুষ? -সূরা হূদ : ৮৭

এ কথাটি তারা শোআইব (আ)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলেছিল। তারা শোআইব (আ)-কে বলেছিল, তোমার নামায ও রোযা তোমাকে কি এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমাদেরকে আমাদের সে উপাস্যগুলোর উপাসনা থেকে বাধা দেবে, যার উপাসনা করতো আমাদের পিতৃপুরুষগণ। অনুরূপভাবে কি শিক্ষা দিচ্ছে যে, পার্থিব লেনদেনও আমরা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী করব? আর এ শিক্ষাও কি দিচ্ছে যে, আমরা সুদের লেন-দেন থেকে বিরত থাকব। যার দ্বারা আমরা প্রচুর লাভবান হয়ে থাকি এবং যেটা আমাদের প্রিয় ব্যবসা? জাতির লোকেরা হযরত শোআইবকে যে বলেছিল, "নিশ্চয়ই তুমি সহিষ্ণু সদাচারী"। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মায়মুন ইবনে মিহরান, ইবনে জুরায়েজ, যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ)-এবং ইবনে জারীর (রহ) বলেছেন, জাতির লোকেরা উপহাস করে শোআইব (আ)-কে এ কথা বলেছিল।

তারপর শোআইব (আ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন—

---

১. এ আয়াতটি মূল্য ও মর্যাদার অন্য এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে, যা বস্তুবাদী মানুষের মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দুনিয়াদার মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশ') টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশি মূল্যবান। কারণ, একটা সংখ্যা একশ' এবং আরেকটা পাঁচ। কিন্তু এ আয়াতে কারীমা বলে, শত টাকা যদি আল্লাহর নাফরমানির রাস্তা দিয়ে আয় করা হয়, তাহলে তা নাপাক আর মাত্র পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর পছন্দের পথে আসে তবে তা পাক-পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে যতই বেশি হোক না কেন তা কখনো কোনোরূপেই পবিত্র বস্তুর সমান হতে পারে না।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۭ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ۭ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۭ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ۔

অর্থ : শোআইব বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন (তাহলে এরপর তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যে সব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করে বসি। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলায় আমি তো সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই তা আল্লাহর (দেওয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি। -সূরা হুদ : ৮৮

হযরত শোআইব (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে সুন্দর ভাষায়, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপদেশ দিয়ে বুঝালেন এবং সুস্পষ্ট ইঙ্গিতের মাধ্যমে সত্যের দিকে দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন—

হে মিথ্যাবাদী মানুষেরা! তোমরা কি একটু ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার পালনকর্তার প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি। অর্থাৎ, তিনি (আল্লাহ) আমাকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক প্রদান করেছেন। রিসালাত ও নবুওয়াতের মর্যাদায় আমাকে আসীন করেছেন। যে সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ। এগুলো সবকিছুই তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ। এরপরও কি তোমাদের কোনো কথা আছে? এরপর শোআইব (আ) তার জাতির কাছে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন, যেরূপ কথা বলেছিলেন হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতির কাছে। "আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না"। অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে কাজ করার জন্য বলব, সে কাজ প্রথমেই আমি নিজে করব। এরূপ নয় যে, আমি তোমাদেরকে কোনো কাজ করার আদেশ দিব। অথচ সে কাজ আমি নিজে করব না। যে কাজ করতে নিষেধ করব, সে কাজ থেকে প্রথমে আমিই বিরত থাকব। এ গুণটি খুবই প্রশংসার যোগ্য। এটি একটি উত্তম বৈশিষ্ট্য। এর বিপরীত কার্যক্রম ও আচরণ অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট। যেরূপ, বনী ইসরাঈলের শেষ যুগের (কিছু সংখ্যক) আলেমগণের মধ্যে এ জঘন্য ও নিকৃষ্ট আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এমন লোক এখনো আছে। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

অর্থ : তোমরা কি মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না। -সূরা বাকারা : ৪৪

আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (কিয়ামতের দিবসে) এক ব্যক্তিকে (সবার সামনে) হাজির করা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে এবং তা নিয়ে সে ঘুরপাক খেতে থাকবে। যেমন, গাধা তার (বহনকৃত) চাক্কি নিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে এসে সমবেত হবে এবং বলবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে। তুমি লোকদেরকে ন্যায় কাজের আদেশ করতে না এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎ কাজের আদেশ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তার উপর আমল করতাম না। আর অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বারণ করতাম। কিন্তু আমি নিজে তা থেকে বিরত থাকতাম না।

এ ব্যবহার কখনো নবী ও রাসূল থেকে সংঘটিত হতে পারে না। বরং এরূপ আচরণ একমাত্র সংঘটিত হতে পারে পাপী, দুষ্ট ও অসৎ ব্যক্তিদের থেকে। সম্মানিত, শ্রদ্ধেয় ও বিচক্ষণ নেতা ও আলেম তো তিনিই, যিনি তার রবকে অদৃশ্যে ভয় করেন। তাদের অবস্থা তো এরূপ হয়ে থাকে, যেরূপ হযরত শোআইব (আ) বলেছেন—

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِىْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۞

অর্থ : শোআইব বললেন, হে আমার কওম! তোমরা ভেবে দেখ, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যের উপর থেকে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে ভালো রিযিক দিয়ে থাকেন৯ (তাহলে এরপর তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও হারাম খাওয়ার মধ্যে আমি কীভাবে শরীক হতে পারি?)। আমি চাই না যে, যে সব বিষয় থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি তা আমি নিজেই করে বসি। আমার সাধ্যে যতটুকু কুলায় আমি তো সংশোধন করতে চাই। আমি যা কিছু করতে চাই তা আল্লাহর (দেওয়া) তাওফীকের উপর নির্ভর করে। আমি তাঁরই উপর ভরসা করে আছি এবং সব ব্যাপারে তাঁরই দিকে ফিরে আসি। -সূরা হূদ : ৮৮

অর্থাৎ, আমার সমস্ত কাজকর্ম, পরিশ্রম সবকিছুরই উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও সংস্কার করা এবং সকল কাজেই আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি। তাঁর কাছেই আমার ফিরে যেতে হবে। তাঁর কাছেই আমার স্থায়ী ঠিকানা। এখানে শোআইব (আ) কিছুটা উৎসাহ দান করেছেন। এরপরেই ভীতি প্রদর্শন করে বলেন—

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞

অর্থ : হে আমার কওম! আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠকারিতা যেন এতদূর না পৌঁছে যে, শেষ পর্যন্ত তোমাদের উপরও ঐ আযাবই এসে যায়, যা নূহ, হূদ বা সালেহের কওমের উপর এসেছিল। আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে বেশি দূরে নয়। -সূরা হূদ : ৮৯

অর্থাৎ, শুধু বিরোধিতা করার জন্য আমার সাথে তোমাদের বিরোধিতা করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নিজেদের মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার উপর অটল থাকা, তোমাদেরকে যেন আল্লাহর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির মধ্যে নিপতিত না করে। যেমন শাস্তি নিপতিত হয়েছিল তোমাদের পূর্বেও তোমাদের মতো যারা অন্যায় আচরণ করেছিল তাদের উপর। অর্থাৎ, নূহ, হূদ ও সালেহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও প্রত্যাখানকারীদের পরিণাম ফল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার। বিশেষ করে লূত (আ)-এর জাতি থেকে। যারা তোমাদের থেকে চলে গেছে বেশি দিন হয় নি তাদের পরিণাম দেখে নাও। "লূত জাতি তো তোমাদের থেকে দূরে নয়।" এ কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক, তারা তোমাদের থেকে অনেক যুগ আগে অতিবাহিত হয় নি এবং তাদের কুফরী ও অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার যে শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তা তোমরা ভালরূপে জান।

দ্বিতীয় অর্থ হলো এই যে, সেই বিধ্বস্ত জনপদটি অবস্থানের দিক দিয়ে তোমাদের দূরে নয়। তোমরা সেখানে গিয়ে ধ্বংস স্তূপগুলো দেখে আসতে পার। এর অর্থ এভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, লূত জাতির লোকেরাও চরিত্রগত দিক দিয়ে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজে তোমাদের মতই ছিল। যেমন, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রতারণা ও অন্যায়ভাবে লোকদের সম্পদ লুট করা ইত্যাদি, সুতরাং তাদের পরিণতি যেরূপ হয়েছিল, তোমাদের পরিণতিও অনুরূপ হতে পারে। "লূত জাতি তোমাদের থেকে দূরে নয়" এর অর্থ উক্ত তিনটিই হতে পারে এবং এ তিনটি

অর্থ গ্রহণ করলে কোনো জটিলতারও সৃষ্টি হয় না। কারণ, কাল ও স্থানের দিক দিয়ে অতি নিকটবর্তী এবং চরিত্রগত দিক দিয়েও এরা লূত জাতির অতি নিকটতম। শোআইব (আ) প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে উৎসাহ ও ধমক দিয়েছেন। এরপরে সমন্বিত করে বলেন—

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ۝

অর্থ : তোমাদের রবের কাছে মাফ চাও। তাঁর দিকে ফিরে এস। নিশ্চয়ই আমার রব বড়ই দয়ালু এবং তাঁর সৃষ্টিকে তিনি ভালো বাসেন। –সূরা হুদ : ৯০

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের বর্তমান কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাক এবং কৃত পাপের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি তাঁর নিকট তাওবা করে, তিনি তার উপর দয়ার্দ্র হন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহের চেয়েও বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া অনেক গুণ বেশি। অর্থাৎ, বান্দা যখন তার রব আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তার অপরাধ ও পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাকে তাঁর প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন। যদিও সে বান্দা এর পূর্বে মহা অপরাধ করে থাকে। শোআইব (আ) তাঁর জাতির লোকদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেন। অত্যন্ত বিনয় ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দাওয়াত দেন এবং ধমকের সুরেও দাওয়াত দেন। জাতির লোকেরা তাঁর এ দাওয়াতের উত্তরে বলল,.

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

অর্থ : তারা জবাব দিলো, হে শোআইব! তোমার অনেক কথা তো আমাদের বুঝেই আসে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের মধ্যে তুমি একজন দুর্বল মানুষ। –সূরা হুদ : ৯১

ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও সুফিয়ান ছওরী (রহ) বলেছেন, হযরত শোআইব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। মারফূ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত শোআইব (আ) আল্লাহর মহব্বতে এত বেশি ক্রন্দন করেছিলেন যে, ক্রন্দনের ফলে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা শোআইব (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে শোআইব! তুমি কি জাহান্নামের ভয়ে এত ক্রন্দন করছ? শোআইব (আ) উত্তরে বললেন, (হে পরওয়ারদেগার! আমি শুধু আপনার মহব্বতে ক্রন্দন করছি। আমি যখন আপনার সাক্ষাৎ লাভ করব, তখন আমার প্রতি কি করা হবে, তার পরোয়া আমি করি না। তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বললেন, হে শোআইব! আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে। এ জন্যে আমি ইমরানের পুত্র মূসা কালিমুল্লাহকে তোমার খাদেম হিসেবে নিযুক্ত করেছি।

অনুরূপ একখানা হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। খতীবে বাগদাদী (রহ) এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন।

কাফিরেরা শোআইব (আ)-কে দুর্বল বলেছিল। তারা বলেছিল—

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ۡ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ

অর্থ : তুমি যদি আমাদের বংশের লোক না হতে তাহলে কবেই তোমাকে পাথর মেরে শেষ করে দিতাম। তোমার এমন শক্তি নেই যে, আমাদের উপর ক্ষমতা দেখাতে পার। –সূরা হুদ : ৯১

এটা ছিল তাদের চরম কুফর এবং বিদ্রূপাত্মক কথা। প্রথমে তারা বলেছিল, "তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না।" অর্থাৎ, এটাকে আমরা জ্ঞানসম্পন্ন কথা মনে করি না। কেননা, এ সব কথা আমরা পছন্দ করি না। এ সব কথা গ্রহণ করার এবং শোনার কোনই আগ্রহ আমাদের নেই। আমরা এ কথার প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করি না। মক্কার কাফিররাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরূপভাবে কথা বলেছিল। "ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করতেছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি।"
–সূরা আস্ সাজদা : ৫

কাফিররা যখন হযরত শোআইব (আ)-কে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَاۗءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۭ

অর্থ : শোআইব বললেন, হে আমার কওম! তোমাদের সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক কি আল্লাহর চেয়ে বেশি সম্মানের বিষয় যে, তোমরা (বংশকে ভয় করলে, আর) আল্লাহকে একেবারেই পেছনে ফেলে রাখলে? -সূরা হুদ : ৯২

অর্থাৎ তোমরা তো আত্মীয়বর্গ ও জতিকে ভয় করছ এবং তাদের কারণে আমাকে হত্যা করছ না। আফসোস! তোমরা আল্লাহকে ভয় করছ না এবং এ কারণে আমার প্রতি তোমরা দয়া প্রদর্শন করছ না যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর। আমার আত্মীয়বর্গ ও জাতি আল্লাহর চেয়েও কি তোমাদের কাছে সম্মানিত ও শক্তিশালী হয়ে গেছে? অতঃপর তিনি বললেন—

اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۭ

অর্থ : জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু করছ, আমার রব এ সবই ঘিরে রেখেছেন। -সূরা হুদ : ৯২

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সব কাজকর্ম ও আচার-আচরণের পূর্ণ খবর রাখেন। তিনি তোমাদের অন্তরের খবরও জানেন। এর উপরেই পরকালে তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে। শোআইব (আ) তাঁর জাতিকে আরো বললেন—

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰي مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۭ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۭ وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۭ

অর্থ : হে আমার কওম! তোমাদের নিয়মে তোমরা কাজ করতে থাক। আমিও আমার কাজ করে যাব। শিগ্‌গিরই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর অপমানকর আযাব আসে, আর কে মিথ্যাবাদী। তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। -সূরা হুদ : ৯৩

এটা হলো কঠোর সাবধানবাণী। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর পথে না-ই আস, তবে তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত পথে থাক। অতি তাড়াতাড়ি জানতে পারবে, পরকালের ঘর (জান্নাত) কাদের জন্য এবং চিরস্থায়ী ধ্বংস এবং দুর্ভোগ ও শাস্তি কাদের উপর আপতিত হয়েছে। আর একথাও জানতে পারবে যে, কে মিথ্যাবাদী তোমরা, না আমি। অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে পরকালের যে সুখবর দিয়েছি এবং জাহান্নামের ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতেছি সেগুলো সত্য, না তোমরা যা বলছ সেগুলো সত্য। এ সব কিছুই তোমরা জানতে পারবে।

"তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকি।" অনুরূপ সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে—

وَاِنْ كَانَ طَاۗىِٕفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَاۗىِٕفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۭ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۝ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَي اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۭ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۭ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۭ عَلَي اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۭ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

অর্থ : আমাকে যে শিক্ষাসহ পাঠানো হয়েছে এর প্রতি যদি তোমাদের একদল ঈমান আনে এবং আর একদল ঈমান না আনে, তাহলে সবরের সাথে দেখতে থাক, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেন। আর তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। (শোআইবের) কওমের সরদারদের (মাঝে) যারা বড়াই করতো, তারা বলল, হে শোআইব! আমরা তোমাকে এবং যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের এলাকা থেকে বের করে দেবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতে হবে। শোআইব এর জবাবে বললেন, আমরা রাজি না হলেও (আমাদেরকে কি জোর করে ফিরিয়ে নেওয়া হবে)? (শোআইব আরো বলেন) আল্লাহ আমাদেরকে (তোমাদের মিল্লাত থেকে) নাজাত দেওয়ার পরও যদি আমরা তোমাদের মিল্লাতে ফিরে যাই, তাহলে আমরা আল্লাহ উপর মিথ্যা আরোপকারী হয়ে যাব। আমাদের রব আল্লাহ যদি (তা-ই) চান, তাহলে আলাদা কথা। তা না হলে আমাদের পক্ষে ঐদিকে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারেই আমাদের রবের ইলম রয়েছে। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করে আছি। হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের মাঝে ঠিক ঠিক ফায়সালা করে দিন। আর আপনিই তো সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

–সূরা আ'রাফ : ৮৭-৮৯

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এটা প্রতীয়মান হলো যে, শোআইব সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ভ্রান্ত ধারণা মতে মনে করেছিল যে, আমরা হয়তো শোআইব (আ)-কে আমাদের ভ্রান্ত ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হব। কিন্তু শোআইব (আ) মুমিনদের পক্ষ থেকে তাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, "আমরা যদি তোমাদের ধর্মকে গ্রহণ না করি, তবুও কি বলপূর্বক আমাদেরকে তোমাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে?" কারণ, তারা (মু'মিনগণ) স্ব ইচ্ছায় ও আন্তরিকভাবে তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে না। যদি একান্ত ফিরে আসতেই হয়, তবে সেটাও হবে তার মনের বিরুদ্ধে ও অনিচ্ছায়। কেননা, যখন কোনো লোক আন্তরিকভাবে ঈমান আনে এবং ঈমানের উপর অবিচল থাকে, তখন তাকে কেউ ঈমান থেকে সরিয়ে নিতে পারে না ও তাকে এর থেকে কেউ টলাতে পারে না। সে ঈমানের পথ ছাড়া অন্য সব ভ্রান্ত পথকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এবং তা থেকে এড়িয়ে থাকে। এ কারণে শোআইব (আ) বলেছেন—

"তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করব। আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয়। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জানা আছে, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি।" (তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকারী ও আশ্রয়স্থল।)

তারপর হযরত শোআইব (আ) তাঁর জাতি ও তাঁর মাঝে একটি ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করে বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও এবং তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।"

হযরত শোআইব (আ) তাঁর জাতির জন্য বদদোয়া করলেন। যারা রাসূলের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁকে অস্বীকার করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের বিরুদ্ধে রাসূলের আবেদন আল্লাহ অবশ্যই মঞ্জুর করেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলের কথা (আবেদন) প্রত্যাখ্যান করেন না। এখানে হযরত শোআইব (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য বদদোয়া করেন। কিন্তু এরপরও তারা তাদের কুফরী ও গোমরাহীর উপর অটল রইল। গোত্রের কোনো লোক যাতে শোআইব (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনে, সে জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বলল–

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۝

অর্থ : তার কওমের ঐ সব সরদার, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, তোমরা যদি শোআইবকে মেনে চল তাহলে তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে।[১] –সূরা আ'রাফ : ৯০

"যদি তোমরা শোআইবের অনুসরণ কর, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।" –সূরা আ'রাফ : ৯০

যখন শোআইব (আ) ও কাফিরদের মধ্যকার কথাবার্তা শেষ হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপর আযাব আপতিত করলেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۞

অর্থ : (তারপর যা ঘটল তা হলো) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। –সূরা আ'রাফ : ৯১

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।" অর্থাৎ ভূমিকম্পের আঘাতে তারা ভূগর্ভে ধসে যায় এবং তাদের প্রাণ তাদের দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে পড়ে। গোটা জনপদের জীব-জন্তু পাখ-পাখালীগুলোও জড় পদার্থের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের মৃতদেহগুলো নিথর ও নিশ্চল হয়ে এলোমেলোভাবে পড়ে রইল। এ অবিশ্বাসী জাতির উপর আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি নিপতিত করেন।

তারা বিভিন্ন অপরাধে নিমজ্জিত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন বিপদাকারে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তাদের উপর প্রলঙ্কারী ঘূর্ণি বায়ু প্রেরণ করেন। ফলে তাদের চলনশক্তি বন্ধ হয়ে যায়। বিকট আওয়াজ প্রেরণ করেন। ফলে অন্য সব আওয়াজ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আগুনের মেঘ প্রেরণ করেন। অগ্নিশিখা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে। আল্লাহ তাদের ঘটনা এবং শাস্তির কথা যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, সেখানে সেরূপেই বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ, তাদের অপরাধের সাথে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্যতা রয়েছে।)

এখানে তিন প্রকারের শাস্তির কথা বর্ণনা করেছেন। ভূমিকম্প, বিকট শব্দ এবং আগুনের মেঘ।

সূরা আ'রাফে উল্লেখ আছে যে, "কাফির নেতৃবৃন্দ হযরত শোআইব (আ)-কে ভয় ভীতি প্রদর্শন করে ও ধমক দেয় এবং তাদের ভ্রান্ত ধর্ম গ্রহণ না করলে এলাকা থেকে বহিষ্কার করার কথাও বলে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, "তারপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা তাদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।"

এখানে কাফিররা শোআইব (আ)-কে বহিষ্কারের কথা বলেছিল, আল্লাহ ভূমিকম্প দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করলেন। অর্থাৎ, তারা শোআইব (আ)-কে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছিল ও ধমক দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন।

সূরা হূদে বর্ণিত আছে, এক বিকট শব্দ তাদের উপর আপতিত হয়। যার ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়ীতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এরূপ আযাব আসার কারণ ছিল, তারা আল্লাহর নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলেছিল—

يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۞

১. শুধুমাত্র শোআইব (আ)-এর জাতির সরদারদের পর্যন্ত এ কথা সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক যুগের দুষ্ট লোকেরা সত্য, সততা ও বিশ্বস্ততার পথে চলার মধ্যে এমন ক্ষতির ভয় করে। প্রত্যেক যুগের মন্দ লোকদের ধারণাই হচ্ছে ব্যবসায়, রাজনীতি ও অন্যান্য পার্থিব ব্যাপার মিথ্যা, বেঈমানি ও নীতিহীনতা ছাড়া চলতে পারে না। 'ঈমানদারি' অবলম্বন করার অর্থ হলো নিজের পার্থিব স্বার্থ বরবাদ করার জন্য তৈরি হওয়া।

অর্থ : হে শোআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এ কথাই শেখায় যে, আমাদের বাপ-দাদারা যে সব মা'বুদদের পূজা করতো তা আমরা ত্যাগ করব? অথবা আমাদের মাল আমাদের মর্জি মতো ব্যবহার করতে পারবো না? তুমিই কি একমাত্র উঁচু মনের ও সৎ মানুষ? -সূরা হূদ : ৮৭

তারা যেরূপে নবীকে উপহাস করেছে, তদ্রূপ আযাবও তাদের উপর আপতিত হয়েছে। তারা তাদের মুখ দ্বারা নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করেছে। এর বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অন্যায় আচরণের সাথে সাম্যতা রেখে তাঁর ফেরেশতা দ্বারা এক বিকট শব্দ তাদের উপর প্রেরণ করেন। যে ভয়ঙ্কর শব্দে তাদের কলিজা পর্যন্ত ফেটে যায়। তারা আল্লাহর নবী সম্পর্কে মুখ দ্বারা যে জঘন্য মন্তব্য করেছিল, তার স্বাদ পেয়ে গেল। প্রথম ভূমিকম্প তাদের চলাচল বন্ধ করে দিল। এরপর ভয়ংকর আওয়াজ তাদেরকে বধির করে দিল। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে, "এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। এটা ছিল তাদের কামনা ও চ্যালেঞ্জের ফল। তারা বলেছিল, "তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্গত। তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ, আমরা ধারনা করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আকাশের একটা খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। সে বলল, "আমার রব ভাল জানেন তোমরা যা কর।"

সুতরাং আল্লাহ তাদের বাসনা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ط اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : তারা তাকে মিথ্যা মনে করে মানতে অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের উপর ছাতার (মেঘাচ্ছন্ন) দিনের আযাব এসে পড়ল।[১] আর তা ভয়ানক দিনের আযাব ছিল। -সূরা শু'আরা : ১৮৯

কাতাদাহ (রা) ও কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরের মতে, আইকাবাসী ও মাদইয়ানবাসী এক জাতি নয়। এরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি। কিন্তু তাদের এ মত দুর্বল।

দুটি কারণে তারা এরূপ ধারণা পোষণ করেন—

১. আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ۞

অর্থ : আইকাবাসী রাসূলগণকে মিথ্যা মনে করল যখন শুআইব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? -সূরা শু'আরা : ১৭৬-১৭৭

এখানে শোআইব (আ)-কে তাদের ভ্রাতা বলা হয় নি। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا .

অর্থ : আমি মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শোআইবকে পাঠিয়েছিলাম। -সূরা আ'রাফ : ৮৫

উক্ত দুটি আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইকাবাসী ও মাদয়ানবাসী দুটি আলাদা আলাদা জাতি। এ দুটি জাতির কাছেই হযরত শোআইব (আ) নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

২. আয়কাবাসীর ক্ষেত্রে "মেঘাচ্ছন্ন দিবসের" শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর মাদইয়ানবাসীদের শাস্তির ক্ষেত্রে "ভূমিকম্প ও বিকট আওয়াজের" কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও বুঝা যায় যে, এরা দুটি আলাদা আলাদা সম্প্রদায়।

---

১. *এ শব্দগুলো থেকে এ কথা বোঝা যায় যে, যেহেতু তারা আসমানি আযাব চেয়েছিল, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এক মেঘমালা পাঠিয়েছিলেন। আযাবের বৃষ্টি তাদেরকে পূর্ণরূপে ধ্বংস করে না দেওয়া পর্যন্ত এই মেঘ তাদের উপর ছাতার মতো ছেয়ে ছিল। এ কথাও লক্ষণীয় যে, হযরত শুআইব (আ)-কে মাদইয়ান ও আইকাবাসীর প্রতি পাঠানো হয়েছিল। এ দু' জাতির উপর আল্লাহর আযাব দু' রকমে এসেছিল।*

কাতাদাহ (রা) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণের প্রথম বক্তব্যের উত্তর হলো এই যে, আইকাবাসীদের ক্ষেত্রে শোআইব (আ)-কে ভাই বলে সম্বোধন না করার কারণ হলো এই যে, এখানে এ সম্প্রদায়ের জঘন্যতম ও নিকৃষ্ট কর্মকাণ্ডের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে "আইকাবাসী" বলা হয়েছে। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা "আইকা" নামক বৃক্ষের পূজা করতো বলে তাদেরকে "আয়কাবাসী" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে যেখানে তাদের এ অন্যায় ও নিকৃষ্ট কার্যসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এর পাশাপাশি একজন নবীকে তাদের ভাই বলে উল্লেখ করা আদৌ উচিত নয়। সুতরাং এ কারণে সেখানে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক পরিহার করা হয়েছে। আর মাদইয়ানবাসী বলে যখন গোত্রীয় সম্পর্ক করা হয়েছে, তখন শোআইব (আ)-কে ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের সম্বোধনীয় ভাই বলা হয়েছে। মূলতঃ এ পার্থক্য অতীব সূক্ষ্ম প্রণিধানযোগ্য। আর তাদের দ্বিতীয় বক্তব্যের উত্তর হলো এই যে, যদি ভিন্নতর শাস্তির কারণে দুটি জাতিকে বুঝানো হয়ে থাকে, তবে মাদয়ানবাসীর প্রতি বিকট শব্দ ও ভূমিকম্প দু'প্রকারের শাস্তি আপতিত হয়েছিল। সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী মাদইয়ানবাসীরাও দু'জাতিতে বিভক্ত। এভাবে তিন জাতি হয়ে যায়। (আইকাবাসী এক সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানবাসী দু'সম্প্রদায়) তাদের এ কথাকে অন্য আর কেউ সমর্থন করেন না।

উক্ত মুফাসসিরগণ তাদের স্বপক্ষে একখানা মারফূ হাদীসও উপস্থাপন করেন, যে হাদীসখানা হাফিজ ইবনে আসাকির (রহ) হযরত শোআইব (আ)-এর জীবন চরিত্র বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাদইয়ান জাতি ও আইকাবাসী ভিন্ন ভিন্ন জাতি। এদের উভয়ের কাছে শোআইব (আ) নবীরূপে প্রেরিত হন। এ হাদীসটি গরীব। এর কতক বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সম্ভবত এটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার (রা)-এর নিজের বক্তব্য। যা তিনি ইয়ারমূকের যুদ্ধের সময় বনী ইসরাঈলের তথ্য সম্পর্কে প্রাপ্ত দুটি উট বোঝাই কিতাবসমূহ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আমাদের মতামত হলো, আইকাবাসী ও মাদইয়ান জাতি উভয়ই একটি জাতি। এরা এক ও অভিন্ন। এর স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা মাদইয়ানবাসীদের যেরূপ চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ চরিত্রের কথা বর্ণনা করেছেন আইকাবাসীরাও। যেমন, এরা উভয় সম্প্রদায়ই মাপে ও ওজনে কম দেয়ার অপরাধে অপরাধী গণ্য হয়েছিল। সুতরাং বুঝা যায় যে, এরা উভয়ই (আইকাবাসী ও মাদইয়ানবাসী) এক ও অভিন্ন জাতি। কিন্তু তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ঘটনার সাথে সম্বন্ধ রেখে শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী, فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ـ

অর্থ : তারপর মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল।

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের উপর প্রচণ্ড গরম অবতীর্ণ করেন এবং সাত দিন পর্যন্ত একাধারে তাদের উপর বায়ু প্রবাহ বন্ধ রাখেন। যার ফলে তাদের পানি ও ছায়া দ্বারা তারা কোনই উপকার পেল না এবং প্রচণ্ড গরম থেকেও বাঁচতে পারলো না। এমনকি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়েও কোনো কাজ হলো না। এ কঠিন মসীবতে পেরেশান হয়ে তারা নিজ ঘর-বাড়ী ছেড়ে একটু বায়ুর জন্য উন্মুক্ত মাঠে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে এক খণ্ড মেঘ তাদেরকে ছায়া দান করল। তারা প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় খুশীতে মেঘের নিচে এসে সবাই সমবেত হতে লাগল। যখন সবাই এসে সমবেত হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই মেঘমালা দ্বারা অগ্নিশিখা তাদের উপর বর্ষণ করেন। এ ছাড়াও প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করে এবং আকাশ থেকে এক বিকট শব্দ তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ তাদের প্রাণকে তাদের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর শব্দে তাদের কলিজা ফেটে যায়) তাদের মৃতদেহগুলো উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۞

অর্থ : (তারপর যা ঘটল তা হলো) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। যারা শোআইবকে মানতে অস্বীকার করল, তারা এমনভাবে মিটে গেল, যেন তারা (তাদের ঘরে) ছিলই না। যারা শোআইবকে মিথ্যা মনে করল তারাই (শেষ পর্যন্ত) বরবাদ হয়ে গেল।

–সূরা আ'রাফ : ৯১-৯২

আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে প্রথমেই হযরত শোআইব (আ) ও তাঁর প্রতি ঈমানদারদেরকে রক্ষা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۞ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ۞

অর্থ : শেষ পর্যন্ত যখন আমার হুকুম এসে গেল, আমার রহমত দিয়ে শোআইবকে ও তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলাম। আর যারা যুলুম করেছিল এমন কঠিন এক আওয়াজ এসে তাদেরকে পাকড়াও করল যে, তারা নিজেদের বাড়ি-ঘরেই উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যেন তারা কখনো সেখানে বসবাসই করতো না। জেনে রাখ, মাদইয়ানবাসীদেরকেও দূরে ফেলে দেওয়া হলো, যেমন সামূদ জাতিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

–সূরা হূদ : ৯৪-৯৫

আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন—

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۞ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۞ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۚ اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ۞

অর্থ : তার কওমের ঐ সব সরদার, যারা তার কথা মানতে অস্বীকার করেছিল, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, তোমরা যদি শোআইবকে মেনে চল তাহলে তোমরা বরবাদ হয়ে যাবে। (তারপর যা ঘটল তা হলো) এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। যারা শোআইবকে মানতে অস্বীকার করল, তারা এমনভাবে মিটে গেল, যেন তারা (তাদের ঘরে) ছিলই না। যারা শোআইবকে মিথ্যা মনে করল তারাই (শেষ পর্যন্ত) বরবাদ হয়ে গেল। –সূরা আ'রাফ : ৯০-৯২

অবিশ্বাসী জাতির যে বলেছিল "তোমরা যদি শোআইবকে অনুসরণ কর, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল"।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তার নবী শোআইব (আ)-এর অবস্থা উল্লেখ করে বলেন, (যখন শোআইব (আ)-এর গোত্রের লোকেরা তাঁর কথা শুনল না এবং প্রকাশ্যে তাঁকে ত্যাগ করল, তখন তিনি আফসোস করে বললেন, কুরআনের ভাষায়)।

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۞

অর্থ : তারপর (শোআইব) এ কথা বলে ঐ এলাকা থেকে চলে গেলেন, হে আমার কওম! আমি তোমাদের নিকট আমার রবের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনার হকও আদায় করেছি। এখন যে কওম সত্য কবুল করতেই অস্বীকার করে তার জন্য আমি কী করে আফসোস করি? –সূরা আ'রাফ : ৯৩

অর্থাৎ যখন আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, তখন শোআইব (আ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে অনুতাপ করে এ বলে সেখান থেকে চলে আসলেন। হে আমার জাতি! আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমি সর্বদাই তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। তোমাদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেছি। কিন্তু তোমরা আমার কথা মানো নি। আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি। তোমাদেরকে সৎপথে আনার জন্য আমি চেষ্টায় কোনো প্রকার ত্রুটি করি নি। কিন্তু আমার সর্ব প্রকার চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ সৎপথে নিয়ে আসতে পারে না। আর আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকে না। এখন থেকে আর আমি তোমাদের সম্পর্কে কোনো আফসোস করব না। কারণ, তোমরা নিজেরাই আমার উপদেশ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছ। তোমরা শাস্তি ও লাঞ্ছনার দিবসকে ভয় কর নি। এ কারণেই নবী বলেছেন, "এখন আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আফসোস করি।" অর্থাৎ তারা নিজেরাই সত্যকে ত্যাগ করল এবং সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করল না। ফলে তাদের উপর আল্লাহর এমন আযাব অবতীর্ণ হলো, যা আর ফিরানো এবং স্থগিত করে রাখা সম্ভব নয়। আর এ আযাব থেকে অবিশ্বাসীদের কারো রক্ষা পাওয়া এবং পালিয়ে যাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না।

হাফিজ ইবনে আসাকির (রহ) তার ইতিহাস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, শোআইব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে আগমন করেছেন। আর ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেছেন, হযরত শোআইব (আ) ও তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিনগণ মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁদের কবর কাবা গৃহের পশ্চিম পাশে নাদওয়াহ ও দারে বনী সহমের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

আমরা ইতঃপূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা করেছি। এরপর তাঁর সময়কার হযরত লূত (আ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনাগুলোও বর্ণনা করেছি। এরপর হযরত শোআইব (আ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা বর্ণনা করেছি। কারণ, কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনার পাশাপাশি হযরত লূত (আ)-এর জাতির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আমরাও এ দু' ঘটনাকে পাশাপাশি বর্ণনা করেছি। আইকাবাসী ও মাদইয়ানবাসী একই সম্প্রদায়। যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। কুরআন মাজীদের অনুকরণেই আমরা লূত (আ) ও এরপরেই শোআইব (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছি। এখন আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই নবুওয়াত ও কিতাব প্রদান সীমাবদ্ধ রাখেন। কারণ, তারপরে যত নবী ও রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, সকলেই তাঁর বংশের লোক ছিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আ)

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কয়েকজন পুত্র সন্তান ছিলেন। যাদের কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এ পুত্র সন্তানদের মধ্যে দু'জন ছিলেন অতি সুপরিচিত ও বিখ্যাত। কারণ এরা দু'জনেই নবী ছিলেন। এ দু'জনার মধ্যে বয়সে বড় ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। এ ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন "যাবীহুল্লাহ"। এ সময় তিনি একাই ছিলেন। ইসমাঈল (আ) মিশরের কিবতী বংশের হাজেরার সুগর্ভে ভূমিষ্ট হতেন। যারা ইসহাক (আ)-কে "যবীহুল্লাহ" বলে থাকে, তারা বনী ইসরাঈলদের থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর এ বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর কিতাব-তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যে অনেক পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংস্কার করেছে। যা সত্য ও সঠিক, সেগুলোকে তারা বাদ দিয়ে আল্লাহর কিতাবের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন ইসমাঈল (আ)-কে যবেহ করার আদেশ পান, তখন ইসমাঈল (আ) ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র সন্তান ছিলেন। যা হোক, বিশুদ্ধ মত এই যে, 'যাবীহুল্লাহ' ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কুরআন মাজীদেও এর উল্লেখ আছে। বনী ইসরাঈলের কিতাবেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর

বয়স যখন ছিয়াশী বছর তখন তাঁর ঔরসে ইসমাঈল (আ) জন্ম লাভ করেন। আর ইসহাক (আ) ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে তখন জন্মগ্রহণ করেন, যখন ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল একশ বছরের উর্ধ্বে। সুতরাং বাহ্যিক এবং তাৎপর্যগত উভয় দিক দিয়েই হযরত ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন একা এবং একক। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একা এভাবে যে, ইসমাঈল (আ) তের বছর পর্যন্ত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র সন্তান ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ) ইসমাঈল (আ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার তের বছর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। আর এর তাৎপর্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) শিশু ইসমাঈল (আ) ও তার মাতা হাজেরাকে নিয়ে ফারান পর্বতের পাদদেশে মরু প্রান্তরে নির্বাসনে রেখে আসেন। তাঁদের কাছে অল্প কিছু পানি ও সামান্য খাবার ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য আর কিছুই ছিল না। একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করেই তাঁদেরকে সেখানে রেখে আসা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর রহমত ও করুণার দ্বারা বেষ্টন করে নেন। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) মহা ব্যবস্থাপক, লালন-পালনকারী ও সাহায্যকারী। হযরত ইসমাঈল (আ) যে বাহ্যিকভাবে ও তাৎপর্যগত দিক দিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একক সন্তান, এর গোপন রহস্য ও তত্ত্ব কে জানে? আর কে এ রহস্য উন্মোচন করতে চেষ্টা করে? নবীগণ ব্যতীত আর কারো পক্ষে এ রহস্য উন্মোচন করা এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গুণাবলী ও আদর্শের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সহনশীল, প্রতিশ্রুতি পালনকারী। নামাযের হেফাযতকারী এবং নিজ পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার আদেশ দানকারী যাতে তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পেতে পারে। এছাড়াও তিনি ছিলেন অন্যান্য ইবাদতের ও দাওয়াত এবং তা'লীমদাতা। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ز اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ص وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۞

অর্থ : এ কিতাবে ইসমাইলের কাহিনীও স্মরণ করুন। তিনি ওয়াদা পালনে সত্যপন্থি ছিলেন এবং রাসূল ও নবী ছিলেন। তিনি তার পরিবারের লোকদেরকে নামায ও যাকাতের হুকুম দিতেন এবং তার রবের নিকট পছন্দনীয় মানুষ ছিলেন। -সূরা মারইয়াম : ৫৪-৫৫

আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন—

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ۞

অর্থ : আমি তাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুখবর দিলাম।[১] সেই ছেলে যখন তার সাথে দৌড়ঝাঁপ করার বয়স পর্যন্ত পৌঁছল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললেন, বাবা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি। এখন তুমি বল, তুমি কী মনে কর। ছেলে বলল, আব্বাজান! আপনাকে যে হুকুম দেওয়া হচ্ছে তা করে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন। -সূরা সাফ্ফাত : ১০১-১০২

পিতা ইবরাহীম (আ) যখন তাকে কুরবানীর কথা বললেন, সাথে সাথে তিনি (ইসমাঈল আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মাথা পেতে নিলেন এবং প্রতিশ্রুতিও দিলেন যে, আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি আন্তরিকভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন। তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পালনও করেছেন এবং চরম পর্যায়ের ধৈর্যধারণ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِي الْاَيْدِيْ وَالْاَبْصَارِ ۞ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ

১. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)।

الدَّارِ ۞ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۞ وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۞

অর্থ : আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করুন। তারা খুবই কর্মক্ষমতা ও দূর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে একটি খাঁটি গুণের ভিত্তিতে খালিস করে নিয়েছিলাম। আর তা ছিল আখিরাতের স্মরণ। নিশ্চয়ই তারা আমার কাছে বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য। ইসমাঈল, আল ইয়াসা'আ ও যুলকিফল-এর কথা স্মরণ করুন। তারা সবাই নেক লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— -সূরা সোয়াদ : ৪৫-৪৮

وَإِسْمٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنٰهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۞

অর্থ : এ সব নিয়ামতই আমি ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফলকে দিয়েছি। এরা সবাই সবর অবলম্বনকারী ছিলেন। আমি তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। আর তারা নেককার লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। -সূরা আম্বিয়া : ৮৫-৮৬

সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلٰى نُوحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ .

অর্থ : (হে রাসূল!) আমি আপনার উপর তেমনিভাবে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের উপর পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়কূবের বংশধরগণের নিকট ওহী পাঠিয়েছি। -সূরা নিসা : ১৬৩

সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قُولُوٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ .

অর্থ : (হে মুসলিম সমাজ!) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর; ঐ হেদায়াতের উপর, যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে; আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইয়াকূবের সন্তানদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। -সূরা বাকারা : ১৩৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ .

অর্থ : অথবা তোমরা কি বলতে চাও, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার সন্তানগণ ইহুদী বা খ্রিস্টান ছিলেন? আপনি বলুন, তোমরা বেশি জানো, না আল্লাহ বেশি জানেন? -সূরা বাকারা : ১৪০

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রেরিত বিভিন্ন নবীর নামের সাথে সাথে ইসমাঈল (আ)-এর নামও বার বার বর্ণনা করেছেন। কয়েক জায়গায় তাঁর নাম ভিন্নভাবে উল্লেখ করে তাঁর সৎগুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁকে নবী ও রাসূল হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যে সব অযৌক্তিক ও অলীক মন্তব্য করেছে, আল্লাহ তার থেকে তাঁকে পবিত্র ও মুক্ত ঘোষণা করেছেন এবং তিনি মু'মিনদের প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার প্রতি যেন ঈমান রাখে।

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন যে, পৃথিবীতে যিনি সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হন, তিনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। এর পূর্বে ঘোড়াগুলো ছিল বন্য প্রাণীরূপে। ইসমাইল (আ) এ বন্য ঘোড়াগুলোকে জনপদে নিয়ে আসেন এবং পোষ মানিয়ে তাতে আরোহণ করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা ঘোড়াসমূহ পোষবে এবং তাতে আরোহণ করবে। কেননা, এটি তোমাদের পিতা ইসমাঈল (আ)-এর মীরাছ।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হযরত ইসমাঈল (আ) সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর।"

এ হাদীস বর্ণনা করেন উমাবী (রহ)। হাদীসখানা বর্ণনা করার সময় জনৈক ইউনুস তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ইয়াসার! আপনি সত্য কথা বলেছেন। আবূ জারীও আমার কাছে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইতপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ) যুবক বয়সে আমালিকা জাতির এক মহিলাকে বিবাহ করেন। পরে তিনি তাঁর পিতার আদেশে সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দেন। উমাবী (রহ) বলেছেন, সেই মহিলার নাম ছিল আম্মারা বিনতে সাদ ইবনে উসামা ইবনে আকীল আল-আমালিকা। এরপর ইসমাঈল (আ) অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ইবরাহীম (আ) সে মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার জন্য পুত্রকে আদেশ দেন। হযরত ইসমাঈল (আ) সে স্ত্রীর সাথেই জীবনযাপন করেন। এ স্ত্রীর নাম ছিল সাইয়্যিদা বিনতে মাদাদ ইবনে আমর আল-জুরহামী। এক বর্ণনা মতে এ মহিলা ছিল তাঁর তৃতীয় স্ত্রী। এ মহিলার গর্ভে হযরত ইসমাঈলের ঔরসে বারটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) এ সন্তানদের নামও বর্ণনা করেছেন। সে নামগুলো হল– নাবিত, কায়যাব, আযবাল, মাসমা, মীশী, মাশ, দাওসা, আযর, ইয়াতুর, তায়মা, নাবাশ, কায়যামা। আহলে কিতাবগণ অনুরূপ এ নামগুলো তাদের কিতাবেও উল্লেখ করেছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ থেকে বারজন মর্যাদাবান ব্যক্তি আগমন করবেন। ইসমাঈল (আ) সম্পর্কে এ সুসংবাদ তাদের কিতাবে ও আমাদের কিতাবে যে দেয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে বলে যে, এরাই হচ্ছে সেই সম্মানিত ব্যক্তি। হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্যে নবী হিসেবে প্রেরিত হন। যেখানের বাসিন্দা ছিল আমালিক ও জুরহাম সম্প্রদায় এবং ইয়ামানবাসীগণ। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর ভাই হযরত ইসহাক (আ)-কে ওসীয়্যত করে যান এবং তাঁর কন্যা নাসমাকে তাঁর ভাতিজা আয়স ইবনে আসহাকের সাথে বিবাহ দেন। আয়সের ঔরসে নাসমার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম ছিল রূম। রূম এর বংশধরকে "বনূল আসফার" বলা হতো। আসফা শব্দের অর্থ হলুদ বর্ণ। বনূল আসফার অর্থ হলুদ বর্ণের বংশধর। এ বলার কারণ আয়সার এর শরীরের বর্ণ হলুদ। এ জন্যে আয়সের বংশধর "বনূল আসফার" নামে ডাকা হতো। অপর এক বর্ণনা মতে আয়স এর আরো দুটি পুত্র সন্তান ছিল। যাদের নাম হচ্ছে ইউনান ও আশবান। ইবনে জারীর (রহ) এ প্রসঙ্গে কোনই মন্তব্য করেন নি। হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজর নামক স্থানে তাঁর মাতা হাজেরার কাছে দাফন করা হয়। ইন্তেকালের সময় ইসমাঈল (আ)-এর বয়স হয়েছিল একশ' সাঁইত্রিশ বছর।

ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কার গরম ও উষ্ণতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করেন। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানান যে, তোমাকে যেখানে দাফন করা হবে, সেখানে আমি তোমার বেহেশতের একটি দরজা খুলে দেব। সেখান থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বেহেশতী হাওয়া আসতে থাকবে। মক্কা ও মদীনার সকল আরব লোকেরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দু' কন্যা কায়যার ও নাবিতের বংশধর।

হযরত ইসহাক (আ)

আমি ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স যখন একশ বছর, তখন তাঁর ঔরসে ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয়। এ সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। হযরত সারাহ (আ) যখন ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ পান, তখন সারাহ (আ)-এর বয়স ছিল নব্বই বছর। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى إِسْحٰقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ ۞

অর্থ : আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি নেক লোকদের মধ্য থেকে একজন নবী। আমি তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম।[১] এখন এ দুজনের বংশধরদের মধ্যে কেউ নেক, আবার কেউ নিজের উপর স্পষ্ট যুলুমকারী। –সূরা সাফ্‌ফাত : ১১২–১১৩

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বহু আয়াতেই হযরত ইসহাক (আ)-এর প্রশংসা করেছেন। তাঁর সম্পর্ক আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি, যার পুত্র ছিলেন মর্যাদাবান এবং তাঁর পুত্রও ছিলেন মর্যাদাবান এবং তাঁর পুত্রও ছিলেন মর্যাদাবান। তিনি হলেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, হযরত ইসহাক (আ) যখন তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় রুফাফা বিনতে বাতওয়াইলকে বিবাহ করেন, তখন ইসহাক (আ)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। কিন্তু এ মহিলাটি (রুফাফা) বন্ধ্যা ছিলেন। হযরত ইসহাক (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে (সন্তানের জন্য) দো'আ করেন। আল্লাহ তাঁর দো'আ কবূল করে তাঁকে দু'টি জমজ পুত্র দান করেন। প্রথম সন্তানটির নাম ছিল ঈসু। যাকে আরবগণ "আয়স" নামে ডাকতেন। ইনি ছিলেন রূপের পিতা। দ্বিতীয় সন্তান যেহেতু প্রথম সন্তানের পরে জন্ম লাভ করেছেন, এজন্যে তাঁর নাম রাখা হয় ইয়াকূব। কারণ "আকব" শব্দের অর্থ পিছনে পিছনে আসা বা পরে আসা। এই ইয়াকূব (আ) এরই উপধি ছিল "বনী ইসরাঈল"। যার দিকে বনী ইসরাঈলগণ সকলেই সম্বন্ধযুক্ত। আহলে কিতাবগণ বলেন "আয়াস" প্রথম সন্তান হওয়ার কারণে হযরত ইসহাক (আ) তাঁকে ইয়াকূব (আ) অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। আর এদের মা রুফাফা ইয়াকূব ছোট সন্তান হওয়ার কারণে তাঁকে আয়স অপেক্ষা বেশি ভালবাসতেন। হযরত ইসহাক (আ) বৃদ্ধ বয়সে যখন দৃষ্টিশক্তি অনেকটা হারিয়ে ফেলেন, তখন তিনি একদিন ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাঁর বড় ছেলে আয়সকে তাঁর জন্য শিকার করে খানা পাকিয়ে নিয়ে আসতে বলেন। যা খেয়ে তিনি তাঁর বরকত ও ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। আয়স একজন শিকারী ছিলেন। তিনি খাদ্য সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়েন। এদিকে মাতা রুফাফা ছোট ছেলে ইয়াকূবকে বললেন, দু'টি উত্তম বকরীর বাচ্চা যবেহ করে তা সুন্দরভাবে পাকিয়ে তোমার বড় ভাইয়ের পূর্বেই পিতার সামনে নিয়ে পেশ কর। যাতে তোমার পিতা তা খেয়ে তোমার জন্য দো'আ করেন। রুফাফা বড় পুত্র আয়সের পোশাক ইয়াকূবকে পরিয়ে তাঁর গর্দান ও বাজুর উপর বকরীর বাচ্চার চামড়া লটকিয়ে দেন। কারণ, আয়স ছিলেন শারীরিক দিক দিয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট। আর ইয়াকূব সেরূপ ছিলেন না। হযরত ইয়াকূব (আ) খানা তৈয়ার করে পিতার খেদমতে নিয়ে গেলেন। পিতা জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? ইয়াকূব (আ) বললেন, আপনার সন্তান। পিতা ইসহাক (আ) তাঁকে গলার সাথে লাগিয়ে চুমু খেলেন এবং বললেন যে, "কণ্ঠস্বর তো ইয়াকূবের মতো কিন্তু শরীর ও পোষাক তো আয়সের বলে মনে হচ্ছে।" তারপর হযরত ইসহাক (আ) খানা খেলেন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন যে, "আল্লাহ যেন তাঁকে তাঁর ভাইদের মধ্যে অধিকতর মর্যাদাবান করেন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে যেন নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা সীমাবদ্ধ থাকে। আর আল্লাহ যেন তার রিযিক ও সন্তান বৃদ্ধি করে দেন।" অতঃপর ইয়াকূব (আ) তাঁর পিতা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এরপরেই ইয়াকূব (আ)-এর বড় ভাই আয়সও ইসহাক (আ)-এর খেদমতে হাজির হন এবং পিতা তাঁকে যা আনার জন্য আদেশ করেছিলেন, তা প্রস্তুত করে আহারের জন্য তাঁর সামনে পেশ করেন। হযরত ইসহাক (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার পুত্র! এগুলো কী? আয়স বললেন, এগুলো সেই খাদ্য, যা আপনি খেতে ইচ্ছা করেছিলেন। পিতা বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি এগুলো আমার সামনে পেশ কর নি? আয়স বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্মুখে এর পূর্বে কোনো খাদ্য নিয়ে আসি নি। অতঃপর আয়স জানতে পারলেন

১. অর্থাৎ, কুরবানীর এই ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দিলেন।

যে, তাঁর পূর্বে তাঁর ছোট ভাই ইয়াকূব এসে এভাবে কাজ করে গেছেন। এতে ইয়াকূবের প্রতি আয়স খুব রাগান্বিত হলেন। আহলে কিতাবগণ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইসহাক (আ)-এর ইন্তেকালের পরে আয়স তাঁর ছোট ভাই ইয়াকূবকে হত্যা করারও হুমকি দেন।

তারপর আয়স পিতার কাছে দো'আর জন্য আবেদন করলে পিতা তাঁর জন্য অন্য আর একটি দো'আ করলেন, "আয়সের সন্তানগণ যেন উত্তম যমীনের অধিকারী হয় এবং অধিক পরিমানে ফসলাদী ও রিযিক যেন লাভ করেন।" মাতা রুফাফা যখন আয়সের এ হুমকির খবর শুনতে পেলেন। তখন ছোট পুত্র ইয়াকূবকে নিরাপদের জন্য হারানে তাঁর মামা লাবানের নিকট যেতে বললেন এবং তাঁর ভাই আয়সের ক্রোধ দমন না হওয়া পর্যন্ত হারানে তার মামার কাছেই থাকতে আদেশ দিলেন। পুত্র ইয়াকূবকে আরো বলে দিলেন যে, তিনি যেন তাঁর মামার কন্যাকে বিবাহ করেন। এরপর মাতা রুফাফা হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে ইয়াকূবের জন্য দো'আর জন্যে আবেদন করলেন এবং তাঁকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্য আরয করলেন। হযরত ইসহাক (আ) দো'আ করলেন ও উপদেশও দিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) ঐ দিন বিকেল বেলায়ই তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে হারানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। চলতে চলতে যখন রাত হয়ে গেল তখন একটি জায়গায় পাথর মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রাবস্থায় হযরত ইয়াকূব (আ) স্বপ্নে দেখলেন যে, আকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি স্থাপিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠানামা করছেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (ইয়াকূব (আ)কে) সম্বোধন করে বলেছেন, "আমি তোমাকে অতি তাড়াতাড়ি বরকতময় করব এবং তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করব। আর তোমাকে এবং তোমার পরবর্তী বংশধরদেরকে এ পৃথিবীর ক্ষমতাবান বানাব। নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে হযরত ইয়াকূব (আ) অত্যন্ত খুশি হন এবং মানত করেন যে, তিনি যদি তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে নিরাপদে ফিরতে পারেন, তবে এ জায়গায় (যেখানে বসে স্বপ্ন দেখেছেন) আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের জন্য একখানা ঘর তৈয়ার করবেন। আর এ মানতও করলেন যে, আল্লাহ তাঁকে যা কিছু অর্থ সম্পদ দান করবেন, তার এক-দশমাংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। তারপর ইয়াকূব (আ) যে পাথরটির উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, সে পাথরটির উপর তৈল লাগিয়ে দিলেন যাতে (পাথরের তৈলের চিহ্ন দেখে) পরে পাথরটি চিনতে পারেন। (সম্ভবত পাথরটি এখানে পতিত হয়েছিল।) তিনি এ স্থানটির নাম বায়তঈল রাখেন। যার অর্থ হচ্ছে "বায়তুল্লাহ"। এটাই সেই স্থান যা আজ বায়তুল মুকাদ্দাস নামে খ্যাত। যা হযরত ইয়াকূব (আ) সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন। আহলে কিতাবগণ আরো বলেছেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হারানে তাঁর মামার কাছে গিয়ে পৌছেন এবং সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর মামার দু'টি কন্যা ছিল। বড়টির নাম ছিল লায়া। আর ছোটটির নাম ছিল রাহীল। ছোট কন্যাটি বড়টি অপেক্ষা অত্যন্ত রূপসী ও সুন্দরী ছিল। ইয়াকূব (আ) তাঁর মামার কাছে তাঁর ছোট কন্যাটি বিবাহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মামা এ শর্তের উপর রাজি হন যে, তাঁকে ছয় বছর বকরীর পাল চরাতে হবে। যখন ছয় বছর পুরা হয়ে গেল, তখন মামা অনুষ্ঠান করে সকলকে দাওয়াত দিয়ে তাঁর মেয়েকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন। কিন্তু ইয়াকূব (আ) জানতেন না যে, ছোট মেয়েটির পরিবর্তে বড় কন্যাটিকে তাঁর সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছে। বাশর রাতে বড় মেয়ে লায়াকে তাঁর কাছে পাঠানো হলো। সকাল বেলা ইয়াকূব (আ) লায়াকে তাঁর স্ত্রীরূপে দেখতে পেয়ে মামার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার সাথে কেন প্রতারণা করলেন? আমি তো রাহীলের জন্য আপনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। মামা বললেন, বড় মেয়ে অবিবাহিতা থাকা অবস্থায় তাকে রেখে ছোট মেয়েকে বিবাহ দেয়া আমাদের সামাজিক নিয়ম বহির্ভূত। যদি তুমি আমার ছোট মেয়েকে পছন্দ করেই থাক, তবে পুনরায় সাত বছর যদি আমার বকরীর পাল চরাতে পার, তবে তাকেও তোমার সাথে বিবাহ দিব। হযরত ইয়াকূব (আ) সাত বছর কাজ করে লায়ার ছোট বোন রাহীলাকেও বিবাহ করেন। এরূপ দু' বোনকে একত্রে বিবাহ করা তাঁদের শরীয়াতে বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তাওরাত কিতাবে এ নিয়ম রহিত হয়ে যায়। ইয়াহুদীরা এ ব্যাপারে আমাদের শরীয়ত সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকে। নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর কাজটি পরবর্তীতে যে রহিত হয়েছে, তা তাওরাত কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। তারপর মামা লাবান তাঁর দু' মেয়ের প্রত্যেকের সাথেই খেদমতের জন্য একজন করে বাদী দিয়ে দেন। বড় মেয়ে লায়ার সাথে যে বাদীটি

দিলেন, তার নাম ছিল যুলফা। আর ছোট মেয়ে রাহীলের সাথে যে বাঁদীটি দিলেন তার নাম ছিল বালহা। আল্লাহ তা'আলা লায়াকে কয়েকটি সন্তান দান করে তাঁর মানসিক দুর্বলতাকে পূরণ করে দেন। অর্থাৎ লায়া সুন্দরী ও রূপসী ছিলেন না। এ অনুভূতি দূর করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তার গর্ভে ইয়াকূব (আ)-এর ঔরসে কয়েকটি সন্তান দান করেন। লায়ার গর্ভে ভূমিষ্ট সন্তানের নাম– ১) রুবিল, ২) শামউন, ৩) লাবী এবং ৪) ইয়াহুযা। ছোট বোন রাহীলের কোনো সন্তান হতো না। এতে তিনি (রাহীল) ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সন্তান ধারণ করার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তিনি (রাহীলা) তাঁর নিজ খাদিমা (বাদী) বালহাকে হযরত ইয়াকূবের খেদমতে উপহারস্বরূপ পেশ করেন। ইয়াকূব (আ) বাঁদী বালহার সাথে মিলিত হলে সে বাঁদী গর্ভ ধারণ করেন এবং তাঁর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় দান। এরপর তাঁর থেকে আর একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তাঁর নাম রাখা হয় নায়ফ্তালী। এবার লায়াও তাঁর বাঁদী যুলহাকে হযরত ইয়াকূবের খেদমতে উপহার স্বরূপ পেশ করেন। হযরত ইয়াকূব (আ) তার সাথেও মিলিত হন। এই বাঁদীর গর্ভেও দু'টি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এরপর লায়াও গর্ভ ধারণ করেন এবং তাঁর গর্ভে পঞ্চম পুত্র ভূমিষ্ট হয়। তার নাম রাখেন আয়সখার। পুনরায় লায়ার গর্ভে ষষ্ট পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় যাবিলুন। এরপর লায়া পুনরায় গর্ভবতী হন। এ গর্ভে একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় দিনা। এভাবে লায়ার গর্ভে ইয়াকূব (আ)-এর ঔরসে সাতটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এ সব কিছু দেখে রাহীলা অত্যন্ত ব্যথিত ও পেরেশান হয়ে একটি সন্তানের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে মুনাজাত করেন। আল্লাহ রাহীলার ব্যথিত হৃদয়ের মুনাজাত কবুল করেন। ফলে আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ঔরসে রাহীলার গর্ভে সুন্দর চেহারার অতি সুশ্রীযুক্ত ও দীপ্তমান এক পুত্র জন্ম লাভ করে। যিনি হলেন হযরত ইউসুফ (আ)।

ইয়াকূব (আ)-এর সকল সন্তান-সন্ততি হারানে অবস্থানকালেই জন্মগ্রহণ করে। ইয়াকূব (আ) তাঁর মামার শর্তসমূহ পূর্ণ করার পরে আরো ছয় বছর ছাগল চরান। এভাবে ইয়াকূব (আ) তাঁর মামার কাছে হারানে বিশ বছর অবস্থান করেন। এবার ইয়াকূব (আ) তাঁর পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য মামার কাছে অনুমতি চাইলেন। মামা বললেন, তোমার কারণে আমার ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রত্যেকটি কাজে বরকত হয়েছে। সুতরাং তুমি আমার ধন-দৌলত থেকে যত পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে যাও। হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন, এ বছর আপনার বকরীর যে বাচ্চাগুলো হবে, তা থেকে যেগুলো হবে সাদা ও কালো রং বিশিষ্ট সেগুলো আমাকে দেবেন। আর দেবেন সেই গর্ভবতী বকরীগুলো যেগুলোর সাদার রং কালো রং এর সাথে মিশ্রিত। (অর্থাৎ সাদার চেয়ে কালো রং বেশি)। আর সেই বকরীগুলোও দেবেন যেগুলোর কালো রং সাদার সাথে মিশ্রিত। (অর্থাৎ কালোর চেয়ে সাদা রং বেশি)। আর দেবেন সেই বকরীগুলো যেগুলো হবে শিং ছাড়া। তাঁর মামার ছেলেরা পিতার বকরীর পাল থেকে এরূপ বকরীগুলোকে আলাদা করেন। তারপর হযরত ইয়াকূব (আ) তার সমস্ত সন্তান-সন্ততি ও মামার দেওয়া বকরীগুলোসহ রওয়ানা হলেন। তিন দিনের পথ অতিক্রম করে ইয়াকূব (আ) আখরুট ও বাদাম গাছে লাকড়িসমূহ খণ্ড খণ্ড করে বকরীর পানি খাওয়ার স্থানে পুঁতে দিলেন। যাতে গর্ভবতী বকরীগুলো তা দেখে ভীত হয় এবং তার পেটের মধ্যে বাচ্চা নড়াচড়া শুরু করে এবং বাচ্চাগুলো উপরোক্ত রংবিশিষ্ট হয়। এটাও ইয়াকূব (আ)-এর একটি মু'জিযা–অলৌকিক ঘটনা। হযরত ইয়াকূব (আ) বহু সংখ্যক বকরী, অন্যান্য পশু ও দাস-দাসীর মালিক হন। তারপর ইয়াকূব (আ) তাঁর নিজ পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পান এবং আল্লাহ তাঁকে এ কথাও জানিয়ে দেন যে, তিনি (আল্লাহ) নিজ সাথে রয়েছেন। ইয়াকূব (আ) এ কথাটি তাঁর মামার কাছে বললে, তিনি খুশি মনে কবুল করেন। সুতরাং ইয়াকূব (আ) নিজ পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে রওয়ানা করেন। রওয়ানা হওয়ার মুহূর্তে রাহীল তাঁর পিতা লাবানের মূর্তিটি গোপনে সাথে করে নিয়ে আসেন। ইয়াকূব (আ) যখন তাঁর কাফেলাসহ হারান শহর ত্যাগ করেন, তখন তাঁর মামা লাবান এবং তাঁর গোত্রের লোকেরা ইয়াকূব (আ)-এর কাছে হাজির হন। লাবান ইয়াকূব (আ)-কে এ বলে তিরস্কার করেন যে, আমার অজান্তে কেন তুমি দ্রুত চলে আসলে এবং রওয়ানা দেয়ার সময় কেন তুমি আমার কাছে বলে আস নি? আমার কাছে বলে আসলে আমি সুন্দর অনুষ্ঠান করে ঢোল, তবলা বাজিয়ে তোমাকে বিদায় করতাম। এরপর

লাবান বললেন, এ কাফেলার লোকেরা আমার মূর্তি সাথে করে নিয়ে এসেছে। ইয়াকূব (আ) এ মূর্তির ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। লাবান তাঁর নিজ কন্যা ও বাঁদীদের শিবিরে প্রবেশ করে মূর্তি খোজাখুজি করল। কিন্তু কিছুই বের হলো না। ইয়াকূব (আ) তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, এ মূর্তি তাঁরা আনেন নি। রাহীল নিজ পিতা লাবানের মূর্তিটি তাঁর নিজ সওয়ারীর পালানের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এর উপরে তিনি বসা ছিলেন। তিনি তাঁর বসার স্থান থেকে দাঁড়ান নি। তাঁকে দাঁড়াতে বললে, তিনি এ বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন যে, "আমি অসুস্থ"। শেষ পর্যন্ত লাবান মূর্তিটির কোনই সন্ধান পেলেন না।

অতঃপর সেখানে অবস্থিত 'জলআদ' নামক একটি টিলার উপর বসে ইয়াকূব (আ) ও লাবানের মাঝে পরস্পরে এ বলে প্রতিশ্রুতি হয় যে, ইয়াকূব (আ) লাবানের মেয়েদেরকে কখনো লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না এবং তাঁর কন্যাদের উপস্থিতিতে অন্য আর কাউকে বিবাহ করবেন না। এরপর উভয়ে মিলে সেখানে খাওয়ার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। গোত্রের সকল লোকেরা আহার করেন। অনুষ্ঠান শেষে শ্বশুর জামাতা একে অপরকে বিদায় জানান এবং সকলেই নিজ নিজ দেশের দিকে রওয়ানা হন। এরপর ইয়াকূব (আ) সায়ীর অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছলে, তাঁর কাছে ফেরেশতাগণ আগমন করেন এবং তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তারপর এক গোলাম এসে ইয়াকূব (আ)-কে বলেন যে, "আয়স" চার'শ সওয়ারীসহ আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হযরত ইয়াকূব (আ) এই সংবাদ শুনে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থী হয়ে দো'আ করেন। নামায আদায় করেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেন। ইয়াকূব (আ) আয়সের জুলুম ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দো'আ করেন।

এদিকে হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর বড় ভাই আয়সের জন্যে বিপুল পরিমাণ উপহার প্রস্তুত করেন, উপহারসমূহের মধ্যে ছিল, দু'শ বকরী, বিশটি ছাগল, দু'শ ভেড়ী, বিশটি ভেড়া, ত্রিশটি দুগ্ধবতী উটনী, চল্লিশটি গাভী, দশটি ষাঁড়, বিশটি গাধী ও দশটা গাধা। ইয়াকূব (আ) তাঁর গোলামদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা প্রত্যেক শ্রেণীর পশুকে ভিন্ন ভিন্নভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে হাকিয়ে নিয়ে চল এবং এমনভাবে শ্রেণী বিন্যাস করবে যাতে প্রতিটি সারির মাঝে কিছুটা দূরত্ব বজায় থাকে। তিনি গোলামদেরকে আরো আদেশ দিলেন যে, আয়সের সাথে তোমাদের যার সাথেই প্রথম দেখা হবে, তিনি যখন তোমাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কারা এবং এ পশুগুলো কার? উত্তরে তোমরা বলবে, এগুলো ইয়াকূবের। তিনি এগুলো উপহার স্বরূপ আমাদের সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় নেতা আয়সের খেদমতে পেশ করেছেন। এভাবে একের পর এক যার সাথেই তোমাদের দেখা হবে, তোমরা সবাই একই কথা বলবে। আর সবাই একথাও তাঁকে বলবে যে, ইয়াকূব (আ) তাঁর দু' স্ত্রী, দু' বাঁদী এবং নিজ এগারটি সন্তান-সন্ততিসহ, তাঁর প্রেরিত কাফেলার থেকে দু' রাতের দূরত্বে আছেন।

হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর কাফেলাসহ রাতের বেলা চলতেন এবং দিনের বেলা বিশ্রাম গ্রহণ করতেন। সফর অবস্থায় কোনো এক ফজরের সময় এক ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধরে তাঁর সামনে উপস্থিত হন। হযরত ইয়াকূব (আ) ফেরেশতাকে মানুষ ধারণা করে তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন এবং তাঁর সাথে কুস্তি করে বিজয়ী হন। কিন্তু এই মল্লযুদ্ধে মানবরূপী ফেরেশতার আক্রমণে ইয়াকূব (আ) তাঁর উরুতে ব্যথা পান। যখন সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? উত্তরে বললেন, আমার নাম ইয়াকূব। ফেরেশতা বললেন, অদ্য থেকে আপনার নাম হবে ইসরাঈল।

অতঃপর হযরত ইসরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয় কি? তিনি তাঁর পরিচয় গোপন করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) বুঝতে পারলেন যে, নিশ্চয়ই ইনি ছিলেন একজন ফেরেশতা। হযরত ইয়াকূব (আ) ফেরেশতা কর্তৃক আঘাত পেয়ে সেই ফজর থেকেই একটু খুড়িয়ে চলতে থাকেন। এ কারণে বনী ইসরাঈলগণ হাঁটুর পিছনের অংশ (উরু) খান না। তারপর হযরত ইয়াকূব (আ) তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পান যে, বড় ভাই আয়স চারশ পদাতিক সেনাবাহিনীসহ এগিয়ে আসছে। ইয়াকূব (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁর খেদমতে পৌঁছেন এবং ভাই আয়সকে দেখার সাথে সাথে তাঁকে সাত বার সম্মানসূচক সিজদা করেন। সে যুগে এটাই ছিল তাদের সালাম। তাঁদের শরীয়াতে এরূপ সম্মানসূচক সিজদা বৈধ ছিল। হযরত আদম (আ)-কেও ফেরেশতাগণ

এরূপ সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-কেও তাঁর ভাইয়েরা অনুরূপ সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন। আয়স ছোট ভাই ইয়াকূব (আ)-কেও দেখে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র হলেন এবং তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন ও চুমু খেলেন। অতঃপর তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। এরপর আয়স ইয়াকূব (আ)-এর সাথে আগত তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? ইয়াকূব (আ) বললেন, এরা আপনার খেদমতে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে নিজ গোলামকে এ সব কিছু প্রদান করেছেন। অতঃপর ইয়াকূব (আ)-এর দু' বাঁদী প্রথমে সামনে অগ্রসর হয়ে আয়সকে সিজদা করেন। তারপর তাঁর বড় স্ত্রী লায়া ও তাঁর সন্তানগণ আয়সকে সিজদা করেন। এরপর রাহীল এবং তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে আয়সকে সিজদা করেন। তারপর হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর উপহার সমগ্রী কবুল করার জন্য বড় ভাইয়ের খেদমতে বিশেষভাবে আবেদন করেন। অবশেষে বড় ভাই আয়স ছোট ভাই ইয়াকূব (আ)-এর উপহার গ্রহণ করেন। তারপর আয়স তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান। হযরত ইয়াকূব (আ) ও পরিবার-পরিজন ও পশু সম্পদ ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে সায়ীর পাহাড় পর্যন্ত পৌছেন। এরপর সাহর নামক স্থান অতিক্রমকালে তিনি সেখানে একখানা ঘর নির্মাণ করেন এবং আশ্রয় নেন। এরপর ইয়াকূব (আ) উর-শলীম নামক এক অঞ্চল সন্নিকটস্থ এক জনপদে অবস্থান করেন এবং শাখীম ইবনে জমুর নামক এক ব্যক্তি থেকে একশ ভেড়ার বিনিময় এক খণ্ড জমি ক্রয় করে সেখানে তাবু স্থাপন করেন। সেখানে তিনি কুরবানীর পশু যবেহ করার জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করেন। সেই জায়গাটির নাম রাখেন ঈল ইলাহে ইসরাঈল। অর্থাৎ ইসরাঈলের ইলাহ। আল্লাহ তায়ালা ইয়াকূব (আ)-কে সেই স্থানে একখানা ঘর তৈরি করার জন্য আদেশ দেন। যাতে সেখান থেকে আল্লাহর পবিত্র নাম বুলন্দ হয়। এ স্থানটি সেই পাথরের স্থান, যেই পাথরখানার উপর হযরত ইয়াকূব (আ) ইতঃপূর্বে তেল লাগিয়ে ছিলেন।

এখানে আহলে কিতাবগণ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মেয়ে দীনা সম্পর্কে একটি বর্ণনা করেন, যে মেয়ে লায়ার গর্ভজাত ছিল। ঘটনাটি হলো এই যে, শাখীম ইবনে জমুর এ দীনাকে জোরপূর্বক তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। অতঃপর তার পিতা ও ভাইদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। দীনার ভাইয়েরা তাকে জানাল যে, তোমরা সবাই যদি খতনা করিয়ে নাও, তাহলে তোমার প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক হতে পারে। কেননা, আমরা খাতনাবিহীন সম্প্রদায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করি না। এ প্রস্তাব তারা মেনে নিয়ে সবাই খাতনা করিয়ে নিল। খাতনা করার পর তৃতীয় দিবসে তারা কষ্ট ও যন্ত্রণায় খুব ছটফট করতে লাগল। এ অবস্থায় ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানগণ তাদের সবাইকে হত্যা করল। এমনকি শাখীম ও তার পিতা জমুরকেও হত্যা করল। হত্যা করার কারণ প্রথমত তারা কুফরী করেছে। দ্বিতীয়ত তারা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাতকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে এবং তারা মূর্তিপূজা করত। এ কারণে ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানগণ তাঁদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ধন-সম্পদগুলোও গণিমত হিসেবে নিয়ে নেয়।

তারপর ইউসুফ (আ)-এর মাতা রাহীল দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হলো। সেই গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যার নাম রাখা হয় বিন ইয়ামীন। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয়, এ সন্তান প্রসবের কষ্টেই হযরত রাহীল ইন্তেকাল করেন। হযরত ইয়াকূব (আ) স্ত্রী রাহীলকে আফরাস নামক স্থানের বায়তে লহমে দাফন করেন। ইয়াকূব (আ) নিদর্শনস্বরূপ হযরত রাহীলের কবরের উপর একখানা পাথর রেখে দেন। যা আজ পর্যন্ত সেখানে বিদ্যমান আছে। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্র সন্তান মোট বারজন। এদের মধ্যে বড় স্ত্রী লায়ার গর্ভে যাদের জন্ম হয়, তাঁরা হলেন– রুবীল, শামউন, লাওয়ী, ইয়াহুয ও যায়েনুল। আর রাহীলের গর্ভ থেকে জন্ম হয় হযরত ইউসুফ (আ) ও বিন ইয়ামীন। আর রাহীলের বাঁদীর গর্ভ থেকে দান ও নায়ফতালী এবং লায়ার বাঁদীর থেকে হাদ ও আশীর (আ)-এর জন্ম হয়। এরপর হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পিতা হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে আসেন এবং কানআনের হিবরুন অঞ্চলে পিতার কাছেই বসবাস করতে থাকেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-ও এখানেই বসবাস করতেন। হযরত ইসহাক (আ) খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একশ আশি বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁকে তাঁর দুই পুত্র আয়স ও ইয়াকূব (আ) তাঁদের দাদা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর কাছেই দাফন করেন। এ স্থানটি ইবরাহীম (আ) নিজেই ক্রয় করেছিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেন। যাতে মানুষ এই ঘটনাতে যেসব কৌশল, উপদেশ, শিষ্টাচার ও তথ্য নিহিত আছে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

الٓمٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۞ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۚ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۞

অর্থ : আলিফ লাম-রা। এটা ঐ কিতাবের আয়াত, যা নিজের কথা স্পষ্ট করে বলে। আমি এটাকে কুরআন হিসেবে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা (আরবরা) তা ভালোভাবে বুঝতে পার। (হে নবী!) আমি এ কুরআনকে ওহী করে পাঠিয়ে অতি সুন্দরভাবে ঘটনাবলি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। তা না হলে তো (এ বিষয়ে) আপনি বেখবর ছিলেন। –সূরা ইউসুফ : ১–৩

আলিফ-লাম-রা, এটা হরূফে মুকাততাআত। এ ব্যাপারে আমি (তাফসীরে ইবনে কাসীরে) সূরা বাকারার তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এ বিষয় কেউ জানতে ইচ্ছা করলে, সেই তাফসীর দেখে নেবেন। এ সূরা সম্পর্কেও তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে এর তাফসীর বর্ণনা করব।

এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রশংসা করেছেন। যে কিতাব তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা ও রাসূলের উপর বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় সম্মানিত স্থানে অবতীর্ণ করেছেন। এ কারণে এ কিতাব অতীত ও ভবিষ্যতের উত্তম ও কল্যাণকর বিষয় এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় কিস্‌সা-কাহিনীর কিতাব-ই নয় বরং আদেশ, নিষেধ, হিকমত, সর্বশ্রেষ্ঠ শরীঅত, সর্বোত্তম ও সুস্পষ্ট পথ এবং সঠিক ও কল্যাণকর বিধানের কিতাব। যেমন এ কিতাবে (কুরআন মাজীদে) আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا .

অর্থ : (হে নবী!) সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে আপনার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ। –সূরা আনআম : ১১৫

অর্থাৎ এটা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সত্য এবং আদেশ ও নিষেধের বিধানদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ। এ কারণেই সূরা ইউসুফের শুরুত আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "(হে নবী!) আমি আপনার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি। এই কুরআনের মাধ্যমে যা (কুরআন) আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। যদিও এর পূর্বে আপনি ছিলেন অনবগতদের অন্তর্ভুক্ত।" অর্থাৎ এর পূর্বে আপনার উপর যে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে, তাতে এ প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ ছিল না। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেন—

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۞ فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۞

অর্থ : আমি[১] মূসার কাছে এ কথা ওহী করেছি যে, রাতারাতি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে বের হয়ে যান। আপনাদের পেছনে ওরা আসবে। ফিরাউন (সৈন্য জমা করার জন্য) শহরে শহরে হরকরা (ঘোষক) পাঠিয়ে দিলো। –সূরা শুআরা : ৫২–৫৩

১. এখন দীর্ঘকালের ঘটনাবলিকে বাদ দিয়ে সেই সময়ের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, যখন হযরত মূসা (আ)-কে মিসর ত্যাগ করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

এভাবে আল্লাহ তাঁর নবীকে সূরা ত্বা-হা-এ সম্বোধন করে বর্ণনা করেন—

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا ۞ خٰلِدِيْنَ فِيْهِ ۚ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ۞

অর্থ : (হে নবী!) এভাবেই আমি অতীতের সকল অবস্থার খবর আপনাকে শোনাচ্ছি। আর আমি আপনাকে আমার কাছ থেকে এক বিশেষ 'যিকির' (উপদেশমূলক শিক্ষা) দান করেছি। যে এ থেকে মুখ ফিরাবে সে কিয়ামতের দিন গুনাহের কঠিন বোঝা বইবে। এ রকম লোকেরা সব সময়ই এ বিপদে পড়ে থাকবে। আর কিয়ামতের দিন তাদের জন্য (এ অপরাধের বোঝা) বড়ই কষ্টদায়ক বোঝা হবে। –সূরা ত্বা-হা : ৯৯-১০১

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কিতাবের অনুসরণ করবে, সে মহাপাপের বোঝা বহন করবে। হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এ কুরআন ছাড়া অন্য কিতাবে (পথে) হেদায়েত তালাশ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।" –মুসনাদ, তিরমিযী

হযরত যাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একখানা কিতাব নিয়ে আসেন। যে কিতাবখানা তিনি কোনো এক আহলে কিতাব থেকে পেয়েছিলেন। তিনি কিতাবখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে পাঠ করলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যান এবং তাঁকে বলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি এ কিতাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ? সেই মহান সত্তার কসম! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। আমি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক ও পরিচ্ছন্ন শরীঅত নিয়ে এসেছি। তোমরা আহলে কিতাবদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যদি জিজ্ঞেস কর, তবে তারা যেটাকে সত্য বলবে, সেটাকে তোমরা মিথ্যা মনে করবে। আর যেটাকে তারা মিথ্যা বলবে, সেটাকে তোমরা সত্য জানবে। সেই মহান সত্তার কসম! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি মূসা (আ)-ও এখন জীবিত থাকতেন, তবে তাঁকেও আমার শরীয়াতের অনুসরণ করতে হতো। –মুসনাদে আহমদ

ইমাম আহমদ (রহ)-ও এ হাদীসখানা অন্য এক সূত্রে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "সেই মহান সত্তার কসম! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমাদের মাঝে বর্তমানে মূসা (আ) বিদ্যমান থাকতেন, আর তোমরা যদি আমার অনুকরণ না করে তাঁর অনুকরণ করতে, তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। তোমরা সকল উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ। আর আমি সকল নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো এক ভাষণে বলেছেন, হে সম্মিলিত লোকেরা! আমাকে ব্যাপক কথা সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আমার জন্যে ব্যাপক আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে উজ্জ্বল, নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন শরীআত নিয়ে এসেছি। সুতরাং তোমরা অন্য কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ো না এবং দিশেহারা হয়ে যেয়ো না। দিশেহারা নির্বোধ লোকেরা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সহীফাটি মিটিয়ে দিতে আদেশ দেন। অতঃপর তার প্রতিটি অক্ষর মুছে ফেলা হয়।

(নবী রাসূলদের কিসসা কাহিনী সম্পর্কে আহলে কিতাবদের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের বর্ণনাই সত্য, নির্ভরযোগ্য ও যথাযথ। এ কারণেই এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদের এ কাহিনীগুলো সকলেরই জানা উচিত। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আ)-এর কিসসাসমূহ কুরআন থেকে এখানে বর্ণনা করা হলো।)

হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন ও পরবর্তী ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ

۞ قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۞ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞

অর্থ : এটা ঐ সময়কার কথা, যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বললেন, আব্বা! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এগারটি তারা, সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে। এ কথা শুনে পিতা বললেন, বাবারে! তোমার এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বলবে না। তাহলে তারা তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।[১] নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। এমনই হবে (যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ)। তোমার রব তোমাকে (নিজের কাজের জন্য) বাছাই করে নেবেন এবং তোমাকে সব কথার মূলে পৌছার নিয়ম শেখাবেন।[২] আর তোমার উপর ও ইয়াকূবের বংশের উপর তাঁর নিয়ামত তেমনিভাবে পুরা করবেন, যেভাবে এর আগে তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর করেছেন। নিশ্চয়ই তোমার রব সবকিছু জানেন এবং মহাকুশলী। –সূরা ইউসুফ : ৪–৬

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর ছিল বারজন পুত্র সন্তান। তাঁদের নাম ইতপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলের সকলেই এ বারজনের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁদের বংশধর। এদের মধ্যে অতি সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)। কয়েকজন আলেমের মতে এ বারজন সন্তানের মধ্যে শুধু হযরত ইউসুফ (আ) নবী ছিলেন। অন্য কারো প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয় নি। ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের বক্তব্য ও কার্যক্রমও এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। আর কিছু সংখ্যক আলেমের মতে ইউসুফ (আ)-এর অন্য ভাইয়েরাও নবী ছিলেন। তারা দলীল স্বরূপ নিম্নের আয়াত পেশ করেন।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ۔

অর্থ : হে নবী! আপনি বলুন, আমরা আল্লাহকে মানি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা-ও মানি। ঐ সব শিক্ষাকেও আমরা মানি, যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ও ইয়াকুবের বংশধরদের উপর নাযিল হয়েছিল। –সূরা আলে-ইমরান : ৮৪

এ আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা "ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরদের কথা বর্ণনা করার জন্য 'اَسْبَاطٌ (বংশধর) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা অন্যান্য সকলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এখানে স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্যান্য পুত্রগণও নবী ছিলেন।

কিন্তু তাঁদের এ দলীল খুবই দুর্বল ও অযৌক্তিক। কারণ, উক্ত আয়াতে اَسْبَاطٌ (বংশধর) দ্বারা বনী ইসরাঈলদের মধ্য হতে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা নবী হিসেবে আবির্ভাব হয়েছেন। এ ছাড়া হযরত ইউসুফ (আ) ছাড়া অন্য আর কারো সম্পর্কে নবী হওয়ার স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায় না। হাদীস দ্বারাও এরূপ প্রমাণিত। মুসনাদে আহমদে ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তিনি ছিলেন

---

১. *হযরত ইউসুফের দশ ভাই তাঁর সৎ মায়ের সন্তান ছিল। তাঁর আরেক ভাই তাঁর থেকে ছোট ছিল। সে তাঁর আপন মায়ের পেটের ভাই। হযরত ইয়াকূব (আ) জানতেন যে, সৎ ভাইয়েরা ইউসুফকে হিংসা করতো এবং চরিত্রের দিক দিয়েও তারা এরূপ সৎ ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা কোনো অনুচিত কাজ করতে লজ্জা করবে। এজন্য তিনি তাঁর নেক পুত্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাদের থেকে সাবধান থেক। স্বপ্নের সুস্পষ্ট মর্ম ছিল এই সূর্য দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ)-কে, চাঁদ দ্বারা তাঁর স্ত্রী তথা হযরত ইউসুফের সৎ মাকে এবং এগারটি তারকা দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর এগারো জন ভাইকে বোঝানো হয়েছে।*

২. *আসলে 'তাবীলিল আহাদীস' এর অর্থ শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নয়, সাধারণত যা মনে করা হয়; বরং এর অর্থ আল্লাহ তাআলা তোমাকে সব বিষয় বোঝার ও মূল তত্ত্ব পর্যন্ত পৌছার শিক্ষা দান করবেন। তোমাকে সেই গভীর দৃষ্টি দান করবেন, যার দ্বারা তুমি প্রতিটি ব্যাপারে মর্ম পর্যন্ত এবং তার মূল পর্যন্ত পৌছার যোগ্যতা লাভ করবে।*

সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁর পুত্রও সম্মানিত, তার পুত্রও সম্মানিত এবং তার পুত্রও সম্মানিত। তাঁরা হলেন ইবরাহীম (আ), পুত্র ইসহাক (আ), তাঁর পুত্র ইয়াকূব (আ) এবং তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)।" [এখানে শুধু হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।]

প্রসিদ্ধ আলেম ও মুফাসসিরগণ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ) অপ্রাপ্ত বয়স (বালক) অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র তাঁকে সিজদা করছেন। (এগারটি নক্ষত্র দ্বারা তাঁর এগার ভাই এবং সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা তাঁর পিতা ও মাতাকে বুঝানো হয়েছে।)

হযরত ইউসুফ (আ) এ স্বপ্ন দেখে খুব আতঙ্কিত হন। তিনি জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের কথা তাঁর সম্মানিত পিতাকে জানান। পিতা স্বপ্নের কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, এই বালক (ইউসুফ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুনিয়া ও আখেরাতে অতি মর্যাদালাভ করবেন। আর মাতা, পিতা ও ভাইয়েরাও তাঁর বাধ্যগত হবেন। পিতা তাঁকে এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখতে আদেশ দিলেন এবং ভাইদের কাছে তা কখনো প্রকাশ না করার জন্য বললেন। কেননা, এ স্বপ্নের কথা জানতে পারলে তারা হিংসার আগুনে জ্বলে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এ কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্যান্য ভাইয়েরা নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেন নি। এ কারণে কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, "তোমরা স্বীয় কাজে সফলতা ও উন্নতি লাভের জন্য তা গোপন রাখ। কারণ, প্রত্যেক নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার শিকার হয়ে থাকে।"

আহলে কিতাবগণের অভিমত হলো, হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর স্বপ্নের কথা তাঁর পিতা ও ভাইদের কাছে একত্রে একই বৈঠকে বলেছিলেন। তাদের এ অভিমত সম্পূর্ণরূপে ভুল। হযরত ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে বলেছিলেন যে, "তোমার রব তোমাকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করবেন এবং তোমাকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করবেন। আর তোমাকে কথার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য শিক্ষা দেবেন। (যা অন্য আর কেউ বুঝবে না।) আর তোমার উপর তাঁর নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দেবেন। অর্থাৎ ওহী নাযিল করে তোমাকে নবুওয়াতের মর্যাদা দান করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা [ইয়াকূব (আ) পরিবারবর্গ] কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। যেমন, এর পূর্বে তোমার পিতামহ ইসহাক (আ) ও প্রপিতামহ ইবরাহীম (আ)-এর উপর অনুগ্রহ পূর্ণ করা হয়েছিল।"

অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর উপর নেয়ামত এরূপ বর্ষিত হবে, যেরূপ বর্ষিত হয়েছিল তাঁর পিতামহ ও প্রপিতামহের উপর। নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বর্ণনা করেন—

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهٗ .

অর্থ : আল্লাহ তার রিসালাতের কাজ কাকে দিয়ে করাবেন এবং কীভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। –সূরা আনআম : ১২৪

এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর নবী, যার পিতা [ইয়াকূব (আ)] আল্লাহর নবী, যার পিতা [ইসহাক (আ)] আল্লাহর নবী, যার পিতা হলেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়। তাকে বুস্তানাতুল ইয়াহুদী বলে অভিহিত করা হতো। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমাকে সেই নক্ষত্রগুলোর নাম বলে দিন, যেগুলো ইউসুফ (আ)-কে সিজদা করেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ হয়ে রইলেন। কোনই উত্তর দিলেন না। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করে সেই নক্ষত্রগুলোর নাম বলে দেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন লোক পাঠিয়ে ইয়াহুদী লোকটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি নক্ষত্রগুলোর নাম বলে দিতে পারি তবে তুমি কি ঈমান আনবে? সে বলল, জী (ঈমান আনব)। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই নক্ষত্রগুলোর নাম হলো– জিয়ান, তারিক, দিয়াল, যুলকাতিয়ান, কাবিস, উসাব, উমরদান, ফায়লাক, মাসবিহ, দাক্কহ, যুল-ফারা, দীয়া ও নূর।

ইয়াহুদী লোকটি বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সেই নক্ষত্রগুলোর নাম এরূপই। –তাফসীরে ইবনে জারীর, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে বাযযার।

আবূ ইয়ালা বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাঁর পিতার কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছেন, তখন পিতা তাঁকে বলেছিলেন, এগুলো বিক্ষিপ্ত বিষয়। আল্লাহ এগুলোকে একত্রিত করবেন।

মুফাসসিরগণ বলেন, সূর্য দ্বারা তাঁর পিতাকে চন্দ্র দ্বারা তাঁর মাতাকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّاۤىِٕلِيْنَ ۝ اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۗ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قَاۤىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ۝

অর্থ : আসল কথা এই যে, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে এ প্রশ্নকারীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এ কাহিনী এভাবে শুরু হয় যে, তাঁর ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, ইউসুফ ও তাঁর ভাই[১] আমাদের পিতার কাছে আমাদের সবার চেয়ে বেশি প্রিয়। অথচ আমরা একটা মযবুত দল। আসলে আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেছেন। ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা কোথাও ফেলে দাও, যাতে তোমাদের পিতার মনোযোগ শুধু তোমাদের দিকেই হয়ে যায়। এ কাজ করার পর নেক হয়ে চল। এ কথার পর তাদের একজন বলল, ইউসুফকে মেরে ফেল না। যদি কিছু করতেই চাও তাহলে তাকে কোনো গভীর কূয়ায় ফেলে দাও, কোনো কাফেলা হয়তো তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। –সূরা ইউসুফ : ৭-১০

আল্লাহ তা'আলা এ ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাতে প্রথমত হিকমত, স্পষ্ট নিদর্শন, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। অতঃপর ইউসুফ (আ) ও তাঁর সহোদর ভাই বিন-ইয়ামীনের প্রতি অন্যান্য ভাইদের হিংসার কথা বর্ণনা করেন। এ হিংসার কারণ ছিল এই যে, তারা মনে করতো, তাদের পিতা তাদের চেয়ে ইউসুফ ও বিন-ইয়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। তাদের দাবি হলো, ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই শুধু মাত্র বিন-ইয়ামীন। আমরা সংখ্যায় তাঁদের (দু'জনের) চেয়ে অধিক। সুতরাং পিতার ভালবাসা ও স্নেহ ঐ দু'জনের চেয়ে বেশি পাওয়ার যোগ্য আমরাই। আমাদের পিতা স্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছেন।

অতঃপর তারা (ভাইয়েরা) নিজেরা পরামর্শ করল, ইউসুফকে হত্যা করবে– না বহু দূরে নিয়ে ফেলে আসবে, যাতে সেখান থেকে আর ফিরে না আসতে পারে। এভাবে পিতার থেকে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের প্রতি আমাদের পিতার পূর্ণ স্নেহ ও ভালবাসা আকৃষ্ট হবে। পরে আমরা এ অপরাধের জন্য তওবা করে নেব এবং ভাল হয়ে যাব। তারা দ্বিতীয় প্রস্তাবের উপর একমত হলো। যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

"তাদের মধ্যে একজন বলল, যদি তোমরা কিছু করতেই চাও ইউসুফকে হত্যা কর না; বরং গভীর কূপে নিক্ষেপ কর। হয়তো কোনো পথিক তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।"

মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, এ কথা যে বলেছিল, সে হলো তাঁর ভাই শামউন। সুদ্দীর মতে, সে ছিল ভাই ইয়াহুয। কাতাদাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (রহ) বলেছেন, সে ছিল বড় ভাই রাবীল। এ কথা বলার কারণ ছিল

১. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বা আপন ভাই বিন-ইয়ামীন, যিনি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিলেন।

যে, এর ফলে ইউসুফ (আ) হত্যা থেকে রক্ষা পাবেন এবং উদ্দেশ্যও সফল হবে। সব ভাইয়েরা এতে একমত হলো। তারা তাদের পিতার কাছে বলল—

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۞ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۞ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۞ قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ۞

অর্থ : এ প্রস্তাব অনুযায়ী তারা পিতার কাছে গিয়ে বলল, আব্বা! এটা কেমন কথা যে, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো ভরসা করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার হিতকামী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। সে খুশি মনে ঘুরে বেড়াবে[১] এবং খেলাধুলা করে মনকে চাঙ্গা করবে। আমরা তার হেফাযতের জন্য অবশ্যই হাজির আছি। পিতা বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এ কথায় আমার খুব চিন্তা হয়। আমি ভয় করি যে, তোমরা তার ব্যাপারে বেখেয়াল হয়ে গেলে তাকে না জানি নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে। তারা জবাবে বলল, আমরা একটা মযবুত দল থাকতে যদি তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমরা বড়ই অকর্মণ্য হব। -সূরা ইউসুফ : ১১-১৪

এরূপে তারা পিতার কাছে আবেদন করল যে, ইউসুফকে যেন তাদের সাথে যেতে অনুমতি দেন। তারা ইয়াকূব (আ)-এর কাছে বলল যে, তারা ইউসুফকে খেলাধুলা করতে দিবে এবং তৃপ্তিসহকারে আহার করাবে। তাদের মনের কথা পিতার কাছে গোপন রাখল। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আল্লাহ রহম করুন, তিনি উত্তর দিলেন, হে আমার সন্তানেরা! আমাকে এটা বড়ই কষ্ট দেবে যে, সে আমার থেকে মুহূর্তের জন্যও আলাদা হয়ে যাবে। এছাড়া আমি ভয় করি, তোমরা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে থাকবে আর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। আর সে অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে বাঘ থেকে নিজকে রক্ষা করতে পারবে না এবং অসতর্কতার কারণে তোমরাও তাকে বাঁচাতে পারবে না।

তখন ভাইয়েরা বলল, "আমরা একটি মযবুত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।" অর্থাৎ আমাদের উপস্থিতিতে তাঁকে নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করবে এটা কিভাবে হতে পারে? আমরা তো শক্তিশালী একটি দল। আমাদের এ শক্তি যদি কোনো কাজেই না লাগে, অর্থাৎ তাকে যদি বাঁচাতে না-ই পারি, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং দুর্বল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে তাদের সাথে দেননি। বরং তাদের পেছনে পাঠিয়েছিলেন। ইউসুফ (আ) পথ হারিয়ে গিয়েছিলেন। এক পথিক তাঁকে তাঁর ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। তাদের এ কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। কারণ, ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে ভাইদের সাথেই প্রেরণ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। সুতরাং তাঁকে একা পাঠাবেন, এটা হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۞ قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۞ وَجَآءُوْ عَلٰى

১. উর্দু বাগধারায় শিশু যখন জঙ্গলে চলে-ফিরে কিছু ফল খেতে থাকে, তখন আদর করে তার প্রতি 'ঘুরে বেড়ানো' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।

فَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝

অর্থ : এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেল, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে একটি গভীর কুয়ায় ফেলে দেবে। তখন আমি ইউসুফের কাছে ওহী পাঠালাম যে, এক সময় আসবে, যখন তুমি তাদের এ কাজের ব্যাপারে তাদেরকে অনুযোগ দেবে। এরা তাদের এ কাজের পরিণাম সম্পর্কে বেখবর। রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল। তারা বলল, আব্বা! আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম আর ইউসুফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। এর মধ্যে নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে গেল। আমরা সত্যবাদী হলেও আপনি আমাদের কথা হয়তো বিশ্বাস করবেন না। তারা ইউসুফের জামায় মিছামিছি রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এল। এ কথা শুনে তাদের পিতা বললেন, তোমাদের নাফস তোমাদের জন্য একটা বড় কাজকে সহজ করে দিলো। ঠিক আছে, আমি সুন্দরভাবেই সবর করব। তোমরা যে কথা বানিয়ে বলছ, সে বিষয়ে শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যায়। –সূরা ইউসুফ : ১৫–১৮

ভাইদের খুব পীড়াপীড়ির কারণে পিতা ইয়াকূব (আ) ইউসুফ (আ)-কে তাদের সাথে দিয়ে দেন। পিতার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে তারা ইউসুফ (আ)-কে গালাগালি করতে থাকে এবং তাঁর সাথে অশ্লীল ও অসম্মানজনক ব্যবহার শুরু করে। তারা তাঁকে কূপের মধ্যে ফেলে দিতে একমত হয়ে গেল এবং কূপের মুখে যে পাথর থাকে, কূপের পানি কমে গেলে যার উপর দাঁড়িয়ে পানি উঠান হয়, সেই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইউসুফ (আ)-কে কূপের তলদেশে ফেলে দেয়া। এ সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, "আল্লাহ আপনাকে এ কঠিন মসীবত থেকে রক্ষা করবেন এবং এমন একটি সময় আসবে, যখন আপনি আপনার ভাইদেরকে তাদের এ অপকর্মের কথা জানিয়ে দেবেন। অথচ তারা কিছুই অনুধাবন করতে পারবে না। তারা সব আপনার মুখাপেক্ষী হবে এবং আপনার সামনে তারা থাকবে ভীত সন্ত্রস্ত।

হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহ) বলেছেন, "তারা অনুধাবন করতে পারবে না"। এর অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই সবকিছু ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে অবগত করেছে তা ভাইয়েরা জানতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এর অর্থ হলো এই যে, আপনি আপনার ভাইদেরকে এই অন্যায় আচরণের কথা এমন এক সময় বলবেন যখন তারা আপনাকে চিনতে পারবে না। ইবনে জারীর (রহ) এটা বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আ)-কে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে ভাইয়েরা তাঁর জামায় রক্ত মাখিয়ে রাতে ইশার সময় চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে ফিরে এল। এ কারণে কোনো বুযুর্গ বলেছেন, কোন লোকের ক্রন্দন যেন তোমা ধোঁকায় না ফেলে। কারণ, অনেক অত্যাচারী অত্যাচার করার পরেও ক্রন্দন করে থাকে। যেমন, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা অত্যাচার করার পরেও কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে চলে গেছে। রাতে আসার কারণ হলো, রাতের আঁধারে তাদের এ প্রতারণা ও ধোঁকা করা অনেকটা সহজ হবে। এসে বলল, আব্বাজান! ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের কাছে রেখে আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছিলাম, আমাদের অনুপস্থিতিতে ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলছে। আমাদের এই সত্য কথা আপনি কখনই বিশ্বাস করবেন না যে, সত্যিই বাঘ ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে।

যদিও আপনি এরপূর্বে আমাদের থেকে ইউসুফের ব্যাপারে এরূপ কোনো ব্যবহার পান নি, যাতে তাঁর ক্ষতি হয়েছে। তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ) পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, "ইউসুফকে আবার বাঘে না খেয়ে ফেলে"। কিন্তু তারা অঙ্গীকার করেছিলেন যে, এরূপ কখনই হবে না। সুতরাং তারা (ভাইয়েরা) পিতাকে বলল, (আমরা জানি) আপনি আমাদের কথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। আপনি আমাদেরকে দোষীই সাব্যস্ত করবেন। অথচ আমরা আমাদেরকে এ প্রসঙ্গে অপারগ মনে করছি।

তারা একটি বকরী যবেহ করে, বকরীর রক্ত ইউসুফ (আ)-এর জামায় মেখে সেই রক্ত মাখা জামা নিয়ে পিতার নিকটে রওয়ানা হলো। যাতে পিতা বুঝতে পারেন যে, ইউসুফকে সত্যিই বাঘে খেয়েছে। কিন্তু তারা জামাটি ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। কারণ, জামাটি ছেঁড়া থাকলে বুঝা যেত যে অবশ্যই বাঘ তাঁকে আক্রমণ করেছিল। বস্তুত মিথ্যার বিপদই হলো ভুলে যাওয়া। পিতার কাছে যখন তাদের কার্যক্রমগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তারা পিতাকে আর ধোঁকা দিতে পারেনি। কারণ, পিতা ইয়াকূব (আ) ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, ইউসুফকে অধিক ভালবাসার কারণে তার অন্যান্য ছেলেরা ইউসুফ (আ)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। আর ইউসুফ (আ)-কে অধিক ভালবাসার কারণ ছিল এই যে, পিতা তাঁর নিদর্শন ও আচার-আচরণ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুওয়াতের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং এ নবুওয়াতের পরম্পরা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই জারি রাখবেন। প্রকৃত নিদর্শন দ্বারা ইয়াকূব (আ) এর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাদের হিংসা ও শত্রুতার আক্রোশ মিটিয়েছে। সুতরাং পিতা বললেন, "বরং তোমরা নিজেরাই একটা বিষয় সাজিয়ে নিয়েছ। সুতরাং আমি পূর্ণ ধৈর্য ধারণ ধরছি। তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, বড় ভাই রুবীল ইউসুফ (আ)-কে ইঙ্গিতে বলেছিল যে, সে পরে এসে তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে এবং পিতার কাছে পৌছিয়ে দেবে। অতঃপর যখন সবাই চলে গেল, তখন রুবীলের অনুপস্থিতিতে ও অজান্তে অন্যান্য ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-কে এক কাফেলার কাছে বিক্রি করে দেয়। সন্ধ্যাবেলা রুবীল কূপের কাছে এসে ইউসুফ (আ)-কে দেখতে না পেয়ে চীৎকার মেরে ওঠেন। অন্যান্য ভাইয়েরা একটি বকরী যবেহ করে তার রক্ত ইউসুফ (আ)-এর জামায় মেখে উক্ত রক্তমাখা জামা ইয়াকূব (আ)-এর কাছে পেশ করে। ইয়াকূব (আ) এ সংবাদ শুনে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পুত্রশোকে অত্যন্ত বিষণ্ন ও চিন্তিত ছিলেন।

আহলে কিতাবগণ এ ঘটনা বর্ণনায় অনেক ভুল তথ্য বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۖ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ۖ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ۖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۞ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرٰهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهٖ أَكْرِمِيْ مَثْوٰهُ عَسٰى أَنْ يَّنْفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ ۖ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ۖ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۞

অর্থ : ওদিকে এক কাফেলা আসলো। কাফেলা তাদের পানিবাহককে পানি আনার জন্য পাঠাল। সে যেইমাত্র কূয়ায় বালতি ফেলল (ইউসুফকে দেখে) চিৎকার দিয়ে উঠল, কী সুখবর! এখানে তো একটি বালক রয়েছে। তারা তাকে ব্যবসায়ের মাল মনে করে লুকিয়ে ফেলল। অথচ তারা যা করছিল তা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। শেষ পর্যন্ত তারা তাকে অল্প দামে মাত্র কয়েক দিরহামে বিক্রি করে দিলো। তারা তার দামের ব্যাপারে বেশি কিছু আশা করে নি। মিসরের যে লোক তাকে খরিদ করেছিল, সে তার বিবিকে বলল, ওকে ভালোভাবে রাখ। হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে ছেলে বানিয়ে নেব। এভাবেই আমি ইউসুফের জন্যে ঐ দেশে থাকার উপায় বের করে দিলাম এবং সব বিষয়ে সঠিক মর্ম শেখার ব্যবস্থা করলাম। আল্লাহ নিজের কাজ সমাধা করেই থাকেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ তা জানে না। যখন (ইউসুফ) পূর্ণ যুবক হয়ে গেল, তখন আমি তাকে সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্যতা ও ইলম দান করলাম। এভাবেই আমি নেক লোকদের বদলা দিয়ে থাকি।

–সূরা ইউসুফ ১৯–২২

ইউসুফ (আ)-কে যখন তাঁর ভাইয়েরা অন্যায়ভাবে কূপের মধ্যে ফেলে চলে গেল, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহর রহমতে তখন একটি যাত্রীদল সেখানে এসে হাজির হলো।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, এটি ছিল একটি ব্যবসায়ী দল। যারা সিরিয়া থেকে পোস্তা, খুরমা এবং বিভিন্ন ফলফলাদি নিয়ে মিশর যাচ্ছিলেন। তারা সেখানে এসে পানি আনার জন্যে তাদের একজনকে কুয়ার কাছে প্রেরণ করে। সে (পানি সংগ্রাহক) কুয়ার মধ্যে বালতি ফেললে হযরত ইউসুফ (আ) তা ধরে ফেলেন। পানির পরিবর্তে একটি সুদর্শন বালক তুলে আনলো। সে বালকটি, দেখেই বলে উঠল, কি আনন্দের ব্যাপার! এতো এক গোলাম। এটি তো সুদর্শন একটি বালক। তারা তাকে মূল্যবান দ্রব্যের মতো লুকিয়ে রাখল। পানি সংগ্রহের জন্য কয়েকজন লোকই সেখানে এসেছিল। তারা ফিরে গিয়ে কাফেলার সাথীদের কাছে বলল যে, এ সুদর্শন বালকটিকে আমরা কুয়ার কাছের লোকদের থেকে ক্রয় করে নিয়ে এসেছি। এ কথা বলার কারণ, যাতে তারা এর শরীকী দাবি না করতে পারে। তারা যা কিছু করেছিল, আল্লাহ তা ভালরূপেই জানেন। অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাঁর ভাইদের দুশমনী ও আচরণ, তাঁকে কুয়ার মধ্যে ফেলে দেয়া এবং তাঁকে পণ্যের মাল হিসেবে গোপন করে রাখা এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলা হিকমতের পর্দায় গোপন করে রেখেছিলেন। এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার রহস্য লুকায়িত ছিল এবং পর্যায়ক্রমে এগুলো তিনি প্রকাশ করেছেন। এ সুদর্শন বালকটি ছিল মিশরবাসীর জন্য আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ। যে বালকটি ভাইদের দ্বারা কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তারপর এক কাফেলার হাতে গোলাম স্বরূপ বিক্রিও হয়েছিল, সে বালকটিই পরবর্তীতে লাভ করেন মিশর রাজ্যের একচ্ছত্র নেতৃত্ব ও বাদশাহী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যই মিশরবাসীকে দুনিয়া ও আখেরাতের অগণিত কল্যাণ দান করেন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন জানতে পারল যে, এক কাফেলা এসে ইউসুফ (আ)-কে কুয়া থেকে তুলে নিয়েছে তখন তারা কাফেলার লোকদের কাছে গেল এবং বলল, এ বালকটি আমাদের গোলাম। এটি আমাদের থেকে পালিয়ে এসেছে। কাফেলার লোকেরা মনে করেছিল, এরা এ সুদর্শন বালকটিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-কে স্বল্পমূল্যে কাফেলার লোকদের কাছে বিক্রি করল। তারা জানত না যাকে আজ তারা সল্প মূল্যে বিক্রয় করছে, তিনিই হলেন ভবিষ্যতের বাদশাহ ও পয়গম্বর। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ج وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ۞

অর্থ : শেষ পর্যন্ত তারা তাকে অল্প দামে মাত্র কয়েক দিরহামে বিক্রি করে দিলো। তারা তার দামের ব্যাপারে বেশি কিছু আশা করেনি। –সূরা ইউসুফ : ২০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), নওফল বাকালী, সুদ্দী, কাতাদাহ ও আতিয়্যাতুল আওফী (রহ) বলেছেন, ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-কে বিশ দিরহামে বিক্রি করেছিল। তারা (ভাইয়েরা) প্রত্যেকে দু' দিরহাম করে ভাগে পেয়েছিল। মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, ইউসুফ (আ)-কে তাঁর ভাইয়েরা বাইশ দিরহামে বিক্রি করেছিল। ইকরামা ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, চল্লিশ দিরহামে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি করা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"মিশরের যে লোকটি ইউসুফকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলেছিল, একে ভালভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। (অর্থাৎ এর সাথে সুন্দর আচরণ কর।) সম্ভবত এ আমাদের কল্যাণে আসবে কিংবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে রাখব।" এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ যে, তাঁর জন্যে এরূপ প্রতিপালকের ব্যবস্থা করেছেন। আর এর মাধ্যমেই তিনি লাভ করেছেন ইহকাল ও পরকালের সফলতা ও কল্যাণ। কথিত আছে যে, মিশর থেকে হযরত ইউসুফ (আ)-কে যিনি ক্রয় করে নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আযীযে মিশর। অর্থাৎ মিশরের মন্ত্রী। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের কোষাগার ও ধনভাণ্ডারের কর্তা ও রক্ষক। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, তাঁর নাম ছিল তাওফীর ইবনে রূহায়ব। তখনকার সময় মিশরের মন্ত্রী আযীযের স্ত্রীর

নাম ছিল রাঈল বিনতে রামআঈল। অন্য এক বর্ণনা মতে তাঁর নাম ছিল ফাকা বিনতে ইয়ানূস। হিশাম রিফায়ী থেকে এটি সালাবী বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ)-কে যিনি মিশরে এনে বিক্রি করেছেন তার নাম ছিল মালিক ইবনে যা'আর ইবনে নুওয়ায়ব ইবনে আফাকা ইবনে মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, সবচেয়ে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তিন ব্যক্তি।

১. মিশরের আযীয, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন যে, ইউসুফ (আ)-কে যত্নের সাথে লালন-পালন কর। হয়তো এ বালক আমাদের অনেক উপকারে আসবে অথবা একে আমরা আমাদের পুত্র বানিয়ে নেব।

২. সেই বালিকা, যে তাঁর পিতা নবী হযরত শোয়াইব (আ)-কে বলেছিলেন, হে আব্বাজান! এ (মূসা আ)-কে কাজে রেখে দিন। কারণ আপনার কাজের লোক হিসেবে এ ব্যক্তিই সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হবে।

৩. তৃতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। যখন তিনি তার পরবর্তী খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত ওমর ফারূক (রা)-কে মনোনীত করেন।

এক বর্ণনা অনুসারে মিসরের আযীয হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে ইউসুফ (আ)-কে সম ওজনের মিশক, রেশম ও রৌপ্যের বিনিময়ে আলাদা আলাদা ওজন করে ক্রয় করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আমি এভাবে ইউসুফকে (মিশর) দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম।"

অর্থাৎ আযীয ও তাঁর স্ত্রী যাতে ইউসুফকে সযত্নে লালন-পালন করে তার ব্যবস্থা করে দিলাম। এভাবে ইউসুফের জন্যে মিশর শহরকে নিরাপদ ও মঙ্গলজনক করে দিয়ে তাকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তারপর আল্লাহ বলেছেন, "তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলাম"। অর্থাৎ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য শিক্ষা দিলাম। "আল্লাহ, তাঁর কার্য সম্পাদন অপ্রতিরোধ।" অর্থাৎ আল্লাহ যাকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা এমনভাবে ব্যবস্থা করেন, যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।" পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "সে (ইউসুফ) যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান প্রদান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বেকার সব ঘটনা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর চল্লিশ বছর বয়সকালেই নবীগণকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়। কত বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্ত (সাবালকত্ব) হয়, এ বিষয় নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক, রাবীয়া, যায়েদ ইবনে আসলাম ও শা'বী (রহ) বলেন, মানুষের ইহতেলাম হলেই সে পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রহ) বলেছেন, আঠার বছর বয়সে পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। যিহাক (রহ)-এর মতে বিশ বছর বয়সে, ইকরামা (রহ)-এর মতে পঁচিশ বছর বয়সে এবং সুদ্দী (রহ)-এর মতে ত্রিশ বছর বয়সে পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহ) বলেন, তেত্রিশ বছর বয়সে এবং হাসান (রহ)-এর মতে চল্লিশ বছর বয়সে পূর্ণ বয়স্ক (সাবালক) হয়।

হাসান (রহ)-এর মতের স্বপক্ষেই কুরআন মাজীদের এ আয়াতটি পরিলক্ষিত হয়। "যখন সে (মানুষ) যৌবনপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়।" সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ) এ বয়সেই নবুওয়াত লাভ করেছিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যুলায়খার প্রেম

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْٓ اَحْسَنَ مَثْوَايَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۞ وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ۞ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ۞

অর্থ : যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে তার দিকে আকৃষ্ট করতে লাগল। একদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে বলল, 'এদিকে এস'। ইউসুফ বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আমার রব[১] তো আমাকে খুবই সুন্দরভাবে রেখেছেন (আমি কি এ কাজ করতে পারি?)। নিশ্চয়ই যালিমরা কখনো সফল হতে পারে না। সে তার দিকে এগিয়ে এল, ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতেন, যদি তিনি তার রবের দলীল-প্রমাণ দেখতে না পেতেন।[২] এমনটাই হলো, যাতে আমি তার নিকট থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। আসলে তিনি আমার বাছাই করা বান্দাহদের একজন ছিলেন। অবশেষে ইউসুফ ও সে আগে-পরে দরজার দিকে দৌড়াল। সে ইউসুফের জামা পেছন থেকে (টেনে) ছিঁড়ে ফেলল এবং তারা দুজনেই তার স্বামীকে দরজার সামনে দেখতে পেল। ঐ মহিলা বলে উঠল, যে লোক তোমার স্ত্রীর প্রতি খারাপ নিয়ত রাখে, তাকে জেলে দেওয়া বা অন্য কোনো কঠোর সাজা ছাড়া আর কী শাস্তি দেওয়া যায়? ইউসুফ বললেন, সে-ই আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করেছিল। ঐ মহিলার পরিবারেরই এক লোক সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তাহলে তো মহিলাই সত্যবাদী এবং সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে মহিলা

১. *সাধারণত মুফাস্সির ও অনুবাদকগণ এখানে এই অর্থ করেছেন যে, 'আমার রব' বলতে হযরত ইউসুফ যার অধীনে সে সময় চাকরি করতেন, সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে এবং তাঁর এ উত্তরের অর্থ ছিল আমার মনিব তো আমাকে এত সুন্দরভাবে রেখেছেন, আমি কেমন করে এ নেমকহারামি করতে পারি যে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যিনা করব। কিন্তু এ কথা একজন নবীর শানের খেলাফ যে, তিনি কোনো পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে কোনো বান্দাহর খেয়াল করবেন এবং কুরআন মাজীদের এর কোনো নযীর নেই যে, কোনো নবী কখনো আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজের 'রব' বলেছেন।*

২. *'বুরহান' শব্দের অর্থ দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ। 'রবের বুরহান' অর্থ- আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক বুঝিয়ে দেওয়া সেই যুক্তি, যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের বিবেক তাঁর নাফসকে এ কথা বোঝাতে পেরেছিল যে, এই মহিলার কুপ্রস্তাব কবুল করা তোমার পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। এ দলীলটি পূর্ববর্তী এই বাক্যের মধ্যে রয়েছে যে, "আমার রব তো আমাকে এত ভালো অবস্থায় রেখেছেন (আমি কোন করে এমন কুকর্ম করব)। এরূপ যালিমদের ভাগ্যে কখনো সফলতা আসে না।"*

মিথ্যাবাদী এবং সে সত্যবাদী।[১] যখন মহিলার স্বামী দেখল, ইউসুফের জামা পেছনের দিক দিয়ে ছেঁড়া তখন সে বলল, এটা তোমাদের মহিলাদেরই চালাকি। নিশ্চয়ই তোমাদের চালাকি বড়ই সাংঘাতিক। ইউসুফ! এ বিষয়টা ছেড়ে দাও। আর (হে মহিলা) তুমি তোমার অপরাধের জন্য মাফ চাও। আসলে তুমিই দোষী। -সূরা ইউসুফ : ২৩-২৯

আযীযের স্ত্রী যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্যে কিভাবে পরোচিত করেছিল, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। যুলায়খা ছিল অত্যন্ত রূপসী, সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া মহিলা। যৌবনের রসে তার শরীর ছিল পরিপূর্ণ। এছাড়াও মন্ত্রীর স্ত্রী হওয়াতে তাঁর সামাজিক অনেক উঁচু মর্যাদায় ছিল।

এরপরও সে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করে ও সুসজ্জিত হয়ে নিজ গৃহের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-কে আহ্বান জানাল। যে পরিবেশে যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে অসৎ কাজের জন্য ডেকেছিল, সেই পরিবেশে ও সেই মুহূর্তে কোনো মানুষ পদস্খলন না হয়ে পারে না। এ অবস্থায় অনেকেরই ঈমানের উপর দৃঢ়তা থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, এই মহিলাটি ছিলেন মিশরের বাদশাহ রাইয়্যান ইবনুল ওয়ালীদের ভাগ্নী। অপরদিকে ইউসুফ (আ)-ও ছিলেন অতিশয় সুদর্শন সুন্দর এক যুবক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেহারায় এত সৌন্দর্য ও লাবণ্য দান করেছিলেন যার বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

এছাড়া যুলায়খার বাস ভবনটিও ছিল অত্যন্ত নিরিবিলি ও নির্জন। যেখানেই এই দুজন ছাড়া অন্য আর কোনো মানুষ ছিল না। যুলায়খা তার কাম-বাসনা পূর্ণ করার জন্য ইউসুফ (আ)-এর সামনে নিজকে সম্পূর্ণরূপে হাজির করে দিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। মোটকথা যুলায়খার সবকিছুই ছিল সহায়ক। এরপরও ইউসুফ (আ) যুলায়খার এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং যুলায়খার মন্দ কর্ম হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য পেরেশান হয়ে দরজার দিকে দৌড়ে যান। আল্লাহ তাঁকে যুলায়খার ছলনা ও অশ্লীল কাজ থেকে রক্ষা করেন। কেননা ইউসুফ (আ) ছিলেন, নবীগণেরই একজন। তাঁর মধ্যে নবুওয়াতের মোতিটি ছিল লুক্কায়িত। এভাবে ইউসুফ (আ) সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাত শ্রেণীর লোকদের অন্যতম একজন হয়ে যান। যাদের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে সে দিন তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনই ছায়া থাকবে না। সে সাত শ্রেণীর লোক হলো—

১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ।

২. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহর স্মরণে (তাঁর ভয়ে বা তাঁর মহব্বতে) অশ্রু ঝরায়।

৩. সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মসজিদের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকে। যদিও মসজিদ থেকে বের হয়, পুনরায় মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত মসজিদের দিকেই তার অন্তর আকৃষ্ট থাকে।

৪. সেই দানশীল ব্যক্তি, যার দান-খয়রাত এমনভাবে গোপন থাকে যে, ডান হাত দ্বারা তিনি কি দান করেছে, তার বাম হাত পর্যন্ত সে খবর রাখে না।

৫. সেই যুবক, যে তার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটায়।

৬. সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী রূপসী মহিলা (অসৎ উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে। কিন্তু সে এ কথা বলে ফিরিয়ে দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি।

১. অর্থাৎ, ইউসুফ (আ)-এর জামা যদি সামনের দিকে ছেঁড়া হয় তাহলে এ কথাই বোঝা যাবে যে, ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ ছিল এবং মহিলাটি নিজেকে বাঁচানোর জন্য লড়াই করেছিল। কিন্তু ইউসুফের জামা যদি পেছনের দিকে ছেঁড়া হয়, তবে তার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐ মহিলা তার পেছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে পালাতে চেয়েছিল। এছাড়া আরেকটি বিষয়ও এই সাক্ষ্যের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ঐ সাক্ষ্য শুধু হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এর দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, মহিলাটির শরীর বা তার পোশাকে উপর হামলা করার কোনো চিহ্ন আদৌ পাওয়া যায় নি, কিন্তু যদি যিনার উদ্দেশ্যে চেষ্টার ব্যাপার হতো তাহলে মহিলাটির উপর তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যেত।

৭. সেই দুব্যক্তি যারা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই পরস্পরে ভালবাসে এবং তাঁরই (সন্তুষ্টির) জন্যই পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়।

যুলায়খা মন্ত্রীর স্ত্রী ও অতিশয় সুন্দরী মহিলা হয়েও হযরত ইউসুফ (আ)-এর উপর আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে অসৎ উদ্দেশ্যে ডেকেছিল। হযরত ইউসুফ (আ) তার ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন যে, "আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি।" আমি এ কাজে কিভাবে রাজি হতে পারি, যেখানে তোমার মালিক আমার মনিব তিনি আমার সাথে সুন্দর আচরণ করেছেন, আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন এবং আমাকে থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন? আমি তাঁর গৃহে বসে তাঁর সম্মানকে লাঘব করব? তা কখনই হতে পারে না। আল্লাহ এমন লোকদেরকে কখনই কামিয়াব করেন না"।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সেই রমণী তো তার প্রতিকার আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত।" এর ব্যাখ্যা আমি তাফসীরে বর্ণনা করেছি। এখানের অধিকাংশ বর্ণনা আহলে কিতাবদের থেকে সংগৃহীত। সুতরাং সেগুলো বর্ণনা করার চেয়ে ত্যাগ করাই উত্তম। এখানে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা একান্ত প্রয়োজন সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে এ অশ্লীল কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাযত করেছেন ও পবিত্র রেখেছেন এবং মহিলার প্রতারণা ও ছলনা থেকে রক্ষা করেছেন এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র চাদরকে দাগমুক্ত রেখে উজ্জ্বল রেখেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ط اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

অর্থ : এমনটাই হলো, যাতে আমি তার নিকট থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। আসলে তিনি আমার বাছাই করা বান্দাহদের একজন ছিলেন। -সূরা ইউসুফ : ২৪

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "তারা উভয়ে দৌড়িয়ে দরজার দিকে গেল।" অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) মহিলার থেকে বাঁচার জন্যে এবং দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে দৌড় দিয়েছিলেন। যুলায়খাও অসৎ উদ্দেশ্যে তাঁর পিছনে পিছনে দৌড় দিল। দরজা খুলে গেলে দরজার সামনে যুলায়খার স্বামী আযীযকে দেখতে পেল। তখন মহিলাটি সামনে এগিয়ে গিয়ে স্বামীকে বলতে লাগল, "যে ব্যক্তি তোমার পরিবারের সাথে কুকর্মের কামনা করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ বা কোনো কঠিন শাস্তি ছাড়া আর কি হতে পারে?"

ছলনাময়ী যুলায়খা স্বামীর কাছে নিজকে নিরাপরাধী সাব্যস্ত করে পূতঃপবিত্র ইউসুফ (আ)-কে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করল আর নিজকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র বলল। তার উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ) নবুওয়াত ও রিসালাতের চাদরকে স্বচ্ছ ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে সাথে সাথে বলে উঠলেন যে, "এ মহিলাই আমাকে ফুসলাতে চেষ্টা করেছে"। অবস্থার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনের তাগিদে হযরত ইউসুফ (আ) সত্য কথা প্রাকাশ করা অতি জরুরি মনে করলেন। ইউসুফ (আ) বললেন, "সেই আমা হতে মন্দকর্ম কামনা করেছিল"। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "স্ত্রী লোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী দিলো।" যে সাক্ষ্য দিয়েছিল, কারও মতে সে ছিল দোলনার একটি শিশু। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ মতটিকে সমর্থন করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা), হিলাল ইবনে ইয়াসাফ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে যোবায়ের, যিহাক (রহ) এবং ইবনে জারীর (রহ)-ও এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একখানা মারফু হাদীসও বর্ণিত আছে। তবে মুহাদ্দিসগণের কতকে এ হাদীসটিকে মাওকূফ হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনা মতে, এ সাক্ষ্যদাতা ছিল যুলায়খার স্বামী আযীযের অতি নিকটাত্মীয় একজন পুরুষ। আর এক বর্ণনা মতে, সে ছিল যুলায়খার নিকটতম এক আত্মীয়। যারা সাক্ষ্যদাতা একজন পুরুষের কথা বলেছেন, তাঁরা হলেন ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও যায়েদ ইবনে আসলাম (রহ)।

সাক্ষ্যদাতা যে-ই হোক সে এ ফায়সালা দিলো যে, "যদি ইউসুফের জামার সম্মুখ দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে যুলায়খা সত্যবাদী এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী। কারণ, এভাবে হলে ইউসুফ যুলায়খাকে ফুসলিয়েছে এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এ অবস্থায় যুলায়খা নিজে তাঁর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁর জামার সামনের দিক ছিঁড়ে ফেলেছে। আর যদি ইউসুফ যুলায়খা থেকে নিজকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দৌড়ে থাকেন, তবে তাঁর জামার পিছন দিক ছেঁড়া থাকবে। কারণ, যুলায়খা তাঁকে ধরার জন্যে জামার পিছন টেনে ধরার কারণে জামাটি ছিঁড়ে গেছে। আর হয়েছেও এরূপ।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "গৃহস্বামী (আযীয) যখন দেখল যে, তার জামার পিছন দিক ছেঁড়া রয়েছে, তখন সে বলল, এ হলো তোমাদের মহিলাদের ছলনা। নিশ্চয়ই তোমাদের ছলনা অতি কঠিন।"

অর্থাৎ হে যুলায়খা! তুমি তো প্রথমে ইউসুফকে অসৎ বলতে চেয়েছ এবং তুমি নিজেই তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ। এটা তোমাদের নারীদের ষড়যন্ত্র ও ভীষণ ছলনা। তারপর স্বামী স্ত্রীর কথাকে অবিশ্বাস করে ইউসুফ (আ)-কে বলল, "ইউসুফ! এ কাজটিকে তুমি উপেক্ষা কর।"

অর্থাৎ এ কর্মটি তুমি কারও কাছে প্রকাশ কর না। কারণ, এরূপ জঘন্য কথা গোপন রাখাই উচিত। তারপর সে তার স্ত্রী (যুলায়খা)-কে নির্দেশ দিলো যে, "তুমি তোমার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ, নিশ্চিতভাবে তুমিই অপরাধী।" কারণ, বান্দা যখন আল্লাহ তা'আলার কাছে তার অপরাধের জন্য একনিষ্ঠভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মিশরবাসীরা তখন যদিও মূর্তিপূজক ছিল কিন্তু তারা বিশ্বাস করতো যে, পাপ ক্ষমাকারী একমাত্র আল্লাহ এবং পাপের জন্যে শাস্তি দানকারী একমাত্র আল্লাহ। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাথে কোনো শরীক নেই। এ কারণে স্বামী আযীয তার স্ত্রীকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ দেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে কোনো শাস্তি দিলো না কেন? এর জবাব এই যে, স্বামী আযীয এ কথা বুঝতে পারছিল যে, তার স্ত্রী যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ও লাবণ্য দেখে নিজকে সামলিয়ে রাখতে পারেনি। সে (স্ত্রী) তাঁর দিকে স্বাভাবিকভাবেই আসক্ত হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে তিনি (স্বামী) এটাও বুঝেছেন যে, ইউসুফ (আ) ছিলেন অতিশয় পবিত্র, সৎ ও নেক চরিত্রের অধিকারী। এ কারণে স্বামী (আযীয) যুলায়খাকে এ ব্যাপারে অপারগ মনে করে তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ দিয়ে বলেন, "(হে যুলায়খা!) তুমি তোমার অন্যায়ের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, অবশ্যই তুমি অপরাধী।"

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَّفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا ۚ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

অর্থ : শহরের মহিলারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আযীযের১ বিবি নিজের জোয়ান দাসের প্রেমে পড়েছে। ভালোবাসা তাকে পাগল বানিয়ে দিয়েছে। আমরা তাকে স্পষ্ট ভুলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। সে যখন তাদের ধোঁকাবাজির কথা শুনতে পেল, তখন সে তাদেরকে তার কাছে ডেকে আনল এবং তাদের জন্য হেলান দেওয়া আসনের ব্যবস্থা করল। খাওয়ার মজলিসে প্রত্যেকের সামনে একটি করে ছুরি রেখে দিল। (তারপর ঠিক যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল তখন) সে ইউসুফকে তাদের সামনে আসতে বলল। যখন মহিলারা তাকে দেখতে পেল তখন তারা তাকে দেখে চমকিত হয়ে গেল এবং তারা সবাই তাদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এ লোকটি মানুষ নয়, এতো কোনো সম্মানিত ফেরেশতা। আযীযের বিবি বলল, দেখলে তো, এ-ই হলো ঐ লোক, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে দোষারোপ করছিলে। অবশ্যই আমি তাকে আকৃষ্ট করতে চেয়েছি। কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। আমি যা তাকে করতে বলি যদি সে তা না করে তাহলে সে অবশ্যই জেলে যাবে এবং অপদস্থ হবে। ইউসুফ বললেন, হে আমার রব! এরা আমাকে যে কাজ করাতে চায় এর চেয়ে আমি জেলে যাওয়া বেশি পছন্দ করি। যদি তুমি এদের ফন্দি আমার কাছ থেকে সরিয়ে না দাও, তাহলে আমি তাদের ফাঁদে জড়িয়ে যাব এবং আমি জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। তাঁর রব তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং ঐ মহিলাদের ফন্দি তাঁর কাছ থেকে দূর করে দিলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শুনেন এবং সবকিছু জানেন।

–সূরা ইউসুফ : ৩০–৩৪

যুলায়খা সম্পর্কে শহরের মহিলারা যে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছিল, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। যুলায়খার ব্যাপারে যে নারীরা এরূপ মন্তব্য করেছিল, তারা ছিল শহরের অভিযাত শ্রেণীর মহিলা। তারা যুলায়খাকে এ বলে তিরস্কার করেছিল যে, সে (যুলায়খা) একটি দাসের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তার প্রেমে সে উন্মত্ত হয়ে গেছে। সে (যুলায়খা) একজন উচ্চবংশীয় মহিলা। এ ছাড়া মিশরের মন্ত্রীর স্ত্রী। সে একজন দাসের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে তার মর্যাদাবান স্বামীর সম্মানকে ক্ষুণ্ন করতে পারে না। এ কারণে নগরের মহিলারা যুলায়খার ব্যাপারে মন্তব্য করেছিল যে, "তাকে আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।" অর্থাৎ সে নিজের মান-সম্মানকে একটি দাসের জন্য বিলীন করে দিয়েছে। বিষয়টা অত্যন্ত লজ্জাকর ও বিভ্রান্তিকর ব্যাপার।

তারপর "আযীযের স্ত্রী (যুলায়খা) যখন তাদের ধোঁকাবাজির কথা শুনল" অর্থাৎ, নগরের মহিলাদের তিরস্কারের কথা যখন যুলায়খা শুনতে পেল যে, মহিলারা তার এ প্রেম সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য ও তিরস্কার করছে, তখন যুলায়খা তার এই অপারগতা ও দুর্বলতাকে মহিলাদের সামনে উপস্থাপন করার ইচ্ছা করলেন। যুলায়খা জানত যে, এ দাস এরূপ দাস নয় যেরূপ তারা মনে করছে এবং তাদের কাছে যে দাস রয়েছে, সে দাস এরূপ নয় বরং এ দাসের সাথে কারো কোনো তুলনা হয় না। সুতরাং এ দাসকে তাদের সামনে পেশ করার জন্য নগরের মহিলাদেরকে দাওয়াত দিয়ে তার বাস ভবনে সমবেত করল। সে আগত মহিলাদেরকে সম্মানের সাথে আতিথেয়তা করল এবং আহার শেষে এমন ধরনের ফলমূল তাদের সম্মুখে পরিবেশন করল, যেগুলো কেটে খেতে ছুরির প্রয়োজন হয়। যেমন, কমলা লেবু, আপেল ইত্যাদি। সুতরাং কেটে খাওয়ার জন্যে সকলের কাছে ছুরি দেওয়া হলো। যুলায়খা পূর্বেই ইউসুফ (আ)-কে পোশাক পরিধান করিয়ে প্রস্তুত করে রেখেছিল। বাহ্যিক সুন্দর পোশাক ছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর সৌন্দর্যময়, লাবণ্যময় ও উজ্জ্বল চেহারার মধ্যে ছিল এক অপূর্ব আকর্ষণ। এ ছাড়া তখন ছিল তার যৌবনের সূচনা। যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ)-কে মহিলাদের সম্মুখে বের হওয়ার জন্য বললে তিনি বের হয়ে আসেন। এ সময় ইউসুফ (আ) চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও অধিক চমকাচ্ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তারা তাকে দেখল তখন তারা তাঁরকে দেখে চমকিত হয়ে গেল।" অর্থাৎ তারা তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করল এবং তাঁর প্রতি তারাও আকৃষ্ট হলো। তারা ধারণাই করতে পারে নি যে, কোনো মানুষ এরূপ সৌন্দর্যময় চেহারার অধিকারী হতে পারে।

---

১. *'আযীয' সেই ব্যক্তির নাম কিংবা মিসরের বিশেষ কোনো পদের নাম ছিল না। মিসরে কোনো উচ্চ ক্ষমতাসীন লোকের উপাধি হিসেবে এ পরিভাষা ব্যবহার করা হতো।*

তারা ইউসুফ (আ)-এর উজ্জ্বলময় চেহারার দিকে তাকিয়ে হতবাক হলো এবং চেতনা হারিয়ে ফেলল। তাদেরকে ফল কাটার জন্য যে ছুরি দেওয়া হয়েছিল, তারা চেতনা হারিয়ে সেই ছুরি দিয়ে ফল কাটার পর নিজেদের হাত পর্যন্ত কেটে ফেলল। অথচ তারা তা অনুভবই করতে পারে নি।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "তারা তাদের হাত কাটল।" অর্থাৎ তারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর চেহারার দিকে তাকিয়ে চমকিত হয়েতাদের দৃষ্টিশক্তি এরূপ হারিয়ে ফেলল যে, নিজেদের হাত যে নিজেরা কাটতেছে তারও অনুভবও তাদের কাছে ছিল না। তারা (মহিলারা) সবাই এক পলকে ইউসুফ (আ)-এর দিকে তাকিয়ে রইল এবং এক বাক্যে বলে উঠল, "সুবহানাল্লাহ! এতো কোনো মানুষ নয়। বরং এতো সম্মানিত ফেরেশতা।"

মে'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি (মে'রাজের রাতে) ইউসুফ (আ)-এর নিকট দিয়ে গমন করলাম। দেখলাম, সৌন্দর্যের অর্ধেক তাকেই প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা সুহায়লী (রহ)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত আদম (আ)-কে যে সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছিল, তার অর্ধেক সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছিল হযরত ইউসুফ (আ)-কে। কারণ, হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করে তিনি নিজেই তার মধ্যে রূহ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্যতায় তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উর্ধ্বে। এ জন্যে জান্নাতীগণ হযরত আদম (আ)-এর অনুরূপ দেহ মোবারক ও সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এভাবে হযরত ইউসুফ (আ) হযরত আদম (আ)-এর সৌন্দর্যের অর্ধেক। এই দু'জনের মাঝে এদের চেয়ে অধিক সৌন্দর্যবান আর কেউ হবে না। যেমন, হযরত হাওয়া (আ) সকল নারীদের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। তার পরে বেশি সুন্দরী ছিলেন হযরত সারাহ (আ)। সৌন্দর্যের দিক দিয়ে এরা দু'জনেই ছিলেন অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় চমকতো। যখন কোনো মহিলা (রাষ্ট্রীয় কাজে) তাঁর কাছে আগমন করতো, তখন তিনি তাঁর চেহারা আবৃত করে নিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি অধিকাংশ সময়ই অবগুণ্ঠিত বা চেহারা আবৃত অবস্থায় থাকতেন, যেন লোকেরা তাঁর চেহারা না দেখতে পারে। এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ) যখন যুলায়খার আমন্ত্রিত নারীদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হন, তখন তাঁর রূপদর্শনে তারা অচেতন হয়ে তাদের নিজেদের আঙ্গুল পর্যন্ত কেটে ফেলে এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যুলায়খার আসক্ত হওয়াটাকে তার ও দুর্বলতা বলে মনে করে। এতে স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, তারাও ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্যের প্রতি আকৃষ্ট ও পেরেশান হয়ে পড়েছিল। যে মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে ভালবাসার জন্য যুলায়খাকে তিরস্কার করেছিল, এ সুযোগে সেই নারীদেরকে সম্বোধন করে যুলায়খা বলল, "এ হলো সেই ব্যক্তি যার জন্যে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছ।" তারপর যুলায়খা আমন্ত্রিত মহিলাদের সামনে ইউসুফ (আ)-এর সততা, পবিত্রতার প্রশংসা করে বলেন, "আমি তার থেকে মন্দকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজকে পবিত্র রেখেছে। এ যদি আমার কথা না শোনে তবে তাকে বন্দি করা হবে এবং লাঞ্ছিত করা হবে।"

এ সময় আমন্ত্রিত নারীরা যারা যুলায়খাকে এর আগে তার অসৎকর্মের জন্য তিরস্কার করেছিল, তারাই ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খার প্রস্তাবকে মেনে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইউসুফ (আ) যদিও যুলায়খার দাস ছিল কিন্তু প্রকৃত দাস তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। সুতরাং ইউসুফ (আ) এ প্রস্তাবকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। কারণ, নবুওয়াতের এক আলামত তাঁর পবিত্র চেহারায় চমকাচ্ছিল। তিনি নিজের ঈমানের হেফাযতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আরয করলেন—

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۞

অর্থ : হে আমার রব! এরা আমাকে যে কাজ করাতে চায় এর চেয়ে আমি জেলে যাওয়া বেশি পছন্দ করি। যদি তুমি এদের ফন্দি আমার কাছ থেকে সরিয়ে না দাও তাহলে আমি তাদের ফাঁদে জড়িয়ে যাব এবং আমি জাহিলদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। -সূরা ইউসুফ : ৩৩

অর্থাৎ আপনি যদি আমার এ প্রসঙ্গটি আমার উপর ছেড়ে দেন, তাহলে আমি এ প্রসঙ্গে একেবারেই দুর্বল ও অক্ষম। আমি আমার জন্য কল্যাণ ও অকল্যাণ কোনোটিরই ক্ষমতা রাখি না। আমি দুর্বল, আপনি আমার (আত্মাকে) শক্তি বৃদ্ধি করে দিন। আপনি আমাকে রক্ষা করুন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এমন শক্তি সামর্থ্য দান করুন, যাতে আমি এ মহিলাদের ছলনা ও ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন। তার উপর থেকে নারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (এরপরও তারা যুলায়খার অপরাধের) নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হলো যে, তাকে কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে। তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করছি" আর অপরজন বলল, "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে"। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দাও। আমরা তো তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি। ইউসুফ বলল, "তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয়, তা আসার পূর্বে আমি তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদেরকে বলব, তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা হতে বলব।" যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

হে জেলখানার সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাকে বাদ দিয়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নামগুলো তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ। এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন অন্য কারো ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত। এটাই শাশ্বত দ্বীন। কিন্তু মানুষ এটা অবগত নয়।

আল্লাহ বলেছেন, আযীয ও তার স্ত্রীর কাছে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউসুফ (আ) পবিত্র ও সৎ। তিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। এরপরও তারা ইউসুফ (আ)-কে জেলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিল। তারা মনে করল, এতে লোকদের মধ্যে ইউসুফ ও জুলায়খা সম্পর্কে যে কথা ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এবং লোকেরা বুঝবে যে, ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে অসৎকাজের জন্য ডেকেছিল। এ কারণেই তাঁকে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। এটা ছিল মূলত হযরত ইউসুফ (আ)-কে হেফাযতের মাধ্যম। জেলে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে নারীদের ছলনা ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করলেন। (ইউসুফ (আ) নিজেও আল্লাহর কাছে বলেছিলেন যে, আমাকে এ নারীদের ছলনা ও ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করুন, যদিও আমার জেলে যেতে হয়।)

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেছেন, এ ঘটনা থেকে কিছু সংখ্যক বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, "পাপের স্থান থেকে দূরে চলে যাওয়াটাও (এক প্রকার) রক্ষা পাওয়া।"

জেলখানায় ইউসুফ (আ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন– "তার সাথে আরো দু'জন যুবক জেলখানায় প্রবেশ করল।" বর্ণিত আছে, এদের মধ্যে একজন ছিল বাদশাহর সাকী। অর্থাৎ বাদশাহকে পানীয় পরিবেশনকারী। তার নাম ছিল বানু। অপরজন ছিল বাদশাহর রুটি প্রস্তুতকারী। অর্থাৎ বাদশাহর খাদ্যের ব্যবস্থাপক। তুর্কীবাসীরা যাকে "জাশেনকীর" বলে। অন্য এক বর্ণনা মতে তার নাম "মাজলাস"। বাদশাহ এ দু'জনকে কোন ব্যাপারে অপরাধী সাব্যস্ত করে জেলে আবদ্ধ করেন। তারা দু'জন জেলখানায় বসে হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখেন। তারা ইউসুফ (আ)-এর জ্যোতির্ময় চেহারা ও সুন্দর আচার-আচরণ দেখে বুঝতে পারলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানি ব্যক্তি। তারা দু'জনে ইউসুফ (আ)-এর কথা, কাজ ও সততায় তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ দু' কারাবন্দী যুবক এক স্থানে থেকে ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন দেখেন। মুফাসসিরগণ বলেছেন, তারা দু'জনে একই রাতে স্বপ্ন দেখেছিলেন। পানীয় পরিবেশনকারী স্বপ্নে দেখলেন যে, তিন ডাল বিশিষ্ট একটি আঙ্গুর গাছে এক গুচ্ছ পাকা আঙ্গুর ঝুলছে। সে

নিজ হাতে আঙ্গুর ছিড়ে রস গ্লাসে নিংড়িয়ে বাদশাহকে পান করাচ্ছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ বাদশাহর রুটি পরিবেশনকারী দেখল যে, তার মাথার উপর রুটি ভরা তিনটি টুকরী আছে। আর লোভী পাখী কাক উপরের টুকরী থেকে রুটি ঠোকরে খাচ্ছে। তারা উভয়ে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে তাদের স্বপ্নের কথা বলে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল এবং বলল, "আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।" তখন হযরত ইউসুফ (আ) বললেন, আমি এ দু'টি স্বপ্নের তাৎপর্য জানি। তোমাদের নিয়মিত খাদ্য তোমাদের কাছে পৌছার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। ইউসুফ (আ)-এর এ কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে—

১. এ কথা দ্বারা ইউসুফ (আ) এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদেরকে এ স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দিব, তা বাস্তবায়নের পূর্বেই। আর আমি যেরূপ বলব সেভাবেই হবে।

২. দ্বিতীয় অর্থ এই যে, "তোমাদের খানা তোমাদের কাছে পৌছার পূর্বেই আমি বলে দিতে পারি যে, যে খানা তোমাদের কাছে আসবে তা মিষ্টি না টক।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর জেল-জীবনের এ দুই সাথীকে বললেন, আমি স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি এবং ভবিষ্যৎ সংবাদ তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, এসমস্ত কিছুই আল্লাহ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, আমি আল্লাহর একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি এক, তাঁর সাথে কোনই শরীক নেই, এ কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূব (আ)-এর মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করা আমার কাজ নয়। এটা আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ কারণ, তিনি আমাকে সঠিক পথ-প্রদর্শন করেছেন। এবং অনুগ্রহ সকল মানুষের প্রতিও। অর্থাৎ আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন মানুষদেরকে তাঁর হেদায়াতের পথ বাতলিয়ে দেই। মানুষের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টিলগ্ন থেকে স্বভাবগতভাবেই বৃক্ষের দানার মতো বিদ্যমান। "কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"

অতঃপর ইউসুফ (আ) তাদেরকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করার নিন্দা করেন। মূর্তির নিকৃষ্টতা, হীনতা, অক্ষমতা ও অপারগতার কথাও তিনি তাদের কাছে তুলে ধরেন, তিনি দু' যুবককে সম্বোধন করে বলেন—

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۞ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ۭ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ۭ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

অর্থ : হে আমার জেলের সাথীরা! (তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ) আলাদা আলাদা অনেক রব ভালো, না ঐ এক আল্লাহ, যিনি সবার উপর বিজয়ী? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছ তারা কতক নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখে গিয়েছে। আল্লাহ তাদের পক্ষে কোনো সনদ নাযিল করেন নি। শাসন ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য নয়। তিনি হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই সঠিক, মযবুত দীন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই তা জানে না। -সূরা ইউসুফ : ৩৯-৪০

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির একমাত্র পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছা মোতাবেক সৃষ্টিকে পরিচালনা করেন, তিনি যাকে চান সৎপথ প্রদর্শন করেন। আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। তিনিই এক আল্লাহ। তাঁর সাথে কোনই শরীক নেই। "তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কারো ইবাদত কর না।" অর্থাৎ তিনি এক, তাঁর কোনই শরীক নেই। আর এটাই হচ্ছে তাওহীদ (একত্ববাদ), সরল পথ ও সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।" অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ, সরল ও সঠিক দ্বীন তাদের কাছে সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট হওয়ার পরেও তারা এ পথে আসতে পারে না। এভাবে ইউসুফ (আ) এ দুই যুবককে জেলখানায় বসে পূর্ণ

সফলতার সাথে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। কারণ, তারা (দুই যুবক) ইউসুফ (আ)-এর মহত্ব ও মহানুভবতায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর কথাগুলো আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। এ কারণে ইউসুফ (আ)-ও চাইলেন যে, তারা যা জানতে চেয়েছে, তার চেয়েও তাদের জন্য যা বেশি কল্যাণকর হবে, সেগুলো তাদের কাছে পেশ করতে। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর (দাওয়াত দেয়ার) দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পর, তিনি তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি বলেছেন, "হে আমার জেলখানার সঙ্গীরা! তোমাদের স্বপ্নের তাৎপর্য হলো, তোমাদের দু'জনার মধ্যে একজন (সাকী) আপন মনিবকে মদ্য পান করাবে। আর দ্বিতীয় জনকে শুলে চড়ান হবে এবং পাখীরা তার মাথা থেকে ভক্ষণ করবে। (সে হলো রুটি প্রস্তুতকারী।) যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" অর্থাৎ স্বপ্নের যে তাৎপর্য আমি তোমাদেরকে বলেছি, অনুরূপই হবে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, "স্বপ্নের ব্যাখ্যা যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ তা মানুষের উপর ঝুলন্ত থাকে। যখন তার ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা (সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী) বাস্তবায়িত হয়।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেছেন, দুই যুবক স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে ইউসুফ (আ)-কে বলেছিল যে, "আমরা স্বপ্নই দেখি নি।" তখন হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন "যে বিষয়ে তোমরা প্রশ্ন করেছ সে বিষয়ের ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।" (অর্থাৎ, আমি যা বলেছি, তা বাস্তবায়িত হবেই।) আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ز فَأَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ .

অর্থ : তারপর তাদের (দুজনের) মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল তাকে ইউসুফ বললেন, তোমার রবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিলো যে, সে বাদশাহের কাছে তাঁর কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেল। আর ইউসুফ আরো কয়েক বছর জেলে পড়ে রইলেন। -সূরা ইউসুফ : ৪২

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, ইউসুফ (আ) তাঁর এ কথা সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যার ব্যাপারে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, সে মুক্তি লাভ করবে। আর সে ব্যক্তি ছিল শুরা পরিবেশনকারী। ইউসুফ (আ) তাকে বলেছিলেন, "তোমার মনিবের কাছে আমার কথা বলবে"। অর্থাৎ তুমি তোমার মনিবকে জিজ্ঞেস করবে, তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে কেন জেলের মধ্যে রেখেছেন। ইউসুফ (আ)-এর এ কথা দ্বারা পমাণিত হয় যে, বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য যে কোনো উপায় অবলম্বন করা জায়েয। এটা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। তারপর আল্লাহ বলেন, "শয়তান তাকে তার রবের নিকট তার কথা বলার বিষয় ভুলিয়ে দিল।"

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথাটি বাদশাহর কাছে পৌঁছাতে শয়তান যুবক ভুলিয়ে দিয়েছিল।

মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, এ ব্যাখ্যাটি সঠিক। আহলে কিতাবগণও এ ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। তারপর আল্লাহ বলেন, "ফলে ইউসুফ (আ) কয়েক বছর কারাগারে রইল"।

উল্লিখিত আয়াতে "بِضْعٌ" শব্দের অর্থ হলো "কয়েক বছর"। এখানে "কয়েক বছর" এর ব্যাখ্যা মুফাসসিরগণ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন بِضْعٌ (কয়েক বছর) দ্বারা তিন থেকে নয় বছর বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, তিন থেকে পাঁচ বছর। অন্য এক বর্ণনা মতে ১০ বছরের কিছু কম। সালাবী এ মতগুলো বর্ণনা করেছেন। আল্লামা ফারা বলেছেন, দশের কমের জন্য بِضْعٌ শব্দটি ব্যবহার করা যায় না। আল্লামা ফারার এই অভিমত নিম্নের আয়াত দ্বারা খণ্ডন হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "সে কারাগারে কয়েক বছর রইল" এখানে অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে ১০ বছরের কমই বুঝা যায়। সূরা রূমের শুরুতে আল্লাহ বর্ণনা করেন- وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ "কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই।" এখানে بِضْعٌ (কয়েক বছর) দ্বারা নয় বছর বুঝানো হয়েছে।

আল্লামা ফারা এ কথাও বলেছেন যে, بِضْعَةَ عَشَرَ (অর্থাৎ দশের কিছু উর্ধ্বে) بِضْعَةَ عِشْرُوْنَ (অর্থাৎ বিশের কিছু উর্ধ্বে) এভাবে নব্বই পর্যন্ত বলা যাবে। কিন্তু এভাবে বলা যাবে না যে, بِضْعَةً وَمِائَةً (একশত ও তার কিছু উর্ধ্বে) এবং بِضْعٌ وَّاَلْفٌ (এক হাজার ও তার কিছু উর্ধ্বে)। তাঁর এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, بِضْعٌ শব্দটি দশের উর্ধ্বের সংখ্যার ক্ষেত্রেই শুধু ব্যবহার হয়।

আল্লামা যাওহারী (রহ) বলেন যে, দশের উর্ধ্বের সংখ্যার জন্য بِضْعٌ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। সুতরাং بِضْعَةَ عَشَرَ এবং بِضْعٌ وَّ عِشْرُوْنَ এভাবে নব্বই পর্যন্ত বলা বৈধ হবে না। কিন্তু তাঁর এ মতটিও সঠিক নয়। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَفِيْ رِوَايَةٍ سَبْعُوْنَ شُعْبَةً اَفْضَلُهَا قَوْلُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ.

অর্থ : ঈমানের ষাটের উর্ধ্বে অন্য এক বর্ণনা মতে সত্তরের উর্ধ্বে শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্ব উচ্চের শাখা হলো, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলা। আর সর্ব নিম্নের শাখা হলো, কষ্টদায়ক বস্তু চলার পথ থেকে সরিয়ে ফেলা।

কারো মতে فَاَنْسٰهُ الشَّيْطٰنُ (শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে) এখানে তাকে (সর্বনাম) দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যার অর্থ এরূপ হয় যে, শয়তান ইউসুফ (আ)-কে তাঁর প্রভুর কথা বিস্মৃত করে দিয়েছে। এ কথাটি একেবারেই দুর্বল। যদিও ইবনে আব্বাস (রা) ও ইকরামা (রা) থেকে এটি বর্ণিত আছে। এর পরেও এটি দুর্বল বলা হয়েছে। (বর্ণনাকারীর কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে) ইবনে জারীর (রহ) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও দুর্বল। ইবরাহীম ইবনে যায়েদ আল খাত্তাবী আল মক্কী এর বর্ণনাকারী। যার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। হাসান ও কাতাদাহ (রা)-এর মুরসাল বর্ণনাও গ্রহণ করা যাবে না। আর এখানে এর কোনো দিক থেকেই গ্রহণ করা যাবে না। ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইউসুফ (আ)-এর উপর অনুগ্রহ করুন। যদি তিনি এ কথাটি না বলতেন যে, "তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলবে" তবে যতদিন তিনি জেলে বন্দি ছিলেন, ততদিন তাঁকে থাকতে হতো না। আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর প্রতিও অনুগ্রহ করুন। কারণ তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে তিনি বলেছিলেন যে, "তোমাদের মোকাবিলায় যদি আমার শক্তি থাকত কিংবা মজবুত দুর্গের আশ্রয় পেতাম"।

এ কথা দ্বারা তিনি মূলত আল্লাহর সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করেছিলেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরবর্তী সকল নবীগণকে (সম্মান ও মর্যাদাসহ) শক্তিশালী বিশিষ্ট জাতির মাঝে প্রেরণ করেন। এ হাদীসটি বর্ণনার দিক দিয়ে মুনকার। এ হাদীসের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আলকাহ একক। তাঁর এ বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। আর এ শব্দগুলো মুনকার। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসকে ভুল বলেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

বাদশাহর স্বপ্ন

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার মধ্যে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۚ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۙ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

অর্থ : একদিন বাদশাহ বলল১, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সাতটি মোটা গাভীকে অপর সাতটি শুকনো গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি ফসলের শীষ সবুজ এবং অপর সাতটি শুকনো। হে শাহী দরবারের লোকেরা! যদি তোমরা স্বপ্নের মর্ম জানো তাহলে আমার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও। তারা বলল, এটা তো একটা দুঃস্বপ্ন। আমরা এ জাতীয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। ঐ দুই কয়েদির মধ্যে যে বেঁচেছিল, অনেকদিন পর এখন (ইউসুফের) কথা তার মনে পড়ল। সে বলল, আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি। আমাকে একটু (জেলখানায় ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন। সে গিয়ে বলল, হে সত্যের প্রতীক২! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন যে, সাতটি মোটা গাভীকে অপর সাতটি শুকনো গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি ফসলের শীষ সবুজ আর অপর সাতটি শুকনো। হয়তো আমি তাদের কাছে ফিরে যাব এবং তারা (আপনার কথা) জানতে পারবে।৩ ইউসুফ বললেন, সাত বছর তোমরা একটানা চাষাবাদ করবে। এ সময়ের মধ্যে তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে তোমরা যতটুকু খাবে, শুধু সে পরিমাণ শস্য বের করে নেবে। বাকি শস্য শীষের মধ্যেই থাকতে দাও। এরপর সাতটি বছর খুবই কঠিন আসবে। এ সময়ের জন্য তোমরা যে ফসল জমা করে রেখেছ তা খাওয়া হবে। অল্প কিছু যা থেকে যাবে তা তোমরা হেফাযত করে রাখবে। এরপর একটি বছর এমন আসবে, যখন রহমতের বৃষ্টি দ্বারা জনগণের দাবি পূরণ করা হবে এবং তারা তখন রস নিংড়াবে।" –সূরা ইউসুফ : ৪৩–৪৯

হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানও ছিল মুক্তি পাওয়ার একটি উপায়। যে কারণে বাদশাহ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে জেল থেকে বের করে তাঁর দরবারে নিয়ে আসেন। বাদশাহ, যিনি স্বপ্নটি দেখেন,

১. মাঝে বন্দিজীবনের কয়েক বছর বাদ দিয়ে যেখান থেকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর পার্থিব উন্নতি শুরু হয়েছে, সেখান থেকে বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

২. আসলে 'সিদ্দীক' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় শব্দটি দ্বারা সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ মান বোঝায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জেলে থাকাকালে এ লোকটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পবিত্র চরিত্র দ্বারা কতটা গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিল এবং অনেক বছর পরও এ প্রভাব অব্যাহত ছিল।

৩. অর্থাৎ তারা যেন আপনার মূল্য ও মর্যাদা জানতে পারে এবং আত্মীয়তের এ অনুভূতি জাগে যে, কীরূপ মহান মানুষকে তিনি কোথায় বন্দী করে রেখেছেন। আর এভাবে আমার সেই ওয়াদা পূরণ করার সুযোগ হবে, যা আমি জেলখানায় আপনাকে দিয়েছিলাম।

তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে, রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ ইবনে ছাবওয়ান ইবনে আরাশা ইবনে ফারান ইবনে আমর ইবনে আমলাক ইবনে লাউয ইবনে সাম ইবনে নূহ।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন, তথা হতে সাতটি মোটা গাভী বের হয়ে নদীর নিকটবর্তী একটি চারণভূমিতে চরতে শুরু করে। অতঃপর ঐ নদী থেকে আরো সাতটি দুর্বল গাভী বের হয়ে আসে এবং পূর্বের মোটা গাভীদের সাথে মিলে চরতে থাকে। এর পরে এই দুর্বল গাভীগুলো মোটা গাভীগুলোকে ধরে খেয়ে ফেলে। বাদশাহ এরূপ স্বপ্ন দেখে ঘুম থেকে পেরেশান অবস্থায় উঠেন। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ ঘুমিয়ে পড়েন। দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখেন যে, একটি ধান গাছে সাতটি সবুজ তরু তাজা শীষ। আর অন্য একটি গাছে সাতটি শুষ্ক শীষ। তিনি দেখছেন যে, শুষ্ক শীষগুলো তরু তাজা শীষগুলোকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং খুব পেরেশান হয়ে যান। বাদশাহ এ স্বপ্নের কথা তাঁর রাজ দরবারে সকলের কাছে বললেন এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু সকলে এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে অসক্ষম। সবাই অপরাগতা প্রকাশ করল এবং বলল, এটা একটি দুঃস্বপ্ন। এ সময় সেই মুক্তিপ্রাপ্ত যুবক যাকে জেল থেকে বের হয়ে আসার সময় ইউসুফ (আ) বাদশাহর কাছে তাঁর কথা বলার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল। তার সেই কথাটি মনে পড়ে গেল। যুবকটির ভুলে যাওয়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছিল। কারণ এ ভুলে যাওয়ার মধ্যে যে রহস্য নিহিত ছিল তা ছিল আল্লাহর হিকমত ও কৌশল। সে যুবক বাদশাহর স্বপ্নটি শুনল এবং রাজ দরবারের সবাই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে অপারগ তাও সে প্রত্যক্ষ করল। এ সময় তাঁর ইউসুফ (আ)-এর কথা স্মরণ এসে গেল। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে—

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ ـ

অর্থ : দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হয়েছিল সে বলল। -সূরা ইউসুফ : ৪৫

ইকরামা ইবনে ইসহাক ও যিহাক (রহ) বলেছেন, بَعْدَ اُمَّةٍ কিরয়াত অনুরূপভাবেই পড়তে হবে যেরূপ সাধারণভাবে পড়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ মীম এর উপরে তাশদীদ দিয়ে। কিন্তু তারা এর অর্থ বলেছেন, بَعْدَ النِّسْيَانِ অর্থাৎ বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ হওয়া। মুজাহিদ (রহ) اُمَّةٌ শব্দটিতে মীমের উপর সাকিন দিয়ে পড়ার পক্ষে। তবে তিনিও এর অর্থ اَلنِّسْيَانُ (ভুলে যাওয়া) বলেছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে, اُمَّةُ اَرْجُلٍ লোকটি ভুলে গেছে। কোনো কবি বলেছেন—

امت و كنت لانسى حديثا

كذاك الدهر يذرى بالعقول ـ

অর্থ : আমি বর্তমানে অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়ে যাই। অথচ এ ভুলে যাওয়ার রোগটি আমার মধ্যে এর পূর্বে ছিল না। যুগের পরিবর্তন এভাবে আমার স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে দিয়েছে।

মোটকথা যুবকটির যখনই ইউসুফ (আ)-এর সেই কথা মনে হলো, তখনই সে বাদশাহর কাছে বলল, "আমি আপনাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা (জেনে) বলে দিতে পারব। সুতরাং আমাকে (জেলখানায়) ইউসুফের কাছে প্রেরণ করুন। সে ইউসুফ (আ)-এর কাছে এসে বলল—

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থ : সে গিয়ে বলল, হে সত্যের প্রতীক! আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন যে, সাতটি মোটা গাভীকে অপর সাতটি শুকনো গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি ফসলের শীষ সবুজ অপর সাতটি শুকনো। হয়তো আমি তাদের কাছে ফিরে যাব এবং তারা (আপনার কথা) জানতে পারবে। -সূরা ইউসুফ : ৪৬

আহলে কিতাবগণের কাছে ঘটনা এরকম যে, সাকী বাদশাহকে যখন ইউসুফ (আ)-এর কথা অবগত করল, তখন বাদশাহ বললেন যে, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আসো। তখন ইউসুফ (আ)-কে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হলো এবং তিনি বাদশাহর সামনেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা পেশ করেন। আহলে কিতাবদের এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে ভুল। কুরআন মাজীদের বর্ণনাই সঠিক ও সত্য যে, সাকী ইউসুফ (আ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করে দিয়েছিলেন। ইউসুফ (আ) কোনো শর্ত ছাড়াই সাথে সাথে তাঁর আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান দ্বারাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর মুক্তির জন্য এবং অন্য কোনো কিছুর শর্ত আরোপ করেননি। বরং সঠিকভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, প্রথম সাত বছর অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। অর্থাৎ দেশে প্রচুর ফসল হবে। পরবর্তী সাত বছর কঠিন দুর্ভিক্ষ হবে। (অর্থাৎ দেশে খাদ্যের অভাব অনটন দেখা দিবে) "এরপর আসবে এক বছর, সে বছরে দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে। অর্থাৎ দেশের লোকেরা খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করবে। দেশ প্রচুর শস্যের সবুজ আভায় উদ্ভাসিত হবে। সে বছর এত ফলফলাদি উৎপন্ন হবে যে, লোকেরা প্রচুর ফলের রস নিংড়িয়ে বের করবে। অর্থাৎ আখ, যয়তুন, আঙ্গুর, তিল ইত্যাদির রস নিংড়িয়ে বের করবে। হযরত ইউসুফ (আ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যাই বলে দেন নি, বরং আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার সহজ উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি বললেন, প্রথম সাত বছরের উৎপাদিত গমের দানাগুলো শীষসহ রেখে দিবে। যাতে সেগুলো নষ্ট হতে না পারে এবং কীট পতঙ্গাদি না খেতে পারে। আর পরবর্তী সাত বছর প্রথম সাত বছরের সঞ্চিত ফসল থেকে অল্প অল্প করে প্রয়োজন মাফিক খরচ করবে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই পরামর্শে তাঁর দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

অর্থ : বাদশাহ বলল, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো"। কিন্তু যখন বাদশাহর পাঠানো লোক ইউসুফের কাছে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, তোমার রবের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর যে, ঐ মহিলাদের ব্যাপারটা কী, যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমার রব তো তাদের ফন্দি সম্পর্কে জানেনই। বাদশাহ তখন ঐ মহিলাদের জিজ্ঞেস করল, "তোমরা যখন ইউসুফকে ভুলাতে চেষ্টা করছিলে তখন তোমাদের অবস্থা কী ছিল?" তারা সবাই বলল, "আল্লাহর কসম, আমরা তো তার মধ্যে মন্দের লেশও পা ইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠল, "এখন সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে সাচ্চা মানুষ।" (ইউসুফ বললেন) (আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আযীয যাতে জানতে পারেন যে, আমি পর্দার আড়ালে কোনো খিয়ানত করিনি। আর নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে আল্লাহ তাদের ফন্দিকে সফলতার পথ দেখান না। (ইউসুফ বললেন)

আমি আমার নাফসকে নেক বলে দাবি করছি না। নাফস তো মন্দের দিকে উসকাতেই থাকে। আমার রব কারো উপর রহমত করলে আলাদা কথা। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। -সূরা ইউসুফ : ৫০-৫৩

বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ)-কে একজন জ্ঞানবান, দূরদর্শী, সঠিক ব্যবস্থাপক ও যথোচিত সিদ্ধান্তগ্রহণকারী বলে বুঝতে পারলেন, তখন তিনি ইউসুফ (আ)-কে সম্মানের সাথে মুক্তি দেয়ার জন্যে আদেশ দেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর বিশেষ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। দূত যখন ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির সংবাদ নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছেন, তখন ইউসুফ (আ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত জেল থেকে বের হবেন না, যতক্ষণ না এ সংবাদ দেশের সকলের কাছে পৌঁছাবে যে, তাঁকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে যে অপরাধের কথা রটানো হয়েছে তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক, সে সম্পূর্ণভাবে এর থেকে পূতঃপবিত্র ও নিষ্কলুষ। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, "তুমি তোমার প্রভুর কাছে (অর্থাৎ বাদশাহ কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, সে সব মহিলাদের (প্রকৃত) অবস্থা কি, যারা নিজেদের হাত কেটেছিল? আমার প্রতিপালক তো তাদের ছলনা সম্পর্কে অবহিত।"

কেউ কেউ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, "আমার প্রতিপালক" কথা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ) যুলায়খার স্বামী আযীযকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ আমার মনিব আযীয যে সেই মহিলাদের ছলনার ব্যাপারে সম্যক অবগত যে, আমি সেই মহিলাদের ছলনা ও প্রতারণা থেকে কিভাবে নিজকে বাঁচিয়ে রেখেছি, যারা আমাকে এমন কু-কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিল, যা আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং হে দূত! তুমি তোমার রাজার কাছে গিয়ে বল, তিনি প্রথম সেই মহিলাদের কাছে আমার চরিত্র ভালরূপে জিজ্ঞেস করে জেনে নিক। যখন মহিলাদের কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তারা সবাই সঠিক ঘটনা প্রকাশ করে বলল, "আশ্চর্য আল্লাহর মহিমা! আমরা ইউসুফের মধ্যে কোনো দোষ দেখি নি।" এ সময় আযীযের স্ত্রী যুলায়খাও বলে উঠল যে, প্রকৃত ঘটনা তো প্রকাশ হয়েই গেছে। সুতরাং (শোন) আমিই তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম। সে আমার কাছে অসৎকর্ম কামনা করে নি। মিথ্যা দোষারোপ করে অন্যায়ভাবে তাঁকে কারাবন্দী করা হয়েছে। তারপর ইউসুফ (আ) বলেন, "আমি এটা বলেছিলাম যাতে সে (আযীয) জানতে পারে যে, তার অজান্তে আমি তার বিশ্বাসঘাতকতা করি নি।"

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন যে, উক্ত কথাটি ছিল যুলায়খার। তখন অর্থ হবে, "আমি এ সত্য কথাটি এজন্যে বলেছি, যাতে আমার স্বামী জানতে পারে যে, আমি মূলতঃ তার অনুপস্থিতিতে তার কোনো বিশ্বাঘাতকতা করি নি। যদিও মনের দিক দিয়ে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার দ্বারা কোনো অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় নি। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

(কারণ, যুলায়খা ভালভাবেই জানত যে, আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রকে সফল করেন না।) অধিকাংশ মুফাসসির এ মতকে সমর্থন করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে হাতিম (রহ) প্রথম অভিমতটিই সমর্থন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

অর্থ : বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে আমি তাকে আমার জন্য খাস করে নিতে পারি। যখন ইউসুফ তার সাথে কথাবার্তা বললেন, তখন (বাদশাহ) বলল, এখন আপনি আমাদের কাছে সম্মান ও মর্যাদা রাখেন এবং আপনাকে আমরা বিশ্বাসী মনে করি। তখন ইউসুফ বললেন, দেশের অর্থ বিভাগ আমার হাতে

তুলে দিন। আমি এর হেফাযতকারী হব এবং (এ বিষয়ে) আমার জানা আছে। এভাবেই আমি সে দেশে ইউসুফের জন্য ক্ষমতার পথ খুলে দিলাম। সেখানে তাঁর ইচ্ছামতো যেকোনো পজিশন দখল করতে পারতেন।[১] আমি যাকে চাই তাকেই আমার রহমত দিয়ে ধন্য করি। নেক লোকদের বদলা আমি নষ্ট করি না। আর আখিরাতের বদলা তাদের জন্য আরো ভালো, যারা ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে ভয় করে চলে।

-সূরা ইউসুফ : ৫৪-৫৭

বাদশাহর কাছে যখন ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা ও সততা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন সে (বাদশাহ) বলল, "ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার নিকটতম সহচর করে রাখব।" অর্থাৎ আমি তাকে রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করব এবং আমার একান্ত সহচরদের অন্তর্ভুক্ত করব।

বাদশাহর সাথে ইউসুফ (আ)-এর আলোচনা হলো এবং তাঁর মর্যাদা সততা সম্পর্কে বাদশাহ অবহিত হলেন। যে প্রেক্ষিতে বাদশাহ ইউসুফ (আ)-কে বলেছিলেন, "আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হলে। হযরত ইউসুফ (আ) উত্তরে বললেন "(হে বাদশাহ!) আমাকে রাজ্যের ধন সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।" হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর কাছে ধন-ভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার চাইলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, প্রথম সাত বছর প্রচুর ফসলাদী উৎপন্নের পর পরবর্তী সাত বছর দেশে চরম দুর্ভিক্ষ ও অভাব দেখা দেবে। এ অভাবের সময় তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় কাজ করবেন এবং মানুষকে এ কঠিন অভাবের সময় দেশের মানুষের কল্যাণে কি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তা আমি ভালভাবেই জানি। এ কথা দ্বারা এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোনো ব্যক্তি নেতৃত্ব চাইতে পারেন। (অর্থাৎ, যে নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখেন।)

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, মিশরের বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ)-কে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁকে সমগ্র মিশরের বিশেষ কর্তৃত্ব প্রদান করেন। বাদশাহ তার বিশেষ আংটি (যা রাষ্ট্রীয় সীল হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে) তাঁকে প্রদান করেন এবং রাজকীয় উত্তম পোশাক তাঁকে পরিয়ে দেন। তাঁর গলায় স্বর্ণের হার পরিয়ে দিয়ে তাঁকে রাজ দরবারে দ্বিতীয় আসনে আসীন করিয়ে তাঁরই সামনে বাদশাহ ঘোষণা দেন যে, এখন থেকে আপনিই দেশের আসল বাদশাহ ও শাসক। আমি শুধু এ রাজদরবারের প্রধান আসনে বসা ছাড়া অন্য আর কোনো দিক থেকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা মর্যাদাসম্পন্ন নয়। আহলে কিতাবদের মতে এ সময় ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল তেইশ বছর। বাদশাহ তাঁকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক সুন্দরী মহিলার সাথে বিবাহ করিয়ে দেন। সালাবী (রহ) বলেছেন, বাদশাহ আযীযে মিশর কিতফীরকে পদচ্যুত করে ইউসুফ (আ)-কে সেই পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আর এক বর্ণনা মতে আযীযের মৃত্যুর পরে বাদশাহ যুলায়খাকে ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিবাহ করিয়ে দিয়েছিলেন। ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে কুমারী অবস্থায়ই পেয়েছিলেন। কারণ, যুলায়খার স্বামী (আযীয) তাঁর সাথে মিলিত হতেন না। তারপর ইউসুফ (আ)-এর ঔরসে যুলায়খার গর্ভে দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। তাদের নাম আফরাইম ও মানসা। হযরত ইউসুফ (আ) মিশরকে সবদিক থেকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন এবং দেশে ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করেন।

বর্ণিত আছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ) মিশরের বাদশাহর কাছে আসেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। বাদশাহ সত্তরটি ভাষায় ইউসুফ (আ)-এর সাথে কথা বলেন। ইউসুফ (আ) প্রতিটি ভাষায়ই বাদশাহকে উত্তর

১. অর্থাৎ এখন গোটা মিশর দেশ তাঁর অধিকারে। এর প্রত্যেক জায়গাকে তিনি নিজের জায়গা বলতে পারতেন। সেখানকার কোনো লুপ এলাকাও এমন ছিল না, যেখানে তিনি বাধা পেতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আ) সে দেশে যে পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, সে কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। অতীতকালের মুফাসসিরগণও এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন। যথা ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ অর্থ করেছেন যে, আমি ইউসুফকে মিশরের সকল জিনিসের মালিক বানিয়েছিলাম। সেদেশে তিনি সেখানে যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারতেন। দেশটিকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি যদি তিনি ফিরাউনকে তাঁর অধীন করে নিজে তার উপর কর্তা হতে চাইতেন, তবে তিনি তাও করতে পারতেন। মুজাহিদের ধারণা, মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

দিয়েছিলেন। বাদশাহ ইউসুফ (আ)-এর অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দেখে বিস্মিত হন। [হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই ভাষা জ্ঞানটাও ছিল তাঁর নবুওয়াতের একটি মু'জিযা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি এ ভাষা জ্ঞান লাভ করেছিলেন।]

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত।" অর্থাৎ প্রথমতঃ ইউসুফ (আ) জেলখানার কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্বাধীন জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুমিন ও সৎকর্মশীলদের বিনিময়। এছাড়াও পরকালে রয়েছে, তাদের জন্য উত্তম ঠিকানা। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন- মিশরের বাদশাহ রাইয়্যান ইবনে ওয়ালীদ হযরত ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। জনৈক কবি বলেছেন—

وراء مضيق الخوف متسع الامن * واول مفروح به غاية الحزن

فلا تياس فالله ملك يسفا * خذانته بعد الخلاص من السجن .

অর্থ : "ভয় সংকটের পরেই আছে সান্ত্বনার-ই বাণী, আনন্দের পূর্বে থাকে চূড়ান্ত পেরেশানী।
আল্লাহরই রহমত থেকে নিরাশ না হও কভু, ইউসুফ (আ)-কে জেল থেকে মুক্ত করেন প্রভু।
মিশর দেশের বাদশাহী করেন তাঁকে দান, এমনিভাবে দয়া করেন আল্লাহ যাকে চান।"

হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে তাঁর ভাইদের আগমন

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ۞ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞

অর্থ : ইউসুফের ভাইয়েরা মিশরে এলো এবং তাঁর সামনে হাজির হলো।[১] তিনি তাদেরকে চিনে ফেললেন, কিন্তু তিনি তাদের কাছে অপরিচিত রয়ে গেলেন। তারপর যখন তিনি তাদের মাল-সামানের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন তাদের চলে যাওয়ার সময় বলে দিলেন, তোমরা দেখলে তো আমি কীভাবে পাত্র ভরে ভরে দেই এবং কত ভালোভাবে মেহমানদারী করি। যদি তোমরা তাকে না আন তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো শস্য নেই এবং তোমরা আমার কাছেও আসবে না।[২] তারা বলল, আমরা চেষ্টা করব, যাতে তার পিতা তাকে পাঠাতে

১. এখানে আবার মাঝখানের সাত-আট বছরের ঘটনা বাদ দিয়ে আলোচনাকে সেখানেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে বনী ইসরাঈলদের মিশরে যাওয়ার সূচনা হয়।

২. দুর্ভিক্ষের কারণে মিশরে খাদ্যশস্যের উপর সরকারি বিধি-নিষেধ ছিল। সম্ভবত সে কারণে হযরত ইউসুফ (আ) এ কথা বলেছিলেন। খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য দশ ভাই এসেছিলেন। কিন্তু সম্ভবত তারা তাদের পিতা ও ১১নং ভাইয়ের হিস্যাও চেয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) সম্ভবত তাদের এ দাবি শুনে বলেছিলেন, 'তোমাদের পিতার না আসার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে। কেননা, তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ; কিন্তু তোমাদের ভাইয়ের না আসার কী যুক্তি থাকতে পারে? যাহোক, এবার তো আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করে তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে শস্য দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু আগামীতে যদি তোমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে না আস তবে তোমাদেরকে বিশ্বাস করা যাবে না এবং তোমরা এখান থেকে কোনো শস্য পাবে না।

রাজি হন এবং আমরা অবশ্যই তা করব। ইউসুফ গোলামদের বলে দিলেন, তারা শস্যের বিনিময়ে যে মাল দিয়েছে তা তাদের জিনিসপত্রের মধ্যেই গোপনে রেখে দাও। ইউসুফ এ আশায় এটা করলেন যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফিরে পাওয়া মাল চিনতে পারবে (এবং এমন দানশীলতায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে)। হয়তো তারা আবার আসবে। -সূরা ইউসুফ : ৫৮-৬২

যখন ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা মিশরে খাদ্য ক্রয়ের জন্য আগমন করেছিল, তখন তাদের এ আগমনের সংবাদ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে জানিয়ে দেন। দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে সমগ্র দেশে যখন ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল, তখন ইউসুফ (আ) মিশরের পার্থিব ও ধর্মীয় সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর কাছে হাজির হলে তাদেরকে তিনি চিনতে পারলেন। কিন্তু ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারলেন না। কারণ, তাদের ধারণাই ছিল না যে, ইউসুফ (আ) এত বড় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে। এ কারণে ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারে নি। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-এর কাছে হাজির হয়ে তাঁকে সিজদা করেন। এ সময় ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনতে পারলেন। কিন্তু তিনি ভাইদের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা গুপ্তচর। তোমরা আমার দেশের গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য এসেছ। ভাইয়েরা বলল, আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় চাই। আমরা আমাদের কওমের লোকদের জন্য খাদ্য নেয়ার জন্য এসেছি। দুর্ভিক্ষের কারণে তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভীষণ কষ্টে জীবন অতিবাহিত করছে। আমরা সবাই কিনআনের অধিবাসী এবং একই পিতার সন্তান। আমরা ছিলাম মোট বার ভাই। একজন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আর সর্ব কনিষ্ঠ ভাই আমাদের পিতার কাছে রয়ে গেছেন। আহলে কিতাবগণ এ কথাও বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) তাদেরকে তিন দিন পর্যন্ত আটক করে রাখেন। তিন দিন পরে তাদেরকে ছেড়ে দেন। তবে তাদের শামউন নামক এ ভাইকে যামানতস্বরূপ তাঁর কাছে রেখে দেন। যাতে তারা তাঁর আপন ছোট ভাই বিন-ইয়ামীনকে নিয়ে আসে। আহলে কিতাবদের এ বর্ণনার মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন," অর্থাৎ প্রত্যেককে উট বোঝাই রসদ প্রদান করেন, যা অন্য কাউকে প্রদান করা হয় নি, তখন বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" প্রথমতঃ হযরত ইউসুফ (আ) তাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। যার উত্তরে তারা বলেছিল, আমরা বার ভাই ছিলাম। এর মধ্যে একজন আমাদের থেকে চলে গেছেন। আর একজন সহোদর ভাই আছেন, যিনি পিতার কাছে রয়ে গেছেন। হযরত ইউসুফ (আ) তাদের বললেন, "পরবর্তীতে তারা যাতে ছোট ভাইকে সাথে করে নিয়ে আসে, সেজন্য তাদেরকে দিয়ে ইউসুফ (আ) বললেন, "তোমার কি দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং মেহমানদেরকে সমাদর করি।" যেমন তোমাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছি এবং তোমাদেরকে মেহমানদারী করেছি। এরপর ইউসুফ (আ) তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না এসো, তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ পাবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।" ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা জবাবে বলল, "আমরা তার ব্যাপারে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব।" অর্থাৎ পিতাকে রাজি করিয়ে তাঁকে আমাদের সাথে নিয়ে আসতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। এরপর ভাইয়েরা বলল, "আমরা তা অবশ্যই করব।" অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর ভৃত্যদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা খাদ্যের বিনিময়ে যা কিছু মূল্য দিয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে তাদের রসদের মধ্যে করে গোপন করে রেখে দাও। "যাতে স্বজনদের কাছে ফিরে গিয়ে তারা বুঝতে পারে যে, তা প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে।" মূল্য ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। কেউ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি ধারণা করেছিলেন তারা দ্বিতীয়বার মিশরে যে আসবে, তার পথখরচ হয়তো তাদের কাছে থাকবে না। তাই এটা তাদের উপকারে আসবে। কারও মতে, ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের পক্ষ হতে থেকে রসদের মূল্য গ্রহণ করবেন, এটা তাঁর কাছে খুবই অশোভনীয় মনে হয়েছিল। তাই তিনি গোপনে মূল্য ফেরত দিতে বলেছেন।

ভাইয়েরা খাদ্যের মূল্য বাবদ যা দিয়েছিল, তার পরিমাণ কত ছিল এ নিয়ে মুফাসসিরীনের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা আসবে। আহলে কিতাবদের মতে তা ছিল রৌপ্যের একটি টুকরা। এ অভিমতটিই যথাযথ বলে মনে হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۞ قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۞ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ۞ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۞ وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে গেল তখন বলল, আব্বাজান! আগামীতে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দিতে অস্বীকার করেছে। তাই আমাদের সাথে আমাদের ভাইকেও পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা খাদ্যশস্য আনতে পারি। আর তার হেফাযতের দায়িত্ব আমাদের। পিতা জবাবে বললেন, আমি তার ব্যাপারে কি তোমাদের উপর ঐ রকম ভরসাই করব, যে রকম তার ভাইয়ের বেলায় করেছিলাম? আল্লাহই ভালো হেফাযতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশি মেহেরবান। তারপর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখল যে, তাদের মালও ফেরত দেওয়া হয়েছে। এটা দেখে তারা চিৎকার দিয়ে উঠল, আব্বা! আমরা আর কী চাই? দেখুন আমাদের মালও আমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। এখন আবার আমরা যাব, আমাদের পরিবারের জন্য রসদ নিয়ে আসব এবং আমাদের ভাইয়ের হেফাযত করব। আর অতিরিক্ত এক উট বোঝাই সামানও নিয়ে আসব। এ পরিমাণ বেশি শস্য সহজেই পাওয়া যাবে। তাদের পিতা বললেন, আমি তাকে তোমাদের সাথে কিছুতেই পাঠাব না, যদি তোমরা তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবে বলে আল্লাহর নামে ওয়াদা না কর। অবশ্য তোমরা বিপদ-আপদে ঘেরাও হয়ে গেলে আলাদা কথা। যখন তারা তাকে ওয়াদা দিলো তখন (তাদের পিতা) বললেন, আমাদের এ কথার উপর আল্লাহই রক্ষক। তারপর তিনি বললেন, হে আমার ছেলেরা! (মিসরের রাজধানীতে) এক দরজা দিয়ে তোমরা ঢুকবে না, বিভিন্ন দরজা দিয়ে ঢুকবে। কিন্তু আল্লাহর কোনো ইচ্ছা থাকলে তা থেকে আমি তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবো না। হুকুম আল্লাহর ছাড়া আর কারো চলে না। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। আর যাকে কারো উপর ভরসা করতেই হয়, সে যেন তাঁরই উপর ভরসা করে। আর ঘটনা তা-ই হয়েছে। যখন তারা পিতার উপদেশ অনুযায়ী শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) ঢুকল, তখন তাঁর এ সাবধানতা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো

কাজেই আসলো না। ইয়া'কূবের মনে যে একটা খটকা ছিল তা দূর করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে একটু চেষ্টা করলেন মাত্র। আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছি তিনি সেটুকু ইলমের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই আসল ব্যাপার জানে না। –সূরা ইউসুফ ৬৩–৬৮

মিশর হতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের দেশে প্রত্যাবর্তন করে আসার পর তাদের সাথে তাদের পিতার কি কথোপকথন হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে তা বর্ণনা করেছেন। পিতাকে তারা এ কথা জানিয়েছিল যে, "আমাদের জন্য বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" অর্থাৎ আমরা যদি আমাদের ছোট ভাইকে না নিয়ে যাই, তবে আমাদের খাদ্যশস্য দেয়া হবে না। আর যদি তাকে আমাদের সাথে আপনি পাঠিয়ে দেন তবে আমাদের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হবে।

আল্লাহ বলেন, "যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে, তারা বলল, আব্বাজান! আমরা আর কি চাইতে পারি?" অর্থাৎ আমাদের মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা এ দানশীল বাদশাহর কাছে দ্বিতীয়বারেও খাদ্য আনার জন্যে অবশ্যই যাব। আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং অতিরিক্ত খাদ্য নিয়ে আসব। "যা এনেছি তা খুবই অল্প।" অর্থাৎ ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে মাল কম দেয়া হয়েছে। এবারে তাকে নিয়ে গেলে তা পরিপূর্ণ ভারে দেয়া হবে।

হযরত ইয়াকূব (আ) বিন-ইয়ামীনকে তাদের সাথে প্রেরণ করতে খুব আশংকা করছিলেন। কারণ, এ বিন-ইয়ামীন পিতার কাছে হারানো ইউসুফ (আ)-এর স্থানে ছিল। ইউসুফ (আ)-কে হারানো ব্যথা, বিন-ইয়ামীনকে দেখে কিছুটা প্রশমিত হতো। এ কারণে তিনি পুত্রদেরকে বলেছিলেন, "আমি তাকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না। যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে কসম কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই। অবশ্য যখন তারা (সব ভাইয়েরা) তাঁর কাছে ওয়াদা করল তখন তিনি বললেন, "আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।"

হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রদের থেকে মজবূত অঙ্গীকার নিলেন এবং তাঁর সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য বললেন। কিন্তু আল্লাহর বিধান ও কুদরত কোনো কিছুতেই ঠেকাতে পারে না। ইয়াকূব (আ)-এর পরিবারের খাদ্য সামগ্রীর যদি প্রয়োজন না হতো, তবে তিনি বিন-ইয়ামীনকে কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে যেতে দিতেন না। কিন্তু তাকদীর অখণ্ডনীয়। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবেই। তিনি যা যেরূপ চাবেন, সেরূপই হবে। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ না করে বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, ইবনে আব্বাস (রা), যিহাক ও সুদ্দী (রহ) প্রমুখ বলেছেন, ইয়াকূব (আ) এ আদেশ এজন্য করেছিলেন, যাতে তাদের প্রতি কারও কু-দৃষ্টি না পড়তে পারে। কেননা, তাদের চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। ইবরাহীম নাখয়ী (রহ) বলেন, এরূপ আদেশ দেয়ার কারণ এই ছিল যে, তারা যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন পথে শহরে প্রবেশ করে, তবে হয়তো তাদের দৃষ্টিতে ইউসুফ (আ) পড়তে পারে। কিংবা কারো থেকে তাঁর সংবাদ জানতে পারে অথবা কোথাও তাঁর নিদর্শন পেয়ে যেতে পারে। প্রথম অভিমতটিই সঠিক। কারণ, ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন, "আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারি না।"

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۚ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا ۚ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা পিতার উপদেশ অনুযায়ী শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) ঢুকল, তখন তাঁর এ সাবধানতা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসলো না। ইয়া'কূবের মনে যে একটা খটকা ছিল তা দূর করার জন্য নিজের পক্ষ থেকে একটু চেষ্টা করলেন মাত্র। আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছি তিনি সেটুকু ইলমের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই আসল ব্যাপার জানে না। –সূরা ইউসুফ : ৬৮

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এ কথা দ্বারা প্রথম মতটিই অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। আহলে কিতাবদের মতে, এবারে পুত্রদের কাছে হযরত ইয়াকূব (আ) দিরহামের পরিবর্তে (বাদশাহর হাদিয়া স্বরূপ) পেস্তা, খুরমা, আখরোট ও বনফুল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۞ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۞ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۞ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۞ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۞ قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ۭ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۞ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ۭ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ۭ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَاۗءَ اللّٰهُ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۗءُ ۭ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۞ قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۞ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন তিনি তাঁর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা ডেকে নিলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমার ঐ ভাই (যে হারিয়ে গিয়েছিল)। এরা যা কিছু এ পর্যন্ত করে এসেছে তা নিয়ে তুমি আর দুঃখবোধ করো না।[১] যখন ইউসুফ তাদের মাল-সামান বোঝাই করছিলেন তখন তিনি তাঁর ভাইয়ের সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিলেন। তখন একজন ঘোষক ডেকে বলল, হে কাফেলার লোকেরা! তোমরা তো চোর। তারা পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কোন্ জিনিস খোয়া গেছে? সরকারি লোকেরা বলল, বাদশাহর ওজন করার পাত্রটি পাওয়া যাচ্ছে না। একজন বলল, যে এটা এনে দেবে তাকে এক উট বোঝাই পুরস্কার দেওয়া হবে। আমি এর দায়িত্ব নিলাম। ঐ ভাইয়েরা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা ভালো করেই জানো

১. এ সময় সম্ভবত বিন ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-কে জানিয়েছিলেন, সৎ ভাইয়েরা তাঁর সাথে কী কী খারাপ ব্যবহার করেছিল এবং তা শুনে হযরত ইউসুফ (আ) ভাইকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, "এখন তুমি আমার কাছেই থাকবে। ঐ যালিমদের কাছে আমি তোমাকে আর যেতে দেব না।" এটাও সম্ভব হতে পারে যে, এ সুযোগে দুই ভাইয়ের মধ্যে এ কথাও ঠিক করা হয়েছিল, যেকোনো কায়দায় বিন-ইয়ামীনকে যেতে না দিয়ে মিসরে রেখে দেওয়া হবে এবং হযরত ইউসুফ (আ) যে কারণে বিষয়টি গোপন রাখতে চাচ্ছিলেন তাও গোপন থেকে যাবে।

যে, আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসি নি এবং আমরা চুরি করার লোক নই। তারা বলল, আচ্ছা তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে চোরের কী শাস্তি হবে? ভাইয়েরা জবাব দিলো, যার সামান থেকে ঐ জিনিস বের হবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমরা তো এভাবেই যালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি। তখন ইউসুফ তাঁর ভাইয়ের আগে অন্যদের বস্তাগুলোর তল্লাশি নেওয়া শুরু করলেন। তারপর তাঁর ভাইয়ের বস্তা থেকে হারানো জিনিস বের করে আনলেন। এভাবেই আমি আমার কৌশল দিয়ে ইউসুফকে সাহায্য করলাম। বাদশাহর দীন (মিসরের আইন) অনুযায়ী তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করা তাঁর পক্ষে ঠিক হতো না। অবশ্য আল্লাহ চাইলে আলাদা কথা।[১] আমি যার ব্যাপারে ইচ্ছা করি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেই। ইলমের অধিকারী এমন একজন আছেন, যিনি সব জ্ঞানীর উপরে। ঐ ভাইয়েরা বলল, সে চুরি করে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এর আগে তার ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছে। ইউসুফ তাদের এ কথা শুনে মনের মধ্যেই গোপন রাখলেন। তাদের কাছে তা প্রকাশ করলেন না। শুধু (নীরবে) বললেন, তোমরা বড়ই মন্দ লোক। (আমার মুখের উপর) তোমরা যে অপবাদ দিচ্ছ এ বিষয়ে আসল কথা আল্লাহ ভালো করেই জানেন। তারা বলল, হে সরদার (আযীয)![২] এর পিতা খুবই বুড়ো মানুষ। তার বদলে আমাদের একজনকে গ্রেপ্তার করুন। আমরা আপনাকে খুবই নেক লোক মনে করি। ইউসুফ বললেন, নাউযুবিল্লাহ! অন্য কোনো লোককে আমরা কেমন করে ধরে রেখে দেবো? যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি[৩] তাকে ছেড়ে দিয়ে আর কাউকে আটক করলে আমরা যালিমদের মধ্যে গণ্য হব।

–সূরা ইউসুফ : ৬৯-৭৯

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর ছোট ভাই বিন-ইয়ামীনকে মিশরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ (আ) তাঁর ছোট ভাই বিন-ইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং তাঁকে প্রকৃত ঘটনা অবগত করেন যে, তিনি তার সহোদর ভাই। এ কথাটি তাঁকে গোপন রাখতে বললেন এবং তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, তারা যে ব্যবহার করেছে, সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করবে। তারপর বিন-ইয়ামীনকে তাঁর কাছে রাখার জন্য কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন যে, "আমার পানপাত্রটি বিন-ইয়ামীনের মালের মধ্যে গোপনে রেখে দাও। তারা বিন-ইয়ামীনের মালের মধ্যে রাজার পানপাত্রটি রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক এ ঘোষণা দেন যে, রাজার পানপাত্রটি চুরি হয়ে গেছে। যে এ পাত্রটি ফিরিয়ে

---

১. *সাধারণত এ আয়াতের অনুবাদ এরূপ করা হয়ে থাকে যে, "ইউসুফ (আ) বাদশাহের আইন তথা মিশরের রাজকীয় আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে আটক করতে পারতেন না।" কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করলে কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহের আইনে চোরকে আটক করতে না পারার কী কারণ থাকতে পারে? পৃথিবীতে কখনো এরূপ কোনো রাজত্ব কি ছিল, যার আইন চোরকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেয় না? সুতরাং সঠিক কথা হচ্ছে– আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে এ কথা শোভা পায় না যে, তিনি বাদশাহের আইন অনুযায়ী কাজ করবেন। সেজন্য হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদের কাছে তাদের ওখানকার আইন কী, তা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইবরাহীমী শরীআত অনুসারে নিজের ভাইকে আটক করেছিলেন।*

২. *এখানে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি 'আযীয' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ার কারণেই কোনো কোনো মুফাস্সির অনুমান করেছেন যে, ইতঃপূর্বে জোলায়খার স্বামী যে পদে ছিল হযরত ইউসুফ সে পদেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বের টীকায় আমি এ কথা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেছি যে, এটা মিসরের কোনো বিশেষ পদের নাম ছিল না; বরং শুধু 'ক্ষমতার অধিকারী' অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হতো।*

৩. *এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, তাকে চোর বলা হয় নি; বরং এই বলা হয়েছে, 'যার কাছে আমরা নিজেদের মাল পেয়েছি'। চোর বললে মিথ্যা বলা হতো। এভাবে মিথ্যা থেকে বাঁচার কৌশলকে শরীআতের পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে। তাওরিয়া মানে, আসল ঘটনাকে গোপন করা। যা ঘটেনি এমন কথা বলা ছাড়া বা অন্যত্র কোনো কৌশল ছাড়া যখন কোনো যালিমের হুলুম থেকে বাঁচার অন্য কোনো উপায় না থাকে তখন একজন লোক সুস্পষ্ট মিথ্যা না বলে এমন কথা বলতে বা এরূপ তদবির করতে পারে, যাতে আসল ঘটনাকে গোপন রেখে হুলুম থেকে বাঁচা যায়। এখন দেখার বিষয় যে, গোটা ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ (আ) কীভাবে 'তাওরিয়া'র শর্ত পূরণ করেছেন। ভাইয়ের অনুমোদন নিয়ে তার জিনিসপত্রের মধ্যে পিয়ালা রেখে দিয়েছিলেন; কিন্তু কর্মচারীদেরকে তিনি এ কথা বলেন নি যে, তার উপর তোমরা চুরির অপবাদ দাও। তারপর যখন সরকারি কর্মচারী চুরির অভিযোগে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল, তখন তিনি নীরবে তল্লাশি চালালেন। তারপর যখন ভাইয়েরা বলল যে, বিন-ইয়ামীনের বদলে আমাদের মধ্যে কাউকে আটক রাখুন, তখন তিনি তাদের কথা দিয়েই জবাব দিলেন, "তোমাদের নিজেদের রায় তো এই ছিল যে, যার জিনিসপত্রের মধ্যে আমার মাল পাওয়া যাবে, তাকেই আটক করা হোক। এখন তোমাদের সামনেই বিন ইয়ামীনের জিনিসপত্রের মধ্যেই পাত্রটি পাওয়া গেছে। তাই আমি তাকেই আটক রাখছি, অন্যকে কেমন করে রাখতে পারি?"*

দেবে, তাকে এক উট বোঝাই মাল পুরস্কার স্বরূপ দেয়া হবে এবং এ দায়িত্ব আমার। সকল ভাইয়েরা ঘোষকের দিকে তাকিয়ে তাকে জানিয়ে দিল যে, আমরা এ ব্যাপারে নির্দোষ। আল্লাহর কসম! তোমরা ভালভাবেই জান যে, আমরা এ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে আসি নি। আমরা চোরও নই। (অর্থাৎ তোমরা জান যে, আমরা চোর নই। এরপরও আমাদের মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ।) এ কথার প্রেক্ষিতে তারা (ঘোষকগণ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা! যদি পানপাত্রটি কারও থেকে বেরিয়ে আসে তবে তার শাস্তি কি হবে? ভাইয়েরা বলল, যার মালপত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে সে-ই তার বিনিময়। আমরা এরূপেই সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।" এটা ছিল তাদের পিতা ইয়াকূব (আ)-এর শরীঅতের বিধান। চোরকে মালের মালিকের (অর্থাৎ যার মাল চুরি হয়েছে তার) কাছেই সোপর্দ করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর ইউসুফ তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশীর আগে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে লাগল। পরে সে সহোদরের মালপত্র মধ্য হতে পাত্রটি বের করল।" এরূপ করার কারণ, অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা এবং ভাইদের যেন কোনোরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করে দিয়েছিলাম। অন্যথায় বাদশাহর আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারত না।"

অর্থাৎ যদি ভাইয়েরা নিজেরা এ কথা না বলত যে, "চোরই চুরিকৃত মালের বদলা" তবে বিন-ইয়ামীনকে ইউসুফ (আ) তাঁর কাছে রাখতে পারতেন না। কারণ, এটা ছিল মিশর দেশের প্রচলিত আইনের বিপরীত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে তা ভিন্ন কথা। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদা দান করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর রয়েছে সর্বজ্ঞানী।" কারণ, ইউসুফ (আ) ছিলেন সকল ভাইদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তকারী এবং সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপে খুব দৃঢ়। তিনি যা কিছু করেছিলেন সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে করেছিলেন। সুতরাং এ ব্যাপারে কোনই আপত্তি থাকতে পারে না। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইউসুফ (আ)-এর মাতা-পিতা ও অন্যান্যদের মিশরে আগমণ ঘটে। ভাইয়েরা বিন-ইয়ামীনের মাল থেকে পাত্রটি বের হতে দেখে বলল, "যদি সে চুরি করে থাকে, তবে এর সহোদর ভাইও তো ইতপূর্বে চুরি করেছিল।" তারা এ সহোদর ভাই বলতে হযরত ইউসুফ (আ)-কে বুঝিয়েছিল। তারা ইউসুফ (আ)-এর ছোট বেলার একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে এ মিথ্যা কথাটি বলেছিল। সে ঘটনাটি হলো এই যে, ইউসুফ (আ) ছোটবেলায় তাঁর নানা (অর্থাৎ রাহীলের পিতা লাবানের) মূর্তিটি গোপনে এনে ভেঙে ফেলেছিলেন। আর এক বর্ণনা মতে, ছোটবেলায় ইউসুফ (আ) তাঁর ফুফুর কাছে থাকতেন। ফুফু তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি ইউসুফ (আ)-কে তার কাছে রাখার জন্য ইসহাক (আ)-এর একটি কোমরবন্দ গোপনে ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের মধ্যে রেখে দিলেন। পরে কোমরবন্দটিই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের মধ্যে পাওয়া যাওয়ার কারণে সে দেশের আইন মোতাবেক তাঁকে তাঁর কাছে রেখে দেয়া হয়। এ সম্পর্কিত আরো বর্ণনা আছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

অর্থ : তারা বলল, হে সরদার (আযীয)! এর পিতা খুবই বুড়ো মানুষ। তার বদলে আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। আমরা আপনাকে খুবই নেক লোক মনে করি। ইউসুফ বললেন, নাউযুবিল্লাহ! অন্য কোনো লোককে আমরা কেমন করে ধরে রেখে দেবো? যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছেড়ে দিয়ে আর কাউকে আটক করলে আমরা যালিমদের মধ্যে গণ্য হব। –সূরা ইউসুফ : ৭৮–৭৯

অর্থাৎ আমরা যদি দোষী ব্যক্তিদেরকে ছেড়ে দেই এবং নির্দোষীকে পাকড়াও করি, তবে আমরা অত্যাচারীর অন্তর্ভুক্ত হব। এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা তাকে কোনোভাবেই ছাড়তে পারি না। আহলে কিতাবগণ

বলেন, ইউসুফ (আ) এ সময় তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল। তারা বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতেই পারে নি। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ط قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ط فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَبِيْ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ج وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ج وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۞ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ط وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ۞ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ۞ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ج اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা ইউসুফ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন এক পাশে গিয়ে তারা পরামর্শ করতে লাগল। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে বলল, তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা আল্লাহর নামে তোমাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন?আর এর আগে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যা কিছু করেছ তা তো তোমরা জানো। আমার পিতার অনুমতি ছাড়া আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না। অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোনো ফায়সালা করে দিন। তিনিই সবচেয়ে ভালো ফয়সালাকারী। তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, হে আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাকে চুরি করতে দেখি নি। আমরা যা জানতে পেরেছি তা-ই বলছি। অজানা কথার হেফাযতের ক্ষমতা আমাদের ছিল না। আমরা যেখানে ছিলাম সেখানকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করুন। যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি। পিতা এ কাহিনী শুনে বললেন, আসলে তোমাদের নাফস তোমাদের জন্য আরো একটা বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে।[১] ঠিক আছে এ ব্যাপারেও আমি ভালোভাবে সবর করব। হয়তো আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার সাথে মিলিত করবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তার সব কাজ হিকমতপূর্ণ (যুক্তিপূর্ণ)। এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে বললেন, 'হায় ইউসুফ!' তিনি দুঃখে কাতর হয়ে গেলেন এবং তাঁর চোখ দু'টো সাদা হয়ে গেল। তাঁর ছেলেরা বলল, আল্লাহর দোহাই। আপনি তো কেবল ইউসুফের চিন্তা নিয়েই আছেন। অবস্থা এমন হয়েছে যে, আপনি তার শোকে নিজেই রোগী হয়ে গেছেন অথবা জীবন দিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, আমি আমার পেরেশানি ও ব্যথার নালিশ আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে করি না। আমি আল্লাহ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না। হে

১. *অর্থাৎ, আমার সেই ছেলে সম্বন্ধে, যার সচ্চরিত্র সম্পর্কে আমি খুব ভালোভাবেই জানি। তোমাদের এ ধারণা করা খুবই সহজ হলো যে, সে একটি পিয়ালা চুরি করতে পারে। এর পূর্বে তোমাদের আরেক ভাইকে জেনে-শুনে গুম করে তার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে নিয়ে আসা খুবই সহজ কাজ ছিল। এখন আবার অন্য ভাইকে চোর বলে স্বীকার করে নেওয়া ও আমাকে সেই সংবাদ দেওয়াও তোমাদের পক্ষে একই রকম সহজ হয়ে গিয়েছে।*

আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তাঁর ভাইয়ের খোঁজ-খবর নাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহর রহমত থেকে তো শুধু কাফিররাই নিরাশ হয়ে থাকে। -সূরা ইউসুফ : ৮০-৮৭

বিন-ইয়ামীনের সম্পর্কে তাঁর ভাইদের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরে তাঁদের অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যখন ভাইয়েরা বিন-ইয়ামীনকে হযরত ইউসুফ (আ) থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা (ভাইয়েরা) ভিন্ন একটি স্থানে গিয়ে পরামর্শে বসল। বড় ভাই রুবীল অন্যান্য ভাইদেরকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে ওয়াদা নিয়েছেন যে, বিন-ইয়ামীনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে। তোমরা সে অঙ্গীকার রক্ষা করনি। "এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অপরাধ করেছিলে। (সুতরাং আমার সামনে এখন এমন কোনো উপায় নেই যে, আমি আমার পিতাকে মুখ দেখাব।) "সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না।" অর্থাৎ এ দেশেই থেকে যাব। "যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে দেশে যেতে অনুমতি দেন। অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোনো ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ আমার ভাইকে আল্লাহ তা'আলা আমার পিতার কাছে পৌছার কোনো ব্যবস্থা করেন। "তিনি উত্তম মিমাংসাকারী।" সুতরাং তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে আব্বা! আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা যা জানি তার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবগত ছিলাম না। আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য "যে এলাকায় আমরা ছিলাম তার অধিবাসীদের কাছে আপনি জিজ্ঞেস করুন এবং মিশর থেকে যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও জিজ্ঞেস করুন। তারা সবাই বলবে যে, আপনার পুত্র চুরি করেছে। আমরা অবশ্যই সত্য কথা বলছি। ভাইয়েরা যখন দেশে ফিরে গিয়ে পিতাকে এ কথা জানাল, তখন পিতা ইয়াকূব (আ) বললেন, "না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি ঘটনা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই উত্তম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার সময় যে কথাটি ইয়াকূব (আ) বলেছিলেন, বিন-ইয়ামীনের ঘটনায়ও অনুরূপ কথা বললেন। যেমন, কোনো বুযুর্গ বলেছেন, "মন্দের বিনিময় পরবর্তীতে অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে।" তারপর ইয়াকূব (আ) আশাবাদী হয়ে আফসোসের সাথে বলেন, "হয়ত আল্লাহ তাদেরকে এক সাথে আমার কাছে এনে দেবেন।" অর্থাৎ ইউসুফ (আ), বিন-ইয়ামীন ও বড়ভাই রুবীলকে। "নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) সর্বাধিক অবগত। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড তিনি (আল্লাহ) ভালভাবেই জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাবান- অর্থাৎ সবকিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান। তারপর ইয়াকূব (আ) তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বলতে লাগলেন, "আফসোস! ইউসুফ, হায় ইউসুফ।"

নতুন দুঃখ বেদনা এসে পুরান দুঃখ বেদনাকে উছলিত করেছে। আর নির্বাপিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। যেমন জনৈক কবি বলেছেন—

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول.

অর্থ ঃ তোমার মনের আকর্ষণ যেখানে ইচ্ছা সেখানেই হতে পারে, তবে প্রকৃত ভালবাসা ও হৃদয়ের প্রেম শুধু প্রথম প্রেমিকের জন্যই। অন্য এক কবি বলেন—

لقد لامنى عند القبور على الكبار * رفيقى لتذراف الدموع السوافك

فقال اتبكى كل قبر رايته * لقبر نوى بين اللوى كادك

فقلت له ان الاسى بعث الاسى * فدعنى فهذا كله قبر مالك.

অর্থ : কবরের পাশে বসে আমার বন্ধু এ বলে আমাকে ভর্ৎসনা করে যে, আমি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত অশ্রুপাত করি কেন? অতঃপর সে বন্ধু বলল, উঁচু ভূমি ও শক্ত ভূমির মাঝে তোমার প্রেমাস্পদের যত কবরই তুমি দেখবে, সবগুলোর কাছেই কি তুমি দাঁড়িয়ে কাঁদবে?

আমি তাকে উত্তরে বললাম যে, নিশ্চয়ই একটি দুঃখ অন্য আর একটি দুঃখকে জাগ্রত করে। আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দাও। এগুলো সবই আমার প্রিয় মনিবের কবর।"

আল্লাহ বলেন, "শোকে তার চোখ দু'টি সাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তাঁর দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর অন্তরে শোকের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। এরপর আবার বিন-ইয়ামীনের বিচ্ছেদ। যা ছিল সম্পূর্ণরূপে অসহনীয়। অন্যান্য ভাইয়েরা যখন পিতা ইয়াকূব (আ)-কে ইউসুফ (আ)-এর শোকে খুবই বিষণ্ন ও কাতর দেখলো, তখন তারা পিতার প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে বলল, "(হে পিতা!) আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না মুমূর্ষু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।" অর্থাৎ আপনি যদি এভাবে সর্বদাই ইউসুফ (আ)-এর চিন্তা মগ্ন থাকেন, তবে আপনি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। সুতরাং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল করাই এখন আপনার জন্য উত্তম। এর জবাবে হযরত ইয়াকূব (আ) বললেন–

"আমি আমার অসহনীয় দুঃখ ও আমার বেদনা শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর পক্ষ হতে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।"

অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমার দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই পেশ করছি। কোনো মানুষের কাছে আমার কোনো নিবেদন নয়। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি জ্ঞাত হয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই আমার এই দুঃখ, কষ্ট ও বেদনা পেরেশানি দূরীভূত করে দেবেন এবং আমাকে শান্তিদান করবেন। আমার একান্ত বিশ্বাস যে, আমার কলিজার টুকরা ইউসুফ (আ) শৈশবে যে স্বপ্ন দেখেছে, তা বাস্তবায়ন হবে এবং আমি ও তোমরা তাঁকে (সম্মানসূচক) সিজদা করব। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, "আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জানি তোমরা জান না"।

এরপর তিনি তাঁর পুত্রগণকে ইউসুফ (আ) ও তাঁর ভাই বিন-ইয়ামীনকে তালাশ করার জন্য উৎসাহিত করে বলেন, "হে পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তার সহোদরের তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, আল্লাহর রহমত থেকে কাফির ছাড়া কেউ নিরাশ হয় না।"

অর্থাৎ দুঃখ ও কষ্টের পরে যে সুখ ও আনন্দ নিহিত রয়েছে, তা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত করা আল্লাহর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۚ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ ۙ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۚ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۞ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۚ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۙ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۞ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাজির হলো তখন তারা বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার ভীষণ মুসীবতে পড়ে গেছি এবং আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদেরকে বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য দান করুন এবং আমাদেরকে খয়রাত দিন। আল্লাহ দানশীলকে পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

(এ কথা শুনে ইউসুফ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।) তিনি বললেন, তোমরা যখন জাহিল ছিলে তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কেমন (আচরণ) করেছিলে, তা কি মনে আছে? তারা চমকিত হয়ে বলে উঠল, হায় তুমিই কি ইউসুফ? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন। আসল কথা হলো, কেউ যদি তাকওয়ার জীবনযাপন করে এবং সবর করে তাহলে এমন নেক লোকদের পুরস্কার আল্লাহ কখনো নষ্ট করেন না। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। আর সত্যি আমরা দোষী ছিলাম। ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের কোনো অপরাধ ধরা হবে না। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সবচেয়ে বেশি মেহেরবান। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার আব্বার চোহারার উপর রাখ। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। -সূরা ইউসুফ : ৮৮-৯৩

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর কাছে তাঁর ভাইদের পুনঃগমনের কথা উল্লেখ করেছেন যে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা পুনরায় তাঁর কাছে মিশরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাদের জন্য খাদশস্য বরাদ্দের এবং বিন-ইয়ামীনকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানান। তারা যখন ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হলো, তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি। অর্থাৎ এ বছর দুর্ভিক্ষের ফলে আমরা ক্ষুধার্ত ও অনাহারে দিনাতিপাত করছি। আর আমাদের পরিবারের লোক সংখ্যাও খুব বেশি। যাতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। আমরা খাদ্যশস্যের জন্য নগণ্য কিছু পণ্য নিয়ে এসেছি। যা গ্রহণ করার মতো নয়। কথিত আছে, মূলতঃ তা অল্প পরিমাণ দিরহাম ছিল। এক বর্ণনা মতে, তা ছিল খুরমা ও বনফুল ইত্যাদি।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, সেগুলো ছিল পুরানা কিছু মাল। যেমন রশি ইত্যাদি। তারা ইউসুফ (আ)-কে বলল, "আপনি আমাদের বরাদ্দ বেশি করে দিন এবং আমাদেরকে সদকা (দান) করুন। আল্লাহ দানকারীদেরকে পুরস্কৃত করেন।"

এখানে "সদকা" দ্বারা এক বর্ণনা মতে তাদের নগন্য বস্তু গ্রহণ করে পূর্ণমাত্রায় বরাদ্দ দেয়া বুঝানো হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে, বিন-ইয়ামীনকে ফিরিয়ে দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে যোবায়ের (রহ) এ মতকে সমর্থন করেছেন। আবু সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর জন্য সদকা গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছিল। ইবনে জারীর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ) যখন জানতে পারলেন যে, ভাইদের কাছে তাঁদের কাছে পথ খরচ ব্যতীত আর কিছুই নেই, তখন তাঁর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি ভাইদের কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন এবং বললেন, "তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ।" এ কথা শুনে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এর পূর্বে তারা যখন মিশরে এসেছিল, তখন তো ইউসুফ (আ)-কে চিনতে পারছিল না। তাই আশ্চর্য হয়ে "তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, হ্যাঁ আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর ভাই।" অর্থাৎ ইউসুফ (আ) বলেছিলেন আমিই সেই ইউসুফ যার সাথে তোমরা এরূপ ব্যবহার করেছিলে। আর "এ আমার ভাই"। ইউসুফ (আ)-এর এ কথাটির মধ্যে তাকীদ ছিল। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বুঝালেন যে, আমার প্রতি তোমরা জুলুম করেছিলে এবং তোমরা ধারনা করেছিলে যে আমি পৃথিবী থেকে শেষ হয়েছি, আর আমার ভাই বিন-ইয়ামীনের প্রতিও তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতে। আজ আমরা সেই দু'জন তোমাদের সামনে হাজির। এ কারণে ইউসুফ (আ) বলেছিলেন যে, "আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন"। অর্থাৎ আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। আমাদেরকে উত্তম জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন। এ সব কিছু লাভের একমাত্র কারণ, পালনকর্তার প্রতি আমাদের অনুগত্যতা, আমাদের ধৈর্যশীলতা ও আমাদের প্রতি পিতার আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা এবং তাঁর দো'আ।

"যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ সেরূপ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। তখন তারা (ভাইয়েরা) বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ আপনাকে

যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন তা আমাদেরকে দেন নি। "নিশ্চয়ই আমরা অন্যায়কারী ছিলাম।" অর্থাৎ আমরা তোমার সাথে মহা অন্যায় করেছি। সুতরাং আজ আমরা অপরাধী হিসেবে তোমার সামনেই উপস্থিত। তুমি এখন আমাদের থেকে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার। ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।" অর্থাৎ তোমরা আমার প্রতি যে অন্যায় করেছ, তার প্রতিশোধ আজ আমি তোমাদের থেকে নেব না। এরপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"

ইউসুফ (আ) বলেন, لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ "আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই।"

তারপর ইউসুফ (আ) তাদেরকে বললেন যে, আমার নিজের ব্যবহৃত জামাটি আমার পিতার কাছে নিয়ে যাও। এতে তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। এটা ছিল নবীগণের একটি মু'জিযা। অতঃপর তিনি ভাইদেরকে পরিবার-পরিজনসহ মিশরে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। যে শহরটি ছিল অত্যন্ত বরকতময়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنَ ۞ قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ۞ فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ۞ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۞

অর্থ : যখন এ কাফেলা (মিসর থেকে) রওয়ানা হলো তখন তাদের পিতা (নিজের বাড়িতে) বলে উঠলেন, আমি ইউসুফের খোশবু পাচ্ছি। তোমরা এ কথা মনে করো না যে, আমি (বুড়ো হওয়ায়) দিশেহারা হয়ে পড়েছি। বাড়ির লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি এখনো আপনার পুরনো ভুলের মধ্যেই পড়ে আছেন। যখন সুখবরদাতা এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারায় লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের বলি নি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না? সবাই বলে উঠল, আব্বা! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দো'আ করুন। আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম। পিতা বললেন, শিগ্‌গিরই আমি আমার রবের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। –সূরা ইউসুফ : ৯৪–৯৮

আব্দুল্লাহ ইবনে ফোযায়েল (রা) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) এর কাছে শুনেছি, তিনি وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ। [যখন যাত্রীদল (মিশর থেকে) বের হয়ে পড়ল] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "যখন যাত্রীদল মিশর থেকে যাত্রা করে, তখন তাদের পৌছার পূর্বেই এক প্রবলবেগী বায়ু ইউসুফ (আ)-এর জামার ঘ্রাণ ইয়াকূব (আ)-এর কাছে পৌছে দেয়। যে প্রেক্ষিতে ইয়াকূব (আ) বলেছিলেন, "আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। যদি আমাকে অস্বাভাবিক মনে না কর।" । এ ঘ্রাণ তিনি তিন দিনের পথের দূরত্ব থেকে পেয়েছিলেন। সাওরী ও শু'বা (রহ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইবনে আব্বাস (রা), আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে যোবায়ের ও কাতাদাহ (রা) বলেছেন, " তোমরা যদি আমাকে অস্বাভাবিক মনে না কর! এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা যদি আমাকে নির্বোধ না বল। ইবনে মাসউদ (রা) ইবরাহীম তায়মী, আমর ইবনে কায়েস, ইবনে জুরায়য (রহ) বলেছেন, ইয়াকূব (আ) পুত্রদেরকে এ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। ইবনে জারীর মুহারিব ইবনে দিনার (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত ওমর (রা) মসজিদে (নববীতে) উপস্থিত হয়ে কোনো এক ব্যক্তিকে এভাবে দো'আ করতে শুনতে পান যে, "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ডাক

দিয়েছেন, আমি সে ডাকে সাড়া দিয়েছি। আপনি আমাকে আদেশ করেছেন, আমি তা মেনে চলেছি। এখন সাহরীর সময় (অর্থাৎ রাতের শেষভাগ) সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" হযরত ওমর (রা) খুব খেয়াল করে বুঝতে পারলেন যে, এ আওয়াজ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর ঘর থেকে আসছে। তখন ওমর (রা) হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে সাহরীর সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যে, আমি তখন (সাহরীর সময়) তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি পুত্রদেরকে বলেছিলেন, "আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে আমার রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।" আল্লাহ তা'আলা নিজেও নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করে বলেছেন যে, "তাঁরা সাহরীর সময় (অর্থাৎ রাতের শেষভাগে উঠে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদের কাছে জুমুআর রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলেছিলেন। (অর্থাৎ পুত্রদেরকে বলেছিলেন যে, জুমুআর রাতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।)

তাফসীরে ইবনে জারীরে বর্ণিত আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এ কথাটি উল্লেখ করেন যে, "আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে আমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।" তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ কথা দ্বারা ইয়াকূব (আ) জুমুআর রাতকে বুঝিয়েছিলেন। এ কথা আমার ভাই ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন। কিন্তু এ হাদীসটি এ সনদের দিক দিয়ে গরীব। এটি মারফূ হাদীস হওয়া প্রসঙ্গেও মতভেদ আছে। এ হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিজের থেকেই বর্ণিত, এটা বলাই উপযোগী। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۞ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۡ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۗ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۔

অর্থ : তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি তাঁর পিতামাতাকে তাঁর সাথে বসালেন এবং পরিবারের সবাইকে বললেন, এখন শহরে চলুন। ইনশা-আল্লাহ সেখানে সবাই নিরাপদে থাকবেন। (শহরে যাওয়ার পর) ইউসুফ তাঁর পিতামাতাকে উঠিয়ে (তাঁর পাশে) সিংহাসনে বসালেন এবং সবাই তাঁর দিকে সিজদায় ঝুঁকে গেল।[১] ইউসুফ বললেন, হে আব্বা! আমি আগে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম, এটা তারই তাবীর (ব্যাখ্যা)। আমার রব এটাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আর এটা তাঁর মেহেরবানী যে, আমাকে জেল থেকে বের করলেন এবং আপনাদেরকে মরুভূমি থেকে এনে আমার সাথে মিলিত করেছেন। অথচ শয়তান আমি ও আমার ভাইদের মধ্যে

১. এই 'সিজদা' শব্দ দ্বারা অনেক লোকের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি একে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে একদল তো বাদশাহ ও পীরদের প্রতি সম্মানজনক সিজদা করা জায়েয প্রমাণ করতে চায়। কেউ কেউ এ দোষ থেকে বাঁচার জন্যে এরূপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হন যে, আগের শরীঅতে শুধু ইবাদাতে সিজদা গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যের) জন্য হারাম ছিল; কিন্তু ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্যকে সিজদা করা জায়েয ছিল। অবশ্য শরীঅতে মুহাম্মাদীতে গায়রুল্লাহর উদ্দেশে সকল রকম সিজদাই হারাম করে দেওয়া হয়েছে। 'সিজদা' শব্দকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষায় হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে লাগিয়ে সিজদা করার অর্থে বোঝার কারণেই যত ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু 'সিজদা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'নত হওয়া' আর এখানে শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে।

বিরোধ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই আমার রব যা করতে চান তা সূক্ষ্ম উপায়ে করে থাকেন। অবশ্যই তিনি সবকিছু জানেন ও মহাকুশলী। হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়েছ আমাকে সব বিষয়ের মর্মকথা শিক্ষা দিয়েছ। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম অবস্থায় মউত দাও এবং পরিণামে আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত কর। –সূরা ইউসুফ : ৯৯–১০১

এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ)-এর মধ্যকার দীর্ঘ সময়ের বিচ্ছেদের পর পুনঃমিলনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ বিচ্ছেদের সময়সীমার ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো মতে এ বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল আশি বছর। এক বর্ণনামতে ৮৩ বছর। এ দুটি মতই হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত আছে। আর কাতাদাহ (রা)-এর বর্ণনা মতে, এ বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল ৩৫ বছর। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, কিছু সংখ্যক লোকের বর্ণনানুযায়ী বিচ্ছিন্নতার সময়কাল ছিল ১৮ বছর। আহলে কিতাবদের ধারণায় এ বিচ্ছিন্নতার প্রকৃত সময়কালটি অনুমান করা যায়। যেমন, যুলায়খা যখন ইউসুফ (আ)-কে অসৎ উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছিল, তখন অনেকের মতে ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল শুধু ১৭ বছর। এরপর ৯ বছর জেলখানায় থাকেন। ইকরামা (রহ) প্রমুখের মতে জেলখানায় থাকেন ৭ বছর। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে প্রথম ৭ বছর ছিল প্রাচুর্যের বছর। এরপর ৭ বছর ছিল দুর্ভিক্ষের বছর। এ সময় ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর কাছে খাদ্য নেয়ার জন্য আসে। তারা প্রথমবার এসেছিল বিন-ইয়ামীন ছাড়া। দ্বিতীয়বার আসে বিন-ইয়ামীনকে সাথে করে আসে। তৃতীয় বছর ইউসুফ (আ)-এর সাথে তাদের পরিচয় ঘটে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে সকল পরিবার-পরিজন মিশরে আনার জন্য বলেন। তারা সবাই মিশরে ইউসুফ (আ)-এর সামনে সম্মিলিত হন। এ সময় পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে হাজির হলো, তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করে।" অর্থাৎ ইউসুফ (আ) শুধুমাত্র তাঁর পিতা-মাতাকেই একান্তে সমবেত করে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

"এবং বলল, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।" কেউ কেউ বলেছেন, প্রথমতঃ ইউসুফ (আ) তাঁর পিতা-মাতাকে মিশরে প্রবেশের জন্যে বলেন, তারপর তাঁদের সাথে একান্তে আলিঙ্গন করেন। কিন্তু এই মতটিকে ইবনে জারীর (রহ) দুর্বল বলেছেন। আর এক বর্ণনা মতে, প্রথমে ইউসুফ (আ)-এর সাথে তাঁর পিতা-মাতার পথে সাক্ষাৎ হয় ও তাঁদেরকে তিনি তাবুতে রাখেন। অতঃপর যখন তারা মিশরের প্রবেশদ্বারে এসে পৌছেন, তখন ইউসুফ (আ) তাদেরকে বলেছেন যে, "আপনারা মিশরে প্রবেশ করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনারা নিরাপদে থাকবেন।" সুদ্দী (রহ)-এরও এ অভিমত। তবে যদি ادخلو مصر (মিশরে প্রবেশ করুন) এর অর্থ, ...اسكنوا (মিশরে বসবাস করুন) কিংবা .....اقيموا (মিশরে অবস্থান করুন) করা হয়, তবে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় না। ব্যাখ্যাটি খুবই বিশুদ্ধ ও যথাযথ হয়।

আহলে কিতাবদের মতে, ইয়াকূব (আ) যখন জাশির (বিলবীস) জনপদের নিকটে পৌছেন, তখন ইউসুফ (আ) তাঁকে সংবর্ধনা জানানো জন্য সেখানে আসেন। ইয়াকূব (আ) প্রথমে তাঁর আগমন বার্তা নিয়ে তাঁর পুত্র ইয়াহুযাকে ইউসুফ (আ)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আহলে কিতাবগণ এ কথাও বলেছেন যে, মিশরের বাদশাহ ইয়াকূব (আ)-এর জন্য জাশির এলাকাটি দান করেন। ইয়াকূব (আ) তাঁর পরিবার-পরিজন ও গৃহপালিত পশু এবং যাবতীয় আসবাবপত্র নিয়ে সেখানে অবস্থান করেন। কোন কোন মুফাসসির বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর আগমনের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহ ও তাঁর সৈন্য বাহিনীসহ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। হযরত ইয়াকূব (আ) বাদশাহর জন্যে দো'আও করেছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর আগমনের বরকতে আল্লাহ তা'আলা মিশরবাসীর উপর থেকে বাকি দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করে দেন এবং ফসলের প্রাচুর্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আবূ ইসহাক সাবিঈ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সাথে তাঁর সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা মিশরে আসেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৬৩। মূসা ইবনে উবায়দা (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। আবূ ইসহাক, মাসরূক (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরা যখন মিশরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৯৩ জন। আহলে কিতাবগণ বলেছেন যে, যখন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশদরগণ হযরত মূসা (আ)-এর সাথে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁদের মধ্যে শুধু যোদ্ধাই ছিল ছয় লাখ। আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তাঁরা মিশরে আগমন করেন, তখন ইয়াকূব (আ)-সহ তাঁরা সংখ্যায় ছিল সত্তর জন। এদের নামও তারা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসালেন।" কেউ কেউ বলেছেন, ইউসুফ (আ)-এর আপন মা ঐ সময় জীবিত ছিলেন না। তিনি এর পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাওরাতের পণ্ডিতগণের মতও এরূপ।

কয়েকজন মুফাসসির বলেছেন, আল্লাহ তাঁকে জীবিত রেখেছিলেন। অন্য একদল মুফাসসির বলেছেন, তাঁর খালা লাইয়্যা মায়ের স্থানে ছিল। খালা মায়ের সমান মর্যাদারই হয়ে থাকে। ইবনে জারীর (রহ) ও অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেন, কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ইউসুফ (আ)-এর আপন মা তখন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং কুরআন মাজীদের বিপরীত আহলে কিতাবদের অভিমত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটাই বিশুদ্ধ মত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁদেরকে তার পার্শে সিংহাসনে বসালেন এবং তারা (ভাইয়েরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। অর্থাৎ পিতা-মাতা ও এগার ভাই সিজদা করেন। এ সিজদা ছিল সম্মানসূচক সিজদা। এ সিজদা ইবাদতের জন্য নয়। এটা তাদের শরীঅতে এবং পরবর্তীতে বৈধ ছিল। পরে আমাদের শরীঅতে এটা অবৈধ (নাজায়েয) বলে ঘোষণা হয়েছে। যখন সিজদা হয়ে গেল, তখন ইউসুফ (আ) তাঁর পিতাকে বললেন, "হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বের স্বপ্নের তাৎপর্য।" অর্থাৎ শৈশবে যে স্বপ্নের কথা আমি আপনার কাছে বলেছিলাম, এটাই সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এখন সেটা পূর্ণ হয়েছে। সে স্বপ্নটি এরূপ ছিল যে, আমি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে আমাকে সিজদা করতে দেখেছি। অতঃপর আপনি আমার এ স্বপ্নটি গোপন করতে বলেছিলেন। (অর্থাৎ কারো কাছে বলতে নিষেধ করেছিলেন।) এরপর বললেন, "আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন ও আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেননা, তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন।" অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট থেকে আমাকে শুধু মুক্তই করেন নি। বরং তিনি আমাকে মিশরের গভর্নর বানিয়েছেন এবং এমন ক্ষমতার অধিকারী করে দিয়েছেন যে, আপনাকে মরুভূমি থেকে এখানে এনে দিয়েছেন। অর্থাৎ মরু অঞ্চল থেকে তিনি (আল্লাহ) আপনাদেরকে মিশরে আগমন করিয়েছেন।

ইয়াকূব (আ) পরিবার-পরিজনসহ কিনআনে বাস করতেন। অতঃপর ইউসুফ (আ) বলেছেন, "(এসব কিছু হয়েছে) শয়তান আমার ও ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পর।" অর্থাৎ কূপে নিক্ষেপের ঘটনা। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তারপর বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা নিপুণতার সাথেই সম্পন্ন করেন।" অর্থাৎ যখন তিনি (আল্লাহ) কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থাও করে দেন। তিনি এমন সুন্দর ও সহজভাবে এর সুব্যবস্থা করেন, যা বান্দা ভাবতেও পারে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর ফয়সালা করেন। তাঁর কুদরতে সবকিছুই সহজে বাস্তবায়ন হয়ে যায়। তিনি (সব বিষয়েই) সর্বজ্ঞ এবং তাকদীর নির্ধারণে ও পরিকল্পনা গ্রহণে মহাজ্ঞানী।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর শানস ব্যবস্থা

এ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাঁর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে মিশরবাসীরা দুর্ভিক্ষের বছরে হযরত ইউসুফ (আ) থেকে খাদ্য-শস্য ইত্যাদি ক্রয় করার জন্য তাদের যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করেছিল।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, প্রথমে হযরত ইউসুফ (আ) মিশরবাসী ও অন্যান্য শহরবাসীর কাছে বিভিন্ন আসবাবপত্রের পরিবর্তে খাদ্য বিক্রি করেন। যেমন স্বর্ণ, রোপ্য, যমীন ও অন্যান্য আসবাবপত্র। মোটকথা, তাদের কাছে যাকিছু ছিল সবকিছুর পরিবর্তে তারা তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। যখন তাদের কাছে খাদ্য ক্রয়ের মতো আর কোনো আসবাবপত্র রইল না, তখন তারা নিজ জীবনের পরিবর্তেও হযরত ইউসুফ (আ) থেকে খাদ্য ক্রয় করে তাঁর দাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদের প্রতি উদারতা ও দয়া প্রদর্শন করে, তাদের যমীন তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং খাদ্যের পরিবর্তে যারা নিজেদেরকে তাঁর কাছে বিক্রি করেছিলেন তাদেরকেও তিনি এ শর্তে আজাদ করে দিলেন যে, যা কিছু তারা উৎপন্ন করবে, তার এক পঞ্চমাংশ মিশরের রাষ্ট্রীয় ধন ভাণ্ডারের (রাজস্ব হিসেবে) জমা দেবে। এরপর থেকেই মিশরে এ প্রথা জারি হয়ে যায়। মিশরবাসী তাদের উৎপন্নের এক পঞ্চমাংশ ধনভাণ্ডারে জমা দিতে থাকে। সালাবী (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) এ দুর্ভিক্ষের বছরে নিজে পেট ভরে আহার করতেন না। কেননা, পেট ভরে আহার করার ফলে হয়তো ক্ষুধার্তদের কথা ভুলে যেতে পারেন। তিনি সারা দিনে শুধু দুপুরে একবার খানা খেতেন। সে খানাও হতো খুব হালকা। ঐ সময়ে অন্যান্য সকল দেশের বাদশাহগণও তাঁর অনুকরণ করেছিলেন। (অর্থাৎ তাঁরাও অনুরূপ করতেন।)

এ প্রসঙ্গে আমি (লেখক) সম্মানিত এক সাহাবীর কথা বর্ণনা করছি। তা হচ্ছে এই যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা)-ও তাঁর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের সময় ততক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরে আহার করেন নি, যতক্ষণে দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে প্রাচুর্যতা ফিরে না আসছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ) বলেছেন, দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে আরয করেন যে, আপনার থেকে দুর্ভিক্ষের কষ্ট দূরীভূত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আপনি একজন বীর বাহাদুর হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর দো'আ

এরপর হযরত ইউসুফ (আ) দেখলেন যে, তাঁর প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর পরিবারের সকল লোকজন তাঁর কাছে এসে মিলিত হয়েছেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ পৃথিবী তার জন্য স্থায়ী বসবাসের জায়গা নয়। এখানে যা কিছু সবকিছুই ধ্বংসশীল। সব বস্তুই তার পরিপূর্ণতার পরে আস্তে আস্তে বিনাশ হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসায় মাশগুল হয়ে যান এবং তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করতে থাকেন। ইউসুফ (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সর্বোত্তম দো'আ করেন, "হে আমার রব! আমাকে ইসলামের উপর (মুসলমানের অবস্থায়) মৃত্যু দান করুন এবং নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।" যেমন অন্যান্য নেক বান্দাগণ দো'আ করে থাকেন যে—

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে মুসলমান অবস্থায় জীবিত রাখুন এবং আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দান করুন।

অনেকের মতে, হযরত ইউসুফ (আ) উক্ত দো'আটি ওফাতের পূর্বমুহূর্তে করেছিলেন। যেমন– রাসূলুল্লাহ ﷺ ওফাতের সময় দো'আ করেছিলেন যে, তাঁর পবিত্র রূহ ঊর্ধ্ব জগতে উঠিয়ে নিতে এবং নবী রাসূলদের সাথে মিলন ঘটাতে। তিনি ﷺ এরূপ দো'আ করেছিলেন যে, "হে আল্লাহ! সর্বোচ্চ বন্ধু" এ দোআটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছিলেন। এর পরেই তাঁর রূহ মোবারক ঊর্ধ্বজগতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দীদারে চলে যায়।

কারো মতে, ইউসুফ (আ) এ দো'আটি তাঁর শারীরিক সুস্থতার সময় করেছিলেন। এমন মৃত্যু কামনা করে দোআ তাঁর শরীঅতেই বৈধ ছিল। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ

(আ)-এর পূর্বে আর কেউই এরূপ মৃত্যু কামনা করেন নি। আমাদের শরীঅতে (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর শরী'আতে) মৃত্যুর কামনা করা ও মৃত্যুর জন্য দো'আ করা নিষেধ। তবে যদি ফিতনা-ফাসাদের আশঙ্কা থাকে এবং সবদিক থেকে অক্ষম হয়ে পড়ে, তবে এরূপ দো'আ করবেন যে, "হে আল্লাহ! আমার জন্যে যদি মৃত্যু শ্রেয় হয়, তবে আপনি আমাকে আপনার কাছে উঠিয়ে নিন।"

যেমন ইমাম আহমদ (রহ) হযরত মাআয (রা)-এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এরূপ দো'আ করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি কোনো জাতিকে পরীক্ষায় ফেলতে চান, তখন আমাকে সেই পরীক্ষায় শাস্তিতে না ফেলে আপনার কাছে উঠিয়ে নিয়ে যান।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "হে আদম সন্তান! ফিতনায় পতিত হওয়ার চাইতে মৃত্যু উত্তম।"

হযরত মারইয়াম (আ)-ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় লোকদের উপহাসমূলক কথা শুনে মনের কষ্টে বলেছিলেন, "হায়! আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হতাম।"

–সূরা মারইয়াম : ২৩

হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)-ও মৃত্যুর জন্যে দো'আ করেছিলেন। তবে তিনি এ মৃত্যুর জন্যে দো'আ তখন করেছিলেন, যখন দেশে ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচর শুরু হয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে, হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার চর্চা হতে থাকে। ইমামুল মুহাদ্দিছীন জনাব হযরত ইমাম বুখারী (রহ)-ও মৃত্যু কামনা করেছিলেন, যখন তিনি তাঁর বিরোধীদের পক্ষ থেকে কঠিন মসিবতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং সাময়িক অস্থিরতায় ভুগছিলেন। ফেতনা-ফাসাদ চরম পর্যায়ে পৌছে এভাবে মৃত্যু কামনা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থায় এরূপ মৃত্যু কামনা করা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহ) তাদের সহীহ গ্রন্থে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর একখানা হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কেউ বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা কর না। কেননা, তোমরা যদি (বিপদে ধৈর্যধারণ করে) নেককার হও, তবে তোমাদের ছওয়াব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর যদি পাপী হও, তবে এতে তোমাদের পাপ মোচন হবে।" যদি দো'আ করতেই হয়, তবে এভাবে কর, "হে আল্লাহ! পৃথিবীতে বেঁচে থাকা আমার জন্য যতদিন মঙ্গলজনক হবে, ততদিন আমাকে জীবিত রাখ। আর মৃত্যু যখন আমার জন্য মঙ্গলজনক হবে, তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।"

উল্লিখিত হাদীসে যে মসীবতগ্রস্ত হওয়ার কারণে মৃত্যু কামনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, সেই মসীবত বলতে মানুষের শারীরিক রোগ বা অসুস্থতাকে বুঝানো হয়েছে। যা সহ্য করা মানুষের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর দ্বারা ধর্মীয় ব্যাপারে যে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়, তা বুঝানো হয় নি। "বরং এ ধরনের ফিতনা-ফাসাদ দূর করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এবং এর থেকে বেঁচে থাকতে হবে।"

এ কথাটি স্পষ্ট যে, হযরত ইউসুফ (আ)-ও মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় উল্লিখিত দো'আ করেছিলেন। তাঁর দো'আটি এরূপ ছিল যে, হে আল্লাহ! যখন মৃত্যুর সময় এসে যাবে, তখন আমার এ দো'আটি কবুল করুন।

ইবনে ইসহাক (রহ) আহলে কিতাবদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে মিশরে সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। ওফাতের সময় তিনি ইউসুফ (আ)-কে ওসিয়ত করে গিয়েছেলেন যে, তাঁকে যেন তাঁর পিতা ইসহাক (আ) ও দাদা ইবরহীম (আ)-এর কাছে দাফন করা হয়। সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ) পিতার এ ওসিয়ত পূর্ণ করেন। তাঁর দেহ মোবারক সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে তাঁর দাদা ও পিতার কাছে দাফন করা হয়।

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বয়স মিশরে প্রবেশের সময় ছিল ১৩০ বছর। এরপর মিশরে সত্তর বছর বসবাস করেন। এতদসত্ত্বেও তারা বলেছেন, ইয়াকূব (আ)-এর বয়স ছিল ১৪০ বছর। এ কথা তাদের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। সুতরাং তারা তাদের কিতাবে কিছু পরিবর্তন করেছে বা এটা তাদের ভ্রান্তমত বা তারা সম্পূর্ণ বয়সের হিসেবে করতে গিয়ে চল্লিশের উপরের খুচরা বয়স বাদ দিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বেলায় তারা খুচরা হিসেবে বাদ দেয় না, এখানে খুচরা বয়স বাদ দেয়াটা সঠিক হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿

অর্থ : তোমরা কি ঐ সময় হাজির ছিলে, যখন ইয়াকূব দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছিলেন? তিনি মৃত্যুর সময় তার সন্তানদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?' তারা সবাই জবাব দিলো, আমরা ঐ এক আল্লাহ দাসত্ব করব, যাকে আপনি ও আপনার পূর্ব-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক মা'বূদ মেনে গেছেন। আমরা তাঁরই অনুগত আছি। –সূরা বাকারা : ১৩৩

হযরত ইয়াকূব (আ) আপন সন্তানদেরকে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও এখলাস (একনিষ্ঠতার) ওসিয়ত করেছেন। তাদের ভবিষ্যত অবস্থা কেমন হবে তাও তাদেরকে অবগত করেন। পুত্র ইয়াহুযাকে সুসংবাদ দেন যে, তোমার বংশ থেকে এক মহান নবীর আগমন ঘটবে। তিনি হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ)। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, যখন হযরত ইয়াকূব (আ) ইন্তেকাল করেন, তখন সমস্ত মিশরবাসীরা সত্তর দিন পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। হযরত ইউসুফ (আ) চিকিৎসকগণকে তাঁর পিতার পবিত্র দেহে সুগন্ধি ও ঔষধ লাগিয়ে তা সংরক্ষণ করে রাখার আদেশ দেন। এভাবে করে চল্লিশ দিন তাঁর মৃতদেহ দাফনহীন অবস্থায় রাখা হয়। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর অনুমতি নিয়ে তাঁর পিতাকে পিতৃপুরুষের কাছে দাফন করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ সময় ইউসুফ (আ)-এর সাথে মিশরের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও ছিলেন। হিবরূন এলাকায় পৌঁছে যেখানে তাঁকে দাফন করা হয় সে স্থানটি ইবরাহীম (আ) আফরূন ইবনে সাখার হায়সী থেকে ক্রয় করেছিলেন। এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। পিতার দাফন শেষে ইউসুফ (আ) সবাইকে নিয়ে সেখানে সাতদিন অবস্থান করেন। অতঃপর স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা পিতার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েন এবং ভাই ইউসুফ (আ)-কে অত্যধিক মহব্বত করতে শুরু করেন। হযরত ইউসুফ (আ)-ও তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা করেন। তারা সবাই মিশরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ওসিয়ত

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ইন্তেকালের সময় যখন এসে গেল, তখন তিনিও এই অন্তিমকালে ওসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁকে যেন তাঁর পিতার কাছে দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের পরে লোকেরা তাঁর মৃতদেহটি বের করে তাঁর পিতার কাছে দাফন করার ব্যবস্থা করেন। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন ইউসুফ (আ)-এর বয়স হয়েছিল ১১০ বছর। তাদের কিতাবে আমি (লেখক) এরূপই লেখা দেখেছি। ইবনে জারীর (রহ) মুবারক ইবনে ফুযালার বক্তব্য হাসান (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে ফেলা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর। এরপর তিনি তাঁর পিতার থেকে ৮০ বছর অনুপস্থিত ছিলেন। পিতা পুত্রের সাক্ষাতের পরে ইউসুফ (আ) ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এ হিসেব মতে তাঁর ওফাতের সময় বয়স হয়েছিল ১২০ বছর। অনেকের মতে, ইউসুফ (আ) তাঁর ভাই ইয়াহুযাকে ওসিয়ত করে যান।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা

ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) ছিলেন রোমের অধিবাসী। তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ– আইয়ূব ইবনে মাওস ইবনে যারাহ ইবনে আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আল খলীল। এছাড়া অনেকের মতে তাঁর বংশ পরম্পরা এরূপ—

আইয়ূব ইবনে অমাওস ইবনে রাবীল ইবনে আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াকূব। এভাবেও আরো অন্যভাবে বংশ পরম্পরা বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে আসাকির (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আইয়ূব (আ)-এর পিতা সেই ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দিন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। উল্লিখিত বংশ তালিকার মধ্যে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। কারণ, হযরত আইয়ূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

যেমন কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۔

অর্থ : পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। আর তার (ইবরাহীমের) বংশধর দাউদ, সোলায়মান ও আইয়ূব, মূসা ও হারূনকেও। -সূরা আনআম : ৮৪

উল্লেখিত আয়াতে তাঁর বংশধর বলতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর বুঝানো আছে। এখানে হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর বুঝানো হয় নি। আর এটাই দলীল যে, হযরত আইয়ূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনস্তন বংশধর। আর প্রথম বংশ তালিকায়ও এরূপ বর্ণিত আছে। হযরত আইয়ূব (আ) সে সব নবীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের নিকট ওহী প্রেরণ করা আছে। যেমন, সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে—

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۔

অর্থ : (হে রাসূল!) আমি আপনার উপর তেমনিভাবে ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তীদের উপর ওহী পাঠিয়েছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের উপর পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব, ইয়াকূবের সন্তানগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের নিকট ওহী পাঠিয়েছি। -সূরা নিসা : ১৬৩

সুতরাং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে এটাই বুঝা যায় যে, হযরত আইয়ূব (আ) হযরত আয়স ইবনে ইসহাকের বংশধর। তাঁর স্ত্রীর নাম এক বর্ণনা মতে লাইয়্যা বিনতে ইয়াকূব (আ)। অপর এক বর্ণনা মতে, রহমান বিনতে আফরাইম। কেউ বলেছেন, তার স্ত্রীর নাম মানসা বিনতে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ)। এ মতটিই খুব প্রসিদ্ধ। হযরত আইয়্যূব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পরে আমরা বনী ইসরাঈলের নবীগণের ঘটনা বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ۞

অর্থ : (এ একই হুকুম ও ইলমের নিয়ামত) আমি আইয়ূবকেও দিয়েছিলাম। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, আমাকে তো রোগ আক্রমণ করেছে, আর তুমি তো সবচেয়ে বড় মেহেরবান। আমি তার দো'আ কবুল

করলাম। রোগের কারণে যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তাকে তার পরিবার-পরিজন তো দিলামই, আমার খাস রহমত থেকে তার পরিবারের সমান সংখ্যায় আরো দিলাম, যাতে ইবাদতকারীদের জন্য এটি একটি শিক্ষা হয়ে থাকে। –সূরা আম্বিয়া : ৮৩-৮৪

সূরা সোয়াদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ ۘ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ۞ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ۞

অর্থ : (হে নবী!) আমার বান্দাহ আইয়ূবের কথা স্মরণ করুন। যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন, শয়তান আমাকে খুব কষ্ট ও আযাবের মধ্যে ফেলেছে।[১] (আমি তাকে হুকুম দিলাম) আপনার পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করুন। এ হলো ঠাণ্ডা পানি, গোসল করার জন্য ও আহারের জন্য। আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং সেই সাথে আমার পক্ষ থেকে রহমত হিসেবে এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ হিসেবে ঐ পরিমাণ আরো দিলাম। আমি তাকে বললাম, শুকনো ঘাসের একটা আঁটি হাতে নিন এবং তা দিয়েই মারুন। আপনার কসম[২] ভাঙবেন না। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি। অত্যন্ত ভালো বান্দাহ। নিশ্চয়ই তিনি তার রবের দিকে রুজু আছেন। –সূরা সোয়াদ : ৪১-৪৪

ইবনে আসাকির (রহ) কালবী (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী হলেন হযরত ইদরীস (আ)। অতঃপর নূহ (আ), অতঃপর ইবরাহীম (আ), অতঃপর ইসমাঈল (আ), এরপর ইসহাক (আ), এরপর সালেহ (আ), এরপর শোআইব (আ), এরপর মূসা (আ) ও হারূন (আ), এরপর ইলিয়াস (আ), তারপর আল-ইয়াসায়া (আ), এরপর উরফী ইবনে সুওয়ায়লিখ ইবনে আফরাইম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ)। অতঃপর ইউনুস (আ) ইবনে মাত্তা, যিনি ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর। এরপর আইয়ূব ইবনে যারাহ ইবনে আমূস ইবনে লায়ফারাম ইবনুল আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)। তবে তাঁর বর্ণিত এ ধারাবাহিকতার বিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, এ কথাটি ব্যাপক প্রসার যে, হযরত হূদ (আ) ও সালেহ (আ)-এর আগমন হযরত নূহ (আ)-এর পরে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে হয়েছিল।

(কারো মতে, হযরত লূত (আ) হযরত ইউসুফ (আ) ও ইয়াকূব (আ) ও ইসহাক (আ)-এর পূর্বে আগমন করেছিলেন। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে যখন ফেরেশতারা লূত (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের বার্তা নিয়ে আসলেন তখন তারা হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুখবরও তাঁকে জানিয়েছিলেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত লূত (আ) হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের পূর্বেই নবী ছিলেন। বরং সম্ভবতঃ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পূর্বেও তিনি নবী ছিলেন।)

১. *এর অর্থ এই নয় যে, শয়তান আমাকে রোগী বানিয়ে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসীবত নাযিল করেছে; বরং এর সঠিক মর্ম হলো 'রোগের যন্ত্রণা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের আচরণে আমি যে দুঃখ ও কষ্ট পেয়েছি তার চেয়েও বেশি দুঃখ এ কারণে বোধ করছি যে, শয়তান কুপরামর্শ দিয়ে আমাকে বিরক্ত করছে। এ অবস্থায় সে আমাকে আমার রব থেকে হতাশ করার জন্যে চেষ্টা করছে, আমাকে আমার রবের প্রতি না-শোকর বানাতে চাচ্ছে এবং আমি যাতে আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় সবর না করি সেজন্য সব রকম চেষ্টা করছে।*

২. *এ শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, অসুস্থ অবস্থায় হযরত আইয়ূব (আ) অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে মারবেন বলে শপথ করেছিলেন (স্ত্রীকে মারবেন বলে শপথ করার কথা বলা হয়)। এ শপথে তিনি কতবার বেত মারবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় যে রোগের কারণে তিনি এ শপথ করেছিলেন সে রোগ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এ কথা ভেবে পেরেশান হলেন যে, যদি শপথ পালন করি তাহলে অনর্থক এক নির্দোষ মানুষকে মারতে হবে, আর যদি শপথ ভঙ্গ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই পেরেশানি থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে, যত বার বেত মারার শপথ তুমি করেছিলে। সেই ঝাড়ু দিয়ে ঐ লোককে মাত্র একবার মার। এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং ঐ লোককে অনর্থক কষ্টও দেওয়া হবে না।*

অভিজ্ঞ মুফাসসিরীন কেরাম ও ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) ছিলেন প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী। তাঁর বহু দাস এবং গৃহপালিত পশু ও চতুষ্পদ জন্তু ছিল। হাওরানের বুসায়না এলাকাটির কর্তৃত্ব ছিল তাঁরই হাতে। ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, গোটা এলাকার মালিকানা ছিল তাঁরই হস্তগত। পরিবার-পরিজনের সংখ্যাও ছিল অধিক। অতঃপর তাঁর থেকে এসবকিছুই নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা ছাড়া শরীরের সর্বাঙ্গে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এ দু'টি অঙ্গ হৃৎপিণ্ড ও জিহ্বা দ্বারা তিনি আল্লাহর যিকির করতে থাকতেন। এত বড় কঠিন রোগ ও বিপদে নিপতিত হওয়ার পরেও তিনি ধৈর্যশীল অবস্থায় দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকতেন। তাঁর রোগ খুব কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ফলে তাঁর প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। এমনকি তাঁকে তাঁর শহর থেকে বের করে শহরের বাইরে এক সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়। তাঁর সাথে লোকদের দেখা সাক্ষাৎ সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য আর কেউ এ কঠিন মুহূর্তে তাঁর পাশে ছিলেন না। স্ত্রী স্বামীর হক ও অতীতের অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখে এ কঠিন বিপদের সময় তাঁর খেদমতের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। তিনি (স্ত্রী) বারবার তাঁর কাছে এসে খবর নিতেন ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার সময় তাঁর সাহায্য করতেন। সর্বদা তাঁর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। অতঃপর স্ত্রীও বয়স বৃদ্ধি হওয়ার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং আর্থিক দিক দিয়েও দূরাবস্থায় পড়ে যান। এরপরও তিনি (স্ত্রী) মানুষের বাড়ি কাজ করে যা পেতেন, তা দ্বারা স্বামীর খেদমত করতেন এবং তাঁর যা কিছু প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতেন।

মোট কথা হযরত আইয়ূব (আ)-এর উপর আপতিত কঠিন মসীবতসমূহ তিনি (স্ত্রী) আন্তরিকভাবে শরীক থাকেন ও স্বামীর দুঃখ-কষ্ট ও মসীবতে তিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। স্বামীর এই কঠিন রোগের সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্বভার তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং স্বামীর খেদমতের জন্য তিনি তার ধন-দৌলত সবকিছু বিলীন করে দেন। অবশেষে যখন তিনি আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তিনি মানুষের বাড়িতে কাজ করে সেই পারিশ্রমিক দ্বারা স্বামীর খেদমত করতেন। অথচ এর পূর্বে তাঁরা ছিলেন প্রচুর ধন-দৌলত ও খুব সম্মান মর্যাদার অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন নবী (আ)-গণ। এরপর যাদেরগণ অর্থাৎ যারা নবী (আ)-গণের পূর্ণ অনুসারী এরপর স্তরভেদে তাঁদের অনুসারীগণ। তিনি ﷺ আরো বলেছেন, মানুষ তাঁর ধার্মিকতা অনুযায়ী পরীক্ষায় পতিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে যতখানী দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকে, তার পরীক্ষাও হয় অধিক কঠিন।

"মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবী (আ)-গণ।" হাদীস শরীফের এ বর্ণনার প্রেক্ষিতে হযরত আইয়ূব (আ) বিশেষভাবে এ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর এ ব্যাধি ও আর্থিক দৈন্যতাকে কঠিন বিপদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বনী ইসরাঈলের আলেমগণ থেকে- হযরত আইয়ূব (আ)-এর ধন-দৌলত ও পরিবার-পরিজন ইত্যাদি নিঃশেষ হওয়ার এবং রোগ-ব্যাধির ঘটনা বিস্তার বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর এই মসীবতের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত আছে। ওহাব (রহ) বলেন, তিনি পূর্ণ তিন বছর এ মসীবতগ্রস্ত অবস্থায় থাকেন। এর কমও নয় বেশিও নয়। হযরত আনাস (রা) বলেন, তাঁর মসীবতের স্থায়িত্বকাল ছিল কয়েক মাস। এ সময় তাঁকে বনী ইসরাঈলের একটি পরিত্যক্ত স্থানে ফেলে রাখা হয়। তাঁর শরীরের উপর কীট বিভিন্ন রকমের পোকা চলাচল করতো। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই কঠিন রোগ থেকে মুক্ত করে পূর্ণ সুস্থতা দান করেন। তাঁকে খুব পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর প্রশংসা করেন। হুমায়দ (রহ) বলেছেন, তাঁর এ পরীক্ষার স্থায়িত্বকাল ছিল আট বছর। সুদ্দী (রহ) বলেন, আইয়ূব (আ)-এর শরীর থেকে গোস্ত গলে খসে পড়ে গিয়েছিল, এমনকি হাড় ও শিরা ব্যতীত তাঁর শরীরে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর স্ত্রী তাঁর (স্বামীর)

ক্ষতবিক্ষত শরীরের নিচে ছাই বিছিয়ে দিতেন। যাতে তিনি একটু আরাম পান। স্ত্রী দীর্ঘদিন এভাবে খেদমত করার পর, একবার তিনি আইয়ূব (আ)-কে বললেন, আপনি যদি আপনার এ রোগ মুক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করতেন, তবে আল্লাহ আপনাকে এই কঠিন মসীবত থেকে মুক্তি দিতেন। হযরত আইয়্যূব (আ) স্ত্রীকে বিস্ময়কর জবাব দিলেন যে, "আমি (আল্লাহর মেহেরবানীতে) ৭০ বছর পর্যন্ত শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলাম। এখন (এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) আর কিছু না পারি অন্তত আরো ৭০ বছর পর্যন্ত আল্লাহর জন ধৈর্যধারণ করব।" এ কথা শুনে স্ত্রী চুপ হয়ে যান এবং স্বামীর খেদমতে মাশগুল থাকেন। হযরত আইয়্যূব (আ)-এর স্ত্রী মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন। তারপর এক সময় লোকেরা হযরত আইয়ূব (আ)-এর এ ধৈর্যশীলা স্ত্রীকে কাজে রাখা বাদ দিয়ে দিলেন। তাঁর থেকে কোনো কাজ নিতেন না। (অথচ এ কাজই ছিল তাঁর জীবনযাপনের মাধ্যম) হযরত আইয়্যূব (আ)-এর স্ত্রীকে সবাই যখন কাজ থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। তখন তিনি (স্ত্রী) আত্মোৎসর্গের এক মহা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তিনি মাথার চুলের দু'টি বেনীর একটি কেটে তা কোনো এক অভিজাত ব্যক্তির কন্যার কাছে উত্তম খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করেন। সে খাদ্য নিয়ে তিনি স্বামী আইয়ূব (আ)-এর কাছে আসেন ও তাঁকে আহার করান। আইয়ূব (আ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, এ খাদ্য কোথেকে এসেছে? কারণ, আইয়ূব (আ)-এর কাছে এটা আশ্চর্যজনক মনে হলো। স্ত্রী বললেন, মানুষের বাড়িতে কাজ করে এ খাদ্য সংগ্রহ করেছি। পরের দিনও তাঁকে কেউ কাজে না নেয়ার কারণে তিনি তাঁর দ্বিতীয় বেনীটিও খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে সে খাদ্য নিয়ে আইয়ূব (আ)-এর কাছে আসেন। এবারও আইয়ূব (আ)-এর কাছে এটা বিস্ময়কর মনে হলো।

তিনি স্ত্রীকে কসম দিয়ে বললেন যে, প্রথমে তুমি বল, এ খাদ্য কোথেকে তুমি সংগ্রহ করেছ? এরপর আমি আহার করব। তখন স্ত্রী তাঁর মাথার উপর থেকে আবরণ (চাদর) সরিয়ে তাঁর মুণ্ডিত মাথা স্বামীকে দেখান। স্ত্রীর এরূপ দৃশ্য দেখে হযরত আইয়ূব (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে দো'আ করেন—

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থ : আমাকে তো রোগ আক্রমণ করেছে, আর তুমি তো সবচেয়ে বড় মেহেরবান। –সূরা আম্বিয়া : ৮৩

ইবনে আবি হাতিম (রহ) বলেছেন, ওবায়েদ ইবনে উমায়র (রহ) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর দুই ভাই ছিল। একবার তারা তাঁর কাছে আসেন। কিন্তু আইয়ূব (আ)-এর শরীরের দুর্গন্ধের কারণে তাঁর নিকটে আসতে সক্ষম হলো না। তারা দু ভাই দূরে দাঁড়িয়ে একজন অন্যজনকে বলল, যদি আল্লাহ আইয়ূব (আ)-এর মধ্যে কোনো কল্যাণ আছে বলে জানতেন তবে এরূপ মসীবতে নিপতিত করতেন না। ভাইদের এই মন্তব্যে হযরত আইয়ূব (আ) এত কষ্ট ও দুঃখ পেয়েছিলেন যে, এমন কষ্ট আর কখনো তিনি পান নি। তিনি সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার যদি জানা থাকে যে, আমি এমন কোনো রাতে পেট পুরে আহার করি নি, যে রাতে আমার জানা মতে কোনো লোক ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেছে, তাহলে আমার সত্যতা জানিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে তাঁর সত্যতা জানিয়ে দিয়েছেন। আর তাঁর দু' ভাই তা শুনতেছিল। তারপর আইয়ূব (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনার যদি জানা থাকে যে, আমার কাছে কখনো দুটি জামা এমন অবস্থায় ছিল না, যখন আমি কোনো বস্ত্রহীন লোকের খবর পেয়েছি, তাহলে আমার সত্যতা জানিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে তাঁর সত্যতা জানিয়ে দিলেন। দুই ভাই তা শুনেছিল। তারপর আইয়্যূব (আ) বললেন, হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের কসম! এ কথা বলেই তিনি সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করেন। হে আল্লাহ! আপনার সম্মানের কসম! আমার এই কষ্ট দূর না করা পর্যন্ত আমি সিজদা থেকে মাথা উঠাবো না। তাঁর রোগ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাথা উঠান নি।

ইবনে জারীর ও ইবনে হাতিম (রহ) বলেছেন, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নবী আইয়ূব (আ)-এর উপর আঠার বছর পর্যন্ত এ কঠিন পরীক্ষা চলছিল। এ সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শুধু তাঁর দু ভাই সকাল-বিকাল তাঁর কাছে আগমন করত।

একদিন এক ভাই অপর ভাইকে বলল, তুমি কি জান! আল্লাহর কসম! সম্ভবত আইয়্যুব (আ) এমন কোনো পাপ করেছে যেরূপ পাপ পৃথিবীতে অন্য আর কেউ করেনি। অপর ভাই বলল, তা হলে সে পাপটি কী? দেখ, আঠার বছর পর্যন্ত সে এই কঠিন ব্যাধিতে ভুগছে, এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর প্রতি করুনা করেন নি। যদি তাঁর থেকে কোনো পাপ কাজই না হতো, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাকে রোগ মুক্ত করতেন। তারপর তারা দু' ভাই সন্ধ্যাবেলা আইয়্যুব (আ)-এর কাছে গেলেন। তখন সে ভাই কথাটি আর গোপন করতে পারল না। সে আইয়্যুব (আ)-এর কাছে তাঁর অপর ভাইয়ের এই মন্তব্যটি বলে দিল। এ কথা শ্রবণ করে আইয়্যুব (আ) বললেন, তুমি কি বলছ, তা আমি বুঝছি না। তবে আল্লাহ এ বিষয় ভালই জানেন। তবে, (একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। সেটা হলো এই যে,) একবার আমি দু ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম যে, তারা (দু ব্যক্তি) পরস্পরে ঝগড়া করছে এবং আল্লাহর পবিত্র নামও উচ্চারণ করছে। তারা যে আল্লাহর পবিত্র নামের পাশাপাশি অন্যায় কথাও বলছে, তাদের এ মন্দ কাজটিকে আমি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলাম। (অর্থাৎ হযরত আইয়্যুব (আ) তাদের এ অন্যায় কাজটিকে একটু এড়িয়ে গেলেন।

হযরত আইয়্যুব (আ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্যে বাইরে গেলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করতেন। অর্থাৎ স্ত্রী তাঁকে বাইরে নিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজন সারা হলে তাঁকে যথাস্থানে আবার নিয়ে আসতেন। একদিন স্ত্রী আসতে একটু বিলম্ব হওয়ায়, আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, "হে আইয়ুব!) তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। এইতো তোমার গোসলের ও পান করার ঠান্ডা পানি।"

স্ত্রী একটু বিলম্বে স্বামীর কাছে পৌছে তাঁর চারপাশে তাকাতে লাগলেন। হযরত আইয়ুব (আ) পূর্বের চেয়েও খুব সুন্দর ও সু-স্বাস্থ্যবান হয়ে গেলেন। স্ত্রী তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি বরকত নাযিল করুন। আপনি কি এখানে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখেছেন? (এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ, স্ত্রী হযরত আইয়ুব (আ)-কে প্রথমে চিনতেই পারছিলেন না।) তারপর স্ত্রী তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! যখন তিনি সুস্থ ছিলেন, তখন তিনি আপনার মতই এরকম সুন্দর ছিলেন। তখন আইয়ুব (আ) বললেন, আমিই সেই লোক।

হযরত আইয়ুব (আ)-এর দুটি ক্ষেত ছিল। একটি গমের এবং দ্বিতীয়টি যবের। দু' খণ্ড মেঘ এসে, এক খণ্ড মেঘ গমের ক্ষেতের উপর স্বর্ণ বর্ষণ করল। আর অন্য মেঘখণ্ডটি যবের ক্ষেতের উপর রৌপ্য বর্ষণ করল। ইবনে জারীর (রহ) এ রূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান (রহ)-ও তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ সব ঘটনা সবিস্তার আলোচনা করেছেন।

ইবনে আবি হাতিম (রহ) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব (আ)-কে জান্নাতের পূর্ণ পোশাক পরিধান করিয়েছিলেন। এরপর তিনি জান্নাতী পোশাক পরিহিত অবস্থায় এক পাশে গিয়ে বসে পড়েন। আইয়ুব (আ)-এর স্ত্রী তাঁর নিকট এসে, তাঁকে দেখে চিনতে পারেন নি। তখন স্ত্রী আইয়ুব (আ)-এর কাছেই জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে একজন রুগ্ন ব্যক্তি ছিল। তিনি কোথায় গেছেন? তবে তাঁকে কি কুকুর কিংবা বাঘে নিয়ে গিয়েছে? এভাবে স্ত্রী তাঁর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বলছিলেন। তারপর হযরত আইয়ুব (আ) বললেন, আমিই তো সেই আইয়ুব। এ কথা শুনে স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? তিনি বললেন, তোমার উপর আফসোস! আমিই সেই আইয়ুব। আল্লাহ আমার পূর্বের চেহারা পুনরায় আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব (আ)-কে তাঁর পূর্বের ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি অনুরূপভাবেই ফিরিয়ে দেন এবং এমনকি তার থেকেও আরো বৃদ্ধি করে দেন। ওহাব বিন মুনাব্বাহ (রহ) বলেন, আল্লাহ হযরত আইয়ুব (আ) কে ওহী প্রেরণ করেন যে, "আমি তোমার (পূর্বের) ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং অনুরূপ আরো তোমাকে দিয়েছি। এখন তুমি এ পানি দ্বারা গোসল কর। এর মধ্যেই আছে তোমার আরোগ্য। আরোগ্য হওয়ার পরে তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে পৌছবে এবং তাদের মাগফিরাতের জন্যে দো'আ করবে। কারণ, তোমার সম্পর্কে তারা আমার নাফরমানী করেছে।"

ইবনে আবি হাতিম এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আবি হাতিম বলেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আইয়ূব (আ)-কে পূর্ণ সুস্থ করার পর তাঁর প্রতি স্বর্ণের ফড়িং বর্ষণ করেন। আইয়ূব (আ) সেগুলো হাত দিয়ে ধরে অতি তাড়াতাড়ি কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন তাঁকে (অদৃশ্য থেকে) বলা হলো, হে আইয়ূব! তুমি কি তৃপ্ত হওনি? তিনি বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনার করুণা থেকে কে তৃপ্ত হতে পারে? (অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহ সর্বদাই পেতে আগ্রহী থাকে।)

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর প্রতি এক ঝাঁক স্বর্ণের ফড়িং নাযিল হয়। আইয়ূব (আ) সেগুলো তাঁর কাপড়ে ভরতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আইয়ূব (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আইয়ূব! আমি যা কিছু তোমাকে দিয়েছি, সেগুলো কি যথেষ্ট নয়? আইয়ূব (আ) বললেন, হে আমার রব! আপনার দান ও অনুগ্রহ থেকে কে হতাশ হতে পারে? হাদীসটি এখানে যদিও মাওকূফ। কিন্তু অন্যসূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে মারফূ রূপেও বর্ণিত আছে। মুসনাদের আহমদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) বস্ত্রহীন অবস্থায় গোসল করছিলেন। এ সময় তাঁর উপর এক ঝাঁক স্বর্ণের ফড়িং নাযিল হতে লাগল। তখন তিনি সেগুলো তাঁর কাপড়ে ভরতে শুরু করলেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ এলো, হে আইয়ূব! তুমি যা দেখছ, তা থেকে কি আমি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করি নি? তিনি আরয করলেন, কেন নয় অবশ্যই। হে আমার রব! কিন্তু আপনার বরকত থেকে আমি অমুখাপেক্ষী নই। ইমাম বুখারী (রহ) এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (আমি যা কিছু দান করেছি এ সবগুলো) "আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ।" –সূরা আম্বিয়া : ৮৪

অর্থাৎ আমি তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ও মসীবত আমার অনুগ্রহ দ্বারা দূর করে দিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ" অর্থাৎ এটা সে লোকের জন্যে উপদেশস্বরূপ, যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে কিংবা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কষ্ট ও পেরেশানিতে নিপতিত হবে। এ মসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি যেন নবী আইয়ূব (আ) থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং তাঁর আদর্শকে ভালভাবে আঁকড়িয়ে ধরে। তারা যেন চিন্তা করে যে, হযরত আইয়ূব (আ) কিভাবে এ মহা পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করেছেন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রেখেছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আইয়ূব (আ)-এর সকল রোগ-ব্যাধি ও পেরেশানি দূর করে দেন। বরং পূর্বের চেয়েও ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন বৃদ্ধি করে দেন।

কোনো কোনো মূর্খ লোকের ধারণা, হযরত আইয়ূব (আ)-এর স্ত্রীর নাম "রহমত"। তারা رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا (তাকে আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমত) এ আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে।

তারা এ আয়াতের অর্থ এরূপ করে থাকে যে, "আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত (স্ত্রী) দান করেছি।" এরূপ ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক।

হযরত যাহহাক (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আইয়ূব (আ)-এর সেই স্ত্রীকে যৌবন ফিরিয়ে দেন এবং স্ত্রীকে পূর্বের চাইতেও সুন্দরী ও রূপসী করে দেন। এমনকি তার গর্ভ থেকে হযরত আইয়্যূব (আ)-এর ঔরসে ছাব্বিশজন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ কঠিন মসীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে হযরত আইয়ূব (আ) ৭০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে লোকেরা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۞

অর্থ : আমি তাকে বললাম, শুকনো ঘাসের একটা আঁটি হাতে নিন এবং তা দিয়েই মারুন। আপনার কসম[১] ভাঙবেন না। আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি। অত্যন্ত ভালো বান্দাহ। নিশ্চয়ই তিনি তার রবের দিকে রুজু আছেন। -সূরা সোয়াদ : ৪৪

যে কোনো কারণে হযরত আইয়ূব (আ) তাঁর স্ত্রীকে একশ দোররা মারার শপথ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাঁর রাসূল হযরত আইয়ূব (আ)-কে এ প্রসঙ্গে অনুমতি প্রদান করেন এবং তা বাস্তবায়নের সহজ পথও বলে দেন যে, একশ কাঠিবিশিষ্ট একটি গোছা হাতে নিয়ে তা দ্বারা একবার স্ত্রীকে আঘাত কর। (তবে শর্ত এই যে, প্রতিটি তৃণ তাঁর শরীরে লাগতে হবে।) কি কারণে আইয়ূব (আ) তাঁর স্ত্রীকে এরূপ দোররা মারার শপথ করেছিলেন, সে ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কেউ বলেছেন, স্ত্রী তাঁর মাথার চুল মুণ্ডন করে বিক্রি করার কারণে তিনি স্ত্রীকে এরূপ কোড়া মারার শপথ করেছিলেন। কেউ বলেছেন, একবার শয়তান চিকিৎসকের আকৃতি ধরে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়ে আইয়ূব (আ)-কে রোগ মুক্তির জন্য ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিল। (অর্থাৎ ঔষধপত্র প্রভৃতি সেবন সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন।) স্ত্রী নবীর কাছে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে খবর দিলেন। নবী আইয়্যূব (আ) বুঝতে পারলেন যে, এটি শয়তানের চক্রান্ত। শয়তান চিকিৎসকের আকৃতি ধরে তাঁর কাছে এসেছিল। তখন নবী এরূপ কসম করেছিলেন। যখন আল্লাহ তা'আলা নবীকে পূর্ণ সুস্থ করলেন এবং এ কসম পূর্ণ করার সময় এসে গেল, তখন আল্লাহ তাঁর নবীকে কসম বাস্তবায়ন করার সহজ পন্থা বলে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা আইয়ূব (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, একশ তৃণ (ঘাস বা ঐ জাতীয় উদ্ভিদ) একত্র করে, তা দ্বারা স্ত্রীকে আঘাত কর। এতেই একশ দোররা মারা হবে এবং কসমও পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের রক্ষা করার সহজ পথ। বিশেষ করে আইয়ূব (আ)-এর ধৈর্যশীলা ও নেককার স্ত্রীর জন্য। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এরূপ দোররা মারার অনুমতি দেয়ার পরে এর কারণও বর্ণনা করেছেন যে, "আমি তাকে ধৈর্যশীলারূপে পেয়েছি। সে কত ভাল বান্দী। নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ইবাদতকারীণী।"

কোন কোন ফিকাহবিদ কসম ও মানতের ক্ষেত্রে সহজ পন্থ গ্রহণ করেছেন এবং বিশেষ ছাড় দিয়েছেন। অনেকে এ বিষয়ের উপর আলাদা পুস্তকও প্রণয়ন করেছেন। যেমন "শপথ থেকে মুক্তির সহজ পদ্ধতি।" তারা দলীল হিসেবে এ আয়াত উল্লেখ করেছেন এবং আশ্চর্য ধরনের মাসয়ালাও বর্ণনা করেছেন। যার কিছু সংখ্যক মাসয়ালা "কিতাবুল আহকামে" বর্ণনা করব, ইনশা-আল্লাহ।

ইবনে জারীর (রহ) এবং ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আইয়ূব (আ) ৯৩ বছর বয়স পেয়েছিলেন। এর বেশি বয়সের কথাও অনেকে বলেছেন। লায়স (রহ) হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দলীল হিসেবে সম্পদশালী ও ধনবানদের সামনে হযরত সোলায়মান (আ)-কে, নিষ্কলুষতা ও সংযমসাধনার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ (আ)-কে এবং মসীবতগ্রস্তদের সামনে হযরত আইয়্যূব (আ)-কে হাজির করবেন। ইবনে আসাকির (রহ)-ও অর্থগত দিক দিয়ে এরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত আইয়ূব (আ)-এর ওফাতের পরে তাঁর কার্যাবলী ও অন্যান্য বিষয়গুলোর দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধায়ন তাঁর অন্য পুত্র বাশার ইবনে আইয়ূব (আ) করেন। কারো কারো মতে এ বাশার ইবনে আইয়ূবই হলেন যুল কিফ্‌ল (আ)। তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল ৭০ বছর বয়সে। অনেক লোকের ধারণা মতে ইনিও নবী ছিলেন। এখন আমি যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করব। কারণ, অনেকের ধারণা, যুল-কিফ্‌ল আইয়্যূব (আ)-এর পুত্র এবং নবী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

---

১. এশব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে এ কথা স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, অসুস্থ অবস্থায় হযরত আইয়ূব (আ) অসতুষ্ট হয়ে কাউকে মারবেন বলে শপথ করেছিলেন (স্ত্রীকে মারবেন বলে শপথ করার কথা বলা হয়)। এ শপথে তিনি কত বার বেত মারবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্ণ সুস্থতা ফিরিয়ে দিলেন এবং অসুখ অবস্থায় যে রাগের কারণে তিনি এই শপথ করেছিলেন সে রাগ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এ কথা ভেবে পেরেশান হলেন যে, যদি শপথ পালন করি তাহলে অনর্থক এক নির্দোষ মানুষকে মারতে হবে, আর যদি শপথ ভঙ্গ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করে আদেশ দিলেন যে, একটি ঝাড়ু নাও, তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে, যতবার বেত মারার শপথ তুমি করেছিলে। সেই ঝাড়ু দিয়ে ঐ লোককে মাত্র একবার মার। এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং ঐ লোককে অনর্থক কষ্টও দেওয়া হবে না।

হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা সূরা আম্বিয়ায় হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পরে বর্ণনা করেন—

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ ۞ وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا ؕ اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

অর্থ : এসব নিয়ামতই আমি ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফলকে দিয়েছি। এরা সবাই সবর অবলম্বনকারী ছিলেন। আমি তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিলাম। আর তারা নেককার লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। –সূরা আম্বিয়া : ৮৫–৮৬

অনুরূপভাবে সূরা স্বা-দেও হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করার পরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন-

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ۞ اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۞ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۞ وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۞

অর্থ : আমার বান্দাহ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা স্মরণ করুন। তারা খুবই কর্মক্ষমতা ও দূর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে একটি খাঁটি গুণের ভিত্তিতে খালিস করে নিয়েছিলাম। আর তা ছিল আখিরাতের স্মরণ। নিশ্চয়ই তারা আমার কাছে বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য। ইসমাঈল, আল ইয়াসা'আ ও যুল-কিফল এর কথা স্মরণ করুন। তারা সবাই নেক লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন।

–সূরা স্বা-দ : ৪৫–৪৮

কুরআন মাজীদে যুল-কিফলের বর্ণনা ও প্রশংসা নবী (আ)-গণের সাথে থাকায় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, তিনিও নবী ছিলেন। এটাই প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে, তিনি নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি। ইবনে জারীর (রহ) এ প্রসঙ্গে কোনো অভিমত প্রকাশ করেন নি। তবে তিনি এবং আবু নাজীহ (রহ) হযরত মুজাহিদ (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যুল-কিফল নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁর জাতির পক্ষ থেকে এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হন যে, তিনি ন্যায় ইনসাফের সাথে সম্প্রদায়ের যাবতীয় কাজের ফায়সালা করবেন। তাদের দেখাশোনা করবেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। এজন্য তিনি যুল-কিফল (দায়িত্বশীল) নামে আখ্যা লাভ করেন।

ইবনে জারীর ও ইবনে হাতিম (রহ) হযরত মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ইয়াসা'আ (আ) শারীরিকভাবে দুর্বল (বায়োবৃদ্ধ) হয়ে যান, তখন তিনি বলেছিলেন, যদি আমি আমার জীবদ্দশায় কাউকে আমার খলীফা নির্ধারণ করে যেতে পারতাম, যিনি আমার যাবতীয় কাজসমূহ পরিচালনা করতেন এবং আমি তাঁর কাজগুলো (অর্থাৎ তিনি কিভাবে দায়িত্ব পালন করেন তা) স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতাম, তবে আমার মনটা প্রশান্ত হতো। অতঃপর তিনি লোকদেরকে জমায়েত করলেন এবং বললেন, যিনি আমার কথাগুলোকে মানতে পারবে, তাকে আমি আমার খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) নির্ধারণ করব। সে কথাগুলো হলো এই যে, দিনের বেলা রোযা রাখবে, রাত জেগে ইবাদত করবে এবং কখনো রাগ হতে পারবে না। উপস্থিত সকলেই চুপ করে রইলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলেন যাকে উপস্থিত সকলে একজন সাধারণ মানুষ এবং নীচু শ্রেণীর লোক বলে মনে করতেন। তিনি বললেন, আমি আপনার এ কথাগুলো মানতে পারব। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দিনের বেলা রোযা

রাখতে এবং রাত জেগে ইবাদত করতে এবং কখনো রাগান্বিত না হয়ে পারবে? সে লোকটি বললেন, জী, পারব। অতঃপর তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। পরের দিন আবার লোকদেরকে সমবেত করে, অনুরূপ জিজ্ঞাসা করলেন। এ সময়ও সবাই চুপ থাকলেন। কিন্তু সে পূর্বের লোকটিই পুনরায় দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমি পারব। তখন হযরত ইয়াসা'আ (আ) তাঁকেই তাঁর খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) মনোনীত করলেন। এরপর শয়তান তার অনুগতদেরকে ডেকে বলল, তোমরা অমুক লোকটির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে। অর্থাৎ যেভাবে হোক তাকে পথভ্রষ্ট করবে। কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হলো। তারপর শয়তান তাদেরকে বলল, তোমরা সরে পড়। আমিই তাকে পথভ্রষ্ট করব। তারপর শয়তান এক বৃদ্ধ ফকীরের বেশে তাঁর কাছে হাজির হলো। এমন সময় সে (শয়তান) তাঁর কাছে আসলো, যখন তিনি দুপুরের খানা সেরে বিশ্রাম করার জন্যে ঘরে গিয়েছিলেন। তিনি এ সময় (দুপুর বেলা) অল্প একটু বিশ্রাম করতেন এবং সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। শয়তান এসে তাঁর ঘরের দরজায় নাড়া দিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে দরজা নাড়াচ্ছে, শয়তান বলল, আমি একজন দুর্বল, অসহায় বৃদ্ধ। একথা শুনে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলেন। তখন বৃদ্ধ (শয়তান) তার ঘটনা বলা শুরু করল। সে বলল, আমার ও আমার জাতির লোকদের মধ্যে বিরোধ আছে। তারা আমার প্রতি জুলুম করেছে এবং এরূপ ব্যবহার করেছে। শয়তানের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর বিশ্রামের সময়টুকু নষ্ট করা। যাতে তিনি বিশ্রাম না করতে পারেন। আর তা-ই হলো। বৃদ্ধের বিবরণ দিতে দিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে। যখন আমি সন্ধ্যার সময় মজলিসে বসব, তখন তোমার ব্যাপারে ন্যায্য মিমাংশা করে দিব। তারপর অভিশপ্ত বৃদ্ধ (শয়তান) চলে গেল। সন্ধ্যাবেলা তিনি (খলীফা) মজলিসে (দরবারে) বসে বৃদ্ধের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু সে (বৃদ্ধ) হাজির হলো না। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। পরদিন সকাল বেলাও মজলিসে বসে তার অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাকে উপস্থিত পেলেন না। তারপর তিনি দুপুর বেলা বিশ্রামের জন্য তা গৃহে গেলেন এবং বিছানায় শায়িত হলেন। এ সময় আবার সেই বৃদ্ধ এসে তার ঘরের দরজায় নাড়া দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাব দিল, আমি সেই অসহায় নির্যাতিত বৃদ্ধ। তখন তিনি তার জন্য দরজা খুলে দিলেন। তিনি বৃদ্ধকে দেখে বললেন, আমি তোমাকে আমার দরবারে আসতে বলেছিলাম না? বৃদ্ধ (শয়তান) বলল, আমার জাতির লোকগুলো অত্যন্ত খারাপ। যখন তারা জানতে পেরেছে যে, আপনার কাছে আমি তাদের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেছি এবং আপনি ফায়সালা দেয়ার জন্যে মজলিসে বসা আছেন, তখন তারা আমার পাওনা আমাকে দিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যখন আপনি মজলিস থেকে চলে গেছেন, তখন তারা আমার পাওনা দিতে অস্বীকার করেছে। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, সন্ধ্যার সময় তুমি আমার দরবারে আসবে। এভাবে দ্বিতীয় দিনেও তিনি বিশ্রাম করতে পারেন নি। সন্ধ্যার সময় দরবারে বসে তিনি বৃদ্ধের অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে বিশ্রাম না করার কারণে তন্দ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তিনি তাঁর ঘরের একজনকে ডেকে বললেন যে, আমি যখন বিশ্রাম করব, তখন কাউকে দরজায় নাড়া দিতে দেবে না। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করব। আমার খুব ঘুম আসছে। তিনি নিদ্রায় যাওয়ার পর মুহূর্তেই সেই বৃদ্ধ (শয়তান) সেখানেও এসে হাজির হলো। দরজায় পাহারাদার দাঁড়ানো ছিল। সে বৃদ্ধকে বলল, সরে যাও, সরে যাও। বৃদ্ধ (শয়তান) বলল, আমি গতকাল এসে আমার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলাম। সুতরাং তুমি আমাকে ভেতরে যেতে দাও। দ্বাররক্ষী বলল, না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে যেতেই দেব না। আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, কেউ যেন ভেতরে যেতে না পারে। বৃদ্ধ (শয়তান) অক্ষম হয়ে ভেতরে প্রবেশের পথ তালাশ করতে লাগল। অবশেষে একটি ছিদ্র পথ দিয়ে সে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে দরজায় নাড়া দিতে লাগল। তিনি (খলীফা) পাহারাদারকে বললেন, আমি তোমাকে দরজায় পাহারা দিতে বলছিলাম না? পাহারাদার বলল, আল্লাহর কসম! এ বৃদ্ধ লোকটি আমার সম্মুখ থেকে আসে নি। তবে আমি দেখছি, সে কোথা থেকে প্রবেশ করল। খলীফা নিজেও উঠে দেখলেন যে, সত্যিই দরজাটি বন্ধই আছে, অথচ বৃদ্ধ গৃহের মধ্যে উপস্থিত। অতঃপর তিনি বৃদ্ধকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর দুশমন? সে বলল, হ্যাঁ, আমি আপনাকে খুব পরীক্ষা করে দেখছি। আপনি বার বার আমাকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আমি চেষ্টা করছিলাম, আপনাকে রাগান্বিত করব। কিন্তু আমি এতে সফল হই নি। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় তাঁর নাম যুল-কিফল

(দায়িত্বশীল) রাখা হয়। কারণ, তিনি ইয়াসা'আ (আ)-এর কাছে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা যথাযথভাবে পালন করেছেন। তার স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি (বৃদ্ধের কার্যকলাপে) একটুও রাগান্বিত হননি।

ইবনে আবু হাতিম (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও প্রায় একই ধরনের বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস, মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস এবং ইবনে হোজায়রা আকবর প্রমুখ থেকে এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

ইবনে আবি হাতিম (রহ) বলেছেন, কিনানা ইবনে আখনাস বলেছেন, আমি আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে এ মিম্বরে বসে বলতে শুনেছি যে, হযরত যুল-কিফ্‌ল নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি প্রতিদিন একশ' রাকআত নামায পড়তেন। তিনি এরূপ প্রত্যহ একশ রাকআত নামায পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার কারণে তিনি যুল-কিফ্‌ল নামে অভিহিত হন।

ইমাম আহমদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুধু একবার বা দু'বার নয় বরং সাতবারের চেয়েও বেশিবার শুনেছি। (অর্থাৎ যদি একবার দুবার শুনতাম, তবে আমি কখনো এ হাদীস বর্ণনা করতাম না।) কিফল বনী ইসরাঈলের এমন এক লোক, যার থেকে এমন কোনো পাপ কাজ নেই, যা সংঘটিত হয় নি। একবার তার কাছে এক মহিলা আসে। সে তাকে উপভোগ করার শর্তে ষাটটি দীনার দেয়। যখন সে স্বামী স্ত্রীর মতো তাকে উপভোগ করতে উদ্যত হলো, তখন মহিলাটি কাঁপতে শুরু করল এবং কেঁদে দিল। কিফল তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার উপর জবরদস্তি করছি? মহিলাটি বলল, না। তবে আমার কাঁদার কারণ এই যে, আমি এরূপ জঘন্য কাজে কখনো লিপ্ত হইনি। অভাব-অনটনই আজ আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে। কিফল বললেন, তুমি এমন কাজে কখনো লিপ্ত হও নি? এরপর তিনি মহিলাটি থেকে নেমে গেলেন ও বললেন, এ দীনারগুলো তোমার, আল্লাহর কসম! এরপর থেকে কিফল আর কখনো আল্লাহর নাফরমানী করবে না। সে রাতেই কিফল মারা যান। সকাল বেলা তাঁর ঘরের দরজায় লিখিত দেখা যায়, "আল্লাহ কিফলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" তিরমিযী (রহ), আ'মাশ এর হাদীস থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। এরপরও যদি হাদীসখানা বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়া হয়, তবে এ হাদীসে কিফল নামক লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর আমি যার কথা প্রথমে আলোচনা করেছি তিনি হলেন যুল-কিফ্‌ল। কুরআন মাজীদেও যুল-কিফ্‌ল নামের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং নামের দিক দিয়েই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রসমূহের বর্ণনা

যে গোত্রসমূহ আল্লাহর আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। তাওরাত নাযিলের পর কোনো জাতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হয় নি। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى .

অর্থ : আগের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর আমি মুসাকে কিতাব দান করেছি। -সূরা কাসাস : ৪৩

অনুরূপভাবে ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম ও বাযযার হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, তাওরাত কিতাব নাযিল করার পর আল্লাহ কোনো জাতিকে আকাশ বা পৃথিবীর শাস্তি দ্বারা পৃথিবীতে ধ্বংস করেন নি, শুধুমাত্র একটি জনপদের লোকদেরকে শাস্তি দিয়েছেন। তাদের মুখমণ্ডলকে বানরের আকৃতিতে পরিণত করে দেন। প্রথম আয়াতই এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ। উল্লিখিত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ (রা) পর্যন্ত মাওকূফ ছিল। বাযযার (রহ) এ হাদীসকে মারফূ বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে গোটা জাতিকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর মধ্যে একটি জাতি হলো আসহাবুর রাস! তাদের কথা আমি এখন আলোচনা করব।

আসহাবুর রাস

সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ ۞ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۞

অর্থ : এভাবেই 'আদ, সামূদ ও রাসবাসী এবং তাদের মাঝের যুগগুলোতে বহু লোককে (ধ্বংস করা হয়েছে)। তাদের মধ্যে প্রতিটি কাওমকে আমি (ইতঃপূর্বে ধ্বংস করে দেওয়া কওমের) উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কওমকেই ধ্বংস করে দিয়েছি। -সূরা ফুরকান : ৩৮–৩৯

সূরা ক্বাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۞ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۞ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۞

অর্থ : এদের আগে নূহের কওম, রাস্সের অধিবাসী, সামূদ, 'আদ, ফিরাউন ও লূতের কওম এবং আকাবাসী ও তুব্বা জাতি (রাসূলদেরকে) মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল। অবশেষে (তাদের উপর) আমার শাস্তি সত্য হয়ে দেখা দিল। -সূরা ক্বাফ : ১২–১৪

এ আয়াত এবং এর পূর্বের আয়াত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তাদের উপর আযাব বর্ষিত হয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস ও বিনাশ হয়েছে। এ ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে আসহাবুর-রাস (কুয়াবাসী)-ও রয়েছে। ইবনে জারীরের মতে এরা সেই পরিখাবাসী, যাদেরকে কাফিরেরা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। অথচ পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে। কিন্তু আল্লামা মুফাস্সির ইবনে জারীর (রহ) একটি বিস্ময়কর মত ব্যক্ত করেছেন যে, আসহাবুর-রাস হলো, আসহাবুল উখদুদ (অগ্নিকুণ্ডের অধিপতি), যাদের কথা কুরআন মাজীদের সূরা বুরূজে বর্ণিত আছে। এটা কিভাবে সঠিক হতে পারে? ইবনে ইসহাক (রহ)-সহ বড় একটি দল স্পষ্টভাবে বলেন যে, আসহাবুল উখদুদ-এর (অগ্নিকুণ্ড অধিপতিদের) ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, হযরত মাসীহ (আ)-এর পরে। আল্লামা ইবনে জারীর (রহ) ইবনে আব্বাস (রা)-এরও একটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবুর-রাস ছামূদ জাতির জনপদসমূহের মধ্য হতে একটি জনপদের অধিবাসী। আর এ ছামূদ জাতি হযরত মাসীহ (আ)-এর অনেক আগের। সুতরাং আসহাবুর-রাস তার পরে কিভাবে হতে পারে?

ইবনে আসাকির (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে দামেশক শহরের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবুল কাসিমের ইতিহাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, আসহাবুর-রাস (কুয়াবাসী) তাদের নিজ শহরে বসবাস করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে তাঁর নবী প্রেরণ করেন। যার নাম ছিল হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আ)। তিনি সকল কাছে তাঁর দাওয়াত পৌছান। কিন্তু সকলেই তাকে মিথ্যাবাদী বলল ও তার কথাকে অমান্য করল। এমনকি তাঁকে হত্যা করে ফেলল। অতঃপর আদ ইবনে আওস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ নিজ পুত্রকে নিয়ে আসহাবুর-রাসের এ লোকালয় ছেড়ে চলে যান। (কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা তাদের নবী এ নেককার ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এদের উপর আল্লাহর শাস্তি অবশ্যই নিপতিত হবে।) তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে "আহকাফ" নামক স্থানে বসবাস করা আরম্ভ করেন। এদিকে রাস (কুয়া) বাসীর উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হলো। সকলেই ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর যারা আহকাফে এসে বসবাস করেছিলেন, তাঁরা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ইয়ামানের দিকে রওয়ানা করেন। তারপর তাদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই একজন জায়রুন ইবনে সাদ ইবনে আদ ইবনে আওস ইবনে ইরম ইবনে সাম ইবনে নূহ দামেশকের মরু অঞ্চলে চলে যান। সেখানে পৌছে তারা একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। সেই শহরটির নাম রাখেন জায়রুন।

এখানে বসবাসকারী লোককে ইরম উম্মতধারী বলা হতো। পূর্বের কোনো নির্মাণ-ই (দালান, কোঠা, অট্টালিকা) অবশিষ্ট ছিল না। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদ জাতির কাছে হযরত হূদ (আ) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রিবাহ ইবনে খালিদ ইবনে হালূদ ইবনে আদকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেন। পিতৃপুরুষের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করে তাদের জাতির নাম আদ রাখা হয়। তারাও হূদ (আ)-কে অমান্য করে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথম অধিবাসীরা ধ্বংস হয়। অবশিষ্ট লোকেরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসবাস করে। এরপর তাদের কাছে হূদ (আ) আগমন করেন। হূদ (আ)-কে অমান্য করার কারণে তারাও বিনাশ হয়।

এ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবুর-রাস আদ জাতির কয়েক যুগ পূর্বের জাতি। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত। ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাস অধিবাসীদের জনপদ ও কূপটি আযারবাইজানে অবস্থিত ছিল। হযরত সাত্তারী, আবু বকর ও ইকরামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাস অধিবাসীরা সেই কূপে তাদের নবীকে ফেলে দিয়ে সেটিকে পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়। ইবনে জুরায়য বলেন, হযরত ইকরামা বলেছেন, আসহাবুর-রাস ফলজ নামক অঞ্চলে বসবাস করতো। আর এ ফলজবাসীদেরকেই আসহাবে ইয়াসীন বলা হয়। যাদের কথা সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত আছে। তাদের অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, ফলজ ইয়ামামার জনপদসমূহের একটি জনপদ (নজদে রাস্ নামক একটি জনপদ আছে। সেটি মদীনা শরীফ ও বুরায়দার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত)।

হযরত ইকরামা-এর মতে, আসহাবুর রাস যদি আসহাবে ইয়াসীন হয়, তবে স্পষ্টরূপে বুঝা যাবে যে, এরা সবাই ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেছেন—

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۝

অর্থ : ব্যস! শুধু প্রচণ্ড এক আওয়াজ হলো এবং হঠাৎ তারা সব বেহুঁশ হয়ে গেল। –সূরা ইয়াসীন : ২৯

এদের ঘটনার পরেই আসহাবে ইয়াসীনের ঘটনাও বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি এরা দুটি সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রেও আসহাবুর-রাস ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এটাই স্পষ্ট যে, এরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল।

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আন নাক্কাশ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, 'আসহাবুর-রাস' এর এলাকায় একটি প্রবাহিত কূপ ছিল। যে কূপের পানি তারা পান করতো এবং সে পানি দিয়ে জমিনও সিঞ্চন করতো। তাদের একজন ন্যায়পরায়ণ ও শিষ্টাচারী বাদশাহ ছিল। সে মারা যাওয়াতে আসহাবুর-রাসগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে পড়ে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরে শয়তান তাদের প্রাণ প্রিয় বাদশাহর রূপধারণ করে তাদের কাছে এসে হাজির হলো এবং বলল, আমি মারা যাই নি; বরং আমি তোমাদের থেকে একটু গায়েব (অদৃশ্য) হয়ে গিয়েছিলাম। এ সময় আমি তোমাদের কার্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করেছি। জাতির লোকেরা অত্যন্ত খুশি হলো। এরপর শয়তান একটি পর্দা টানিয়ে জাতির লোকদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিল এবং লোকদেরকে বলল, আমি কখনো মারা যাব না। অধিকাংশ লোকই তার কথা বিশ্বাস করে, কঠিন বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেল। একপর্যায়ে লোকেরা তার পূজা করা আরম্ভ করল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে একজন নবী পাঠান। তিনি এসে তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের এ উপাস্য (অর্থাৎ যাকে তোমরা পূজা করছ) এটি একটি অভিশপ্ত শয়তান। সে (শয়তান) পর্দার আড়াল থেকে তোমাদের সাথে কথা বলছে। তার ইবাদত করো না; বরং অংশীবাদহীন এক আল্লাহরই ইবাদত করো।

আল্লামা সুহাইলী (রহ) বলেছেন, এ নবীর প্রতি নিদ্রার মধ্যে ওহী প্রেরণ করা হতো। তাঁর নাম ছিল হযরত হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আ)। তাঁর গোত্রে লোকেরা তাঁর উপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে। অতঃপর তাঁর মৃতদেহ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। এ কারণে কূপের পানি শুকিয়ে যায়। এ কূপের পানি তারা

তৃপ্তিসহ পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করত এবং কূপ থেকে পানি সেচ করে জমিতে দিত, যাতে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। কিন্তু এ পানি শুকিয়ে যাওয়াতে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল এবং অভাব-অনটনে আপতিত হলো। তাদের গাছপালাগুলো শুকিয়ে গেল। ফল-ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শহর জনশূন্য হয়ে পড়ল। শাস্তির পরে তারা এক চরম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। তাদের সামাজিক ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তারা জীবন বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে তারা সকলেই সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। তাদের নির্মিত দালান, কোঠা ও অট্টালিকাগুলো জ্বীন, ভূত ও হিংস্র জানোয়ারের আস্তানা হয়ে গেল। সেখানে মানুষের কোনো শব্দ শোনা যায় না। সেখান থেকে ভেসে আসে জ্বিন ভূতের শোঁ শোঁ আওয়াজ এবং বাঘের গর্জন।

ইবনে জারীর (রহ) মুহাম্মাদ ইবনে কাআব কুরাজী (রহ) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথম ব্যক্তি যিনি বেহেশতে প্রবেশ করবেন, তিনি হলেন এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি। এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের মাঝে একজন নবী প্রেরণ করেছিলেন। সে জনপদের একজন লোক ছাড়া আর কেউই প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনে নি। এ ব্যক্তি ছিল সেই কৃষ্ণকায় গোলাম। এরপর সে জনপদের অধিবাসীরা নবীর সাথে অন্যায় ব্যবহার করল এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিল। তারা একটি কূয়া খনন করে তার মধ্যে তাঁকে ফেলে দিল এবং কূপটির মুখ পাথর দিয়ে ভালরূপে বন্ধ করে দিল। এ সময় কৃষ্ণকায় গোলামটি জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতো ও বিক্রিলব্ধ টাকা দ্বারা খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করে তা নিয়ে সেই কূয়ার নিকটে চলে যেতেন এবং আল্লাহর সাহায্যে কূপের মুখ থেকে পাথর সরিয়ে খাদ্য ও পানীয় (রশি বা অনুরূপ কিছুর সাহায্যে) নবীর কাছে পৌছাতেন। আবার পাথরখানি অনুরূপভাবে রেখে দিতেন। যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, ততদিন এভাবে চলছিল। অতঃপর একদিন সে (গোলাম) জঙ্গলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে সেগুলো একত্রে বেঁধে মাথায় উঠানোর ইচ্ছা করল। হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়ল। আল্লাহর হুকুমে এক ঘুমে সাত বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। সাত বছর পর একটু আড়মোড়া করে (অন্য পাশ ফিরে) শুয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরো সাত বছর পর্যন্ত এক ঘুমের মধ্যে রাখেন। তারপর সে (গোলাম) জাগ্রত হন এবং তার কাঠের বোঝা মাথায় উঠিয়ে নেন। সে যে দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর একাধারে ঘুমে কাটিয়েছে, তা ধারণাই করতে পারে নি। তাঁর ধারণা ছিল যে সে কিছু সময় ঘুমিয়েছে। অতঃপর কাঠ নিয়ে লোকালয়ে আসল এবং কাঠ বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ টাকা দিয়ে খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করল। এরপর তিনি খাদ্য ও পানীয় নিয়ে কূয়ার কাছে চলে যান। কিন্তু তিনি সেখানে পৌছে কোনো কূয়া দেখতে পেলেন না। এদিক সেদিক তালাশ করেও কূয়ার কোনো সন্ধান পেলেন না। তারপর তিনি জনপদে চলে গেলেন। এদিকে ঘটনা এভাবে হয়েছিল যে, তাঁর এ দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর ঘুমের সময় আল্লাহ তাআলা নবীর গোত্রের লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে দেন। তারা তাদের নবীকে কূয়া থেকে বের করে আনে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তারা তাঁকে সত্যনবী বলে বিশ্বাস করে এবং তাঁর সহযোগিতা করে। নবী কূয়া থেকে বের হয়েই সকলের নিকট সেই কৃষ্ণকায় গোলামটির কথা জিজ্ঞেস করেন যে, সে লোকটি কোথায়? তার কি হয়েছে? সবাই বলল, আমাদের জানা নেই।

অবশেষে নবী ইন্তেকাল করেন। তারপর সে গোলাম (আল্লাহর আদেশে) জাগ্রত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ কৃষ্ণকায় গোলমটি বেহেশতে সর্বাগ্রে প্রবেশ করবেন। হাদীছটি মুরসাল এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ আছে। সম্ভবত এ দীর্ঘ ঘটনাটি মুহাম্মাদ ইবনে কাআব কুরাজী থেকে বর্ণিত। আল্লামা ইবনে জারীর (রহ) এটিকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, এ ঘটনা সেই আসহাবুর রাস সম্পর্কে হতে পারে না। যাদের কথা কুরআনে বর্ণিত আছে। কারণ, তাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলার স্পষ্ট ঘোষণাই আছে। পক্ষান্তরে এ জাতির লোকেরা পরবর্তীতে ঈমান এনেছিল। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, তাদের বংশধরেরা ঈমান এনেছিল। তাদের নবীও অন্যজন ছিল। এরপর আল্লামা ইবনে জারীর (রহ) বলেন যে, তারা আসহাবুল উখদূদ, (অগ্নিকুণ্ডের মালিকগণ)। তাঁর এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বল হওয়ার কারণ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর একটি কারণ

এই যে, আসহাবুল উখদূদকে পরকালের আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। আর আসহাবুর-রাস সম্পর্কে পৃথিবীতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

ইয়াসীন সম্প্রদায়ের ঘটনা

অবাধ্যতা ও নাফরমানির কারণে যে জাতিগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলোর মধ্যে একটি জাতি হলো ইয়াসীন জাতি। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন—

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۞ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ۞ قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ۞ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۞ قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۭ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۞ وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۞ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۞ اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۞ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۞ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۭ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۞ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ۞ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۞

অর্থ : (হে নবী!) আপনি উদাহরণ হিসেবে তাদেরকে ঐ জনপদের কাহিনী শুনিয়ে দিন, যখন সেখানে রাসূলগণ এসেছিলেন। আমি তাদের নিকট দু'জন রাসূল পাঠালাম এবং তারা দু'জনকেই মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করল। তখন আমি তৃতীয়জনকে সাহায্যের জন্য পাঠালাম। তারা সবাই বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আমাদেরকে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। লোকেরা বলল, তোমরা আমাদের মতই কয়েকজন মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও এবং রাহমান কখনো কোনো জিনিস নাযিল করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথা বলছ। রাসূলগণ বললেন, আমাদের রব জানেন যে, আমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে। আর সাফ সাফ পয়গাম পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আমাদের উপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। লোকেরা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জন্য কুলক্ষণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে শেষ করে দেবো এবং আমাদের হাতে তোমরা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। রাসূলগণ জবাব দিলেন, তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের সাথেই লেগে আছে। তোমরা কি এ সব কথা এ জন্য বলছ যে, তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে? আসল কথা হলো, তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী লোক। ইতোমধ্যে শহরের দূর কিনারা থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, হে আমার কওম! রাসূলগণের কথা মেনে নাও। মেনে চল তাদেরকে, যারা তোমাদের কাছে কোনো মজুরি চায় না। আর তারা সঠিক পথে আছে। কেন আমি ঐ সত্তার দাসত্ব করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে

হবে? আমি তাঁকে বাদ দিয়ে কি অন্য ইলাহ বানিয়ে নেব? অথচ রাহমান যদি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোনো কাজেই লাগবে না এবং তারা আমাকে ছাড়িয়েও নিতে পারবে না। আমি যদি তা করি, তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ে যাব। আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও। (শেষ পর্যন্ত তারা তাকে মেরে ফেলল এবং) তাকে বলা হলো, "বেহেশতে প্রবেশ যাও"। তখন সে বলল, "হায় আমার কওম যদি জানতে পারত যে, আমার রব কোন জিনিসের বদৌলতে আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে শামিল করে নিয়েছেন।" এরপর আমি তার কওমের উপর আসমান থেকে কোনো সেনাবাহিনী নাযিল করি নি। আর তা পাঠানোর কোনো দরকারও আমার ছিল না। বাস! শুধু প্রচণ্ড এক আওয়াজ হলো এবং হঠাৎ তারা সব বেহুঁশ হয়ে গেল। –সূরা ইয়াসীন : ১৩-২৯

পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের অধিকাংশ আলেম বলেছেন, এ জনপদটি ছিল 'ইন্তাকিয়া'। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) তিনি হযরত ইবনে আব্বাস, কাব এবং ওহা ইবনে মুনাব্বিহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই 'ইন্তাকিয়া' জনপদের একজন বাদশাহ ছিল। তার নাম ছিল 'ইনতাখীস'। সে ছিল মূর্তিপূজক। আল্লাহ তাআলা তার নিকট তিনজন নবী প্রেরণ করেন। কিন্তু সে তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এক বর্ণনা মতে সে নবীদের নাম ছিল– সাদেক, মাসদূক এবং শালুম। কাতাদাহ ও ইবনে জারীরের মতে, তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি। ইবনে জারীর শোয়াইব আল জুবাঈ হতে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম দু'জন রাসূলের নাম ছিল শামঊন ও ইউহান্না এবং তারপর প্রেরিত তৃতীয়জনের নাম ছিল 'বুলিস'। আর সে জনপদটির নাম ছিল 'ইন্তাকিয়া'। কিন্তু এ মতটি ভ্রান্ত দুর্বল। কারণ, হযরত ঈসা (আ) যখন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, তার পূর্বেও ইন্তাকিয়াবাসী ঈমানদার ছিল এবং এ এলাকাটি ঐ চারটি এলাকার একটি, যেখানকার অধিবাসীরা হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। সে চারটি এলাকা হলো– ইন্তাকিয়া, আল কুদস, ইস্কান্দারীয়া ও রুমিয়া। এ চারটি এলাকার পর কনস্টেনটাইল (ইস্তাম্বুল ও তুর্কীবাসী) মুসলমান হন। এ এলাকাগুলো ধ্বংস হয় নি। এমনকি ইন্তাকিয়াবাসী আযাবে পতিত হয় নি। কিন্তু যখনই তারা সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখনই তারা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হলো।

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন— إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ۞

অর্থ : সে শাস্তি ছিল শুধুমাত্র এক মহানাদ। তারপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। –সূরা ইয়াসীন : ২৯

ঘটনা এটাও হতে পারে যে, ইন্তাকিয়াবাসী আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার সে এলাকাটি আবাদ হয় এবং হযরত ঈসা (আ) তাদের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ফলে তারা ঈমান আনে। এ দুটি মত ও উভয় ঘটনার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। সুতরাং বুঝা গেল, যারা বলেছেন যে, সূরা ইয়াসীনে যাদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ আছে, তাদের কাছে হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ থেকে দূতদের প্রেরণ করা হয়েছে, সে কথাটি সঠিক নয়। যার একটি কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, আমি তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করেছি। এতে বুঝা যায়, তারা ছিল আল্লাহর পয়গম্বর। ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি নয়।

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন–"(হে নবী!) আপনি তাদের কাছে সে লোকালয়ে অধিবাসীদের উপমা বর্ণনা করুন, যখন তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করেছিলেন। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ﷺ আপনি আপনার উম্মতগণকে তাদের ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাদের কথা আমি উল্লেখ করছি। অতঃপর তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন আমি তাদেরকে তৃতীয় একজন রাসূল পাঠিয়ে শক্তিশালী করলাম। তারা সকলে গিয়ে বলল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি। কিন্তু ইন্তাকিয়ার লোকেরা তাদের কথাকে এ বলে উড়িয়ে দিল যে, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। অর্থাৎ তারা রাসূলগণের এ কথাকে অসম্ভব ও বিস্ময়কর মনে করছিল যে, আল্লাহ তাআলা কোনো মানুষকে রাসূল বানাতে পারেন! এজন্যে রাসূলগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাদেরকে উত্তর দিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ

তাআলা অবগত আছেন যে, আমরা তোমাদের প্রতি তাঁর প্রেরিত রাসূল ও দূত। যদি আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেই তাহলে তিনি আমাদের প্রতি খারাপ প্রতিফল দিবেন ও কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা তোমাদের নিকট পৌছে দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। তাই আমরা তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী স্পষ্টভাবে পৌছে দিচ্ছি। এখন হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। তাঁকে প্রশ্ন করার কেউই নেই। তারা রাসূলদেরকে বলল, "আমরা তোমাদেরকে দুর্ভাগ্যবান মনে করছি। অর্থাৎ আমরা তোমাদের মধ্যে দুর্ভাগ্যের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। না জানি তোমাদের কারণে আমরা আযাবের মধ্যে পতিত হয়ে যাই। তোমরা যদি তোমাদের এ দাওয়াত থেকে বিরত না থাক, তাহলে আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব। অর্থাৎ কাফিরেরা রাসূলগণকে বলল, তোমরা এ ধরনের কথাবার্তা থেকে বিরত হও, নতুবা আমরা তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দেব। এভাবে তারা রাসূলদেরকে প্রথমে হত্যা করার, পরে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার হুমকি দিল।

রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করার কারণে তোমাদের উপর দুর্ভাগ্য নেমে আসছে। আমরা তোমাদেরকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করছি এজন্য কি তোমরা আমাদেরকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার ধমকি দিচ্ছ? বরং তোমরা অত্যন্ত সীমালঙ্ঘনকারী জাতি। অর্থাৎ তোমরা না সত্যকে গ্রহণ করছ, না সত্যকে গ্রহণ করার ইচ্ছা করছ? আল্লাহ তাআলা বলেন, শহরের প্রান্তসীমা হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসলো। অর্থাৎ নবীদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য এবং তাঁদের প্রতি ঈমান প্রকাশ করার জন্য আসলো এবং বলল, হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলদের অনুকরণ কর। তোমরা এমন লোকদের অনুকরণ কর, যারা তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন না এবং তাঁরা সঠিক পথের উপরেই আছেন। এ জন্যে যে, তাঁরা কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই তোমাদেরকে হেদায়েতের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে। তারপর আগত লোকটি নিজেই তাঁর সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিলেন এবং লা শরীক এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করলেন এবং পরকালে কোনই উপকার করতে পারে না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপর যদি ঈমান আনি, তবে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পতিত হবো। তারপর যখন এ মু'মিন ব্যক্তি নিজ জাতির হঠকারিতা সম্পর্কে অবগত হলো, তখন রাসূলদের সম্মুখে এসে বললেন, আমি তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি। আমার এ কথা শুনে নাও এবং রবের কাছে গিয়ে সাক্ষ্য প্রদান কর। অথবা এখানে তিনি নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! শুনে নাও, আমি প্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। যখন মুমিন ব্যক্তি নিজের ঈমান আনার কথা প্রকাশ করলেন, তখন তাঁর অবাধ্য জাতির লোকেরা তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করল। এক বর্ণনা মতে তাঁকে লাঠি দিয়ে হত্যা করল অথবা কোনো যালিম তাঁর সাথে মোকাবিলা করে তাঁকে শহীদ করে দিল। মোটকথা, কোনো না কোনো পন্থায় জাতির লোকেরা তাঁকে খুব কষ্ট দিল। ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সম্প্রদায়ের সব লোকেরা (পর্যায়ক্রমে এ মুমিন) ব্যক্তির শরীরের উপর চড়ল এবং পা দ্বারা পিষ্ট করল। পেটের আঁতুড়ি পিছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে আসলো। ইমাম সাওরী আবু মুজলিমের হতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই মাজলুম শহীদ লোকটির নাম ছিল 'হাবীব ইবনে মুরী'।

কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রি বা তাঁতী। কারো কারো মতে তিনি ছিলেন মুচি অথবা রংশিল্পী। অপর এক বর্ণনা মতে, তিনি সেখানে একটি গুহায় ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হাবীব কুষ্ঠরোগে রোগাক্রান্ত ছিলেন। তাকে তাঁর জাতির যালিমেরা অন্যায়ভাবে হত্যা করে। এজন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে আদেশ দেয়া হলো, 'জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও। তারপর যখন এ শহীদ ব্যক্তি জান্নাতের সবুজ শ্যামলতা ও নেয়ামতসমূহ দেখতে পেলেন, তখন অনুতাপ করলেন। হায়! আমার জাতির লোকেরা যদি জানতে পারত যে, আমার রব আমাকে মাফ করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাহলে তারাও ঈমান আনত এবং এ সব নেয়ামতসমূহ ভোগ করতে সক্ষম হতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ লোক সারাজীবন নিজ জাতির কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে তাদেরকে এ উপদেশ দিয়েছেন যে, হে আমার জাতি! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ কর এবং নিজের মৃত্যুর পরেও তাঁর সম্প্রদায়ের একজন কল্যাণকামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলেছেন হায়! আমার জাতি যদি জানত যে, আমার প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিত লোকদের মধ্যে শামিল করেছেন। ইবনে আবী হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে হযরত কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তি যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সম্মান-ইজ্জত দেখতে পেলেন, তখনও জুলুম-নির্যাতনের কথা ভুলে গিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনা করলেন। সামান্যও অভিশাপ করলেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর কসম! জাতির লোকেরা যখন সে মুমিন লোকটিকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তাআলাও তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলেন। সে শাস্তি এক মহানাদ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারপর তারা সবাই হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। আমি এরপর সে সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোনো বাহিনী অবতরণকারী ছিলাম না। অর্থাৎ আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোনো বাহিনীর মুখাপেক্ষী ছিলাম না; বরং শুধুমাত্র একটি চিৎকারই সে কাজ করেছিল। এ হাদীসই আল্লামা ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহ) বর্ণনা করে বলেছেন, অন্য কোনো বাহিনী অবতরণ করেনি। এর অর্থ হলো, রাসূলদের দুটি দল (গ্রুফ) প্রেরণ করা হয় নি। তবে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী বলেছেন, এখানে প্রথম মতটিই অধিক উত্তম মত।

গ্রন্থকার ইবনে কাছীর (রহ)ও বলেছেন যে, আমার মতেও প্রথম মতটি অধিক যুক্তি। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'আর আমি কোনো বাহিনী অবতরণ করি নি। অর্থাৎ আ. প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বড় কোনো বাহিনীর মুখাপেক্ষী ছিলাম না। যা দ্বারা আমার ওলীদের ও নবীগণের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেব; বরং তা ছিল একটি ভয়ংকর শব্দ। এতেই তারা সবাই নিথর হয়ে গেল। মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন, সে অবাধ্য জাতির নিকট হযরত জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তাদের শহরের দরজাসমূহ সজোরে আঁকড়ে ধরেন এবং শহরের দিকে (ফিরে) এক প্রচণ্ড চিৎকার দেন। ফলে তাদের রূহ শরীর হতে বের হয়ে যায় এবং তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে কাষ্ঠখণ্ডের মতো পড়ে থাকে। অর্থাৎ, শহরের মধ্যে কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। সর্বত্র শুধু নিস্তব্ধতা। এমন কোনো লোক বেঁচে রইল না, যে স্বচক্ষে তার কৃতকর্মের ফল দেখতে পারে। কিন্তু এ সব বর্ণনা এটাই প্রমাণ করছে যে, এ এলাকাটি "ইন্তাকিয়া" ছিল না। কেননা, এদের নিকট তো আল্লাহর রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, যাকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। যার ফলে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ যখন ইন্তাকিয়ার জনগণের নিকট ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি পাঠানো হলো, তখন তারা সকলেই সাথে সাথে রাসূলদের আনগত্য করল। বরং এক বর্ণনা মতে ঈসা (আ)-এর প্রতি সর্ব প্রথম ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে ইন্তাকিয়াবাসী ছিল।

এ প্রসঙ্গে তাবরানী শরীফের একটি বর্ণনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত আছে যে, তিনজন লোক ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নে অগ্রগামী ছিলেন ইউসা ইবনে নূন। ঈসা (আ)-এর প্রতি (ঈমান আনয়নে অগ্রগামী) ছিলেন ইয়াসীনবাসী। আর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়নে অগ্রগামী ছিলেন আলী ইবনে আবূ তালিব (রা)। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়। কেননা, এ বর্ণনাকারীর মধ্যে হুসাইন নামক বর্ণনাকারী এমন, যার বর্ণিত হাদীস মুহাদ্দিসগণ বর্জন করেছেন এবং তিনি ছিলেন কঠোর শী'আপন্থী।

হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বর্ণনা করেন—

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۭ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ۔

অর্থ : ইউনুসের কওম ছাড়া (আর কি কোনো নযীর আছে যে) এক বস্তি আযাব দেখে ঈমান আনল এবং তাদের ঈমান তাদের জন্যে উপকারী প্রমাণিত হলো? ঐ কওম যখন ঈমান আনল, তখন অবশ্য আমি তাদের উপর থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক আযাব দূর করে দিলাম[১] এবং একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিলাম। –সূরা ইউনুস : ৯৮

অনুরূপ কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ)-কে তার উপাধি দ্বারা আহ্বান করে বলেন—

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : আমি মাছওয়ালাকেও[২] ঐ নিয়ামত দিয়েছি। যখন তিনি রাগ করে চলে গেলেন[৩] এবং মনে করেছিলেন, আমি এর কারণে তাকে দোষী সাব্যস্ত করব না, তখন শেষ পর্যন্ত (মাছের পেটে থাকা অবস্থায়) অন্ধকার থেকে আমাকে ডাকলেন,[৪] তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের মধ্যে শামিল ছিলাম। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে নাজাত দিলাম। আর এ রকমভাবেই আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি। –সূরা আম্বিয়া : ৮৭-৮৮

সূরা সাফফাতে আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আ) এর ঘটনা বর্ণনা করেন—

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۞ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ۞ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۞ فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ۞ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ

---

১. *মুফাসসিরীন কেরাম এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহর আযাব আসার খবর জানার পর আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং আযাবের আলামত দেখার পর তার কওম তওবা ও ইসতিগফার (অনুতাপ ও ক্ষমা শিক্ষা) করল, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং আযাব নাযিল করলেন না।*

২. *অর্থাৎ হযরত ইউনুস (আ)। কোথাও তাঁর নাম নেওয়া হয়েছে আবার কোথাও তাঁকে 'যুননূন' এবং 'সাহিবুল হুত' তথা 'মাছওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। তাঁকে এজন্য মাছওয়ালা বলা হয়নি যে, তিনি মাছ ধরতেন বা বিক্রি করতেন; বরং আল্লাহ তা'আলার হুকুমে একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল আর সে কারণেই তাঁকে 'মাছওয়ালা' বলা হয়েছে। যেমন, সূরা সাফফাতের ১৪২নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে।*

৩. *অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের হুকুম আসার আগেই তিনি নিজের কাওমের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর হিজরত সঠিক হয়নি।*

৪. *অর্থাৎ মাছের পেটের মধ্য থেকে, যা নিজেই অন্ধকারময় ছিল এবং এর উপর সমুদ্রের অন্ধকারও যোগ হয়েছিল।*

يُبْعَثُوْنَ ۞ فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۞ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۞ وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ۞ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই ইউনুসও রাসূলগণের একজন ছিলেন। (স্মরণ কর) যখন তিনি একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন। তারপর তিনি এক লটারিতে শরীক হলেন এবং তাতে হেরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি (আল্লাহর নিকট) নিন্দার উপযুক্ত ছিলেন[১]। এ অবস্থায় যদি তিনি তাসবীহকারীদের মধ্যে গণ্য না হতেন, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন[২]। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে অসুস্থ অবস্থায় মরু এলাকায় নিয়ে ফেলে দিলাম এবং তার উপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম। এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এর চেয়ে বেশি লোকদের কাছেও পাঠালাম। তারপর তারা ঈমান আনল। কাজেই আমি তাদেরকে এক বিশেষ সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম। –সূরা সাফফাত : ১৩৯–১৪৮

সূরা কালামে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۞ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۞ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

অর্থ : অতএব, আপনার রবের হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করুন এবং মাছওয়ালার (ইউনুস (আ)[৪]-এর) মতো হবেন না, যখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় কাতরভাবে ডেকেছিলেন। যদি তার রবের মেহেরবানী তার কাছে না পৌঁছত, তাহলে হেয় অবস্থায় খোলা ময়দানে তাকে ফেলে দেওয়া হতো। অবশেষে তার রব তাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাকে নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিলেন। –সূরা কালাম : ৪৮–৫০

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস (আ)-কে 'মসুল' এলাকায় 'নীনাওয়া' বাসীদের কাছে (দ্বীন প্রচারের জন্য) প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং তাঁরই ইবাদত করার জন্য বলেন। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং কুফরীর উপর অবিচল থাকে। তারপরেও ইউনুস (আ) দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন। যখন তিনি দেখলেন যে, তারা কোনোভাবেই আল্লাহর দ্বীনকে কবুল করছেন না, তখন তিনি মনের কষ্টে ও ক্রোধে তাদেরকে তিনদিনের সময় দিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন যে, এর মধ্যে তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি আপতিত হবে।

ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, কাতাদাহ (রহ) ও প্রাচীনকালের আরো কিছু সংখ্যক বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, যখন ইউসুফ (আ) নীনাওয়াবাসীদের ছেড়ে চলে যান ও তাদের প্রতি আল্লাহর আযাব শীঘ্রই আপতিত হবে বলে তারা বুঝতে পারল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে তওবা করার অনুভূতি সৃষ্টি করে দিলেন। তারা নবীকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল সেজন্য অনুতপ্ত হলো। তারা উত্তম পোশাক ত্যাগ করে

১. এ কথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়– ১) হযরত ইউনুস (আ) যে নৌকায় ছিলেন তা অতিরিক্ত বোঝাই ছিল। ২) নৌকার আর অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই লটারি করা হয়েছিল, যে লটারিতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। ৩) লটারিতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠেছিল। সুতরাং তাঁকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। ৪) হযরত ইউনুস (আ) তাঁর রবের অনুমতি ছাড়া নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে এ বিপদে পড়েছিলেন। 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

২. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই হযরত ইউনুস (আ)-এর কবর হয়ে থাকত।

৩. এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি বলার অর্থ এই নয় যে, এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সন্দেহ ছিল; বরং এর অর্থ হলো, যদি কেউ তাদের জনপদ দেখত, তবে এই অনুমানই করতো যে, এই শহরের বসতি এক লাখের বেশিই হবে, কম হবে না।

৪. অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর মতো অধৈর্য হবেন না। ধৈর্যের অভাবের কারণেই (তিনি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে হিজরত করলেন, যার ফলে) তাঁকে মাছের পেটে যেতে হয়েছিল।

জীর্ণবস্ত্র পরিধান করল এবং পুরুষ থেকে স্ত্রীদেরকে আলাদা করে রাখল। এটা শুধু মানুষের বেলায়ই করা হয় নি বরং পশুগুলোকেও এভাবে আলাদা করে রাখল।

তারপর তারা নিজ শহর থেকে বের হয়ে এক মরু প্রান্তরে গিয়ে মাতা-পিতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও শিশুরা সবাই একত্র হয়ে চোখের পানি ঝরিয়ে চিৎকার করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। শুধু এ লোকগুলোই আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেনি, বরং উষ্ট্র, গাভী, বকরী ও অন্যান্য পশুগুলোও তাদের বাচ্চাসহ সেখানে হাজির হয়ে চিৎকার দিয়ে ডাকতে লাগল। মোটকথা, নীনাওয়াবাসী তাদের কৃতকর্মে অনুতপ্ত হয়ে এত অস্থির ও পেরেশান হয়ে পড়েছিল, মনে হয় যেন তারা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করছে। তারপর তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত নাযিল হলো। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ও মেহেরবানীতে তারা সে শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে গেল, যে শাস্তি তাদের মাথার উপর মেঘের কালোটুকরার মতো ঘুরতেছিল এবং সেগুলো তারা দেখছিল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোনো এলাকাবাসী কেন এমন হলো না, যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? অর্থাৎ এর অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকাবাসীরা কেন ঈমান এনেছিল না, যে ঈমানের কারণে আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা এ কথাটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অতীতের কোনো এলাকাবাসীই তাদের কুফরী ও অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসেনি। বরং তারা আল্লাহর আহ্বানকে সরাসরি প্রত্যাখান করেছিল। তবে অতীতের অধিবাসীদের মধ্যে শুধু ইউনুস (আ)-এর এলাকার অধিবাসীরাই ঈমান এনেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ط لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ إِلٰى حِيْنٍ ۞

অর্থ : তবে ইউনুস এর কওম ছাড়া। ঐ কওম যখন ঈমান আনল তখন অবশ্য আমি তাদের উপর থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক আযাব দূর করে দিলাম[১] এবং একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ করে দিলাম। –সূরা ইউনুস : ৯৮

তাদের ঈমানের আল্লাহ তা'আলা নিজেই যখন ঘোষণা করেন, তখন পরকালে তাদের শাস্তি কেন হবে? অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"আমি তাকে ইউনুস (আ)-কে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের কাছে প্রেরণ করেছিলাম ও তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম। এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন— "তাদেরকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করার সুযোগ দিয়েছি।" এ কথার দ্বারা আখেরাতের শাস্তি রহিত হওয়ার সাথে কোনো বৈপরিত্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি এ পৃথিবীতে তাদেরকে জীবিত রেখে পার্থিব নেয়ামত দ্বারা তাদেরকে ভরপুর করে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

ইউনুস (আ)-এর জাতির সংখ্যা অবশ্যই এক লক্ষ ছিল। তবে এর বেশি সংখ্যা হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। সাকহুল (রহ)-এর মতে তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। উবাই ইবনে কাআব (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺকে, وَأَرْسَلْنَاهُ إِلٰى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে, অতিরিক্ত সংখ্যা দ্বারা কত বুঝানো হয়েছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বিশ হাজার। (অর্থাৎ এক লক্ষের অধিক বিশ হাজার ছিল) এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। তা না হলে এ হাদীসে বর্ণিত সংখ্যাই সঠিক বলে বিবেচিত হতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার। তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। ইবনে আব্বাস

১. *মুফাসসিরীনে কেরাম এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহর আযাব আসার খবর জানার পর আল্লাহ তা'আলা বিনা অনুমতিতে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং আযাবের আলামত দেখার পর তাঁর কওম তওবা ও ইসতিগফার (অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা) করল, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং আযাব নাযিল করলেন না।*

(রা)-এর আর এক বর্ণনা মতে, তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার। হযরত ইউনুস (আ)-কে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। মাছের ঘটনার পূর্বে না পরে এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ আছে। আর এ নিয়েও মতভেদ আছে যে, তিনি এক জাতির লোকদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, না দুটি জাতির লোকদের কাছে আলাদা আলাদাভাবে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ তিনটি বিষয়ে আমার প্রণীত তাফসীর গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা আছে।

এর পরবর্তী ঘটনা হলো এই যে, যখন হযরত ইউনুস (আ) তার এলাকায় এসে নৌকায় সাওয়ার হলেন, তখন নৌকাটি কিছুদূর চলার পরে ভীষণ তুফানের মধ্যে পতিত হলো এবং নৌকার মধ্যের লোকজন সবাই ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। এ অবস্থায় আরোহীগণ পরামর্শ করলো, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে একজন অপরাধী লোক আছে। যার কারণে আমরা এ মসিবতে পতিত হয়েছি। সুতরাং লটারির মাধ্যমে এ অপরাধী লোকটিকে চিহ্নিত করতে হবে। তারা সিদ্ধান্ত করল, লটারিতে যার নাম উঠবে তাকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। এ ব্যবস্থা করলে আশা করি আমাদের নৌকাটি হালকা হয়ে যাবে এবং আমরা সবাই এ কঠিন মসিবত হতে বেঁচে যাব। লটারিতে হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম উঠল। তার কারণে অন্যান্য আরোহীগণ প্রথমবারের লটারি বাতিল করে দিয়ে দ্বিতীয়বারের লটারি ফেলল। এবারেও হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম উঠল। হযরত ইউনুস (আ) নৌকার লোকদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজেই কাপড় খুলে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু নৌকার আরোহীগণ তাকে বাধা দিলেন এবং তৃতীয়বার লটারির ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু আল্লাহর কি শান! তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে। এবারেও হযরত ইউনুস (আ)-এর নাম উঠল।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۞ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই ইউনুসও রাসূলগণের একজন ছিলেন। (স্মরণ কর) যখন তিনি একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন। তারপর তিনি এক লটারিতে শরীক হলেন এবং তাতে হেরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মাছ তাঁকে গিলে ফেলল। তখন তিনি (আল্লাহর নিকট) নিন্দার উপযুক্ত হলেন[১]। –সূরা সাফফাত : ১৩৯-১৪২

অর্থাৎ তৃতীয়বার যখন লটারিতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠল, তখন তিনি নিজেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ তা'আলা সবুজ সমুদ্র থেকে একটি বৃহদাকার মাছ প্রেরণ করেন। মাছটি তাকে গিলে ফেলে। আল্লাহ সেটিকে হুকুম দেন যে, এ (নবী) কিন্তু তোমার কাছে আমার আমানত। তার গোশত ভক্ষণ করবে না এবং তাঁর হাড্ডিরও যেন কোনো ক্ষতি না হয়। কারণ, এ (নবী) তোমার খাদ্য নয়। মাছটি আল্লাহর আমানতকে যথাসাধ্য তার নিজের পেটে সংরক্ষণ করে এবং তাকে নিয়ে সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক বর্ণনা মতে, সে মাছটিকে অন্য মাছ গিলে ফেলে। যেটি তার চেয়েও অনেক বড় ছিল। বর্ণিত আছে, যখন ইউনুস (আ) মাছের পেটের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি মারা গেছেন। তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নাড়া দিয়ে যখন অনুভব করলেন যে, সেগুলো নড়ছে, তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। এ অবস্থায় তিনি সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় পড়ে যান এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন—

---

১. এ কথাগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায়– ১) হযরত ইউনুস (আ) যে নৌকায় ছিলেন তা অতিরিক্ত বোঝাই ছিল। ২) নৌকার তার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তাই লটারি করা হয়েছিল যে, লটারিতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। ৩) লটারিতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠেছিল। সুতরাং তাঁকে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল। ৪) হযরত ইউনুস (আ) তাঁর রবের অনুমতি ছাড়া নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে এই বিপদে পড়েছিলেন। 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

"হে আমার রব! আমি আপনার জন্য এমন এক স্থানে মসজিদ (সিজদার স্থান) বানিয়ে নিয়েছি, যেখানে অন্য আর কেউ কখনই আপনার ইবাদত করে নি।"

হযরত ইউনুস (আ) মাছের পেটে কতসময় ছিলেন এ নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে। মুজাহিদ, শাবী (রহ) বলেছেন, সকাল বেলা তাঁকে মাছে গিলেছিল এবং সন্ধ্যা বেলা উদর থেকে বের করে দিয়েছিল। কাতাদাহ (রা) বলেন, ইউনুস (আ) মাছের পেটে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন। জাফর সাদেক (রহ) বলেছেন, তিনি মাছের পেটে সাত দিন অবস্থান করেছিলেন। উমাইয়া ইবনে আবু সালাত (রহ) একটি কবিতার মাধ্যমে তার অভিমত বর্ণনা করেন।

وانت بفضل منك نجيت يونسا * وقد بات في اضعاف الحوت لياليا .

"আল্লাহ তুমি অনুগ্রহে নাজাত দিলে ইউনুসেরে, * ছিলেন তিনি কয়েকটি রাত মাছের গভীর উদরে।"

সাঈদ ইবনে আবুল হাসান ও আবূ মালেক (রহ) বলেছেন, ইউনুস (আ) মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থান করেছিলেন। মোটকথা এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন যে, ইউনুস (আ) কতদিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন। মাছটি ইউনুস (আ)-কে নিয়ে সমুদ্রের গভীর অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেছিল। তিনি সমুদ্রের গভীর তলদেশে বসে শুনছিলেন যে, সমুদ্রের মাছগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাসবীহ পাঠ করছে। এমনকি সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরগুলোও রহমানুর রহীমের তাসবীহ পাঠ করছে।

তিনি (আল্লাহ) আসমান, যমীন ও এর মধ্যস্থ সমস্ত সৃষ্টির এবং সমুদ্র ও সমুদ্রের তলদেশে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই স্রষ্টা। তিনি সকল সৃষ্টির কথা সর্বাবস্থায় শুনতে পান এবং মুখ থেকে যা প্রকাশ করেন তা-ও শুনতে পান। তিনিই মসীবতকে দূর করেন। তিনি ক্ষীণতম শব্দটিও শুনতে পান এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়টি সম্পর্কেও অবগত। তিনি দোয়া শোনেন ও কবুল করেন। চাই সেটি যত বড়ই হোক না কেন। অনুরূপভাবে তিনি (আল্লাহ) তার প্রেরিত রাসূল জনাব মুহাম্মাদ ﷺ আল আমীনের উপর নাযিলকৃত স্পষ্ট কিতাবে বর্ণনা করেন,

"আমি মাছওয়ালাকেও ঐ অনুগ্রহ করেছি। যখন তিনি রাগ করে চলে গেলেন ও মনে করেছিলেন, আমি এর কারণে তাকে দোষী সাব্যস্ত করব না।, তখন শেষ পর্যন্ত (মাছের পেটে থেকে) অন্ধকারের মধ্যে আমাকে ডাকলেন, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয় আমি জালিমদের মধ্যে শামিল ছিলাম। তখন আমি তার দোআ কবুল করলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে নাজাত দিলাম। আর এ রমকভাবেই আমি মু'মিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।"

অর্থাৎ সে সমুদ্রের তলদেশে মাছের উদরে বসেও আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আ)-এর আবেদন শুনেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সে (ইউনুস [আ]) মনে করেছিল যে, আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করব না।" অর্থাৎ আল্লাহ তার জন্য জমিনকে সংকীর্ণ করবেন না। আর এক বর্ণনা মতে, এখানে কুদরত দ্বারা তাকদীর-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোনো কবি বলেছেন—

فلا عائد ذالك الزمان الذى مضى * تبارکت ما يقدر يكن فلك الامر .

"যেই যামানা যায়গো চলে, কোনো দিন তা ফিরে না * নির্ধারিত যাহা আছে তার ব্যতিক্রম ঘটে না।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর সে অন্ধকার থেকে দো'আ করেছিল" এর ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মৎস উদরের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার ও রাতের অন্ধকারসমূহের মধ্যে ইউনুস (আ) আল্লাহকে ডেকেছিলেন। আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। সালিম ইবনে আবুল জাদ (রহ) বলেছেন, ইউনুস (আ)-কে যে মাছটি গিলেছিল সে মাছটিকে আবার অন্য আর একটি বড় মাছ গিলে ফেলেছিল। এ দু' অন্ধকার এবং সমুদ্রের অন্ধকারসহ মোট তিন অন্ধকারের মধ্যে তিনি অবস্থান করেছিলেন। আর এ তিন অন্ধকারের মধ্যে বসেই ইউনুস (আ) আল্লাহকে ডেকেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞

অর্থ : এ অবস্থায় যদি তিনি তাসবীহকারীদের মধ্যে গণ্য না হতেন, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতেন[১]। –সূরা সাফফাত : ১৪৩-১৪৪

অর্থাৎ ইউনুস (আ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' সহ অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করেন ও আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করেন এবং তওবা ও ইস্তেগফার করেন। যদি তিনি এরূপ না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মৎস উদরেই থাকতে হতো। এ ব্যাখ্যাটি হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত আছে। আর এক বর্ণনা এরূপ আছে যে, যদি ইউনুস (আ) মাছের উদরে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র ও গুণকীর্তন বর্ণনাকারী এবং অনুগতশীলদের শামিল না হতেন, তবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত মাছের উদরেই থাকতেন। এ ব্যাখ্যাটি অধিকাংশ মুফাসসির গ্রহণ করেছেন।

যাদের মধ্যে আছে যিহাক বিন কায়স, আতা বিন সায়িব, হাসান বসরী, ইবনে আব্বাস, আবুল আলীয়া, ওহাব বিন মুনাব্বাহ, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, যিহাক ও সুদ্দী (রহ) প্রমুখ। ইবনে জারীর (রহ)ও এ ব্যাখ্যা পছন্দ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একখানা হাদীস এ ব্যাখ্যার স্পষ্ট স্বপক্ষে প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে আব্বাস (রা) কে বলেছেন—

"হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি। আল্লাহকে আল্লাহর (আদেশ-নিষেধকে) হেফাজত করবে, তিনি (আল্লাহ) তোমার হেফাজত করবেন। আল্লাহর নির্দেশাবলী ও তার সমস্ত কথাকে মেনে চল, এতে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার কাছে পাবে। তুমি যদি তোমার আরাম-আয়েশের সময় আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ তোমার কঠিন মসীবতের সময় তোমাকে স্মরণ করবেন।'

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় ইউনুস (আ) আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাও ইউনুস (আ)-এর কঠিন মসীবতের সময় তাঁকে স্মরণ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের উদরে কিছুদিন রাখার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি (আল্লাহ) পূর্বেই মাছটিকে আদেশ দেন যে, ইউনুস (আ)-কে তোমার উদরে নিয়ে যাও। কিন্তু তার গোশত ও হাড্ডির বিন্দু পরিমাণ যেন ক্ষতি না হয়। মাছটি যখন ইউনুস (আ)-কে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে পৌছল, তখন তিনি কিছু শব্দ শুনতে পেলেন। মনে মনে বললেন, এ শব্দ কিসের? আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাকে জানিয়ে দিলেন যে, এ শব্দ হচ্ছে, সামুদ্রিক প্রাণীর তাসবীহ। তখন হযরত ইউনুস (আ)ও মাছের উদরে বসে তাসবীহ পাঠ করেন। ইউনুস (আ) -এর এ তাসবীহ ফেরেশতাগণ শুনে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমরা অচেনা যমীন থেকে একটি ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এ কিসের শব্দ? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ শব্দ আমার বান্দা ইউনুস (আ)-এর। তার থেকে আমার মর্জির খেলাপ একটি কাজ সংঘটিত হয়েছে। এজন্য আমি তাকে সমুদ্রের মধ্যে মাছের উদরে বন্দী করেছি। ফেরেশতাগণ আরজ করেন, তিনি তো একজন নেক বান্দা। যার থেকে প্রত্যহ দিন রাত নেক আমল আপনার কাছে পৌছত। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হ্যাঁ। সে উত্তম তাসবীহ পাঠ করে। অতঃপর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে ইউনুস (আ)-এর মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। আল্লাহর আদেশ মাছটি ইউনুস (আ) কে সমুদ্রের তীরে এনে ফেলে দিল। এ সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, وَهُوَ سَقِيمٌ "সে (এ সময়) ছিল রুগ্ন।" –সূরা সাফফাত : ১৪৫

১. অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটই হযরত ইউনুস (আ) এর কবর হয়ে থাকত।

ইবনে আবী হাতিম তাঁর তাফসীরগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ইউনুস (আ) মাছের উদরে বসে এ কালিমা দ্বারা দো'আ করেছিলেন–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তুমি পবিত্র। আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

এ দো'আর আওয়াজ আরশের নিচে গিয়ে পৌঁছলে ফেরেশতাগণ আরজ করেন, হে আমাদের রব! এ ক্ষীণতম আওয়াজটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। মনে হচ্ছে এ পরিচিত আওয়াজটি কোনো অচেনা স্থান হতে ভেসে আসছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কি এ আওয়াজ চিনতে পার নি। ফেরেশতাগণ বললেন, না। আল্লাহ বললেন, এ আওয়াজ হলো আমার বান্দা ইউনুস (আ)-এর। ফেরেশতাগণ (বিস্মিত হয়ে) বললেন, আপনার বান্দা ইউনুস (আ)-এর দৈনিক মকবুল আমল ও দো'আ তো আপনার মহান দরবারে পেশ হতো।

হে প্রতিপালক! যিনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আপনাকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতেন না, আজ তার এ কঠিন মসীবতের সময়, তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করে, তাকে কি এ মসীবত থেকে উদ্ধার করবেন না? আল্লাহ বললেন, কেন নয়? অবশ্যই করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মাছটিকে আদেশ দিলেন, হে মৎস! তুমি ইউনুসকে তীরে একটি উন্মুক্ত ময়দানে ফেলে এসো।

ইবনে আবী হাতিম হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্ত কিছু শুনেছেন যে, সে খোলা ময়দানে একটি লাউ গাছ ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি পাহাড়ী বকরীরও ব্যবস্থা করে দিলেন। সেটি সকল-বিকাল এসে তাকে দুধ পান করিয়ে চলে যেত। তার আহারের উত্তম ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এভাবে হযরত ইউনুস (আ)-এর দুধ পান চলতে থাকে। কবি উমাইয়া ইবনে সালাত এ প্রসঙ্গে বলেন—

فانبت يقطينا عليه برحمة * من الله لو لا الله اصبح ضاويا .

"লাউয়ের চারা আল্লাহ তা'আলা জন্মালেন সেথায় নচেৎ তিনি দুর্বলতায় হতেন অসহায়।"

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ۞ وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ۞

অর্থ : শেষ পর্যন্ত আমি তাকে অসুস্থ অবস্থায় মরু এলাকায় নিয়ে ফেলে দিলাম এবং তার উপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম। –সূরা সাফফাত : ১৪৫-১৪৬

ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তিনি এমন হয়ে গিয়েছিলেন, যেমন মুরগীর বাচ্চা, যার উপর এখনো পলক গজায় নি। ইবনে আব্বাস (রা) ও যায়েদ (রহ) বলেছেন, তার শারীরিক অবস্থা ছিল সদ্য প্রসূত বাচ্চার অনুরূপ। তিনি ছিলেন তখন অত্যন্ত নরম তুলার ন্যায়। শরীরের উপর কিছুই ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "আমি তার উপর লাউগাছ উৎপন্ন করলাম।" এর ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা), ইকরামা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জোবায়ের, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ, যিহাক, আতা খোরাসানী (রহ) ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, এখানে লাউগাছকেই বুঝানো হয়েছে।

আলেমগণ কেউ কেউ বলেছেন, লাউগাছ উৎপন্ন করার মধ্যে অনেক উপকারিতা আছে। লাউগাছের পাতা নরম ও কোমল হয়ে থাকে। এর পাতা খুব বেশি হয় এবং ছায়াও ঘন হয়। মাছি এ গাছ থেকে দূরে থাকে। এ গাছের ফল ধরার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খাওয়া যায়। কাচা ও রান্না করে খাওয়া যায়। বাকলসহ ও বাকল ছাড়াও খাওয়া যায়। মোটকথা লাউয়ের মধ্যে অনেক ধরনের উপকারিতা রয়েছে। এতে পেট ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা থাকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর এক বর্ণনায় পূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইউনুস (আ)-এর জন্য একটি পাহাড়ী বকরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেটি জংগল থেকে এসে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা তাঁকে দুধ

পান করিয়ে যেত। এটি হযরত ইউনুস (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম (অর্থাৎ তাঁর দো'আ কবুল করলাম) এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা থেকে। (অর্থাৎ দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের স্থান (মৎস্য উদর) থেকে তাকে রক্ষা করলাম, যাতে সে পতিত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে রক্ষা করে থাকি। অর্থাৎ যে আমার কাছে আশ্রয় কামনা করে, আমি তাকে উত্তম আশ্রয় দেই এবং বিপদ থেকে মুক্ত করি।

তাফসীরে ইবনে জারীরে উল্লেখ আছে, সাআদ ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'ইউনুস (আ) এ দো'আ পড়ে, আল্লাহ তা'আলার এ নাম নিয়ে দো'আ করলে দো'আ কবুল হয়, কিছু চাওয়া হলে তা পাওয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দো'আটি কি শুধু ইউনুস (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট, না সমস্ত মুসলমানদের জন্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ দো'আ হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্যে যদিও খাস (নির্দিষ্ট) কিন্তু এটি সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানদের জন্যও, যদি তারা এ কালিমা দ্বারা দো'আ করে। তুমি কি আল্লাহ তা'আলার বাণী শোন নি?

ইউনুস (আ) তাঁর প্রতিপালককে অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল—

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তোমার সত্তা পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি যালিমদের মধ্যে শামিল ছিলাম। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে নাজাত দিলাম। আর এ রকমভাবেই আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি। –সূরা আম্বিয়া : ৮৭-৮৮

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার কাছে যিনি প্রার্থনা করবেন, তিনি যেন ইউনুস (আ)-এর এ দো'আ দিয়ে দো'আ করেন।

সাআদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইউনুস (আ)-এর দো'আর (বাক্য) দ্বারা আল্লাহর কাছে দো'আ করবে, তার দো'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। আবু সাঈদ আল আশজা এক বর্ণনাকারী বলেছেন, এ হাদীসে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি ইঙ্গিত আছে—

وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

অর্থ : আমি মু'মিনগণকে এভাবেই মুক্ত করে থাকি।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উল্লিখিত কালিমা দ্বারা আমার কাছে দোয়া করবে, আমি তাকে অনুরূপভাবে বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবো করব।

হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা

নাম ও বংশ পরম্বরা

মূসা ইবনে ইমরান, ইবনে কাহেস, ইবনে আযের, ইবনে লাওয়ী, ইবনে ইয়াকুব, ইবনে ইসহাক, ইবনে ইবরাহীম (আ)।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, (হে নবী!) স্মরণ করুন এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি একান্ত আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে। –সূরা মরিয়ম : ৫১-৫২

আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র কালামের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে ও সংক্ষেপে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আমি তাফসীরে ইবনে কাসীরে যথাস্থানে সে আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি। এখন আমি এ কিতাবে কুরআন ও হাদীসের আলোকে মূসা (আ)-এর ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের পূর্বসূরীদের থেকে যে সব ইসরাঈলী বর্ণনা বর্ণিত আছে, সেগুলোও আমি এখানে বর্ণনা করব। ভরসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর। আমি তারই অনুগ্রহের প্রত্যাশী। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন, "(তা-সীম-মীম) এ আয়াতগুলো স্পষ্ট কিতাবের। (হে নবী!) আমি আপনার নিকট মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি, মু'মিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরআউন দেশে (মিশরে) পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে দুর্বল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সেদেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করতো। –সূরা কাসাস : ১-৬

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে (সূরায়ে মরিয়মে) সংক্ষিপ্তভাবে এবং পরে (সূরায়ে কাসাসে) বিস্তারিতভাবে মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! আমি আপনার কাছে মূসা ও ফিরআউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বর্ণনা করছি।' অর্থাৎ এভাবে বর্ণনা করেই মনে হয় যেন আপনি নিজে হাজির থেকে এ ঘটনা সচক্ষে অবলোকন করেছিলেন। ফিরআউন দেশে (মিশরে) সৈরাচারী হয়েছিল। সে ছিল অত্যাচারী, সন্ত্রাসী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। পার্থিব স্বার্থ অর্জন করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার তাবেদারী থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। আল্লাহর বান্দাদেরকে সে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছিল। তাকে যারা অমান্য করতো, তাদের প্রতি খুব জুলুম, নির্যাতন ও অত্যাচার করতো। এ মজলুম, নিপীড়িত ও অত্যাচারিত দলটি ছিল বনী ইসরাঈলগণ! যারা ছিল আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর বংশধর। এ সময় আল্লাহর জমিনে এ দলটিই ছিল সর্বোত্তম দল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের বাদশাহ (শাসক) হয়েছিল এক অত্যাচারী, যালিম, পাপী, সন্ত্রাসী ও নাফরমান ব্যক্তি। সে কাফির লোকটি তার নিজের উপাসনা করার জন্যে তাদেরকে (বনী ইসরাঈলদেরকে) বলতো এবং তাদের দ্বারা খুব নীচু ধরনের কাজ করাতো। এটাই শুধু নয়; বরং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত এবং কন্যা সন্তানদেরকে শুধু জীবিত রাখত। এ বাদশাহ ছিল নির্দয়, নিষ্ঠুর ও ভীষণ অত্যাচারী। কাফির বাদশাহর এ জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায়ভাবে পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার কারণ ছিল এই যে, বনী ইসরাঈলের মাঝে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যমানা থেকে একটি সুসংবাদ প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাদের মধ্য হতে একটি শিশু জন্মলাভ করবে। সে শিশুটি বড় হয়ে মিশরের ফিরআউনের রাজত্ব ধ্বংস করে দেবে। এরপর বনী ইসরাঈলের কাছে মিশর রাজ্যের কর্তৃত্ব অতি দ্রুত

চলে আসবে। এ সুসংবাদে ফিরআউন অস্থির হয়ে বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদের হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে এ নাফরমান ও জালিম বাদশাহর অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রাখেন। ফিরআউন এ সুসংবাদ শ্রবণে ভীত হয়ে তখন সর্বত্র নির্দেশ জারি করে দিল যে, শুধু বনী ইসরাঈল থেকে যে সব পুত্র সন্তান জন্মলাভ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। কিন্তু কোনো কৌশল ও সতর্কতা ভাগ্যের লিখনকে পরিবর্তন করতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) এবং আরো কিছু সংখ্যক সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ফিরআউন স্বপ্নে দেখেছিল, একটি অগ্নিশিখা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে চলে এসে মিশরের ঘর-বাড়ি এবং সকল কিবতীদেরকে[১] জ্বালিয়ে দিল। কিন্তু এ অগ্নিশিখা বনী ইসরাঈলের কাউকে আদৌ স্পর্শ করল না। ফিরআউন ঘুম থেকে জেগে দেশের সকল গণক, জ্যোতিষী, যাদুকর ও অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকদেরকে ডেকে এনে তাদের কাছে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলল, বনী ইসরাঈলের থেকে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবে এবং তার হাতেই মিশরবাসীর ধ্বংস হবে। তখন ফিরআউন বনী ইসরাঈলের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করার এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখার আদেশ দেয়। এ শিশু ভূমিষ্ঠের সুসংবাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি ইচ্ছা করলাম সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি দয়া করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও (মিশর) দেশের অধিকারী করতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা এদের দ্বারা তারা আশঙ্কা করতো।

অর্থাৎ দুর্বল ও মজলুমদেরকে সবল ও শক্তিশালী করা এবং বঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে সম্মানিত করা। আল্লাহ তা'আলা এ সব কিছু বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে আ'রাফে বর্ণনা করেন—

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ لا بِمَا صَبَرُوْا ط

অর্থ : আর তাদের জায়গায় আমি ঐ লোকদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম, যাদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখা হয়েছিল। (এটা ঐ এলাকা) যাকে আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম[২]। এভাবে বনী ইসরাইলের পক্ষে আপনার রবের কল্যাণকর ওয়াদা পুরা হলো। কেননা, তারা সবর করেছিল। –সূরা আ'রাফ : ১৩৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "এভাবেই আমি তাদেরকে তাদের বাগ-বাগিচা, ঝরণাধারা, ধন-সম্পদ ও উন্নত বাড়ি-ঘর থেকে বের করে আনলাম।'

মোটকথা, মূসা (আ) যাতে ভূমিষ্ঠ না হতে পারে সে সম্পর্কে ফিরআউন তার সর্বশক্তি ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। এমনকি এলাকাভিত্তিক ধাত্রী ও তথ্য অনুসন্ধানকারী নিয়োগ করল, যাতে তারা এলাকায় ঘুরে ঘুরে গর্ভবতী নারীদের তালাশ করে তাদের প্রসবের সময় জানতে পারে। তারপর কোনো নারী যখন পুত্র সন্তান প্রসব করতো, তখন সে সন্তানটিকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই ফিরআউনের নিয়োগকৃত লোকেরা হত্যা করে ফেলত। আহলে কিতাবগণ বলেন, ফিরআউন পুত্র সন্তানদেরকে হত্যার নির্দেশ এজন্য দিয়েছিল যে, যাতে বনী ইসরাঈলের শক্তি প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায় এবং তার বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয়। কিন্তু এ কথাটি অবাস্তব ও ভ্রান্ত। বরং কথাটি এরূপ যে, হযরত মূসা (আ)-এর আগমনের পরেও ফিরআউন পুত্র সন্তান হত্যার আদেশ জারি রেখেছিল। এর কারণ যাতে বনী ইসরাইলের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি না পায়। আর হযরত মূসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে পুত্র সন্তান হত্যার যে আদেশ দিয়েছিল, তা ছিল শুধু হযরত মূসা (আ)-এর আগমনকে প্রতিহত করার জন্যই।

---

১. বনী ইসরাঈলের বিরোধী ফিরাউনের দল।

২. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারী করা হলো। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এলাকার জন্যই এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যে, 'আমি এর মধ্যে বরকত দান করেছি'।

কুরআন মাজীদে এ কথাটি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَآءَهُمْ ط

অর্থ : যখন মূসা তাদের নিকট আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বলল, মূসার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ।

–সূরা মু'মিন : আয়াত ২৫

হযরত মূসা (আ)-এর আগমনের পূর্বেও এবং পরেও বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে ফিরআউনের আদেশ হত্যা করা হয়েছিল।

বনী ইসরাঈলগণ বলেছিল, "(হে মূসা!) আমরা তো তোমার আগমনের পূর্বেও নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আগমনের পরেও।" –সূরা আরাফ : ১২৯

মোটকথা ফিরআউন হযরত মূসা (আ) -এর আগমনের পূর্বে বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তান হত্যার যে আদেশ দিয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু হযরত মূসা (আ)-এর আগমনকে প্রতিহত করা। যাতে তিনি কোনোভাবেই পৃথিবীতে না আসতে পারেন। আর তার আগমনের পরে এ হত্যাকারী রেখেছিল বনী ইসরাঈলের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট করে দেয়ার জন্যে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের এত সতর্কতা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ভূমিষ্ঠ হন এবং নিরাপদে প্রতিপালিত হন ফিরআউনের ঘরে। এ অবস্থায় তাকদীর ফিরআউনকে উদ্দেশ্য করে যেন বলছে, হে স্বৈরাচারী ও অত্যাচারী ও বিপুল সেনাবাহিনী ও রাজ্যের অধিকারী হওয়ার গর্বে গর্বিত ও অহঙ্কারী বাদশাহ! তুমি শুনে নাও, মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে কেউ বিন্দু পরিমাণ নাড়াতে পারে না। আর তার লিখনকে কেউও পরিবর্তন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এ শিশুটিকে পৃথিবীতে পাঠানোর ইচ্ছা করেছেন, যার ভয়ে তুমি থর থর করে কাঁপতে ছিলে। যার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি অন্যায়ভাবে অনর্থক অগণিত অসংখ্য কলিকে প্রস্ফুটিত হওয়ার পূর্বেই হত্যা করে ফেলেছ। তুমি আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতের লীলাখেলা অবলোকন কর, যার ভয়ে তুমি এত কিছু করেছ, তাঁকেই তিনি তোমার নিজ ঘরে প্রতিপালন করাবেন। শুধু তাই নয় বরং তোমার নিজ বিছানায় লালন-পালন করাবেন। তার খাদ্যও তোমার আহার খাদ্য থেকেই ব্যবস্থা করবেন। সে তোমার ঘরেই লালিত হবে। আল্লাহর কুদরতের কি লীলাখেলা! হে ফেরআউন! তুমি তাকে তোমার পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাঁর লাল-পালনের সুব্যবস্থা করবে। তার সেবা-যত্নের জন্য সেবক-সেবিকা নিয়োগ করবে। কিন্তু তুমি এর মূল রহস্য কোনো অবস্থাতেই জানতে পারবে না। তারপরেও তুমি কিভাবে খোদায়ী দাবি করতে পার? হে ফিরআউন, তুমি জেনে রেখ! এ শিশুর হাতেই তোমার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, ইহকালেও এবং পরকালেও। কেননা, তিনি তোমার কাছে সত্য নিয়ে আগমন করবেন। কিন্তু তুমি সে সত্যের বিরোধিতা করবে এবং তার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হবে তা তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। আল্লাহ তা'আলা তার এ কুদরত এজন্য দেখাবেন, যাতে গোটা সৃষ্টি বুঝতে পারে যে, কিরূপে তিনি তোমার চেষ্টা, কৌশল ও শক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনিই (আল্লাহ) আকাশ ও পৃথিবীর তথা গোটা সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। তিনিই মহা পরাক্রমশালী ও মহা শাস্তিদাতা।

তার শক্তি ও ইচ্ছাকে বিন্দুমাত্র কেউ টলাতে পারে না। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন যে, কিবতীরা (অর্থাৎ ফিরআউনের লোকেরা) ফিরআউনের কাছে এসে বনী ইরাঈলের সংখ্যা কমে যাওয়ার ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়ে বলল যে, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে ধারাবাহিকভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে। এতে পরবর্তীতে তাদের বড়রাও বিনাশ হয়ে যাবে সুতরাং কিবতীদেরও অনুরূপ কাজ করতে হবে, যেরূপ নিকৃষ্ট ও অন্যায় কাজ বনী ইসরাঈলদের থেকে হচ্ছে। ফিরআউন একটু কৌশল করে পুনরায় এ আদেশ জারী করলো যে, এক বছর তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে আর এক বছর এ হত্যা থেকে বিরত থাকা হবে। এভাবে চলতে লাগল।

মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর বড় ভাই হযরত হারুন (আ) হত্যা বিরত থাকার বছর ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। আর হযরত মূসা (আ) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন হত্যা করার বছর। হযরত মূসা (আ) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তার মা অত্যন্ত অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, গর্ভ অবস্থায় তো তিনি তার গর্ভকে গোপন রেখেছিলেন। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তার গর্ভের লক্ষণও বাহ্যিকভাবে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ব্যাপারটি তো সূর্যের মতো প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এখন কিভাবে তিনি তার এ প্রিয় সন্তানকে ফিরআউন বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করবেন, সে চিন্তায়ই তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। এ চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তিনি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যে সিদ্ধান্তটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল।

সে সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি (মা) একটি সিন্দুক তৈরি করে তার শিশুটিকে সিন্দুকে লুকিয়ে রাখেন। এবং সিন্দুকটিকে একটি রশি দিয়ে বাঁধেন। তার বাড়ি ছিল (নীল) নদীর তীরে। তিনি শিশুটিকে সিন্দুক থেকে বের করে দুধ পান করিয়ে আবার সেখানে লুকিয়ে রাখতেন। যখন কোনো লোকের আগমন অনুভব করতেন, তখন সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দিতেন এবং রশির এক প্রান্ত নিজের হাতে রেখে দিতেন। লোকেরা চলে যাওয়ার পরে রশি ধরে টেনে সিন্দুকটি কাছে নিয়ে আসতেন। এভাবেই তিনি শিশুটিকে প্রতিপালন করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"আমি মূসার মাকে ইঙ্গিত করলাম, তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে থাক, তারপর যখন তার জীবন সম্পর্কে তোমার ভয় হবে, তখন তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। কোনো ভয় ও দুঃখ করবে না। আমি তাকে তোমারই কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করবো। শেষ পর্যন্ত ফিরআউনের পরিবারের লোকেরা তাকে (নদী থেকে) তুলে নিল, যাতে তিনি তাদের দুশমন হন এবং তাদের দুঃখের কারণ হন। নিশ্চয়ই ফিরাউন, হামান ও তাদের দু'জনের সেনাবহিনী (তাদের প্রচেষ্টায়) বড়ই ভুলের মধ্যে ছিল। ফিরাউনের স্ত্রী (তাকে) বলল, এ শিশুটি আমার ও তোমার চোখ জুড়ানোর মতো। তাকে মেরে ফেল না। হয়তো সে আমাদের জন্য উপকারী হবে কিংবা তাকে সন্তান বানিয়ে নেব অথচ (এর পরিণাম সম্পর্কে) তাদের কোনো চেতনাই ছিল না। -সূরা কাসাস : ৭-৯

হযরত মূসা (আ)-এর মাতার প্রতি এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তঃনিক্ষিপ্ত বাণী (ইলহাম)। রাসূলদের প্রতি যেরূপ ওহী অবতীর্ণ হতো, সেরূপ ওহী ছিল না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র মধুমক্ষী সম্পর্কেও ইরশাদ করেছেন, "হে নবী! আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা আদেশ দিয়েছেন, গৃহ তৈরি কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ তৈরি করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর। তারপর তোমরা প্রতিপালকের সহজ পথ (পদ্ধতি) অনুসরণ কর এবং তার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়।"

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর মাতার প্রতি যে আদেশ দেয়া হয়েছিল, সেটি সেরূপ ওহী নয়, যা নবী রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল।

ইবনে হাযম (র) ও কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদের অভিমত এই যে, মূসা (আ)-এর মায়ের প্রতি নবী রাসূল (আ)-দের মতই ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল। এ কথাটি সঠিক নয়। বরং প্রথম কথাটিই সঠিক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পক্ষ থেকে আবুল হাসান আশআরী (রহ) এটিই বর্ণনা করেছেন। আল্লামা সুহাইলী (রহ) বলেন, মূসা (আ)-এর মাতার নাম 'আয়া রেখা'।) আরেক বর্ণনায় তার নাম 'আয়া যাখত'।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে এ কথার ইঙ্গিত দিছেলেন। আর এ কথার ইঙ্গিতও দিছেলেন যে, তোমার সন্তানের ব্যাপারে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা ও ভয় কর না। সে (শিশু) যেখানেই থাক না কেন, তাকে আল্লাহ তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেবেন। আরো সুসংবাদ হচ্ছে এ যে, তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করে সম্মানিত করা হবে এবং ইহকাল ও পরকালে তার কালেমা উজ্জ্বল ও সমুন্নত করা হবে। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করলেন। প্রতিদিনের মতো একদিন ফিরআউন বাহিনীর লোকের আগমন দেখে, তিনি শিশু মূসা (আ)-কে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে সিন্দুকটি নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর কি

ইচ্ছা! সেদিন সিন্দুকটির রশির এক মাথা নিজের হাতে রাখতে ভুলে গিয়েছিলেন। সিন্দুকটি রশিসহই ভেসে চলে গেল। নদীর তীরেই ছিল ফিরআউনের রাজ প্রসাদ। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ـ

অর্থ : সিন্দুকটি যখন ভেসে যাচ্ছিল তখন সেদিকে 'ফিরআউনের লোকেরা উঠিয়ে নিল। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে।

কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, আয়াতে বর্ণিত لِيَكُوْنَ এর মধ্যে لام (লাম) অক্ষরটি শেষফল কিংবা পরিণাম প্রকাশক। এটির সম্পর্ক فَالْتَقَطَهُ এর সাথে। অর্থাৎ তাকে (নদী থেকে) উঠানোর পরিণাম, তাদের জন্যে অমঙ্গলই হবে। এ ছাড়া لام (লাম) টি বাক্যের বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং কারণ প্রকাশক হলে তখন অর্থ হবে, "ফিরআউনের লোকেরা সিন্দুকটি তুলে নিল, যাতে তাদের জন্য এটি বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায়—

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَاطِئِيْنَ ـ

অর্থ : ফিরআউন ও হামান এবং তাদের সৈন্যরা ছিল অন্যায়কারী। (অর্থাৎ তাদের কৃত কাজগুলো খুবই জঘন্য ছিল) যে কারণে তারা শাস্তি ও দুঃখের স্বাদ আস্বাদন করবে।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, ফিরআউনের দাসীরা এ সিন্দুকটি তুলে নিয়ে ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়ার সামনে এনে রেখে দিল। তারা সিন্দুকটি খুলতে সাহস পেল না। এক বর্ণনা মতে, আসিয়া মূসা (আ)-এর সময়কার মুসলমান বাদশাহ রাইয়্যানের পৌত্রী ছিল। মুফাসসিরগণ তার বংশ পরম্পরা এরূপ বর্ণনা করেছেন, আসিয়া বিনতে মুযাহিস ইবনে আসাদ ইবনে রাইয়্যান ইবনুল ওয়ালীদ। অন্য এক বর্ণনা মতে, আসিয়া ছিলেন মূসা (আ)-এর গোত্রের বনী ইসরাঈলের একজন মহিলা। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর ফুফু। আল্লামা সুহাইলী (রা) এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আসিয়া (আ)-এর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী হযরত মরিয়ম (আ)-এর কাহিনীতে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। তারা দু'জন জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের মর্যাদা লাভ করবেন। আসিয়া (রা) যখন সিন্দুকটির ঢাকনা খুলে উপর থেকে কাপড়টি সরিয়ে ফেললেন, তখন সিন্দুকটির মধ্যে আলোকোজ্জল একটি শিশু দেখতে পেলেন। যার চেহারায় নবুওয়াত রিসালাতের নূর চমকাচ্ছিল। তার চেহারার উজ্জ্বলতায় সারাঘর আলোকিত হয়ে গেল। আসিয়া (রা)-এর নেকনজর এ উজ্জ্বলময় চেহারার উপর পড়ার সাথে সাথেই শিশুটির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। শিশুটির প্রতি মায়া-মহব্বতে তার অন্তর ভরে গেল। ফিরআউন এসে আসিয়া (রা)-কে জিজ্ঞেস করল এ শিশুটি কে? এরপর শিশুটিকে হত্যা করার আদেশ দিল। আসিয়া (রা) শিশুটিকে রক্ষা করার জন্য ফিরআউনের কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানিয়ে বললেন, এ শিশুটিকে উপহারস্বরূপ আমাকে দান করুন। এটি হবে আমার ও আপনার জন্য নয়ন শান্তিকর। ফিরআউন উত্তরে বলল, এ শিশুটি তোমার জন্য নয়ন শান্তিকর হবে। কিন্তু আমার জন্য নয়। অর্থাৎ এ শিশুটি আমার প্রয়োজন নেই। ফিরআউনের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাটিই তাকে বিনাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, খোদার কসম যদি ফিরআউন বলতো যে, এটি আমার জন্যও নয়ন শান্তিকর হবে, তবে সেও হেদায়েতের নূর লাভ করতো। বে-আদব আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। এরপর আসিয়া (রা) বললেন, 'সে আমাদের উপকারে আসতে পারে।" আল্লাহ তা'আলা তার আশা পূর্ণ করেছিলেন। পৃথিবীতে মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তিনি হেদায়েতের নূর লাভ করেছিলেন এবং আখেরাতেও তার মাধ্যমে তিনি জান্নাত লাভ করবেন। আসিয়া (রা) এরপর বলেছিলেন যে, "আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। আসিয়া (রা)-এর এ কথাটিও পূর্ণ হয়েছিল। তারা দু'জনেই তাকে পালকপুত্র বানিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, তাদের

কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা এর পরিণাম ফল বুঝতে পারে নি।" অর্থাৎ তারা ধারণাই করতে পারে নি যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। কারণ, তাদের মূসা (আ)-কে নদী থেকে উঠানো, ফিরআউন ও তার বাহিনীর জন্য মহা শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আহলে কিতাবদের মতে, হযরত মূসা (আ)-কে নদী থেকে তুলেছিল ফিরআউনের কন্যা দুরতাবা। কিন্তু এ মত সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"ওদিকে মূসার মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠল। আমি তার মনকে মজবুত করে দিলাম, যাতে (আমার অঙ্গীকারের প্রতি) সে বিশ্বাসী হয়। (যদি আমি তা না করতাম) তাহলে সে (অস্থির হয়ে) গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলত। সে (শিশুটির) বোনকে বলল, তুমি এর পেছনে পেছনে যাও। কাজেই সে দূর থেকে এরূপভাবে তার দিকে লক্ষ্য রাখল যে, (দুশমনরা) টেরও পেল না। আর আমি আগে থেকেই (অন্য সকল মহিলার) বুকের দুধ এর জন্য হারাম করে রেখেছিলাম। (এ অবস্থায়) মূসার বোন তাদেরকে বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা একে প্রতিপালন করবে এবং আদর-যত্ন করে তাকে রাখবে? এভাবে আমি মূসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম। যাতে তার চোখ ঠাণ্ডা হয়, সে চিন্তিত না হয় এবং জানতে পারে যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ লোকই এ কথা জানে না।" -সূরা কাসাস : ১০-১৩

ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রহ), ইকরামা (রা), সাঈদ ইবনে জোবায়ের, আবু ওবায়দা, হাসান, কাতাদাহ ও যিহাক (রহ) প্রমুখ বলেছেন, "মূসা (আ)-এর মায়ের হৃদয় অস্থির হয়ে পড়ার অর্থ মূসা (আ) ছাড়া পৃথিবীর সবকিছুই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আর "সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত' এর অর্থ, সন্তানের বিচ্ছেদে অস্থির হয়ে ধৈর্য হারিয়ে তিনি প্রকাশ্যে তার সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করা শুরু করতো। আল্লাহ যদি তার হৃদয়কে মজবুত না করে দিতেন এবং তার অন্তর থেকে দুঃখ-বেদনা দূর না করতেন তবে তিনি প্রকাশ্যেই এ সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা শুরু করে দিতেন। তার বড় কন্যাকে তার পেছনে পেছনে খবর নেয়ার জন্য পাঠালেন। সে তাদের অজান্তে দূর হতে দেখছিল। মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, সে বহুদূর থেকে দেখতেছিল। কাতাদাত (রহ) বলেছেন, সে এমনভাবে দেখছিল, যাতে কেউ বুঝতে না পারে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা তো বুঝতে পারছিল না'। শিশু মূসা (আ)-কে ফিরআউনের লোকেরা যখন ফিরআউনের বাসভবনে নিয়ে আসল, তারা তাকে দুধ পান করানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মূসা (আ) কোনো মহিলার বুকের দুধ পান করলেন না ও কোনো খাদ্যও গ্রহণ করলেন না। ফিরআউনের লোকেরা এতে পেরেশান হয়ে পড়ল। তারা মূসা (আ)-কে যেকোনো খাদ্য খাওয়াতে অথবা কোনো মহিলার দুধ পান করতে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হলো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি পূর্ব থেকেই (অন্য মহিলার) দুধ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম।"

অবশেষে ফিরআউনের লোকেরা এতখানী পেরেশান হয়ে পড়ল যে, ধাত্রীর সাথে তাকে শহরে অন্যান্য মহিলাদের কাছে পাঠালো, যাতে তারা এমন কোনো মহিলা তালাশ করে বের করতে পারে কিনা, যার দুধ সে পান করতে রাজি হয়।

আল্লাহর কি আশ্চর্য কুদরত! যার কারণে ফেরআউন লক্ষ লক্ষ শিশু হত্যা করে ফেলেছে। অথচ সে শিশুটিই ফিরআউনের ঘরে তার লোকের দ্বারা পালিত হচ্ছে। ফিরআউনের লোকেরা শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে পেরেশান ঠিক এমন সময়, মূসা (আ)-এর বোন, তার ভাইকে দেখে ফেললেন। বোন তার পরিচয় গোপন রেখে লোকদের কাছে বললেন, 'তোমাদের কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের হয়ে তাকে লালন-পালন করবে এবং তার কল্যাণকামী হবে।"

লোকেরা তাকে বলল, "তুমি কিভাবে জানলে যে, তারা তার কল্যাণকামী ও তার প্রতি দয়ার্দ্র হবে"। বোন জবাবে বলল, বাদশাহর সন্তুষ্টি এবং শিশুটির কল্যাণের জন্যই আমি এ কথা বলেছি। লোকেরা তার কথাকে গ্রহণ করল এবং শিশুটিকে সাথে করে তারা তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে শিশুটিকে তার মায়ের কোলে

তুলে দিল। তারা কি জানত যে, এ মহিলাই তার মা? যখন মহিলা তার স্তনের কাছে শিশুটির মুখ লাগিয়ে দিলেন তৎক্ষণাৎ শিশু মূসা (আ) দুধ পান করা শুরু করে দিলেন এবং তৃপ্তিসহ দুধ পান করলেন।

শিশু মূসা (আ)-কে দুধ পান করতে দেখে, ফেরআউনের লোকেরা সন্তুষ্ট হলো এবং তাদের পেরেশানি দূর হলো। আসিয়া (আ)-এর কাছে এ সুসংবাদ পৌঁছলে তিনি এ মহিলাকে (অর্থাৎ মূসা (আ)-এর মাতাকে) নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, আপনি আমাদের বাসভবনেই থাকবেন এবং এখানে বসে এ শিশুটির লালন-পালন করবেন। আমি আপনার খেদমত করব। কিন্তু মূসা (আ)-এর মা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আমার স্বামী ও সন্তানেরা চিন্তার মধ্যে থাকবে। তবে এটা হতে পারে যে, এ শিশুটিকে আমার সাথে দিয়ে দেবেন। আমি আপনার জন্য শিশুকে আন্তরিকভাবে লালন-পালন করব। আসিয়া (আ) শিশুটিকে মায়ের সাথে দিয়ে দিলেন। তিনি তার জন্য কিছু সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন এবং কাপড়-চোপড়সহ বিভিন্ন মূল্যবান মালামাল সাথে দিয়ে দিলেন। মূসা (আ)-এর মা শিশু মূসাকে নিয়ে বাড়ীতে চলে আসেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মা ও পুত্রের দুটি কলিজা পুনরায় মিলনতা করলেন। প্রথমে ভয় ছিল আর এখন তিনি নির্জনে প্রশান্ত মনে সরকারের নির্দেশে শিশুটির লালন-পালন করছেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কি কুদরত! আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অর্থাৎ আমি যে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার এবং রিসালাত প্রদানের ওয়াদা দিয়েছিলাম, সে ওয়াদা অনুযায়ী তাকে উত্তমভাবে ফিরিয়ে দিলাম। সুতরাং পরবর্তীকালে রিসালাতের ওয়াদার সত্যতাও স্পষ্ট। কিন্তু "তাদের অধিকাংশ লোকই এটা জানে না।" যে রাতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সাথে তূর পর্বতে (অদৃশ্যে) একান্তে কথা বলেছিলেন, সে সময়ও তার মায়ের কাছে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার অনুগ্রহের কথা সর্বপ্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"আপনার উপর আরো একবার আমি অনুগ্রহ করেছিলাম। (স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা) যখন আমি আপনার মাকে ইঙ্গিত করেছিলাম এমন ইঙ্গিত, যা ওহীর মাধ্যমেই করা যায়। এ শিশুটিকে একটি সিন্দুকে রাখুন ও সিন্দুকটিকে নদীতে ভাসিয়ে দিন। নদী তাকে কিনারে পৌঁছিয়ে দেবে এবং তাঁকে আমার এক দুশমন ও এ শিশুটির দুশমন তুলে নেবে। আর আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ভালবাসা পয়দা করে দিলাম, যাতে আপনি আমার চোখের সামনে লালিত-পালিত হন। -সূরা ত্ব-হা : ৩৭-৩৯

কাতাদাহ (রা) ও আরো কয়েকজন মুফাসসির বলেছেন, উল্লিখিত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা এই যে, আমি তোমাকে আমার শত্রুর ঘরে লালন-পালন করিয়েছি, যাতে তুমি উত্তম খাদ্য ও পোশাক গ্রহণ কর এবং তোমার সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন আমার নিয়ন্ত্রণেই হবে। আমি একজন উত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"(ঐ সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনার বোন (নদীর কিনারে) চলছিল। সে গিয়ে বলল, "আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকের সংবাদ দেবো, যে এ শিশুটিকে ভালোভাবে লালন-পালন করবে?[১] এভাবেই আমি আপনাকে আবার আপনার মায়ের কাছেই পৌঁছে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না হয়। আর (আপনি ঐ কথাও স্মরণ করুন) আপনি এক লোককে হত্যা করেছিলেন। আমি আপনাকে ঐ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে পার করেছি। আপনি মাদইয়ানবাসীর মাঝে কয়েক বছর ছিলেন। হে মূসা! এরপর আপনি সময়মতো এসে গেছেন। -সূরা ত্ব-হা : ৪০

পরীক্ষা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। কুরআনের আলোকে মূসা (আ)-এর শিশুকালের ঘটনা বর্ণনা করলাম। এখন আলোচনা করব তার যৌবনকাল সম্পর্কে।

১. *অর্থাৎ ঝুড়ির সাথে সাথে নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর ফিরাউনের পরিবারের লোক যখন শিশুকে তুলে নিয়ে তার জন্য ধাত্রীর খোঁজ করতে লাগল, তখন হয়রত মূসা (আ)-এর বোন গিয়ে তাদেরকে এ কথা বলেছিলেন।*

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল এবং তার বিকাশ পুরো মাত্রায় হয়ে গেল, তখন আমি তাকে 'হুকুম' ও 'ইলম' দান করলাম। আমি নেক লোকদেরকে এভাবেই বিনিময় দিয়ে থাকি। (একদিন) তিনি এমন সময় শহরে প্রবেশ করলেন, যখন শহরবাসী অসতর্ক অবস্থায় ছিল। সেখানে তিনি দেখতে পেলেন, দু'জন লোক মারামারি করছে। তাদের একজন তার জাতির লোক, অপরজন তার দুশমন কওমের লোক। তার নিজের কওমের লোকটি তার শত্রুপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য ডাকল। মূসা তাকে ঘুষি মারলেন ও তাতে সে মারা গেল। মূসা বলে উঠলেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয়ই সে বড় দুশমন এবং প্রকাশ্য গোমরাহকারী। তখন মূসা দো'আ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন১। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

মূসা (আ)-এর মায়ের কাছ থেকে শিশু মূসা (আ)-কে ফিরিয়ে দেয়ার দয়ার কথা বর্ণনা করার পরেই আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর যৌবন ও যৌবনের সূচনায় তার শক্তির কথা উল্লেখ করেন। এ সময়টি ছিল তার চরিত্র বিকাশের সময়। অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে এ সময় তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এ চল্লিশ বছরের সময়ই আল্লাহ তা'আলা তার ওয়াদা অনুযায়ী তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত প্রদান করেন। যে খবর তিনি (আল্লাহ) মূসা (আ)-এর মাতাকে দুধপান করানোর সময় প্রদান করে ছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তাকে তোমার নিকট ফেরত দিব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব।'

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর রিসালাত ও নবুওয়াত বর্ণনার পরে তার মিশর শহর থেকে বের হওয়া এবং মাদইয়ান শহরে প্রবেশ করা এবং সেখানে অবস্থান করার কারণ বর্ণনা করেন। মূসা (আ) মাদইয়ানে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানেও তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অগণিত অনুগ্রহপ্রাপ্ত হন। বিশেষ করে তিনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় (তূর পাহাড়ে) আল্লাহ তা'আলার সাথে (অদৃশ্যে) কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনেই আসবে।

মিশরে মূসা (আ) কর্তৃক এক ব্যক্তিকে হত্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "সে (মূসা) নগরীতে প্রবেশ করল যখন তার অধিবাসীবৃন্দ ছিল অসতর্ক"।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রা), ইকরামা, কাতাদাহ ও সুদ্দী (রহ) বলেছেন, এ সময়টি ছিল ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যেখানে বসে দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল।" অর্থাৎ একজন অপরজনকে মারছিল এবং একে অপরকে পরাভূত করতে চেষ্টা করছিল। এ দুজনের একজন ছিল মূসা (আ)-এর গোত্রের অর্থাৎ ইসরাঈলী। অপরজন ছিল মূসা (আ)-এর শত্রু কিবতী। ইবনে আব্বাস (রা), কাতাদাহ, সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ)ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মূসা (আ)-এর দলের লোকটি তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর সাহায্য কামনা করল।" মূসা (আ) মিশরে ফেরআউনের পালকপুত্র হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এ কারণে মিশরে তার ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

এছাড়া তিনি ফেরআউনের নিজ গৃহে বিশেষভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে তার মিশরে বিশেষ এক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সব কারণেই বনী ইসরাঈলগণ মিশরে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তারা (বনী ইসরাঈলগণ) মূসা (আ)-কে দুধপান করানোর কারণে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন এবং সম্পর্কের দিক দিয়ে তারা মূসা (আ)-এর মামা হয়ে গিয়েছিলেন। এ সব দিক বিবেচনা করে বনী ইসরাঈলের লোকটি মূসা (আ)-এর সাহায্য কামনা করলে তিনি তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলেন। "তখন মূসা (আ) তাকে ঘুষি মারল' এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেন, তিনি হাতের আঙ্গুলি মুট করে তাকে (ঘুষি) মারলেন। কাতাদাহ (রহ) বলেছেন, তার সাথে একটি লাঠি ছিল, তা দিয়ে তিনি তাকে আঘাত করলেন (এতে সে মারা

১. 'মাগফিরাত' অর্থ উপেক্ষা করা ও ক্ষমা করে দেওয়া এবং গোপন করাও হয়। হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ার মর্ম হচ্ছে- আমার এই গুনাহ (যা আমি ইচ্ছাকৃত করিনি) ক্ষমা করে দাও এবং তা গোপন রাখ। যাতে শত্রুরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারে।

গেল)। এ কিবতীটি ছিল কাফির ও মুশরিক। মূসা (আ) তাকে হত্যা করতে চান নি। তাকে মারার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাকে সতর্ক করা ও ধমক দেয়া। এ কারণে হযরত মূসা (আ) সাথে সাথে বললেন, "এটি শয়তানের (কুমন্ত্রণার) কারণে। সে তো প্রকাশ্য শত্রু বিভ্রান্তকারী।" সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। (আল্লাহ) তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়াশীল। সে বলল, "হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ কারণে আমি আর কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।"

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন— "পরের দিন খুব সকালে মূসা ভয়ে ভয়ে ও সবদিক থেকে বিপদের আশঙ্কা করতে করতে শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ঐ লোকটি যে গতকাল তাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল, আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা তাকে বললেন, "তুমি বড়ই গোমরাহ লোক"। অতঃপর মূসা যখন তাদের দুজনের দুশমনের উপর হামলা করতে চাইলেন তখন ঐ লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল[১] হে মূসা! তুমি গতকাল যেভাবে এক লোককে হত্যা করেছ, তেমনিভাবে আজ আমাকে হত্যা করতে চাও? তুমি এ দেশে জালিম হয়ে থাকতে চাও, সংশোধনকারী হয়ে থাকতে চাও না? তারপর এক লোক শহরের অপর দিক হতে দৌড়ে এসে বলল[২] হে মূসা! কর্মকর্তারা তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। কাজেই এখান থেকে সরে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার হিতকামীদের একজন। এ কথা শুনেই মূসা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং দোয়া করলেন, হে আমার রব! আমাকে জালিম কওম থেকে নাজাত দাও। –সূরা কাসাস : ১৮–২১

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, মূসা মিশর শহরে ভীত ও সতর্ক অবস্থায় রাত্রিযাপন করে, ভোর বেলা সংবাদ নেয়ার জন্যে বাইরে আসলেন। কারণ, মূসা (আ) এ ভয় করছিলেন যে, তার এ ঘটনা কর্মকর্তারা জেনে যাবে এবং তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, মূসা (আ) ইসরাঈলী লোকটির সাহায্যার্থে কিবতীকে হত্যা করেছেন। সুতরাং তারা নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্য হতে একজন। তারপর তার উপর যে কঠিন মসিবত আসবে তা স্পষ্ট। মূসা (আ) এ খবর শোনার জন্য ভোর বেলা শহরে প্রবেশ করলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘটনা ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। মূসা (আ) চিন্তিত ও ভীত অবস্থায় শহরে ঘোরা-ফেরা করছেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন আগের দিন যে ইসরাঈলী লোকটি তার সাহায্য কামনা করেছিল, যার কারণে তিনি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলেন, আজও সেই (ইসরাঈলী) লোকটি অন্য একজন কিবতীর উপর চড়াও হয়ে মূসা (আ)-এর সাহায্য কামনা করছে। মূসা (আ) ইসরাঈলী লোকটিকে তিরস্কার করলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত লোক।" মূসা (আ) এ কথা বলে কিবতীকে ইসরাঈলী লোকটির কবল থেকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে গেলেন। তখন ইসরাঈলী লোকটি মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে বলল, "হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যেরূপ আগের দিন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হতে চাও না?'

কিছু সংখ্যক মুফাসসিরের মত এই যে, এ কথাটি ছিল সেই ইসরাঈলী লোকটির যে আগের দিনের ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিল। যখন সে মূসা (আ)-কে কিবতীর দিকে এগিয়ে যেতে দেখল, তখন সে মনে করেছিল মূসা (আ) তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য আসছেন। কারণ মূসা (আ) প্রথমে তাকে তিরস্কার করেছিলেন এবং এ বলেও ধমক দিয়েছিলেন যে, তুমি তো সুস্পষ্ট একজন বিভ্রান্ত লোক। এভাবে সে মূর্খ ইসরাঈলী মূসা (আ)-এর গোপন বিষয়টি প্রকাশ করে দিল।

---

১. *এ লোক ঐ ইসলাঈলীই ছিল, যাকে হযরত মূসা (আ) আগের দিন সাহায্য করেছিলেন। তাকে ধমক দেওয়ার পর যখন তিনি মিশরীকে প্রহার করতে চলেছেন, তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করেছে যে, তিনি তাকে প্রহার করতে যাচ্ছেন। তাই সে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে এবং নিজের বোকামির কারণে গতকালের হত্যাকাণ্ডের রহস্য ফাঁস করে ফেলেছে।*

২. *অর্থাৎ দ্বিতীয় ঝগড়ায় যখন হত্যার রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে এবং সেই মিশরী গিয়ে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছে তখন এ ঘটনা ঘটেছে।*

এতে তার বিপক্ষ কিবতী লোকটিও হত্যার বিষয়টি অবগত হলো। কেননা, আগের দিন হত্যাকাণ্ডের পর শহরে সবার মুখে একটিই আলোচনা ছিল যে, ফেরআউনের দলের লোকটিকে কে হত্যা করল? এভাবে কিবতী লোকটি হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে নিশ্চিত হলো যে, ইনিই হত্যাকারী। তারপর সে (কিবতী) ফেরআউনের কাছে মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দায়ের করল। তবে এ ব্যাখ্যাটি কিছু সংখ্যক আলেমের। অধিকাংশের বর্ণনা নয়। আর এটাও হতে পারে যে, কিবতীর থেকেই এ কথাটি প্রকাশ পেয়েছিল। কারণ যখন সে মূসা (আ)-কে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখল, তখন সে খুব ভীত হয়ে পড়ল এবং মনে করল যে, তিনি হয়তো ইসরাঈলী লোকটির সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন। তখন সে (কিবতী) অনুমান করে উপরোক্ত কথাটি বলছিল। কিন্তু সে এ প্রসঙ্গে নিশ্চিত ছিল না যে, গতকাল কিবতীর হত্যাকারী ইনিই; বরং সে ধারনা করে বলছিল যে, আজ যখন সে ইসরাঈলী লোকটির সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়েছে, হতে পারে গতকালও এ লোকটিই ইসরাঈলী লোকটির সাহায্য করতে এসে কিবতীকে হত্যা করেছিল। অথবা কিবতী লোকটি যখন দেখল যে, ইসরাঈলী লোকটি খুব জোরে চিৎকার দিয়ে মূসা (আ) কে তার সাহায্যের জন্য ডাকছে, তখন সে ধারনা করল যে, গতকালও এ লোকটি কিবতীকে হত্যা করেছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

মোটকথা যেভাবেই হোক হত্যার সংবাদটি প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং ফেরআউনের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, কিবতীর হত্যাকারী মূসা (আ)। সুতরাং ফেরআউনের বাহিনী মূসার (আ) কাছে আসার পূর্বেই এক ব্যক্তি দ্রুত এসে তাকে বলল, হে মূসা! শহরের কর্মকর্তারা সবাই বসে আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি দ্রুত শহর ত্যাগ করুন। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। তখন মূসা (আ) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় শহর ছেড়ে বের হলেন। অর্থাৎ তখনই মূসা (আ) শহর থেকে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু রাস্তা-ঘাট সবকিছুই ছিল তার কাছে অপরিচিত। আর এমন কেউ ছিল না যার কাছে গিয়ে তিনি আশ্রয় নিবেন বা রাস্তা ঘাট সম্পর্কে জেনে নেবেন। তিনি অপরিচিত রাস্তায় চলতে শুরু করেন এবং জবানে বলতে থাকেন, "হে আমার রব! আমাকে জালিম লোকদের থেকে রক্ষা করুন।"

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "(মিশর থেকে বের হয়ে) যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি বললেন, আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালাবেন[১]। যখন তিনি মাদইয়ানের কূয়ার কাছে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, অনেক লোক তাদের পশুকে পানি খাওয়াচ্ছে। আর তাদের থেকে আলাদা হয়ে একদিকে দুজন মেয়ে তাদের পশুকে আটকে রেখেছে। মূসা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের অবস্থা কী? তারা দুজন বলল, এ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুকে পানি পান করতে পারছি না। আর আমাদের পিতা একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ। এ কথা শুনে মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। অতঃপর একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে দো'আ করলেন, হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে মঙ্গলই অবতীর্ণ কর আমি এরই কাঙাল। –সূরা কাসাস : ২২-২৪

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রাসূল এবং যার সাথে তিনি (তূর পাহাড়ে) কথা বলেছিলেন, তার ব্যাপারে বলছেন যে, সে মিশর থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন। তার ভয় ছিল যে, ফেরআউন বাহিনীর কোনো লোকের সাথে তার দেখা হয়ে যায় কিনা।

কিন্তু তিনি তো বেরিয়ে আসলেন, এখন কোথায় যাবেন? কোন দিকে যাত্রা করবেন, কোনো রাস্তাই তার কাছে পরিচিত ছিল না। কারণ, তিনি কখনো মিশর থেকে বাইরে বের হন নি। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার যাত্রা মাদইয়ানের দিকেই হয়ে গেলো। আল্লাহ বলেন, 'যখন মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করল তখন বলল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ আমি নিশ্চিত যে আল্লাহ আমাকে আমার লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়ে দিবেন। আর সেটাই হলো। এই পথই তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দিল। (অর্থাৎ আল্লাহর মেহেরবানীতে যে পথ ধরে তিনি যাত্রা শুরু করলেন, সে পথেই তিনি মনযিলে মাকসুদে পৌঁছে গেলেন) অর্থাৎ

১. অর্থাৎ সেই রাস্তা, যা দ্বারা আমি নিরাপদে মাদইয়ান পৌঁছাব।

মাদইয়ানের কূপের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। মাদইয়ান শহরে একটি কূপ ছিল। যে কূপটি ছিল মাদইয়ানবাসীদের। যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ কূপের অধিবাসীদেরকে বিনাশ করে দেয়া হয়েছিল। এরা ছিল শোয়াইব (আ)-এর গোত্র।

এ ব্যাপারে আলেমদের দু'ধরনের মত রয়েছে, এক মত অনুযায়ী মাদইয়ানবাসীদের ধ্বংস হয়েছিল মূসা (আ)-এর যমানার পূর্বে। এ অধিবাসীরা 'আসহাবুল আয়কা' নামেও অভিহিত ছিল। তিনি যখন কূপের কাছে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দুজন মেয়ে তাদের পশুগুলোকে আলাদা করে দাড়িয়ে আছে। অর্থাৎ বালিকা দুটি এ উদ্দেশ্যে তাদের পশুগুলো আগলিয়ে রেখেছে, যাতে তাদের পশুগুলো অন্যদের পশুগুলোর সাথে মিলে না যায়। এ বালিকারা সংখ্যায় ছিল দুজন। আহলে কিতাবগণ বলেন, তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন। তাদের বর্ণনা ভুল। তবে এটাও হতে পারে যে, তারা সংখ্যা সাতজনই ছিল। কিন্তু কূপের কাছে এসেছিল দুজন। আহলে কিতাবগণের বর্ণনা যদি সঠিকও হয় যে, তারা (বালিকারা) সংখ্যায় ছিল সাতজন তবে উল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়। অন্যথায় কুরআনের বর্ণনার আলোকে, তারা (মেয়েরা) সংখ্যায় দু'জনই ছিল।

মূসা (আ) (মেয়েদেরকে) বললেন, তোমাদের কী অবস্থা! তারা বললো, আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ। অর্থাৎ আমরা দুর্বল। রাখালরা থাকতে আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছি না। (এ ছাড়া অন্যপুরুষদের উপস্থিতিতে তাদের গা ঘেঁষে পানি পান করানো সম্ভব না।) আর আমাদের পিতাও অতিশয় বৃদ্ধ, তিনি আসতে পারেন না। 'তখন মূসা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করায়।' মুফাসসিরগণ বলেন, রাখালেরা যাবার সময় কূপটির মুখের উপর একখানা পাথর রেখে মুখটি বন্ধ করে যেত। বালিকা দুটি পরিশেষে এসে অবশিষ্ট পানি তাদের পশুগুলোকে পান করাতেন। এ দিন হযরত মূসা (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে সে ভারী পাথরটি উঠিয়ে বালিকাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন। পানি পান করানোর পরে পাথরখানা অনুরূপভাবে রেখে দিলেন। আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা) বলেন, এ পাথরটি সরাতে কমপক্ষে দশ জন লোক প্রয়োজন হতো। অনুরূপভাবে কূপ থেকে বালতিটি উঠাতে অনেক লোকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেটিও তিনি নিজে উঠিয়ে মহিলাদের পশুগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করিয়েছিলেন। এরপর মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এ গাছটি ছিল বাবলা গাছ। তিনি এ গাছটির পাতা খুব সুস্বাদু ও সবুজ দেখেছিলেন। সেখানে বসে তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজ করলেন, "হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন, আমি তার কাঙ্গাল। "এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মূসা (আ) মাদইয়ানে পৌঁছেন, কিন্তু তিনি গাছের পাতা ও কিছু সবজি ছাড়া অন্য কিছু আহার করতে পারেননি। বহু দূর ও অপরিচিত কঠিন পথ অতিক্রম করে আসার কারণে তার জুতা পর্যন্ত পা থেকে খুলে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন নগ্নপা। এ নগ্নপা ও দুর্বল শরীর নিয়েই তিনি খুব অসহায় ও কাতর অবস্থায় গাছের ছায়ায় এসে অবস্থান নিলেন। অথচ এ সময় তিনি ছিলেন সৃষ্টি জগতের মধ্যে আল্লাহর একজন অতি নিকটতম প্রিয় বান্দা। ক্ষুধার কারণে তার পেট পৃষ্ঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিনি তখন এক টুকরা খেজুরের পর্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিলেন। আতা ইবনে সায়েব (রহ) বলেছেন, "হে আল্লাহ আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন, তার আমি কাঙ্গাল।" মূসা (আ) এ দে'আটি মেয়েদেরকে শুনিয়ে বলেছিলেন। যার প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'অল্পক্ষণ পরেই সেই দু'জন ঐ মেয়ের একজন লজ্জার সাথে এসে মসাকে বলল, আপনি আমাদের পশুগুলোকে যে পানি পান করিয়েছেন এর বিনিময় দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। যখন মূসা তার কাছে পৌঁছলেন, তখন তার সকল ঘটনা তাকে শোনালেন। মেয়ে দুটির পিতা বলল, তুমি কোনো ভয় করো না। এখন তুমি জালিম কাওমের হাত থেকে বেঁচে গেছ। মেয়ে দুটোর একজন তার পিতাকে বলল, আব্বাজান! এ লোকটিকে চাকরিতে নিয়োগ করুন। ইনি ভালো লোক, তাকে আপনি কর্মচারী

হিসেবে রাখতে পারেন; সে এমনই হওয়া উচিত যে সবল ও আমানতদার। তাদের পিতা (মূসাকে) বলল, আমার এ দুমেয়ের একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই। এ শর্তে যে, তোমাকে আমার এখানে আট বছর কাজ করতে হবে। আর যদি দশ বছর পুরা কর, তাহলে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার সাথে কড়াকড়ি করতে চাই না। ইনশাআল্লাহ! তুমি আমাকে সৎ লোক হিসেবেই পাবে। মূসা উত্তরে বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এ কথা ঠিক হয়ে গেল। এ দুটো মেয়াদের মধ্যে যেটাই আমি পুরা করে দেই, এরপর আমার উপর কোনো চাপ যেন দেয়া না হয়। আমরা যা কিছু বলছি আল্লাহই এর রক্ষক।' –সূরা কাসাস : ২৫-২৮

অর্থাৎ মূসা (আ) যখন ক্ষুধায় অস্থির ও পেরেশান হয়ে গাছের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন এবং দো'আ করলেন, তখন মেয়ে দুটি সে দো'আ শুনছিল। তারপর তারা পশুগুলোকে নিয়ে অতিদ্রুত বাড়িতে গিয়ে পৌছলেন। আজ তাদের খুব দ্রুত আসতে দেখে তাদের পিতা খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন। (কারণ এর আগে তারা কোনো দিন এত দ্রুত বাড়িতে পৌছে নি) তারা বাড়িতে এসে পিতার কাছে মূসা (আ)-এর কথা বললেন। পিতা শোয়াইব (আ) তার এক কন্যাকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন তাকে নিয়ে আসার জন্য। মেয়েদ্বয়ের একজন লজ্জাজনিত পায়ে তার নিকট আসল এবং বলল, আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করানোর বিনিময় দেয়ার জন্য।

কন্যাটি এ মজুরি দেওয়ার কথাটি স্পষ্টভাবে প্রথমেই এজন্য বলে দিয়েছিলেন, যাতে মূসা (আ)-এর অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। এতে কন্যাটির লাজুকতা প্রকাশ পেয়েছিল। মূসা (আ) তাঁর কাছে এসে সব বৃত্তান্ত বললেন। অর্থাৎ মিশরের সব ঘটনা তার কাছে বললেন। বৃদ্ধ ঘটনাগুলো শুনে বললেন, "ভয় কর না, তুমি জালিম সম্প্রদায় হতে বেঁচে গিয়েছ।" অর্থাৎ তাদের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে এসেছ। এখন কোনো চিন্তা নেই। বালিকাদ্বয়ের পিতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমের মতে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়াইব (আ)। এটিই প্রসিদ্ধ অভিমত। হাসান বসরী (রহ) ও মালিক ইবনে আনাস (রা) এ মতকে সমর্থন করে বলেছেন, ইনি হযরত শোয়াইব (আ)ই। এক হাদীসেও তাঁকে এ নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ হাদীসের সূত্রে কিছুটা সন্দেহ আছে। আলেমগণের আর একটি দল স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত শোয়াইব (আ) তাঁর নিজ জাতির ধ্বংসের পরে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। অতঃপর মূসা (আ) তার সাক্ষাৎ পান এবং তার এক কন্যাকে মূসা (আ) বিবাহ করেন। ইবনে আবী হাতিম প্রমুখ হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ)-এর শ্বশুর ইনিই ছিলেন। তার নাম ছিল শোয়াইব। তিনি কুয়াবাসীদের নেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাদাইয়ানবাসীর নবী ছিলেন না। আর এক বর্ণনা মতে, হযরত মূসা (আ)-এর শ্বশুর ছিলেন হযরত শোয়াইব (আ)-এর ভাতিজা। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন হযরত শোয়াইব (আ)-এর চাচাতো ভাই। কারো মতে তিনি ছিলেন, হযরত শোয়াইব (আ)-এর গোত্রের এক ব্যক্তি। তার নাম ছিল ইয়াসরুন। আহলে কিতাবদের গ্রন্থে এভাবে লিখিত আছে যে, ইয়াসরুন মাদইয়ানের একজন গণক ছিলেন। অর্থাৎ মাদইয়ানবাসীদের নেতা ও সর্দার ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ওবায়দা ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ) আরো বলেছেন যে, তিনি ছিলেন শোয়াইব (আ)-এর ভাতিজা। ইবনে আব্বাস (রা) তার উক্ত বর্ণনার সাথে আর একটু বাড়িয়ে বলেন, তিনি মাদইয়ানবাসী ছিলেন। যা হোক তিনি মূসা (আ)-কে মেহমান হিসেবে খুব সম্মান প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর থাকার সুব্যবস্থা করলেন। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হলো। তারপর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে এ বলে সান্ত্বনা দিলেন যে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কারণ, আপনি এখন জালিমদের হাত থেকে নিরাপদ স্থানে চলে এসেছেন। এ সময় হযরত শোয়াইব (আ)-এর এক মেয়ে পিতার কাছে আবেদন জানালেন যে, 'আব্বাজান! আপনি একে আপনার কাজের জন্য রেখে দিন। এ লোক আপনার পশুগুলো চরাবে। মেয়ে পিতার কাছে যখন মূসা (আ)-এর প্রশংসা করলেন, তখন পিতা কন্যাকে বললেন, তুমি এগুলো কিভাবে জানলে? কন্যা জবাবে বললেন, তিনি কূপের ভারী পাথরখানা একা একা উঠিয়েছিলেন, যা উঠাতে কমপক্ষে দশজন লোকের প্রয়োজন হয়। এতে বুঝা গেল যে, তিনি খুব শক্তিমান। আর যখন আমি তার আগে চলছিলাম তিনি বললেন, আমার পেছনে পেছনে চলো। যখন রাস্তা ঘুরবে, তখন পাথর নিক্ষেপ করে আমাকে পথ নির্দেশ করবে। এতে বুঝা গেল তিনি খুব বিশ্বস্ত।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছে, লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দূরদর্শী লোক ছিলেন তিনজন—

১. হযরত ইউসুফ (আ)-এর মনিব। যখন তিনি তার স্ত্রীকে ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে বলেছিলেন, এর থাকার সুব্যবস্থা কর।

২. হযরত শোয়াইব (আ)-এর কন্যা। যখন তিনি তার পিতাকে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছিলেন, "হে (পিতা) তুমি একে মজুর হিসেবে রেখে দাও। কারণ, তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"

৩. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), যখন তিনি তার পরবর্তী খিলাফতের জন্য হযরত ওমরা (রা)-কে মনোনীত করেছিলেন।

হযরত শোয়াইব (আ) কন্যার কথার উত্তরে হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলেন, "আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই। (কিন্তু) এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। আর যদি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাকে সদাচারী পাবে।"

উক্ত বাণী দ্বারা হযরত আবু হানীফা (রহ)-এর অনুসারীগণ এ মাসয়ালা দিয়ে থাকেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি এভাবে ক্রয় করে যে, এ দুটি দাসের মধ্যে একটি ক্রয় করলাম, তবে তা শুদ্ধ হবে। কারণ, হযরত শোয়াইব (আ) বলেছিলেন যে, দু'কন্যার মধ্যে একজনকে বিবাহ দিব। তবে এখানে কিছু সূক্ষ্ম কথা আছে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত। হযরত হাম্বল (রা)-এর অনুসারীগণ এ আয়াত দ্বারা মাসয়ালা পেশ করেন যে, আহার ও পোষাক প্রদানের বিনিময়ে কাউকে মজুর রাখা জায়েয। যা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তিনি এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, উতবা ইবনে নদর (রা) বলেছেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি ﷺ সূরা কাসাস তিলাওয়াত করলেন। তিনি মূসা (আ)-এর কিসসা পর্যন্ত পৌছে বললেন, মূসা (আ) নিজকে আট কিংবা দশ বছর তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করার জন্য ও পেটের খাদ্যের বিনিময়ে নিজেকে মজুর হিসেবে পেশ করেন। এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজার। তবে হাদীসটি দুর্বল। এ কারণে শুধু এ হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না। এ হাদীসটি ইবনে আবু হাতীম (রা) অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর উত্তর প্রসঙ্গে বলেন, '(মূসা বলল) এ দুটি মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে সম্পর্কে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী। হযরত মূসা (আ) তার শ্বশুরকে এ কথা বলেছিলেন। এ স্বাধীনতা দেয়া সত্ত্বেও মূসা (আ) পূর্ণ দশ বছর পশু চরান।

ইমাম বোখারী (রহ) সহীহ বুখারী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রা) বলেছেন, আমার কাছে হীরার একজন ইয়াহুদী অধিবাসী জিজ্ঞেস করেছিলেন, মূসা (আ) দুটি মেয়াদ কালের কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আমি তো জানি না। তবে আরবের বড় আলেমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি। হযরত সাঈদ (রা) বলেছেন, অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, তিনি দুটি মেয়াদ কালের মধ্যে যেটা অধিক ও উত্তম সেটাই পূর্ণ করেছেন।

আর আল্লাহর রাসূল যখন বলেছেন, তখন তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করেছেন। মুফাসসির ইবনে জারীর (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি জিবরাঈল (আ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেছি দুটি মেয়াদের মধ্যে যেটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ সেটাই পূর্ণ করেছেন। (অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেছেন)। হযরত মুজাহিদ (রহ) থেকে মুরসাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরাঈল (আ)-এর কাছে এ (মেয়াদ কাল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জিবরাঈল (আ) হযরত ইস্রাফীল (আ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন। হযরত ইস্রাফীল (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে জিজ্ঞেস করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুটি মেয়াদের মধ্যে যেটি বেশি কল্যাণকর ও বেশি পরিপূর্ণ।

এরূপ ইবনে জারীর (রা) মুহাম্মাদ ইবনে কাআব (রা) হতেও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, দুটি মেয়াদকালের মধ্যে হযরত মূসা (আ) কোন মেয়াদ পূর্ণ করেছেন? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, দু'মেয়াদকালের মধ্যে যেটি বেশি কল্যাণকর ও পরিপূর্ণ সেটাই পূর্ণ করেছেন। বাযযার ও ইবনে আবী হাতিম (রহ) (কিছু বাড়িয়ে) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো যে, মূসা (আ) দুটি মেয়াদের মধ্যে কোনটি পূর্ণ করেছিলেন? তিনি ﷺ উত্তরে বললেন, এ দুয়ের মধ্যে যেটি বেশি কল্যাণকর। তিনি বলেন, যদি তুমি এটা জিজ্ঞেস কর যে, দুটি কন্যার মধ্যে কোনটিকে বিবাহ করেছিলেন? (তখন আমি বলব) ছোট কন্যাটিকে বিবাহ করেছিলেন। ওতবা ইবনে নদর থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, মূসা (আ) তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা ও পেটের আহারের (অর্থাৎ বিবাহ ও খাদ্যের) বিনিময়ে নিজেকে মজুর হিসেবে পেশ করেছিলেন এবং মজুরির মেয়াদকালও পূর্ণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন? তিনি বলেছিলেন বেশি কল্যাণকর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন।

হযরত মূসা (আ)-এর মাদইয়ান থেকে বিদায়

হযরত মূসা (আ) যখন হযরত শোয়াইব (আ) হতে বিদায় নেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বিদায়ের পূর্বে তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার পিতার কাছে বলে কিছু বকরী নিয়ে নাও, যা দ্বারা আমরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারি। হযরত শোয়াইব (আ) সে বকরীগুলোর সকল বাচ্চা মূসা (আ)-কে প্রদান করলেন, যে বাচ্চাগুলো মায়ের রং এর ভিন্ন রংএ জন্ম নিয়েছে। হযরত শোয়াইব (আ)-এর সব বকরীগুলো কালো ও খুব সুন্দর ছিল। হযরত মূসা (আ) একটি পন্থা অবলম্বন করলেন। (যা তার জন্য মু'জিযার মতোই ছিল।) তিনি হাতে একখানা লাঠি নিয়ে সমস্ত বকরীগুলোকে কূপের কাছে পানি পান করানোর জন্য নিয়ে গেলেন এবং নিজে কূপের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। যখনই কোনো বকরী পানি পান করে কূপের কাছ থেকে ফিরে আসত, তখনই তিনি সে বকরীর শরীরে লাঠি দ্বারা খুব আস্তে আঘাত করতেন। এভাবে এক একটি করে সমস্ত বকরীই তার কাছ থেকে অতিক্রম করে চলে আসলো। যার ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিটি বরকীই দুটি করে বাচ্চা প্রসব করে। দু-একটি বাচ্চা ছাড়া সব বাচ্চাই মায়ের রং এর ভিন্ন রংএ জন্ম নেয়। বাচ্চাগুলো ভালো জাতের বকরী ও সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, যদি তোমরা সিরিয়া বিজয় করতে সক্ষম হও, তখন অবশ্যই তোমরা মূসা (আ)-এর সে বকরীগুলোর আটাশটি জাত দেখতে পাবে। আর সেগুলো হবে শ্যামলা রং-এর।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, যখন আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তার শ্বশুরের দেওয়া মেয়াদ পূর্ণ করেন, তখন তার শ্বশুর তাকে বললেন, বকরীর যে সব বাচ্চা তার মায়ের রং এর ভিন্ন রংএ জন্ম নেবে সেগুলো সব আপনার। মূসা (আ) পানি পান করার জায়গায় কিছু রশি এমনভাবে বাঁধলেন যে, বকরীগুলো তা দেখার সাথে সাথেই ভয়ে অস্থির হয়ে এদিক-সেদিক পালিয়ে যেতে লাগল। তারপর একটি বকরী ছাড়া আর সব বকরীগুলো সাদা-কালো মিশ্রিত রং এর বাচ্চা জন্ম দিল। মূসা (আ) ঐ বছরের সব বাচ্চাগুলো নিয়ে রওয়ানা হলেন।

এধরনের ঘটনা হযরত ইয়াকুব (আ)-ও তার মামা যিনি তার শ্বশুরও ছিলেন, এ দুজনের মধ্যেও ঘটেছিল। যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "যখন মূসা মেয়াদ পুরা করে দিলেন এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, তখন তূর পাহাড়ের দিক থেকে একটি আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিবারকে বললেন, তোমরা এখানেই থাক। আমি একটি আগুন দেখলাম। সেখান থেকে হয়তো আমি কোনো খবর নিয়ে আসব কিংবা আগুনের কোনো টুকরা নিয়ে আসব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন উপত্যকাটির ডান কিনারায়[১] এক বরকতময় স্থানের একটি গাছ থেকে ডাক এল হে মূসা! আমি আল্লাহ

১. অর্থাৎ সেই কিনারা, যা হযরত মূসা (আ)-এর ডান হাতের দিকে ছিল।

রাব্বুল আলামীন। (তাকে হুকুম দেওয়া হলো) আপনার লাঠিটি ছুড়ে দিন। যখন মূসা দেখলেন, লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখন তিনি পেছন ফিরে ছুটলেন এবং একবার ফিরেও দেখলেন না। (বলা হলো) হে মূসা! ফিরে আসুন। ভয় পাবেন না। নিশ্চয়ই আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ। (আবার হুকুম হলো) আপনার হাত আপনার বুকে রাখুন। তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। এতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। আর ভয় থেকে বাঁচার জন্য হাত দুটো বুকে চেপে ধরে রাখুন[১]। ফেরআউন ও তার দরবারের লোকদের সম্মুখে পেশ করার জন্য এ দুটো উজ্জ্বল নিদর্শন (দেওয়া হলো)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক সম্প্রদায়। –সূরা কাসাস : ২৯-৩২

হযরত মূছা (আ) যে তার মেয়দ সম্পূর্ণ করেছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন, "মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করার পর সপরিবারে যাত্রা করল।

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, মূসা (আ) দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ করার পরেও আরো দশ বছর পূর্ণ করেন। 'মূসা (আ) সপরিবারে যাত্রা করল" অর্থাৎ মূসা (আ) তার শ্বশুরের দেশ ছেড়ে সপরিবারে যাত্রা করলেন। কয়েকজন মুফাসসির বলেন, মূসা (আ)-এর আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে পড়ে গেল। তাদের সাথে সাক্ষাতের তীব্র আগ্রহ তার অন্তরে সৃষ্টি হলো। তিনি স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বকরী এবং অন্য আসবাবপত্র নিয়ে চললেন এবং গোপনে মিশরে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করারও সংকল্প করলেন। মুফাসসিরগণ বলেন, এ সফরে তারা এরূপ এক রাতের সম্মুখীন হলো, যে রাতটি ছিল খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও তীব্র ঠাণ্ডা। যে কারণে তারা পথ ভুলে গিয়েছিল। তারা সঠিক রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিল না। অগ্নি উৎপাদক পাথর ঘষে আগুন জ্বালানোর জন্য বার বার চেষ্টা করেও ভীষণ ঠাণ্ডার কারণে ব্যর্থ হলো। রাস্তার কোনই সন্ধান পেল না। এ পেরেশানীর মধ্যে হঠাৎ তূর পাহাড়ের উপর একটি অগ্নিশিখা দেখতে পেলেন। তূর পাহাড় তার ডানদিকে পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল। তিনি অগ্নিশিখা দেখা মাত্রই "তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত তিনি সেটিকে আগুন মনে করেছেন। মূলত সেটি ছিল 'আল্লাহর নূর'।

এটা দেখার সৌভাগ্য সবার হয় না। তারপর তিনি তার পরিবারকে বললেন, "সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য (রাস্তার) খবর আনতে পারি অর্থাৎ এক খণ্ড জলন্ত কাষ্ট আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার।" মূসা (আ)-এর রাতের অন্ধকারে পতিত হওয়ার কথা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "(হে নবী!) আপনার কাছে কি মূসার সংবাদ পৌছেছে? যখন তিনি এক আগুন দেখতে পেলেন[২] তখন তিনি তার পরিবারকে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি একটি আগুন দেখেছি। হয়তো তোমাদের জন্য এক আধটা অগ্নি শিখা নিয়ে আসব কিংবা ঐ আগুনের সাহায্যে পথের দিশা পেয়ে যাব[৩]। –সূরা ত্বা-তা : আয়াত ৯-১০

সূরা নামলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "(তাদেরকে ঐ সময়ের ঘটনা শুনিয়ে দিন) যখন মূসা তার পরিবারকে বললেন, আমি আগুনের মতো কিছু একটা দেখলাম। এখনি আমি সেখান থেকে কোনো সংবাদ বা আগুনের টুকরো নিয়ে আসব, যাতে তোমরা তাপ নিতে পার।

হযরত মূসা (আ) নিজ পরিবারবর্গকে বলেছিলেন, আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য সংবাদ নিয়ে আসব। সত্যিই তিনি সেখান থেকে এক মহা-সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। সে সুসংবাদটি কি ছিল? আর তিনি সেখান

১. অর্থাৎ অথবা যদি কোনো ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হয়, যাতে তোমার মন ভীত হয়ে পড়ে, তখন নিজের হাতে চাপ দিও। এর ফলে তোমার মনে শক্তি সঞ্চার হবে এবং ভয়-ভীতির কোনো প্রভাব তোমার মধ্যে থাকবে না।

২. এটা ঐ সময়ের কথা, যখন হযরত মূসা (আ) কয়েক বছর মাদইয়ানে নির্বাসিত জীবনযাপন করার পর নিজের স্ত্রীকে (যাকে তিনি মাদইয়ানে বিয়ে করেছিলেন) নিয়ে মিসরে ফিরে আসছিলেন।

৩. মনে হয় তখন রাতের বেলা ও শীতের সময় ছিল। হযরত মূসা সিনাই এলাকার মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। দূর থেকে আগুন দেখে তিনি মনে করেছিলেন, হয়তো ওখান থেকে কিছু আগুন পাওয়া যাবে, যা দ্বারা সারা রাত বাচ্চাদেরকে গরম করে রাখার ব্যবস্থা হয়ে যাবে অথবা কমপক্ষে ওখান থেকে পথের দিশা পাওয়া যাবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন দুনিয়ার পথ পাওয়ার; কিন্তু সেখানে মিলে গেল আখিরাতের মুক্তির পথ।

থেকে কি পথ নির্দেশনা নিয়ে আসলেন? সে নির্দেশনা কি ছিল? তিনি সেখানে আগুনের বদলে নূর লাভ করেছিলেন, সেটি কোন নূর?

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "সেখানে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন উপত্যকাটির ডান কিনারায় এক বরকতময় জায়গার একটি গাছ থেকে ডাক এল, হে মূসা! আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।" –সূরা কাসাস : ৩০

সূরা নামালে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করেন— "যখন মূসা সেখানে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ হলো, তিনি বড়ই বরকতময় যিনি এই আগুনে ও এর চারপাশে আছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনিই রাব্বুল আলামীন।'

–সূরা নামাল : ৮

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) মহাপবিত্র ও পরাক্রমশালী। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তা নির্দেশ দেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মূসা! আমি আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে এ পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করেন এবং সেখানকার আদব রক্ষা করে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল তখন আহ্বান করে বলা হলো হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক! অতএব, তোমার জুতা খুলে ফেল। কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ এবং আমি তোমাকে মনোনয়ন করেছি। অতএব, যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তা তুমি মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর। আমিই আল্লাহ, আমা ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। অতএব, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম কর।

কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই নিজ আমল অনুপাতে ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুকরণ করে, সে যেন তোমাকে এটাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্রাচীন কালের ও পরবর্তী কালের মুফাসসিরগণ বলেছেন, যখন মূসা (আ) দূর থেকে আগুন দেখে তার কাছে গেলেন, তখন দেখতে পেলেন যে, একটি কাঁটাযুক্ত সবুজ গাছে অগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে অর্থাৎ জায়গাটি খুব চমকাচ্ছিল। অথচ গাছটি সবুজ রং ও সজীবতায় ছিল পরিপূর্ণ। মূসা (আ) অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এ গাছটি ছিল পাহাড়ের ডান দিকে পশ্চিম প্রান্তে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বলেন, হে মুহাম্মাদ মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। –সূরা কাসাস : আয়াত ৪৪

হযরত মূসা (আ) 'তুওয়া' নামক পর্বতভূমিতে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর এ বৃক্ষটি তার ডানে পশ্চিম প্রান্তে ছিল। এ অবস্থায় তার প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকায় আহ্বান করলেন এবং সর্বপ্রথম তাকে এ পবিত্র উপত্যকার মর্যাদা, সম্মান ও পবিত্রতার জন্য জুতা খোলার আদেশ দিলেন।

এ রাতের বিশেষ এক মর্যাদা ও মাহাত্ম্য হলো এই যে, এ রাতে আল্লাহ তা'আলার সাথে হযরত মূসা (আ) কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আহলে কিতাবগণ বলেছেন যে, হযরত মূসা (আ) এ নূরের তীব্র চমকের কারণে নিজের চেহারার উপর নিজ হাত রেখেছিলেন।

কারণ নূরের তীব্র চমকে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যেমন চাইলেন তার সাথে কথা বললেন। তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের প্রতিপালক। আমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণের জন্যই নামায কায়েম কর। অর্থাৎ আমিই একা সারা জাহানের প্রতিপালক। যিনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। নামায বা অন্যান্য ইবাদত সবকিছুই শুধু তার সন্তুষ্টির জন্যই। অন্য কারো ইবাদত করা জায়েয নয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে কিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এ পৃথিবী অস্থায়ী বাসস্থান। যে বাসস্থান স্থায়ী, যার কোনো শেষ নেই, তা হচ্ছে পরকাল। আর এ

পরকালের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ আমল অনুপাতে ফল লাভ করতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল বা মন্দকর্মের বিনিময় সেখানে তাকে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে একমাত্র তার জন্যই ইবাদত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সে সব লোকদের থেকে এড়িয়ে থাকতে বলেছেন, যারা পরকালে অবিশ্বাসী এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান এবং তিনি যা করতে ইচ্ছা করেন, তা শুধু 'কুন' (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথেই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে মূসা! তোমার ডান হাতে কি?' অর্থাৎ তোমার কাছে দীর্ঘদিন ধরে এ কাঠের লাঠিটি যে রয়েছে এটি সম্পর্কে তুমি কি বল? মূসা (আ) বললেন, 'এটা আমার লাঠি'। আমি এতে ভর দেই এবং এটি দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষ পালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটি আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। অর্থাৎ আমি এটিকে এসব কাজে ব্যবহার করে থাকি। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি এটি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে এটা নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।'

এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক বিষয় এবং মূসা (আ) -কে স্পষ্ট প্রমাণ দেখানো যে, হে মূসা! যে মহান সত্তা (আল্লাহ তা'আলা, তার শান হচ্ছে এই যে, তিনি যা করতে চান তা কুন (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথে হয়ে যায়। সে মহান আল্লাহ যা চান তাই করেন।

আহলে কিতাবগণ বলেন, মূসা (আ) নিজেই মুজেযা এবং স্পষ্ট নিদর্শন প্রার্থনা করেছিলেন। যাতে মিশরবাসীরা তাকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরকে সে মুজেযা ও নিদর্শনগুলো দেখাতে পারেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার হাতে কি? মূসা (আ) বললেন, এটি লাঠি। আল্লাহ বললেন এটা জমীনে নিক্ষেপ কর। তারপর মূসা (আ) সেটাকে যমীনে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) এতে ভীত হয়ে পড়েন। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! তুমি হাত বাড়িয়ে এটার লেজ ধর। মূসা (আ) যখন সাপটির উপর হাত রাখলেন, সাথে সাথে সেটি পূর্বের লাটি হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'আপনার লাঠিটা একটু ফেলে দিন। যখন মূসা দেখলেন যে, লাঠিটা সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে, তখন পেছন ফিরে ছুটলেন এবং পেছনের দিকে দেখলেনও না। (আল্লাহ বললেন) হে মূসা! ভয় করবেন না। আমার সামনে রাসূলরা ভয় পান না। -সূরা নামাল : ১০

অর্থাৎ বৃহৎ এক সর্প হয়ে গেল। যেটি ছিল খুব লম্বা ও মোটা। সেটির মুখ ছিল খোলা। সেটিকে বলা হয় অজগর। সেটি খুব দ্রুত ছোটাছুটি করতেছিল। যেরূপ 'জান' সর্প খুব দ্রুত ছোটাছুটি করে থাকে।

আর এ 'জান' নামক সর্পটি খুব দ্রুতগামী সর্প। অর্থাৎ এসর্প শারীরিক দিক দিয়ে খুবই হালকা ও আকারে খুবই ছোট এবং চলনে খুবই দ্রুতগামী। সেটিকে 'জান' অথবা 'জিনান' সর্প বলা হয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি থেকে সৃষ্ট বৃহৎ আকারের অজগর সর্পটির মধ্যেও 'জান' নামক দ্রুত ও চঞ্চল সর্পটির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। মূসা (আ) সেটি দেখে ভীত হয়ে পিছনে সরে যেতে লাগলেন। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবেই এতে ভয় পেয়ে থাকে। হযরত মূসা (আ) পিছনে তাকিয়েও দেখলেন না। তখন তার রব তাকে ডেকে বললেন, 'হে মূসা! সম্মুখে অগ্রসর হও'। ভয় পেয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদ।' হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশ শোনা মাত্রই পিছনের দিকে ফিরলেন। তারপর আল্লাহর নির্দেশ হলো, '(হে মূসা!) তুমি এটাকে ধর, ভয় করো না, হযরত মূসা (আ) খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তার জামার আস্তিনে হাত রেখে সাপটিকে ধরে সেটার মুখের উপর নিজের হাত রাখেন। আহলে কিতাবগণ বলেন, মূসা (আ) সাপের লেজে হাত রেখেছিলেন। যেভাবেই হোক, যখনই সাপের উপর মূসা (আ)-এর হাত পড়লো তৎক্ষণাৎ সেটি কাঠে রূপান্তরিত হয়ে পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গেল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তির অধিকারী মাশরিক ও মাগরিবের রব।

তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় নিদর্শন প্রদান করে নির্দেশ দেন যে, "তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এরপর হাত বের কর। হযরত মূসা (আ) তার নিজ হাত বগলে রেখে বের করে দেখল যে, তার হাত চন্দ্রের

মতো চমকাচ্ছে। অথচ এটা কোনো শ্বেতি জাতীয় রোগের কারণে নয় কিংবা অন্য কোনো কারণেও নয়। শুধু মুজেযার কারণে এরূপ চমকাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে নির্দোষ শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে। ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত দুটো নিজের দিকে চেপে ধর' তবে পূর্বের হাতের ন্যায় হয়ে যাবে)।

অর্থাৎ হাতের এরূপ নতুন অবস্থা দেখে যদি তোমার ভয় লাগে তবে তোমার হাত তোমার বক্ষের সাথে লাগিয়ে রাখ। তবে প্রথমে যেমন তোমার হাত ছিল, তেমনই হয়ে যাবে।

বক্ষের উপর এরূপ হাত রাখায় ভয় চলে যাওয়া এটা হযরত মূসা (আ)-এর জন্য যদিও নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু ঈমানের বরকতে যে ব্যক্তিই রাসূলের অনুসরণ করবে এবং এরূপ করবে, তার ভয়ও দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অন্তরে যখনই কোনো ভয়ের সৃষ্টি হবে, তখন যদি সে তার নিজের হাত বক্ষের উপর চেপে ধরে তবে তার ভয় দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা সূরা নামলে বর্ণনা করেন— "(হে মূসা!) আপনার হাতটি একটু আপনার বুকে ঢুকিয়ে রাখুন। তা চমকদার হয়ে বের হয়ে আসবে অথচ আপনার কোনো কষ্ট হবে না। (এ দুটো নিদর্শন) ঐ নয়টি নির্দশনের মধ্যে শামিল, যা ফেরাআউন ও তার কওমের নিকট (নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়া হচ্ছে)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক কওম ছিল।

অর্থ এ দুটি নিদর্শন লাঠি ও শুভ্র হাত তোমার কাছে আল্লাহর প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে সূরা কাসাসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এ দুটি প্রমাণ তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত ফেরআউন ও তার পরিষদ বর্গের জন্য। নিশ্চই ওরা সত্যত্যাগী জাতি।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নয়টি নিদর্শনের কথা বলেছেন। যার মধ্য হতে দুটি নিদর্শনের কথা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আর বাকি সাতটি নিদর্শন ও বর্ণিত দুটি নিদর্শন (মোট) নয়টি নিদর্শনের কথা সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। তোমরা বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যখন মূসা তাদের কাছে এলেন তখন ফেরআউন তো এ কথাই বলেছিল হে মূসা! আমি মনে করি তোমার উপর জাদুর আছর পড়েছে। মূসা এ কথার উত্তরে বললেন, তুমি ভালো করেই জানো, এ সব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ নিদর্শন আসমান ও যমীনের রব ছাড়া আর কেউ নাযিল করে নি। হে ফেরাআউন! আমি তোমাকে অবশ্যই একজন হতভাগা মনে করি। -সূরা বনী ইসরাঈল : ১০১-১০২

এখানে শুধু নিদর্শনের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সূরা আরাফে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

"আমি ফেরআউনের লোকদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ ও ফসলের অভাবে ফেলে রেখেছি, যাতে তাদের চেতনা হয়। (তাদের অবস্থা হলো) যখন সুদিন আসে, তখন তারা বলেন, এটা তো আমাদের পাওয়ারই কথা। আর যখন দুঃখের দিন আসে, তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করে। অথচ তাদের দুর্ভাগ্য তো আসলে আল্লাহরই হাতে ছিল। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই তা জানে না। (ফেরআউনের কওম) বলল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য যত নিশানাই নিয়ে আস না কেন আমরা তোমার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না। অবশেষে আমি তাদের উপর তুফান পাঠালাম, পঙ্গপাল ছেড়ে দিলাম, উকুন ছাড়ালাম, ব্যাঙ বের করলাম ও রক্তের বৃষ্টি দিলাম। এসব আলামত আলাদা আলাদা করে দেখালাম। কিন্তু তারা বিদ্রোহ করেই চলল। তারা বড়ই অপরাধী জাতি ছিল। -সূরা আরাফ : ১৩০-১৩৩

এ আলামতগুলো আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং হযরত মূসা (আ) সত্য নবী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। এ নয়টি আলামত ছাড়া অন্য দশটি হলো শরীয়ত সম্পর্কিত আয়াত অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশাবলী। যথা, সুদ না খাওয়া, জুলুম না করা ইত্যাদি।

মোটকথা, হলো দশটি আয়াত শরীয়ত সম্পর্ক। আর নয়টি আয়াত হলো কুদরত সম্পর্কিত। এ দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। এগুলো বিস্তারিতভাবে এজন্য আলোচনা করা হলো যে, কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর মতে এ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। দুটি বিষয়ই এক। অর্থাৎ ঐ নয়টিও শরীয়তী বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত। যা সঠিক নয়। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে এ দুটি নির্দেশ নিয়ে ফেরাআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে যেতে আদেশ দিলেন। কিন্তু হযরত মূসা (আ) বললেন—

'হে আমার রব! আমি তাদের একজন লোককে মেরে ফেলেছিলাম। তাই আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে। আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে ভালো বক্তা। তাকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠাও, যেন সে আমাকে সমর্থন করে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যা মনে করে অস্বীকার করবে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে আমি তোমার হাত মজবুত করে দেবো এবং তোমাদের দুজনকে এমন শক্তি ও দলীল দান করব যে, তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনগুলোর জোরে তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে। –সূরা কাসাস : ৩৩-৩৫

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা ও রাসূলের সাথে যে সব কথা বলেছিলেন সে সম্পর্কে বলেন, যখন আমি মূসা (আ)-কে ফেরআউনের কাছে যেতে আদেশ দিলাম তখন মূসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি মিশরে তাদের এক লোককে হত্যা করে ফেরআউন থেকে নিজকে বাঁচিয়ে এখানে চলে এসেছি। এখন আমার সাথে আমার ভাই হারুনকেও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করুন। যাতে সে আমাকে সাহায্য করে। সে আমার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাষী। সুতরাং তাকে আমার সাথে দিয়ে দিন। সে আমার উত্তম সাহায্যকারী হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলবে। আল্লাহ তা'আলা তার আবেদন কবুল করে বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রধান্য দান করব। অর্থাৎ এমন যুক্তি ও প্রমাণ তোমাকে দান করব, যাতে সে তোমার আদৌ ক্ষতি করতে পারবে না। আমার নিদর্শনের বরকতেই তুমি ও তোমার অনুসাগতরা বিজয়ী হবে।

সূরা ত্বা-হা-এ আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'মূসা আবেদন করলেন, হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্থ করে দিন। আমার কাজকে আমার জন্য সহজ করে দিন। আমার মুখের জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। –সূরা ত্বহা : ২৪-২৫

কথিত আছে, মূসা (আ)-এর কথা একটু অস্পষ্ট ছিল। কারণ, শৈশবে তিনি নিজের মুখে নিজ হাত দ্বারা একটি অঙ্গার প্রবেশ করিয়েছিলেন। ঘটনাটি এরূপ ছিল, মূসা (আ) শৈশবে একবার ফেরআউনের দাঁড়ি ধরেছিলেন। এতে ফেরআউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। তখন আসিয়া (আ) ফেরআউনকে বললেন, এ তো শিশু। এ বুঝে শুনে এ কাজ করেনি। আপনি এ শিশুর সামনে খেজুর ও অঙ্গার দিয়ে পরীক্ষা করুন। ফেরআউন তার বুদ্ধি-বিবেচনা অনুমান করার জন্য তার সামনে খেজুর ও অঙ্গার রাখল। মূসা (আ) ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি খেজুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে মনস্থ করলেন। তখন ফেরেশতাগণ উপস্থিত হয়ে শিশু মূসা (আ)-এর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি অঙ্গারটি হাত দিয়ে উঠিয়ে দ্রুত মুখের মধ্যে দিয়ে দিলেন। এতে তার কথা একটু অস্পষ্ট হয়ে গেল।

তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার কথার অস্পষ্টতা দূর করে দেয়ার জন্যে আবেদন করেন যে, তার অস্পষ্টতা এতটুকু দূর করে দেয়া হোক, যাতে তার কথা মানুষ বুঝতে পারে। সম্পূর্ণভাবে অস্পষ্টতা দূর করে দেয়ার জন্যে দো'আ করেন নি। হযরত হাসান বসরী (রা) বলেন, রাসূল ﷺ গণ আল্লাহ তা'আলার কাছে শুধু এতটুকুই চেয়ে থাকেন যতটুকু তাদের প্রয়োজন। এ কারণে মূসা (আ)-এর কথা কিছুটা অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছিল। কারণ, তিনি তার কথার অস্পষ্টতা সম্পূর্ণ দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেন নি। আর এ কারণেই ফেরআউন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে অপপ্রচার করতো যে, যিনি (তার মনের কথা) বর্ণনা করতে অক্ষম, তিনি কিভাবে রাসূল হতে পারেন?

কথার অস্পষ্টতা দূরীভূত করার জন্যে আবেদন করার পর দ্বিতীয় আবেদন করেছিলেন যে, "আমার পরিবার থেকে আমার জন্যে একজনকে সহকারী বানিয়ে দিন। হারুনকে, যে আমার ভাই। তার সহযোগিতায় আমার হাতকে মজবুত করে দিন এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দিন। যাতে আমরা বেশি করে আপনার তাসবীহ পাঠ করতে পারি ও আপনার কথা বেশি বেশি স্মরণ করি। আপনি তো সর্বদাই আমাদের হাল-অবস্থা দেখছেন। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! আপনি যা চেয়েছেন তা দেওয়া হলো। –সূরা ত্বা-হা : ২৯-৩৬

অর্থাৎ হে মূসা! তোমার সব দরখাস্ত আমি কবুল করেছি এবং যা কিছু তুমি চেয়েছ সবগুলোই আমি তোমাকে দান করেছি। হযরত মূসা (আ) তার ভ্রাতার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে রিসালাতের সুপারিশ করেছিলেন। তা-ও কবুল হয়েছে।

মূসা (আ) আল্লাহর কাছে অতি প্রিয় বান্দা ও মর্যাদাবান ছিলেন বলেই তার ভাইকেও রিসালাতের মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।

–সূরা মরিয়ম : আয়াত ৫৩

একবার হযরত আশেয়া সিদ্দীকা (রা) হজ্বের সফরে কোনো এক লোককে এ প্রশ্ন করতে শুনেছিলেন যে, সে কোন ভাই, যিনি তার ভাইয়ের উপর খুব আস্থা রেখেছিলেন। কেউ কোনো উত্তর না দেয়াতে, তখন হযরত আশেয়া (রা) তার হাওদার চার পাশের লোকদেরকে বললেন, তিনি ছিলেন মূসা ইবনে ইমরান (আ)। তিনি তার ভাই হারুন (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করেছিলেন যে, তাকে নবী বানিয়ে দিন। সে আমার সাহায্যকারী হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, আমি নিজ অনুগ্রহে মূসাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "(হে নবী!) স্মরণ করুন, যখন আপনার রব মূসাকে ডেকে বললেন, তুমি অত্যাচারি সম্প্রদায়ের নিকট যাও —ফেরআউনের সম্প্রদায়ের নিকট তারা কি ভয় করে না?

তখন সে বলেছিল, হে আমার রব! আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে এবং আমার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নয়। সুতরাং হারুনের প্রতিও ওহী পাঠাও। আমার বিরুদ্ধে তো তাদের এক নালিশ আছে। আমি আশঙ্কা করি তারা আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'না, কখনই নয়। অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি শ্রবণকারী। সুতরাং তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমাদের সাথে যেতে দাও বনী ইসরাঈলকে।' ফেরআউন বলল, আমরা কি তোমাকে শিশুকালে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নি? আর তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে অতিক্রান্ত করেছ এবং তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ। –সূরা শু'আরা : ১০-১৯

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা এই যে, তারপর দুভাই ফেরআউনের রাজ দরবারে পৌঁছলেন ও আল্লাহর বাণী তাকে শুনালেন যে, লা শারীক এক আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার কর্তৃত্ব ও নির্যাতনের কয়েদখানা থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে ছেড়ে দাও। যাতে তারা তাদের মনঃপূত স্থানে গিয়ে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারে এবং তার মহান দরবারে একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে আবেদন করতে পারে। কিন্তু ফেরআউন নিজকে খুব বড় মনে করে তার অন্যায় কাজের উপর দৃঢ় রইল। আর মূসা (আ)-কে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে লাগল। সে (ফেরআউন) মূসা (আ)-কে বলল, তুমি কি সে লোক নও, যাকে আমি আমার নিজঘরে লালন-পালন করেছি? আর দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার থেকে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছিল? ফেরআউনের এ কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ) যে ফেরআউনের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তীতে সে ফেরআউনের কাছেই আবার তাঁকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, এ ফেরআউন সে লোক নয়, যার থেকে হযরত মূসা (আ) পালিয়ে এসেছিলেন। বরং সে (ফেরআউন) হযরত মূসা (আ)-এর মাদইয়ানে অবস্থানকালীন অবস্থায় মারা গিয়েছিল। তারপর মূসা (আ)-কে নবী করে অন্য ফেরআউনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু আহলে কিতাবের এ মত একেবারেই

ভুল। কারণ, এটা উল্লিখিত আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এরপর ফেরআউন মূসা (আ)-কে যে বলেছিল, "তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ, তুমি অকৃতজ্ঞ। এর অর্থ হলো, তুমি তো প্রথমে এখান থেকে এক কিবতীকে হত্যা করে গিয়েছ। আর এর ভয়ে তুমি আমার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলে। এখন তুমি এমন্ত অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করছো। হযরত মূসা (আ) উত্তরে বললেন, 'এটাতো আমার থেকে অকস্মাৎ সংঘটিত হয়েছিল। (এ সময়) আমি ছিলাম অভিজ্ঞ। অর্থাৎ আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই এটা সংঘটিত হয়েছিল। অতঃপর আমি তোমার থেকে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমার প্রতিপালক আমাকে জবান দান করেছেন এবং আমাকে রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন। এরপর হযরত মূসা (আ) ফেরআউনের প্রতিপালন ও অনুগ্রহের কথার উত্তরে বললেন যে, আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছ, তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। ফেরআউন বলল, জগতসমূহের রব আবার কি? মূসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সব কিছুর রব। যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। ফেরআউন তার পরিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা শুনছ তো! মূসা বলল, তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষগণেরও রব। ফেরআউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল। মূসা বলল, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছুর রব যদি তোমরা বুঝতে। –সূরা শুআরা : ২২-২৮

হযরত মূসা (আ) ও ফেরআউনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। আর এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, ফেরআউনের কাছে হযরত মূসা (আ) যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছিলেন, তাতে তিনি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মা'বূদ এবং ইবাদতের যোগ্য। এরপূর্বে ফেরআউন আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা ও মহাশক্তিমান হিসেবে অস্বীকার করেছিল। সে তার ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী নিজকে মাবূদ (উপাস্য) বলে মনে করেছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, "ফেরআউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো মা'বূদ আছে বলে আমি জানি না।" –সূরা কাসাস : ৩৮

ফেরআউন শুধু গোড়ামী, অহঙ্কারীবশত ও ঔদ্ধত্য নিজকে খোদা বলে দাবি করেছিল। সে যে শুধু একজন আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহ তার রব এবং আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত উপাস্য, এ ধারণা তার ছিল। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে—

'তারা একেবারেই অন্যায়ভাবে ও অহঙ্কারের সাথে (ঐ আলামতগুলোকে) অস্বীকার করল। অথচ তাদের দিল তা বিশ্বাস করেছিল। এখন দেখে নাও, ফাসাদকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। –সূরা নামাল : ১৪

আল্লাহ যে একমাত্র মা'বূদ এ প্রসঙ্গে ফেরআউন নিশ্চিত থাকা সত্ত্বেও সে হযরত মূসা (আ)-এর রিসালাত ও নবুওয়াতকে অস্বীকার করল এবং বলল, আচ্ছা যে পালনকর্তা আমার কাছে তোমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন, সে কে? কারণ দু'ভাই প্রথমে বলেছিলেন যে, নিশ্চয়ই আমরা জগতসমূহের পালনকর্তার রাসূল। এ কারণে ফেরআউন জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা 'জগতসমূহের সে পালনকর্তা কে? যিনি তোমাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। মূসা (আ) জবাবে বললেন, জগতসমূহের পালনকর্তা তিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থ সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক। এবং এর মধ্যস্থ অগণিত সৃষ্টি যেমন, মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, জীব-জন্তু, গাছপালা ও তৃণলতা ইত্যাদি, যেগুলো সম্পর্কে প্রত্যেকেরই বিশ্বাস ও ধারণা যে, এগুলো কখনই নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে না; বরং এগুলোর অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। যিনি ছাড়া কোনো মাবূদ নেই। তিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। তিনিই আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন।

হযরত মূসা (আ)-কে উপহাস ও তিরস্কার করার উদ্দেশ্যে ফেরআউন তার পাশে উপস্থিত পরিষদবর্গ ও অন্যান্য লোকদেরকে বলল, হে আমার পরিষদবর্গ! মূসা (আ)-এর উপাস্য কি "তোমরা শুনছ? তারপর মূসা (আ) ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গকে সম্বোধন করে বললেন, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও

পালনকর্তা। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের বাপ-দাদা ও অতীতের সমস্ত লোকদেরকেও সৃষ্টি করেছেন।

এ কথার উপর সকল মানুষেরই বিশ্বাস আছে যে, তারা কেউই নিজে নিজে সৃষ্টি হয় নি এবং তার মাতা-পিতাও নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি; বরং সবকিছুরই একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কোনো কিছুই সৃষ্টি হতে পারে না। আর এসব কিছুই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনিই গোটা সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা। এভাবে হযরত মূসা (আ) প্রথমে যমীন, আসমান ও অন্যান্য বস্তুর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর উপস্থিত লোকদের ও তাদের মাতা-পিতার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলাও এ দুটি বিষয় অন্যত্র বর্ণনা করেছেন।

আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাসমূহ ব্যক্ত করব, বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তিনিই (আল্লাহ) সত্য। -হা-মীম সাজদা : ৫৩

এসব সুস্পষ্ট নিদর্শন পেশ করার পরেও ফেরআউন গাফলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলো না এবং ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসল না; বরং সে তার কুফরী, স্বেচ্ছাচারিতা ও আত্মম্ভরিতার উপর অটল রইল। "ফেরআউন (উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলল, তোমাদের এ রাসূল সাহেবটি, যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে এ তো সম্পূর্ণরূপেই পাগল মনে হয়। মূসা বললেন, পূর্ব ও পশ্চিম এবং এর মাঝখানে যা কিছু আছে এ সব কিছুরই তিনি রব! যদি তোমাদের কিছু আকল থেকে থাকে।' -সূরা শুআরা : ২৭-২৮

অর্থাৎ আকাশের এ আবর্তমান উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলোর নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহই। তিনিই অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পালনকর্তা এবং প্রাচীনকালের ও পরবর্তীকালের পালনকর্তা। চন্দ্র, সূর্য ও ঘূর্ণায়মান এবং স্থির থাকা নক্ষত্রগুলোর তিনিই সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো সৃষ্টিকারী। এ সবগুলোই তার ইচ্ছা ও নির্দেশের অনুগত হয়ে আকাশে চলতে থাকে। সব সময়ই এগুলো একে অন্যের পিছনে ঘুরতে থাকে। সবকিছুর নিয়ন্ত্রক সে মহান সত্তা (আল্লাহ) যিনি সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ও সবকিছুর মালিক। যিনি সৃষ্টিকুলের মধ্যে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপকারী। মোটকথা যখন ফেরআউনের কাছে (আল্লাহর একত্ববাদ ও খোদায়িত্বের) প্রমাণ পরিপূর্ণভাবে পেশ করা হলো এবং তার সন্দেহ দূরীভূত হলো এবং তার কাছে একগুয়েমি, হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই বাকি ছিল না, এরপরেও সে নিজ দাপট ও প্রভাবে বশীভূত হয়ে মূসা (আ)-কে ধমক দিল। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে মা'বূদরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করে রাখব। মূসা (আ) বললেন, 'আমি তোমার কাছে স্পষ্ট কোনো নিদর্শন নিয়ে আসলেও? ফেরআউন বলল, বেশ! তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে তা নিয়ে এস দেখি। (ফেরআউনের মুখ থেকে এ কথা বের হতেই) মূসা তার হাতের লাঠিটি ছুড়ে দিলেন। অমনি তা স্পষ্ট অজগর সাপ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি যখন তার হাত (বগল থেকে) টেনে বের করলেন, তখন তা উপস্থিত লোকদের সামনে চকমক করছিল[১]। -সূরা শুআরা : ২৮-৩৩

এ দুটি (মুজেযা) নিদর্শন দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে শক্তিশালী করেছিলেন। আর এ দু' নিদর্শন ছিল লাঠি ও হাত। এটা ছিল অস্বাভাবিক ব্যাপার ও বিরাট অলৌকিক ঘটনা। এতে জ্ঞানিগণ ও চিন্তাবিদগণও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন যে, হযরত মূসা (আ) নিক্ষেপ করলেন লাঠি, আর তা হয়ে গেল বৃহৎ এক অজগর সাপ! এতে দর্শকগণ ভীত ও পেরেশান হয়ে পড়ল। কথিত আছে! ফেরআউন এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে এত ভীত ও পেরেশান হয়ে পড়ল যে, তার পাতল পায়খানা শুরু হয়ে গেল। একদিনে সে চল্লিশ বারেরও বেশি পায়খানা করল।

অথচ এর পূর্বে সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মাত্র একবারের বেশি পায়খানা করে নি। এখন (একদিনে চল্লিশ বার পায়খানা হওয়ার) বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গেল। যখন মূসা (আ) তার পবিত্র হাত নিজে বগলে ঢুকিয়ে বের

১. হযরত মূসা (আ) বগল থেকে হাত বের করামাত্র হঠাৎ সারা মহল আলোতে চকমক করে উঠল। মনে হলো যেন সূর্য উঠেছে।

করলেন, তখন সবাই দেখতে পেল যে, হাতখানা চাঁদের মতো ঝলমল করেছে এবং তার উজ্জ্বলতায় চোখ ঝলসিয়ে যাচ্ছে। অতঃপর উজ্জ্বলময় হাতখানা যখন বগলে নিয়ে আবার বের করলেন, তখন হাতখানা পূর্বের মতো হয়ে গেল। কিন্তু ফেরআউন আল্লাহ তা'আলার এ আলামতগুলো দেখার পরেও এ আলামতগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বলার অবকাশ না পেয়ে শুধু বলল, এগুলো যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফেরআউন ঈমান আনার পরিবর্তে এ আলামতগুলোর মোকাবিলা যাদু দ্বারা করার চিন্তা করল এবং এ উদ্দেশ্যে তার রাজকর্মচারীদেরকে রাজ্যের সর্বত্র প্রেরণ করল, যাতে তারা তালাশ করে বড় বড় যাদুকরদেরকে ফেরআউনের কাছে নিয়ে আসে। এর সবিস্তার বর্ণনা যথস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে মূসা!) অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! এরপর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করে নিয়েছি। তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য কর না। তোমরা উভয়ে ফেরআউনের নিকট যাও, সেতো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় করবে। তারা বলল, হে আমাদের রব! আমরা আশঙ্কা করি যে, আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে কিংবা অন্যায়-আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা আশংকা কর না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও আমি দেখি। -সূরা ত্বা-হা : ৪০-৪৬

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে সে রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যে রাতে আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেছেন এবং নবুওয়াতের মর্যাদা দান করেছেন এবং বিশেষ নিদর্শন দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে মূসা!) যখন তুমি ফেরআউনের ঘরে ছিলে তখনো আমি তোমাকে দেখেছিলাম এবং তুমি আমার হেফাজতে, প্রতিপালনে ও আমার দয়ার মধ্যে ছিলে। অতঃপর আমি তোমাকে মিশর ভূখণ্ড থেকে বের করে আমার ইচ্ছা, কুদরত ও কৌশলসহ তোমাকে মাদাইয়ানে নিয়ে আসলাম। আর সেখানে তুমি কয়েক বছর অবস্থান করলে। অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে। আর এগুলো সব আমার নির্ধারিত তকদীর অনুযায়ী হয়েছে। তারপর আমি আমার রিসালাত ও আমার সাথে কথা বলার জন্য তোমাকে মনোনীত করলাম। অতঃপর আমি তোমাকে দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করলাম। "তুমি ও তোমার ভ্রাতা উভয়েই আমার নিদর্শন নিয়ে যাও। আমার স্মরণে গাফলতী করবে না। অর্থাৎ যখন তোমরা ফেরআউনের কাছে আসবে, তখন আমাকে স্মরণ করবে। এ স্মরণ তোমাদের জন্য সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে ফেরআউনের সাথে কথা বলার সময় ও তার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় এবং দলীল উল্লেখ করতে ও তাকে উপদেশ দিতে। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার (নেক) বান্দা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হওয়ার সময় আমার স্মরণ করে।"

এর স্বপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোনো দলের সম্মুখীন হবে, তখন অটল থাকবে এবং আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। -সূরা আনফাল : ৪৫

আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন যে, ফেরআউন তার গোমরাহী, কুফরী ও অবাধ্যতার উপর দৃঢ় থাকবেই। যে কারণে সে ছিল সৃষ্টির মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট। এরপরও তার উপর আল্লাহ তা'আলার দয়া, অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী কিরূপ ছিল, তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি (আল্লাহ) তার প্রিয় বান্দা ও রাসূল, যার সাথে তিনি কথা বলেছেন এবং যিনি ছিলেন তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাকে ফেরআউন সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন যে, তুমি তার কাছে গিয়ে তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। এটা ছিল গোটা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার অতি দয়া ও মেহেরবাণী। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কেও সম্বোধন করে বর্ণনা করেছেন, "(হে নবী! আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথে ডাকুন, হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।" -সূরা নাহল : ১২৫

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, ' তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না। তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা সীমালঙ্ঘনকারী। -সূরা আনকাবুত : ৪৬

হযরত হাসান বসরী (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী "তোমরা দু'জনে তার সাথে নম্র কথা বলবে" এর অর্থ ফেরআউনকে নম্র ভাষায় সুন্দরভাবে এ কথা বুঝিয়ে বলবে, তোমার একজন প্রতিপালক আছে, আমাদের সকলেরই মৃত্যুর পরে পরকালে পুনর্বার হাজির হতে হবে এবং তোমার সামনে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম। সুতরাং তুমি তোমার পরিণামের কথা চিন্তা কর।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, এর অর্থ হলো হে মূসা ও হারুন! তোমরা দুজনে ফেরআউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বল এবং তাকে সুন্দরভাবে বুঝাও যে, আমি ক্রোধ ও শাস্তির তুলনায় ক্ষমা ও দয়ার বেশি নিকটবর্তী। হযরত ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে মহান সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তার দুশমনের প্রতিও এতখানী ভালবাসা ও দয়া রাখেন, সে মহান আল্লাহ তার বন্ধু ও নেক বান্দার প্রতি কতখানি ভালবাসা রাখেন তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, 'আপনারা দু'জনই ফেরআউনের কাছে যান। সে বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবেন। হয়তো সে উপদেশ কবুল করবে অথবা ভয় পাবে। দু'জনেই আরয করলেন[১], হে আমাদের রব! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের সাথে অন্যায় আচরণ করবে বা বাড়াবাড়ি করবে। -সূরা ত্বা-হা : আয়াত ৪৫

কেননা, ফেরআউন ছিল অত্যাচারী, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও ঘৃণ্য শয়তান। মিশরের সর্বত্র ছিল তার প্রভাব-প্রতিপত্তি। বিশাল সৈন্য বাহিনীর ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং স্বভাবগত কারণেই তারা দু'ভাই কিছুটা আশংকাবোধ করেছিল যে, হয়তো ফেরআউন প্রথম সাক্ষাতেই তাদের সাথে অন্যায় আচরণ শুরু করতে পারে। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দৃঢ় থাকার উপদেশ দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন— "তোমরা ভয় করবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি। "অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, "আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফেরআউনের কাছে যেতে বললেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বর্ণনা করেন— 'আপনারা তার কাছে যান এবং বলুন, আমরা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। আর তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। তাদের প্রতি সালাম, যারা সঠিক পথে চলে। নিশ্চয়ই আমাদেরকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, যারা মানতে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য অবশ্যই আযাব রয়েছে। -সূরা ত্বা-হা : ৪৭-৪৮

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা ফেরআউনের কাছে গিয়ে তাকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দাও। তাকে বলবে! তুমি এক আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি (আল্লাহ) এক। তার কোনো অংশীদার নেই। আর বল, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলদেরকে প্রেরণ কর। তাদের উপর জুলুম, নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে দাও। আমরা আমাদের নবুওয়াতের আলামত স্বরূপ তোমার কাছে সঠিক ও উজ্জ্বলময় হাত নিয়ে এসেছি। আর শান্তি তো কেবল তারই উপর, যিনি সৎপথের অনুসারী। এখানে ফেরআউনকে সালাম প্রদানের ব্যাপারে উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি তুমি সৎপথের অনুসারী হও, তবে তোমার প্রতি সালাম (শান্তি)। এরূপে এ সালামের মধ্যেও বিদ্যমান আছে দাওয়াতের এক মহা কৌশল।

তারপর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আমাদের কাছে ওহী এসেছে যে, শাস্তি তার জন্য যে (নবীকে) অস্বীকার করবে এবং (তাদের দাওয়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ যে অন্তর থেকে সত্যকে অস্বীকার করবে এবং কার্যত মুখ ফিরিয়ে অস্বীকৃতির প্রকাশ ঘটাবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহর শাস্তিতে উপস্থিত হবে।

হযরত সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান থেকে আগমন করে সর্বপ্রথম তার মা ও ভাইয়ের কাছে পৌছেন। এ সময় তারা রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। তাদের খাবারের মধ্যে ছিল শালগম। হযরত মূসা (আ) ও তাদের সাথে আহার করলেন। আহার শেষে মূসা (আ) তার ভাই হারুন (আ)-কে বললেন, আল্লাহ আমাদের দু'জনকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ফেরআউনের কাছে গিয়ে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেই। সুতরাং আমার সাথে চল। দু'ভাই মিশরের বাদশাহ ফেরআউনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

তাঁরা যখন ফেরআউনের রাজপ্রসাদে পৌছলেন, তখন তার দরজা বন্ধ ছিল। হযরত মূসা (আ) দারোয়ানকে বললেন, ফেরআউনকে গিয়ে বলো, দরজায় আল্লাহর রাসূল এসেছেন। কিন্তু সে তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। কয়েকজন মুফাসসির বলেছেন, মূসা (আ) ও হারুন (আ) দু'জনে দীর্ঘ সময় বিলম্ব করার পর ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন। কারণ, কেউই ফেরআউনের কাছে গিয়ে তাদের কথা বলে নি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে জালালী অবস্থায় ফেরআউনের দরজায় পৌছে দরজার উপর নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। এতে ফেরআউন অশান্তিবোধ করল এবং তাদেরকে প্রবেশের অনুমতি দিল। অনুমতি পেয়ে মূসা (আ) ও হারুন (আ) দু'জনে ফেরআউনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ যেভাবে দাওয়াত দেওয়ার কথা বলে দিয়েছেন, অনুরূপভাবেই তারা তাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছেন যে, ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর হারুন শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাকেও তোমার সাথে নিয়ে যাবে এবং যেসব নিদর্শন আমি তোমাকে প্রদান করেছি, তা প্রকাশ করবে। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলেন, কিন্তু আমি ফেরআউনের অন্তর কঠিন করে দেব এবং (এতে) সে বনী ইসরাঈলকে (জেল-জুলুম থেকে) অব্যাহতি দেবে না। তুমি আমার আলামতসমূহ ও বিস্ময়কর বস্তুসমূহ দ্বারা মিশরকে আলোড়িত করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত হারুন (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, তুমি 'হোরাইব' পর্বতের কাছে পৌছ। সেখানে তোমার আপন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হবে। হযরত হারুন (আ) মিশর হতে বের হয়ে সেখানে পৌছলেন এবং দু'ভাইয়ের সাথে সেখানে সাক্ষাৎ হলো। অতঃপর হযরত মূসা (আ) হযরত হারুন (আ)-কে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ আদেশ দিয়েছেন। তারপর তারা দু'জনে আল্লাহর নিদর্শানুযায়ী মিশরে প্রবেশ করে বনী ইসরাঈলদের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট আলেমদেরকে একত্র করেন। তারপর সবাইকে নিয়ে ফেরআউনের কাছে হাজির হলেন। ফেরআউনের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছালে, সে বলল! আল্লাহ কে? তাকে আমি চিনি না। আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকেও অব্যাহতি দিব না। (নাউজুবিল্লাহ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (মূসা [আ] ও হারুন [আ]) ফেরআউনের কাছে যখন আল্লাহর দাওয়াত পৌছাল, তখন সে (ফেরআউন) বলল[১], "হে মূসা! তাহলে তোমার রব কে? মূসা উত্তরে বললেন, তিনিই আমাদের রব, যিনি প্রতিটি জিনিসকে আকার দান করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন২। ফেরআউন বলল, তাহলে এর আগের যুগের লোকদের অবস্থা কী ছিল? মূসা উত্তর দিলেন যে, এ বিষয়ের ইলম আমার রবের কাছে এক কিতাবে হেফাযত করা আছে। আমার রব পথহারাও হন না, ভুলেও যান না।[৩] তিনিই[৪] ঐ সত্ত্ব যিনি জমিনকে

---

১. *এখন সেই সময়কার কাহিনী শুরু হচ্ছে, যখন দুই ভাই ফেরআউনের কাছে হাজির হয়েছিলেন।*

২. *অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস যে আকারেই গঠিত হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা গঠন করেছেন বলেই তা সেভাবেই গঠিত হয়েছে। তারপর আল্লাহ তা'আলা কোনো জিনিস গঠন করার পর তাকে এমনিই ছেড়ে দেননি; বরং তিনি তার সকল সৃষ্টিকেই পথ দেখান। দুনিয়ার কোনো বস্তুই এরূপ নেই যাকে আল্লাহ তা'আলা তার নিজ গঠন অনুযায়ী কাজ করার ও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার নিয়ম তাকে শিক্ষা দেননি। তিনি প্রতিটি বস্তুর শুধু স্রষ্টাই নন, তিনি সেগুলোর পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকও।*

৩. *অর্থাৎ ফেরআউন বলেছিল, 'যদি এ কথাই সঠিক হয়ে থাকে যে, মাবূদ শুধু একজনই, তাহলে আমাদের সকলের বাপ-দাদা শত শত বছর ধরে বংশের পর বংশ যে অন্য মাবূদদের পূজা-উপাসনা করে এসেছেন, তোমাদের কাছে তাদের মর্যাদা কী? তারা কি সকলে আযাবের যোগ্য? তাদের সকলের জ্ঞান-বুদ্ধি কি খতম করে গিয়েছিল?* *[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

বিছানা বানিয়েছেন, তোমার চলার জন্য এর মধ্যে রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। তারপর এ মাধ্যমে আমি নানা রকম গাছপালা জন্মাই। তোমরা খাও এবং তোমাদের পালিত পশুকেও চরাও। নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে। এ মাটি থেকে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব এবং এ থেকেই তোমাদেরকে আবার বের করব।

আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন সম্পর্কে সংবাদ দেন যে, সে (ফেরআউন) সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করে বলে, হে মূসা! তোমার প্রতিপালক কে? উত্তরে হযরত মূসা (আ) বলেন, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন। তারপর পথনির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রতিপালক ও মালিক তিনিই। যিনি প্রথমে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে আকৃতি দান করেছেন। তারপর নির্ধারণ করেছেন তাদের আমল (তারা কি কি কাজ করবে), তাদের রিযিক (তারা কিভাবে খাদ্য গ্রহণ করবে) এবং তাদের মৃত্যুর সময় (তারা কখন মৃত্যুবরণ করবে) ইত্যাদি। অতঃপর এসবগুলো নিজের কাছে লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তারপর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার কাজের ও রিযিকের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন যে, এগুলো কিভাবে অর্জন করা যাবে। এভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজগুলো তার সৃষ্টির মাঝে তার নিজ কুদরত ও ইলম অনুযায়ী চলছে। আর প্রথম থেকেই আল্লাহ তা'আলা তার নিজ পরিপূর্ণ ইলম এর ভিত্তিতে প্রতিটি সৃষ্টির তাকদীর লিখে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, "(হে রাসূল!) আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর সুষম করেছেন।[৬] যিনি তাকদীর ঠিক করেছেন,[৭] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[৮] –সূরা আলা : ১-৩

অর্থাৎ ফেরআউন মূসা (আ)-কে বলল, "যখন তোমার প্রতিপালক সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক, তাদের রিযিকদাতা ও তত্ত্বাবধায়ক এবং যিনি ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই, তখন অতীতের লোকেরা তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত কেন করল? তারা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র ইত্যাদি কেন উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল? তোমার কথা অনুসারে তাদেরকে তাদের পথ থেকে সরিয়ে সত্যপথ কেন প্রদর্শন করা হলো না? হযরত মূসা (আ) জবাবে বললেন, এই ইলম আমার প্রতিপালকের কাছে কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। আমার রব ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। সুতরাং যদি অতীতের লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করে, এটা তোমার মাবূদ হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নয় এবং আমার কথা অসত্য হবারও কোনো দলীল নয়। কারণ, তারাও তোমার মতই মূর্খ ছিল। তারা যা কিছু করেছে তা সবই আল্লাহ তা'আলার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

আমার রব তাদেরকে তাদের ছোট বড় সকল কৃতকর্মের বিনিময় দেবেন। তিনি কারও প্রতি বিন্দু মাত্রও অবিচার করেন না। কারণ, বান্দার সকল কৃতকর্ম তার কাছে এমন কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, যা থেকে কিছুই মুছে

৪. ফেরআউনের প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, শ্রোতাদের মনে ও তাদের মাধ্যমে গোটা জাতির মধ্যে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। কিন্তু হযরত মূসা (আ)-এর এই জবাব তার সবকটি বিষদাঁত ভেঙে দিল যে, তারা যেমনই থাকুক না কেন, তারা নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। তাদের প্রতিটি কাজ ও তৎপরতা এবং তারা যে যে নিয়তে কাজ করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা তা ভালো করেই জানেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন তা তিনিই ভালো জানেন।

৫. কথার ধারা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'ভুলে যান না' পর্যন্ত হযরত মূসা (আ)-এর জবাব শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে ৫৫ নং আয়াত পর্যন্ত সবটুকুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা ও উপদেশ হিসেবে ইরশাদ করা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত বিশ্বে প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যা-ই সৃষ্টি করেছেন, তা ঠিক ঠিকভাবে বানিয়েছেন। এর ভারসাম্য ও সমতা যথাযথভাবে কায়েম করেছেন। প্রত্যেক জিনিসকে এমন আকারে তৈরি করেছেন যে, ঐ জিনিসের জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতি কল্পনাও করা যায় না।

৭. অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করার আগে ঠিক করে দিয়েছেন যে, দুনিয়ায় এর কী কাজ হবে, সে কাজের জন্য এ জিনিস কতটুকু পরিমাণ প্রয়োজন হবে, এর আকৃতি কেমন হবে, এর কী কী গুণ থাকবে, কোন জায়গায় এ জিনিস সৃষ্টি হবে, এ জিনিসকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে ও একে কাজে লাগানোর জন্য কী কী সুযোগ ও উপায় দরকার, কোন সময় এর সৃষ্টি হওয়া উচিত, কোন সময় পর্যন্ত এর দরকার থাকবে এবং কখন, কীভাবে একে খতম হতে হবে এসবের পূর্ণ পরিকল্পনার নামই হলো ঐ জিনিসের 'তাকদীর'।

৮. অর্থাৎ কোনো জিনিসকে সৃষ্টি করেই এমনি ছেড়ে দেওয়া হয় নি; বরং যে জিনিস যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে জিনিস দ্বারা ঐ কাজ ঠিকভাবে করার নিয়মও শিখিয়ে দিয়েছেন।

যেতে পারে না। আর আমার প্রতিপালক কোনো কিছুই ভুলে যান না। তারপর হযরত মূসা (আ) ফেরআউনের সামনে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও তার সৃষ্টির কুদরত সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে মহান সত্তা (আল্লাহ) এ জমিনকে তোমাদের জন্য বিছানাস্বরূপ বানিয়েছেন, আকাশকে ছাদ রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ, পশু ও জানোয়ারের রিযিকের জন্য মেঘ ও বৃষ্টিকে আদেশ নিয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আহার কর ও গবাদি পশু চারণ কর, অবশ্যই তাতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ এগুলো সঠিক জ্ঞানবান ও বিবেকবান এবং সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের শিক্ষার জন্য নিদর্শন। যা দ্বারা তারা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, তিনি (আল্লাহ)-ই সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। অনুরূপভাবে সূরা বাকারায় বর্ণনা করেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সে প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিচানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তাদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিও না। –সূরা বাকারা : ২১-২২

উক্ত আয়াতে যমীনকে বৃষ্টির মাধ্যমে জীবিত (সতেজ) করা এবং ফলমূল উৎপন্ন করানোর কথা আলোচনা করার পরেই পরকালে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন "আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আবার তোমাদেরকে বের করব।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।" –সূরা আরাফ : ২৯

সূরা রুমে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনে, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার, এটা তার জন্যে অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তারই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ফেরআউনের কাছে মূসা (আ)-এর দাওয়াত দেয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ফেরআউনকে আমি আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছি। কিন্তু সে মিথ্যা দোষারোপ করতেই থাকল এবং কিছুতেই মেনে নিল না। ফেরআউন বলল, হে মূসা! তুমি কি তোমার জাদুর ক্ষমতা বলে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য আমাদের কাছে এসেছ ? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরাও তোমার বিরুদ্ধে এরূপ জাদুই নিয়ে আসব। নির্দিষ্ট করে নাও কখন ও কোথায় আমাদের ও তোমার মধ্যে এ মুকাবেলা হবে। আমরাও এ কথা থেকে ফিরে যাব না, তুমিও ফিরে যাবে না। খোলা ময়দানে সামনা-সামনি এসে যাও। মূসা বললেন, উৎসবের দিন-সময় ঠিক করা হলো। সূর্য উঠার পরই জনগণ একত্রিত হোক।[১]

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের চরম মূর্খতা, দুর্ভাগ্য ও স্বল্পজ্ঞানের কথা বর্ণনা করে বলেন, "সে (ফেরআউন) আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং অহঙ্কার করে মূসা (আ)-কে বলেছিল, (হে মূসা!) যা কিছু তুমি নিয়ে এসেছ এগুলো শুধু জাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়। অনুরূপ জাদু প্রদর্শন করে আমিও তোমার মোকাবিলা করতে সক্ষম। সুতরাং এখন একটি স্থান ও সময় নির্দিষ্ট কর, যাতে আমরা উভয়ে মোকাবিলা করতে পারি। হযরত মূসা (আ) নিজেও চেয়েছিলেন যে, এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি হোক, যাতে সকল মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। এ কারণে হযরত মূসা (আ)-এ বিষয়টি ভেবেই বলেছিলেন, তোমাদের নির্দিষ্ট সময় উৎসবের দিন। আর এ

১. *ফেরাআউনের উদ্দেশ্য ছিল যদি একবার জাদুকরদের লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করে দেখানো যায়, তাহলে মূসা (আ)-এর মুজিযার যে প্রভাব মানুষের মনে পড়েছে তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য এটা একটা বিরাট সুযোগ ছিল। তিনি বললেন, আলাদা করে আবার একটি দিন ও জায়গা ঠিক করার দরকার কী? জাতীয় উৎসবের দিন তো কাছেই আছে। সেদিন গোটা দেশের লোকেরাই তো রাজধানীতে এসে একত্রিত হবে। তাই ঐ মেলার ময়দানেই মুকাবিলা হোক, যাতে সারাদেশের লোক তা দেখতে পারে এবং সময়ও ঠিক করা হোক দিনের বেলায়, যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে।*

উৎসবের দিন সবার সমবেত হওয়ার দিন। সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে জমায়েত করা হবে। অর্থাৎ দিনের শুরুতে যখন সূর্যের আলো প্রখর হবে, তখন লোক জমায়েত হবে, যাতে সত্য সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

মূসা (আ) মোকাবিলার জন্য রাতকে নির্ধারণ করেন নি। কারণ, এতে মানুষের মধ্যে অস্পষ্টতা ও সন্দেহ থেকে যেতে পারে। মূসা (আ) তার রবের পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ তাকে ও তার দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। যদিও ফেরআউনী কিবতীদের মুখ মলিন হোক না কেন। অতঃপর ফেরআউন প্রস্তুত হয়ে যথাস্থানে এসে পৌছল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, ফেরআউন ফিরে গিয়ে তার সব কলা-কৌশল সংগ্রহ করল এবং মুকাবিলা করার জন্য এলো। মূসা (অপর পক্ষকে সম্বোধন করে) বললেন, এ হতভাগারা! আল্লাহর প্রতি[১] মিথ্যা আরোপ করো না। তা হলে তিনি এক কঠিন আযাব দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। মিথ্যা যে-ই রচনা করবে, সে-ই ব্যর্থ হবে। এ কথা শুনে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো এবং তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল[২]। শেষ পর্যন্ত তাদের কতক লোক বলল, এরা দু'জন তো জাদুকর মাত্র। এরা চায়, তাদের দু'জনের জাদুর জোরে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে এবং তোমাদের আদর্শ জীবন-পদ্ধতিকে খতম করে দেবে। তাই তোমাদের সব কলা-কৌশল জোগাড় করে সারিবদ্ধ হয়ে ময়দানে এসো। জেনে রাখ! আজ যে বিজয়ী হবে সে-ই সফলকাম হবে।

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, সে তার দেশের জাদুকরদেরকে সমবেত করল। এ সময় মিশরে নামকরা বড় জাদুকর ছিল। তারা জাদু বিদ্যায় খুব পারদর্শী ছিল। সুতরাং ফেরআউনের লোকজন তালাশ করে শহরের বড় বড় নামকরা জাদুকরদেরকে সমবেত করল। অসংখ্য জাদুকর সমবেত হয়ে গেল। এক বর্ণনা মতে, জাদুকরগণ সংখ্যায় ছিল আশি হাজার। এটি মুহাম্মাদ ইবনে কাব (রহ)-এর বর্ণনা। কাসিম ইবনে আবী বুরদা (রহ)-এর মতে, তারা সংখ্যায় সত্তর হাজার। হযরত সুদ্দী (রহ) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি। আবূ উমামা (রহ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, তাদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। ইবনে আবী হাতিম ও হাসান বসরী (রহ) বলেছেন, তারা ছিল মাত্র সত্তর জন। ইবনে আব্বাস (রা) হতে এরূপও একটি বর্ণনা আছে যে, তারা ছিল বনী ইসরাঈলের চল্লিশ জন ক্রীতদাস। ফেরআউন তাদেরকে আদেশ দিয়েছিল যে, তারা যেন জাদুকর ও গণকদের কাছে গিয়ে জাদু বিদ্যা শিখে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এ কারণেই বনী ইসরাঈলের লোকেরা ফেরআউনকে একবার বলেছিল যে, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালক (এক আল্লাহ)-এর উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেন আর তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তাও। তবে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

ফেরআউন জাদুকরদেরকে সাথে নিয়ে তার মন্ত্রীপরিষদ ও রাজ দরবারের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরসহ প্রভাতে ময়দানে হাজির হলো; বরং ফেরআউনের পক্ষ থেকেই প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল যে, এ বিরাট মেলায় সবাই যেন হাজির হয়। সবলোক বেরিয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল, "যদি জাদুকরেরা বিজয়ী হয়, তবে আমরা তাদেরই আনুগত্য করব। ময়দানে লোকজন এসে সমবেত হওয়ার পর হযরত মূসা (আ) জাদুকরদের কাছে এসে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং মিথ্যা জাদু দ্বারা তার মোকাবিলায় না আসার জন্য বললেন। কারণ মিথ্যা জাদু দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মোকাবিলায় আসার পরিনাম হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ভয়াবহ। হযরত মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, "(আফসোস!) তোমাদের দুর্ভাগ্য! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ কর না। করলে

১. এ মুজিযাকে জাদু এবং যে নদী তা দেখালেন তাকে মিথ্যাবাদী জাদুকর বল না।

২. এর দ্বারা বোঝা যায়, তারা তাদের অন্তরের দুর্বলতা নিজেরা টের পেয়েছিল। তারা এ কথা জানত, হযরত মূসা (আ) ফেরআউনের দরবারে যা কিছু দেখিয়েছিলেন তা জাদু ছিল না। তারা প্রথম থেকেই এর মুকাবিলায় ভয়ে ভয়ে দোটানায় পড়ে এসেছিল। যখন ঠিক মুকাবিলার সময়ে হযরত মূসা (আ) তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সতর্ক করলেন, তখন দিশেহারা হয়ে তারা হঠাৎ গোপনে পরামর্শ করতে লাগল। তারা হয়তো ভেবেছিল, জাতীয় উৎসব ও মেলার দিন যখন সারাদেশের লোক হাজির থাকবে, তখন খোলা ময়দানে দিনের বেলায় এই মুকাবিলা করা ঠিক হবে কিনা? যদি এখানে আমরা পরাজিত হই এবং সারাদেশের লোকের সামনে জাদু আর মুজিযা যে এক জিনিস নয়, তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অন্য কোনো রকমের কথা বানিয়ে অবস্থা সামলানো যাবে না।

তিনি তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, সেই ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল। এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, জাদুকরদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো। তাদের কেউ বলল, এটা নবীর কথা এবং তিনি জাদুকর নন। কেউ বলল, তিনি (নবী) একজন যাদুকর। আল্লাহ তা'আলাই বলেন, "ওরা বলল, এ দু'জন অবশ্যই জাদুকর। তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করতে। অর্থাৎ মূসা (আ) ও তার ভাই হারুন (আ) দু'জনই বড় দক্ষ জাদুকর। জাদুবিদ্যায় তারা খুবই পারদর্শী। এ জাদু দ্বারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকদেরকে তাদের পক্ষে নিয়ে নিবে। তারপর বাদশাহ ও তার অনুগতদের উপর আক্রমণ করে তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলবে। এভাবে এ জাদু দ্বারা তারা তোমাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। (তারপর) তাঁরা বলল, (হে ফেরআউনের যাদুকরেরা!) তোমরা তোমাদের জাদুক্রিয়া প্রস্তুত কর। তারপর সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হও। আজ যে বিজয়ী হবে সে সফলকাম হবে। প্রথম কথাটি তারা পরস্পরে একে অপরকে (জাদু কাজে) উৎসাহিত করার জন্য বলেছিল। যাতে সকল জাদুকর তাদের জাদুর কৌশল, প্রতারণা ও অপবাদ খুব সুন্দরভাবে সবার সামনে পেশ করে। জাদু প্রদর্শনের জন্য তারা একজন অন্যজনকে সামনে অগ্রসর হতে বল। আর ফেরআউন বিজয়ের প্রত্যাশায় মন্ত্রী পরিষদকে নিয়ে ময়দানের এক প্রান্তে সর্বসাধারণের সাথে বসে গেল। তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হলো। মিথ্যা প্রতারণা ও অপবাদ দ্বারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মোকাবিলা কি করে করা সম্ভব? সে নির্দেশনাবলী আল্লাহ তা'আলা তার সে সম্মানিত রাসূলকে দান করেছেন, আর তাকে এমন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সাহায্যও করেছেন, যার মোকাবিলায় পার্থিব চিন্তা, শক্তি ও জ্ঞান সবকিছুই রহিত হয়ে যায়। ফেরআউন তার আনীত জাদুকরদেরকে বলল, তোমরা সকলে মিলে একবারেই তোমাদের জাদুর খেলা দর্শকদেরকে দেখিয়ে দাও। অতঃপর তারা একজন অন্যজনকে জাদু প্রদর্শনের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। কারণ, ফেরআউন তাদেরকে বিভিন্নভাবে ওয়াদা করিয়েছিল এবং তাদেরকে প্রচুর পুরস্কারের আশা দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন, শয়তান তাদেরকে শুধু প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়েছিল। আল্লাহ বলেন (উভয় দল প্রস্তুত হয়ে যখন সামনাসামনি হলো, তখন) 'তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের জাদুর প্রভাবে আকস্মাৎ মূসা (আ)-এর মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো (সর্প হয়ে) ছুটোছুটি করছে। মূসা তার অন্তরে কিছু ভয় অনুভব করল। আমি বললাম, ভয় কর না। তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে, তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো শুধু জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হবে না।" -সূরাত ত্বাহা : ৬৫-৬৯

যখন জাদুকররা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল এবং মূসা (আ) ও হারুন (আ)-ও তাদের সামনাসামনি হলেন, তখন জাদুকরেরা মূসা (আ)-কে বলল, আপনারা কি আমাদের পূর্বে জাদু নিক্ষেপ (প্রথম) করবেন, না আমরা আপনাদের পূর্বে নিক্ষেপ করব? তখন মূসা (আ) বললেন, "তোমরাই নিক্ষেপ কর। তারা পূর্বেই লাঠি ও রশিতে মন্ত্র স্থাপন করে রেখেছিল। যে কারণে লাঠি ও রশি এমনভাবে ঘুরতে ছিল, দর্শকদের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল সেগুলো সাপের ন্যায় ছুটিছুটি করতেছে। এভাবে তারা দর্শকদের চোখ জাদু দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। যখন জাদুকরেরা তাদের লাঠি ও রশিগুলো নিক্ষেপ করলো: চীৎকার দিয়ে বলতে লাগল, ফেরআউনের সম্মানে কসম! আমরাই বিজয়ী। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গেই বলেন, "যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল। তাদেরকে আতঙ্কিত করল ও তারা এক বড় ধরনের জাদু দেখাল। অনত্র আল্লাহ বলেন, তাদের জাদুর প্রভাবে হঠাৎ মূসার মনে হলো তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো (সর্পরূপে) ছুটোছুটি করছে, (এ সময়) মূসা তার অন্তরে কিছু ভয় অনুভব করল। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর অন্তরে এরূপ ভয়ের সঞ্চার হলো যে, তার লাঠি নিক্ষেপ করার আগেই সাধারণ দর্শকগণ জাদুকরদের মিথ্যা জাদু ও প্রতারণায় আবার স্বীকার না হয়ে পড়ে। কারণ, হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশের আগে (নিজের পক্ষ থেকে) কিছুই করতে পারছিলেন না। আল্লাহ তা'আলাও মূসা (আ)-এর এ পেরেশানীর মুহূর্তে তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনান। আল্লাহ বলেন, ভয় কর না, তুমিই শক্তিশালী।

তোমার ডান হাতে যা আছে (লাঠি) তা নিক্ষেপ কর। এ (লাঠি) তারা যাকিছু করেছে তা গ্রাস করবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যতই আসুক, সফল হবে না। আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তার হাতের লাঠি (জমিনে) নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তোমরা যা এনেছ তা জাদু, আল্লাহ এটাকে শীঘ্রই অসার করে দেবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম কার্যকর করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তার বাণীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন।

এ কথা সূরা আরাফেও বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন, '(তখন) আমি মূসাকে ইশারা করলাম যে, তোমার লাঠি ছুড়ো। সাথে সাথেই তা তাদের তৈরি মিথ্যা ভোজবাজিকে গিলে ফেলতে লাগল। এভাবেই যা সত্য ছিল তা-ই সত্য প্রমাণিত হলো এবং তারা যা কিছু বানিয়েছিল তা বাতিল হয়ে গেল। (ফেরআউন ও তার সঙ্গীরা) মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হওয়ার বদলে) অপমানিত হলো। জাদুকরদের এ অবস্থা হলো যে, যেন কেউ ভেতর থেকেই তাদেরকে সিজদায় ফেলে দিলো। (জাদুকররা) বলল, আমরা রাব্বুল আলামীনকে মেনে নিলাম, যিনি মূসা ও হারুনের রব।'[১] -সূরা আরাফ : ১১৭-১২২

পূর্ব যমানার কয়েকজন আলেম বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত মূসা (আ) নিজ লাঠি নিক্ষেপ করেন, তখন সেটি বড় অজগর সাপে রূপান্তরিত হলো এবং সেটির পা ছিল। সাপটির গর্দান ছিল খুব মোটা ও চওড়া। সেটির আকৃতি ছিল খুব ভয়ঙ্কর। সাপটিকে দেখে উপস্থিত মানুষ ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যেতে শুরু করল। অজগর সাপটি জাদুকরদের নিক্ষিপ্ত রশি ও লাঠিগুলোর দিকে দ্রুত ছুটে গিয়ে সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলল। সমস্ত মানুষ অবাক হয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এ দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল। আর জাদুকরেরা নিজেদের অপকর্মগুলো স্বচক্ষে দেখে লজ্জিত হলো এবং তারা আন্তরিকভাবে অনুধাবন করল যে, এটা কোনো জাদু নয়। আর কোনো ভেল্কিবাজি, ধোঁকাবাজি ও নযরবন্দীও নয়। আর এগুলো কোনো ধারণা বা মিথ্যা ন বা ভ্রান্ত কোনো বিষয় নয়; বরং এগুলো সত্য। যা রাসূলগণ ব্যতীত আর কেউই প্রদর্শন করতে সক্ষম নয়। আর মহান আল্লাহ তা'আলা এগুলো তার রাসূলকে সাহায্য করার জন্য প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা জাদুকরদের অন্তর থেকে গোমরাহী ও গাফলতীর পর্দা সরিয়ে দিলেন এবং তাদেরকে হেদায়াতের আলো দ্বারা আলোকিত করলেন। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার, জুলুম অত্যাচার করার এবং কুফরীর মানসিকতা তাদের অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল। তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে তার মহান দরবারে সিজদাবনত হলো। তারা ফেরাআউনের অথবা অন্য কারও শাস্তি ও তিরস্কারের ভয় না করে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে চিৎকার করে বলল, "আমরা হারুন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম। "এ কথাটি আল্লাহ তা'আলা সুন্দরভাবে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারপর জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে বলল, আমরা হারুন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

(ফেরআউন) বলল, "কী! আমি অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসার উপর বিশ্বাস স্থান করলে। দেখছি সে তো তোমাদের প্রধান। সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি তো তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। তারা (জাদুকরগণ) বলল, আমাদের নিকট যে স্পষ্ট আলামত এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর তোমাকে কোনভাবেই প্রধান্য দিব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার।"

১. এভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের চালকে তার নিজের উপরই ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ ফেরআউন নিজেরই কৌশলজালে নিজেই আটক হয়ে পড়ে। সে সারাদেশের নামকরা জাদুকরদেরকে ডেকে দেশবাসীর সামনে এই আশায় হাজির করেছিল যে, জনগণ হযরত মূসা (আ)-কে একজন জাদুকর বলে বিশ্বাস করে নেবে। অথবা অন্তত জনসাধারণের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু জাদুকররা সকলে জানিয়ে দিলো যে, হযরত মূসা (আ) যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তা কিছুতেই জাদু নয়; বরং তা নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন যার সামনে সবরকম জাদুর শক্তি অচল।

আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেন এবং যে জাদুকরী করতে তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছিলে তা-ও ক্ষমা করে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন ও চিরস্থায়ী। আসল কথা[১] হলো, যে অপরাধী হয়ে তার রবের সামনে হাজির হবে তার জন্য দোযখ অবধারিত রয়েছে, যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যে তার সামনে মুমিন হিসেবে হাজির হবে, যে নেক আমল করে থাকবে, এমন সব লোকের জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। চির সবুজ বাগ-বাগিচা, যার নিচে ঝরণাধারা বহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ বদলা তার জন্য যে পবিত্র জীবন কাটায়। -সূরা ত্বা-হা : ৭৩-৭৬

হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রা), ইকরামা, হাশিম ইবনে আবী দারদাহ ও ইমাম আওযায়ী (রহ) প্রমুখ বলেছেন, জাদুকরেরা যখন আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সিজদাবনত হলো, তখন তাদেরকে জান্নাতের সে সুসজ্জিত প্রাসাদগুলো দেখানো হলো, যা তাদের বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তাদের অভ্যর্থনার জন্য জান্নাতের যেসব রাস্তা সুসজ্জিত করা হয়েছিল, সেগুলোও তারা দেখল। এ কারণে তারা (জাদুকরগণ) ফেরআউনের ধমক ও শাস্তির বিন্দুমাত্র পরওয়া করছিল না।

ফেরআউন এ কারণে হুমকী দিয়েছিল যে, যখন সে দেখতে পেল জাদুকরগণ মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনে ফেলেছে এবং উপস্থিত জনতার সামনে প্রকাশ্যে হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর প্রশংসা করছে, এতে ফেরআউন অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়ল। আর এ ঘটনায় সে (ফেরআউন) নির্বাক হয়ে গেল, দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলল। জাদুকরগণকে ফেরআউনের এভাবে হুমকী দেয়া যে, "আমার অনুমতি ব্যতীত তোমরা কেন ঈমান এনেছ। এ বলাটা ছিল তার রাজনৈতিক কৌশল, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে রাখার এক অভিনব পন্থা। অর্থাৎ আমার সামনে তোমরা এতবড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমার মতামত ও পরামর্শ ছাড়া কেন নিলে? তারপর ফেরআউন তাদেরকে ভয় দেখাল, ধমক দিল এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলল, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান; সেই তোমাদেরকে জাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। অন্যত্র বর্ণিত আছে, এ তো তোমাদের চক্রান্ত; তোমরা জেনেশুনে এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে এটা হতে বের করার জন্য। আচ্ছা! তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম পাবে। -সূরা আরাফ : ১২৩

ফেরআউনের এ কথাটি যে অসত্য, ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যমূলক তা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির কাছেই স্পষ্ট। এরূপ অবাস্তব ও অমূলক কথা কোনো শিশুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ফেরআউনের রাজ দরবারের সকল লোক ও সাধারণ মানুষ এ কথাটি ভালভাবেই জানে যে, মূসা (আ) এ জাদুকরগণকে কখনই দেখে নি। তিনি কিভাবে এ জাদুকরদের শিক্ষক ও প্রধান হতে পারেন? ফেরআউনের মন্তব্যটি মিথ্যা হওয়ার আরো যুক্তি হলো এই যে, হযরত মূসা (আ)-এ জাদুকরগণকে সমবেত করেন নি। আর এদের সম্পর্কে তার কোনো ইলমও ছিল না। অর্থাৎ তাদের সাথে তার কোনো পূর্বপরিচয়ও ছিল না; বরং ফেরআউন নিজেই এ জাদুকরগণকে সংবাদ দিয়ে, বিশেষ লোক প্রেরণ করে উপস্থিত করে ছিল। জাদুকরদের অনুসন্ধান করে সমবেত করার জন্য মিশরের গ্রাম-গ ও শহরের সর্বত্র লোক পাঠিয়েছিল ফেরআউন নিজেই। হযরত মূসা (আ) প্রেরণ করেন নি। সুতরাং (ফেরআউনের এ কথাটি কিভাবে সত্য হতে পারে) তার এ কথাটি মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়। এ ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

সূরা আরাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তারা তার সাথে কুফরী করেছে। সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। মূসা বলল, হে ফেরআউন! আমি তো জগসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি। সুতরাং বনী ইসরাঈলকে তুমি আমার সাথে যেতে দাও। ফেরআউন বলল, যদি তুমি কোনো

১. *জাদুকরদের কথার পর আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন। কথার ধরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ কথা জাদুকরদের কথার অংশ ছিল না।*

নিদর্শন এনে থাক এবং তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তা পেশ কর। তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেটি এক সাক্ষাৎ অজগর হলো এবং সে তার হাত (বগলে প্রবেশ করিয়ে) বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা (হাত) দর্শকের দৃষ্টিকে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো। ফেরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও? তারা বলল, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও, যেন তারা তোমরি নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে। জাদুকরেরা ফেরআউনের নিকট এসে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? সে বলল, হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা বলল, হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব? সে বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা (জাদুকরেরা রশি ও লাঠি) নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের জাদু করল (অর্থাৎ, দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাল)। তাদেরকে আতঙ্কিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। আমি মূসা প্রত্যাদেশ করলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং তারা যা করতেছিল তা মিথ্য প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা পরাভূত হলো লাঞ্ছিত হলো এবং জাদুকরেরা সিজদাবনত হলো। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুনেরও প্রতিপালক। ফেরআউন বলল, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? এটা তো এক চক্রান্ত; তোমরা স্বজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীকে সেথা হতে বের করার জন্য। আচ্ছা! তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানবে। আমি তো তোমাদের হস্ত-পদ বিপরীত দিক হতে কর্তন করবই। তারপর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই; তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব; তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এজন্যই যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু ঘটান।" –সূরা আরাফ : ১০৩-১২৬

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এরপর আমি মূসা ও হারুনকে আমার আয়াতসমূহসহ ফেরআউন ও তার সর্দারদের নিকট পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করল এবং তারা অপরাধী লোক ছিল। তারপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের নিকট সত্য এলো, তখন তারা বলল যে এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। মূসা বললেন, যখন সত্য এসে গেছে, তখন তোমরা এমন কথা বলছ? এটা কি জাদু? অথবা জাদুকররা সফল হতে পারে না।[১] এর জবাবে তারা বলল, তুমি কি এজন্য এসেছ যে, আমাদের বাপ-দাদাকে যে পথে চলতে দেখেছি তা থেকে আমাদেরকে ফিরাবে এবং যাতে দুনিয়ায় তোমাদের দু'জনের বড়ত্ব কায়েম হয়ে যায়? তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নেব না। ফেরআউন (নিজের লোকদেরকে) বলল, সব যোগ্য জাদুকরকে আমার নিকট হাজির কর। যখন জাদুকররা এলো তখন মূসা তাদেরকে বললেন, তোমরা যা কিছু ফেলার তা ফেল। যখন তারা তাদের জাদু ফেলল তখন মূসা বললেন, যা কিছু তোমরা ফেলেছ তা (নিছক) জাদু। আল্লাহ এখনি তা বাতিল করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ শোধরাতে দেন না। আল্লাহ তার ফরমান দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করে দেখান, অপরাধীদের নিকট তা যতই অপছন্দনীয় হোক।" –সূরা ইউনুস : ৭৫-৮২

সূরা শুআরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ফেরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব। মূসা বলল, আমি যদি তোমার নিকট কোনো স্পষ্ট নিদর্শন আনয়ন করি তবুও? ফেরআউন বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর। তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হলো এবং মূসা (আ) (বগলে হাত প্রবেশ করিয়ে পুনরায় সে) হাত বের

১. অর্থাৎ জাদু ও মুজিযার মধ্যে যে মিল দেখা যায়, তার ভিত্তিতে তোমরা বিনা সংকোচে এটাকে জাদু বলছ। কিন্তু তোমরা এটা দেখলে না যে, জাদুকর কেমন চরিত্রের লোক হয় এবং তারা কী উদ্দেশ্যে জাদুর খেলা দেখায়। কোনো জাদুকর কি বিনা স্বার্থে ও বিনা দ্বিধায় এক মহাশক্তিশালী বাদশাহর দরবারে এসে তাকে খুদাহ বলে এবং তাকে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দেয়?

করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো। ফেরআউন তার পরিষদবর্গকে বলল, এ তো সুদক্ষ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদু বলে বের করতে চায়। এখন তোমরা কি করতে বল? তারা বলল, তাকে ও তার ভ্রাতাকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও, যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি অভিজ্ঞ জাদুর উপস্থিত করে। তারপর নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হলো এবং লোকদেরকে বলা হলো, তোমরাও সমবেত হতেছ কি? (অর্থাৎ তোমরাও সমবেত হও) যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়। তারপর জাদুকরেরা এসে ফেরআউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? ফেরআউন বলল, হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হবে। মূসা তাদেরকে বলল, তোমরা যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর। তারপর তারা তাদের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তারা বলল, ফেরআউনের ইজ্জতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব। তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করলে সহসা তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। তখন জাদুকরেরা সিজদাবনত হয়ে পড়ল এবং বলল, "আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। ফেরআউন বলল কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তাতে বিশ্বাস করলে? সে তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এর পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই। তারা বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন। কারণ, আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী। -সূরা শুয়ারা : ২৯-৫১

সুতরাং ফেরআউন মিথ্যা বলেছে এবং অহঙ্কার করে বলেছে যে, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। ফেরআউন এমন এক মিথ্যা কথা বলেছে, যে সম্পর্কে সবাই জানে যে, এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা এবং তার বানানো কথা। এছাড়া ফেরআউনের ধৃষ্টতা ও মূর্খতা তার নিজের কথায়ও স্পষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা স্বজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদের নগর হতে বের করে দেয়ার জন্য। এখনই তোমরা এর পরিণাম জানতে পারবে।

"আমি তো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবই।" ফেরআউনের এ কথার অর্থ হলো এই যে, আমি তোমাদের ডান হাত এবং বাম পা, অথবা বা হাত এবং ডান পা কর্তন করবই। আর তাদেরকে শূলবিদ্ধ করবে বলে যে হুমকী দিয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল, এটা যাতে পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে এবং কোনো লোক যাতে মূসা (আ)-এর অনুসারী না হয়। অর্থাৎ তার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান না আনে। এ কারণেই বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করব। কারণ, এ বৃক্ষটি খুব উঁচু। এটি সবার চোখে পড়বে এবং সবাই বিষয়টি অবগত হবে। সে আরো বলেছিল, তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে (পৃথিবীতে) কে কঠোর ও সর্বাধিক স্থায়ী।

কিন্তু জাদুকরদের অন্তরে ঈমান মযবূত হয়ে গেল। এ কারণে তারা জবাবে বলে ছিল আমাদের নিকট لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর ও যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রধান্য দিব না।

উল্লিখিত وَالَّذِيْ فَطَرَنَا এ আয়াতের واو (ওয়াও) শব্দটি যদি সংযোগকারী অব্যয় হয় তবে এর অর্থ হবে, হে ফেরআউন! আমরা তোমাকে আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর প্রধান্য দিব না। আর যদি 'ওয়াও' অক্ষরটি শপথের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে তবে অর্থ হবে, সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তোমার শক্তিতে যা আছে, তা আমাদের উপর প্রয়োগ করতে পার। আমরা কোনো পরওয়া করি না। কারণ, এ পার্থিব জীবনে তুমি আমাদেরকে হয়তো কিছুটা শাস্তি দিতে পার, যখন আমরা পৃথিবী ছেড়ে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান পরকালে

ফিরে যাব, তখন সে মহান সত্তার আদেশই স্থায়ীভাবে জারি থাকবে, যার আমরা এখন আনুগত্য করছি এবং যার রাসূলের অনুসরণ করছি। তারা আরো বলেছেন, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যাতে তিনি আমাদের যাবতীয় অপরাধ ও তুমি যে আমাদের জোরপূর্বক জাদু করতে বাধ্য করেছ সে অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। অর্থাৎ তুমি যেসব উপহার সামগ্রী ও প্রতিশ্রুতির কথা বলেছ, সেগুলোর চাইতে আল্লাহ তা'আলার বিনিময় ও ওয়াদা অধিক উত্তম, কল্যাণকর ও স্থায়ী। অর্থাৎ পরকালের প্রতিদান স্থায়ী, আর এ পৃথিবী হচ্ছে অস্থায়ী। তারা আরো বলল, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবেন। কারণ, আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী। অর্থাৎ আমাদের থেকে যেসব পাপ কাজ ও অবৈধ কাজ সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ মেহেরবানী করে সেগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে এ প্রত্যাশা করছি। কারণ, তারই অনুগ্রহে কিবতীদের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর নবুওয়াতের উপর ঈমান এনেছি।

এ মু'মিনগণ ফেরআউনকে এ কথা বলেছিলেন যে, 'তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করেছি, যখন এগুলো আমাদের কাছে এসেছে অর্থাৎ তোমার কাছে আমাদের অপরাধ শুধু এটাই যে, আমরা আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং নিজের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর প্রতি ঈমান এনেছি, যখন সেগুলো আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর কি শান! তাদের ঈমান এতখানি দৃঢ় হয়েছিল যে, তারা ফেরআউনকেও নসীহত করলেন এবং মহান আল্লাহ তা'আলার শাস্তির কথাও তাকে জানিয়ে দিলেন। তারা বললেন, যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম। যেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। সুতরাং হে ফেরআউন! তুমি এগুলো থেকে নিজকে রক্ষা কর। কখনো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আর আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি এবং হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আন। কারণ, 'যারা তার নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এ পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র। সুতরাং হে ফেরআউন! তুমি এদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর। কিন্তু ফেরআউনের ব্যাপারে যে ফায়সালা হয়েছে তা কেউই খণ্ডন করতে পারবে না।

ফেরআউনের ব্যাপারে মহান সত্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়ে গেছে যে, ফেরআউন জাহান্নামী। যে যন্ত্রণা স্বাদ-আস্বাদন করবে এবং তার মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢালা হবে এবং তাকে তিরস্কার-ঠাট্টা করে এবং ধমক দিয়ে বলা হবে, জাহান্নামের শাস্তি আস্বাদন কর, তুমি তো ছিলে (পৃথিবীতে) শক্তিশালী ও সম্মানিত। ফেরআউন ছিল এরূপ তিরস্কার ও ভর্ৎসনার যোগ্য। সে ছিল নিকৃষ্ট ব্যক্তি।

এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অভিশপ্ত ফেরআউন সে মু'মিনগণকে শূলবিদ্ধ করেছিল ও (কঠিন) শাস্তি দিয়েছিল। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি রাজি হন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রা) বলেছেন, তারা দিনের প্রথম ভাগে ছিল (ফেরআউনের) জাদুকর, আর দিনের শেষ ভাগে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী শহীদ ও নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এ হাদীসের সত্যতা পাওয়া যায় জাদুকরদের নিম্নোক্ত মুনাজাতা

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদেরকে মসীবতে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দিন এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদের মৃত্যু ঘটান।

পরাজিত হওয়ার পর ফেরআউনের কর্মসূচী

জাদুর জয় পরাজয়ের ঘটনাটি যখন ঘটে গেল, অর্থাৎ ফেরআউনের মোকাবিলায় মু'মিনগণ মহাবিজয় লাভ করল, কিবতীরা হলো পরাজিত এবং মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে যে জাদুকরদেরকে আনা হয়েছিল তারাই মূসা (আ)-এর অনুসারী হয়ে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে গেল। এরপরও কিবতীদের অন্তরে এর কোনোই প্রভাব পড়ল না; বরং তাদের কুফরী, গোমরাহী ও অবাধ্যতা আরো বৃদ্ধি পেল। এরপর ফেরআউন কি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে সূরা আরাফে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, আপনি কি মূসাকে ও তার জাতিকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন? সে বলল, আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীগণকে জীবিত রাখব আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।

সূরা আ'রাফে বর্ণিত 'মূসা (আ) তার কওমকে বললেন, আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর এবং সবর কর। যমীন তো আল্লাহরই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকেই এর ওয়ারিশ বানিয়ে দেন[১]। আর শেষ পর্যন্ত সফলতা তাদের জন্যেই, যারা তাকে ভয় করে চলে। মূসার কাওম বলল, আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর এখন আপনার আসার পরও কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। (মূসা জবাবে) বললেন, হয়তো শিগগিরই তোমাদের রব তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে দুনিয়ায় খলীফা বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। –সূরা আ'রাফ : ১২৮-১২৯

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তারা ছিল তাদের নিজ নিজ জাতির নেতা ও সম্পাদশালী ব্যক্তি। তারা বাদশাহ ফেরআউনকে খুব উত্তেজিত করল, যাতে সে (ফেরআউন) আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি যুলুম করে এবং তিনি যে সব নিদর্শনাবলী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে সেগুলোকে অবিশ্বাস করে এবং তার সাথে মোকাবিলা করে। এ সম্পর্কে তারা বলল, আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন? –সূরা আরাফ : ১২৭

হযরত মূসা (আ)-এর লা-শরীক এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করা, কিবতীদের দৃষ্টিতে ছিল মহাঅন্যায় ও অপরাধের কাজ।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত, আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন? এর অর্থ দু'ভাবেই হতে পারে। একটি হলো, সে আপনাকে ও আপনার মাবুদগুলোকে বর্জন করে। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, সে আপনাকে ও আপনার ইবাদতকে বর্জন করে। (প্রথম অর্থে, আয়াতে বর্ণিত (ইলাহ) শব্দটিও বহুবচন, আর দ্বিতীয় অর্থে, এটি বহুবচন নয়।

এ আয়াতে দুটি অর্থ হতে পারে। এক) মূসা আপনার ধর্ম বর্জন করে। এ অর্থটি যে যথাযথ, তা অন্য আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, মূসা আপনার ইবাদত বর্জন করে। কারণ, অভিশপ্ত ফেরআউন ধারণা করতো, সে একজন উপাস্য। তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। ফেরআউনের অনুগতরা ফেরআউনকে মূসা (আ) ও তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি যুলুম ও নির্যাতন করতে প্ররোচিত করতো, সে এতে উত্তেজিত হলো এবং বলল, "আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং নারীদেরকে জীবিত রাখব। যাতে মূসা (আ)-এর সৈন্যসংখ্যা আর বৃদ্ধি না পায়। যদি সে তার বাহিনী নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করেও বসে তবুও তাদের সৈন্য সংখ্যা স্বল্পতার কারণে আমরা তাদের উপর বিজয়ী থাকব। মূসা (আ) তার জাতিকে বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। অর্থাৎ যখন ফেরআউনের লোকেরা তোমাদের উপর অত্যাচার করতে ও তোমাদেরকে হত্যা করতে চাবে, তখন তোমরা তাদের মোকাবিলায় আল্লাহ তা'আলার কাছে

১. *আধুনিককালে কত লোক এ আয়াত থেকে 'যমীন আল্লাহ তা'আলার' এই অংশটুকু মেনে নেয় আর তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে ওয়ারিশ বানান' এই অংশ বাদ দেয়।*

সাহায্য কামনা করবে এবং এ (মসীবতের) পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান তাকে এ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করবেন। আর উত্তম পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। অর্থাৎ তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও, তবেই বিজয়ের মালা তোমাদের কাছে চলে আসবে। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, মূসা বলেছিল, হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) হয়ে থাক, তবে তোমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা কর। তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (তারপর দোয়া করলেন) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির উৎপীড়নের পাত্র কর না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর। -সূরা ইউনুস : ৮৪-৮৬

বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে যে অভিযোগ করেছিল, আমাদের কাছে তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরও। এর অর্থ এরূপ, হে মূসা! তোমার আগমনের পূর্বে তোমার অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য আমাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং তোমার আগমনের পরেও আমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। যাতে বনী ইসরাঈলের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয় এবং জনবলে তারা দুর্বল থাকে। হযরত মূসা (আ) বললেন, অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। সূরা মু'মিনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম ফেরআউন, হামান ও কারুনের নিকট। কিন্তু তারা বলেছিল, এ লোকটা তো জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। -সূরা মু'মিন : ২৩-২৪

ফেরআউন ছিল বাদশাহ! হামান ছিল ফেরআউনের ওযীর (মন্ত্রী)। আর কারুন ছিল মূসা (আ)-এর জাতি বনী ইসরাঈলের এক সম্পদশালী ব্যক্তি। সে (কারুন) ফেরআউনের ভ্রান্ত মতের অনুকরণ করত। তার ঘটনা পরে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'তারপর মূসা আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, মূসার সাথে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখ। কিন্তু কাফেরদের ষড়যন্ত্র, ব্যর্থ হবেই। -সূরা মু'মিন : ২৫

হযরত মূসা (আ)-এর আগমন ও দাওয়াতের পরে বনী ইসরাঈলদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার এবং তাদের জনশক্তি হ্রাস করা। আর উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাইলগণ এমন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী না হয়ে যায়, যাতে তারা কিবতীদের উপর হামলা করতে পারে। কারণ, কিবতীরা বনী ইসরাঈলদেরকে খুব ভয় করতো। কিন্তু তাদের এ জুলুম নির্যাতনের কৌশল তাদের কোনই উপকারে আসল না। তারা সে মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার ভাগ্যলিপিকে কোনভাবেই খণ্ডন করতে পারল না, যে মহান সত্ত্বা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে 'কুন' (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথে তা হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, (ফেরআউন বলল) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন ঘটাবে বা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। -সূরা মু'মিন : ২১

ফেরআউন তার জাতির লোকদেরকে উপদেশ ও নসীহতের প্রতারণায় নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইল। এ কারণে আরবে উপহাস ও ঠাট্টা হিসেবে এ উক্তিটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেল যে, ফেরআউন একজন উপদেশ দাতা (বক্তা) হয়ে গেছে। ফেরআউন তার ভ্রান্ত ধারণায় মনে করেছিল যে, মূসা (আ) আবার লোকদেরকে পথভ্রষ্ট না করে বসে। এর জবাবে মূসা (আ) বলেছিলেন, 'যারা বিচারদিনকে বিশ্বাস করে না, সে সব উদ্ধত ব্যক্তিগণ থেকে আমি আমার ও তোমার প্রতিপালকের শরাণাপন্ন হচ্ছি। -সূরা মুমিন : ২৭

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় কামনা করছি, ফেরআউন ও তার অনুসারীদের অমঙ্গল থেকে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে 'উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। অর্থাৎ তারা এমন অবাধ্য ও উদ্ধত যে তারা নবী ও মুমিনগণের প্রতি জুলুম ও অনিষ্ট করেই যাচ্ছে। এর থেকে কোনোভাবেই ফিরে আসছে না। আর

তারা আল্লাহ ও তার শাস্তিকে আদৌ ভয় করছে না। কেননা, তারা পরকালে ও পরকালের শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। এ কারণে হযরত মূসা (আ) তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তারা এমন অবাধ্য যে, হিসাব-নিকাশের দিনের প্রতিও বিশ্বাস করে না।

তারপর এক মুমিন লোক এসে হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ অবলম্বন করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন গোত্রের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে। সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরআউন বলল, আমি যা বুঝি, আমি তোমাদেরকে তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎ পথই দেখিয়ে থাকি। –সূরা মুমিন : ২৮-২৯

এ মু'মিন লোকটি ফেরআউনের চাচাতো ভাই ছিল। নিজ জীবননাশের ভয়ে তিনি তার ঈমানের কথা গোপন রাখতেন। কোনো কোনো আলেমের মতে এ (মুমিন) লোকটি কিবতী ছিল না; বরং তিনি ছিলেন ইসরাঈলী। কিন্তু এ অভিমতটি (কুরআনী) বর্ণনার সাথে শব্দগত দিক দিয়ে এবং অর্থগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অমিল এবং এ কথাটি যথার্থ হওয়া অস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে জুরায়য (রহ) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিবতীদের মধ্যকার এ মর্মে মু'মিন লোকটি এবং যে লোকটি শহরের এক প্রান্ত থেকে এসেছিল (যার সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। এবং ফেরআইনের স্ত্রী (এ তিনজন) ছাড়া আর কেউ হযরত মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনে নি। ইবনে হাতিম (রহ.) এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। দারকুতনী (রহ) বলেছেন, এ মুমিন লোকটি ফেরআউনের বংশের ছিল। শামআন নামে সে প্রসিদ্ধ ছিল। সুহাইলী (রহ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিবরানী গ্রন্থে তার নাম 'খায়রক" বলে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। মোটকথা সে মু'মিন লোকটি তার ঈমান ও আমল গোপন রাখতেন। যখন অভিশপ্ত ফেরআউন হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করার দৃঢ় ইচ্ছা করল এবং এ সম্পর্কে তার পরিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করতে লাগল, তখন এ মু'মিন লোকটির হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে আশঙ্কা হলো যে, ফেরআউন তাকে হত্যা করবে। তখন তিনি ফেরআউনকে নম্র ভাষায় ও ও সুকৌশলে বুঝালেন এবং এরূপ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী বাদশাহের সামনে ন্যায় কথা বলা। এ মর্যাদায় মু'মিন লোকটি উচ্চতম স্থান লাভ করেছেন। কারণ, ফেরআউনের চাইতে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী বাদশাহ অন্য আর একজন হতে পারে না। (অর্থাৎ সে ছিল চরম অত্যাচারী বাদশাহ) আর ফেরআউনের কাছে মু'মিন লোকটির উক্ত কথাটি ছিল অত্যধিক ন্যায়ভিত্তিক কথা। কারণ, তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, একজন নবীকে হিফাজাত করা ও নিরাপদে রাখা। আর এটাও হতে পারে যে, তিনি (মু'মিন লোকটি) তার ঈমানের কথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এরূপ বলেছিলেন। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটিই অধিক বিশুদ্ধ ও সঠিক। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এ মুমিন লোকটি ফেরআউনকে বলেছিলেন, তুমি কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলেন যে, আমার রব আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে তার রব বলে মেনে নিয়েছেন এ কারণে কি তুমি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছ? এমন মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তির সাথে খারাপ ব্যবহার করা আদৌকি ঠিক হবে; বরং এরূপ ব্যক্তিকে সম্মান করা তোমার একান্ত কর্তব্য।

আর যদি তার সাথে এরূপ সুন্দর ব্যবহার করতে না-ই পার, তবে তাকে শালীনতার সাথে বিদায় দাও। আর প্রতিশোধের আগুনকে নির্বাপণ কর। অর্থাৎ হত্যা করার চিন্তা অন্তর থেকে দূরীভূত কর। মু'মিন লোকটি আরো

বললেন, সে আমাদের প্রতি পালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ তিনি এমন কিছু অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মুজেযা নিয়ে এসেছেন, যাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য এবং তার আনীত আলামতসমূহ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। সুতরাং যদি তোমরা তার সাথে সন্ধি কর আর তার কথা মেনে নাও, তবে তোমরা প্রশান্তিতে ও নিরাপদে থাকবে।

কারণ, যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন, তবে এ মিথ্যার দায়-দায়িত্ব তার উপরেই পড়বে। আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর নিপতিত হবেই। অর্থাৎ তিনি মিথ্যাবাদী হলে, তাতে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই। আর যদি তিনি সত্যবাদী হন আর তোমরা তার প্রতি নির্যাতন কর, তবে অবশ্যই তোমাদের কিছু না কিছু শাস্তি ভোগ করতেই হবে। আর সে শাস্তি যদি পূর্ণভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করে, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে? ব্যাপারটি কি একটুও চিন্তা করেছ?

মুমিন লোকটি মূসা (আ)-এর স্বপক্ষে ফেরআউনের সাথে ভদ্র ও নম্র ভাষায় কথা বলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে বাঁচিয়ে দেয়াতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি অবশ্যই একজন পূর্ণ জ্ঞানী ও শান্তিপ্রিয় লোক। এরপর মুমিন ব্যক্তি তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল। কিন্তু এ রাজত্ব ও নেতৃত্ব তোমাদের থেকে সরিয়ে নেয়ার আমি আশঙ্কা করছি। কারণ, তোমাদের পূর্বে যেসব রাজা-বাদশাহগণ আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করেছে, তারা সকলেই বিনাশ হয়ে গেছে এবং মর্যাদা প্রাপ্তির পরে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। পরবর্তীতে অনুরূপ পরিণাম হয়েছে ফেরআউন ও তার গোত্রের লোকদেরও। যখন ফেরআউন ও তার অনুসারীরা হযরত মূসা (আ)-এর আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করেছে এবং তাকে ও তার আনীত নিদর্শনাবলীকে ঔদ্ধত্যের সাথে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তখন আল্লাহ তআলা তাদের থেকে রাজত্ব, নেতৃত্ব ও ধন-সম্পদ কেড়ে নেন। রাজপ্রাসাদের আরাম-আয়েশ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেন। তারপর তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে মারেন এবং তাদের আত্মাগুলো (জাহান্নামের) সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছিয়ে দেন। এ কারণেই এ জ্ঞানবান, নেককার, সঠিকপথ প্রদর্শক, সত্যের অনুসারী, নবুওয়াত ও নিদর্শন সত্যায়নকারীগণ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে বলেছিলেন, আজ কর্তৃত্ব তোমাদের। অর্থাৎ আজ তোমরা রাজ সিংহাসনে আসীন, জনগণের মধ্যে তোমরাই উচ্চ ও সম্মানিত মর্যাদাসম্পন্ন। তাদের উপর তোমাদেরই রাজত্ব। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিপতিত হলে, তা থেকে কে রক্ষা করবে? অর্থাৎ মনে করলাম, তোমরা পৃথিবীতে সংখ্যায় অনেক বেশি, শক্তি ও সামর্থ্যে বনী ইসরাঈলের অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশি, কিন্তু এসব কিছু শাস্তির সময় উপকারে আসবে না। রাজাধিরাজ গোটা জাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলার শাস্তি থেকে আমাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু মু'মিন লোকটির উত্তরে ফেরআউন বলল, 'আমি যা বুঝি, আমি তাই তোমাদের বলছি। আমি কেবল তোমাদেরকে সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি। অর্থাৎ আমি আমার পথে তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আর আমার দৃষ্টিতে এটিই সঠিক পথ। ফেরআউন উক্ত দুটি কথাই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছিল। কারণ, সে মনেপ্রাণে নিশ্চিত জানত যে, মূসা (আ) যা কিছু পেশ করেছেন, তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই আনীত। কিন্তু এর পরেও সে (ফেরআউন) কুফরী, গোমরাহী ও শত্রুতার কারণে বাহ্যিকভাবে এরূপ বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ বলেন (এ কারণে) মূসা (তাকে) বলেছিল, "তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এ সব স্পষ্ট নির্দশন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রবই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফেরআউন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন। (আল্লাহ বলেন) তারপর ফেরআউন তাদেরকে (মিশর) দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল। তখন আমি ফেরআউন ও তার সাথীগণ সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে (মিশর অথবা সিরিয়ার যেখানে ইচ্ছা) বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি সমবেত করে উপস্থিত করব।

–সূরা বনী ইসরাইল : ১০২-১০৪

বুঝা গেল যে, ফেরআউনের সঠিকভাবেই জানা ছিল যে, হযরত মূসা (আ) সত্য নবী। কিন্তু রাজ সিংহাসনের লোভে ঈমান আনা থেকে বিরত রইল। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল, তারা (ফেরআউন ও তার অনুসারীরা) বলল, এটা স্পষ্ট জাদু। তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখান করল, যদিও তাদের অন্তর এ (নিদর্শন) গুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ! বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। -সূরা নামাল : ১৩-১৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারপর সে (মূসা) তাকে (ফেরআউনকে) মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে অমান্য করল এবং অবাধ্য হলো। অতঃপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হলো। আর সে সবাইকে সমবেত করে উচ্চকণ্ঠে বলল, "আমিও তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। তারপর আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা আছে। -সূরা নাযিআত : ২০-২৬

সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছিলাম ফেরআউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তারা ফেরআউনের কার্যকলাপের অনুরূপ করতো এবং ফেরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিন তার জাতির অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে প্রবেশ করানো হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান। এ পৃথিবীতে তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপপ্রাপ্ত এবং অভিশাপপ্রাপ্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার যা ওদেরকে দেওয়া হবে। -সূরা হূদ : ৯৬-৯৯

আমি যা বুঝি তোমাদের তাই বলছি। ফেরআউনের এ কথাটি ছিল মনগড়া ও স্পষ্ট মিথ্যা। অনুরূপভাবে তার নিম্নোক্ত কথাটি "আমি শুধু তোমাদের সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি, এটাও ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ, সে সঠিক পথে ছিল না। বরং সে ছিল মিথ্যাবাদী, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট এবং ভ্রান্ত পথের অনুসারী। যে কারণে সে নিজেই সর্বপ্রথম মূর্তি ও দেবদেবীর পূজা শুরু করে। এরপর তার মূর্খ ও পথভ্রষ্ট জাতিকেও তার অনুসরণ করার আহ্বান করে এবং সে যে কুফরী দাবি করেছিল যে, 'সে রব' (নাউজুবিল্লাহ) তা বিশ্বাস করার জন্যও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন তার জাতির মধ্যে এ বলে ঘোষণা করল, হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এটা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি হতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেওয়া হলো না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সাথে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা তো ছিল এক সত্য ত্যাগী সম্প্রদায়। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে। তারপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। -সূরা যুখরুফ : ৫১-৫৬

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "অতঃপর মূসা (ফেরআউনের কাছে গিয়ে) তাকে বড় প্রমাণ দেখালেন১। কিন্তু সে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল ও অমান্য করল। তারপর সে চালবাজি করার মতলবে পেছনে ফিরল। তারপর লোকদেরকে একত্র করে সে তাদের সম্বোধন করে বলল, আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব। অবশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। আসলে যে (আল্লাহকে) ভয় করে২, তার জন্য এতে রয়েছে বিরাট উপদেশ।

সূরা হূদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও (নবুওয়াতের) স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরআউন ও তার সরদারদের নিকট পাঠিয়েছি। কিন্তু (জনগণ) ফেরআউনের আদেশেই মেনে চলেছে। অথচ ফেরআউনের আদেশ সঠিক ছিল না। কিয়ামতের দিন সে তার কাওমের সামনে থাকবে এবং তারই নেতৃত্বে তাদেরকে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তা কতই না মন্দ জায়গা। যেখানে কেউ পৌঁছে! তাদের উপর দুনিয়াতেও লা'নত পড়েছে, কিয়ামতের দিনও পড়বে। কতই না মন্দ পুরস্কার সেটি, যা কেউ লাভ করে!

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, ফেরআউন তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যে কথা বলেছিল (আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই বলছি, আমি শুধু তোমাদের সৎপথই দেখিয়ে থাকি।) তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট কথা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তির উক্তির বিবরণ দিয়ে বলেন, 'মুমিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করি যেমন ঘটেছিল নূহ, আদ, সামুদ এবং তার পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোনো জুলুম করতে চান না। হে আমার ভয়ঙ্কর! আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি ভয়ঙ্কর দিবসের, যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে। আল্লাহর আযাব হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ, কিন্তু সে তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ করতে। অবশেষে যখন ইউসুফের ইন্তেকাল হলো তখন তোমরা বলেছিলে, তারপর আল্লাহ আর কোনো রাসূল প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহকারীদেরকে যারা নিজেদের কাছে কোনো দলীল প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাদের এ কর্ম আল্লাহ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত। এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। –সূরা মুমিন : ৩০-৩৫

উক্ত আয়াতে আল্লাহর বন্ধু এ মু'মিন লোকটি, আল্লাহর দুশমন (ফেরআউন ও তার অনুসারী)-দেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, যদি তারা আল্লাহ ও তার রাসূল মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তারাও অনুরূপ শাস্তিতে পতিত হবে, যেরূপ শাস্তিতে পতিত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী নাফরমান ও অবাধ্য লোকেরা। তাদের উপর পতিত হয়েছিল বড় ধরনের শাস্তি। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হয়েছিল। কিবতী ও অন্যান্য লোকদের এটা ভালভাবেই জানা ছিল যে, নবীকে মিথ্যা বলার কারণে নূহ, আদ ও সামুদ এবং তারে পরবর্তী লোকদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হয়েছিল। যে কারণে পৃথিবীর মানুষের কাছে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নবী (আ)-গণ যে আলামত নিয়েই আসেন তা সত্য ও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। কারণ, দেখা গেছে এগুলো অবিশ্বাসকারী, অস্বীকারকারী ও ত্যাগকারীদের উপর আল্লাহর কঠিন শাস্তি নাযিল হয়েছে। আর নবী (আ)-দের অনুসারীগণ সে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং পরকালেও তারা নিরাপদ। কিয়ামতের দিবসকে উপরিউক্ত আয়াতে 'ভয়ঙ্কর দিবস' বলা হয়েছে। কারণ, সেদিন মানুষ একে অপরকে আহ্বান করবে (ডাকবে)। পশ্চাৎ ফিরে সেদিন এদিক-সেদিক পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু কোথাও পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— সেদিন এ মানুষই বলে উঠবে, পালানোর জায়গা কোথায়? কক্ষনো নয়! সেখানে কোনো আশ্রয়ের জায়গা থাকবে না। সেদিন তোমার রবেরই সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে[১]।

–সূরা কিয়ামাহ : ১০-১২

এ ব্যাপারে আল্লাহ তআলা অন্য সূরায় বর্ণনা করেন— হে জিন ও মানবসমাজ! যদি আসমান ও যমীনের সীমানা পার হয়ে তোমরা পালিয়ে যেতে পার, তাহলে পালাও দেখি। কিছুতেই পালাতে পারবে না। এর জন্যে অনেক শক্তি লাগবে[২]। অতএব, তোমাদের রবের কোন কোন কুদরতকে তোমরা অস্বীকার করবে? (যদি তোমরা

১. এর মর্ম এই নয় যে, এ সময় আল্লাহ তা'আলা এত ব্যস্ত যে, অন্যান্য বান্দাদের কৈফিয়ত নেওয়ার জন্য তার অবসরই মিলছে না; বরং এর আসল অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এর জন্য একটি সময়সূচি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সে হিসেবে মানুষ ও জিনের শেষ বিচারের সময় এখনো আসে নি।

২. যমীন ও আসমান এর অর্থ বিশ্বজগৎ বা অন্য কথায় আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজগত। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। যে বিচারের খবর তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, তার সময় এলে তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমাদেরকে ধরে আনা হবে। এ পাকড়াও থেকে রক্ষা পেতে হলে তোমাদেরকে আল্লাহর রাজ্য থেকে পালিয়ে যেতে হবে; কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। যদি নিজেদের মনে এরূপ শক্তির অহঙ্কার তোমাদের থাকে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে একবার দেখ না।

পালাতে চেষ্টা কর তাহলে) তোমাদের উপর আগুনের শিখা ও ধোঁয়া ছেড়ে দেওয়া হবে। তোমরা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। অতএব (হে জিন ও মানুষ!) তোমাদের রবের কোন কোন নেয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করবে?

অতঃপর সে মু'মিন ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, তিনি মিশরে আগমন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন সমস্ত সৃষ্টির জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণস্বরূপ অর্থাৎ তার দ্বারা সবাই ইহকাল ও পরকালের ফায়েদা লাভ করেছেন। অনুরূপভাবে এ মূসা (আ)ও হলেন তারই অধস্তন বংশধর। তিনি লোকদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। আর সৃষ্টির কাউকেই এক আল্লাহর শরীক না করার জন্যে বলেন। তারপর মু'মিন লোকটি মিশরের লোকদের অভ্যাস ও চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, তোমাদের তো অভ্যাসই হলো সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, আর রাসূলগণের বিরোধিতা করা। এ কারণেই তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইউসুফ এসেছিল তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিল, তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। অবশেষে যখন ইউসুফ (আ)-এর মৃত্যু হলো, তখন তোমরা বলেছিলে তারপরে আল্লাহ আর কোনো রাসূল প্রেরণ করবেন না। এরূপে মিশরের লোকেরা প্রথম থেকেই হযরত মূসা (আ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। তারা মনে করত, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে আর কোনো নবী পৃথিবীতে আগমন করবে না। সুতরাং পরবর্তীতে আগত নবী মূসা (আ) সম্পর্কেও তাদের ভ্রান্ত ধারণা তিনি আল্লাহর রাসূল নন। এ প্রেক্ষিতে মু'মিন লোকটি বললেন, এরূপে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন সীমালঙ্ঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণকে যারা মিথ্যা বলে কোনো প্রকার দলীল-প্রমাণ ব্যতীতই, তারা আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়। আর আল্লাহ এমন সব লোকদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট থাকেন, যারা সত্য বিষয়ের প্রতি সন্দেহ করে এবং তা মিথ্যা বলে। অতঃপর বলেন, এভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।

মু'মিন লোকটির সত্য কথায় ফেরআউনের মনগড়া যুক্তি শেষ হয়ে গেল। সে চরম উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। ফেরআউনের ধৃষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন বলল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি পথ পাই, আসমানে আরোহণের, যেন দেখতে পাই মূসার মা'বূদকে; তবে আমি তো তাকে মিথ্যাবাদী মনেই করি। এভাবেই ফেরআউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দকর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে এবং ফেরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

–সূরা মুমিন : ৩৬-৩৭

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরাআউন এ কথা বলেছিল যে, যাতে আমি পথ পাই, আসমানে আরোহণের পথ। অর্থাৎ আসমানে আরোহণের রাস্তা। অতঃপর ফেরআউন বলল, হয়তো এটাতে উঠে আমি মূসার মা'বূদকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী।

উক্ত দুটি সূরার দুটি আয়াত দ্বারা দু-প্রকারের অর্থ প্রকাশ পায়। প্রথমত: আমি মূসাকে মিথ্যাবাদী বলছি বা জানছি তার এ কথায় যে, আমি ব্যতীত অন্য আর একজন প্রতিপালক আছে। দ্বিতীয় অর্থ হলো, আমি মূসাকে মিথ্যা জানছি তার এ কথায় যে, সে বলছে, আল্লাহ তাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। প্রথম অর্থটি ফেরআউনের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাযথ বলে প্রমানিত হয়। কারণ, ফেরআউন সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ)-কে অস্বীকার করছে। কিন্তু শব্দগত দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিই যথাযথ বলে বুঝা যায়। কারণ, ফেরআউন বলে ছিল, আমি মূসার মা'বূদকে দেখব। অর্থাৎ তার সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করব যে, তাকে আপনি নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন কিনা? আর সে যে আল্লাহর রাসূল! এ বিষয়ে তাকে আমি মিথ্যা জানছি। মোটকথা ফেরআউনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে, জনসাধারণকে হযরত মূসা (আ)-এর সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তার প্রতি যাতে কেউ ঈমান না আনে তার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তাই তাকে মিথ্যাবাদী রূপে প্রকাশ করার জন্য খুব করে লেগে গিয়েছিল। ফেরআউন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, এভাবেই ফেরআউনের

নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সঠিক পথ থেকে। এর পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউনের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, এখানে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অর্থ, ফেরআউনের ষড়যন্ত্র-কৌশল ও প্রতারণামূলক কথা যে, আকাশে গিয়ে পৌঁছব। তা ব্যর্থ হয়ে গেল। সে তার উদ্দেশ্যে তার শক্তি ও কৌশল দ্বারা পৃথিবীর নিকটবর্তী (প্রথম) আকাশে উঠতে পরবে না। সেখানে এ অভিশপ্ত ফেরআউন সপ্ত আকাশে উঠার স্বপ্ন কিরূপে দেখতে পারে? যেখানে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লী। যেখানে যাওয়া কারো পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কয়েকজন মুফাসসির বলেছেন, ফেরআউনের উর্ধ্ব আকাশে আরোহণের জন্য যে ইমারত তৈরি করা হয়েছিল, সেটি এত উঁচু ছিল যে, জমিন থেকে সেটির চূড়া নজরে আসতে ছিল না। ইমারতটি পাকা(পোড়ানো) ইট দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, ফেরআউন (হামানকে) বলেছিল, "হে হামান! আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর এর দ্বারা আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আহলে কিতাবগণ বলেন যে, বনী ইসরাঈলগণ ইটের কাজে খুব পারদর্শী ছিলেন। ফেরআউন তাদের থেকে যে সমস্ত কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করিয়েছিল, তার মধ্যে এটিও একটি ছিল। অর্থাৎ তাদের দ্বারা এ ইট তৈরি করানো হয়েছিল। বনী ইসরাঈলগণ নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কোনো কাজই করার সুযোগ পেত না; বরং তারা সর্বদা মাটি, বালু ও পানি সংগ্রহের কাজেই লিপ্ত থাকতো। ফেরআউন তাদেরকে প্রত্যহ কতগুলো নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে দেয়ার জন্য বলতো। আর সে কাজগুলো যদি তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে দিতে না পারতো, তবে তাদেরকে শারীরিকভাবে খুব নির্যাতন করতো এবং খুব তিরস্কার করতো। এ কারণে বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল, আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। -সূরা আরাফ : ১২৯

এরূপভাবে হযরত মূসা (আ) তাদেরকে ওয়াদা দিলেন যে, ইনশাআল্লাহ! শুভ পরিণাম তোমাদের জন্যই রয়েছে। আর কিবতীরা ধ্বংস হবে। আর পরিশেষে অনুরূপই ঘটে গেল। এটাও নবুওয়াতের একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মু'মিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব। হে আমার জাতি! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখেরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দ কর্ম করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ অথবা নারীর যারা মু'মিন হবে, সৎকর্ম করে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে। সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। -সূরা মুমিন : ৩৮-৪০

এ মুমিন লোকটি মানুষদেরকে সত্য ও সঠিক পথে দাওয়াত দিয়েছেন। আর সে দাওয়াত ছিল, আল্লাহর নবীর অনুসরণ করা এবং তার কথাকে সত্যায়ন করা। তারপর তিনি তাদেরকে এ নসীহত করেন যে, এ ধ্বংসীল পৃথিবী শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে।

তিনি তাদেরকে অল্পে তুষ্ট থাকার জন্য ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের ভরসা না করার জন্য দাওয়াত দেন এবং পুণ্যের কাজ করার প্রতিও উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে সবকিছুই সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকে। তার কাছে কারও আমল (কৃতকর্ম) বিনষ্ট হয় না। তিনি (আল্লাহ) সবকিছুর উপরই শক্তিমান। সবকিছুই তার কুদরতী হাতের নিয়ন্ত্রণে। তিনি (আল্লাহ) এমন মেহেরবান যে, অল্প নেক আমলের বিনিময়ে অনেক প্রতিদান দিয়ে থাকেন এবং পাপের বিনিময়ে শুধু পাপ পরিমাণই দিয়ে থাকেন। সেখানে বেশি প্রদান করেন না। তিনি আরো বলেন যে, পরকালের আযাব চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তি ঈমান ও কোনো আমলসহ সেখানে পৌঁছবে, তার জন্যে সেখানে আছে নিরাপদ প্রাসাদ ও উচ্চমর্যাদা এবং অগণিত উত্তম বস্তুসমূহ। আর সেখানে তাদের জন্যে আছে এমন বহু প্রকারের ফল ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্য যা কখনই শেষ হওয়ার নয়। আর আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামতই তাদের জন্য থাকবে স্থায়ীভাবে। এরপর এ মু'মিন লোকটি তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার কথা এবং তার খারাপ পরিণতি থেকে সাবধান করে বলেন, হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা

আমাকে ডাকছ অগ্নির দিকে। তোমরা আমাকে বলছ, আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তার সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে ডাকছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে ডাকছ এমন একজনের দিকে, যে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও আহ্বানযোগ্য নয় অর্থাৎ ইবাদতের যোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহকে অর্পণ করছি। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফেরআউন জাতিকে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় জাহান্নামের আগুনের সম্মুখে, সকাল-সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, ফেরআউন জাতিকে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। -সূরা মুমিন : ৪১-৪৬

এভাবে মু'মিন ব্যক্তি ফেরআউন ও তার জাতির লোকদেরকে সে মহান সত্তার দিকে আহ্বান করেন, যিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলে 'কুন' (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথে তা হয়ে যায়। অন্যদিকে এ পথভ্রষ্ট লোকেরা তাকে অভিশপ্ত নাফরমান ফেরআউনের ইবাদত করার জন্য ডাকছিল। এ কারণে সে (মু'মিন লোকটি) তাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে বিস্মিত হয়ে উক্ত কথা বলেছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের কাছে তাদের মিথ্যা মাবুদের অক্ষমতা ও অস্তিত্ব হীনতার কথা প্রকাশ করে বলেন, তোমাদের সে মিথ্যা মাবুদ এমন যে, সে কারো উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না এবং ক্ষতি করারও ক্ষমতা রাখে না। তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও আহ্বানের যোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের! প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট ও সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। অর্থাৎ তোমাদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মাবুদের যেখানে এ পৃথিবীতে কোনো কিছু করার বা ঘটানোর ক্ষমতা নেই, সেখানে চিরস্থায়ী আবাস পরকালে সে কিরূপে কোনো কিছু করার ক্ষমতা রাখতে পারবে? সুতরাং সে প্রতিপালক যার দিকে আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা ও নেককার পাপী সকলেরই রিযিকিদাতা। যিনি বান্দাগণকে সৃষ্টি করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনিই মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং তার বাধ্যগত নেককার বান্দাগণকে জান্নাতে এবং নাফরমান পাপীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। অতঃপর মুমিন ব্যক্তি তাদের অন্যায় ও অবাধ্যতার উপর দৃঢ় থাকার জন্য সাবধান করে দিয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তা অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে এবং আমি আমার সম্পর্কে আল্লাহকে অর্পণ করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখেন।

যখন তিনি (মু'মিন ব্যক্তি) তাদেরকে ন্যায় কাজ করার জন্য এবং অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বললেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে সে শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন, যে শাস্তি তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন, সেসব নাফরমান পাপীদের উপর তাদের অবাধ্যতা ও পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার কারণে। অর্থাৎ তারা সাধারণ মানুষের কাছে এমন সব ভ্রান্ত ও মিথ্যা মতবাদ প্রচার করে, যাতে সহজ-সরল সাধারণ মানুষেরা সত্য গ্রহণে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন জাতিকে কঠিন শাস্তি পাকড়াও করল, তাদেরকে আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয়। অর্থাৎ কবরে তাদের আত্মাগুলোকে সকাল সন্ধ্যা জাহান্নামের আগুনের সামনে হাজির করা হয়।

আল্লাহ বলেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন (তাদের ব্যাপারে আদেশ দেয় হবে যে) ফেরআউন জাতিকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। আমি তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 'কবরের শাস্তি' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই। মোটকথা! আল্লাহ তাদেরকে হঠাৎ করে ধ্বংস করেননি। বরং তাদের কাছে প্রথমে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও প্রমাণসহ নবী প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাদের সমস্ত প্রকার সন্দেহ দূরীভূত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তো ফেরআউনের অনুগতদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোনো মঙ্গল হতো, তারা বলতো, এটা আমাদের

প্রাপ্য। আর যখন কোনো অমঙ্গল হতো তখন তারা মূসা ও তার সাথীগণকে হতভাগা গণ্য করতো, তাদের অমঙ্গল আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। তারা বলল, আমাদের যাদু করার জন্য তুমি যেকোনো নিদর্শন আমাদের নিকট হাজির কর না কেন আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি। -সূরা আরাফ : ১৩০-১৩৩

আল্লাহ ফেরআউন জাতিকে পরীক্ষায় আপতিত করেন। তারা ছিল কিবতী। তাদেরকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে এক প্রকার শাস্তি ছিল, দুর্ভিক্ষ ও অভাব অনটন। এ দুর্ভিক্ষের কারণে তাদের ভূমিতে কোনো ফসলাদি উৎপন্ন হতো না এবং গাভী, বকরী ইত্যাদির স্তন থেকে দুধ বের হতো না। দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি ছিল, ফল-ফলাদি কম হওয়া। এ সব শাস্তির পরেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করল না এবং ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসল না; বরং ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কারের সাথে, স্বীয় কুফর ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল।

আর যখন তাদের কাছে কোনো কল্যাণ পৌঁছত, তখন বলত আমরা এর যোগ্য। আর যদি কোনো অমঙ্গল পৌঁছত, তখন (সেটা) মূসা (আ) ও তার অনুগত মুমিনগণের হতভাগা হওয়াকেই দায়ী করতো; বরং যখন কোনো কল্যাণ পৌঁছত এবং অধিক ফসল উৎপন্ন হতো, তখন এটা বলত না যে, এটি আমরা পেয়েছি মূসা (আ) ও তার অনুসারী মু'মিনগণের বরকতে এবং তাদের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে। মূলত কথা হচ্ছে যে, তাদের অন্তর ও চিন্তা-চেতনা কুফরীতে আচ্ছন্ন ছিল এবং ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার প্রকাশ চরম পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল। যখনই কোনো শাস্তি তাদের উপর নাযিল হতো, তখন সেটাকে মূসা (আ) ও তার অনুসারী মুমিনগণের দিকে ইঙ্গিত করতো। আর যখন কোনো অকল্যাণ এসে পৌঁছত তখন সেটা তাদের নিজেদের যোগ্যতার কারণে প্রাপ্ত হয়েছে বলে ধারণা করতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন (মনে রেখ!) তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করবেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

আরো বলেন— আসলে যাদের সম্পর্কে আপনার রবের কথা সত্যে পরিণত হয়েছে[১], তাদের সামনে যে কোনো নিদর্শনই আসুক না কেন, কষ্টদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত কখনো তারা ঈমান আনবে না।[২] ইউনুসের জাতি ছাড়া (আর কি কোনো নযীর কাছে যে) এক বস্তি আযাব দেখে ঈমান আনল এবং তাদের ঈমান তাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হলো? ঐজাতি যখন ঈমান আনল, তখন অবশ্য আমি তাদের উপর থেকে দুনিয়ার জীবনের অপমানজনক আযাব দূর করে দিলাম[৩] এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ করে দিলাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ রক্ত দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন। কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল আর তারা ছিল এক অপরাধী জাতি।

প্লাবন সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এতে এত বেশি বৃষ্টি হয়েছিল যে, ক্ষেত ও বাগানসমূহ পানিতে ডুবে গিয়েছিল। হযরত সুদ্দি (রা), সাঈদ ইবনে জোবায়ের, কাতাদাহ ও জিহাক (রহ) থেকে বর্ণিত

---

১. মনে হয় এ সম্বোধন নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি করা হয়েছে; কিন্তু আসলে যারা তার দাওয়াতের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিল, তাদেরকে শোনানোই ছিল উদ্দেশ্য। আহলে কিতাবদের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, আরবের জনসাধারণ আসমানি কিতাব সম্পর্কে কিছুই জানত না। তাদের জন্য এ ডাক একটি নতুন দাওয়াত ছিল। কিন্তু আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা নেক ও সৎ ছিল তারা এ বিষয়ের সত্যতার সমর্থন জানাতে পারত যে, কুরআন যে জিনিসের দিকে ডাকছে তা ঠিক ঐ জিনিসই, যার দাওয়াত আগে থেকেই আল্লাহর রাসূলগণ দিয়ে এসেছেন।

২. অর্থাৎ যারা নিজেরা সত্য তালাশ করে না, যারা নিজেদের দিলে জেদ, কুসংস্কার, পক্ষপাতিত্ব ও হঠকারিতার তালা লাগিয়ে রেখেছে, যারা দুনিয়ার প্রেমে পাগল ও শেষ ফলের চেতনা রাখে না, তাদের ঈমান আনার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটে না।

৩. মুফাস্সিরীনে কেরাম এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু হযরত ইউনুস (আ) আল্লাহর আযাব আসার খবর জানার পর আল্লাহ তা'আলার বিনা অনুমতিতে নিজের এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং আযাবের আলামত দেখার পর তার কাওম তাওবা ও ইস্তিগফার (অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা) করল, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং আযাব নাযিল করলেন না।

আছে যে, প্লাবন দ্বারা অধিক পরিমানে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র) বলেছেন, এ প্লাবন অর্থ সর্বাবস্থায় (বিরামহীন) পানির বর্ষণ ও প্লেগ ব্যাধির আক্রমণ ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এরূপও একটি বর্ণনা আছে যে, প্লাবন অর্থ এরূপ শাস্তি, যে শাস্তি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পাকড়াও করেছিল। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন প্লাবন অর্থ মৃত্যু। কিন্তু এ হাদীসটি গরীব। তারপর বর্ণিত আছে পঙ্গপালের মাস্তির কথা। হযরত সালমান ফারসী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ (পঙ্গপাল) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। হযরত ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার অনেক জানোয়ার এমন রয়েছে যা আমি ভক্ষণ করি না এবং (ভক্ষণ করা) হারামও বলি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ (পঙ্গপাল)গুলো খাওয়া অপছন্দ করায় তা খাওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। অনুরূপভাবে গুইসাপ খাওয়া থেকেও বিরত রয়েছেন। তিনি ﷺ পিয়াজ ও রসুন এবং করাস (এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত সব্জী) খাওয়াও অপছন্দ করতেন। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আওফা (রা) হতে বর্ণিত আছে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এ সময় আমরা পঙ্গপাল (টিড্ডি) ভক্ষণ করতাম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পঙ্গপাল খাওয়া হারাম নয়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা অপছন্দ করতেন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তাফসীর গ্রন্থে আমি বর্ণনা করেছি। এখানে মূলকথা হচ্ছে, এ পঙ্গপালগুলো তাদের শস্যসমূহ কেটে নষ্ট করে দিতো। ফল-ফলাদি ও শস্যসহ কোনো কিছুই বাকি রাখতো না। সব শেষ করে ফেলত।

অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, উকুনের শাস্তির কথা। এ কমল (উকুন) সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, উকুন এমন এক ধরনের পোকা, যেগুলো গমের মধ্য থেকে বের হয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এখানে কমল (উকুন) দ্বারা পাখাহীন ছোট পঙ্গপালকে বুঝানো আছে। হযরত মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদাহ (রহ.)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও হাসান (রা) বলেছেন, এ (উকুন) গুলো হলো এক প্রকার ক্ষুদ্র পোকা। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেছেন, কমল (উকুন) পালকযুক্ত এক প্রকারের মাছি। (যার কামড়ে শরীরের চুলকানি দেখা দেয়)। ইবনে জারীর (রা) আরবগণ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এগুলো হলো ছোট ছোট এক প্রকার পোকা বিশেষ। এগুলো যা হোক না কেন এ পোকাগুলো কিবতীদের থাকার বিছানায় প্রবেশ করল। এগুলোর যন্ত্রণায় তারা অস্থির হয়ে পড়ল। এগুলোকে বিছানায় রেখে জীবনযাপন করাও ছিল একেবারে অসম্ভব। কারণ এ পোকাগুলো কাঠ ও বিছানা কেটে ফেলতো। হযরত আতা ইবনে সাঈব (রহ) এগুলোর ব্যাপারে বলেছেন, বর্তমানে যেগুলো উকুন হিসেবে আমরা দেখতে পাই, সেগুলোই বুঝানো হয়েছে।

তারপর ব্যাঙ এর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাঙগুলো এত বেশি ও ব্যাপক হয়েছিল যে, এগুলো খাদ্য ও খাবার পাত্রসমূহে লাফিয়ে পড়তো শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হয়েছিল যে, যখনই তারা আহারের সময় কোনো খাবার পাত্র খুলতো, তখন তার মধ্যে কোনো না কোনো ব্যাঙ লাফিয়ে পাত্রের ভেতরে পড়তো।

তারপর রক্তের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা এরূপ ছিল যে, তাদের ব্যবহারের ও খাবারের পানিতে রক্ত মিশ্রিত থাকত। যখনই তারা পানি তারা পান করার ইচ্ছা করতো, সাথে সাথে তা তাজা রক্তে পরিণত হয়ে যেত।

এমন কোনো কূপ, ঝর্ণা ও নদী-নালা বাকি ছিল না, যার পানি রক্ত মিশ্রিত থাকত না। কিবতীরা যখনই পানি ব্যবহারের জন্য কিংবা পান করার জন্য কোনো পানির কাছে যেতো, সাথে সাথে সে পানি রক্তে পরিণত হয়ে যেতো, এরূপ শাস্তি ছিল শুধু কিবতীদের উপর। বনী ইসরাঈলগণকে এ শাস্তি আদৌ স্পর্শ করে নি। এটাও ছিল এক প্রকার মুজেযা ও সুস্পষ্ট দলীল। আর এ বরকত বনী ইসরাঈলগণ লাভ করেছিল হযরত মূসা (আ)-এর কারণে। সকল কিবতীদের এরূপ শাস্তিতে পতিত হওয়া এবং বনী ইসরাঈলদের এ শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকা, মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, যাদুকরেরা যখন ঈমান আনল, তখন আল্লাহর দুশমন ফেরআউন ব্যর্থ ও পরাজিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল। এরপরও সে ঈমান

আনল না; বরং গোমরাহীর উপর অটল রইল এবং অন্যায় অপরাধের কাজ আরো বেশি বেশি করতে লাগল তখন আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত শাস্তিগুলো পর্যায়ক্রমে নাযিল করেন। তাদের উপর প্রথমে দুর্ভিক্ষ পতিত হলো তারপর প্লাবন, তারপর পঙ্গপাল, তারপর উকুন, তারপর ব্যাঙ, তারপর রক্ত।

প্রথমে পানির প্লাবনে সমস্ত যমীন প্লাবিত হলো। এতে যমীনের অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, কিবতীরা যমীনে কোনো প্রকার ফসলাদি উৎপন্ন করতে পারল না। ফলে তারা চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হলো, তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়ে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এসে বিনয়ের সাথে আরয করল, 'হে মূসা (আ)! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য দো'আ কর, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন সে মতে যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি দূর কর, তবে আমরা তো তোমার উপর অবশ্যই ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমাদের সাথে যেতে দেব। -সূরা আরাফ : ১৩৪

হযরত মূসা (আ) তাদের ঈমান আনয়নের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং তিনি আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে হাত উঠিয়ে দো'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দার দো'আয় তাদের উপর থেকে শাস্তি দূর করে দেন। কিন্তু কিবতীদের উদ্দেশ্য যখন সফল হলো অর্থাৎ যখন শাস্তি থেকে রক্ষা পেল, সাথে সাথে তারা (কিবতীরা) তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। যখন তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল, সাথে সাথে আল্লাহ তাদের উপর দ্বিতীয় শাস্তি অবতীর্ণ করেন। আর সে শাস্তি ছিল পঙ্গপালের শাস্তি। এ পঙ্গপালগুলো এসে তাদের ফল-ফলাদি ও সকল ফসলাদি খেয়ে ফেলত। এমনকি তাদের বৃক্ষগুলোও খেয়ে শেষ করে দিত। আর তাদের দরজার লোহার পেরেকগুলোও চেটে চেটে শেষ করে ফেলত। এতে তারা (কিবতীরা) অস্থির হয়ে পূর্বের মতো কৌশল অবলম্বন করে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে দো'আর জন্যে আবেদন করল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। দো'আর বরকতে আল্লাহ তাদের শাস্তি দূর করে দিলেন। কিন্তু তারা এবারো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তারপর আল্লাহ তা'আলা উকুনের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। আমি (লেখক) এভাবে বর্ণনা শুনেছি যে, হযরত মূসা (আ)-কে এ আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন তার লাঠি নিয়ে একটি বালুর ঢিবির কাছে যান এবং সেটির উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। আঘাত করার সাথে সাথে সেটা থেকে অসংখ্য উকুন বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেগুলো বেরিয়ে কিবতীদের ঘর-বাড়ীতে, খাদ্য-বস্তুতে এবং বিছানার মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরকে অস্থির করে তুলল। সেগুলো তাদের নিদ্রা ও আরাম-আয়েশকে হারাম করে দিল। যখন তারা (কিবতীরা) অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ল, তখন দিশেহারা হয়ে দ্বিতীয়বার আবার তারা প্রথম বারের মতো হযরত মূসা (আ)-এর কাছে দো'আর জন্য আবেদন করল। নবীর দো'আয় এবারেও তাদের শাস্তি উঠিয়ে নেয়া হলো। কিন্তু এবারেও তারা তাদের ওয়াদা ভঙ্গ করতে পরোয়া করল না। অতঃপর তাদের উপর ব্যাঙের শাস্তি অবতীর্ণ হলো। তাদের ঘর-বাড়ী, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সবকিছুতে ব্যাঙ এসে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এমনকি যখনই তারা কোনো কাপড় অথবা খাবারের ঢাকনা উঠাত তখন তার মধ্যে ব্যাঙ দেখতে পেত। এ শাস্তি কঠিন আকার ধারণ করে যখন তাদেরকে অস্থির করে ফেলল, তখন তারা (কিবতীরা) হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এসে দোয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। আল্লাহ তাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিলেন। কিন্তু এবারেও তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রক্তের শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। ফেরআউন জাতির সকলের পাত্রগুলো রক্তে ভরে গেল। তারা কোনো কূপ, ঝর্ণা ও পাত্র থেকে পানি পান করতে পারত না। যখনই পনি পান করার উদ্দেশ্যে কূপ ও ঝর্ণার কাছে যেত সাথে সাথে পানি রক্ত হয়ে যেত। কোনো পাত্রে পানি রাখলে তা তাজা রক্তে পরিণত হয়ে যেত। যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, এখানে রক্ত দ্বারা নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে আবী হাতিম (রা) থেকে হাদীসখানা বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "যখনই তাদের উপর কোনো বালা-মুসীবত নাযিল হতো তখন বলত, হে মূসা! তোমার রবের কাছে তোমার যে পদমর্যাদা আছে, তার ভিত্তিতে তুমি আমাদের পক্ষে দো'আ কর। এবার

যদি তুমি আমাদের উপর থেকে বিপদ দূর করিয়ে দাও, তাহলে আমরা তোমার উপর অবশ্যই ঈমান আনব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো। কিন্তু যখনি আমি তাদের উপর থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত, যে সময়টুকুতে তারা এ অবস্থায় অবশ্যই পৌঁছাত, আমার আযাব সরিয়ে দিতাম, তৎক্ষণাৎ তারা তাদের ওয়াদা থেকে ফিরে যেত। তখন আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা, তারা আমার নিশানাগুলোকে মিথ্যা মনে করেছিল এবং এ সব থেকে তারা বেপরওয়া হয়ে গিয়েছিল। –সূরা আরাফ : ১৩৪-১৩৬

আল্লাহ তা'আলা তার উক্ত বাণীতে (ফেরআউনের অনুসারী) কিবতীদের কুফরী, গোমরাহী, অবাধ্যতা, মূর্খতা ও স্বেচ্ছারিতার উপর সার্বক্ষণিক লিপ্ত থাকা এবং রাসূলের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন। এদের কাছে নবীগণ মু'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) ও স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু যখনই তারা কোনো নিদর্শনাবলী ও মুজেযা অবলোকন করতো এবং কঠিন শাস্তিতে পতিত হতো, তখন হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এসে আবেদন করতো যে, আপনি যদি আমাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতে পারেন তবে অবশ্যই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার সাথে আপনার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলদেরকেও প্রেরণ করব। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর দো'আয় তখন তাদের শাস্তি দূরীভূত হতো, তারপর তারা আরো বেশি করে পাপ ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হতো।

হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনত না। বরং তার কথাকে প্রত্যাখ্যান করে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। তারপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় শাস্তি অবতীর্ণ করলে, তারা দ্বিতীয়বার আবার মূসা (আ)-এর কাছে এসে মিথ্যা ওয়াদা দেয় যে, আপনি আল্লাহর কাছে দো'আ করে আমাদের শাস্তি দূর করে দিন। আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার সাথে বনী ইসরাঈলদেরকেও প্রেরণ করব। কিন্তু এবারেও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করল। একদিকে তাদের কুফরী, শিরকী ও অবাধ্যতা, অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতকে এড়িয়ে যাওয়া। দেখুন! এখানে আল্লাহ তা'আলার কিরূপ দয়া ও মেহেরবানী, আল্লাহর নিদর্শন তাদের সামনে বার বার হাজির করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করছেন না; বরং তাদেরকে বার বার সুযোগ দিচ্ছেন এবং বার বার তাদের সামনে দলীল ও নিদর্শন পেশ করছেন। যাতে তারা তাদের কুফরী থেকে বেঁচে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের কাছে প্রেরণ করার পরও যখন তারা সীমালঙ্ঘন করল, তখন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে কঠোর আযাবে পাকড়াও করলেন এবং তাদের অনুসারী সকল কাফেরদের জন্য সে আযাবকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, 'মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফেরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত। সে তাদের কাছে আমার নিদর্শনসহ আসামাত্র তারা তা নিয়ে উপহাস করতে লাগল। আমি তাদেরকে এমন কোনো নিদর্শন দেখাই নি, যা এর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। তারা বলেছিল হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন। তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। তারপর যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখন তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ফেরআউন তার জাতির মধ্যে এ বলে ঘোষণা করল, হে আমার জাতি! "মিশর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত; তোমরা এটা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি হতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেয়া হলো না স্বর্ণ-বলয় কিংবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার জাতিকে হতবুদ্ধি করেছিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী জাতি। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম। তারপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও উদাহরণ। –সূরা যুখরুফ : ৫১-৫৬

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন। এ রাসূল আল্লাহর সাথে (তূর পাহাড়ে বসে) কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাকে স্বেচ্ছাচারী ফেরআউনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। আল্লাহ তার রাসূলকে স্পষ্ট নিদর্শন ও বিভিন্ন প্রকারের মু'জেযা প্রদান করে শক্তি প্রদান করেছিলেন। ফেরআউনের উচিত ছিল, আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি সম্মান দেখান। তাকে সত্য জেনে তার প্রতি ঈমান আনা, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সত্য ও সঠিক পথে চলা। কিন্তু সে পাপ কাজ থেকে বিরত তো ছিলই না; বরং নবীর উপর ঈমান আনা ও তার আনুগত্যতার পরিবর্তে তার (নবীর) মুজেযাসমূহকে উপহাস করতে লাগল এবং নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো: আল্লাহর পথ থেকে নিজেও সরে রইল এবং অন্যকেও সে পথ থেকে বিরত রাখল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য পর্যায়ক্রমে তাদের প্রতি শাস্তিসমূহ প্রেরণ করেন। যার প্রতিটি শাস্তিই পূর্বের শাস্তির তুলনায় অধিক কঠিন ও ভয়াবহ ছিল। কিন্তু তারপরও তারা তাদের ভ্রান্ত ও পাপের পথ থেকে ফিরে আসল না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— 'আমি তাদেরকে শাস্তি দিতে থাকলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। তারা বলেছিল, হে যাদুকর! আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে তুমি তা প্রার্থনা কর; যা তিনি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।" -সূরা যুখরুফ : ৪৮-৪৯

সে যমানায় যাদুকর শব্দটি কোনো তিরস্কারমূলক শব্দ ছিল না এবং যাদুকর বলে কাউকে সম্বোধন করা কোনো দূষণীয় বিষয় ছিল না। তখনকার যুগে আলেমগণও যাদুকর ছিল। এ কারণে কিবতীগণ তাদের কঠিন বিপদের সময়ও হযরত মূসা (আ)-কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে বলে। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর দো'আয় তাদের থেকে শাস্তি দূরীভূত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি অপসারিত করলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, ফেরআউন তার রাজত্বের শান-শওকত, শহরের সৌন্দর্য এবং প্রবাহিত নদীনালা ও ঝর্ণা নিয়ে খুব গর্ব করতো। ফেরআউন গর্ব করে বলতো, নদী-নালা ও ঝর্ণাসমূহ আমার প্রাসাদের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। এ প্রবাহমান নদী-নালাগুলো নীল নদের সাথে সংযুক্ত থাকায় এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফেরআউন নিজ রাজত্ব ও রাজ প্রাসাদ নিয়ে অহংকার করার পর নিজের রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে অহঙ্কার ও গর্ব করে এবং আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে বলে যে, সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে অক্ষম। শিশু অবস্থায় মুখে অঙ্গার নেয়ায় মূসা (আ)-এর মুখে একটু জড়তা এসে গিয়েছিল। পরবর্তীতে জড়তা বাকি থাকার কারণে, তার কথায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকত। এ কারণে ফেরআউন তিরস্কার করতো। অথচ আল্লাহ তা'আলার কাছে সেটাই ছিল মূসা (আ)-এর জন্য সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও সম্মানের ব্যাপার, ফেরআউন যেটা তার ত্রুটি মনে করতো।

মূসা (আ)-এর কথায় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকার পরেও আল্লাহ তা'আলা তার সাথে তূর পাহাড়ে কথা বলেছেন, তার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন এবং তার প্রতি তাওরাত কিতাবও নাযিল করেছেন। এরপরও অভিশপ্ত ফেরআউন তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করেন।

সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে পরিশেষে ফেরআউন বলতে লাগল যে, মূসা (আ)-এর হাতে স্বর্ণ বলয়ও নেই এবং শরীরে কোনো সাজ-সজ্জাও নেই। ফেরআউনের দৃষ্টিতে এটাও ছিল মূসা (আ)-এর ত্রুটি। অথচ মূর্খ ফেরআউনের জানা নেই যে, এ এগুলো তো নারীদের ভূষণ। পুরুষদের সৌন্দর্য্য এগুলো নয়। সুতরাং রাসূলগণ (নারীদের) এ সৌন্দর্যের অধিকারী কিভাবে হতে পারে? রাসূলগণ পার্থিব মোহমুক্ত ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী। পরকালে তাদের জন্যে আল্লাহ যে সব নেয়ামতের ব্যবস্থা করে রেখেছেন সে ব্যাপারে তারা পূর্ণ অবগত আছেন। তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে কেন আসল না? হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ফেরআউনের উক্ত মন্তব্যটিও ছিল অহেতুক ও মনগড়া। কারণ, মূসা (আ)-এর সাথে ফেরেশতাদের আগমনের কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

ফেরআউনের এ কথার উদ্দেশ্য যদি এটা হয়ে থাকে যে, ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে এসে হযরত মূসা (আ)-এর সামনে কেন সম্মান প্রদর্শন করেন না? তবে তার এ কথাটি একেবারেই অযৌক্তিক। কারণ, ফিরেশতাগণ হযরত মূসা (আ)-এর চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরকেও সম্মান দেখান এবং তাদের সম্মানে তারা স্বীয় পাখা পর্যন্ত বিছিয়ে দেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ফেরেশতাগণ স্বীয় পাখাসমূহ দ্বীনী জ্ঞান অন্বেষণকারীদের চলার রাস্তায় বিছিয়ে দেন। এ হাদীসের আলোকেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ফেরেশতাগণ কতখানি সম্মান দেখিয়ে থাকেন।

আর ফেরআউনের এ কথার অর্থ যদি এ হয়ে থাকে যে, ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে এসে হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তবে ফেরআউনের এ কথাটি আদৌ অর্থবহ ও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, মূসা (আ)-কে এমন সব মুজেযা ও নিদর্শনাবলী প্রদান করা হয়েছে, যা সত্যসন্ধানী ও জ্ঞানীদের জন্য স্পষ্ট দলীল।

এ সব কিছুর পরেও যারা এর বিপরীত চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অন্তরে মহর মেরে দিয়েছেন। এ সব (ভ্রান্ত) লোকেরা অভিশপ্ত ফেরআউনের মতো স্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি তাদের কাছে আসার পরেও কেবল বাহ্যিক ছাল-বাকল দেখে (রাজত্বের লোভে) অন্ধ হয়ে যায়। তারপর তাদের পথ ভ্রষ্টতা, অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিন্তায় সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে। যেরূপ অবস্থা হয়েছিল মিথ্যাবাদী ও (রাজত্বের লোভে) অন্ধ ফেরআউন ও তার অনুসারী কিবতীদের ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এভাবে যখন সে যখন তার জাতিকে হতবুদ্ধি করে দিল, তখন তারা তাকে মেনে নিল। অর্থাৎ তাদের জ্ঞানকে হ্রাস করে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা ফেরআউনের প্রভু ও রব হওয়ার মিথ্যা দাবিকে বিশ্বাস করেছিল। আল্লাহ তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন এবং তাদের অকল্যাণ করুন। এরপর আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই তারা ছিল পাপী জাতি। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদের থেকে পতিশোধ নিলাম। অর্থাৎ নীল নদের অতল গহ্বরে ডুবিয়ে দিলাম, উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে উঠিয়ে অপদস্থ করে ধাক্কা দিয়ে রাজ সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিলাম, আরাম-আয়েশ ও সুখের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাহান্নামের কঠিন ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে নিপতিত করলাম। আল্লাহ তা'আলা এরূপ লাঞ্ছনাদায়ক ও কঠিন শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

এরপর আল্লাহ বলেন, পরবর্তীতে যারাই তাদের অনুসারী হবে তাদের জন্যে এটা করে রাখলাম এক দৃষ্টান্ত। কিংবা তাদের জন্য এটা দৃষ্টান্ত ও শিক্ষণীয়, যারা এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী এবং শাস্তির ভয় করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, তারা বলল, এতো অলীক যাদু মাত্র। আমাদের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনো এভাবে কথা শুনি নি। মূসা বলল, আমার রব সম্যক অবগত, কে তার নিকট হতে পথনির্দেশ এনেছে এবং আখেরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। যালিমরা কখনো সফলকাম হবে না। ফেরআউন বলল, হে মন্ত্রীবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্যে ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর; হয়তো আমি এতে উঠে মূসার মা'বূদকে দেখতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী। ফেরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ! যালিমের পরিণাম কি হয়ে থাকে!

আমি তাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকার জন্য নেতা বানিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোনো সাহায্য পাবে না। তাদেরকে আমি সরদার করেছিলাম, তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতো কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি তাদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত ও কিয়ামতের দিন তারা হবে ঘৃণিত। –সূরা কাসাস : ৩৬-৪২

উক্ত কুরআন মাজীদের বাণীতে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তারা অহঙ্কার করল এবং সত্যপথ থেকে ফিরে গেল এবং তাদের বাদশাহ ফেরআউন নিজেকে মিথ্যা খোদা বলে দাবি করল এবং তারা (কিবতীরা) সে মিথ্যা খোদার দাবিদার ভণ্ড প্রতারক ফেরআউনের অনুকরণ করল, তখন মহাশক্তির অধিকারী, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবতীর্ণ করলেন। যার উপরে বিজয়ী হতে সমস্ত সৃষ্টি অক্ষম। যার প্রতিশোধ (শাস্তি) প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। সে মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার কঠিন শাস্তি তাদের উপর এসে গেল।

ফেরআউন ও তার অনুসারীদেরকে একই সময় নীল নদে নিমজ্জিত করে দেয়া হলো। তাদের মধ্যে কেউই রক্ষা পেল না। সবগুলোই নিমজ্জিত হয়ে জাহান্নামবাসী হলো। পৃথিবীতে তাদের জন্য থেকে গেল শুধু সমস্ত সৃষ্টির অভিশাপ। এ অভিশাপের শিকার হচ্ছে তারা সার্বক্ষণিকভাবে। আর কিয়ামতেও তাদেরকে দেয়া হবে বহু পুরস্কার। যে পুরস্কার হবে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট।

ফেরআউনকে তার বাহিনীসহ ধ্বংস

কিবতীরা যখন তাদের বাদশাহ ফেরআউনের অনুকরণ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো এবং কুফর, নাফরমানী, অহঙ্কার ও অবাধ্যতার উপর অটল রইল, তখন আল্লাহ তা'আলা মিশরবাসীর উপর বিভিন্ন ধরনের বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করলেন, যা দেখে জ্ঞান হারিয়ে যায়, চোখের দৃষ্টি ঝলসে যায়। কিন্তু তারপরেও তা তাদের (কিবতীদের) অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করল না এবং কুফর ও পাপ কাজ থেকে তারা বিরত থাকল না। শুধু কিছুসংখ্যক লোক ঈমানের স্থায়ী সম্পদের মালিক হলেন। এক বর্ণনা মতে এদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। একজন ফেরআউনের স্ত্রী, দ্বিতীয়জন ফেরআউনের বংশের এক লোক। যার কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয়জন হলেন, যিনি প্রথমে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে দৌড়ে এসেছিলেন এবং সংবাদ দিয়েছিলেন যে, ফেরআউনের লোকেরা আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি পলায়ন করুন। এ তিনজন ঈমান এনে পূর্ণ মুসলমান হয়েছিলেন।

ইবনে আবী হাতিম (রা) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে, যারা কিবতীদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিলেন। নতুবা কিবতী ছাড়া অন্যরাও তো অনেকে ঈমান এনেছিলেন। যেমন, যাদুকরগণ। তারা কিবতী ছিল না। অপর এক বর্ণনা মতে, হযরত মূসা (আ)-এর উপর কিবতীদের একটি দল এবং সকল যাদুকরগণ এবং বনী ইসরাঈলের সব গোত্রের লোকেরা ঈমান এনেছিলেন। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত বাণী এ বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশঙ্কায় তার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউই তার প্রতি ঈমান আনে নি। যমীনে তো ফেরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে অবশ্যই সীমলঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

কুরআন মাজীদের উক্ত বাণীতে বর্ণিত, তার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা ফেরআউনের সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোককে বুঝানো হয়েছে। বিষয়বস্তুর যোগসূত্রে এটাই বুঝা যায়। কেউ বলেছেন, এখানে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোককে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরই আছে মূসা (আ)-এর আলোচনা। কিন্তু প্রথম অভিমতটিই কুরআন মাজীদের বাখ্যার আলোকে বেশি সুস্পষ্ট ও সঠিক। আর ফেরআউনের নির্যাতনের ভয়ে তারা তাদের ঈমান গোপন করে রেখেছিল। ফেরআউনের সম্প্রদায়ের অন্যান্য (নাফরমান) লোকেরা এ সব মু'মিনগণের পেছনে লেগেই থাকত। আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, 'নিশ্চয়ই দেশে তো ফেরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ ফেরআউন ছিল অন্যায়কারী ও স্বৈরাচারী। সে প্রতিটি বিষয়েই সীমালঙ্ঘন করেছিল। সে এমন এক জঘন্য লোক ছিল, যা সমূলে ধ্বংস হওয়ার সময় অতি নিকটে এসে কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। সে এমন অভিশাপের যোগ্য ছিল, যার ধ্বংস ছিল অনিবার্য। এ সময় হযরত মূসা (আ) তার জাতির লোকদেরকে

বললেন— "হে আমার জাতির লোকেরা। যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা (আল্লাহর উপর) আত্মসমর্পণকারী হও, তবে তারই উপর ভরসা কর। তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির জাতি হতে রক্ষা কর।"

অর্থাৎ যখন দুশমনের উপর শাস্তি পতিত হওয়ার সময় এসে গেল, তখন হযরত মূসা (আ) তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আল্লাহর উপর ভরসা করা, তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একমাত্র তার কাছেই আবেদন ও প্রার্থনা করার জন্য আদেশ দেন। তারা সবাই তার কথা মেনে নিলেন ও একমাত্র আল্লাহর সামনেই তাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। এতে (সন্তুষ্ট হয়ে) আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "আমি মূসা ও তার ভাইয়ের নিকট ওহী প্রেরণ করলাম, মিসরে কয়েকটি বাড়ি নিজের কওমের জন্যে তৈরি করে নাও। ঐ বাড়িগুলোকে কিবলা বানিয়ে নাও। নামায কায়েম কর১ এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও।"

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) দু'ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, তোমাদের জাতির লোকদের ঘরগুলোকে কিবতীদের ঘর থেকে আলাদা করে ভিন্ন স্থানে স্থাপন কর। যাতে যখন স্থানান্তরের আদেশ দেয়া হবে, তখন যেন তারা খুব সহজে গোপনে বের হয়ে যেতে পারে।

আর খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হওয়ার জন্যে যাতে একে অপরকে খবর দিতে পারে। তোমাদের ঘরগুলোকে ইবাদতগৃহ কর এর অর্থ, এক বর্ণনা অনুযায়ী, তোমাদের নিজ গৃহগুলোকে মসজিদও বানাও। আর এক বর্ণনা মতে, তোমাদের নিজ গৃহে বেশি পরিমাণ নামায কায়েম কর। দ্বিতীয় বর্ণনাটি সমর্থন করেছেন যায়েদ ইবনে আসলাম এবং আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রহ)। এ বর্ণনা অনুযায়ী এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যখন কোনো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে তখনই নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর। —সূরা বাকারা : ৪৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি নামাযে মশগুল হতেন। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেও করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলগণ! তাদের ইবাদতখানায় ও মজলিসে প্রকাশ্যে ইবাদত করতে যেতে ভয় পেতেন। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিজ গৃহে নামাযের স্থান করে নেয়ার জন্য আদেশ দেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে খুব সহজ আদেশ প্রদান করেন। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (র) বলেন, তোমাদের গৃহসমূহকে কিবলা বানাও এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ঘরগুলোকে মুখামুখি করে তৈরি কর। কেননা, কিবলার এক অর্থ সম্মুখ।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— মূসা দো'আ করলেন, "হে আমাদের প্রভু! তুমি ফেরআউন ও তার সর্দারদেরকে দুনিয়ার জীবনে চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করে রেখেছ। হে আমাদের রব! (এমনটা কি) এজন্যে করেছ, যাতে তারা জনগণকে তোমার পথ থেকে সরিয়ে দেয়? হে আমাদের রব! তুমি তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং তাদের দিলে মোহর মেরে দাও, যাতে কষ্টদায়ক আযাব না দেখা পর্যন্ত তারা ঈমান না

১. *সরকারের জুলুম ও বনী ইসরাঈলের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মিসরে ইসরাঈলি ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে নামাযে জামাআতের নিয়ম খতম হয়ে গিয়েছিল। তাদের ঐ শৃঙ্খলা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় ও তাদের ধর্মীয় চেতনা মরণাপন্ন হওয়ার এটা ছিল একটা খুব বড় কারণ। এ জন্য হযরত মূসা (আ)-কে পুনরায় জামাআতবদ্ধ নামাযের ব্যবস্থা চালু করতে হুকুম করা হয়েছিল। তাকে এ উদ্দেশ্যে মিশরে কয়েকটি বাড়ি তৈরি বা নির্দিষ্ট করে সেখানে জামাআতে নামায আদায় করার হুকুম দেওয়া হয়। এ ঘরগুলোকে কিবলা করার অর্থ হচ্ছে, ঘরগুলোকে সমস্ত জাতির জন্য কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা এবং এরপরই 'নামায কায়েম কর' বলার অর্থ হচ্ছে, আলাদাভাবে নিজ নিজ জায়গায় নামায আদায় করার বদলে লোকেরা যেন নির্দিষ্ট স্থানসমূহে জামাআতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ে।*

আনে[১]। আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন, তোমাদের দু'জনের দো'আই কবুল করা হলো, তোমরা মজবুত হয়ে থাক এবং যাদের ইলম নেই তাদেরই তরীকা কখনো মেনে চলবে না।'

হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দুশমন ফেরআউনের উপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করেছিলেন। কারণ, সে (ফেরআউন) অহঙ্কারবশত সত্য পথকে ত্যাগ করেছিল, আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখত, ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচারিতা, ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বিষয়ের উপর অটল রয়েছিল এবং সত্যকে ত্যাগ করে অহঙ্কার প্রকাশ করতো, যে সত্য সুস্পষ্টভাবে তার কাছে প্রকাশ হয়েছিল। এ কারণে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলেন, হে প্রভু! আপনি ফেরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গকে (অর্থাৎ তার অনুসারী কিবতীদেরকে) এ পার্থিব জীবনে শোভনীয় বস্তু ও ধন-সম্পদ প্রদান করেছেন। হে প্রভু! তারা এর দ্বারা তোমার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অর্থাৎ এর দ্বারা পৃথিবীর মানুষেরা প্রতারণায় পড়ে যায়। মূর্খরা মনে করে, এরা কিভাবে ভ্রান্ত হতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব শোভনীয় বস্তু, ধন-সম্পদ, উত্তম সাওয়ারী, উত্তম পোষাক-পরিচ্ছদ, বড় বড় সুরম্য প্রাসাদ, অট্টালিকা, উত্তম খাদ্যদ্রব্য প্রাকৃতিম সৌন্দর্য, নেতৃত্ব ও রাজত্ব দান করেছেন। কিন্তু (মূর্খরা জানে না যে,) এ সব কিছুই শুধু পার্থিব জীবনের অস্থায়ী ভোগবস্তু। পরকালে তারা কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে।

হযরত মূসা (আ)-এর অভিশাপ 'হে প্রভু! তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর' এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রা) বলেছেন, এ অভিশাপের অর্থ হচ্ছে এই যে, হে আল্লাহ! তাকে ধ্বংস করে দাও। আবু আলিয়া ও রাবী ইবনে আনাস ও যিহাক (রা) বলেছেন, এ অভিশাপের অর্থ হে আল্লাহ! এদের (চেহারার অবস্থা খোদিত-অঙ্কিত) পাথরে পরিণত করে দাও। কাতাদাহ (রা) বলেছেন, এর অর্থ সম্পর্কে আমার কাছে যে বর্ণনা এসে পৌঁছেছে, তা হলো, তাদের ক্ষেত্রসমূহ পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মুহাম্মাদ ইবনে কাব (রা) বলেছেন, তাদের শোভনীয় বস্তুগুলো পাথর হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন যে, তাদের সমুদয় বস্তুগলো পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ)-এর কাছে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হলে তিনি তার গোলামকে বললেন, যাও একটি থলে নিয়ে এস, সে একটি থলে তার কাছে নিয়ে আসল। দেখা গেল! থলের মধ্যে যে ছোলা ও ডিম ছিল তা পাথর হয়ে গিয়েছে। ইবনে আবি হাতিম (রা) এটি বর্ণনা করেছেন। এরপর হযরত মূসা (আ) অভিশাপ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও। (কারণ) তারা তো কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ! তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিন। এটা ছিল এমন এক অভিশাপ! যার দ্বারা তাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি আহ্বান করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দো'আ কবুল করেন এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করেন। যেমন, হযরত নূহ (আ)-এর অভিশাপ তার জাতির বিপক্ষে কবুল করেছিলেন। হযরত নূহ (আ) এ অভিশাপ করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল কাফির ও দুষ্কৃতকারী। -সূরা নূহ : ২৬-২৭

যখন হযরত মূসা (আ) (ফেরআউনের ব্যাপারে) আল্লাহর দরবারে বদদোয়া করেছিলেন, তখন হারুন (আ) মূসা (আ)-এর দো'আর সাথে সাথে আমীন আমীন বলেছিলেন, এ কারণে তাদের দু'জনকেই দো'আ প্রার্থনাকারী হিসেবে গণ্য করে আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেন—

১. হযরত মূসা (আ) মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষদিকে এ দো'আ করেছিলেন। একের পর এক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ (মুজিযা) দেখে নেওয়া, দীনের সত্যতা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়ে যাওয়া এবং খুব সাবধান করে দেয়ার পরও ফেরআউন ও তার সাথীরা যখন খুবই হঠকারিতার সঙ্গে সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল তখন মূসা (আ) এ দো'আ করেছিলেন। এরূপ অবস্থায় নবীর বদদোয়া বা অভিশাপ কুফরীর উপর জেদকারী কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার কারণেই হয়েছিল। অর্থাৎ এরপর আর তাদেরকে ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় নি।

"তোমাদের দু'জনের দো'আই কবুল করা হলো। তোমরা মজবুত হয়ে থাক ও যাদের ইলম নেই তাদের তরীকা কখনো মেনে চলবে না।" -সূরা ইউনুস : ৮৯

অভিজ্ঞ মুফাসসিরগণ এবং আহলে কিতাবগণ বলেছেন, বনী ইসরাঈল ফেরআউনের কাছে তাদের ঈদগাহ ময়দানে যেতে অনুমতি চাইল, ফেরআউন মনের অনিচ্ছায় অনুমতি প্রদান করল। মূলত এটা ছিল শহর থেকে বের হওয়ার প্রাথমিক প্রস্তুতি। অতঃপর বনী ইসরাইলগণ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারা এরূপ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, শুধু ফেরআউনের নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তোমরা কিবতীদের থেকে তাদের স্বর্ণালঙ্কারাদি কিছু দিনের জন্য ধার স্বরূপ নিয়ে নাও। সুতরাং বনী ইসরাঈলগণ তাদের থেকে প্রচুর অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে এক রাতে হঠাৎ তারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে। ফেরআউন তাদের মিশর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার খবর জানতে পেরে অত্যন্ত পেরেশান ও ক্রোধান্বিত হয়। সে অতি দ্রুত তার সৈন্য বাহিনী জমা করে, বনী ইসরাঈলের মোকাবিলা করার জন্য উৎসাহিত করে।

বনী ইসরাঈলকে সমূলে নিপাত করার উদ্দেশ্যে ফেরআউন তার বাহিনীসহ বনী ইসরাঈলের পেছনে ছুটল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মূসার প্রতি ওহী করেছিলাম এ মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হও, তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অতঃপর ফেরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী প্রেরণ করল এই বলে যে, বনী ইসরাঈল তো ক্ষুদ্র একটা দল। এরা তো আমাদের ক্রোধ বৃদ্ধি করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা সতর্ক (অর্থাৎ আমরা সতর্ক আছি)। পরিণামে আমি ফেরআউন গোষ্ঠীকে বের করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবন হতে এবং ধন-ভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। এরূপই ঘটেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম, এ সমুদয়ের অধিকারী। তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। তারপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা বলল, কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার রব! সত্বর তিনি আমাকে পথনির্দেশ করবেন। অতঃপর মূসার প্রতি ওহী করলাম, তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সেখানে উপনীত করলাম আমার দলটিকে এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে। তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। আপনার প্রতিপালক! তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। -সূরা শুআরা : ৫২-৬৮

অভিজ্ঞ মুফাসসিরগণ বলেছেন, ফেরআউন এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনী ইসরাঈলের পিছনে ধাওয়া করেছিল। এক বর্ণনা মতে তার এ বিশাল বাহিনীতে এক লক্ষ ছিল দাঙ্গাবাজ যুদ্ধাংদেহী সৈন্য। আর মোট সৈন্য বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ষোল লক্ষের চেয়েও বেশি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। আর এক বর্ণনা মতে, ফেরআউনের মোকাবিলায় বনী ইসরাঈলের যোদ্ধা ছিল শিশু-মহিলাদের সংখ্যা বাদ দিয়ে শুধু চার লক্ষ্য। মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলগণ মিশর থেকে বের হলেন। ঠিক এর চারশ ছাব্বিশ সৌর বছর পূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর পিতামহ হযরত ইয়াকুব ইসরাঈল (আ) মিশরে কিছু সংখ্যক লোকসহ প্রবেশ করেছিলেন। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মিশরে অবস্থান কালের মেয়াদ ছিল চারশ ছাব্বিশ বছর। যাই হোক ফেরআউন তার বিশাল সেনা বাহিনীসহ সূর্যোদয়ের সময় বনী ইসরাঈলের কাছে গিয়ে পৌছল। উভয় দল মুখোমুখি হলো। সেখানে উভয় দলই উভয় দলকে দেখে ভালভাবেই চিনতে পারল এবং প্রত্যেকেই উত্তেজিত হয়ে গেল। যুদ্ধ এখনো শুরু হয় নি। তবে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল। এ সময় অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় বনী ইসরাঈলগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আবেদন করলেন, আমরা তো পাকড়াও হয়ে গেলাম।

তাদের পেরেশান হওয়াটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিকই ছিল। কারণ, তাদের পেছনে ছিল যুদ্ধাংদেহী দাঙ্গাবাজ ফেরআউনের বিরাট সৈন্যবাহিনী। আর সামনে ছিল মহা সমুদ্র। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তাদের জন্য আর কোনো পথ বাকি ছিল না। আর সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তিও তাদের ছিল না। তাদের সামনে পেছনের অবস্থা

তো ছিল এরূপ। আর ডানে-বামে ছিল উঁচু পাহাড়। সেগুলো ছিল চলার পথের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ ডান-বামের রাস্তাগুলো এ উঁচু পাহাড় সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রেখেছিল। পেছনে ফেরআউন ভীষণ ক্রোধান্বিত ও শক্তিশালী বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত। বনী ইসরাঈলগণ ফেরআউনের বিশাল বাহিনী স্বচক্ষে অবলোকন করে পেরেশান ও ভীত হয়ে পড়ল। কারণ, এর আগে তারা (বনী ইসরাঈলগণ) ফেরআউন বাহিনী কর্তৃক চরম নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ)-এর কাছে নিজেদের অসহায় ও দুর্বলতার অবস্থাটা অভিযোগ আকারে পেশ করেন। তখন আল্লাহর নবী দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার সাথে তার জাতির লোকদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করে বললেন, কখনই নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন। হযরত মূসা (আ) তার দলের মাঝখানে ছিলেন। পরে তিনি দলের সামনে এসে সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালেন এবং জালালী দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। দেখা গেল, সমুদ্রেও ভীষণ তরঙ্গ শুরু হলো। এ সময় তিনি পবিত্র জবানে বলতে লাগলেন, এখানে আসার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। তার সাথে ছিলেন, তার বড় ভাই হযরত হারুন (আ) ও বনী ইসরাঈলের নেতা ও বিশিষ্ট আলেম এবং সাধক ইউশা ইবনে নূন। হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর পরে আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুওয়াত প্রদান করেছিলেন। পরবর্তীতে তার আলোচনাও আসবে ইনশাআল্লাহ।

এ তিনজনের সাথে ফেরআউনের বংশের সে মু'মিন লোকটিও ছিল। এ চারজন সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন। আর বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোকজন তাদের সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন। বর্ণিত আছে যে, ফেরআউন বংশের মু'মিন লোকটি তার ঘোড়াটিসহ বার বার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছিলেন, মনে হয় যেন ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মধ্যে সাতার শিখানো হচ্ছে। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। তারপর মু'মিন লোকটি হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কি এখানে আসার আদেশ দেয়া হয়েছে?

মূসা (আ) উত্তরে বললেন, জী! জী। অতঃপর পরিবেশ ভয়াবহ এক যুদ্ধের আকার ধারণ করল এবং ফেরআউন খুব উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত অবস্থায় বনী ইসরাঈলের সামনে এসে উপস্থিত হলো। এ কঠিন মুহূর্তে, মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, হে মূসা! নিজ লাঠির দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন। এক বর্ণনা মতে মূসা (আ) সাথে সাথে এ কথা বলেছিলেন যে, আল্লাহর আদেশে দু'ভাগ করে (রাস্তা) হয়ে যাও। বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আ) সমুদ্রকে 'আবু খালিদ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। সমুদ্র বিভক্ত হয়ে বৃহৎ পর্বতের আকার ধারণ করল। কথিত আছে, সমুদ্র বারটি রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বনী ইসরাঈলগণও বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। সুতরাং প্রতিটি গোত্র এক এক রাস্তায় নেমে পড়ল। আরেক বর্ণনায় আছে যে, প্রতিটি রাস্তার সাথে প্রাচীর হয়ে গিয়েছিল এবং প্রাচীরের সাথে জানালা ছিল। যা দ্বারা তারা একগোত্র অন্য গোত্রকে দেখতে পাচ্ছিল। তবে এ অভিমতটির বিশুদ্ধতার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, সমুদ্রের পানি এত স্বচ্ছ ও নির্মল ছিল যে, স্বাভাবিকভাবেই অন্য দিকের সব জিনিস দৃষ্টিগোচর হতো। এজন্যে জানালা বা অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়ে না।

আল্লাহর অসীম কুদরতে রাশি রাশি পানি স্থলাকার পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। (কিছুক্ষণ আগেও যে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়েছিল, সে সমুদ্রই মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল নিশ্চল পর্বতসম।) আল্লাহ তা'আলার মহান শান তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, 'কুন' (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথে তা হয়ে যায়। আল্লাহ পশ্চিমা বায়ুকে সমুদ্রের উপর চলতে আদেশ দেন। ফলে সমুদ্রের আবর্জনাগুলো সরে গিয়ে পানি স্বচ্ছ ও নির্মল হয়ে গেল এবং এমন রাস্তা হয়ে গেল, মনে হয় যেন পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মূসার কাছে ওহী প্রেরণ করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড় ও তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হতে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে,

এরূপ আশঙ্কা বা ভয় করো না। অতঃপর ফেরআউন তার সৈন্যবাহিনীসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন, তারপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে নিমজ্জিত করল। আর ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায় নি। -সূরা ত্বাহা : ৭৭-৭৯

আর এ সাহায্য মু'মিনগণকে সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। হযরত মূসা (আ) যখন তার সকল লোকজনসহ নদী পার হয়ে নিরাপদে ওপার গিয়ে উঠলেন, তার একটি লোকও নদীর মধ্যে যখন ছিল না, তখন ফেরআউনের সৈন্য বাহিনীর একটি দল সমুদ্রের রাস্তায় নেমে পড়ে। এ সময় হযরত মূসা (আ) চাচ্ছিলেন, তার লাঠিটি দ্বারা সমুদ্রের উপর পুনরায় আঘাত করবেন। যাতে সমুদ্র আবার পূর্বের ন্যায় হয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদেশ দিলেন, এরূপ করো না। সমুদ্রকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "এদের পূর্বে আমি তো ফেরআউন জাতিকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকট এসেছিল এক সম্মানিত রাসূল, সে বলল : আল্লাহর বান্দাগণকে আমার নিকট প্রত্যার্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর না, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট নিদর্শন। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, সেজন্যে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের স্মরণ নিচ্ছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা আমার থেকে দূরে থাক। তারপর মূসা তার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করলেন, এরা তো এক অপরাধী জাতি। আমি বলেছিলাম, তুমি আমার বান্দাগণ নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে। তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ; কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, তাতে তারা আনন্দ পেত। এরূপই ঘটেছিল ও আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন জাতিকে। আকাশ ও পৃথিবীতে কেউই তাদের জন্য অশ্রুপাত করে নি ও তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয় নি। আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে ফেরআউনের; সে তো ছিল প্রভাবশালী সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে (তৎকালীন) বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলি, যাতে ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা। -সূরা দুখান : ১৭-৩৩

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, সমুদ্রকে তার নিজ অবস্থায় ছেড়ে দাও। উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'সমুদ্রকে তার অবস্থায় স্থির থাকতে দাও।" এর ব্যাখ্যা অনুরূপই। অর্থাৎ সমুদ্রের যে বৈশিষ্ট্য আছে, সে অবস্থায়ই তাকে থাকতে দাও। তার ব্যতিক্রম করো না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, রাবী, যিহাক, কাতাদাহ, কাআব আহবার, সামানক ইবনে হারব ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) প্রমুখও এরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহর আদেশে সমুদ্রকে তার গতিতে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর ফেরআউন সমুদ্রে নির্মিত রাস্তার কাছে এসে বিস্মিত হলো। আল্লাহ তা'আলার এ বিস্ময়কর লীলাখেলা দেখে সে পেরেশান ও ভীত হয়ে পড়ল। পূর্বে সে যে ধারণা করে আসছিল, তাতে দৃঢ়তা এসে গেল যে, এসব কিছুর নিয়ন্ত্রক আরশে আজীমের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ লীলা খেলা সবকিছু একমাত্র তারই। এ চিন্তা করে পেছনের দিকে ফেরে আসল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার সাহস আর হলো না। বনী ইসরাঈলকে পাকড়াও করতে আসায় এবং স্বীয় কৃতকর্মের জন্য সে খুব অনুতপ্ত হলো। কিন্তু এখন তার এ অনুতাপ তার কোনই উপকারে আসল না; বরং পুনরায় সে তার সৈন্য বাহিনীর সামনে এসে বাহ্যিকভাবে তার খুব সাহসিকতার কথা প্রকাশ করল এবং বনী ইসরাঈলের মোকাবিলা করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করল। তারপর তার পাপাত্মা ও কুফরী চিন্তা তাকে প্ররোচিত করল যে, তার অনুসারীদের সাথে সে আরো প্রতারণা করবে। তারপর সে চিন্তা-ভাবনা করে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলল, তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখ, সমুদ্রে আমার জন্যে (নিব বাহু বিদীর্ণ করে) পথ করে দিয়েছে। যাতে আমি আমার ঐ সব পলাতক দাসদেরকে পাকড়াও করতে পারি। যারা আমার তাবেদারী স্বীকার না করে আমার রাজত্ব থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মূলত সে মুখে এ সব কথা বললেও, তার অন্তরের কথা সৈন্যবাহিনীর কাছে গোপন রেখেছিল। সে কথাটি ছিল এই যে, আমি

তো তাদের পিছনে এখন আর অগ্রসর হতে চাই না। কারণ, সে অনুভব করেছিল যে, আল্লাহর শাস্তি অতি নিকটবর্তী। সে খুবই পেরেশান ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল যে, সে এখন কি ভূমিকা গ্রহণ করবে। সে তো আন্তরিকভাবে চাচ্ছিল যে, সামনে অগ্রসর না হয়ে পিছু হটে যাবে। তার ধারণা করেছিল এতে হয়তো সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু অন্যদিকে আবার সে তার অনুসারী ও পূজকদের কাছে তার মিথ্যা খোদায়ীত্বকে অটুট রাখতেও চাচ্ছে। এ দ্বিধাদ্বন্দ্বে কখনো সামনে অগ্রসর হয়, আবার কখনো পিছনে চলে আসে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে ফেরআউন পিছনে ফিরে আসারই মনস্থ করল। ফিরে আসবে, এমন সময়ই আল্লাহর কুদরতের লীলাখেলা তার সামনে হাজির হয়ে গেল। হযরত জিবরাইল (আ) একটি আকর্ষণীয় ও উৎকৃষ্ট উষ্ট্রীর উপর আরোহন করে সেখানে আগমন করলেন ও তার উষ্ট্রিটি ফেরআউনের উষ্ট্রিটিকে অতিক্রম করে আগে চলে গেল।

ফেরআউনের উষ্ট্রিটি হযরত জিবরাঈর (আ)-এর উষ্ট্রিটিকে দেখা মাত্রই সেটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল এবং জিবরাঈলের উষ্ট্রিটির পিছনে দ্রুত ছুটতে লাগল। হযরত জিবরাইল (আ) তার উষ্ট্রিটিকে খুব দ্রুত হাঁকিয়ে চললেন। ফেরআউনের উষ্ট্রিটি ফেরআউনকেসহ খুব দ্রুত উষ্ট্রিটির পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগল। ফেরআউন তার ভাল-মন্দ কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ও তার উষ্ট্রিটিকেও থামিয়ে রাখা তার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব হলো না। হযরত জিবরাঈল (আ) তার উষ্ট্রিটিসহ সমুদ্রের মধ্যস্থ রাস্তায় নেমে পড়েন। পেছন থেকে ফেরআউনের উষ্ট্রিটিও ফেরআউনকেসহ সমুদ্রের রাস্তায় নেমে পড়ল। পেছনের সৈন্য বাহিনীও ফেরআউনের অনুসরণ করে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করল। যখন ফেরআউনসহ তার সকল সৈন্যরা সমুদ্রের পথে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, এখন তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। তখন মূসা (আ) লাঠি দ্বারা সমুদ্রের উপর আঘাত করলেন। এতে সমুদ্র পূর্বের মতো হয়ে গেল। রাস্তাগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল ও উত্তাল ঢেউ শুরু হলো।

ফেরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী সবাই নিমজ্জিত হলো। একটি মানুষও বেঁচে রইল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন— আমি মূসা ও তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। তারপর অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। এ ঘটনার মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ লোকই মু'মিন নয়। নিশ্চয়ই আপনার রব মহাশক্তিশালী ও দয়াবান। –সূরা শুআরা : ৬৫-৬৮

আল্লাহ তা'আলা তার কোনো বন্ধুকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন নি এবং এটি এতবড় কঠিন শাস্তি ছিল যে, তার দুশমনদের কেউই এর থেকে রক্ষা পায় নি। এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কুদরতের এক বিরাট দৃষ্টান্ত ও স্পষ্ট প্রমাণ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করলাম এবং ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী উদ্ধতসহকারে সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। অবশেষে যখন সে নিমজ্জমান হলো, তখন বলল, আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। (তোমার এ কথা) এখন? ইতঃপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্গত ছিলো। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে গাফিল। –সূরা ইউনুস : ৯০-৯২

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়া সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যখন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ফেরআউনকে এক বার উপরে উঠাচ্ছিল, আর একবার তলদেশে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন বনী ইসরাঈল সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে এ মহাশাস্তি স্বচক্ষে দেখে করে প্রাণ জুড়াচ্ছিল। এ সময় ফেরআউন যখন তার ধ্বংস প্রত্যক্ষ করছিল এবং ভয়ঙ্কর উত্তাল তরঙ্গের মাঝে পতিত হলো এবং যখন মৃত্যুর ভয়াবহ ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলো, তখন সে অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনল। তার ঈমান আনাটা এমন এক সময় ছিল, যখন তা কোনই উপকারে আসল না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— যাদের বিরুদ্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। –সূরা ইউনুস : ৯৬-৯৭

অর্থাৎ ফেরআউন যখন শাস্তি স্বচক্ষে দেখলো এবং শাস্তিতে পাকড়াও হলো, তখন ঈমান আনার চেষ্টা করল। কিন্তু তার চেষ্টা কোনো উপকারে আসল না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— যখন তারা আমার আযাব দেখতে পেল, তখন চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা এক লা শরীক আল্লাহকে মেনে নিলাম এবং তার সাথে যাদেরকে আমরা শরীক করতাম, সে সবকে আমরা অস্বীকার করলাম। কিন্তু আমার আযাব দেখে ফেলার পর তাদের ঈমান তাদের জন্য কোনো উপকারে আসল না। কারণ, এটাই আল্লাহর বিধান, যা সব সময় তার বান্দাহদের মাঝে চালু রয়েছে। তখন কাফেররা সবাই ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল। -সূরা মুমিন : ৮৪-৮৫

আর হযরত মূসা (আ)ও তাদের সম্পর্কে অনুরূপ বদদোয়া করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস করে দিন এবং তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দিন, যাতে তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পূর্বে ঈমান না আনে। এ সময় তাদের ঈমান তাদের কোনই উপকারে আসল না। শুধু বেদনা আর অনুতাপের কারণ হলো। যখন হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) দু'ভাই বদদোয়া করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তোমাদের দু'জনের দো'আ কবুল করা হলো। ফেরআউনের নিমজ্জিত হওয়া সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন ফেরআউন বলেছিল বনী ইসরাঈল যাতে ঈমান এনেছে আমি তাতে ঈমান আনলাম। নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরআউনের এ উক্তি সম্পর্কে জিবরাইল আমাকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনি যদি সে সময়ের দৃশ্য দেখতেন যে, আমি সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদা মাটি উঠিয়ে ফেরআউনের মুখে ভরে দিলাম। আবার যেন তার উপর আল্লাহর রহমত না এসে যায়। ইমাম আহমদ এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ তাবলিসী (রহ) এ হাদীসখানা এরূপে বর্ণনা করেছেন যে, আপনি যদি তখন আমাকে দেখতেন যে, আমি সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদা মাটি উঠিয়ে তা ফেরআউনের মুখে ভরে দিলাম, এ ভয়ে যে, আবার আল্লাহর রহমত তার কাছে পৌছে না যায়।

ইবনে আবী হাতিম (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (রাস) বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করছেন, তখন ফেরআউন নিজ অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেছিল এবং মুখে বলেছিল আমি ঈমান আনলাম, যাতে বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তারপর হযরত জিবরাঈল (রা) এ আশঙ্কা করেছিলেন যে, আবার তার উপর আল্লাহর ক্রোধের তুলনায় আল্লাহর রহমত অগ্রগামী হয়ে যায় নাকি। সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ) নিজ পাখা দ্বারা সমুদ্র থেকে কাদা মাটি তুলে ফেরআউনের মুখের উপর ছুড়তে রইলেন। এভাবে তার মুখ মাটি দ্বারা ঢেকে দিলেন।

ইবনে জারীর (রা) উল্লিখিত হাদীসটি আবু খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে জিবরাইল (আ) বলেছেন, হে মুহাম্মদ ﷺ! আমাকে যদি আপনি তখন দেখতেন, যখন আমি ফেরআউনের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছিলাম এ আশঙ্কায় যে, আল্লাহর রহমত তার প্রতি পৌছে না যায়। তারপর তাকে নিপাত করা হয়।

ইবরাহীম তায়মী, কাতাদাহ, মায়মুনা ইবনে মাহরান প্রমুখ (রা)-গণ এ হাদীসটি মুরসাল বলেছেন। অনেক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) বলেছেন, ফেরআউনের প্রতি আমার যে ক্রোধ বা রাগ, এরূপ ক্রোধ আর কারো প্রতি আমার হবে না। (আর এ ক্রোধ তখন হয়েছিল। যখন সে বলেছিল, আমি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপালক। আর আমি তার মুখে তখন কাদা মাটি ভরে দিয়েছিলাম, যখন সে ঈমান আনার কথা মুখ থেকে প্রকাশ করেছিল।

ফেরআউনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন— এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তার ঈমান আনাটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাকে যদি পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করা হতো, তবেও সে প্রথম বারের মতো অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হতো। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন, (হে নবী!) আপনি যদি দেখতে পেতেন, যখন

তাদেরকে আগুনের পাশে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে যে হায়! আমাদেরকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হতো। তবে আমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তরে বললেন, 'না, পূর্বে তারা যা গোপন করতো তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, পুনরায় তাই করতো এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। -সূরা আনআম : ২৮

মোটকথা ফেরআউনকে শাস্তিতে পাকড়াও করার পরে সে ঈমান এনেছিল। যা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাকে যদি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হতো, তবে সে প্রথমবারের মতই নাফরমান হতো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ মুফাসসিরগণ বলেছেন যে, বনী ইসরাঈলের কেউ কেউ সন্দেহ করেছিল যে, ফেরআউন মারা যায় নি। তখন আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে আদেশ দিলেন যে, ফেরআউনের মৃতদেহটি তীরে নিক্ষেপ কর। আর এক বর্ণনা মতে পানির উপরে নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।

কারো মতে, জমিনের কোনো এক উঁচু জায়গায় নিক্ষেপ করার জন্য সমুদ্রকে আদেশ দিয়েছিলেন। ফেরআউনকে তার পরিহিত পোশাকসহ নিক্ষেপ করা হলো, যাতে বনী ইসরাঈলগণ অতি সহজে চিনতে পারে এবং তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে এবং আল্লাহর কুদরত স্বচক্ষে দেখতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের উদ্দেশ্যে বলেন, আজ আমি তোমার দেহকে সংরক্ষণ করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাক। অর্থাৎ আজ তোমাকে তোমার পরিহিত যুদ্ধের পোশাকসহই সংরক্ষণ করব, যাতে তোমাকে সবাই চিনতে পারে। আর এটি হলো পরবর্তী আগতদের জন্য নিদর্শন ও শিক্ষণীয়। আর আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরতের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন বাহিনীকে বিনাশ করে দিয়েছেন। ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী ধ্বংস হয়েছিল আশুরার দিন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মদীনায় আগমন করেন। এ সময় ইয়াহুদীগণ আশুরার (দশই মহররমের) রোজা রেখেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের রোযা যা তোমরা রাখছ? তারা উত্তরে বলল, এটা সে দিন, যেদিন মূসা (আ) ফেরআউনের উপর বিজয় লাভ করেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, মূসা (আ)-এর ব্যাপারে তোমরাই অধিক হকদার। সুতরাং তোমরাও রোজা রাখ। (বোখারী)

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— তখন আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম। তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা তারা আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং এ সব থেকে তারা বেপরওয়া হয়ে গিয়েছিল। আর তাদের জায়গায় আমি ঐ লোকদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম, যাদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখা হয়েছিল। এটা ঐ এলাকা যাকে আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম[১]। এভাবে বনী ইসরাঈলের পক্ষে আপনার রবের কল্যাণকর ওয়াদা পুরা হলো। কেননা, তারা সবর করেছিল। আর ফেরআউন ও তার কওম যাকিছু (শিল্প) গড়েছিল এবং (দালান) উঁচু করেছিল সবই বরবাদ করে দিলাম। বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। তারপর চলতে চলতে পথে এখন এক কওমের উপর যেতে হলো, যারা তাদের কতক মূর্তির পরম ভক্ত ছিল। (মূসার কওম) বলল, হে মূসা! এদের যেমন অনেক মা'বুদ আছে আমাদের জন্যও তেমনি কোনো মা'বুদের মূর্তি বানিয়ে দাও[২]। মূসা বললেন, তোমরা বড়ই মূর্খের মতো কথা বলছ। এ লোকেরা যে তরীকায় চলছে তা তো বরবাদ হয়েই যাবে। আর তারা যা আমল করছে, তা একেবারেই বাতিল। মূসা বললেন, আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ তোমাদের জন্য তালাশ করব? অথচ তিনিই আল্লাহ! যিনি

১. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তিনের উত্তরাধিকারী করা হলো। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার এলাকার জন্যই এ শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি এর মধ্যে বরকত দান করেছি।

২. এ জাতি যদিও বংশগতভাবে মুসলিম ছিল, কিন্তু মিসরে কয়েক শ' বছর ধরে এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করায় তাদের মধ্যে এই পৌত্তলিকতার

তোমাদেরকে দুনিয়ার সব কওমের উপর মর্যাদা দান করেছেন। (আল্লাহ বলেন) ঐ সময়ের কথা মনে করে দেখ! যখন আমি ফেরআউন থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলাম। (তখন অবস্থা এই ছিল যে) তোমাদেরকে কঠোর আযাব দেয়া হতো। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে কতল করতো এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদেরকে বেঁচে থাকতে দিত। এ সব তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর বিরাট পরীক্ষা ছিল। -সূরা আ'রাফ : ১৩৬-১৪১

আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার অনুগতদের নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে বলছেন, তাদের মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে এবং তাদেরকে ও তাদের ধন-সম্পদগুলো ধ্বংস করে দিয়ে বনী ইসরাঈলকে তাদের ধন-সম্পদ ও রাজত্বের অধিকারী করে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন— (অপরদিকে) আমি বনী ইসরাঈলকে ঐ সবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম। -সূরা শু'আরা : ৫৯

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আমি ইচ্ছা করলাম, যাদেরকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করে রাখা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি মেহেরবানী করব, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করব এবং তাদেরকেই উত্তরাধিকারী বানাব।

এর পূর্বে আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আর তাদের স্থানে আমি ঐ লোকদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের ওয়ারিশ বানিয়ে দিলাম, যাদেরকে দুর্বল বানিয়ে রাখা হয়েছিল। (এটা ঐ এলাকা) যাকে আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম। এভাবে বনী ইসরাঈলের পক্ষে আপনার রবের কল্যাণকর ওয়াদা পূরণ হলো। কেননা, তারা সবর করেছিল। আর ফেরআউন ও তার কওম যা কিছু (শিল্প) গড়েছিল এবং (দালান) উঁচু করেছিল সবই বরবাদ করে দিলাম। -সূরা আ'রাফ : ১৩৭

অর্থাৎ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ফেরআউন ও তার সকল অনুগতদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, নেতৃত্ব ও রাজত্ব সবকিছুই বিনাশ করেছি। অর্থাৎ তাদের বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গ এবং রাজ দরবারের অন্যান্য সব কর্মচারী ধ্বংস হয়ে গেছে। মিশর শহরে সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কোনো লোকই বেঁচে থাকে নি।

ইবনে আব্দুল হাকাম তার প্রণীত 'মিশরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ সময়ই মিশরের স্ত্রীগণ পুরুষদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল। কারণ, আমীর বিত্তশালী ও বড় বড় লোকের স্ত্রীগণ তাদের চাইতে নীচ পর্যায়ের সাধারণ লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং এ স্ত্রীগণই তাদের স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পেয়েছিল। মিশরে এ পদ্ধতি এখন পর্যন্ত চালু আছে। (অর্থাৎ এ কিতাব লেখা পর্যন্ত পরবর্তী অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। আহলে কিতাবগণ বলেন, বনী ইসরাঈলকে যখন মিশর ত্যাগের আদেশ দেয়া হয়েছিল, তখন যে মাস ছিল সে মাসকেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বছরের শুরু (প্রথম মাস) হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেন। আর তাদের এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, প্রত্যেক গৃহের মালিক যেন একটি করে বকরীর বাচ্চা (আল্লাহর রাস্তায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) যবেহ করে। আর যদি শক্তি সামর্থ্য থাকে, তবে যেন একটি করে বকরী যবেহ করে। এবং (প্রয়োজনে) তাদেরকে যেন এতে অন্তর্ভুক্ত করে। আর বকরী যবেহ করার পরে তার রক্ত যেন তাদের নিজ নিজ ঘরের দরজায় চৌকাটে ছিটিয়ে দেয়। যাতে (সে রক্ত) তাদের ঘরগুলোর চিহ্ন স্বরূপ হয়ে থাকে। আর এ আদেশও দেয়া হয়েছিল যে, তারা বকরীর কোনো কিছুই বাকি রাখবে না এমনকি হাড্ডিও না। এবং ঘরের বাইরেও কিছু নিয়ে যেতে পারবে না। আর এ গুলো রুটি দিয়ে খাবে এবং এ রুটি সাতদিন পূর্বে তৈরি করবে। সাতদিনের প্রথম দিন হবে মহররমের চৌদ্দ তারিখ। এটা ছিল বসন্তকা। যখন (ভূনাকৃত) বকরীটির গোশত খাওয়া শুরু করবে, তখন বকরীটির মধ্যাংশ উপরে কোনো কিছুর সাথে বেঁধে নিবে এবং পায়ের দিক নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখবে। আর বকরীটির উপরি অংশটি তোমাদের মুখের বরাবর রাখবে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত খেয়ে নেবে। রাতের বেলায় খাওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা আগুনে পুড়িয়ে দেবে। অতঃপর এ দিনটি তাদের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে তাওরাতের অনুসরণ করা পর্যন্ত ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। যখন তাওরাত মানসুখ (রহিত) হয়ে যায় তখন এ নিয়মও রহিত হয়েই গিয়েছিল। আহলে কিতাবগণ একথা বলেন

যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ রাতে (যে রাতে বনী ইসরাঈল মিশর থেকে বের হয়েছিলেন) কিবতীদের সকল কুমারী সন্তান ও (গৃহপালিত) পশুগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। যাতে তারা বনী ইসরাঈল থেকে গাফিল থাকে। বনী ইসরাঈল দ্বিপ্রহরে মিশর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এ সময় মিশরবাসী (কিবতীরা) তাদের কুমারী সন্তানদের মৃত্যুশোকে বিলাপ করতে থাকে। এমন কোনো ঘর বাকি ছিল না যে ঘরে ক্রন্দন চলছিল না। অর্থাৎ সবাই শোকে কাতর হয়ে পড়ে। তারপর হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হলো যে, এখন বেরিয়ে পড়। তখন সবাই অতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

তারা এত তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়লেন যে, আটার খামিরা বানিয়ে রুটি তৈরি করার সময় পর্যন্ত পায় নি, তারা সে খামিরাগুলো এবং আহারের অন্যান্য সামগ্রীসমূহ ব্যাগের মধ্যে করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তারা কিবতীদের থেকে পূর্বেই অনেক স্বর্ণ-অলঙ্কার ও মূল্যবান সামগ্রী ধারস্বরূপ নিয়ে রেখেছিলেন। এগুলোও সাথে করে নিয়ে নিলেন।

শিশু ও মহিলা ছাড়া তারা সংখ্যায় ছিল ছয় লাখ। এদের সাথে অনেক গবাদি পশুও ছিল। মিশরে বনী ইসরাঈলের অবস্থানকাল ছিল চারশ ত্রিশ বছর। তাদের কিতাবে এ কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এ সময়কে তারা ফসখ (রহিত করণ) এর বছর বলে থাকেন।

বছরে তিনটি ঈদের উৎসব পালন করে থাকেন তারা। একটি হলো ঈদুল ফসখ অর্থাৎ রহিত পাওয়ার আনন্দ। (এটা ছিল যে তারিখে মিশর ত্যাগ করেছিল সে তারিখে) দ্বিতীয় হলো, ঈদুল ফিতর। আর তৃতীয় হলো, ঈদুল হামল। ঈদুল হামল ছিল বছরের প্রথম দিন। এগুলোর কথা তাদের কিতাবে বর্ণিত আছে। তাদের উৎসবগুলোর মধ্যে এ তিনটি উৎসবই ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বনী ইসরাঈল যখন মিশর হতে বের হলো, তখন তারা সাথে করে হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবুতও নিয়েছিলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে সমুদ্রের তীরবর্তী রাস্তার কাছে দাফন করা হয়েছিল সে রাস্তা ধরে অতিক্রম করে চলছিল।

দিনের বেলা বনী ইসরাঈল যখন পথ চলতো তখন উপর থেকে মেঘ তাদেরকে ছায়া প্রদান করতো। জ্যোতি বের হয়ে তাদের উপর বর্ষণ হতো। রাতের বেলা তাদের সামনে সামনে থাকতো অগ্নি স্তম্ভ। (যাতে তাদেরকে ঠাণ্ডা স্পর্শ করতে না পারে) এ পথ ধরে তারা সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছলেন এবং সেখানে পৌঁছে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। এদিকে ফেরআউন তার মিশরী অনুসারীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছে বনী ইসরাঈলকে ঘেরাও করলো। এ সময় বনী ইসরাঈল সমুদ্রের তীরে অবস্থান করছিল। অনেক বনী ইসরাঈল অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ অনুতাপ করে বলতে লাগলেন, এ অচেনা মরুভূমিতে মৃত্যুর চেয়ে মিশরে থাকাটাই অনেক ভাল ছিল। তখন হযরত মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, ভয় করো না। ইনশাআল্লাহ! এরপর ফেরআউন ও তার সৈন্য বাহিনী আর কখনো মিশরে ফিরে যেতে পারবে না।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)কে আদেশ দিলেন, সমুদ্রের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্রকে বিভক্ত করে দাও, যাতে বনী ইসরাঈল সমুদ্রের শুকনো রাস্তায় প্রবেশ করতে পারে। তারপর (লাঠির আঘাতে) সমুদ্রের পানি দু'পাশে সরে গিয়ে এরূপ শুষ্কপথ হয়ে গেল, মনে হচ্ছিল যেন, দু পাশে বিশাল পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করে দেন। এ পথে বনী ইসরাঈল নিরাপদে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। ফেরআউনও তার সৈন্য বাহিনীসহ মূসা (আ)-এর পেছনে পেছনে আসল। যখন তারা সমুদ্রের মাঝ বরাবর এসে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সমুদ্রের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করার জন্য আদেশ দিলেন। আঘাত করার সাথে সাথে সমুদ্রের পানি পূর্বের মতো হয়ে গেল এবং ভীষণ তুফান শুরু হলো। তবে আহলে কিতাবদের মতে এ ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের বেলায় এবং সকাল বেলায় তারা জলোচ্ছ্বাসের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ দ্বিতীয় কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার সৈন্যবাহিনীকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দেন, তখন মূসা (আ) ও তার সাথী বনী ইসরাঈলগণ এ তাসবীহ পাঠ করেন।

আমি সেই দীপ্তমান রবের তাসবীহ পাঠ করছি, যিনি (ফেরআউনের) সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করেছেন এবং অশ্বারোহীদেরকে সমুদ্রের তুফানে নিক্ষেপ করেছেন। তার মোকাবিলা করা অসম্ভব। যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ তাসবীহটি ছিল অনেক লম্বা। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, এ সময় হযরত হারুন (আ)-এর বোন নাবীয়াহ মারইয়াম নিজ হাতে একটি দফ নিয়ে বের হলেন। তার অনুকরণে বনী ইসরাঈলের অন্যান্য মহিলারাও হাতে দফ নিলেন। হযরত মারইয়াম তখন এ তাসবীহ গাইতে লাগলেন—

সে মহা পরাক্রমশালী প্রভু অতি পবিত্র, যিনি (ফেরআউনের) ঘোড়াগুলো ধ্বংস করেছেন এবং ঘোড় সাওয়ারদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

(ইবনে কাসীর (রহ) বলেছেন) আমি নিম্নরূপ বর্ণনা তাদের কিতাবে দেখেছি। সম্ভবত উক্ত বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবনে আল কুরযী (রা) বলেছেন। তিনি কুরআনের আয়াত (হে হারুনের বোন) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ইমরানের বোন মারইয়াম অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হলেন এ মারইয়াম। যিনি হযরত হারুন (আ) ও মূসা (আ)-এর বোন। আমি (তাফসীর গ্রন্থে) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কাব এ বর্ণনাকে সঠিক নয় বলে যা বলেছেন, তা বর্ণনা করেছি। কারণ, এটা কোনোভাবেই বলা যেতে পারে না। আর এরূপ কথা কেউ বর্ণনাও করেন নি। বরং সকল তাফসীরবিদগণ এর বিরোধিতা করেছেন। বনী ইসরাঈলের উক্ত বর্ণনা যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, তারপরও এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, এই মারয়াম বিনতে ইমরান হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর বোন। আর হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা মারইয়াম বিনতে ইমরান-এর উল্লিখিত মারইয়ামের নিজ নামের সাথে এবং পিতা ও ভাইয়ের নামের সাথে সাদৃশ আছে।

সুতরাং উল্লিখিত দু'জন মারইয়াম হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন। মুহাম্মাদ ইবনে কাবের মতে দু'জন কখনই এক নয়। এর স্বপক্ষে একখানা হাদীসও পাওয়া গেছে। একবার সাহবী মুগীরা ইবনে শুআবা (রা)-এর কাছে নাজরানবাসীরা আল্লাহর বাণী হে হারুনের বোন এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে উত্তর দিতে পারলেন না। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জান না, তারা তাদের নবীদের নামের সাথে মিল রেখে নাম রাখতেন।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসখানা বর্ণনা করেন। প্রথমে যে মাবীয়াহ নাম এসেছে, সেখানে মাবীয়াহ দ্বারা মারইয়ামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বাদশাহর স্ত্রীকে মালিকা (মহারাণী) বলা হয়ে থাকে এবং আমীরের স্ত্রীকে আমীরাহ বলা হয়ে থাকে। এভাবে মারইয়ামকেও মাবীয়াহ বলা হয়েছে। মূলত সে মাবীয়াহ ছিল না। তার দফ ইত্যাদি বাজানো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদের জন্য দু'ঈদে ও অন্যান্য উৎসবের দিনে এরূপ দফ বাজানো বৈধ ছিল। আমাদের ধর্মীয় বিধানেও মহিলাদের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে শুধু দফ বাজানোর অনুমতি আছে। এর প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে বর্ণিত হাদীসখানা গ্রহণ করা যেতে পারে। (কুরবানীর সময়) মিনার দিনগুলোতে দুটি বালিকা হযরত আয়েশা (আ)-এর কাছে বসে দফ বাজাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দিকে তার পৃষ্ঠ মোবারক দিয়ে এক কাত হয়ে শুয়েছিলেন। তাঁর চেহারা মোবারক দেয়ালের দিকে ছিল। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) সে ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি এরূপ দৃশ্য দেখা মাত্রই তাদেরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূলের ঘরে শয়তানের বাজনা? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু বকর! ওদেরকে ওদের কাজ করতে দাও। প্রত্যেক জাতির জন্যই রয়েছে আনন্দের দিন। আর এটা হচ্ছে আমাদের আনন্দের দিন। অনুরূপভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর অনুমতি আছে। যা যথাস্থানে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়ে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে চললেন, তখন তিন দিন পর্যন্ত তারা কোনো পানি পাচ্ছিলেন না। পানির পিপাসায় সবাই পেরেশান হয়ে পড়লেন। অবশেষে তারা লবনাক্ত পানি পেলেন, যা পানযোগ্য ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন, আপনি এক

টুকরো কাঠ নিজ হাতে (লবনাক্ত) পানিতে রেখে দেন। কাঠটি পানিতে রাখা মাত্রই (লবনাক্ত) পানি মিঠা পানিতে পরিণত হয়ে গেল এবং পান করার উপযুক্ত হলো। এ সময় আল্লাহ তাআল হযরত মূসা (আ)-কে ফরজ ও সুন্নাত সম্পর্কে অবগত করেন এবং অনেক উপদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ সংরক্ষিত কিতাবে ইরশাদ করেন— আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই। অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হলো। তারা বলল, হে মূসা! তাদের দেবতার মতো আমাদের জন্যেও এক দেবতা গড়ে দাও। সে বলল, তোমরা কী এক মূর্খ জাতি। এ সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো ধ্বংস হবে এবং তারা যা করছে তা-ও অযৌক্তিক।

বনী ইসরাঈলের লোকদের এ কথা ছিল মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার কথা। কারণ, তারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নিদর্শনসমূহ স্বচক্ষে দেখেছিল। যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হযরত মূসা (আ) যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তা সত্য ও আল্লাহ প্রদত্ত। তারপরও তারা মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যাওয়ার সময় নির্বোধের মতো এ কথা বলে। বর্ণিত আছে যে, এ মূর্তিটি ছিল গাভীর আকৃতির। সম্ভবত বনী ইসরাঈল সে মূর্তিপূজকদের কাছে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তোমরা এ মূর্তির কেন পূজা করছ?

তারা উত্তরে বলল, এ (মূর্তি) তাদের উপকার করে ও অপকারও করে। প্রয়োজনের সময় তাদের কাছে বিভিন্ন (খাদ্য) পাওয়া যায়। কোনো কোনো মূর্খ বনী ইসরাঈল তাদের এ কথা শুনে বিশ্বাস করল এবং এদের নবী হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর কাছে বললেন যে, তাদের মতো একজন মাবুদ (উপাস্য) আমাদের জন্যেও বানিয়ে দাও। তখন হযরত মূসা (আ) তাদেরকে নির্বোধ ও মূর্খ অবিহিত করে বললেন, এ সব লোক যাতে লিপ্ত আছে, তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে, তাও অমূলক। অতঃপর মূসা (আ) তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যেসব অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, সেগুলো তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে শরীআতের জ্ঞান প্রদান করে এবং তোমাদের থেকে রাসূল প্রেরণ করে বিশ্ববাসীর উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। তিনি মেহেরবানী করে তোমাদেরকে ফেরআউনের জুলুম ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের সামনেই তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। ফেরআউন ও তার অনুসারীরা যা কিছু (ধন-সম্পদ, দালান-কোঠা ও অন্যান্য সামগ্রী) নির্মাণ করেছিল, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সেগুলোর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। কারণ, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও মুক্তিদাতা। (হে বনী ইসরাঈল)-এরপরও কি তোমরা তাঁড়া অন্যের উপাসনা করতে চাচ্ছ? মূসা (আ)-এর কাছে এরূপ প্রশ্ন ও দাবি সকল বনী ইসরাঈলের ছিল না। কারণ আয়াতে বর্ণিত তারা বললো, হে মূসা! তাদের মতো আমাদের জন্যও একটি দেবতা বানিয়ে দাও। এখানে (তারা বলল) দ্বারা সকলকে বুঝানো হয় নি। এর মধ্যে যে সর্বনামটি রয়েছে, সেটি দ্বারা একটি গোষ্ঠী বা বিশেষ শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন, অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুতক্ষণে আমি তোমাদেরকে কখনো হাজির করব না। –সূরা কাহাফ : আয়াত ৪৮। এখানেও 'তোমরা মনে করতে' দ্বারা সকলকে বুঝানো হয় নি; বরং শুধু কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমদ (রা) মূসাদে আহমদে বর্ণনা করেছেন যে, আবু ওয়াকিদ লায়সী (রহ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হোনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা একটি কুল বৃক্ষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ কুল বৃক্ষে কাফেরদের জন্যে যেমন তরবারী ঝুলানো এবং তার চারপাশে ঘোরাফেরা করার জন্যে (উত্তম) স্থান, অনুরূপ স্থান আমাদের জন্যেও করে দিন। কারণ, কাফেররা তাদের তরবারী এ কুল বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে রেখে তার চার পাশে ঘুরতে থাকে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহু আকবার! তোমাদের কথা তো এরূপ হলো যেরূপ বলেছিল বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-কে যে, তাদের দেবতার মতো আমাদের জন্যে একটা দেবতা বানিয়ে দাও।

ইবনে জারীর (রা) কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ হাদীস এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াকিদ লাইসী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হোনাইনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ ছিল। যেটির তারা পূজা করতো। তারা তাদের তরবারী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিও সে বৃক্ষে রাখত। বৃক্ষটিকে বলা হতো, যুরাত স্থান। আমরাও একটি উঁচু সবুজ কুল বৃক্ষের কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাদের জন্যেও তাদের মতো একটি চক্কর দেয়ার স্থান বানিয়ে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে মহান সত্তার শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! তোমরা অনুরূপভাবে বলছ, যেরূপ বলেছিল মূসা (আ)-কে তার জাতির লোকেরা যে, তাদের মতো আমাদের জন্যও এক দেবতা বানিয়ে দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কিত আয়াত শরীফ পাঠ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— বনী ইসরাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর চলতে চলতে পথে এমন এক কওমের উপর দিয়ে যেতে হলো, যারা তাদের কতক মূর্তির পরম ভক্ত ছিল। (মূসার কওম) বলল, হে মূসা! এদের যেমন অনেক মা'বূদ আছে আমাদের জন্যেও তেমনি কোনো মা'বূদের মূর্তি বানিয়ে দাও[১]। মূসা বললেন, তোমরা বড়ই মূর্খের মতো কথা বলছ। এ লোকেরা যে তরীকায় চলছে তা তো বরবাদ হয়েই যাবে। আর তারা যা আমল করছে, তা একেবারেই বাতিল। -সূরা আ'রাফ : ১৩৮-১৩৯

বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা

হযরত মূসা (আ) মিশর ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তিনি সেখানে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) পৌঁছে সেখানে অবস্থানরত জাব্বারীন, কারামীন, হায়সাহীন, ওকানআনী জাতিকে দেশ থেকে বের করে দিতে বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিলেন। এরা ছিল দুর্দান্ত ও দুর্ধর্ষ জাতি। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাদের মোকাবিলা করতে রাজি হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তীহ ময়দানে বেষ্টন করলেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা সে ময়দানের মধ্যেই উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করছিল। আল্লাহ তাদের উপর ভয়ভীতি এবং তার ক্রোধ ও শাস্তি নিপতিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

(হে নবী! স্মরণ করুন) যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলেন, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজাধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেন নি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হে আমার জাতি! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসারণ করবে না; করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত জাতি রয়েছে এবং তারা সে স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না, তারা সে স্থান থেকে বেরিয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করব।

যারা ভয় করছিল তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বলল, তোমরা তাদের মোকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ করলেই তোমরা বিজয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহর উপরই ভরসা কর। মূসা

তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি আর তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এখানেই বসে থাকব। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ছাড়া অপর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী জাতির মধ্যে ফায়সালা করে দাও। আল্লাহ বললেন, আচ্ছা বেশ, তাহলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য ঐ দেশ নিষিদ্ধ করা হলো। তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী জাতির জন্যে দুঃখ করবে না।

-সূরা মায়দা : ২০-২৬

১. *এ জাতি যদিও বংশগতভাবে মুসলিম ছিল; কিন্তু মিসরে কয়েক শ' বছর ধরে এক পৌত্তলিক জাতির মধ্যে বাস করায় তাদের মধ্যে এ পৌত্তলিকতার প্রভাব পড়ে।*

আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের উপর আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন নেয়ামতে ভূষিত করেছেন। এখন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে আল্লাহর পথে তার দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, হে আমার জাতি! পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর। আর এটা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তোমরা পশ্চাদপসারণ করবে না। অর্থাৎ তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যেও না। যদি যাও তবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ উপকৃত হওয়ার পরে আবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পূর্ণ সফলতার পরে আবার অকৃতকার্য হবে। তখন তারা বলল, হে মূসা! যেখানে এক দুর্দান্ত এবং কাফের গোত্র রয়েছে। আমরা কখনই সেখানে (তাদের উপস্থিতিতে) প্রবেশ করব না। যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে আমরা সেখানে প্রবেশ করব।

তারা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ তারা এর পূর্বে ফেরআউন ও তার বাহিনীর ধ্বংস স্বচক্ষে দেখেছিল। যারা ছিল এ দুর্দান্ত জাতির চেয়েও অধিক শক্তিশালী। আর সৈন্যসংখ্যা ও অর্থ-সম্পদও ছিল এদের চেয়ে অনেক বেশি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তারা তাদের কথায় তিরস্কৃত হওয়ার যোগ্য এবং তারা তাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল ধারণা করে দুশমনদের উপর আক্রমণ করতে ভীত হয়ে পড়েছিল এবং দুর্দান্ত, দুর্ভাগা ও আল্লাহদ্রোহীদের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলো না। এ প্রসঙ্গে অনেক মুফাসসির অনেক কাল্পনিক কিচ্ছা কাহিনী ও অনর্থক কথা বর্ণনা করেছেন। যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত অযৌক্তিক এবং বিবেকের কাছে অগ্রহণীয়। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, জাব্বারীন জাতির বিশাল দেহবিশিষ্ট ও বিরাট আকৃতির ছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, যখন রাসূলের দূতগণ তাদের এলাকায় গমন করেন, তখন তাদের সাথে জাব্বারীন জাতির এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হয়। সে তাদেরকে একজন একজন করে উঠিয়ে নিজ আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আস্তিনের পাশে বেঁধে নিলেন। তারা (দূতগণ) সংখ্যায় ছিল বারজন। অতঃপর জাব্বারীন লোকটি তাদের বাদশাহর কাছে উপস্থিত হয়ে আস্তিন থেকে ঝেড়ে তাদেরকে বাদশাহর সামনে ফেলে দিল।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, এগুলো কি? বাদশাহ চিনতেই পারল না যে, এরা বনী আদম। এ সব ঘটনা কাল্পনিক ও মনগড়া। যার কোনো ভিত্তি নেই।

আরো বর্ণিত আছে যে, বাদশাহ তাদেরকে একগুচ্ছ করে আঙ্গুর ফল দিয়েছিল। তার প্রতিটি আঙ্গুর এক ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। এটা দেয়ার কারণ ছিল, যাতে বনী ইসরাঈল তাদের দেহের উচ্চতা ও গঠন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তাদের এ কথাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ দুর্ধর্ষ বাহিনীর আওজ ইবনে আনাক নামক এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার জন্যে রওয়ানা হয়েছিল। তার দেহের উচ্চতা ছিল তিন হাজার হাত এবং প্রস্থ ছিল তেত্রিশ হাত এবং মোটা ছিল তিন হাত। আল্লামা বাগাবী (রহ.) ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। যা আদৌ শুদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসের আলোচনায় আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাদীসখানা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত উচ্চতা করে সৃষ্টি করেছেন। আদম (আ)-এর পর থেকে (আদম সন্তানের) দৈর্ঘতা পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে পেতে (এ পর্যন্ত) আসে। এমনকি আওজ নামক লোকটি সম্পর্কে এরূপ ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, আওজ একটি পাহাড়ের বৃহৎ চূড়া উপড়িয়ে নিয়ে নিল এবং বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তা (চূড়া) তাদের উপর নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করল। তারপর একটি পাখী এসে উপর থেকে পাথরটি ছিদ্র করতে শুরু করে। ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে এতখানি ছিদ্র করল যে, পাথরখানা আওজের গলায় প্রবেশ করে বেড়ী সাদৃশ হয়ে গেল। অতঃপর মূসা (আ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। হযরত মূসা (আ)-এর দেহের দৈর্ঘ ছিল দশ হাত এবং তিনি দশ হাত লাফ দিয়ে উপরে উঠলেন এবং তার লাঠিটি ছিল দশ হাত। এভাবে ত্রিশ হাত উঁচু থেকে তিনি আওজকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেন ও তাকে হত্যা করেন। এ বর্ণনাটি নওফ ইবনে বাকালী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। ইবনে জারীর (রা) এ হাদীসখানা ইবনে আব্বাস (রা)

থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনার সূত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। এছাড়া এগুলো হচ্ছে ইসরাঈলী বর্ণনা এবং বনী ইসরাঈলের মূর্খ ও নির্বোধ লোকদের মনগড়া কথা। কারণ, তাদের পক্ষ থেকে এত অসত্য ও মনগড়া কথা ছড়িয়ে আছে যে, সত্য ও মিথ্যা বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ বর্ণনাগুলোকে সঠিক বলে মেনে নিলে, বনী ইসরাঈলের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার অজুহাত সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। কারণ, তারা কিভাবে সেই দুর্দান্ত ও বিশাল দেহের অধিকারী লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের এরূপ যুদ্ধ থেকে ফিরে থাকার ব্যাপারে তাদেরকে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে তীহ ময়দানে চল্লিশ বছর পর্যন্ত উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিয়েছেন। কারণ, তারা রাসূলের বিরোধিতা করে যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল।

এ সময় হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ) এবং কলিব ইবনে ইউকান্না এ দু'জন সৎ ব্যক্তি যুদ্ধের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না থাকার জন্য বলেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রহ), ইকরামা (রা), আলীয়া (রা), সুদ্দী (রা), রাবী ইবনে আনাস প্রমুখ (রা) এরূপ বর্ণনা করেছেন। যারা ভয় করেছিল তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীতে যে দু' জনের কথা বলা হয়েছে, তারাই হলেন উল্লিখিত দু'জন। (অর্থাৎ হযরত ইউশা ইবনে নূন ও কালিব ইবনে ইউকান্না) আল্লাহ তা'আলা এ দুজনকে ঈমান গ্রহণের ও (নবীর) আনুগত্য করার তাওফীক দিয়ে তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তারা দু'জন বলেছিলেন, তোমরা তাদের মোকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে। আর তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ ভরসা করবে, তার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হবে এবং একমাত্র তারই আশ্রয় কামনা করবে, তখন তিনি তোমাদের দুশমনের মোকাবিলায় তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে শক্তিশালী করবেন এবং তোমাদের বিজয় দান করবেন। তখন বনী ইসরাঈল এর উত্তরে হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিল, হে মূসা! সে লোকেরা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে কখনই প্রবেশ করব না। সুতরাং (যুদ্ধ যদি করতেই হয়) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব। এভাবে তাদের নেতৃবৃন্দ ও সর্দারেরা যুদ্ধ থেকে বিরত রইলো তারা ভীত হলো। বর্ণিত আছে, যখন ইউশা ইবনে নূন (আ) ও কালিব ইবনে ইউকান্না তাদের এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা শোনলেন, তখন তারা তাদের কাপড় ছিড়ে ফেললেন এবং হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্যে গযবের ভয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় পড়ে গেলেন। তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন যে, এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও ধৃষ্টতা কথার জন্য তার জাতির প্রতি আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়ে পড়ে নাকি। হযরত মূসা (আ) আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দো'আ করলেন। হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত আর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী জাতির মধ্যে ফায়সালা করে দাও।

আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইলো। তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী জাতির জন্য দুঃখ করবে না। তাদের এ অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানোর শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে তারা দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা চলতেই থাকে। কেউ ময়দান থেকে বের হতে পারে না। বর্ণিত আছে, এ ময়দানে যারাই প্রবেশ করেছে তারা কেউই সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারে নি। বরং চল্লিশ বছর সেখানে সবাই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু তাদের সন্তান-সন্ততি ও ইউশা বিন নুন এবং কালিব (আ) বাকি ছিলেন। এই তো ছিল বনী ইসরাঈলের অবস্থা। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রাণপ্রিয় সাহাবায়ে কেরাম বদরের যুদ্ধের দিন তাদের নবীর সাথে এরূপ কথা বলেন নি, যেমন কথা বলেছিল বনী ইসরাঈল তাদের নবীর সাথে। বরং যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের ব্যাপারে সাহাবায়ে কোরামের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) কত সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে সুন্দর পরামর্শ দিয়েছিলেন, অন্যান্য মুহাজিরগণও। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাকে (যুদ্ধের

ব্যাপারে) পরামর্শ দাও, আমাকে পরামর্শ দাও। তখন হযরত সাআদ ইবনে মায আনসার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যসহ পৃথিবীতে চাচ্ছেন? আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্যসহ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে মহা সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন, তবে আমরা আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের কেউ পিছপা হবে না। আমাদের কাল-ই যদি দুশমনের সাথে যুদ্ধ করতে হয়, তবে সেজন্যে আমরা আন্তরিকভাবে প্রস্তুত। আমরা যুদ্ধের জন্যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দৃঢ়। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন কিছু কাজ আপনাকে দেখাবেন, যাতে আপনার অন্তর খুশিতে ভরে যাবে ও আপনার চক্ষু জুড়াবে। আপনি আমাদের নিয়ে যুদ্ধে চলুন।

আল্লাহ আমাদের বরকত দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সাআদ (রা)-এর এ কথায় অত্যন্ত খুশি হলেন। হযরত সাআদের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারকে আনন্দের ছাপ ফুটে উঠল।

ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত মিকদাদ (রা) বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তেমন কথা বলব না, যেমন কথা বনী ইসরাঈল তার নবীকে বলেছিল। (যে তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসা থাকব) বরং (আমাদের কথা হলো) আপনি আপনার প্রতিপালকের সাথে আমাদেরকেও নিয়ে চলুন। আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করব।

ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, আমি মিকদাদ (রা)-কে এমন এক অবস্থায় দেখতে পেয়েছি যে, আমি যদি সে অবস্থায় থাকার সুযোগ পেতাম, তবে তা সবকিছুর চেয়ে আমার কাছে প্রিয় মনে হতো।

তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাশরীফ আনলেন। তখন তিনি ﷺ মুশরিকদের জন্য বদ দো'আ করছিলেন। তখন হযরত মিকদাদ (রা) আরয করলেন, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে সেরূপ কথা বলব না, যেরূপ কথা বলেছিল বনী ইসরাঈল তাদের নবী হযরত মূসা (আ)-কে। (তা হচ্ছে এই যে, তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসে থাকব) বরং (আমাদের কথা হলো) আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে (সবদিক) থেকে যুদ্ধ করব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, মিকদাদের এ কথায় তার চেহারা মোবারক খুশিতে চমকাচ্ছিল এবং তিনি ﷺ অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি ﷺ মুসলমানদের কাছে (যুদ্ধ করা সম্পর্কে) পরামর্শ চাইলেন। হযরত ওমর (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় পরামর্শ চাইলেন। তখন আনসার নেতৃবন্দ অন্যান্য সকল আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসার দল! রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মতামত চাচ্ছেন। আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা আপনাকে সেরূপ কথা (কখনই) বলব না, যেরূপ কথা বলেছিল বনী ইসরাঈল তাদের নবী মূসা (আ)-কে। সে মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি দূরদেশেও (যুদ্ধের জন্য) গমন করেন, আমরা তখনো আপনার অনুসরণ করব।

বনী ইসরাঈলের তীহ ময়দানে অবস্থান ও বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন

পূর্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল দুর্দান্ত জাব্বারীন জাতির সাথে যুদ্ধ করার আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে তা থেকে বিরত রয়েছিল। এতে আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে তীহ ময়দানে উদভ্রান্ত অবস্থায় চল্লিশ বছর ঘুরিয়েছিলেন। এর মধ্যে কেউই সেখান থেকে বের হতে পারেনি। আমি (ইবনে কাসীর) আহলে কিতাবদের গ্রন্থে এ কথা লেখা দেখি নি যে, বনী ইসরাঈল জাব্বারীন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রয়েছিল। বরং সেখানে লেখা আছে যে, হযরত মূসা (আ) ইউশা ইবনে নূনকে (কয়েকজন লোকসহ) কাফেরদের একটি জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আ), হারুন (আ), খোর নামক এক ব্যক্তি

এ তিনজন একটি টিলার উপরে বসেছিলেন। হযরত মূসা (আ) তার লাঠিটি যখন উপরে উঠালেন, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউশা (আ)-কে বিজয় দান করলেন।

আর যখন মূসা (আ)-এর হাত দুর্বল কিংবা অন্য কোনো কারণে নিচে নেমে যেত, তখন হযরত ইউশা (আ)-এর উপর কাফেররা বিজয়ী হতো। এভাবে চলছিল। তারপর হযরত হারুন (আ) এবং খোর দু'জনে মিলে মূসা (আ)-এর হাতকে লাঠিসহ সূর্য উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপরের দিকে উঠিয়ে ধরে রাখলেন। অবশেষে হযরত ইউশা (আ) জয়লাভ করলেন। আহলে কিতাব থেকে এরূপ ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, মাদইয়ান শহরের 'ইয়াসরুন' নামক এক গণক, যিনি হযরত মূসা (আ)-এর শ্বশুরও ছিলেন। তিনি যখন খবর পেলেন যে, হযরত মূসা (আ) ফেরআউনের মোকাবিলায় জয়লাভ করলেন এবং এরূপ এরূপ অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করছেন, তখন তিনি মুসলমান হয়ে মূসা (আ)-এর কাছে হাজির হলেন এবং তার সাথে তার কন্যা সাফুরাও ছিলেন। যিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর স্ত্রী। আর সাথে তার দুই পুত্র জ্যারসুন ও আটের ছিলেন। তারা সবাই এসে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মূসা (আ) শ্বশুরকে খুব সম্মান করলেন। এ কারণে, বনী ইসরাঈলের প্রবীণ লোকেরা ও নেতৃবৃন্দরাও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন ও তাকে তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করলেন। আহলে কিতাবগণ বলেছেন, ইয়াসরুন দেখতে পেলেন যে, ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার সময় বনী ইসরাঈলের লোকেরা এসে হযরত মূসা (আ)-এর চার পাশে ভিড় জমায়, আর সমস্ত ফয়সালাই দিচ্ছেন হযরত মূসা (আ) নিজেই। ইয়াসরুন হযরত মূসা (আ)-কে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি এমন কিছু সংখ্যক লোক নির্ধারণ করুন, যারা সৎ, বিশ্বস্ত, খোদাভীরু, সংযমী ও চরিত্রবান। যারা সুদ-ঘুষ ও আত্মসাতকে ঘৃণা করেন। তারপর তাদের মধ্য হতে কাউকে হাজার লোকের উপর, কাউকে একশত লোকের উপর, কাউকে পঞ্চাশজন লোকের উপর এবং কাউকে দশজন লোকের উপর নেতৃত্ব করার যথাযথ ক্ষমতা দিয়ে দিন।

এ নেতৃবৃন্দ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন লোকদের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু মিমাংশা করবেন। যদি তারা (নেতৃবৃন্দ) জটিল কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন, তখন তার মিমাংশার জন্য তারা আপনার কাছে আসবেন। আপনি সুষ্ঠু মিমাংশা করে দিবেন। হযরত মূসা (আ)-এর এ পরামর্শ খুব পছন্দ হলো এবং সেরূপই করলেন।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, বনী ইসরাঈল মিশর থেকে বের হয়ে তৃতীয় মাসে সীনাই ঝিলের কাছে গিয়ে অবতরণ করেন। যে মাসটি তাদের জন্য বছরের (প্রথম মাস) শুরু হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, সে প্রথম মাসেই তারা মিশর থেকে বের হয়েছিলেন। এ সময়টিও ছিল ঋতুর প্রথম মাস। এ হিসাব মতে সম্ভত বনী ইসরাঈল গ্রীষ্মকালে তীহ ময়দানে প্রবেশ করেছিল।

আহলে কিতাবগণ বলেন। বনী ইসরাঈল সীনাইয়ের তূর পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তারপর মূসা (আ) তূর পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং নিজ প্রতিপালকের সাথে কথা বলেন। তখন মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তুমি তোমার নিজ জাতির লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার দয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দাও যে, তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে ফেরআউনের নির্যাতন, লাঞ্ছনা ও শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরআউনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তুমি তোমার জাতিকে এ আদেশ দাও যে, তারা যেন পবিত্রতা অর্জন করে, গোসল করে এবং নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখে এবং তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে। তৃতীয় দিনে তারা সবাই যেন সীনাই পাহাড়ের চারপাশে এসে সমবেত হন। কিন্তু পাহাড়ের কাছে যেন কেউ না আসে। যে ব্যক্তি পাহাড়ের কাছে আসবে তাকে মেরে ফেলা হবে। এমনকি কোনো জীবজন্তুও যেন না আসে। যদি আসে তবে সেগুলোর পরিণামও অনুরূপ হবে। শিঙ্গার ধ্বনি চলা পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে। (সে যুগে বাঁশির মতো শিঙ্গা বানিয়ে তা বাজানো হতো।) যখন শিঙ্গার ধ্বনি বন্ধ হয়ে যাবে তখন তোমরা পাহাড়ের কাছে আসতে পারবে। বনী ইসরাঈল এ কথা শুনে তা যথাযথভাবে পালন করলেন। তারা গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করলেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। তৃতীয় দিনে বৃৎ পাহাড়কে মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলল। তার মধ্য হতে নূরের স্তম্ভ ও সেগুলো ছায়া বিস্তার করল। তার মধ্য হতে বিভিন্ন প্রকারের ধ্বনি ভেসে

আসতে লাগল এবং শিঙ্গার বিকট ধ্বনি ও বিদ্যুৎ এর গর্জন শোনা গেল। এতে বনী ইসরাঈল খুব ভীত হয়ে পড়লেন এবং নিজস্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশে এসে সমবেত হলো। এ সময় পাহাড়কে কালো ধোঁয়ায় আবৃত করে ফেলল। পাহাড় প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে আরম্ভ করল এবং দুলতে লাগল।

মূসা (আ) পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি বিশেষ দয়া বর্ষণ করেন, তার সাথে কথা বলে তাকে ধন্য করেন এবং কালীমুল্লাহ উপাধি দিয়ে ধন্য করেন। উভয়ের আলাপ শেষে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন যে, তুমি নিচে নেমে বনী ইসরাঈলকে বলো যে, তোমরা এখন পাহাড়ের নিকটবর্তী হও এবং আল্লাহর উপদেশ বাণী শ্রবণ কর। আর তাদের মধ্যে যারা আলেম ছিলেন, তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো যে, তারা যেন পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন, যাতে তারা অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারেন। কিন্তু তাদের কিতাবে লিখিত এ তথ্যটি পরবর্তিতে রহিত হয়ে যায়। অতঃপর মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তারা পাহাড়ে আরোহণ করার ক্ষমতা রাখে না। আর আমি এর পূর্বে এদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রেখেছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিলেন যে, তুমি যাও, তোমার ভাই হারুন (আ)-কে সাথে করে নিয়ে এসো। আর গণক আলেমগণ এবং বনী ইসরাঈলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তারা যেন পাহাড়ের খুব নিকটে থাকে। হযরত মূসা (আ) নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বললেন এবং দশটি উপদেশ দিলেন।

আহলে কিতাবগণের মতে, বনী ইসরাঈলগণ সে পবিত্র বাণী শুনেছিল। কিন্তু বুঝতে পারে নি। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে আল্লাহর বাণী সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মূসা (আ)-কে বলল, আমরা এ প্রসঙ্গে নিশ্চিত হলাম যে, আপনি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত নবী। তবে আমরা আশঙ্কা করছি যে, কখন না যেন মারা যাই। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত দশটি উপদেশ বাণীর কথা জানিয়ে দিলেন। সেগুলো হলো এই যে—

১. লা শারীক এক আল্লাহর ইবাদত করা।

২. আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা থেকে বিরত থাকা।

৩. সপ্তাহের শনিবার দিনকে সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ সপ্তাহের যেকোনো একদিনকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা। সে দিন সকল কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকা। এখন জুমআর দিবসকে নির্ধারণ করা হয়েছে। জুমআর দিবসের কারণে শনিবার দিনের ইবাদতকে রহিত করা হয়েছে

৪. মাতা-পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ তোমার আয়ু বাড়িয়ে দেবেন।

৫. সন্তান-সন্ততিকে হত্যা না করা।

৬. জিনা-ব্যভিচার না করা।

৭. চুরি না করা।

৮. নিজ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী না দেয়া।

৯. নিজ প্রতিবেশীর ঘরে (অসৎ উদ্দেশ্যে) দৃষ্টিপাত না করা।

১০. নিজ বন্ধুর (বা প্রতিবেশীর) স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি না করা এবং তার দাস-দাসী, জীব-জানোয়ার কিংবা তার গাধার প্রতি মোটকথা, তাদের কোনো জিনিসের প্রতিই লোভ না করা।

অধিকাংশ আলেমগণ বলেছেন, উক্ত দশটি উপদেশ বাণীর কথা কুরআন মাজীদের দুটি আয়াতে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— (হে রাসূল!) তাদেরকে বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে পড়ে শোনাই যে, তোমাদের রব তোমাদের উপর কী কী বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করেছেন[১]। তা এই যে, তার সাথে কোনো জিনিসকে শরীক করো না ও পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদের ও তাদের রিযক দেই। প্রকাশ্যে হোক আর গোপনে হোক কোনো রকম অশ্লীলতার[২] কাছেও

যেও না। আল্লাহ (মানুষের) যে জীবনকে সম্মানের পাত্র করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না। এ সব কথা মেনে চলার জন্যেই তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন। হয়তো তোমরা বুঝে-শুনে চলবে। ইয়াতীমরা যৌবন বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত ভালো (নিয়ত ও নিয়ম) ছাড়া তাদের মালের ধারে-কাছেও যাবে না। পরিমাণ ও ওজনের বেলায় ইনসাফ করবে। আমি প্রত্যেকের উপর ততটুকু দায়িত্বই দিয়ে থাকি, যতটুকু পালন করা তার পক্ষে সম্ভব। আর যখন তোমরা কথা বল ইনসাফের সাথে বল, নিকটাত্মীয়রে ব্যাপারে হলেও। আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করো তা পালন করো[৩]। আল্লাহ তোমাদের এ সব বিষয়ে হেদায়েত দিয়েছেন হয়তো তোমরা নছীহত কবুল করবে। এটা আল্লাহর হেদায়াত যে, এটাই আমার সরল মজবুত পথ। এ পথেই চলো। অন্যসব পথে চলবে না। তাহলে তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এসব ঐ হেদায়াত, যা তোমাদের রব তোমাদেরকে দিয়েছেন। হয়তো তোমরা (বাঁকা পথ থেকে) বেঁচে চলবে।

এ উপদেশ বাণীর পরেও অনেক উপদেশ এবং বিভিন্ন নির্দেশাবলী ভিন্ন ভিন্নভাবে নাযিল হয়েছে। যা কিছুদিন যাবৎ চালু ছিল। এর পরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এর অনুকরণ চলছিল। অতঃপর বনী ইসরাঈলের মধ্যে যখন অবাধ্যতার বীজ অনুপ্রবেশ করল তখন তারা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন সাধন করল। পর্যায়ক্রমে সবগুলো আদেশে পরিবর্তন করে ফেলল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও এগুলো রহিত হয়ে যায়। এভাবে বেশ কিছুদিন চালু থাকার পরে সেগুলো রহিত ও বাতিল হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলারই আদেশ কায়েম থাকবে পূর্বেও ও পরেও। (অর্থাৎ সর্ব সময়ের জন্য) তিনি যা ইচ্ছা করেন, সেটাই পৃথিবীতে কার্যকরী হয়। তার আদেশই সবকিছুর উপর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহান ও বরকতময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন— হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিরাম, তোমাদের যা প্রদান করেছি, তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর ও এ বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে চলতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা তার দয়া ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলকে তাদের দুশমনের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং সংকীর্ণতা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত রেখেছেন। তিনি (আল্লাহ) তার নবীর সাথে তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পাশে তাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন। তাদের উপর দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল ও উপহার সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

ভ্রমণ ও অবস্থানকালীন কঠিন সময়ে যখন কোনো প্রকার ফসলাদি উৎপন্ন করা বা ফল-ফলাদি সংগ্রহের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে মান্না ও সালওয়া খাবার প্রেরণ করেন। প্রতিদিন সকালে মান্না তারা নিজ নিজ ঘরের মধ্যে বসে পেয়ে যেত এবং এক দিনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তারা সংরক্ষণ করে রেখে দিত। আর যতটুকু অতিরিক্ত সংগ্রহ করে রাখত তা নষ্ট হয়ে যেত। আর যদি কম সংরক্ষণ করে রাখত, তবে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কম হতো না। অতিরিক্ত যা সংগ্রহ করে রাখত, তা অবশিষ্ট থাকত না। অথবা নষ্ট হয়ে যেত।

---

১. *অর্থাৎ তোমরা যে বাধ্যবাধকতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছ, সেগুলো তোমার প্রভুর দেওয়া বাধ্যবাধকতা নয়।*

২. *মূল শব্দ 'ফাওয়াহিশ' ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ সব কাজের প্রতি এই শব্দ আরোপ করা হয়, যেসবের খারাবী অতি স্পষ্ট। যৌন ব্যভিচার, লুত (আ)-এর জাতির অপকর্ম, সমকামিতা, নগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করাকে কুরআন মাজীদে 'ফাহেশা' কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। হাদীসে মদ খাওয়া ও ভিক্ষা করাকে মোটামুটি 'ফাহেশা' কাজ বলা হয়েছে। এরূপ অন্যান্য লজ্জাকর কাজও 'ফাহেশা' হিসেবে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাজ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা নিষেধ করেছেন।*

৩. *আল্লাহর ওয়াদা' এর অর্থ ঐ আহাদ বা ওয়াদা, যা মানুষ ও আল্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। যখন একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্ম নেয়।*

মান্না-এর দ্বারা লোকেরা রুটির মতো তৈরি করতো। যা খুব সাদা ও মিষ্টি হতো। যখন সন্ধ্যা হতো তখন সালওয়া নামক পাখী তাদের চার পাশে এসে একত্রিত হতো। সেগুলো তারা অতি সহজেই ধরতো এবং রাতের খাবারের জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যেত। গ্রীষ্মকালের সময় তাদের উপর আল্লাহ মেঘ প্রেরণ করতেন। যাতে তারা গরম ও তৃষ্ণা থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহের কথা তোমরা স্মরণ কর, যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আমি যা নাযিল করেছি, তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের নিকট যা আছে তার প্রত্যায়নকারী। আর তোমরাই এটা প্রথম ত্যাগকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের পরিবর্তে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। তোমরা নামায কায়েম করো ও যাকাত প্রদান কর এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো। (এটা কি জ্ঞানের কথা যে) তোমরা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ দাও, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব অধ্যায়ন করো। তবে কি তোমরা বুঝ না? (বিপদাপদে) তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো এবং এটা বিনীতগণ ছাড়া আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন। তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তারই দিকে তারা ফিরে যাবে। হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপর মর্যাদা দিয়েছিলাম। তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না; কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারো নিকট হতে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কোনো প্রকার সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। স্মরণ করো! যখন আমি ফেরআউনী জাতি হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে যবেহ করে ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রেখে তোমাদের কষ্টদায়ক যন্ত্রণা দিত এবং তাতে তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক মহা পরীক্ষা ছিল; যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরআউনী জাতিকে নিমজ্জিত করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করতেছিলে। যখন মূসার জন্য চল্লিশ রাত নির্দিষ্ট করেছিলাম, তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; আর তোমরা তো জালিম। এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম, যাতে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও। আর যখন মূসা আপন জাতির লোকদের বলল, হে আমার জাতি! গোবৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেছ; সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করো। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই উত্তম। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনই বিশ্বাস করব না; তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে, আর তোমরা দেখছিলে। তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা করো। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা থেকে আহার করো। তারা আমার উপর জুলুম করে নি; বরং তারা তাদের উপর জুলুম করেছিল। স্মরণ করো! যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ করো, যথা ও যেথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্যে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ করো দ্বার দিয়ে এবং বলো, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারকারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— ঐ কথা মনে কর, যখন মূসা তার কাওমের জন্য পানি চেয়ে দোয়া করল, তখন আমি বললাম, অমুক পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে তা থেকে বারোটি ঝর্ণা বের হলো এবং প্রত্যেক গোত্র জেনে নিল যে, তার পানি নেবার জায়গা কোনটি[১]। (তখন তাদেরকে হেদায়াত করা হয়েছিল যে,) আল্লাহার দেয়া রিযক খাও ও পান কর আর দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। মনে করে দেখ! যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাবার পেয়ে ধৈর্য্য ধরতে পারি না। আপনার রবের কাছে দো'আ করুন যেমন আমাদের জন্য যমীন থেকে শাক-সব্জি, তরি-তরকারি, গম, ডাল ও পেঁয়াজ ইত্যাদি উৎপন্ন করেন। তখন মূসা বলেছিলেন, তোমরা কি একটা ভালো জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট জিনিস নিতে চাও? তাহলে তোমরা কোনো শহরে গিয়ে থাক। তোমরা যা চাচ্ছ তা সেখানে পাবে। অবশেষে অবস্থা এ হলো যে, তাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং অবনতি ও দূরবস্থা নেমে এলো এবং তারা আল্লাহর গজবে নিপতিত হলো। এ অবস্থা এজন্য হলো যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করতে লাগল এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে থাকল। অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং শরীঅতের সীমা থেকে বের হয়ে যাওয়ার দরুনই তাদের এ দশা হয়েছে। -সূরা বাকারা : ৪০-৬১

উক্ত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের উপর আল্লাহ তা'আলার অগণিত অনুগ্রহের কথা সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। তাদের জন্য অতীব সুস্বাদু ও মজাদার মান্না ও সালাওয়া দু'প্রকারের খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। যা তারা অতি সহজে ও বিনা পরিশ্রমে লাভ করতো। তারা সকাল বেলা রুটির পরিবর্তে মান্না এবং সন্ধ্যাবেলায় পাখির গোশত (সালওয়া) পেয়ে যেত। পানির ব্যবস্থাও সেখানে করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পাথরের উপর তার নিকট লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। ফলে পাথর ফেটে হয়ে বারটি গোত্রের জন্য বারটি ঝরনা প্রবাহিত হলো।

প্রবাহিত এ মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি তারা নিজেরা পান করতো ও তাদের পশুদেরকেও পান করাতো। প্রয়োজন পরিমাণ পানি সংগ্রহ করেও রাখতো। আর গ্রীষ্মকালে মেঘ তাদেরকে ছায়া দান করতো। এগুলো ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি মহা অনুগ্রহ ও বিশেষ দান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এ বান্দারা আল্লাহর হক যথাযথভাবে আদায় করে নি এবং তার কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে নি। এ নিয়ামতের পরিবর্তে তারা আল্লাহর ইবাদতও করেনি। পরে তারা এ নিয়ামতের প্রতি বিরক্ত হয়ে গেল এবং খুব পেরেশান হয়ে পড়ল। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আরয করল, এই (মান্না ও সালওয়া) খাদ্যের বদলে আর অন্য কিছু খাদ্য প্রদান করা হোক। যেমন সব্জী, গম, ক্ষারা, শশা, মশুর ও পিঁয়াজ ইত্যাদি। বনী ইসরাঈল এগুলো পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করলেন। এতে মূসা (আ) তাদেরকে বেশি পরিমানে ধমকালেন এবং সাবধান করে দিলেন। তাদের এ কাজগুলোর প্রতি তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? তবে কোনো নগরে আবতরণ করো। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। অর্থাৎ তোমরা এ উৎকৃষ্ট নিয়ামতের পরিবর্তে যেসব পার্থিব খাদ্য পেতে আগ্রহী সেগুলো পাওয়ার জন্য ছোট বড় যে কোনো শহরে অবস্থান করো। সেখানে তা তোমরা অর্জন করতে পারবে। আর সেই মর্যাদা থেকেও তোমরা অবতরণ করবে, যার তোমরা উপযুক্ত নও। কিন্তু আমি তোমাদের কথার কোনই উত্তর দিব না এবং তোমাদের অভিলাষও আল্লাহর কাছে পৌছবে না। বনী ইসরাঈলের উক্ত আচরণে প্রমাণিত হয় যে, তারা নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত ছিল না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার বাণী তাদের প্রতি প্রথমেই অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন— তোমরা এ খাদ্য সামগ্রীর সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। (সূরা ত্বাহা : আয়াত ৮১) অর্থাৎ তাদের জন্যে অত্যাচারী বাদশাহর শাস্তি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারা ধ্বংসের যোগ্য হয়েছে।

১. বনী ইসরাঈল বারোটি দলে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ প্রত্যক দলের জন্য আলাদাভাবে একটি ঝরনাধারা প্রবাহিত করেন; যেন তাদের মধ্যে পানি নিয়ে কোনো ঝগড়া-বিবাদ না হয়।

কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ কঠোর ধমক ও সাবধান বাণীর সাথে, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমার বাণীও পেশ করেছেন। তবে এ ক্ষমা তাদের জন্যে, যারা অনুতপ্ত হয়ে (তাওবা করে) ঈমান ও নেক আমলে সুসজ্জিত হয়ে সৎপথে চলবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে। -সূরা ত্বাহা : ৮২

আল্লাহ তা'আলা ও মূসা (আ)-এর মধ্যে কথাবার্তা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী!) স্মরণ করুন, মূসার জন্যে আমি ত্রিশ রাত নির্দিষ্ট করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূর্ণ হয় এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার জাতির মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না। মূসা (যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার পালনকর্তা তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না, তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে যখন তার রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তার জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম। তিনি বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ করো এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তার জন্যে ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার জাতিকে এগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেবে, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে সেটাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে অমান্য করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল অন্যমনস্ক। যারা আমার নিদর্শন ও আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের সব আমল বরবাদ হয়ে যাবে। তারা যা করে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে। -সূরা আরাফ : ১৪২-১৪৭

কয়েকজন বুযুর্গ, যাদের মধ্যে আছেন ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক ও মুজাহিদ (রহ), তারা বলেন, ত্রিশ রাত হলো যিলকদের পূর্ণমাস এবং আরো দশ হলো জিলহজ্বের প্রথম দশরাত, মোট চল্লিশ রাত। এ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার বাণী তার উপর নাযিল হয়েছিল কুরবানীর ঈদের দিন। আর অনুরূপ একটি বরকতময় দিবসেই আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর পরিপূর্ণ করেন এবং দলীল প্রমাণাদি দ্বারা তা মযবুত করেন। হযরত মূসা (আ) যখন তার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করেন তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। কথিত আছে মূসা (আ) এ পূর্ণ সময়কাল কোনো আহার করেন নি। যখন মাস পূর্ণ হলো তখন তিনি একটি বৃক্ষের ডাল দিয়ে মিসওয়াক বানিয়ে তা মুখে দিলেন, যাতে এ দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকার কারণে মুখে যে এক প্রকারের গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে মুখ সুগন্ধিময় হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তুমি আরো দশ দিন এখানে অবস্থান কর। এবং রোজা রেখে মুখে সেই গন্ধ পুনরায় আনয়ন কর, যা তুমি মিসওয়াক করে দূর করেছিলে। কারণ, এ গন্ধ আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় এ কারণে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের চাইতেও অধিক পছন্দনীয়। মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তার ভাই হারুন (আ)-কে বনী ইসরাঈলের লোকদের জন্য তার প্রতিনিধি (খলীফা) মনোনীত করলেন। হারুন (আ) ছিলেন সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি মূসা (আ)-এর সহোদর ভাই। আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর একান্ত সহকারী। মূসা (আ) তাকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও আদেশ দিলেন। আর এ কথাগুলো হযরত হারুন (আ)-এর নবুওয়াতের জন্য যথোপযুক্ত ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মূসা (আ) যখন তার জন্যে নির্ধারিত সময়ের স্থানে পৌছল, তখন তার রব তার সাথে কথা বলেছেন। সব কথা সুস্পষ্টভাবে শোনা গেছে। তারপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ডাকলেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিকটবর্তী করে নিলেন। এ স্থানটি বুলন্দ (উচ্চ) স্থান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পদমর্যাদা। আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) তার উপর বর্ষিত হতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা যখন তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র বাণী (ক) সুস্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন। এ সময় হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তআলার প্রেমে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং নূরের পর্দা উঠিয়ে দেয়ার জন্যে আবেদন করেন এবং তিনি সে মহান সত্তা, যাকে এ পৃথিবীতে বসে মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়, যিনি মহা পরাক্রমশালী, তার কাছে এ আবেদন করলেন যে, হে আমার রব! আমাকে নিদর্শন প্রদান করুন। আমি আপনাকে দেখব। আল্লাহ বলেন, তুমি আমাকে কখনই দেখতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নূরের সামনে কোনো কিছুই স্থির থাকতে পারে না। সে পাহাড় যা মানুষের চেয়েও শক্তিশালী ও দৃঢ়, সে বৃহৎ পাহাড়কে কেউ নাড়াতে পারে না, সে পাহাড়ও আল্লাহ তা'আলার নূরের তাজাল্লী সহ্য করতে পারে না। সুতরাং হে মূসা! তুমি কিভাবে আমার দর্শনকে সহ্য করতে পারবে? সুতরাং আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিলেন, (হে মূসা) তুমি পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।

আগেকার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বলেছিলেন, (হে মূসা!) কোনো জীবিত মানুষ আমাকে দেখতে পারবে না। যদি কেউ দেখে তবে সে মারা যাবে। আর কোনো শুষ্ক বস্তুও আমাকে দেখতে পারবে না। যদি দেখে তবে সে গলে পানি হয়ে যাবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পর্দা হচ্ছে নূরের। অন্য বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলার পর্দা হচ্ছে অগ্নির। যদি আল্লাহ তা'আলা সেই পর্দা সরিয়ে ফেলেন তবে আল্লাহ তা'আলার কুদরতী চেহারার নূরের রশ্মি যে পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে অর্থাৎ আল্লাহর (কুদরতী) দৃষ্টি যেসব সৃষ্টির উপর পড়বে, সেগুলো সবই পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এরূপ যে, কোনো দৃষ্টিই তাকে অনুধাবন করতে পারে না। এর অর্থ আল্লাহর নূর এরূপ যে, যখন তা কোনো বস্তুর উপর গিয়ে পতিত হয় বা প্রকাশ পায়, তখন সে বস্তু নূরের দীপ্তি বা তাপ অনুধাবন করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে বলে উঠল মহিমাময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই ফিরে আসলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।

মুজাহিদ (রা) বলেছেন, আল্লাহর এ বাণী (হে মূসা!) বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করো। এটা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে। তখন মূসা (আ) পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন যে, পাহাড় আল্লাহর নূর ধারণ করতে সক্ষম হলো না; বরং নূরের তাজাল্লীতে পাহাড় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। মূসা (আ) এ দৃশ্য দেখে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে ইমাম আহমদ (রহ) ও তিরমিযী (রহ)-এর বর্ণিত হাদীসখানা উল্লেখ করেছি। যেটি ইবনে জারীর (রহ) ও হাকিম (রা) বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনে জারীর (রা) এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন— যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে নূর প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণবিচূর্ণ করল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

অতঃপর তিনি ﷺ কনিষ্ঠ আঙ্গুলের উপরের জোড়ায় বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে বললেন, এভাবে মুহূর্তের মধ্যে পাহাড় উড়ে গিয়েছিল। সুদ্দী ও ইকরামা (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তার নূরের তাজাল্লী শুধু কনিষ্ঠ আঙ্গুলি পরিমাণ পাহাড়ের উপর প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ মাটি হয়ে গিয়েছিল এবং মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন,

মূসা (আ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন এর অর্থ তিনি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম কথাটিই বিশুদ্ধ। কেননা পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো, তখন সে বলল, (হে প্রতিপালক!) মহিমাময় আপনি। অর্থাৎ মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাময়ের কারণে আপনাকে কেউ দেখতে পারে না। সুতরাং আমি অনুতপ্ত হয়ে (তওবা করে) আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম যে, আর কখনো আপনার দর্শনের জন্য আপনার কাছে আকাঙ্ক্ষা করব না। আর আমিই বিশ্বাসকারীদের মধ্যে প্রথম যে কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাকে দেখতে পারে না। যদি কেউ দেখে সাথে সাথে সে মারা যাবে। আর কোনো শুষ্ক বস্তুও আপনাকে দেখতে সক্ষম নয়। যদি দেখে, তবে তা গলে পানি হয়ে যাবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের মধ্যে কারো উপর আমাকে শ্রেষ্ঠতম বলে প্রাধান্য দিও না। কিয়ামতের দিনে সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাব। তখন আমি দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশের একটি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না যে, তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন, না তূর পাহাড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার কারণে (পরকালের বেহুঁশী থেকে) রক্ষা পেয়েছেন (বোখারী, মুসলিম)। উল্লিখিত হাদীসের শব্দসমূহ বোখারী শরীফের। এ হাদীসের শুরুতে এক ইয়াহুদীর ঘটনা বর্ণিত আছে। সে (ইয়াহুদী) একজন আনসারী সাহাবীকে বলল, খোদার কসম! মূসা (আ) গোটা মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আনসারী লোকটি (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করে) তাকে একটি চড় মারলেন। এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমাকে নবীদের কারো উপর প্রাধান্য দিও না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুরূপই বলেছিলেন। এবং তিনি এ কথা বলেছিলেন যে, আমাকে মূসা (আ)-এর উপর প্রাধান্য দিও না। অতঃপর উল্লিখিত হাদীসটি পুরোপুরি বর্ণনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ কথাটি ছিল তার বিনয় ও নম্রতার জন্যে। আর নবীদের মধ্যে কাউকে পক্ষপাতিত্ব ও ক্রোধের কারণে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য না দেয়া।

এ হাদীসের অর্থ এটাও হতে পারে যে, নবীদেরকে কারো উপর কাউকে প্রাধান্য দেয়া এটা আল্লাহ তা'আলার বিষয়। এটা তোমাদের বিষয় নয়। (অর্থাৎ তোমরা প্রাধান্য দিতে পার না। সুতরাং তোমরা এরূপ কথা (কখনই) বলো না। কারণ, এরকম প্রাধান্য দেয়া নিজ অভিমত ও চিন্তা দ্বারা দেয়া যায় না; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল।

কয়েকজন মুফাসসির বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। যখন তাকে তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে, তখন তার প্রথম কথা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। কারণ, প্রথম বর্ণনাটি যে, তিনি ﷺ বিনয় ও নম্রতার কারণে এ কথাটি বলেছিলেন, সে হাদীসটি হয়তো আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) খায়বরের যুদ্ধের বছরে অর্থাৎ শেষের দিকে হিজরত করেছিলেন। আর এ কথাটি অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বরের যুদ্ধের পর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা অবগত আছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা মানুষ এবং সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা, তোমরাই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। আর উম্মতের এ সম্মান ও মর্যাদা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কারণেই হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে মুতাওয়াতির (অনুক্রম)সহ হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিনে আদম সন্তানের সর্দার হব। এতে আমার কোনো গর্ব নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাত্র তার জন্য নির্ধারিত মাকামে মাহমূদের বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেন। যে ব্যাপারে পূর্বের ও পরের সকলেই ঈর্ষা করবেন। নবী রাসূলগণও এ মাকাম উচ্চতর অবস্থান সম্পর্কে অবগত থাকবেন। এমনকি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন পয়গম্বর নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-ও এ মাকাম পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাব। তখন দেখব যে, মূসা (আ) আরশের ছায়ায় অবস্থান করছেন। আমার জানা নেই যে, তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান

ফিরে পেয়েছেন, না তূর পাহাড়ে সংজ্ঞাহীন হওয়ার কারণে তার প্রতিদানে পরকালের বেহুঁশী থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টির ফয়সালার জন্যে তার নূর প্রকাশ করবেন, তখন সমস্ত মানুষ নূরের তাপ অনুভব করার পূর্বেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী জনাব হযরত মোস্তফা ﷺ।

তিনি হযরত মূসা (আ)-কে আরশের একটি স্তম্ভ ধরা অবস্থায় দাঁড়ানো দেখতে পাবেন। এরপর সত্যবাদী ও সত্যায়নকারী রাসূল ﷺ বললেন, আমার জানা নেই, তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন অর্থাৎ তিনি অল্পক্ষণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন, না পৃথিবীতে (তূর পাহাড়ে) সংজ্ঞাহীন হওয়ার কারণে তার প্রতিদানে তিনি সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

এদিক থেকে হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা যে অনেক উর্ধ্বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কারণে তিনি যে নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা প্রমাণ করে না। এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে বর্ণনা করেছেন। কেননা, যখন ইয়াহুদী লোকটি বলেছিল যে, আল্লাহর শপথ! মূসা (আ) গোটা মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এতে মুসলমান আনসারী লোকটি তার মুখমণ্ডলে চড় মারেন। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হলেন।

ইয়াহুদী লোকটিকে চড় মারতে হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে মনে করে সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হযরত মূসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মূসা! আমি তোমাকে আমার বাক্যালাপ ও রিসালাত দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"

আল্লাহ তা'আলার এ পবিত্র বাণীর ব্যাখ্যা হলো এই যে, (হে মূসা!) তোমার সময়ের সমস্ত মানুষের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। এখানে পূর্বের ও পরের মানুষের মধ্যে তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়নি। (অর্থাৎ তোমার সময়কালে যে সব মানুষ উপস্থিত, তাদের মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি) কারণ, তার পূর্বে ইবরাহীম (আ) মূসা (আ) থেকে উত্তম ছিলেন। যা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনায় পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তার পরে হুজুরে আকরাম ﷺ তো সব মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সেরা মানুষ। যা মিরাজের রাতে সকল নবী রাসূলের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনুরূপভাবে তার বাণীও সমস্ত মানুষের চেয়ে সর্ব সুন্দর ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ﷺ বলেছেন, 'আমি অতি শীঘ্র এমন এক উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত হব, যাতে সকল মানুষ আমার প্রতি ঈর্ষা করবে। এমনকি ইবরাহীম (আ) ও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে মূসা!) আমি যা কিছু তোমাকে দান করেছি, তা দৃঢ় ভাবে ধর।

তার চেয়ে বেশি প্রার্থনা করো না এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। অর্থাৎ রিসালাত দিয়ে ও আমার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ দিয়ে তোমাকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছি, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট মনে করো। এর চেয়ে বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না; বরং এজন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তার জন্যে ফলকে সব বিষয়ে উপদেশ এবং সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। এ ফলকটি ছিল উত্তম ও মূল্যবান খাঁটি জাওহারের তৈরি। সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ বাণী এবং হালাল হারাম (বৈধ-অবৈধ) সম্পর্কিত আলোচনা বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলা তার নিজ কুদরতী হাতে লিখেছিলেন। তাওরাতে সব ধরনের অশ্লীল কাজের বিবরণ ছিল। এ কিতাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, এ (নির্দেশ)গুলো দৃঢ়ভাবে (দৃঢ় সংকল্পের সাথে ও নেক উদ্দেশ্যে) ধর। আর তোমার জাতিকে নির্দেশ দাও যে, তারা যেন এগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করে। অর্থাৎ উত্তম নিয়মে এগুলো যেন রাখে এবং উত্তম বস্তুর উপর লিখে, আর আমি অতি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান দেখাব। অর্থাৎ যারা আমার অনুগত হবে না, আমার বিধানের বিরোধিতা করবে এবং আমার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, অতি শীঘ্রই আমি তাদের পরিণাম আপনাকে দেখাব।

তারপর আল্লাহ বলেন— পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব। তারা আমার প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে সেটাকে তারা সঠিক পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফিল। যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করবে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। –সূরা আরাফ : ১৪৬-১৪৭

অর্থাৎ পৃথিবীতে যারা গর্ব করে বেড়ায় এ ব অবাধ্যদেরকে আমার আয়াতের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য ইত্যাদির তাওফীক দেব না। ওরা অলৌকিক ঘটনা, নিদর্শনাবলী ও মুজেযাসমূহ দেখেও আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করে না। ওরা যখন আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তখন এর শাস্তিস্বরূপ আমি তাদেরকে সৎ ও সঠিক পথ থেকে সরিয়ে রেখেছি। ওদেরকে সত্য পথ থেকে এবং কিতাবের সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য বুঝা থেকে গাফিল রেখেছি। এ সবকিছুই ওদের মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে।

মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে তার জাতির অবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বলেন— মূসার জাতি তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলঙ্কার দ্বারা গড়ল এক গোবৎস, এক গো-আকৃতি, যা 'হাম্বা' রব করতো, তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা সেটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালিম। তারা যখন অনুতপ্ত হলো ও দেখল যে, তারা বিপদগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, আমাদের রব যদি আমাদের উপর দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা ত্বরান্বিত করলে? এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিলে, আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলেন। হারুন বলল, হে আমার ভ্রাতা! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এরূপ করো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না। মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল করো। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যারা গো-বৎসকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের রবের লাঞ্ছনা ও ক্রোধের আপতিত হবেই। আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি। যারা অসৎ কাজ করে, তার পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য তাতে লিখা ছিল পথনির্দেশ ও রহমত। –সূরা আরাফ : ১৪৮-১৫৪

সূরা ত্বা-হায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মূসা! তোমার জাতিকে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কিসে? সে বলল, এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার রব! আমি তাড়াহুড়া করে তোমার নিকট আসলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এজন্যে। তিনি বললেন, আমি তো তোমার জাতিকে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে গোমরা করেছে। তারপর মূসা তার জাতির নিকট ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বলল, হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? তারা বলল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলঙ্কারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। তারপর সে তাদের জন্য বানাল এক গো-বৎস, এক আকৃতি, যা হাম্বা রব করতো। তারা বলল, এটা তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে! তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, সেটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? হারুন তাদেরকে পূর্বে বলেছিল, হে আমার জাতি! এটা

(গো-বৎস) দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের রব তো দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। তারা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজা হতে কিছুতেই বিরত থাকব না। মূসা বলল, হে হারুন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল, আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারুন বলল, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধর না। আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নি। মূসা বলল, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কী? সে বলল, আমি দেখেছিলাম যা তারা দেখে নি। অতঃপর আমি সেই দূতের (জিবরাঈল (আ)-এর) পদচিহ্ন হতে এক মুষ্টি (ধুলা) নিয়েছিলাম এবং আমি তা নিক্ষেপ করেছিলাম, আমার মন আমার জন্য যন্ত্রণা দিয়েছিল এরূপ করতে। মূসা বলল, দূর হও! তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে, তুমি বলবে, 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রইল এক নির্দিষ্ট সময়। তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য করো, যার পূজায় তুমি রত ছিলে, আমরা সেটা জ্বালিয়ে দেবই। তারপর সেটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। (তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহর, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই।। তার জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত। -সূরা ত্বা-হা : ৮৩-৯৮

হযরত মূসা (আ) নিজ রবের কাছে (তূর পাহাড়ে) চলে যাবার পরে তার জাতির লোকদের কি অবস্থা হয়েছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, হযরত মূসা (আ) নির্ধারিত সময়ে নিজ রবের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে চলে গেলেন এবং তূর পাহাড়ে বসে নিজ রবের সাথে কথা বলা শুরু করেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আল্লাহ মূসা (আ)-এর সব প্রশ্নের জবাব দিলেন। মূসা (আ)-এর অনুপস্থিতিতে সামিরী নামক বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈল থেকে সব স্বর্ণ-অলঙ্কারাদি নিয়ে নিল, যা তারা কিবতীদের থেকে ধার স্বরূপ এনেছিল। এরপর সামিরী সেগুলো দ্বারা একটি বাছুর গড়ল এবং এক মুষ্টি (ধুলো) মাটি সেটির মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করল। এ (ধুলো) মাটি সামিরী হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরআউনকে নীল দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরেছিলেন, তখন সামিরী হযরত জিবরাঈল (আ)-কে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে এ মাটি সংগ্রহ করে রেখেছিল। যা হোক সামিরী এ মাটি নিজ হাতে বাছুরটির মুখের মধ্যে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে বাছুরটি জীবন্ত বাছুরের মতো ডাকতে শুরু করল। বর্ণিত আছে যে, সেটি রক্ত মাংসের জীবন্ত একটি বাছুরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল এবং সেটির মধ্যে প্রাণসংযুক্ত হলো। এটি কাতাদাহ (রা) প্রমুখের বর্ণনা। এক বর্ণনা এভাবেও আছে যে, যখন সেটির পিছন থেকে (বায়ু) প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হতো তখন সেটি থেকে গরুর মতো হাম্বা আওয়াজ বেরিয়ে আসতো। যখন সেটির থেকে লম্বা আওয়াজ বেরিয়ে আসা শুরু হলো তখন বনী ইসরাঈল আনন্দিত হলো এবং সেটির চার পাশে এসে সমবেত হলো। অতঃপর তারা বলল, এটা তোমাদের মা'বূদ ও মূসারও মা'বূদ। কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছিল। অর্থাৎ মূসা তার খোদাকে আমাদের কাছে রেখে ভুলে চলে গেছে। সেখানে গিয়ে তিনি তার খোদাকে তালাশ করছে। অথচ তার খোদা তো আমাদের কাছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ও অনর্থক কথা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। তার পবিত্র নাম ও শব্দাবলী পবিত্র এবং তার অনুগ্রহ ও দান অশেষ।

আল্লাহ তা'আলা তাদের অনর্থক কথাগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের উপাস্যকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের সে উপাস্য হলো, এক প্রকার জন্তু বা অভিশপ্ত শয়তান।

আল্লাহ বলেন, তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে, এটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতেও ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন, তারা কি দেখে না যে, সেটি (বাছুরটি) তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদেরকে পথনির্দেশ করতে পারে না। আর এরা ছিল অন্যায়কারী।

আল্লাহ বলেন, (সামিরী যে বাছুরটি গড়েছে) এটি তো জন্তু। যেটি কোনো কথা বলতে পারে না এবং কোনো প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে না। আর এটি অপকার বা উপকার করারও ক্ষমতা রাখে না। আর এ বাছুরটি সঠিক পথনির্দেশও দিতে সক্ষম নয়। অথচ তারা এ নির্জীব বস্তুকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তারা অত্যাচারী। তারা নিজেরাও জানে যে, এ ধ্বংসশীল বস্তু, যা আমরা নিজ হাতে তৈরি করেছি সেটা কোনো দিন মাবুদ (উপাস্য) হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— তারা যখন অনুতপ্ত হলো ও দেখল যে, তারা বিপদগামী হয়ে গিয়েছে, তখন তারা বলল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই। –সূরা আরাফ : ১৪৯

পথভ্রষ্ট জাতির কাছে মূসা (আ)-এর প্রত্যাবর্তন

হযরত মূসা (আ) নিজ জাতির কাছে ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, তারা বাছুর পূজা করতে আরম্ভ করেছে। মূসা (আ)-এর সাথে কয়েকখানা ফলক ছিল। যেগুলোতে তাওরাত লিখা ছিল। তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে সে ফলকগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। আর এক বর্ণনা মতে, সে ফলকগুলো এমন জোরে নিক্ষেপ করেছিলেন যে, সেগুলো ভেঙে গিয়েছিল।

আহলে কিতাবগণ এ বর্ণনাটি সঠিক বলে বর্ণনা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে পুনরায় ফলক প্রদান করেন। কিন্তু কুরআন মাজীদে ফলক ভেঙে যাওয়ার কথা এবং পুনরায় মূসা (আ)-কে ফলক প্রদানের কথা উল্লেখ নেই। শুধু এতটুকু আছে যে, মূসা (আ) তার জাতির লোকদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত দেখে রাগান্বিত হলেন এবং ফলকগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। আহলে কিতাবগণ এ কথাও বলে যে, ফলক ছিল মাত্র দুটি। অথচ কুরআন মাজীদের বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, মূসা (আ) কয়েকখানা ফলক নিয়ে এসেছিলেন। হযরত মূসা (আ) সর্বপ্রথমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতার কথা অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি এতখানি রাগান্বিত হননি। কিন্তু যখন তিনি সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে স্বচক্ষে তাদের গোমরাহী অবলোকন করলেন, তখন তিনি মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন এবং রাগান্বিত হয়ে ফলকগুলো জমিনে ফেলে দিলেন। এ হাদীসখানা ইবনে হিব্বান ও ইমাম আহমদ (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তারপর হযরত মূসা (আ) নিজ জাতির লোকদেরকে তাদের গোমরাহী কার্য-কলাপের জন্য খুব ধমকালেন। তারা এ ব্যাপারে ওজর পেশ করল। কিন্তু তাদের সে ওজর ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট। তারা বলল, আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের স্বর্ণালঙ্কারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে।

বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা স্বর্ণ-অলঙ্কারাদি নিজেদের জন্য গ্রহণ করাকে পাপের কাজ বলে মনে করেছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ স্বর্ণ-অলঙ্কারসমূহ তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলেন। (তারা কতখানি নির্বোধ যে) আল্লাহ যা তাদের জন্য হালাল করেছেন, সেটা তারা অন্যায় কাজ বলে মনে করল। অথচ তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে বাছুর পূজাকে তারা অন্যায় কাজ বলে মনে করল না। এ বাছুরটিকে তারা এক আল্লাহর সাথে শরীক করল। যা ছিল মহা অপরাধ ও পাপের কাজ। অথচ এটাকে তারা কোনো অপরাধ বলেই মনে করছিল না। এ জন্যেই বলা হয়, গুনাহ করে ওজর পেশ করা নিকৃষ্টতম পাপ। অতঃপর মূসা (আ) তার ভাই হারুন (আ)-কে সম্বোধন করে বললেন, হে হারুন! যখন তুমি তাদেরকে দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা থেকে? অর্থাৎ যখন তুমি তাদেরকে ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হতে দেখলে, তখন তুমি আমার কাছে এসে তাদের এ কার্যক্রম সম্পর্কে আমাকে কেন অবহিত করলে না? তখন হারুন (আ) বললেন, আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, আপনি বলবেন তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। তখন হযরত মূসা (আ) দো'আ করলেন, হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করুন। আপনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

হযরত হারুন (আ) বনী ইসরাঈলকে এ জঘন্য অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাদেরকে ধমক দিয়েছিলেন ও সতর্কও করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হারুন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার জাতি! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বাছুরটিকে তোমাদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ করেছেন যে, সেটি থেকে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ বের হয়ে আসার কারণে তোমরা সেটাকে মা'বূদ (উপাস্য)-রূপে গ্রহণ করো। এরপর হযরত হারুন (আ) বলেন, নিশ্চয়ই তোমার রব দয়াময়। সুতরাং আমার অনুসরণ করো ও আমার নির্দেশ মান। অর্থাৎ তোমার রব আল্লাহ তো দয়াময়। এ বাছুর কখনই তোমাদের উপাস্য নয়। সুতরাং আমি যা বলি তা মান্য করো ও আমার অনুকরণ করো। কিন্তু তারা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এ পূজা থেকে কোনোভাবেই বিরত থাকব না।

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত হারুন (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, হারুন (আ) বনী ইসরাঈলকে বাছুর পূজা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন এবং ধমক দিয়েছিলেন ও সতর্কও করে ছিলেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। কিন্তু তারা তার কথা মানেনি ও তার অনুকরণ করেনি। অতঃপর হযরত মূসা (আ) সামিরীর দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, হে সামিরী তোমার উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করেছে? সে বলল, আমি এমন কিছু দেখেছি যা অন্য আর কেউ দেখেনি। অর্থাৎ আমি জিবরাইল (আ)-কে ঘোড়ার উপর সাওয়ার অবস্থায় দেখেছিলাম। অতঃপর আমি জিবরাঈলের ঘোড়ার পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি (ধুলো) মাটি সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। কেউ বলেছেন, সামিরী জিবরাঈল (আ)-কে এমন অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তার ঘোড়াটির পা যেখানেই পড়ত সে স্থানটি সাথে সাথে সবুজ-শ্যামল হয়ে যেত। আর সামিরী সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে রেখেছিল। অতঃপর যখন সে (সামিরী) স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত বাছুরের মধ্যে সেই সংগৃহীত মাটি নিক্ষেপ করল, তখন, সাথে সাথে বাছুরটির থেকে হাম্বা হাম্বা আওয়াজ বের হয়ে আসতে লাগল। একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। এ কারণে সে বলেছিল। আমি একটা বাছুরের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য মন্ত্রণা দিয়েছিল এরূপ করা।

মূসা (আ) বললেন, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য শাস্তি এটাই রইল যে, তুমি বলবে যে, আমাকে স্পর্শ করো না।

হযরত মূসা (আ) সামিরীকে অভিশাপ করেছিলেন যে, তুমি কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত করেছিলেন যে, কেউ যদি তাকে স্পর্শ করে, তবে সেও সেই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। এটা ছিল তার জন্যে পার্থিব শাস্তি। পরকালের শাস্তি সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমার জন্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ (শাস্তি)। তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না। হযরত মূসা (আ) সামিরীকে বললেন, যে মা'বূদের পূজায় তুমি লিপ্ত ছিলে, আমরা সেটাকে জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর ওটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সাগরে নিক্ষিপ্ত করবই। এরপর হযরত মূসা (আ) সে বাছুরটিকে জ্বালিয়ে দেলেন। কিভাবে জ্বালিয়েছেন এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। এক বর্ণনা মতে, আগুন দ্বারা জ্বালিয়েছিলেন। কাতাদাহ (রা) প্রমুখের এ অভিমত। হযরত আলী (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, অতিশয় শীতল বস্তু দ্বারা সেটিকে শেষ করে দিয়েছিলেন। আহলে কিতাবগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন। তারপর সেটাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে বনী ইসরাঈলকে সে সমুদ্রের পানি পান করার জন্যে আদেশ দেয়া হলো। তারা সকলে নির্দেশানুযায়ী পানি পান করল। তাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজারী ছিল, তাদের গলায় বাছুরের ছাই আটকে গেল। আর এক বর্ণনা মতে তাদের চেহারার বর্ণ হলদে হয়ে গেল। অতঃপর হযরত মূসা (আ) পুনরায় বনী ইসরাঈলকে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্যে আহ্বান করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের ইলাহ (মাবূদ) তো কেবল আল্লাহই যিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ নেই। তার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন— যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই। আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।
–সূরা আরাফ : ১৫২

উক্ত আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক বিদয়াত ও শিরক সৃষ্টিকারীরা কিয়ামতের কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে বলেন, এ গুনাহগার যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় (তওবা করে), তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের তওবা কবুল করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন— যারা অসৎ কর্ম করে, পরে তারা তওবা করলে ও ঈমান আনলে, তোমার রব তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

অর্থাৎ প্রতিটি গুনাহের ক্ষমা ঈমান ও নেক আমল দ্বারা হয়ে যাবে। কিন্তু বাছুর পূজার জঘন্য পাপ ক্ষমা করার জন্যে নিজেদেরকে কুরবানী করতে হবে। (অর্থাৎ স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী স্মরণ করুন) যখন মূসা আপন জাতির লোককে বলল, হে আমার জাতি! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই উত্তম। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈলের এ মহা অন্যায় ও পাপের ক্ষমার জন্য নিজেরা একে অপরকে হত্যা করা সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ পদ্ধতি এরূপ হয়েছিল যে, যারা এ গুনাহ (বাছুর পূজা) থেকে পবিত্র ছিল তারা তলোয়ার হাতে নিল এবং পাপীরা তাদের মাথা নিচু করে দু'জানু হয়ে বসে গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে মেঘে এমন আচ্ছন্ন করে দিলেন যে, অতি নিকটে বসা নিজের সঙ্গীকেও দেখতে পাচ্ছিল না। নিজ বংশের ও আত্মীয়দের একজন অন্যজনকে চিনতে পারছিল না। এরপর পবিত্র লোকেরা (অর্থাৎ যারা বাছুর পূজা করে নি) পাপীদের গর্দানের উপর তলোয়ার মারতে শুরু করল এবং ধারাবাহিকভাবে হত্যা করতে লাগল। সেদিন ভোর বেলা একই সময় সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল নিজেদের গুনাহের জন্যে অনুতপ্ত হলে নিজেদের জীবনকে কুরবানী করে দিয়েছে। অর্থাৎ সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল নিহত হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন সে তাওরাতের ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য ওখানে লিখিত ছিল পথনির্দেশ ও রহমত। –সূরা আরাফ : ১৫৪

উক্ত ফলকে লিখিত ছিল উপদেশ ও রহমত। আল্লাহর তা'আলার বাণী দলিল হিসেবে পেশ করে কোনো কোনো মুফাসসির বলেন যে, সে (ফলক)-গুলো ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এ যুক্তি ও প্রমাণ সঠিক নয়। এ বর্ণনাতে এমন কোন কথা বলা নেই যাতে ফলক ভেঙে যাওয়া প্রমাণিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ফিতনা সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হবার পর বাছুর পূজা করেছিল। এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত কথা। কারণ, তারা যখন সমুদ্র পার হলো তখন বলেছিল, হে মূসা! তাদের যেমন ইলাহ (মাবুদ) আছে, আমাদের জন্যেও তেমন এক মাবুদ গড়ে দাও। অনুরূপভাবে আহলে কিতাবগণও বলেন যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় প্রবেশের পূর্বে বাছুর পূজা করেছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস প্রবেশের ঘটনাটি ছিল এই যে, যখন বাছুর পূজারীদেরকে হত্যা করা হলো এবং এ ঘটনায় তিন হাজার বনী ইসরাঈল নিহত হয়ে গেল, তখন হযরত মূসা (আ) তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা কামনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ শর্তে ক্ষমা করে দিলেন যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের ভূমিতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— মূসা স্বীয় জাতি হতে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হলো, তখন মূসা (আ) বলল, হে আমার রব! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যদ্বারা তুমি যাকে ইচ্ছা

হেদায়াত দান কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো ও আমাদের প্রতি দয়া করো এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যেই তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত করো দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্দিষ্ট করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার আলামতে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়। সে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎ কাজে বাধা দেয়। সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হলাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর (কুরআন) তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুকরণ করে তারাই সফলকাম। –সূরা আরাফ : ১৫৫-১৫৭

সুদ্দী (রহ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, এ সত্তরজন লোক ছিলেন বনী ইসরাঈলের আলেমগণ। তাদের সাথে ছিলেন হযরত মূসা (আ), হযরত হারুন (আ), ইউশা ও নাদব (আ)। তারা সবাই হযরত মূসা (আ)-এর সাথে তূর পাহাড়ে এজন্যে গিয়েছিলেন যে, বনী ইসরাঈল বাছুর পূজা করে যে গুনাহ করেছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কাছে ওজর পেশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে আসবে। তাদেরকে প্রথমে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করে সুগন্ধি ব্যবহার করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। তারপর এসব উলামায়ে কেরাম যখন তূর পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাদের উপর মেঘ এসে আচ্ছন্ন করে ফেলল ও মেঘের মধ্য হতে নূরের সুউচ্চ স্তম্ভ চমকাতে শুরু করল। এরপর মূসা (আ) একা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন।

বনী ইসরাঈল বলেছেন যে, তারা আল্লাহর বাণী নিজ কানে শুনেছিলেন। একদল মুফাসসির তাদের এ কথাকে সমর্থন করেছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীকে এর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন— যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে, তারপর তারা তা ইচ্ছে করেই বিকৃত করে। –সূরা বাকারা : ৭৫

কিন্তু এ দলীল এ বিষয়ের সাথেই যে সম্পৃক্ত তা নয়। আর এ বাণী দ্বারা যে এ অর্থই গ্রহণ করতে হবে সেটাও জরুরী নয়। কারণ, অনুরূপভাবে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। –সূরা তওবা : আয়াত ৬

এ আয়াতে কাফেরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন সে আশ্রয় কামনা করবে, তখন তাকে আশ্রয় দিবেন, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পারে। এরপর যেকোনো ফায়সালা করুন। এ আয়াতেও আল্লাহর বাণী তাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর কথা বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবেই বনী ইসরাঈলের সেই ৭০ জন লোকও মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহর বাণী শুনেছিল।

এখানেই শেষ নয়; বরং বনী ইসরাঈল এ ধারণাও প্রকাশ করে যে, সেই ৭০ জন আলেম আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎও লাভ করেছিলেন। এটা তাদের স্পষ্ট ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার দর্শনের প্রার্থনা করেছিলেন, তখন বিদ্যুৎ কম্পন বজ্র ও হঠাৎ শাস্তি এসে তাদেরকে নিপাত করে দিয়েছিল। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— মনে করে দেখ! যখন তোমরা মূসাকে বলেছিলে, আল্লাহকে প্রকাশ্যে (তোমার সাথে কথা বলতে) না দেখা পর্যন্ত তোমার কথা আমরা কোনভাবেই বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা দেখতে পেলে যে, এক কঠিন আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলল। তোমরা মরে পড়েছিলে, অতঃপর আমি আবার তোমাদেরকে বাঁচিয়ে তুললাম, যাতে (এ অনুগ্রহের পর) তোমরা কৃতজ্ঞ হও। –সূরা বাকারা : ৫৫-৫৬

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, হযরত মূসা (আ) নিজে বনী ইসরাঈল থেকে এ ৭০ জন লোক মনোনয়ন করেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলার দিকে চল এবং তোমাদের জাতির অন্যান্য লোকদের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আর তোমরা প্রথমে রোযা রাখ এবং তোমাদের

কাপড়-চোপড় ও শরীর পবিত্র রাখ। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাদের সকলকে নিয়ে স্বীয় রবের দর্শনের নির্ধারিত সময় তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। এ তূর পাহাড়ে আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেউই আসতে পারে না। সুতরাং হযরত মূসা (আ) তার মনোনীত ৭০ জন লোকের সেখানে আসার জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে তারাও আল্লাহর কথা শুনতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পেয়ে তারাও মূসা (আ)-এর সাথে সেখানে গেলেন। হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ের নিকট এসে পৌঁছলেন তখন মেঘ এসে গোটা পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অতঃপর মূসা (আ) মেঘের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং অন্যান্য লোকদেরকে পাহাড়ের নিকট আসার জন্য বললেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সাথে যখন কথা বলতেন, তখন তার পেশানীতে নূর চমকাতে থাকতো। এ সময় কোনো মানুষ তার চেহারার দিকে তাকাতে সক্ষমই হতো না। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর সামনে পর্দা পড়ে গেল। তিনি লোকদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলেন। গোত্রের লোকেরা মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ল এবং কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সকলেই সিজদাবনত হয়ে পড়লেন। এ সময় তারা আল্লাহ ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার কথাবার্তা শুনতে পেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিচ্ছেন যে, এটা করো এটা করো না। আলাপ শেষে হযরত মূসা (আ) থেকে মেঘমালা দূর হয়ে গেল। তারপর মূসা (আ) স্বীয় জাতির লোকদের প্রতি মনোনিবেশ হলেন। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, হে মূসা! আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করি না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে দেখতে পাই। (এ কথা বলার সাথে সাথেই) তাদেরকে বজ্র পাকড়াও করল এবং তাদের প্রাণ দেহ থেকে বের হয়ে গেলো। তারা সবাই মারা গেল। অতঃপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন, হে আমার রব! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য তুমি আমাদেরকে কি নিপাত করবে। অর্থাৎ তাদের জন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যারা বাছুর পূজা করেছে। কারণ তাদের এ (অন্যায়) কাজের সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইবনে জুরায়েয (র) বলেছেন, তূর পাহাড়ে আগত ৭০ জনকে এজন্যে ধ্বংস করা হয়েছিল যে, তারা বাছুর পূজা থেকে লোকদেরকে বারণ করেছিল না।

হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর দরবারে আরয করলেন যে, (আপনার ধ্বংস করাটা) এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা। এর অর্থ হচ্ছে, আপনার পক্ষ থেকে এটা ছিল আমাদের প্রতি আপনার পরীক্ষা। ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা), আবুল আলীয়া, রাবীয়া ইবনে আনাস (রা) প্রমুখগণেরও এ অভিমত যে, তিনিই (আল্লাহ) তাদেরকে বাছুর গড়ার এবং সেটা পূজা করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। যাতে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন। যেমন, হযরত হারুন (আ) ও তার নিজ জাতিকে এ কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, হারুন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার জাতি! বাছুর পূজা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায়ই ফেলা হয়েছে।

এ কারণেই মূসা (আ) বলেছিলেন, হে প্রভু! আপনিই এ পরীক্ষা দ্বারা যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করুন ও আমাদের প্রতি দয়া করুন এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্যে নির্ধারিত করুন দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল। আমরা তো আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে তওবা করেছি ও পাপ কাজ থেকে ফিরে গিয়েছি এবং সাবধান হয়েছি। ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রহ), সাঈদ ইবনে জোবায়ের, আব্দুল আলীয়া, ইবরাহীম তায়মী, যিহাক, সুদ্দী, কাতাদাহ (রা) প্রমুখেরও এ অভিমত। আভিধানের দৃষ্টিতেও এরূপ অর্থ। এর উত্তরে আল্লাহ বলেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার দায়; তাতো প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত। অর্থাৎ আমি যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তিতে পাকড়াও করব। আল্লাহর বাণী আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুতে বিস্তৃত। এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির শেষে একখানা কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। যা তার নিজের কাছে (পবিত্র) আরশে রেখে দেন। তাতে লেখা আছে, নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গযব (ক্রোধ)-এর উপর বিজয়ী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সুতরাং এটা আমি অতি শীঘ্রই তাদের জন্য নির্দিষ্ট করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, যাকাত দিবে ও আমার উপদেশ বিশ্বাস করবে। অর্থাৎ যারা উল্লিখিত গুণের অধিকারী হবে তাদের জন্য সুনিশ্চিত আমার রহমত নির্ধারণ করব। আর যারা বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করবে। কুরআন মাজীদের এ বাণীতে বণী ইসরাঈলের সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনাটা শর্ত করে দিয়েছেন। যা দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীয়া ﷺ ও শেষ নবী জনাব হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর মর্যাদা ও সম্মান যে হযরত মূসা (আ)-এর উপরে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ পেয়েছে। আর এ আদেশ ও শর্ত সে গোপন কথার অন্তর্ভুক্ত যে কথোপকথন হযরত মূসা (আ) ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে (তূর পাহাড়ে) হয়েছিল। আমি এ আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার তাফসীর গ্রন্থে করেছি।

মূসা (আ)-এর আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন

১. হযরত কাতাদাহ (রা) বলেছেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেন, হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে দেখতে পেয়েছি যে, এমন এক উম্মতের আগমন ঘটবে, যারা হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত। যাদের আবির্ভাব হবে মানুষের কল্যাণের জন্যে তারা মানুষকে ন্যায় কাজের আদেশ দেবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলবেন। হে আমার রব! এ উম্মতকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

২. হযরত মূসা (আ) পুনরায় আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে পেয়েছি যে, এমন এক উম্মত হবে, সৃষ্টির মধ্যে যাদের আগমন ঘটবে সর্বশেষে। কিন্তু তারা জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে। হে আমার রব! এদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

৩. পুনরায় হযরত মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমি তো (তাওরাতের) ফলকে এমন এক উম্মতের কথা পেয়েছি, যাদের কিতাব (কুরআন) তাদের সীনায় সংরক্ষিত থাকবে এবং তা (না দেখে) পাঠ করবেন। আর আগের উম্মতেরা এদের নিজ নিজ কিতাব দেখে পড়তে পারতেন। কিন্তু সে কিতাব তাদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হতো, তখন তাদের কিছুই মনে থাকত না এবং তারা কিছুই বলতে পারত না। আল্লাহ তা'আলা সে উম্মতগণকে এতখানি হেফজ (মুখস্থ করার) শক্তি দান করবেন যে, যা অন্য কোনো উম্মত লাভ করবে না। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! এ উম্মতকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা জবাবে বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

৪. হযরত মূসা (আ) আবার আরয করলেন হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে এমন এক কিতাবের কথা পেয়েছি যে, যারা প্রথম ও শেষ কিতাবের উপর ঈমান আনবে। অর্থাৎ সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনবে। তারা পথভ্রষ্ট ও বিদআতপন্থীদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা মিথ্যাবাদী (দাজ্জাল)-এর সাথে লড়াই করবে। আপনি এ উম্মতগণকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

৫. পুনরায় মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে এমন এক উম্মতের কথা লেখা পেয়েছি যে, তারা নিজেদের দানকৃত সদকা ও যাকাত নিজেরা খাবে, কিন্তু তাদেরকে এজন্য পুরস্কারও দেয়া হবে। আর আগের উম্মতগণ আল্লাহর রাস্তায় যে সব দান ও কুরবানী করতেন, তা যদি আল্লাহর দরবারে কবুল হতো তবে আকাশ থেকে আগুন এসে তা (দানকৃত বস্তু) পুড়ে ভস্ম করে দিয়ে যেত। আর যদি কবুল না হতো তবে আগুন সেগুলো জ্বালিয়ে দিত না। সেগুলো পশু-পাখীরা খেয়ে যেত। আর এ উম্মতের ধনী লোকদের থেকে সদকা নিয়ে দরিদ্র অসহায় লোকদেরকে দেয়া হবে। হে আমার রব! এ উম্মতকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

৬. মূসা (আ) পুনরায় আরয করলেন, হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে এমন এক উম্মতের কথা পেয়েছি, যারা কোনো নেক কাজের নিয়ত করবে, অথচ যথা সময়ে আমল করতে সক্ষম হবে না, তাদেরকে এ (নেক নিয়তের) বিনিময়ে দশ নেকী থেকে সাতশ' পর্যন্ত নেকী দেয়া হবে। হে আমার রব! এদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

৭. পুনরায় হযরত মূসা (আ) আবেদন করলেন, হে আমার রব! আমি (তাওরাতের) ফলকে এমন এক উম্মতের কথা পেয়েছি, যারা কিয়ামতের দিনে সুপারিশ করবে এবং যাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। আপনি এদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তো আহমদ ﷺ-এর উম্মত।

হযরত কাতাদাহ (রহ) বলেছেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতঃপর মূসা (আ) ফলকগুলো নিক্ষেপ করলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমাকেও আহমদের উম্মতের মধ্যে শামিল করুন।

অনেক মুফাসসিরই হযরত মূসা (আ)-এর এরূপ মুনাজাতের কথা বর্ণনা করেছেন। আরো এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যার কোনো ভিত্তিই নেই। আমি আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে ও বিশেষ অনুগ্রহে এ সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করব, যা বিশুদ্ধ হাদীস থেকে সংগৃহীত। হাফেজ আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবনে হাতিম ইবনে হিব্বান (রহ) তাদের সহীহ গ্রন্থে কালীমুল্লাহর স্বীয় প্রতিপালকের কাছে জান্নাতীদের সর্বনিম্ন মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে, মুগীরা ইবনে শোবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, মূসা (আ) স্বীয় প্রতিপালকের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কোন জান্নাতী সর্বনিম্নের মর্যাদায় হবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি যখন সকল জান্নাতী জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে, তখন সে ব্যক্তি (জান্নাতের সামনে) এসে হাজির হবেন। তাকে বলা হবে জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলবে, আমি কিভাবে জান্নাতে প্রবেশ করব, সেখানে তো সব জান্নাতীরা (বসবাসের জন্য) নিজ নিজ জায়গা নির্ধারণ করে নিয়েছে। (অর্থাৎ সেখানে আর স্থান কোথায়) তখন তাকে বলা হবে, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, পৃথিবীর একজন বাদশাহর রাজত্ব সমান স্থান তোমাকে জান্নাতে দেয়া হবে? সে বলবে, জী, হে প্রভূ! এতে আমি সন্তুষ্ট। তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্যে রয়েছে এটা এবং এটার পরিমাণ আরো (জান্নাত)। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি এতে সন্তুষ্ট। তাকে পুনরায় বলা হবে, এর সাথে তোমার জন্যে রয়েছে (এমন নেয়ামত) যা তোমার মন চাইবে, তা এবং যাতে তোমার চক্ষু জুড়াবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাঁর রবের কাছে আরয করলেন, হে আমার রব কোন জান্নাতী উচ্চ মর্যাদার অধিকারী? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বললেন, তাদের সম্পর্কে শীঘ্রই আমি তোমাকে বলছি।

তাদের মান-সম্মান আমার নিজ কুদরতী হাতে। তারা এমন নেয়ামতের মালিক হবে, যা কেউ কোনো দিন দেখে নি, শুনে নি, এমনকি কোনো মানুষ মনে মনেও তার কল্পনা করতে পারে নি। এ হাদীসের সত্যায়নকারী কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত বাণী— কেউই জানে না, তাদের জন্যে নয়ন প্রীতিকর কি (সব বস্তু) লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ। -সূরা সিজদা : ১৭

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (রহ) অনুরূপভাবে হাদীসটি সুফিয়ান (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান দ্বারা সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। মুসলিম শরীফে এরূপে বর্ণিত আছে যে, তাকে বলা হবে তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, পৃথিবীর বাদশাহদের একজন বাদশাহর রাজত্ব সমান তোমাকে দেয়া হবে? সে বলবে, আমার রব! আমি এতে সন্তুষ্ট। তখন তাকে বলা হবে, তোমাকে দেয়া হবে অনুরূপ আরো, অনুরূপ আরো, এভাবে পঞ্চম (বার বলার পরে) বারে সে ব্যক্তি নিজেই বলবে, হে আমার রব! এতেই আমি সন্তুষ্ট। অতঃপর বলা হবে, তোমাকে অনুরূপ দশগুণ দেয়া হবে এবং তার সাথে দেয়া হবে তোমার মন যা চাইবে, আর যা দেখে তোমার চক্ষু জুড়াবে। অতঃপর সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি এতে সন্তুষ্ট। তারপর হযরত মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! তার পরে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কে হবে?

আল্লাহ বললেন, সে ব্যক্তি, যার মান-সম্মানের বৃক্ষ আমার কুদরতী হাতে রোপণ করেছি এবং তাদের নেয়ামত সুরক্ষিত করে ফেলেছি। তারা এমন সব নেয়ামতের অধিকারী হবেন, যা কেউ চোখ দ্বারা দেখে নি, কান দ্বারা শুনে

নি এবং কোনো মানুষের মনেও এর কল্পনা সৃষ্টি হয় নি। এ হাদীসের সত্যায়নকারী কুরআন মাজীদের উক্ত বাণী। কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

ইবনে হিব্বান (রহ) "কালীমের স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সাতটি প্রশ্ন" অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একদিন হযরত মূসা (আ) স্বীয় রবের কাছে ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। আর এ ছয়টি প্রশ্ন সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-এর ধারণা ছিল যে, এ প্রশ্নগুলো শুধু তারই জন্যে নির্দিষ্ট। আর সপ্তম বিষয়টি মূসা (আ)-এর পছন্দ ছিল না।

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করলেন, পরওয়ারদেগার! আপনার বান্দার মধ্যে কোন বান্দা অধিক মুত্তাকী (পরহেযগার?) আল্লাহ তা'আলা বললেন, যে ব্যক্তি যিকির করে এবং সর্বদা আমাকে স্মরণ করে।

মূসা (আ) আরয করলেন, আপনার বান্দার মধ্যে কোন বান্দা সর্বাধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত? আল্লাহ তা'আলা বললেন, যে ব্যক্তি সত্যপথের অনুসারী। মূসা (আ) আরয করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা উত্তম ফয়সালাকারী? আল্লাহ তা'আলা বললেন, যে ব্যক্তি অন্যের জন্য যে ফয়সালা করে, নিজের জন্যেও অনুরূপ ফয়সালা করে।

মূসা (আ) আবেদন করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবান কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন— সে আলেম জ্ঞানী ব্যক্তি, যে নিজ ইলম (জ্ঞান) দ্বারা তৃপ্ত হয় না। বরং অন্যের ইলম (জ্ঞান)-কে নিজের জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে।

মূসা (আ) আরয করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা সর্বাধিক সম্মানিত? আল্লাহ তা'আলা বললেন, সে ব্যক্তি প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েও ক্ষমা করে দেয়।

মূসা (আ) আরয করলেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে অধিক ধনবান কে? আল্লাহ বললেন, সে ব্যক্তি যতটুকু সম্পদ সে প্রাপ্ত হবে, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

মূসা (আ) বললেন, আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি অল্প সম্পদের অধিকারী? (অর্থাৎ স্বীয় সম্পদকে কম মনে করা।)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অধিক সম্পদের অধিকারী হলেই তাকে ধনী বলা যায় না। মনের দিক দিয়ে যিনি ধনী, তাকেই প্রকৃত ধনী বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মঙ্গল কামনা করেন, তখন তার অন্তরকে ধনী করে দেন। অর্থাৎ তার অন্তরে অল্পে তুষ্ট থাকার এবং অন্যের সাহায্য প্রত্যাশী না হওয়ার মনোভাব সৃষ্টি করে দেন ও তার অন্তরে তাকওয়া আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করে দেন। আর যখন কারো প্রতি অমঙ্গলে ইচ্ছা করেন, তখন তার চোখের সামনে সর্বদা দারিদ্র্যকে তুলে ধরেন। অর্থাৎ সে সর্বাবস্থায় নিজকে দরিদ্র মনে করে ইবনে হিব্বান (রহ) সম্পদের অধিকারী এর ব্যাখ্যায় বলেন, যার মনের অবস্থা অভাগ্রস্ত থাকে। সে স্বীয় সম্পদকে নিজের জন্য স্বল্প মনে করে এবং সর্বদাই যা আছে তার চেয়েও বেশি সম্পদ পাওয়ার অভিলাষী থাকে।

ইবনে জুরায়য (রা) তার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে তিনি তার বর্ণনার কিছুটা সংযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা সর্বাধিক জ্ঞানী? আল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি অন্যের থেকে জ্ঞান অন্বেষণ করে স্বীয় জ্ঞানের সাথে সংযুক্ত করে। তার উদ্দেশ্য এই যে, হয়তো সে এমন কোনো জ্ঞানের কথা পাবে, যা তার হেদায়েতের পাথেয় হয়ে থাকে। অথবা এমন কিছু পেয়ে যাবে, যা তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! পৃথিবীতে আমার চেয়ে কি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি আছে? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ আছে। তিনি হলেন খিযির। তখন মূসা (আ) তার সাথে সাক্ষাৎ করার উপায় জানতে চাইলেন। এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

উক্ত হাদীসের অনুরূপ মূসাদে আহমদে অন্য একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আমার রব! আপনার মুমিন বান্দাগণ তো পৃথিবীতে খুব কষ্ট ও পেরেশানীতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, (পরকালে) তাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। হে মূসা! এদিকে তাকিয়ে দেখ! এসব কিছু আমি আমার মুমিন বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। অতঃপর মূসা (আ) আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনার মর্যাদা ও মহত্ত্বের কসম। তারা যদি দু'হাত কাটা ও দু'পা লেংড়া হয়ে থাকে এবং সে যদি জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত এ লেংড়া অবস্থায়ই থাকে, আর তার শেষ ঠিকানা যদি হয় এটাই (অর্থাৎ জান্নাত) তবে সে যেন জীবনে কোন কষ্টেই পতিত হয়নি। অতঃপর মূসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আপনার কাফির বান্দাদেরকে তো পৃথিবীতে খুব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরাম-আয়েশে থাকতে দেখা যায়। আল্লাহ বলেন, পরে (পরকালে) তাদের জন্যে তো জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে। হে মূসা! এটা আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। হযরত মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আপনার সম্মান ও মহত্ত্বের কসম। তাদের জন্ম হতে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা পৃথিবী যদি তাদের জন্য হয়, তারপর তাদের ঠিকানা যদি এটাই হয় তবে তারা জীবনে কোনই শান্তি লাভ করে নি।

ইমাম আহমদ (রা) একাই এর বর্ণনাকারী। এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন একটি যিকির শিখিয়ে দেন, যার দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করতে পারি এবং আপনাকে ডাকতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! তুমি বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মূসা (আ) বললেন, এ যিকির তো আপনার সমস্ত বান্দারাই করে থাকে। পুনরায় আল্লাহ বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মূসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আমি এমন একটা কালিমা চাই যেটা শুধু আমার জন্যই নির্দিষ্ট হবে। আল্লাহ বলেছেন, হে মূসা! যদি সপ্তম আকাশ ও তার মধ্যস্থ সবকিছু এবং সপ্ত যমীন ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু এক পাল্লায় রাখা হয় আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। এ হাদীসের সত্যায়নকারী হিসেবে কাছাকাছি অর্থের হাদীস রয়েছে। যা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বোত্তম দোআ হলে আরাফাতের দো'আ। (অর্থাৎ আরাফত ময়দানে বসে যে দোয়া করা হয়) আর সর্বোত্তম কালিমা (বাণী হলো, যা আমি বলি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণও বলেছেন। সেটা হলো—

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। গোটা রাজত্ব তার জন্যই এবং সকল প্রশংসাও তার জন্যে। তিনি সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ইবনে আবী হাতিম (রা) আয়াতুল কুরসীর তাফসীরে লিখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার রব কি ঘুমান? মূসা (আ) বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে মূসা তারা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে তোমার প্রতিপালক কি ঘুমান? তুমি দু'টো শিশি (বোতল) তোমার হাতে নিয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাক। মূসা (আ) আল্লাহর এ আদেশ পালন করলেন। যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ হয়ে গেল, তখন মূসা (আ)-এর একটু তন্দ্রা আসল। তখন তার মাথা নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর হঠাৎ শক্তভাবে ধরলেন। তারপর রাত দ্বিপ্রহরের সময় তিনি তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। এ সময় তার হাত থেকে শিশি দুটো পড়ে ভেঙে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, হে মূসা! আমি যদি ঘুমাতাম, তবে আকাশ ও পৃথিবী ভেঙে এরূপ বিনাশ হয়ে যেত, যেভাবে তোমার হাত থেকে শিশি পড়ে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আয়াতুল কুরসী অবতীর্ণ করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ মিম্বরে বসে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর অন্তরে এ চিন্তা আসল যে, আল্লাহ তা'আলা কি ঘুমান? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে তার কাছে পাঠালেন। সে ফেরেশতা মূসা (আ)-কে তিন রাত পর্যন্ত জাগ্রত রাখেন। তাকে ঘুমাতে দেন নি। এর পর সে (ফেরেশতা) হযরত মূসা (আ)-এর দু'হাতে দু'টি শিশি দিয়ে শিশি দু'টোকে ধরে রাখতে বললেন। হযরত মূসা (আ)-এর তন্দ্রা এসে গেল। তার হাত থেকে শিশি দুটো পড়ে যাবার উপক্রম হলো। যখন তিনি তন্দ্রায় একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন, তখন তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর রেখে শিশি দু'টোকে শক্তভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন। এক পর্যায়ে তিনি তন্দ্রায় এত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন যে, দু'টো শিশুই তার হাত থেকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা ঘুমাতেন বা তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করতো তবে আকাশ ও পৃথিবী যথাস্থানে স্থায়ী থাকত না।

এ হাদীসখানা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হওয়ার গরীব পর্যায়ের। তবে এটা মওকুফ (সাহাবাসূত্রে) বর্ণিত হওয়াটা অধিক যুক্তিসঙ্গত। এটাও হতে পারে যে, এ হাদীসের উৎস ইসরাঈলী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— স্মরণ কর! যখন তোমাদের ওয়াদা নিয়েছিলাম এবং 'তূর' কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন করেছিলাম, বলেছিলাম, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। এর পরেও তোমরা মুখ ফিরালে। আল্লাহর অনুগ্রহ এবং করুণা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।' -সূরা বাকারা : ৬৩-৬৪

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বর্ণনা করেন— (তাদের কি ঐ কথা মনে আছে?) যখন আমি পাহাড়কে ঝাড় করে তাদের উপর এমনভাবে রেখে দিলাম, যেন তা একটা ছাতা এবং তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে। তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব দিচ্ছি তা মযবূতভাবে ধরো এবং এতে যা কিছু লেখা আছে, তা মনে রাখ। আশা করা যায়, তোমরা ভুল পথ থেকে বেঁচে থাকবে।

-সূরা আরাফ : ১৭১

ইবনে আব্বাস (রা) ও বুযুর্গগণ বলেছেন যে, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের কাছে তাওরাতের ফলক নিয়ে এসে তাদেরকে বললেন যে, এ তাওরাতকে মেনে চল এবং একে মযবূতভাবে হেফাযত কর। তারা মূসা (আ)-কে বলল, এ তাওরাত আমাদের সামনে খুলে পাঠ করো। যদি এর নির্দেশাবলী মেনে চলা আমাদের জন্য সহজ হয় তবে আমরা এটা গ্রহণ করব। (আর যদি কঠিন হয় তবে এটা আমরা বর্জন করব)।

হযরত মূসা (আ) বললেন, যাকিছু এ তাওরাতের মধ্যে আছে সবকিছুই তোমরা গ্রহণ করো। এভাবে বাদানুবাদ হতে লাগল। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, পাহাড়কে তাদের মাথার উপর উঠিয়ে ধরতে। ফেরেশতা পাহাড়কে তাদের উপর ঝুলিয়ে দিল। মনে হচ্ছিল যেন, মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। তারপর বনী ইসরাঈলকে বলা হলো, যদি তোমরা তাওরাতের সব নির্দেশাবলী কবুল না করো তবে এ পাহাড়কে তোমাদের উপর পতিত করা হবে। তখন তারা কবুল করল। তারপর তাদেরকে সিজদা করার জন্যে আদেশ দেয়া হলো। তারা সিজদা করল এবং সিজদায় রত অবস্থায় আড়চোখে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। (পাহাড় পড়ে যায় নাকি তা দেখার জন্য) ইয়াহুদীরা সেই থেকে আজ পর্যন্ত এ কথা বলে থাকে যে, আমাদের কাছে সেই সিজদার চাইতে বড় কোনো সিজদা আর হতে পারে না, সে সিজদার কারণে আমরা এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, যখন তাওরাত পাঠ করে শুনানো হলো তখন পৃথিবীতে যত পাহাড়, বৃক্ষ, পাথর ও অন্যান্য সৃষ্টি ছিল, সবগুলোই থর থর করে কাঁপতেছিল। আর পৃথিবীর ছোট বড় নির্বিশেষে সকল ইয়াহুদীরা তাওরাতের তিলাওয়াত শুনে (ভয়ে) কাঁপতে ছিল এবং স্বীয় মাথা অবনত করে দিল। এ সম্পর্কে

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা এরপরও ফিরে গিয়েছ। অর্থাৎ এই মহা প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরে এবং বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পরেও স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলেছ। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না হতো, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে। অর্থাৎ তোমাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে তোমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছি এবং তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি এটা না করলে তোমরা বিনাশ হয়ে যেতে।

বনী ইসরাঈলের গাভীর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী!) স্মরণ করুন, যখন মূসা আপন জাতিকে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করার জন্যে আদেশ দিয়েছেন। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আল্লাহর স্মরণ নিচ্ছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্যে তোমার রবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো সেটা কিরূপ? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটা এমন গরু যেটা বৃদ্ধও নয়, অল্প বয়স্কও নয়, মধ্য বয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা করো। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো সেটার রং কী? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, সেটা গাঢ় পিত বর্ণের গরু। সেটার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়। তারা বলল, আমাদের জন্যে তোমার রবকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বলো সেটা কোনটি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা এবার পথপ্রাপ্ত হব। মূসা বলল, তিনি বলছেন, সেটা এমন গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্যে ব্যবহৃত হয় নি, সুস্থ, নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য কথা এনেছ। যদিও তারা যবেহ করতে আগ্রহী ছিল না, তবুও তারা সেটাকে যবেহ করল।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— ঐ ঘটনা কি তোমাদের মনে আছে, যখন তোমরা এক লোককে মেরে ফেলেছিলে, অতঃপর ঐ ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া করেছিলে এবং একে অপরকে দোষারোপ করেছিলে, তখন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তোমরা যা গোপন করছ, তা তিনি প্রকাশ করে দেবেন। -সূরা বাকারা : ৭২

ইবনে আব্বাস (রা), উবাইদা সালমানী, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ ও সুদ্দী (রা) এবং আরো কিছু সংখ্যক বুযুর্গ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনবান লোক ছিল। সে ছিল খুব বৃদ্ধ। তার কয়েক ভাতিজা ছিল। তারা তার দ্রুত মওত কামনা করছিল। তারা এ প্রতীক্ষায় ছিল যে, সে মারা গেলেই তারা তার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। এ লোভে একদিন রাতে তাদের একজনে ধনবান বৃদ্ধকে হত্যা করে তার মৃতদেহ শহরের দর্শনীয় স্থানে ফেলে রাখল। কারো মতে, তার আত্মীয়-স্বজনের একজনের ঘরের সামনে ফেলে রেখেছিল। সকালবেলা লোকেরা এ হত্যাকাণ্ড দেখে এ নিয়ে ঝগড়া করতে লাগল। হত্যাকারী ভাতিজাও চিৎকার দিয়ে (চাচার খুনে) তারা যে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত তা বলতে লাগল। তারপর লোকেরা ভাতিজাদেরকে বলল, তোমরা আল্লাহর নবীর কাছে এ অভিযোগ নিয়ে কেন যাচ্ছ না? ভাতিজাগণ চাচার হত্যার অভিযোগ নিয়ে আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর কাছে গেল। তারা অভিযোগ পেশ করল। হযরত মূসা (আ) বললেন, যে কোনো এক বক্তি তো এ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। কিন্তু সে লোকটি কে, তা বলো। কিন্তু কেউ কোনো কথাই বলল না। তারপর লোকেরা মূসা (আ)-কে বলল, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। হযরত মূসা (আ) এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা একটি গরু জবেহ করার জন্যে আদেশ দিলেন। তারা উত্তরে বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? অর্থাৎ আমরা তো নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি, আর তুমি আমাদেরকে গরু যবেহ করার জন্য বলছ।

তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি যে, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ওহী ব্যতীত কোনো কথা তোমাদের সাথে বলা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমাদের ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি (আল্লাহ) এ উত্তর দিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রা), ওবায়দা, মুজাহিদ, ইকরামা, সুদ্দী, আবুল আলীয়া (রহ) প্রমুখ বলেছেন, তারা প্রশ্ন না করে যেকোনো একটি গরু যদি যবেহ করতো তাতেই তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যেত। কিন্তু তারা নিজেরাই

নিজেদেরকে জটিলতায় ফেলেছিল। এ সম্পর্কে মারফু হাদীসও বর্ণিত আছে। তারা প্রথমে গরুটির গুণ, এরপর রং, এরপর সেটার বয়স ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। তাদেরকে এমন জবাব প্রদান করা হয়েছে, যা পালন করা তাদের জন্যে ছিল খুবই কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ (রহ) এবং আরো একটি জামাআত বলেন, যখন তাদেরকে মধ্যবয়সী গরু যবেহ করার জন্যে আদেশ দেয়া হলো (অর্থাৎ না বৃদ্ধ ও না ছোট) এরপর তারা নিজেরা সেটির রূপ, রং সম্পর্কে প্রশ্ন করে নিজেদেরকে জটিলতায় ফেলেছে।

তখন তাদেরকে গাঢ় পিত রং-এর গরু যবেহ করার জন্য আদেশ দেয়া হলো। যা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় অনুভব হয়। আর এটা ছিল আকর্ষণীয় রং। এতেই তারা ক্ষান্ত হয় নি। বরং এরপর তারা নিজেদেরকে আরো জটিলতায় ফেলতে চাইল। তারা বলল, (হে মূসা) আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালকের কাছে জিজ্ঞেস করো, সেটা কোনটি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব।

আবু হাতিম ও ইবনে মারদুয়াহ (রহ) হতে মারুফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি বনী ইসরাঈল, ইনশাআল্লাহ না বলত, তবে তারা কখনো সফলকাম হতো না। এ হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— মূসা উত্তর দিলেন, আল্লাহ বলছেন, ওটা এমন গাভী যা থেকে কোনো কাজ নেওয়া হয় না, হালচাষও করে না, পানিও তোলে না, একেবারে নিখুঁত ও দাগবিহীন। তখন তারা বলে উঠল, হ্যাঁ এতক্ষণে তুমি সঠিক তথ্য দিয়েছ। অতঃপর তারা ওটাকে যবেহ করল। তারা তা করতে চেয়েছিল বলে মনে হচ্ছিল না।[১]

এ বৈশিষ্ট্য পূর্বের বৈশিষ্ট্যের চেয়েও খুব কঠিন। কারণ, পূর্বে তো বলা হয়েছে যে, এমন গরু যা চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। বরং সেটি হতে হবে নিখুঁত ও পূর্ণ সুস্থ। এ সম্পর্কে আবুল আলীয়া ও কাতাদাহ (রহ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এটিতে যেন অন্য কোনো রং-এর মিশ্রণ না থাকে; বরং সেটি যেন সর্ব প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে। যখন এ সব কঠিন শর্ত আরোপ করে দেয়া হলো, তখন তারা বলল—

"এখন তুমি সত্য বলেছ।" বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈল উক্ত গুণে গুণান্বিত গরু একটি লোকের কাছেই পেয়েছিল। সে লোকটি তার মাতা-পিতার একান্ত অনুগত ছিল। বনী ইসরাঈল তার কাছে গরুটি চাইলে সে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করল। তারপর গরুটির মূল্য কিছু বাড়িয়ে বলা হলো। তাতেও সে দিতে সম্মত হলো না। এভাবে বাড়িয়ে বলতে বলতে, হযরত সুদ্দী (রা)-এর বর্ণনা মতে, গরু বরাবর স্বর্ণ দিতে তারা সম্মত হলো। লোকটি তাতেও দিতে সম্মত হলো না। শেষ পর্যন্ত গরু বরাবর স্বর্ণের ওজনের দশগুণ মূল্য ধার্য হলো। লোকটি এতে সম্মত হলো এবং এ বিনিময়েই গরু বিক্রি করল। অতঃপর আল্লাহর নবী তাদেরকে গরুটি যবেহ করার জন্য বললেন, তারা সেটি যবেহ করল, তারা গরুটি যবেহ করার ব্যাপারে প্রথমে ইতস্তত করছিল। অর্থাৎ তারা এ প্রসঙ্গে সন্দিহান ও পেরেশান ছিল যে, এতে সফল হতে পারবে কিনা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা সফল হয়েছে। অতঃপর যবেহ কৃত গরুটির এক খণ্ড গোশত নিহত ব্যক্তির শরীরে লাগানোর জন্য তাদেরকে আদেশ দেয়া হলো। এক বর্ণনা মতে, গরু নিহত ব্যক্তির শরীরে লাগানোর জন্য বলা হয়েছে। কেউ বলেন, হাড্ডি

১. *মিশরবাসী ও প্রতিবেশী জাতিসমূহের কাছ থেকে গাভীর মর্যাদা ও পবিত্রতার ধারণা এবং গো-পূজার রোগ বনী ইসরাঈলের মধ্যে গভীরভাবে সংক্রমিত হয়েছিল। সে কারণে তারা মিশর থেকে বের হওয়ার পরপরই বাছুরকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এজন্যেই তাদেরকে গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। তারা এ হুকুম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এ সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন তুলতে থাকে। তারা যতই এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রশ্ন করে ততই তারা সেই প্রশ্নসমূহের বেড়াজালে বেশি করে আটকে যেতে থাকে। এমনকি সে জামানায় তারা যে বিশেষ ধরনের গাভী নিজেদের পূজার জন্য নির্দিষ্ট করতো, শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষ রঙের গাভী যবেহ করার হুকুম দেয়া হয়। এ যেন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হলো যে, তারা তাদের পূজার গাভীকেই যবেহ করুক।*

লাগানোর কথা বলা হয়েছে। আবার কেউ বলেন, নাসিকার নরম হাড্ডি লাগানোর কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেন, দু'কাঁধের মাঝখানের অংশটুকু লাগানোর কথা বলা হয়েছে। মোটকথা, যে কোনো একটি অংশ মৃত ব্যক্তির শরীরে লাগানোর সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দিলেন।

সে উঠে দাঁড়াল। তার শরীরের শিরায় শিরায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে হত্যা করেছে? উত্তরে সে বলল, আমাকে আমার অমুক ভাতিজা হত্যা করেছে। এ কথা বলেই সে মারা গেল। পূর্বে যেরূপ (মৃতদেহ) ছিল, অনুরূপই হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। অর্থাৎ তোমরা যেভাবে এ নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করার বিস্ময়কর ঘটনা অবলোকন করলে, অনুরূপভাবে সমস্ত মৃতদের উপর আল্লাহ তা'আলার আদেশ জারি থাকে। যখন তিনি কাউকে জীবিত করতে ইচ্ছা করেন, এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে জীবিত করেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন— তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা ও আবার জীবিত করা একটি মাত্র প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই) অনুরূপ। –সূরা লুকমান : ২৮

মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেন, (হে নবী! তাদেরকে মূসার ঐ কাহিনী শুনিয়ে দিন) যখন মূসা তার খাদেমকে বললেন, দু'নদী যেখানে মিলিত হয়েছে, সেখানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি থামব না। তা না হলে আমি যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকব[১]। যখন তারা দু'জন ঐ দু'নদীর মিলনকেন্দ্রে পৌঁছল, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল এবং মাছটি এমনভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেল, যেন কোনো সুড়ঙ্গ লাগানো ছিল। কিছু দূর যাওয়ার পর মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমার নাশতা আন। আজকের সফরে তো আমরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাদেম বলল, আপনি কি দেখেছেন? এটা কী করে হয়ে গেল? যখন আমরা পাথরের পাশে বিশ্রাম নিয়েছিলাম তখন আমার মাছের কথা খেয়াল ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন বেখেয়াল করে দিলো যে, আমি তা (আপনাকে) বলতে ভুলে গেছি। মাছটি তো আজবভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেল। মূসা বললেন, আমরা তো ঐ স্থানের তালাশেই ছিলাম[২]। তারা দু'জনেই তখন তাদের পদচিহ্ন ধরে আবার ফিরে এলেন। সেখানে তারা আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে এক বান্দাহকে পেলেন, যাকে আমি নিজের রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং আমার পক্ষ থেকে এক খাস ইলম দান করেছিলাম[৩]। মূসা তাকে বললেন, আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনি আমাকেও ঐ ইলম শেখাতে পারেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কেমন করে সবর করতে পারেন?

মূসা বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন। আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হব না। তিনি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আপনি যদি সাথে চলতে চান তাহলে আমি নিজে আপনাকে না বলা পর্যন্ত আমাকে আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না। এখন তাঁরা দু'জনই রওয়ানা দেলেন। তারা যখন এক নৌকায় সাওয়ার হলেন, তখন ঐ লোকটি নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা প্রশ্ন করলেন, আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যেই কি আপনি নৌকায় ছিদ্র করলেন? এটা তো আপনি এক মারাত্মক কাজ করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না? মূসা বললেন, আমি

১. কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে জানা যায়নি যে, হযরত মূসা (আ)-এর সফর কোন সময় হয়েছিল এবং ঐ দু'নদীই বা কোন কোন নদী ছিল। যাদের মিলনের জায়গায় এই ঘটনা ঘটেছিল; কিন্তু কাহিনীটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে মনে হয় মূসা (আ) যখন মিসরে ছিলেন ঘটনাটি সেই সময়ের, যখন ফেরাউনের সঙ্গে তার টক্কর চলছিল। আর দুটি নদী হচ্ছে 'শ্বেতনীল ও কটানীল'। এ দুটো নদী যেখানে একত্র হয়েছে, সেখানেই সুদানের রাজধানী খার্তুম শহর রয়েছে।

২. অর্থাৎ যে জায়গায় আমার পৌঁছার কথা সে জায়গার এ চিহ্ন সম্পর্কেই তো আমাকে জানানো হয়েছে।

৩. আল্লাহর এই বান্দাহর নাম সকল সহী হাদীসে 'খিজির' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যা ভুলে গেছি সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করবেন না। আমার ব্যাপারে আপনি এতটা কড়াকড়ি করবেন না। আবার তারা দু'জন চলতে লাগলেন। তারা একটি বালককে দেখতে পেলেন। ঐ লোকটি তাকে হত্যা করে ফেলল। তখন মূসা বললেন, আপনি একজন নির্দোষকে হত্যা করে ফেললেন? অথচ সে তো কাউকে খুন করে নি। আপনি তো এক মহা অন্যায় কাজ করে বসলেন। ঐ লোক বললেন, আমি আপনাকে বলি নি যে, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না? মূসা বললেন, এরপর যদি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। নিন এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেলেন। এরপর আবার তারা দুজন চললেন। তারা এক জনবসতিতে পৌছে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা তাদের দু'জনেরই মেহমানদারি করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটি দেয়াল পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় দেখতে পেলেন। ঐ লোক তা মেরামত করে দিলেন। মূসা বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের মজুরি নিতে পারতেন। তিনি বললেন, ব্যাস! আর না। আমার ও আপনার এক সাথে চলা শেষ হয়ে গেল। আমি এখন আপনাকে ঐ সব বিষয়ের হাকীকত বলব, যা সম্পর্কে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি। ঐ নৌকার ব্যাপারটি এই যে, কতক গরীব লোক এর মালিক। তারা নদীতে মেহনত মজুরি করে। আমি এটাকে ত্রুটিপূর্ণ করতে চাইলাম। কারণ, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা আছে, যারা প্রত্যেক নৌকাকে জোর করে কেড়ে নেয়। এরপর ঐ বালকটির কথা। তার পিতা-মাতা মু'মিন ছিল। আমি আশঙ্কা করলাম, এ ছেলেটি বিদ্রোহ ও নাফরমানী করে তাদের কষ্ট দেবে। তাই আমি চাইলাম, তাদের রব এর বদলে তাদেরকে এমন সন্তান দান করুন, যে চরিত্রের দিক দিয়েও এর থেকে ভালো হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় ব্যবহারও আশা করা যাবে। ঐ দেয়ালটির প্রসঙ্গে কথা হলো, সেটি দুজন ইয়াতীমের, যারা এ শহরেই থাকে। এ দেওয়ালের নিচে এদের জন্য ধন-সম্পদ লুকানো আছে। আর তাদের পিতা নেককার ছিল। তাই আপনার রব চাইলেন, এরা দুজন সাবালক হোক এবং তাদের সম্পদ বের করে নিক। এটা আপনার রবের দয়ার কারণে করা হয়েছে। আমি নিজের মর্জিতে তা করি নি। এ হলো ঐ সবের ব্যাখ্যা, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি[১]।

আহলে কিতাবের কতকে বলেছেন যে, যে মূসা খিযির (আ)-এর কাছে গিয়েছিলেন তিনি হলেন, মূসা ইবনে মানসা ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল (আ)। আমাদের মধ্যেও কতকে এই কিতাবীদের অনুসরণে তাদের কিতাব ও সহীফা থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকে। তাদের মধ্যে হলেন, নুফ ইবনে ফুযালা আল হোমায়রী আশ শামী ও আল বাকালী। তার সম্পর্কে অনেকে ধারণা করে থাকেন যে, তিনি দামেস্কের অধিবাসী। তার মাতা ছিলেন হযরত কাআব আহবারের স্ত্রী। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশুদ্ধ কথা হলো এই যে, মূসা ইবনে ইমরান বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন এবং তার উপরেই তাওরাত কিতাব নাযিল হয়েছে। আর এটাই হলো সর্বসম্মত অভিমত।

---

১. এ ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, হযরত খিজির (আ) যে তিনটি কাজ করেছিলেন তা আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই করেছিলেন। এ কথাও অতি পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, তিনটি কাজের মধ্যে প্রথম দুটি কাজ এরূপ ছিল, যার অনুমতি কোনো শরীআতে কোনো মানুষকে কখনো দেওয়া হয় নি। এমনকি ইলহামের ভিত্তিতেও কোনো মানুষ কারো কোনো মালিকানাভুক্ত নৌকা এজন্য নষ্ট করে দিতে পারে না যে, পরে কোনো ছিনতাইকারী নৌকাটি ছিনিয়ে নেবে এবং কোনো বালককে এজন্য হত্যা করতে পারে না যে, বড় হয়ে সে কাফের বা অবাধ্য হবে। এ কারণে এ কথা না মেনে উপায় নেই হযরত খিজির এ কাজ শরীআতের বিধান অনুসারে করেন নি; বরং তিনি এ কাজ করেছিলেন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী। তা ছাড়া এ জাতীয় হুকুম পালনের জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষ ছাড়া ফেরেশতা বা অন্য এক প্রকার সৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন। কাহিনীর ধরন থেকে এ কথাও বোঝা যায়, পর্দার পেছনে আল্লাহ তা'আলার মাশিয়তের (ইচ্ছার) কারখানায় ভালো-মন্দের কেমন হিসাব করে কাজ হয়ে থাকে, যা বোঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে, পর্দা সরিয়ে মূসা (আ)-কে ঐ কারখানা এক নজর দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তার এই বান্দাহর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত খিজিরের জন্য 'বান্দাহ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই তাকে মানুষ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি হতে পারে না। সূরা আম্বিয়ার ২৬নং আয়াত, সূরা যুখরুফের ১৯নং আয়াত এবং আরো বারোটি জায়গায় ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও ঐ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইমাম বোখারী (রহ) বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে জিজ্ঞেস করেন যে, নূফ বাকালী মনে করে যে, খিযির (আ)-এর সাথে যে মূসা সাক্ষাৎ করেছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের নবী নন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। কারণ, উবাই ইবনে কাআব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, একবার মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক মজলিসে খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালে তাকে প্রশ্ন করা হলো, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ) উত্তরে বললেন, "আমি। এ কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। কারণ জ্ঞানের সম্বন্ধ তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে করেন নি। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, খিযির তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। এ কথা শুনে মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে প্রভু! তার পর্যন্ত পৌঁছার পথ ও পদ্ধতি কী? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জানানো হলো, একটি মাছ থলের মধ্যে ভরে, সেটি নিয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়। যেখানে বসে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তুমি তার সাক্ষাৎ পাবে। মূসা (আ) একটি মাছ থলের মধ্যে ভরে রওয়ানা হলেন। তার সাথে ছিলেন তারই শিষ্য ইউশা ইবনে নুন। তারা চলতে চলতে একটি মরু প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছলেন। বিশ্রামের জন্য সেখানে যাত্রা বিরতি করলেন। তারা সেখানে এক খণ্ড পাথরের উপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় থলের মাছটি (যেটি পাকানো ছিল) থলের মধ্যে ছটফট করতে লাগল। অতঃপর থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যে পথ ধরে সেটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিল, সেটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা সে সুড়ঙ্গের পানি প্রবাহিত হওয়া বন্ধ করে রাখলেন এবং সেটি একটি স্তর হয়ে গেল। মূসা (ইউশাকে) বললেন, আমাদের নাস্তা (মাছটি) নিয়ে আস। আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত জায়গা, অর্থাৎ যেখানে বসে মাছটি হারিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে ক্ষুধা অনুভব হয় নি। যখন তারা সে নির্ধারিত স্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, তখন ক্ষুধা অনুভব করলেন। ইউশা ইবনে নূন উত্তর দিলেন, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আমরা শিলা খণ্ডের উপর মাথা রেখে বিশ্রাম করেছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তান এ কথাটি আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে রাস্তা বানিয়ে সমুদ্রে নেমে গেল। (অর্থাৎ যে পথে মাছটি গিয়েছিল, সে স্থান সুড়ঙ্গ হয়ে গেল। সেখান থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এতে তারা দু'জনেই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।) তারপর মূসা (আ) ইউশাকে বললেন, আমরা তো সে জায়গাটিই অন্বেষণ করছি। তারপর তারা উভয়েই নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চললেন। চলতে চলতে তারা সেই পাথরখণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একজন বস্ত্রাবৃত লোক ছিলেন। হযরত মূসা (আ) তাকে সালাম দিলেন। তখন তিনি [বস্ত্রাবৃত লোকটি যিনি ছিলেন খিযির (আ)] বললেন, এ যমীনে সালাম কোত্থেকে আসল? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। খিযির (আ) বললেন, বনী ইসরাঈলের? মূসা (আ) বললেন, জী, হ্যাঁ। আমি আপনার কাছে এজন্যে এসেছি যে, আপনি কল্যাণকর যে জ্ঞান জানেন তা আমাকে শিখাবেন।

খিযির (আ) বললেন, হে মূসা (আ) আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইলম (জ্ঞান) প্রদান করা হয়েছে, তা আপনাকে প্রদান করা হয়নি। মূসা (আ) বললেন, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার আদেশ কখনো অমান্য করব না।

খিযির (আ) বললেন, আপনি যদি সফরে আমার সঙ্গীই হতে চান, তবে আপনি কোনো বিষয়ে আমার কাছে প্রশ্ন করতে পারবেন না, যতক্ষণ না আমি নিজে আপনার কাছে কোনো কিছু বলি।

তারপর দু'জনে চলতে আরম্ভ করলেন। সমুদ্রের তীর দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা একখানা নৌকা দেখতে পেলেন। তাঁরা নৌকার মালিককে বললেন, আমাদের দু'জনকে নৌকায় উঠিয়ে লও। মালিক খিযির (আ)-কে চিনতে পারলেন। সে বিনা ভাড়ায়-ই দু'জনকে নৌকায় উঠিয়ে নিল। নৌকায় আরোহণ করেই কুঠার দিয়ে খিযির (আ) নৌকাটির একখানা তক্তা ভেঙে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, এ লোকটি তো আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় পার করে দিলেন। এরপরও আপনি তার নৌকাটি ভেঙে দিয়ে সকল আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দিবেন? আপনি এ

কাজ ভাল করেন নি। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আমি প্রথমেই তো বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। মূসা (আ) বললেন, আমি যা ভুলে গিয়েছি, সে প্রসঙ্গে আপনি আমাকে জবাবদেহী করবেন না। আমার কথার জন্য আমাকে বিপদে ফেলাবেন না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রথমবার হযরত মূসা (আ) থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, এরপর একটি চড়ুই পাখী নৌকাটির এক পার্শ্বে বসে সমুদ্রের মধ্যে ঠোঁট দিল। তখন খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় আমার ও আপনার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত এই চড়ুই পাখীর। যেটি নিজ ঠোঁটে এই মহাসমুদ্র থেকে পানি নিয়েছে। (আল্লাহর জ্ঞান মহাসমুদ্রের মতো। আর আমার ও আপনার জ্ঞান চড়ুই পাখীর ঠোঁটের পানির মতো)। এরপর তারা দু'জনে নৌকা থেকে তীরে উঠে উপকূল দিয়ে চলতে লাগলেন। পথে হযরত খিযির (আ) একটি বালককে অন্য কতগুলো বালকের সাথে খেলতে দেখলেন। খিযির (আ) বালকটির মাথা ধরে তাকে নিজ হাতে হত্যা করলেন। হযরত মূসা (আ) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ বালককে কোনো বিনা অপরাধে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ফেললেন? আপনি খুব খারাপ কাজ করেছেন।

খিযির (আ) বললেন, আপনাকে আমি কি বলেছিলাম না যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না? মূসা (আ) বললেন, এরপর যদি আমি আর কোনো সওয়াল করি তবে আপনি আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ওজর পেশ করা হলো। তারপর আবার তারা দু'জনে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তারা এক জনবসতির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তারা দু'জনেই এলাকাবাসীর কাছে কিছু খেতে চাইলেন। তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ দেয়াল দেখতে পেলেন। হযরত খিযির (আ) সেটাকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করে দিলেন। তখন মূসা (আ) বললেন, এটা তো এমন একটি জাতির সম্পদ যাদের কাছে আমরা এসেছি। অথচ তারা (বলার পরেও) আমাদেরকে মেহমানদারী করতে সম্মত হলো না। আপনি ইচ্ছা করলে তো এ (নির্মাণের কাজে) তাদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, এবার আমার ও আপনার মধ্যে বিদায়ের সময় হয়ে গেছে। (আপনাকে আমার সাথে রাখা আর সম্ভব নয়।) এখন আমি আপনাকে সে সব বিষয়ের তথ্য দিচ্ছি , যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারে নি। রাসূলুল্লাহ (আ) বলেন, আমাদের আন্তরিক কামনা ছিল যে, মূসা (আ) যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের অনেক কথা আমাদেরকে শুনাতেন।

হযরত মূসা ও খিযির (আ) সম্পর্কিত ঘটনার কিছু কথা

وَكَانَ وَرَائَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ ـ

হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত দু'খানা এভাবে পড়তেন—

وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَّكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ـ

হযরত আব্বাস (রা) এখানে سَفِيْنَةٍ এর সাথে صَالِحَةٍ এবং وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ এর সাথে كَافِرًا যোগ করে পাঠ করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সে বালক ছিল কাফির।

হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ছিলেন তার শিষ্য ইউশা ইবনে নুন। উভয়ের সাথে মাছ ছিল। পাথরখণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে উভয়ই সেখানে বিশ্রাম অবতরণ করেছিলেন। তারপর মূসা (আ) শিলার উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন।

সুফিয়ান (র) বলেছেন, যে পাথরের কাছে তারা বিশ্রাম করেছিলেন। সেই পাথরখণ্ডের নিচে একটি প্রস্রবণ ছিল। যেটাকে 'হায়াত' বলা হতো। (এটি সেই 'আবে হায়াত') যে নামটি মানুষের কাছে কাছে প্রসিদ্ধ। এ প্রস্রবণের পানি যে কোনো বস্তুর উপর পড়লে তা জীবিত হয়ে যেত। পাকানো মাছটিতেও প্রস্রবণের পানি

পড়েছিল। যাতে মাছটি জীবিত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটি থলের মধ্যে বসে ছটফট করছিল। অতঃপর মাছটি থলে থেকে বেরিয়ে নিজে পথ করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল। মূসা (আ) জাগ্রত হয়ে যখন ক্ষুধা অনুভব করলেন, তখন সাথের শিষ্যকে বললেন, আমার জন্য নাশতা লও। আমার ক্ষুধা লেগেছে।

বর্ণনাকারী বলেছেন, চড়ুই পাখিটি ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে যে পানি উঠিয়েছিল, এ ঘটনা দ্বারা হযরত খিযির (আ) হযরত মূসা (আ)-কে ভালভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আমার ও আপনার ইলমের (জ্ঞানের) তুলনায় আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) এরূপ, যেরূপ এ চড়ুই পাখিটির সমুদ্র থেকে ঠোঁটে পানি নেয়া।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, আমি একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ঘরে তাঁর কাছে বসাছিলাম। এ সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, আমার কাছে যেকোনো প্রশ্ন করতে পার। তখন আমি আরয করলাম, হে ইবনে আব্বাস (রা), আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করুন। কুফায় এক লোক আছে, যে খুব গল্প করে থাকে। তার নাম নূফ। তার ধারণা যে, হযরত খিযির (আ)-এর কাছে ইলম লাভের উদ্দেশ্যে যে মূসা গিয়েছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) নন। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের থেকে ইবনে জুরায়য (রহ) বলেন, আমাকে আমর (রা) বলেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা)-কে উত্তর দিয়েছিলেন যে, "আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।" ইবনে জুরায়য (রহ) বলেন, আমাকে ইয়ালী (রা) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন যে, আমার কাছে কাআব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাসূল মূসা (আ) একদিন লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। এ সময় লোকদের চোখ থেকে পানি পড়ছিল এবং প্রত্যেকের অন্তর নরম হয়ে গিয়েছিল। তারপর এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর কাছে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে আপনার চেয়েও কি কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি আছে? আল্লাহর নবী জবাব দিলেন, না। এ কথায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলেন। কারণ মূসা (আ) জ্ঞানের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বোধন করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার চেয়েও অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! তার সাথে সাক্ষাতের উপায় কী?

আল্লাহ তা'আলা বললে, দু'সাগরের মিলন স্থলে যাও। হযরত মূসা (আ) বললেন, হে আমার রব! আমাকে একটি নিদর্শন বলে দিন, যা দ্বারা আমি সে জায়গাটি চিনতে পারি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়ে পূর্বের বর্ণনাকারী জুরায়য (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন, যেখানে বসে তোমার মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তার সাক্ষাৎ পাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রে ইয়ালা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, একটি মৃত (পাকানো) মাছ সাথে নাও। তার মধ্যে প্রাণ দান করা হবে। (অর্থাৎ যেখানে বসে সেটি জীবিত হবে, সেখানেই তার সাক্ষাৎ পাবে)। হযরত মূসা (আ) একটি ভাজা মাছ থলের মধ্যে ভরে নিলেন এবং সাথীকে বললেন, যখনই মাছটি তোমার থেকে হারিয়ে যাবে, তখনই আমাকে তুমি অবগত করবে। সাথী বললেন, ঠিক আছে। এটা তো আর কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মাছটি যখন থলে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রে নেমে গেল, তখন মূসা (আ) পাথর খণ্ডের উপর মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হযরত ইউশা (আ) মূসা (আ)-কে জাগ্রত করা ভাল মনে করলেন না। তিনি চিন্তা করলেন, যে, মূসা (আ) জাগ্রত হলে তাকে প্রসঙ্গটি জানাবেন। কিন্তু মূসা (আ) যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা (আ) তাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। মাছটি এমন আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নেমে গেল যে, সুড়ঙ্গ করে চলে গিয়েছিল। সেখানে পানি প্রবাহিত হচ্ছিল না। বর্ণনাকারী জুরায়য (রা) বলেন, আমর (রা) আমাকে এ সুড়ঙ্গের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের দুটো আঙ্গুলি মিলিয়ে গোল করে দেখালেন।

"আমরা এ সফরে (ক্ষুধায়) ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।" হযরত মূসা (আ)-এর এ কথায় হযরত ইউশা (আ) আরয করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার থেকে তো এ কষ্ট দূরীভূত করেছেন। এরপরও ক্ষুধা পাওয়া ভাল নিদর্শন নয়। তারপর ইউশা (আ) বললেন, মাছের ঘটনা এরূপ। অতঃপর উভয়ই সে স্থানের দিকে ফিরে চললেন। সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, হযরত খিযির (আ) বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ছিলেন। তার চাদরের এক প্রান্ত ছিল

দু'পায়ের নিচে আর অন্য প্রান্ত ছিল মাথার নিচে। হযরত মূসা (আ) তাকে সালাম দিলেন। তিনি চেহারার উপর থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, এই জমিনে সালাম প্রদানকারী আবার কে? আপনি কে? তিনি বললে আমি মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বনী ইসরাঈলের মূসা? বললেন, জী, হ্যাঁ। তিনি খিযির (আ) বললেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? মূসা (আ) বললেন, আমার উদ্দেশ্য হলো, আপনাকে যা শিখানো হয়েছে তা আমাকে শিক্ষা দেবেন। হযরত খিযির (আ) বললেন, আপনার কাছে তাওরাত কিতাব আছে, সেটা কি যথেষ্ট নয়? বর্ণনাকারী এর সাথে একটু সংযোগ করে বলেছেন যে, খিযির (আ) বলেছিলেন, 'আপনার কাছে ওহী নাযিল হয় এর পরেও? খিযির (আ) বললেন, হে মূসা! আমার কাছে সত্যিই ইলম আছে। কিন্তু আপনাকে শিখানো সমীচীন নয়। এ সময় একটি চড়ুই পাখী এসে তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্রের পানি উঠাল। তখন হযরত খিযির (আ) বললেন, আপনার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় এরূপ, যেরূপ এ পাখিটি সমুদ্র থেকে ঠোঁটে পানি উঠিয়েছে।

তারপর তাঁরা উভয়ে নৌকায় উঠলেন। তারা দু'জনে নদীর তীরে দিয়ে চলতে লাগলেন। সে নদীতে ছোট ছোট নৌকা ছিল, যেগুলোতে মানুষ এপার থেকে ওপার পার হতো। এক নৌকার মাঝি খিযির (আ)-কে চিনতে পেরে বলল, ইনি একজন আল্লাহর নেক বান্দা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কী খিযির (আ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, জী, হ্যাঁ। তারপর নৌকার মাঝি বলল, আমি বিনা ভাড়ায় তাকে পার করে দিব। অর্থাৎ ভাড়া নিয়ে তাঁকে নৌকায় উঠাব না। তারপর তাঁরা দু'জনে নৌকায় উঠলেন। খিজির (আ) কুঠার দিয়ে নৌকাটির একখানা তক্তা ভেঙে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি কি নৌকার আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এরূপ কাজ করেছেন? এটা আপনি ভাল কাজ করেননি। খিযির (আ) বললেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারবেন না। এ সফরে হযরত মূসা (আ) হযরত খিযির (আ)-এর সাথে তিনবার প্রশ্ন করেছিলেন। প্রথমটি ভুলে করেছিলেন। দ্বিতীয়টি শর্ত হিসেবে। আর তৃতীয়টি ছিল জেনে শুনে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) বললেন, আমার ভুল হয়েছে। এ ব্যাপারে আমাকে জবাবদিহী করবেন না। তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন। পথে একটি বালককে হত্যা করলেন। ইয়ালী (রহ) বললেন, হযরত খিযির (আ) কতগুলো বালককে খেতে দেখলেন। তার মধ্য হতে তিনি একটি কাফির বালককে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেন? অতঃপর তারা দু'জনে চললেন। এক জনপদে পৌঁছে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীরকে নির্মাণ করে দিলেন। হযরত সাঈদ (আ) এর বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বীয় হাত অল্প একটু উঁচু করে ইঙ্গিত করে বললেন, এভাবে নির্মাণ করেছিলেন। খিযির (আ) তার নিজ হাত দ্বারা কারামত ও মুজেযা হিসেবে স্পর্শ করে এ প্রাচীরটিকে নির্মাণ করেছিলেন। তারপর হযরত মূসা (আ) তাদের থেকে যে পারিশ্রমিক নেয়ার কথা বলেছিলেন, এর অর্থ হলো পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু খাদ্য তাদের থেকে নেয়া।

তাদের পেছনে বাদশাহ ছিল। এ বাদশাহর নাম ছিল, হাদাদ ইবনে বাদাদ। আর সেই নিহত বালকটির নাম ছিল জায়সুর। ইবনে আব্বাস (রা) এখানে وَكَانَ اَمَامَهُمْ পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তাদের সামনে ছিল বাদশাহ।

হযরত খিযির (আ) এ চিন্তা করে নৌকাটির তক্তা ভেঙে ফেলেছিলেন, যাতে সামনে যে অত্যাচারী বাদশাহ আসবে, সে নৌকাটি খুঁত দেখে ছেড়ে দিবে। যখন বাদশাহর কাছ থেকে নৌকাটি অতিক্রম করল, তখন সেটি খুঁত দেখে বাদশাহ সেটিকে ছেড়ে দিল। পরে নৌকার মালিক নৌকাটি সেরে পূর্বের মতো কাজে লাগাতে লাগল।

বালকটির মাতা পিতা মু'মিন ছিল। আর বালকটি ছিল কাফের। হযরত খিযির (আ)-এর এ আশঙ্কা হলো যে, বালকটির মায়ায় পড়ে মাতা-পিতা তার প্রতি ঝুঁকে পড়তে পারে। অর্থাৎ তার ধর্ম কিনা গ্রহণ করে বসে। এজন্য খিযির (আ) চাইলেন যে, তাদের রব যেন এর পরিবর্তে একটি পবিত্র ও উত্তম পুত্র দান করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আর একটি সন্তান দান করেছিলেন। যেটি নিহত বালকটির চেয়ে নম্র, বিনয়ী ও উত্তম ছিল। সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) ব্যতীত অন্যান্য মুফাসসিরের মতে এ বালকটির পরিবর্তে তার মাতা-পিতার যে সন্তানটি হয়েছিল, সেটি ছিল বালিকা, কারো কারো মতে সেটি ছিল বালক। আবী আসিম (রা) বলেন, বনী ইসরাঈলের নবী হযরত মূসা (আ) একবার খুতবায় (ভাষণে) বলেছিলেন, আল্লাহ ও তার বিধানকে আমার চেয়ে

আর কেউই অধিক জানে না। এ কথার প্রেক্ষিতে মূসা (আ)-কে জানানো হলো যে, তিনি যেন সেই ব্যক্তির (অর্থাৎ খিযির আ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর পরবর্তী হাদীস পূর্বের মতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমার ও হুর ইবনে কায়েসের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ হলো যে, মূসা (আ)-এর সাথী, যার থেকে তিনি ইলম (জ্ঞান) অর্জন করেছেন, তিনি কে? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। এ সময় তার কাছ দিয়ে উবাই ইবনে কাব (রা) যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাকে কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ও আমার এ সাথীর মধ্যে এ প্রসঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, মূসা (আ) যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে পথের সন্ধান চেয়েছিলেন, তিনি কে? (হে উবাই ইবনে কাআব!) আপনি কি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, জী, হ্যাঁ। পরে তিনি পূর্বোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাহফে বর্ণনা করেছি।

আল্লাহর বাণী আর এ প্রাচীর এটা ছিল নগরবাসীর দুই পিতৃহীন বালকের। সুহাইল (রা) বলেছেন, এ বালক দুটির নাম ছিল আসরাম ও সুরাইম। তাদের পিতার নাম ছিল কাশিহ। আয়াতে উল্লিখিত 'গুপ্তধন' হলোএক বর্ণনা মতে, স্বর্ণ। এটা ইকরামা (রা)-এর অভিমত। ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে 'গুপ্তধন' দ্বারা জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞান সম্বলিত বাণী। তবে যুক্তিসঙ্গত কথা হলো এই যে, সেটি ছিল স্বর্ণের পাত। তাতে জ্ঞান বিষয়ক কথা লেখা ছিল। বাযযার (রা) বলেছেন, আবূ যর (রা) থেকে মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন– 'গুপ্তধন' (খাযানা) স্বর্ণের শক্ত পাত ছিল। এতে (জ্ঞান বিষয়ক উপদেশবাণী) লেখা ছিল। তাতে এ উপদেশ বাণী লেখা ছিল যে,

আমি বিস্মিত হই সে ব্যক্তির উপর যে তাকদীরে বিশ্বাস করে। তারপরও পেরেশান হয়ে পড়ে। আর আমি বিস্মিত হই সে ব্যক্তির উপর, যে জাহান্নামের কথা স্মরণ করেও হাসে। আমি আশ্চর্য হই সে ব্যক্তির উপর যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করেও (আল্লাহর ইবাদত) থেকে অন্যমনস্ক থাকে।

অনুরূপভাবে হযরত হাসান বসরী (রহ) ও জাফর (রহ)-এর আযাদকৃত ওমর (রহ) এবং জাফর সাদেক (রহ) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর বাণী "তার মাতা-পিতা ছিল মু'মিন"। এখানে মাতা-পিতা দ্বারা কারো মতে সপ্তম পুরুষের দাদাকে বুঝানো হয়েছে। কারো মতে, দশম পুরুষের দাদাকে বুঝানো হয়েছে। যাই হোক, আল্লাহ নেককার মানুষের বংশধরকে রক্ষা করে থাকেন, আল্লাহ তা'আলাই সাহায্যকারী। আপনার রব দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, এ পিতৃহীন বালক দুটি বড় হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নিবে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাদের প্রতি এরূপ করেছেন।

এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, হযরত খিযির (আ) নবী ছিলেন। কারণ, সব কাজই তিনি আল্লাহর আদেশে করেছেন। অর্থাৎ তাঁর আদেশেই করেছেন। নিজের পক্ষ থেকে বা নিজ ইচ্ছায় কোনো কাজ করেন নি। এক বর্ণনা মতে তিনি রাসূল ছিলেন। এক বর্ণনা মতে, তিনি একজন আল্লাহর নেক বান্দা (ওলী) ছিলেন। তবে বিস্ময়কর মত এই যে, ছিলেন তিনি একজন ফেরেশতা। সবচেয়ে বিস্ময়কর বর্ণনা এই যে, কারো মতে তিনি ছিলেন ফেরআউনের পুত্র। আর এক বর্ণনা মতে, তিনি হলেন যিহাক বাদশাহর পুত্র। এ বাদশাহ হাজার বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করেছেন। ইবনে জারীর (রা) বলেছেন, অধিকাংশ আহলে কিতাবের মতে খিযির 'আরীদুন' বাদশাহর যুগের একজন লোক। এক বর্ণনা মতে, খিযির ছিলেন, যুল-কারনাইনের অগ্রগামী বাহিনীর প্রধান। এই যুল কারনাইন সম্পর্কে অনেকের ধারণা, তিনিই ছিলেন আফরীদুন। তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর যমানার লোক। কোনো কোনো লোক মনে করে যে, খিযির 'আবে হায়াত' পান করে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছেন। কেউ বলেছেন, তিনি (খিযির) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং তার সাথে বাবেল হিজরতকারী কোনো এক ব্যক্তির সন্তান ছিলেন। এক বর্ণনা মতে তার নাম ছিল 'মালাকান'। কেউ বলেছেন,

হযরত খিযির লাহরা ছাবের পুত্র ছাপাছেবের যুগে একজন নবী ছিলেন। ইবনে জারীর (রা) বলেন, আফরীদুন ও ছাপাছেব এই দুই বাদশাহর মাঝে যুগের পর যুগ ব্যবধান ছিল। এদের ব্যাপারে কেউ অজ্ঞ থাকতে পারে না। ইবনে জারীর (রা) বলেন, অভিজ্ঞ অভিমত এই যে, তিনি আফরীদুনের যুগের একজন লোক ছিলেন। তারপর তিনি বারবার হায়াত পেতে থাকেন। যিনি মূসা (আ)-কে পেয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত 'মনুচেহেরের' যুগে ছিল। আর এ মনুচেহের তার বাদশাহী তার দাদা থেকে মীরাছ সূত্রে পেয়েছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। তিনিই প্রথম বাদশাহ যিনি (যুদ্ধে) পরীখা খননের পদ্ধতি প্রথম প্রচলন করেছিলেন। আর তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম এলাকাভিত্তিক গভর্নর মনোনীত করেছিলেন। তার বাদশাহী কাল ছিল প্রায় একশত পঞ্চাশ বছর। বর্ণিত আছে যে, ইনি ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের বংশধর। এ লোকটির সুন্দর ভাষণ ও বিশুদ্ধ বচন লোকদেরকে আকর্ষণ করতো। বর্ণিত আছে, ইনি খলীলুল্লাহ (আ)-এর বংশধর। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— (হে নবী) স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কী স্বীকার করলে? এবং এ ব্যাপারে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে ওয়াদা নিলেন যে, তার পরে যেকোনো নবী আসবেন, তার সাহায্য করবে এবং তার প্রতি ঈমান আনবে। আর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সম্পর্কে সব নবী থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। কারণ, তিনি হলেন সর্বশেষ নবী।

সুতরাং হযরত খিযির (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে তারও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনা ও তাকে সাহায্য করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আর অবশ্যই তার সাথে সাক্ষাৎ না করে পারত না। তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তবে বদরের যুদ্ধের দিন অবশ্যই তিনি হুজুর ﷺ এর পতাকাতলে এসে দাঁড়াতেন। যেভাবে জিবরাইল (আ) ও ফেরেশতাদের অন্যান্য সর্দারগণ এসে পতাকাতলে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত খিযির (আ) ছিলেন নবী এটাই সঠিক কথা। কারো মতে তিনি ছিলেন একজন রাসূল, আবার কেউ বলেছেন তিনি ছিলেন একজন ফেরেশতা। যাই হোক না কেন, জিবরাঈল (আ) হলেন ফেরেশতাদের সর্দার। আর মূসা (আ) মর্যাদায় হযরত খিযির (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। মূসা (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ঈমান আনা তার জন্যেও জরুরী হতো। এ ক্ষেত্রে হযরত খিযির যিনি মর্যাদায় মূসা (আ)-এর তুলনায় একটু কম কিংবা অনেকের ধারণা অনুযায়ী যদি ওলীই হয়ে থাকতেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর তার ঈমান আনাটা এবং তার সাথে সাক্ষাৎ করাটা অবশ্যই জরুরী হয়ে পড়ত।

এতে প্রমাণিত হয় যে, খিযির (আ) জীবিত নন। যদি জীবিত থাকতেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও সাক্ষাৎ হতো। কিন্তু কোনো হাসান হাদীসে এমনকি দুর্বল হাদীসেও এরূপ কথা পাওয়া যায় নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খিযির (আ)-এর কিছু সময়ের জন্যে সাক্ষাৎ হয়েছে। যদিও হাকিম (রা)-এর একটি বর্ণনা আছে। যার সূত্র খুবই দুর্বল। খিযির (আ)-এর জীবন চরিত আলোচনায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

হযরত মূসা (আ)-এর জীবনে প্রথম পরীক্ষা

হাদীস গ্রন্থে 'ফুতূন' নামে একটি অধ্যায় আছে। যেখানে মূসা (আ) তার জীবনে যতগুলো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম আবূ আব্দুর রহমান নাসায়ী (রহ) তার সুনান গ্রন্থের 'তাফসীর অধ্যায়ে' আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর তাফসীরে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا .

"আর আপনি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, তারপর আমি আপনাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দেই। আমি আপনাকে বহু পরীক্ষা করেছি।" হাদীসটি হচ্ছে এই যে, সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি, এর অর্থ কি?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) উত্তরে বললেন, হে যোবায়ের! এ প্রশ্নটি আগামীকাল করে জেনে নেবে। (এখন সময় নেই) কারণ এ অনেক লম্বা কথা। (সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বললেন) আমি পরদিন সকাল বেলা পুনর্বার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বিষয়টি শোনার জন্যে উপস্থিত হলাম। যেহেতু তিনি আমাকে আজ এ দীর্ঘ হাদীসখানা শুনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলতে আরম্ভ করলেন— ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সেই ওয়াদা নিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা চলছিল, যে ওয়াদা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশের মধ্যে নবী ও বাদশাহদের ধারাবাহিকতা কায়েম রাখবেন। (ফেরআউনের কয়েকজন সঙ্গী বলল, এখনো বনী ইসরাঈল এমন একজন বাদশাহর আগনের অপেক্ষায় আছে, যিনি তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনবেন ও তা লাঘব করবেন। ফেরআউন এবং তার পরিষদবর্গের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা হযরত ইউসুফ (আ)-এর আগমনে পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি নবী ও বাদশাহ এ দুটো মর্যাদাসম্পন্ন পদেরই অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর পরে আল্লাহ তা'আলার এ ওয়াদা শেষ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হতে পারল না। তারা এ ভয় করল যে, এখনো তাদের থেকে বাদশাহ ও পয়গম্বর আসতে পারেন। যার আগমনে আমাদের রাজত্ব ও নেতৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এ চিন্তা করে ফেরআউন তার পরিষদবর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করল, এখন এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কী? পরিষদবর্গ ফেরআউনকে বুদ্ধি দিল যে, হে বাদশাহ ফেরআউন! একটি (শক্তিশালী) দল প্রস্তুত করে তাদের প্রত্যেককে একখানা ছুরি দিয়ে বনী ইসরাঈলের প্রতিটি ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দিন। তারা ঘরে ঘরে গিয়ে তালাশ করে নবজাতক পুত্র সন্তানকে হত্যা করবে। সভায় এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হলো। এ পরামর্শ অনুযায়ী জোরালোভাবে কাজ শুরু হয়ে গেল। এভাবে কিছু দিন চলল। এরপর ফেরআউনপন্থীদের খেয়াল হলো যে, বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধরা তো শ্রীঘ্রই স্বাভাবিকভাবেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে অল্পদিনের মধ্যেই বনী ইসরাঈলের পুরুষ লোকগুলো শেষ হয়ে যাবে। অথচ তাদের দ্বারাই তো আমরা নিজেদের যাবতীয় কাজ করাতাম। এখন যদি তারা সব শেষ হয়ে যায়, তবে এ কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজগুলো আমাদের নিজেদেরই তো করতে হবে। এ নিয়ে তারা চিন্তায় পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, এক বছর নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে। আর এক বছর তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এক বছর পর পর হত্যার কাজ চলবে। এতে বৃদ্ধের মধ্যে যারা মারা যাবে, ঐ বেঁচে যাওয়া সন্তানরা তাদের স্থান পূরণ করবে। আর তাদের দ্বারা আমাদের কাজ-কামগুলো চালান যাবে।

যারা মারা যাবে তাদের স্থানই পূরণ করবে, ঐ বেঁচে যাওয়া সন্তানরা। এতে বনী ইসরাঈলের লোক সংখ্যাও বাড়বে না। আর আমাদের কাজেরও বিঘ্ন ঘটবে না। সবাই এ সিদ্ধান্তে একমত হলো। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা গর্ভবতী ছিলেন। সে বছর বাচ্চা জীবিত রাখার বছর ছিল, সে বছরেই তার গর্ভ থেকে হযরত হারুন (আ) ভূমিষ্ট হন। এ কারণে তার মাতা তাকে নির্ভয়ে ভূমিষ্ঠ করেন। কিন্তু পরবর্তী যে বছরে পুত্র সন্তানদেরকে একের পর এক হত্যা করা হচ্ছিল, সে বছর মূসা (আ)-এর মাতা হযরত মূসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন। এতে তিনি (মাতা) অত্যন্ত ভীত পেরেশান ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ পর্যন্ত বলে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হে ইবনে যোবায়ের! এটাও পরীক্ষাসমূহের মধ্যে একটা বড় পরীক্ষা। অর্থাৎ এটা একটা কঠিন পরীক্ষা।

যে পরীক্ষায় তিনি সম্মুখীন হলেন মাতৃগর্ভে বসেই। অর্থাৎ তার পরীক্ষা শুরু হলো পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই। হযরত মূসা (আ)-এর মাতা মূসা (আ)-কে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার কাছে ইলহাম করলেন (অর্থাৎ তার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ বার্তা প্রেরণ করা হলো) যে, তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তাও করবে না, নিশ্চয়ই আমি তাকে (তোমার সন্তানকে) তোমার কাছে ফেরত পাঠাব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মূসা (আ)-এর মাতাকে আদেশ দিলেন যে, যখন তুমি সন্তান ভূমিষ্ঠ করবে, তখন তাকে একটি সিন্দুকে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। একদিন মূসা (আ)-এর মাতা সন্তান ভূমিষ্ঠ করেন ও আদেশ অনুযায়ী নবজাতক সন্তানকে সিন্দুকে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। যখন সিন্দুকটি মূসা (আ)-এর মাতার চোখের আড়ালে চলে গেল, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। তিনি (মাতা) মনে মনে বলতে লাগলেন, আমি আমার নিজ সন্তানের সাথে বিরূপ ব্যবহার করলাম? আমার সামনে যদি আমার সন্তানকে নিজ হাতে দাফন দিতে পারতাম এটাই তো আমার জন্যে খুব ভাল ছিল। আমি আমার সন্তানকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে কি সমুদ্রের জন্তু ও মাছের খাদ্য বানিয়ে দিলাম?

এদিকে সিন্দুকটিকে পানির স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে চলছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে সিন্দুকটি এমন এক স্থানে এসে থেমে গেল, যে স্থান হতে ফেরআউনের স্ত্রীর বাঁদীরা পানি ভরে নিয়ে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখতে পেয়ে তা উঠিয়ে নিল এবং খুলতে ইচ্ছা করল। কিন্তু হঠাৎ তাদের কারো মধ্যে এ ধারনা আসল যে, এর মধ্যে কোনো মূল্যবান সম্পদ থাকতে পারে। যদি আমরা একা খুলি তবে আমাদের মালিক আমাদেরকে সন্দেহ করতে পারে যে, হয়তো এর মধ্য হতে আমরা কিছু নিয়ে নিয়েছি। এ চিন্তা করে তারা (বাঁদিরা) বন্ধ করা অবস্থায়ই সিন্দুকটি নিয়ে ফেরআউনের স্ত্রীর সামনে হাজির করল। ফেরআউনের স্ত্রী সিন্দুকটি খুলে তার মধ্যে একটি ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু দেখতে পেলেন। শিশুটির প্রতি তার দৃষ্টি পড়া মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে শিশুটির প্রতি খুব মায়া-মহব্বত সৃষ্টি করে দিলেন। যে মহব্বত (ভালবাসা) ছিল গভীর।

মূসা (আ)-এর মায়ের অবস্থা

এদিকে মূসা (আ)-এর মা চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন। মূসা (আ) ছাড়া তার অন্তরে আর কিছুরই স্থান ছিল না। তার চিন্তা-ভাবনা শুধুমাত্র মূসা (আ)-কে নিয়েই। রাজ প্রাসাদে বাচ্চার আগমনের সংবাদ পেয়ে ফেরআউন বাহিনীর কসাইরা বাচ্চাটিকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ছুরি হাতে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো। (বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস (রা) বললেন) হে ইবনে যোবায়ের! এটাও ছিল মূসা (আ)-এর জন্যে একটি কঠিন পরীক্ষা। ফেরআউনের স্ত্রী বললেন, তোমরা একে রেখে দাও। যবেহ করো না। একটি শিশুর দ্বারা বনী ইসরাঈলের শক্তি বৃদ্ধি পাবে না। আমি ফেরআউনের কাছে যাচ্ছি। আমি তার কাছে বলে এ শিশুটিকে রেখে দেব। যদি সে (ফেরআউন) আমাকে দিয়ে দেয়, তবে তোমরা যে ধৈর্যধারণ করলে, এটা একটা ভাল কাজ হবে। আর যদি সে যবেহ করার আদেশ দেয়, তবে তোমাদেরকে আমি কোনো কিছু বলব না। অতঃপর স্ত্রী বাদশাহ ফেরআউনের কাছে গিয়ে বললেন, এ শিশুটি তোমার ও আমার চোখ শীতল করবে। দুর্ভাগা ফেরআউন বলল, তোমার জন্য হতে পারে। আমার একে কোনো প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শপথ সে মহান সত্তার, যার শপথ করা হয়ে থাকে! ফেরআউন যদি এ সময় নিজের চোখ শীতল করবে বলে স্বীকার করে নিত, যেভাবে তার স্ত্রী নিয়েছিলেন, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই হেদায়াত দান করতেন। কিন্তু ফেরআউনের এ ধৃষ্টতামূলক আচরণ তার হেদায়েতের প্রতিবন্ধকতা হয়ে গেল। ফেরআউন স্ত্রীর ভালবাসায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুটিকে রাখার অনুমতি দিল।

এরপর ফেরআউনের স্ত্রী তার বাঁদিদেরকে বললেন, যাও এ শিশুটিকে দুধ পান করানোর জন্যে একজন ধাত্রী তালাশ করে নিয়ে এসো। তারা যে মহিলাকেই নিয়ে আসত কারো দুধ শিশু (মূসা আ) পান করতেন না এবং স্তনও মুখে নিতেন না। শেষ পর্যন্ত ফেরআউনের স্ত্রী এ আশঙ্কা করলেন যে, শিশুটি হয় দুধ না খেয়ে শেষ পর্যন্ত

যারা-ই যায় কিনা। ফেরআউনের স্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি শিশুটিকে বাঁদিদের কোলে দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলেন, হয়তো যে কোনো এক মহিলার স্তন মুখে নিতে পারেন।

এ দিকে মূসা (আ)- এর মাতা সন্তানকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে গভীর চিন্তায় অস্থির ছিলেন। তিনি তার কন্যা অর্থাৎ মূসা (আ)-এর বোনকে বললেন, তুমি তার পেছনে পেছনে যাও এবং তালাশ করে দেখ, আমার কলিজার টুকরা জীবিত আছে না তাকে সামুদ্রিক জন্তু ইত্যাদি খেয়ে ফেলেছে? আল্লাহ তা'আলা যে মূসা (আ)-এর মাতাকে তার সন্তানকে তার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন, তিনি (মাতা) পুত্রের মায়ায় সে কথা ভুলে গিয়েছিলেন। মূসা (আ)-এর বোন মূসা (আ)-কে দূর থেকে দেখতেছিলেন। কিন্তু লোকজন তা অনুধাবন করতে পারছিল না। বোন দেখছে যে, ধাত্রীদের গমনাগমন চলছে। তখন সে (বোন) দেখল যে, সবাই ধাত্রীরা শিশুকে দুধ পান করাতে ব্যর্থ হলো এবং তার ভাই মূসা (আ) দুধ পান করানোর জন্যে কারো কোলে যাচ্ছেন না, তখন বোন খুব খুশি হলো। সে মহা আনন্দে বলে উঠল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব, যারা এই শিশুটিকে লালন-পালন করতে পারবে এবং তারা তার মঙ্গলকামী হবে।

লোকেরা বোনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিভাবে জানলে যে সে পরিবার এ শিশুটির মঙ্গলকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। (আর এ শিশুটি তার দুধ পান করবেন)। তবে কি তারা এ শিশুটিকে চিনে? বোনের এ কথায় লোকদের সন্দেহের সৃষ্টি হলো। (এ পর্যন্ত বলে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন) হে ইবনে যোবায়ের! এটাও পরীক্ষাসমূহের একটি পরীক্ষা।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে বোনের মুখ হতে এ উত্তর বেরিয়ে গেল যে, আমি তাদের কথা এজন্য বলছি যে, তারা বাদশাহর পরিবারের লোকদের সেবা করতে খুবই আগ্রহী এবং বাদশাহ থেকে তারা উপকৃত হওয়ারও কামনা করে থাকেন। সম্ভবত তাদের দুধ এ শিশু পান করতে পারেন। তারা খুব উদার ও নম্র-ভদ্র। বোনের এ কথায় লোকেরা তাকে ছেড়ে দিল এবং সেই পরিবারের মহিলাকে নিয়ে আসার জন্য বলল। বোন খুশিতে দ্রুত মায়ের কাছে গিয়ে পৌছলেন এবং এ সুখবর জানালেন। মাতা এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই যাত্রা করলেন এবং শান্ত হলেন। তিনি সেখানে পৌছে নিজ কলিজার টুকরাকে যখনই কোলে নেয়ার জন্য হাত বাড়ালেন, সাথে সাথে শিশু কোলে লাফিয়ে পড়লেন এবং স্তন চুষতে শুরু করল। শিশুটি তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করলেন। তারপর একজন সুসংবাদ বাহক দ্রুত ফেরআউনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে সুসংবাদ দিল যে, আমি আপনার পুত্রের জন্য ধাত্রী তালাশ করে নিয়ে এসেছি। তখন বাদশাহ ও তার স্ত্রী তাকে ডেকে পাঠালো। মা ও শিশু উভয়ই রাজ প্রাসাদে এসে হাজির হন। ফেরআউনের স্ত্রী মূসা (আ)-এর মায়ের সাথে তার গভীর সম্পর্ক দেখতে পেলেন যে, শিশু মূসা (আ) তার মায়ের বুকের সাথে লেগে আছেন। এ অবস্থা অবলোকন করে ফেরআউনের স্ত্রী বললেন, তুমি এ শিশুটিকেসহ আমার প্রাসাদে অবস্থান করো এবং একে দুধ পান করানোর খেদমতে রত থাক। কারণ, এ শিশুটিকে আমি সব চেয়ে অধিক ভালবাসি। মূসা (আ)-এর মা বললেন, আমি আমার ঘর-বাড়ী, সন্তান-সন্ততি ছেড়ে এখানে কোনোভাবেই থাকতে পারি না। আমার এ সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে একে আমার সাথে দিয়ে দেন। আমি একে আমার বাড়ীতে আমার সন্তানদের কাছে নিয়ে যাব। মূলত মূসা (আ)-এর মায়ের মনে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। (শিশুটিকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তুমি চিন্তা করে না) এ কারণে তিনি ফেরআউনের স্ত্রীর সামনে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলেন। মূসা (আ)-এর মা নিশ্চিত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ করবেন। তারপর মূসা (আ)-কে অতি উত্তমরূপে প্রতিপালন করাতে লাগলেন এবং কঠিন মসীবত থেকে হেফাযত করলেন। বনী ইসরাঈলের উপরও অত্যাচার, নির্যাতন আগের তুলনায় কিছুটা কমে গেল। শিশু মূসা (আ) তার মায়ের কাছে থেকে বড় হয়ে গেল। একদিন বাদশাহর স্ত্রী মূসা (আ)-এর মাকে বললেন, আমার ছেলেটিকে তুমি আমার সাথে দেখা করাবে? মা একদিনের জন্য ওয়াদা দিলেন। অতঃপর ফেরআউনের স্ত্রী তার ভাণ্ডার রক্ষক, বাঁদি ও রাজ দরবারের অন্যান্য পরিষদ বর্গ বললেন, আমার ছেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসছে। তোমরা তাকে

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করো। বাদশাহর স্ত্রীও ছেলের জন্য মূল্যবান সামগ্রী বাছাই করে রেখেছিলেন। মা যখন তার সন্তানটিকে নিয়ে রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করলেন, তখন বাদশাহর স্ত্রী আনন্দে অভিভূত হয়ে মূল্যবান উপহার দিয়ে তাকে বরণ করলেন। মূসা (আ)-এর মাতাকেও অনেক উপহার প্রদান করলেন। কারণ তিনি মূসা (আ)-কে উত্তমভাবে লালনপালন করেছেন। অতঃপর বাদশাহর স্ত্রী বললেন, আমি একন এ শিশুটিকে ফেরআউনের কাছেও নিয়ে যাব। যাতে তিনি এর চাইতেও মূল্যবান উপহার সামগ্রী প্রদান করে তাকে সম্মানিত করেন। বাদশাহর স্ত্রী শিশুকে নিয়ে বাদশাহর কাছে গেলেন। বাদশাহ ফেরআউন শিশু হযরত মূসা (আ)-কে নিজ কোলে নিল। কোলে বসে মূসা (আ) ফেরআউনের দাড়িতে হাত দিলেন ও দাড়ি ধরে নিচের দিকে টান দিলেন। এ সময় আল্লাহর দুশমন পথভ্রষ্ট ফেরআউনের আমলারা তাকে বলল, হে বাদশাহ! আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তার নবী সম্পর্কে কি ওয়াদা দিয়েছিলেন? তিনি তো এ কথা বলেছিলেন যে, তিনি (নবী) আপনার ধন-সম্পদ ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী হবেন, আপনার উপর বিজয়ী হবেন, আপনাকে পরাজিত করবেন। এ নিদর্শন তো এ শিশুটির মধ্যে পাওয়া গেল) তখন ফেরআউন শিশুটিকে যবেহ করার জন্য তার জল্লাদ বাহিনীকে ডেকে আনল। এ পর্যন্ত বলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হে যোবায়ের! এটাও ছিল এক মহা পরীক্ষা ফেরআউনের এ নিষ্ঠুরতার কথা তার স্ত্রী শুনে দ্রুত তার কাছে এসে বললেন, যে শিশুটি আপনি আমাকে দান করলেন, সেটির ব্যাপারে আপনি আবার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন? ফেরআউন বলল, তুমি কি তাকে দেখনি যে, সে আমার দাড়ি ধরে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলে আমার উপর বিজয়ী হতে চাচ্ছে। স্ত্রী বললেন, এ শিশু এ কাজটি বুঝেশুনে করেছে, তার স্পষ্ট প্রমাণ আপনি আমার কাছে পেশ করুন। যাতে সত্য জিনিসটা প্রকাশ পায়। আপনি এজন্যে দুটি জ্বলন্ত অঙ্গার ও দুটি মুক্তা এ শিশুটির সামনে রেখে দিন। যদি শিশুটি মুক্তা না ধরে অঙ্গার ধরে, তবে আপনি বুঝবেন যে, কোনো বিবেকবান এমন কাজ কখনই করতে পারে না। ফেরআউন প্রসঙ্গটি বিবেচনায় আনল। সে শিশুর সামনে এ দুটি বস্তু রাখলে শিশু মূসা (আ) অঙ্গার ধরলেন। ফেরআউন তার হাত থেকে অঙ্গারটি ফেলে দিল। যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। তখন ফেরআউনের স্ত্রী ফেরআউনকে বললেন, এখন দেখলে তো? ফেরআউন যে কঠোর চিন্তা করেছিল আল্লাহ তা থামিয়ে মূসা (আ)-কে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তা'আলাই প্রতিটি কাজের উত্তম ব্যবস্থাপক। অতঃপর মূসা (আ) যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন এবং যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন কোনো ফেরআউন বাহিনী কোনো ইসরাঈলীর উপর জুলুম নির্যাতন করতে সাহস করতো না। ফেরআউন বাহিনী একেবারে চুপ হয়ে গেল।

মূসা (আ)-এর আঘাতে এক কিবতী মারা যাওয়ার ঘটনা

একদা মূসা (আ) শহরের এক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় দেখতে পেলেন, শহরের এক কিনারে বসে দুটি লোক ঝগড়া করছে। একজন হলো ফেরআউনের লোক (কিবতী) আর অন্যজন ইসরাঈলী। ইসরাঈলী লোকটি ফেরআউনের লোকটির মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করার জন্য মূসা (আ)-কে ডাক দিলেন। মূসা (আ) কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, ফেরআউনের লোকটি ইসরাঈলীকে পরাজিত করে ফেলছে। কিবতীর হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, তিনি মূলত আমাদেরই সমর্থক। তবে ইসরাঈলী মহিলার দুধ পান করার কারণে তাদের সাথে কিছু সম্পর্ক আছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে এমন সব বিষয় অবগত করিয়েছিলেন, যা অন্যের ধারণার বাইরে ছিল। হযরত মূসা (আ) ফেরআউনী লোকটির মল্লযুদ্ধে লেগে গেলেন এবং তাকে এমন জোরে এক ঘুষি মারলেন, যাতে সে (কিবতী) সাথে সাথে মারা গেল। এ সময় আল্লাহ এবং ঐ ইসরাঈলী ব্যতীত আর কেউই উপস্থিত ছিলেন না। মূসা (আ)-ও বুঝতে পারছিলেন না যে, এতেই সে মারা যাবে। সুতরাং মূসা (আ) তখন বললেন, এটা তো শয়তানের কর্ম! সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।

অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম (অন্যায়) করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর তাকে (আল্লাহ) ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে

আরো বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। তারপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হলো। -সূরা কাসাস : ১৩-১৮

অপরদিকে ফেরআউনের কাছে অভিযোগ এসে পৌছল যে, এক ইসরাঈলী আমাদের এক কিবতীকে হত্যা করেছে। সুতরাং আমরা এর প্রতিশোধ নিব। ইসরাঈলীদেরকে আর কোনো ছাড় দেয়া হবে না। ফেরআউন বলল, হত্যাকারীকে তালাশ করে আমার কাছে নিয়ে এসো এবং হত্যার ব্যাপারে সাক্ষীও উপস্থিত করো। কারণ, যদিও বাদশাহ তার জাতির কল্যাণকামী ও তাদের জন্য নিবেদিত, কিন্তু এজন্য বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে কাউকে হত্যা করা শোভনীয় নয়। সুতরাং তালাশ করে আমাকে বলো। তোমাদের অধিকার আমি যথাযথভাবে প্রদান করব। (অর্থাৎ এর প্রতিশোধ আমি নিব) সুতরাং নিহত ব্যক্তির লোকেরা শহরে ঘুরতে লাগল। কিন্তু হত্যাকারীকে খুজে পেল না এবং কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও পেল না। এদিকে মূসা (আ) হঠাৎ পুনরায় শহরে ঐ ইসরাঈলীকে দেখতে পেলেন যে, সে অন্য আর এক ফেরআউনী লোকের সাথে ঝগড়া করছে। ইসরাঈলী মূসা (আ)-কে দেখা মাত্রই তাকে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। মূসা (আ) একটু এগিয়ে গেলেন। কিন্তু আগের দিনের কৃতকর্মের জন্য তিনি খুবই লজ্জিত ছিলেন। ইসরাঈলী লোকটিকে আগের দিনের মতো অন্য আর এক কিবতীর সাথে ঝগড়া করতে দেখে ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে ভর্ৎসনা করলেন। ইসরাঈলী দেখল যে, মূসা (আ) আগের দিনের মতো তার সমর্থনে এগিয়ে আসছে না; বরং তিনি তার বিরোধী হয়ে গেছেন। মূসা (আ) ইসরাঈলীকে বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন উচ্ছৃঙ্খল লোক। ইসরাঈলী মনে করলো যে, গতকাল তিনি রাগান্বিত হয়ে ফেরআউনী লোকটিকে ঘুষি মেরে শেষ করে দিয়েছিল। এখন আমার উপর তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত। আমাকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন। সুতরাং আমাকেও হয়তো হত্যা করতে পারেন। অথচ হযরত মূসা (আ)-এর এরূপ কোনো ইচ্ছাই ছিল না।

এ ধারণা করে ইসরাঈলী যা বলার ছিল না, তা বলে ফেলল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তাদের দু'জনের (ইসরাঈলী ও কিবতীর) পারস্পরিক ঝগড়া তো বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু অনুসন্ধানকারী ফেরআউন বাহিনী প্রমাণ পেয়ে গেল। তারা ফেরআউনের কাছে পৌছে তাকে বিস্তারিত ঘটনা জানাল। তারা এ কথাও বললো যে, ইসরাঈলী মূসা (আ)-কে বলেছে যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও যেভাবে গতকাল তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে? এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ কিবতীর হত্যাকারী মূসা (আ) নিজেই। ফেরআউন এ তথ্য পেয়ে তার জল্লাদ বাহিনীকে মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্যে প্রেরণ করল। ফেরআউনের জল্লাদ বাহিনী মূসা (আ)-এর তালাশে বড় এক রাস্তা দিয়ে গমন করছিল। তাদের ধারণা ছিল, মূসা (আ) তাদের থেকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। ইত্যবসরে হযরত মূসা (আ)-এর জাতির এক লোক অন্যদিক দিয়ে সংক্ষিপ্ত রাস্তা ধরে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে এসে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে সব ঘটনা বললেন। (হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হে ইবনে যুবায়ের! এটাও ছিল একটি মহা পরীক্ষা।)

মূসা (আ)-এর মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা

হযরত মূসা (আ) এ সব কথা শুনে সাথে সাথে শহর থেকে বেরিয়ে মাদাইয়ানের দিকে রওয়ানা হলেন। এর পূর্বে তিনি কোনো সময় কোনো কষ্টের সম্মুখীন হন নি। বরং তখন রাজকীয় ব্যবস্থাপনা তার জন্য সহজলভ্য ছিল। আর রাস্তা-ঘাট সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা ছিল না; বরং তিনি তার পরওয়ারদেগারের উপর আস্থা রেখেই যাত্রা করলেন। কিছুই তার জানা ছিল না যে, তিনি কোথায় যাচ্ছেন। শহর থেকে বের হতে হবে, আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বের হলেন। আল্লাহ তা'আলাই পথপ্রদর্শন করবেন। তিনি রওয়ানা হয়ে মাদইয়ানের একটি কূপের কাছে গিয়ে পৌছলেন এবং সেখানে অনেক লোককে দেখতে পেলেন। যারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে। তাদের পিছনে দুটি মেয়ে তাদের পশুকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত মূসা (আ) মেয়েদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের উদ্দেশ্য কী? তোমরা আলাদা স্থানে কেন এভাবে দাঁড়িয়ে আছ এবং তোমাদের পশুগুলো কেন পানি পান করাচ্ছ না? মেয়ে দুটি বলল, আমাদের এ শক্তি নেই যে, মানুষের মধ্যে ঢুকে কূপের কাছে পৌছে

পশুকে পানি পান করাব; বরং আমরা অবশিষ্ট পানির অপেক্ষা করছি। হযরত মূসা (আ) তাদের বকরিগুলোকে পানি পান করিয়ে দিলেন।

মূসা (আ) সবার আগে গিয়ে বড় বালতি দিয়ে এত পরিমান পানি তুলেছিলেন যে, তাদের সব বকরি পনি খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিল। তারপর লজ্জাশীলা মেয়ে দুটি বাড়িতে ফিরে গেল। হযরত মূসা (আ) সেখান থেকে চলে এসে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন। তিনি ক্ষুধায় অত্যন্ত দুর্বল হয়ে আল্লাহর কাছে বলতে লাগলেন, হে আমার রব! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবেন, তার আমি কাঙ্গাল।

এদিকে কন্যাদ্বয় খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌছলে তাদের পিতা খুব আশ্চর্য হয়ে যান যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বকরিগুলো তৃপ্তিসহ পানিও পান করেছে এবং তাদের স্তনগুলোও দুধে ভরপুর, ব্যাপার কি? পিতা কন্যাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে আসলে? তারা তখন মূসা (আ)-এর বিষয়টি পিতাকে জানালেন যে, এক যুবক তাদেরকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ কথা শুনে পিতা তার এক মেয়েকে পাঠিয়ে মূসা (আ)-কে ডেকে আনালেন। মূসা (আ) তার কাছে হাজির হয়ে বিস্তারিত ঘটনা তাকে জানালেন। তিনি (পিতা) ঘটনা শুনে মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সম্প্রদায় থেকে বেঁচে গিয়েছ। অর্থাৎ ফেরআউন ও তার জাতির আমাদের উপর কোনো কর্তৃত্ব নেই। আর আমরা তাদের রাজত্বেও অবস্থান করছি না। ইত্যবসরে এক কন্যা বলে উঠল, মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত। এ যুবকের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান আছে।

কন্যার এ কথায় পিতা তার আত্মমর্যাদাবোধের প্রতি খেয়াল করে জিজ্ঞেস করলেন, তার শক্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তুমি কিভাবে জানলে? কন্যাটি বলল, তার শক্তির বুঝতে পেরেছি কূপ থেকে বড় বালতি দিয়ে পানি উঠান দ্বারা। এভাবে কাউকে কোনো দিন পানি উঠাতে দেখি নি। আর বিশ্বস্ততার প্রমাণ এভাবে পেয়েছি যে, যখন আমি তার কাছে আপনার পয়গাম নিয়ে পৌছেছি, তখন তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করেই যখন বুঝতে পারলেন যে, আমি একটি মেয়ে। সাথে সাথে তিনি তার দৃষ্টিকে নিচু করলেন। আর আমাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে পেছনে থেকে আমাকে পথ বাতলিয়ে দাও।

এরূপ ব্যবহার বিশ্বস্ত ব্যক্তিরই হয়ে তাকে। পিতা কন্যার কথায় খুব খুশি হলেন এবং কন্যার কথা শুনে মূসা (আ)-এর প্রতি তার সুধারণা সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি দশ বছর পূর্ণ করো সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। –সূরা কাসাস : ২৭

সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেছেন, আমাকে একজন ঈসায়ী আলেম জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার কি জানা আছে যে, মূসা (আ) কোন মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, না এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। (সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা) বলেন) অতঃপর আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তোমার কি জানা নেই যে, আট বছর পূর্ণ করা তো আল্লাহর নবীর জন্যে আবশ্যক ছিল। এর থেকে তিনি কোনো কম করতে পারতেন না। তিনি আরো বললেন, (হে যোবায়ের!) তোমার কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দ্বারা যে সব ওয়াদা পূর্ণ করান, সে ওয়াদা তিনি করেছেন। সুতরাং হযরত মূসা (আ) দশ বছর কালই পূর্ণ করেছিলেন। (সাঈদ ইবনে যোবায়ের বলেন) এরপর আমি একদিন সেই ঈসায়ী আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ সংবাদ জানালাম। সে বলল, যার কাছে তুমি জিজ্ঞেস করেছ, আমি তার সম্পর্কে তোমাকে বলে দিচ্ছি যে, তিনি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানবান। উত্তরে আমি বললাম, আপনার কথা একেবারেই সঠিক। তিনি আমার চেয়ে অনেক উত্তম।

তারপর মূসা (আ) যখন তার পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি পথে লাঠি ও উজ্জ্বল হাত ইত্যাদি মুজেযাস্বরূপ (অলৌকিক ঘটনা) এবং নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন। যা কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। অতঃপর

হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজ যবানের (মুখের) জড়তা এবং ফেরআউনী লোকটির হত্যার ব্যাপারে ফেরআউন থেকে যে আশঙ্কাবোধ করেন, সে ব্যাপারে আবেদন পেশ করলেন যে, মুখের জড়তা বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে এক প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ আমি ভালভাবে লোকদেরকে বুঝাতে সক্ষম হব না। কারণ আমার মুখে জড়তা আছে সুতরাং আমার ওযীর (সাহায্যকারী) হিসেবে আমার ভাই (হারুন)-কে আমার সাথে দিয়ে দেয়া হোক। সে আমার পাশে থেকে আমার সাহায্য করবে এবং বড় বড় মজলিসে সুন্দর ভাষায় লোকদের সাথে কথা বলবে। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর এ দাবি পূরণ করেন। আর মুখের জড়তা অনেক কমিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত হারুন (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, তুমি সামনে অগ্রসর হয়ে মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করো (এবং তাকে অভ্যর্থনা জানাও)।

ফেরআউনের কাছে হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর আগমন

হযরত মূসা (আ) তার লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং হারুন (আ)-এর সাথে মিলিত হন। তারপর তারা দু'জনে মিলে ফেরআউনের রাজ প্রসাদে পৌঁছলেন। তারা দীর্ঘ সময় প্রধান ফটকে অপেক্ষা করেন। কারণ তারা প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছিলেন না। পরে কঠোর নিরাপত্তার মাধ্যমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলো। তারা ফেরআউনের কাছে পৌঁছে বললেন, আমরা আপনার রবের রাসূল। ফেরআউন জিজ্ঞেস করল, তোমাদের রব কে? (এর পরবর্তী ঘটনা আগে বর্ণনা করা হয়েছে) ফেরআউন বলল, এখন তোমাদের উদ্দেশ্য কী? এ সময় সে পুরনো কিবতী হত্যার কথাও তুলে ধরল। হযরত মূসা (আ) বললেন, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনি আমার (নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনবেন এবং বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে দিয়ে দিবেন। ফেরআউন মূসা (আ)-এর এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে বলল, তুমি সত্যবাদী হলে কোনো নিদর্শন পেশ করো। তারপর মূসা (আ) তার লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করলেন, সাথে সাথে সেটি একটি বিশালকায় অজগর সাপে পরিণত হলো। সে অজগরটি মুখ হা করে ফেরআউনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ফেরআউন এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ভয়ে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং সাপটিকে থামিয়ে রাখার জন্যে মূসা (আ)-এর কাছে আবেদন করল। মূসা (আ) সাপটিকে থামিয়ে দিলেন। এরপর মূসা (আ) দ্বিতীয় নিদর্শনটি পেশ করলেন। তিনি তার নিজ হাতখানা বগলে প্রবেশ করিয়ে বের করলেন। সাথে সাথে হাতখানা নিখুঁত সাদা উজ্জ্বলময় চাকচিক্য হয়ে গেল। তারপর হাতখানা পুনরায় বগলে প্রবেশ করালেন। সাথে সাথে হাতখানা পূর্বের আসল আকৃতিতে এসে গেল। ফেরআউন এ ব্যাপার তার মন্ত্রীবর্গের সাথে পরামর্শ করল। তারা বলল, এ দুজন যাদুকর। তারা চায় তাদের জাদুর দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বের করে দিতে এবং তোমাদের উত্তম জীবনব্যবস্থা ধ্বংস করতে। অর্থাৎ এ দেশ থেকে তারা আপনাকে বহিষ্কার করতে চাচ্ছে যে দেশে আপনি অত্যন্ত আরাম-আয়েশের সাথে জীবনযাপন করছেন। মূসা (আ) তাদের কাছে যে প্রস্তাবগুলো পেশ করেছিলেন, মন্ত্রীবর্গ সেগুলো ত্যাগ করে দিল। তারা (মন্ত্রীবর্গ) ফেরআউনকে পরামর্শ দিলো যে, আপনার রাজত্বে অনেক যাদুকর আছে। তাদেরকে জমায়েত করুন। আপনার সে যাদুকরদের দ্বারাই এ দু'জনকে পরাজিত করা যাবে। তারপর ফেরআউন যাদুকর সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শহরে তার লোকজন পাঠিয়ে দিলো। তার যাদুরকদেরকে রাজদরবারে সম্মিলিত করল। যাদুকরেরা বাদশাহর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল যে জাদুকরের সাথে আমাদের মোকাবিলা হবে সে কি দিয়ে জাদু চালাবে। ফেরআউন বলল, সে সাপ দ্বারা জাদু দেখায়। যাদুকরেরা বলল আল্লাহর কসম! পৃথিবীতে সাপ ও রশি দিয়ে জাদু প্রদর্শনে আমাদের চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কেউ নেই। মোকাবিলার জন্যে তাদের মহা উৎসবের দিবস ধার্য হলো। সবাইকে বলা হলো তারা যেন সকাল বেলা ময়দানে এসে সমবেত হয়। সাঈদ (রা) বলেছেন, আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, উৎসবের দিনেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফেরআউন ও তার যাদুকরদের উপর বিজয় দিয়েছিলেন, সেদিন ছিল আশুরার দিন। অর্থাৎ দশই মহররম সেই ধার্যকৃত দিবসে লোকেরা সমবেত হতে শুরু করল। লোকেরা একে অপরকে বলতে লাগল, চল চল, আজ মূসা (আ) ও ফেরআউনের যাদু স্বচক্ষে দেখব। যদি মূসা ও হারুন (আ) জয় লাভ করে, তবে আমরা তাদের অনুসরণ করব।

তারা এ কথাটা বলেছিল বিদ্রূপ করে। মূলত এ কথাটা তাদের আন্তরিক কথা ছিল না। যখন লোকেরা এসে সম্মিলিত হলো এবং যাদুকরেরা তাদের যাদুর আসবাবপত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল, তখন যাদুকর মূসা (আ)-কে বলল, হে মূসা তুমি প্রথম (তোমার যাদু) নিক্ষেপ কর, নতুবা আমরাই (আমাদের যাদু) প্রথম নিক্ষেপ করি।

হযরত মূসা (আ) বললেন, তোমরাই (আগে) নিক্ষেপ কর। তারপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরআউনের সম্মানের কসম! আমরাই হব বিজয়ী। হযরত মূসা (আ) তাদের এ যাদু রেখে প্রথমে একটু ভীত হয়ে পড়েন। সাথে সাথে তাকে আল্লাহ তা'আলা তার ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন হে মূসা! তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। লাঠি যমীনে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে, সেটি একটি বিশাল অজগর সাপে পরিণত হয়ে গেল। সেটি ছিল বিশাল লম্বা ও বড় মুখবিশিষ্ট।

মূসা (আ)-এর সাপটি মুখ হা করে রইল। আর ফেরআউনের যাদুকরের যাদুর রশিগুলো সব অজগরের মুখে ঢুকতে লাগল। এভাবে করতে করতে সমস্ত রশি, লাঠি ও সাপগুলো অজগরটি গিলে ফেলল। যাদুকরেরা এ ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে চিন্তা করল যে, যদি এরা সত্যিই যাদুকর হতো তবে তাদের যাদু আমাদের যাদুগুলোকে কখনই গ্রাস করতে পারত না। বরং অবশ্যই এ নিদর্শনগুলো আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত।

অতএব, আমরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, এ সমস্ত কিছুই মেনে নিলাম। আর আমাদের ভুলের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করলাম। এ অবস্থা দেখে ফেরআউন মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ল। সকলের সামনে ফেরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গ পরাজিত হলো। আর তাদের কাজগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হলো। তারা পরাজিত হলো এবং অপমান হয়ে ফিরে গেল। অন্য দিকে রাজপ্রাসাদে বসে ফেরআউনের স্ত্রী অত্যন্ত বিনয় মিনতির সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত মূসা (আ)-এর সাহায্য এবং ফেরআউনের পরাজয় কামনা করে দো'আ করছিলেন। তার এ প্রার্থনা ফেরআউন বাহিনীর লোকেরা দেখে মনে মনে খুশি হলো, তিনি তার স্বামী ফেরআউনের বিজয়ের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করছেন। মূলত তার প্রার্থনা ছিল হযরত মূসা (আ)-এর জন্য। বারবারই ফিরেআউন তার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগল। যখনই কোনো দৃষ্টান্ত তার কাছে পেশ করা হতো, তখন সে মূসা (আ)-এর কাছে ওয়াদা দিত যে, আমি বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই তোমাদের সাথে দিয়ে দিব। আর যখন সে শাস্তি তাদের থেকে সরিয়ে নেয়া হতো, তখনই ওয়াদা ভঙ্গ করতো এবং ধৃষ্টতার সাথে বলতো, তোমাদের রব কি এটা ছাড়া অন্য আর কোনো শাস্তি প্রেরণ করতে পারেন? অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ইত্যাদি প্রকাশ্য শাস্তিরূপে প্রেরণ করেন। অতঃপর তারা প্রত্যেকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে এসে অভিযোগ করে এবং এই বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিত যে, আমরা ঈমান আনব। আমাদের থেকে এ শাস্তিগুলো সরিয়ে দিন। যখন তাদের থেকে শাস্তিসমূহ সরিয়ে নেয়া হয়, সাথে সাথে তারা পূর্বের মতো ওয়াদা ভঙ্গ করে। এভাবে চলতে লাগল। একদিন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তার জাতিকে নিয়ে বের হতে নির্দেশ দিলেন। মূসা (আ) রাতেই তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ফেরআউন সকাল বেলা যখন দেখল যে, মূসা (আ) তার লোকজন নিয়ে শহর ত্যাগ করেছেন, সাথে সাথে সৈন্য বাহিনী একত্রিত করার জন্য তার বিশেষ বাহিনীকে শহরে প্রেরণ করল। অতঃপর তিনি সমুদ্রের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন। এ সময়ে ফেরআউন এর বাহিনীর অগ্রভাগ নদীর কিনারায় এসে পৌঁছেছে। সমুদ্র হঠাৎ তার রবের নির্দেশ ও মূসা (আ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বারটি রাস্তায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। যখন মূসা (আ) তার সমস্ত লোকজন নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ওপার উঠে গেলেন, তখন ফেরআউন তার শক্তিধর বাহিনীকে নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করল। সমুদ্র তার পথ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে ডুবিয়ে মারল। মূসা (আ) পার হয়ে ওপারে ওঠার পরে তার কিছু সংখ্যক সাথী এ আশঙ্কা করছিলেন যে, সম্ভবত ফেরআউন ডুবে মারা যায় নি। আমরা তার মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। তারপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন, আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্র ফেরআউনের মৃত দেহটি তীরে নিক্ষেপ করে দিলো। সবাই তার মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখলো। তখন সবাই নিশ্চিত হলো যে, সে ফেরআউন মারা গেছে।

বনী ইসরাঈলের পরবর্তী ঘটনাসমূহ

সমুদ্র পার হয়ে বনী ইসরাঈল একটি জাতি নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় দেখতে পেল যে, তারা তাদের মূর্তিগুলোর সম্মুখে মাথানত করে পড়ে আছে। তখন বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলল, হে মূসা (আ)! তাদের উপাস্যের মতো আমাদের জন্যেও এক উপাস্য (দেবতা) গড়ে দাও। তিনি বললেন, তোমরা তো এক মূর্খ জাতি, এ সব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধ্বংসশীল এবং তারা যা করছে তাও ভ্রান্ত (অমূলক)। অর্থাৎ হে আমার গোত্রের লোকেরা! তোমরা পেছনে (সমুদ্র পার হওয়ার) বিরাট এক দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছ এবং উপদেশ শুনেছ। যা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। এ ঘটনাটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। তারপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে একটি স্থানে অবতরণ করিয়ে বললেন, তোমরা এখানে অবস্থান করো এবং হারুনের অনুকরণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকে তোমাদের খলীফা মনোনয়ন করেছেন। আমি ত্রিশ দিনের জন্য আমার প্রতিপালকের কাছে যাচ্ছি। এরপর তোমাদের কাছে ফিরে আসব। অতঃপর হযরত মূসা (আ) স্বীয় রবের কাছে আসলেন এবং ত্রিশ দিনের মধ্যে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা করলেন এবং ত্রিশ দিন ও রাত রোযাও রেখেছিলেন। মূসা (আ) মনে মনে ভাবলেন যে, রোযা রাখার কারণে মুখে একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। তিনি এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করলেন না। তাই তিনি দুর্গন্ধ দূর করার জন্যে মেসওয়াক করে নিলেন। মুখ পরিষ্কার করে যখন মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সমীপে হাযির হলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করলেন, হে মূসা! তুমি কেন রোযা ভঙ্গ করলে? (অর্থাৎ মিসওয়াক করে রোযা কেন ভঙ্গ করলে?) অথচ এটি করার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবহিত ছিলেন। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমি আপনার সাথে মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে কথা বলব এটা আমার কাছে খুবই অপছন্দনীয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে মূসা! তুমি জান না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মেশকের ঘ্রাণের চেয়েও পছন্দনীয়। সুতরাং তুমি ফিরে যাও এবং আরো দশটি রোযা রেখে আস। মূসা (আ) তার রবের নির্দেশ পালন করলেন। এদিকে যখন মূসা (আ)-এর জাতির লোকেরা দেখল যে, হযরত মূসা (আ) ফিরে আসছেন না, তখন তাদের কাছে খুব খারাপ লাগছিল। হযরত হারুন (আ) তাদেরকে খুব ওয়াজ নসীহত করেছিলেন যে, তোমরা মিশর ত্যাগ করে এসেছ। ফেরআউনী লোকদের অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার আমানত ও কর্জ তোমাদের কাছে আছে। আমার মতে তোমাদের যে আসবাবপত্র, ধন-দৌলত তাদের কাছে রয়ে গেছে, তোমরা আল্লাহর কাছে সেগুলোর সাওয়াবের আশা করতে পার। আর তাদের সম্পদ যা আমানত হিসেবে কিংবা কর্জ হিসেবে তোমাদের কাছে রয়েছে, তা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এখন সেগুলো তাদেরকে ফেরত দেয়াও সম্ভব নয়। আর আমাদের কাছে রাখাও সমীচীন নয়। হযরত হারুন (আ) একটি গর্ত খনন করলেন এবং গোত্রের লোকদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন তাদের সকল মালামাল ও স্বর্ণঅলঙ্কারাদি এ গর্তে ফেলে দেয়। তারপর হারুন (আ) সেগুলো সব জ্বালিয়ে দিলেন এবং বললেন, এগুলো না আমাদের জন্য, না তাদের জন্য। সামিরী নামক এক লোক ছিল। সে ছিল বাছুরপূজক জাতির একজন। এ জাতিটি বনী ইসরাঈলের পড়শী ছিল। কিন্তু তারা বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ লোকটি হযরত মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের সাথে এসে গিয়েছিল। সে (সামিরী) সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার পায়ের নীচের ধুলো থেকে এক মুষ্টি ধুলো রেখে দিয়েছিল। যখন হযরত হারুন (আ) লোকদের স্বর্ণালঙ্কার গর্তে জ্বালিয়ে দিল, তখন সামিরীও সেই ধুলো হাতের মুষ্টির মধ্যে নিয়ে সেখানে পৌঁছল। হযরত হারুন (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে সামিরী! তোমার হাতের মধ্যে কি, যা তুমি গর্তে নিক্ষেপ করছ না? সে বলল, এটা সেই দূতের ঘোড়ার পায়ের ধুলো, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে সমুদ্র পার করিয়ে দিয়েছেন। আমি এটা কোনো অবস্থাতেই গর্তে নিক্ষেপ করতে পারি না। তবে এ শর্তে নিক্ষেপ করতে পারি সেটা হলো, আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দো'আ করবেন যে, এটা নিক্ষেপের মধ্যে আমার যে উদ্দেশ্য তা যেন আল্লাহ পূরণ করেন। এ শর্ত মেনে নিলে আমি এটা গর্তে নিক্ষেপ করব। হযরত হারুন (আ) দোয়া করলেন। অতঃপর সামিরী তার হাতের ধুলো গর্তে নিক্ষেপ করে বলল, আমি চাই এগুলো যেন বাছুরে

রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে গর্তের যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, পিতল ও অন্যান্য আসবাবপত্র ছিল সবগুলো একটি প্রাণহীন বাছুরের আকার হয়ে গেল। সেটির মধ্যে প্রাণ ছিল না, তবে কিছু আওয়াজ ছিল। মূসা (আ) পথ ভুলে গিয়েছেন। এক দল বলল, মূসা (আ) ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটাকে মিথ্যা বলব না। তিনি যদি আমাদেরকে বলেন যে, এটা আমাদের রব, তবে আমরা এটাকে বিনষ্ট করব না এবং এর উপাসনায় লিপ্ত হব। আর যদি এটাকে তিনি রব না বলেন, তবে আমরা মূসা (আ)-এর কথাই অনুসরণ করব। একদল বলল, এটা শুধুমাত্র শয়তানের কাজ। এ আমাদের রব কিভাবে হতে পারে? আমরা একে বিশ্বাস করি না এবং এর প্রতি ঈমানও রাখি না। এভাবে তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রথম দলটি সামিরীর কথাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিল এবং সেটাকে সত্য বলে প্রকাশ্যে ঘোষণাও করেছিল। হযরত হারুন (আ) তাদেরকে বললেন, হে আমার জাতি! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের রব দয়াময়। তারা বলল, মূসা (আ)-এর খবর কী? ত্রিশ দিনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন চল্লিশ দিন কাটাচ্ছেন। তিনি কি আমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন? মূর্খরা বলল, মূসা (আ) তার রবকে খুঁজছেন। অথচ তার রব এদিকে। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বললেন, মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা যেসব খবর দেন, তার মধ্যে একটি খবর এও ছিল যে, তোমার জাতি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এতে মূসা (আ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ক্রোধান্বিত হয়ে নিজ জাতির কাছে ফিরে আসেন, তা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করা হয়েছে। মূসা (আ) তার ভাই হারুন (আ)-এর মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলেন এবং ক্রোধে ফলকগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর ভাইয়ের অপারগতার কথা শুনে তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামিরীকে লক্ষ্য করে মূসা (আ) বললেন, তোমাকে এসব কাজ করতে কোন জিনিসে প্ররোচিত করেছে? সামিরী বলল, আমি জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন থেকে এক মুষ্টি ধুলো উঠিয়ে রেখেছিলাম। আমি এর মধ্যে যা কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার দেখেছি, তা আপনার কাছে অজানা ছিল বলে আমি মনে করেছিলাম। তারপর আমি সেই ধুলো গর্তে নিক্ষেপ করলাম। আমার মন (নফস্) এরূপ করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করেছে। মূসা (আ) বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও। তোমার জীবনের জন্য এই (অভিশাপ) হয়ে রইলো যে তুমি বলবে, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। আর তোমার জন্যে রইলো (শাস্তির) প্রতিশ্রুতির দিন। যার অন্যথা করা হবে না। আর চেয়ে দেখ, যেই উপাস্যের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়েছ, আমি সেটিকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব ও সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করব। যদি এটা সত্যিই উপাস্য (মাবূদ) হতো, তবে এটির অবস্থা এরূপ হতো না। তারপর বনী ইসরাঈল এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলো যে, তারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হচ্ছে। আর যাদের মতামত হারুন (আ)-এর পক্ষে ছিল, তারা খুব খুশি হলো এবং নিজ জাতির লোকদের জন্যে মূসা (আ)-এর কাছে আরয করলেন, হে মূসা (আ)! আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য তওবা করার এক পথ বাতলিয়ে দেন। তখন মূসা (আ) তার জাতি থেকে সত্তরজন লোককে বাছাই করে সাথে নিলেন। যারা ভাল কাজের ব্যাপারে পিছনে থাকেন না এবং আল্লাহর সাথে শরীক করেন না। মূসা (আ) তাদের নিয়ে তওবা করার জন্য (তূর পাহাড়ের দিকে) চললেন। অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আ) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন যে, তিনি তার জাতির লোকদের কাছে গিয়ে কি বলবেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে বললেন, হে আমার রব! ইচ্ছে করলে আপনি তাদেরকে ও আমাকে এর পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তাদের কৃতকর্মের জন্যে কি আমাদেরকে আপনি ধ্বংস করবেন? মূসা (আ)-কে বলা হলো, তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যাদের অন্তর বাছুরের ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। যে কারণে আল্লাহর শাস্তি ভূমিকম্প তাদেরকেসহ আঘাত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জীলে, যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।

—সূরা আরাফ : ১৫১-১৫৭

তারপর মূসা (আ) আরয করলেন, হে আমার রব! আমি আমার জাতির জন্যে তওবা কবুলের প্রার্থনা করছি, আপনি তো বলেছেন, আপনার দয়া আমার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি আমাকে সুযোগ দিয়ে সেই দয়াপ্রাপ্ত জাতির প্রতি অবতীর্ণ করতেন, তবে কতইনা ভাল হতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের তওবা কবুলের পদ্ধতি হলো এই যে, তাদের মধ্যে যারা শিরক থেকে পবিত্র তারা প্রত্যেকে অন্যজনকে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করবে। চাই সে ব্যক্তি পিতা হোক, পুত্র হোক বা নিজ বংশের লোক হোক। আর এ ব্যাপারে পরোয়া করবে না যে, কে কে হত্যা হলো। কিছু সংখ্যক এমন লোকও ছিল, তওবা কবুলের এই কঠিন রীতির কথা শুনে, স্বীয় পাপের কথা গোপন রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে মূসা (আ)-কে সংবাদ দিয়েছেন। পরে তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে এবং নির্দেশকে আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়কেই ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর হযরত মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পরে ফলকগুলো তুলে নিলেন। ফলকে যা কিছু লেখা ছিল সে অনুযায়ী বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু এ উপদেশ তারা তাদের জন্য কঠিন মনে করল। এ উপদেশ তারা মেনে নিতে রাজি হলো না। অতঃপর আল্লাহ তাদের মাথার উপর পাহাড় উত্তোলন করলেন। মনে হচ্ছিল যেন, মেঘ তাদের উপর এসে জমে গেছে। পাহাড় এত নিকটে এসে গেল যে, তারা আশঙ্কা করছিল, এখনই এ পাহাড় তাদের মাথার উপর ভেঙে পড়বে। এ ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে বনী ইসরাঈল কিতাব হাতে নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল, কখন না জানি পাহাড় ভেঙে তাদের মাথার উপর পড়ে যায়। হাতে কিতাব নিয়ে তারা স্বীকার করল যে, আমরা অবশ্যই এ কিতাবের সব কথা মেনে চলব। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর থেকে পাহাড় সরিয়ে নিলেন। অতঃপর তারা রওয়ানা হয়ে পবিত্র ভূমিতে গিয়ে পৌঁছলেন। তারা সেখানে এমন একটি শহর পেল, যেখানে জাব্বারীন নামক এক অত্যাচারী জাতি ছিল। তারা ছিল বিশাল দেহবিশিষ্ট ও চরিত্রহীন। তাদের ফলসমূহের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেগুলো ছিল খুবই বড়। তারপর বনী ইসরাঈল বলল, হে মূসা! আমাদের মাঝে রয়েছে জাব্বারীন জাতি। এদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত এ শহরে থাকবে, ততক্ষণ আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। তারা যদি শহর হতে বেরিয়ে যায়, তারপর আমরা প্রবেশ করব।

জাব্বারীন জাতির মধ্য হতে দু'ব্যক্তি বলল, আমরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনলাম। তারপর তারা বলল, তোমরা তো শুধু জাব্বারীন জাতির বিশাল দেহ ও জনসংখ্যা দেখে ভয় পাচ্ছ। মূলত ওরা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল। ওরা শক্তিহীন। তোমরা দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। তোমরাই হবে বিজয়ী। তোমাদেরকে বাধা দেয়ার ক্ষমতা বা শক্তি তাদের নেই। অনেকের মতে এ দু'ব্যক্তি মূসা (আ)-এর জাতির মধ্য থেকেই ছিল। যারা ভীত ছিল তারা বলল, হে মূসা (আ)! যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা (জাব্বারীন) সেখানে থাকবে, ততক্ষণ আমরা প্রবেশ করবই না। এ ধরনের কথা বলে তারা মূসা (আ)-কে রাগান্বিত করল। হযরত মূসা (আ) বাধ্য হয়ে তাদের জন্য বদদো'আ (অভিশাপ) করলেন এবং তাদেরকে ফাসিক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলে সম্বোধন করলেন।

এর পূর্বেও তাদের থেকে বহু অন্যায় সংঘটিত হয়েছিল। বার বার তারা ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু মূসা (আ) তাদের জন্যে বদদো'আ করেন নি। কিন্তু এবার মনের কষ্টে বদদো'আ করতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার বন্ধুর বদদো'আ কবুল করলেন এবং তিনি (আল্লাহ) নিজেও তার বন্ধু কালীমুল্লাহর মতো তাদেরকে ফাসিক বলে সম্বোধন করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর মাস্তি অবতীর্ণ করলেন যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত এক ময়দানে তারা বেষ্টিত (বন্দী) অবস্থায় থাকবে। যেখান থেকে তারা (নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) বাইরে বের হতে পারবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদভ্রান্ত অবস্থায় নির্ধারিত সীমানার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। দ্বিপ্রহরে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে মেশকে ছায়াস্বরূপ করে দিয়েছিলেন এবং জীবনযাপনের জন্যে মান্না ও সালওয়া দু'প্রকারের খাদ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আর তাদেরকে এমন পোষাকের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা পুরানও হতো না এবং ছিড়তোও না। তাদের জন্যে একখানা চৌকোণা পাথর

প্রেরণ করেছিলেন। মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন সেটির উপরে আঘাত করতে। মূসা (আ) তার লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করার সাথে সাথে সেটি থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক দিকে তিনটি করে ঝর্ণা ছিল। প্রত্যেক জাতি তাদের ঝর্ণা চিনে নিয়েছিল। যখন তারা স্থান পরিবর্তন করতো, পাথরটি নিজে নিজেই সেখানে পৌঁছে যেত।

হাদীসে 'ফুতুন' (মূসা [আ]-এর কঠিন পরীক্ষা সম্বলিত হাদীস) এখানেই শেষ। এ হাদীসকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাদীসে মারফু বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। (লেখক বর্ণনা করেছেন) আমার এ কথাটিই সঠিক। কেননা, একবার মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাস (রা)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। একপর্যায়ে তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললেন যে, মূসা (আ) কর্তৃক এ (কিবতী) হত্যার তথ্য প্রকাশকারী ফেরআউনের অনুসারী ছিল না। সে কিভাবে প্রকাশ করতে পারে, তার তো এ সম্পর্কে কোনো জানা ছিল না এবং সে এ সময় সেখানে উপস্থিতও ছিল না। ইসরাঈলী এ তথ্য প্রকাশ করেছে। কারণ সে তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর হাত ধরে সাদ ইবনে মালেক যুহরী (রা)-এর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আবু ইসহাক! আপনার কি জানা আছে যে, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসা (আ) কর্তৃক নিহত ফেরআনের অনুসারী সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন? যে লোকটি এই হত্যার তথ্য ফাঁস করেছিল সে কী ইসরাঈলী ছিল না ফেরআউনী? সাদ (রা) বললেন, তথ্য ফাঁসকারী ফেরআউনের অনুসারী ছিল। সে ঈসরাঈলী থেকে শুনেছিল এবং ইসরাঈলী হত্যার সময় সে স্থানে উপস্থিত ছিল। অনুরূপভাবে হাদীসখানা ইমাম নাসাঈ (রা)-ও বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতিম (রা) তাদের তাফসীর গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনে হারুন (রহ)-এর হাদীস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি মাওকুফ হাদীস। মারফু হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

মীনার তৈরি

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে আদেশ দিয়েছিলেন যে, পাইন কাঠ, পশুর চামড়া, বকরি ও ভেড়ার পশম দ্বারা একটি মীনার তৈরি করো। সেটি রঙিন রেশম ও স্বর্ণ রোপ্য দ্বারা সুসজ্জিত করারও আদেশ দেয়া হয়েছিল। এর বিস্তারিত বর্ণনা আহলে কিতাবের কাছে রয়েছে। সেটির উপর রঙিন রেশম এর পর্দা ছিল এরূপ বর্ণনাও রয়েছে। তারপর পাইন কাঠ দ্বারা একটি সিন্দুকও তৈরি করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। সেটির দৈর্ঘ্য আড়াই হাত, প্রস্ত দু'হাত এবং উচ্চতা দেড় হাত। এটি খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো ছিল। এর চার কোণে ছিল চারটি (স্বর্ণের) শিকল। তাদের বর্ণনা মতে, সেটির দু' পার্শে দু' ফেরেশতার মূর্তি সামনাসামনি বসানো ছিল। এ সিন্দুকটির নির্মানকারীর নাম ছিল বাসলিয়াল। কিতাবীদের মতে মূসা (আ)-কে এ আদেশ দেয়া হয়েছিল যে, পাইন কাঠ দ্বারা যেন একখানা দস্তরখান (যার উপর খানা রাখা হয়) বানানো হয়। সেটির দৈর্ঘ্য হবে দু'হাত, প্রস্থ আড়াই হাত এবং সেটি স্বর্ণ দ্বারা রং করানো থাকবে। দস্তরখানের উপর প্লেট, গ্লাস, পাত্র ও চামচ সাজানো থাকবে। অতঃপর স্বর্ণের একটি মীনার বানানোর আদেশ দেয়া হলো। তাতে ছয়টি স্বর্ণের শিকল থাকবে। তিনটি স্বর্ণের স্তম্ভ থাকবে এবং সে স্তম্ভ তিনটিতে তিনটি করে বাতি থাকবে। আর মীনারের মধ্যে চারটি ঝাড় বাতি থাকবে। এসব কিছু হবে স্বর্ণের। এটিও বাসলিয়াল নামক শিল্পী তৈরি করেছেন। এ মীনারটি বছরের প্রথম দিন স্থাপন করা হয়েছিল। এ দিন ছিল বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। এ সিন্দুকের প্রমাণ কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারাও পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– তাদের নবী তাদেরকে আরো বললেন, আল্লাহর পক্ষ হতে তার বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এ যে, তার বাদশাহীর আমলেই ঐ সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে। যার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে সান্ত্বনার বিষয় আছে। যার মধ্যে মূসা ও হারুনের বংশধরদের ছেড়ে যাওয়া

বরকতের জিনিস আছে এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করছে। যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্যে বিরাট নিদর্শন আছে।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আহলে কিতাবদের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সেখানে তাদের শরীয়তের বিধান ও কুরবানীর বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে এ কথাও লেখা রয়েছে যে, 'মীনার' নির্মাণের ঘটনা বাছুর পূজার পূর্বের ঘটনা। বাছুরের পূজা শুরু হয়েছিল বায়তুল মুকাদ্দাস আগমনের পূর্বে। উক্ত 'মীনার' তাদের জন্যে কাবার অনুরূপ ছিল। সে দিকে ফিরে তারা নামায আদায় করতো। এ মীনারকে তারা তাদের জন্য বরকতময় মনে করতো। মূসা (আ) যখন মীনারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন, তখন মীনারের চার পাশে লোকেরা দাঁড়িয়ে যেত। এ মীনারের দরজার সামনেই মেঘ মালার স্তম্ভ এসে ছেড়ে যেত। মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সিজদায় পড়ে যেতেন। এ মেঘ ছিল নূর সম্বলিত। যা পর্দার ন্যায় প্রতিবন্ধক হয়ে যেত। এ পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে যে সম্বোধন করতেন, তা শুনা যাচ্ছিল।

আল্লাহ তা'আলা ও মূসা (আ)-এর মধ্যে যে সময় কথাবার্তা হতো এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার বিধানসমূহ অর্থাৎ আদেশ, নিষেধ যে সময় অবতীর্ণ হতো, সে সময় মূসা (আ) তাবুতের (সিন্দুকের) পার্শ্বে দু'মূর্তির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখন কথাবার্তা শেষ হয়ে যেত, তখন হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধানগুলো জানিয়ে দিতেন। যখন বনী ইসরাঈল এমন সব ঝগড়া-বিবাদের ফায়সালার জন্যে কিংবা মাসয়ালা জানার জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসতেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোনো আদেশ প্রদান করেন নি, তখন তিনি সেই মীনারে প্রবেশ করে তাবুত (সিন্দুর)-এর কাছে মূর্তি দুটির কাছে দাঁড়িয়ে যেতেন। তারপর তার কাছে সে বিষয়ে ফায়সালা অবতীর্ণ হতো। এ সময় তাদের শরীয়তে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম, হীরা ও মোতী ব্যবহার করা বৈধ ছিল এবং এগুলো দ্বারা ইবাদতখানা সুসজ্জিত করতে পারত। কিন্তু আমাদের শরীয়তে এসব জায়েয নয়; বরং আমাদের মসজিদসমূহকে খুব আকর্ষণীয় করে সুসজ্জিত করতে নিষেধ করা আছে। কেননা, এতে নামাযীদের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে। মসজিদে নববী প্রশস্ত করার সময় হযরত ওমর (রা) মসজিদের নির্মাতা ইবনুন নাসকে বলেছেন, মসজিদ লাল কিংবা হলদে রং করা থেকে যদি বিরত না থাক, তবে তুমি লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে পতিত করবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মসজিদ এভাবে রঙিন করো না যেভাবে ইয়াহুদ ও নাসারা (খৃষ্টান)গণ তাদের ইবাদতখানাকে রং দ্বারা সুসজ্জিত করেছে। এটা উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর মর্যাদা ও মসজিদের পবিত্রতার দৃষ্টান্ত। এ উম্মত আগের উম্মতের মতো নয়। এদেরকে আল্লাহ তাআলা নামাযে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার এবং পৃথিবীর সকল চিন্তা হতে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করেছেন। এটা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য। এ মীনার বনী ইসরাঈলের সাথে তীহ প্রান্তেও ছিল। তারা এ মীনারের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। এটা ছিল তাদের কিবলা ও কাবা। তাদের ইমাম ছিলেন মূসা কালীমুল্লাহ (আ)। আর হযরত হারুন (আ) ছিলেন কুরবানী করার দায়িত্বে। হযরত হারুন (আ)-এর বংশধরগণ তাদের পিতৃপুরুষের আদর্শের উপর কায়েম থেকে কুরবানী প্রথা আজ পর্যন্ত চালু রাখেন। হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকালের পর তার খাদেম ইউশা ইবনে নুন নবুওয়াতসহ যাবতীয় কার্যাবলীর দায়িত্ব পান। অতঃপর ইউশা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসেও প্রবেশ করেন। তার বর্ণনা পরবর্তীতে আসবে। এখানে এ কথাটা উল্লেখযোগ্য যে, যখন ইউশা (আ)-এর হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় হয়, তখন তিনি এ মীনারটি বায়তুল মুকাদ্দাসের এক বিশেষ স্থানে স্থাপন করিয়ে দেন। এরপর থেকে বনী ইসরাঈলরা সেটির দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় শুরু করে। সেই থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যমানা পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরেই নামায আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও হিজরতের পূর্বে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করতেন। তবে কা'বা শরীফকে সামনে রাখতেন। যখন হিজরতের নির্দেশ পেলেন, তখন পুনরায় তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করার আদেশ দেয়া হয়। তারপর ষোল মাস

এক বর্ণনা মতে সতের মাস তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। তারপর ইবরাহীম (আ)-এর কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের তারিখ ও সময় ছিল হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসের কোনো এক দিনের যোহর কিংবা আসরের নামাযের সময়। এর বিস্তারিত আলোচনা আমি সূরা বাকারার ১৪২-১৪৪ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেছি।

কারুনের সাথে মূসা (আ)-এর ঘটনা

পবিত্র কালামে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– কারুন মূসা (আ)-এর জাতিরই লোক ছিল। অতঃপর সে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আমি তাকে এত ধনরত্ন দিয়েছিলাম যে, তার চাবিগুলো শক্তিশালী একদল লোকের জন্যও বহন করা কঠিন ছিল। একবার যখন তার জাতির লোকেরা তাকে বলল, অহঙ্কার করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারীদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাকে যে ধন-দৌলত দিয়েছেন তা দিয়ে আখেরাতের ঘর তৈরির কথা চিন্তা করো। আর দুনিয়া থেকেও নিজের আমলের কথা ভুলে যেও না। আল্লাহ তোমার উপর যেমন রহমত করেছেন, তুমিও (মানুষের প্রতি) রহমত করো। পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের পছন্দ করেন না। কারুন বলল, আমার কাছে যে ইলম আছে এর কারণেই আমাকে এসব (সম্পদ) দেওয়া হয়েছে। সে কি এ কথা জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে যুগে যুগে এমন বহু লোককে ধ্বংস করেছেন, যারা এর চেয়েও বেশি বাহুবল ও জনবলের অধিকারী ছিল? অপরাধীদেরকে তো তাদের গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার (দরকার) হয় না[১]। তারপর একদিন সে তার কাওমের সামনে পুরা জাঁকজমকসহ বের হলো। যারা দুনিয়ার জীবনের জন্যে লালায়িত ছিল, তারা তাদের দেখে বলল, হায়! যা কারুনকে দেয়া হয়েছে, তা যদি আমাদেরও থাকত! নিশ্চয়ই সে বড়ই ভাগ্যবান। আর যাদেরকে ইলম দেয়া হয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের জন্যে আফসোস! আল্লাহর সাওয়াব তার জন্যই ভালো, যে ঈমান আনে ও নেক আমল করে। আর যারা ধৈর্যধারণ করে, তারা ছাড়া আর কেউ এ সম্পদ পায় না। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে ও তার ঘরবাড়িকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তখন আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্যকারী আর কোনো দল ছিল না। আর সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে পারল না। এখন ঐ লোকেরাই যারা গতকাল কারুনের মতো মর্যাদা কামনা করেছিল, তারা বলতে লাগল, আফসোস! আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে ইচ্ছা মেপে মেপে দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া না করতেন, তাহলে তিনি আমাদেরকে ধসিয়ে দিতেন। আফসোস! আমাদের এ কথা মনে ছিল না যে, কাফেররা কখনো সফল হয় না। ঐ আখিরাতের ঘর[২] তো আমি তাদের জন্য খাস করে দেবো, যারা পৃথিবীতে নিজেদের বড়ত্ব চায় না এবং ফাসাদও সৃষ্টি করতে চায় না। আর ভালো পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে। –সূরা কাসাস : ৭৬-৮৩

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কারুন মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই ছিল। ইবরাহীম নাখয়ী (রা) আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে নওফেল, সামাক ইবনে হারব, কাতাদাহ, মালিক ইবনে দীনার ও ইবনে জুরায়েয (রহ) সকলেরই এ একই মত। তবে তারা এর সাথে একটু সংযোজন করে বর্ণনা করেছেন যে, কারুনের বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

কারুন ইবনে ইয়াসহার ইবনে কাহিস এবং মূসা (আ) ইবনে ইমরান ইবনে কাহিস।

ইবনে জুরায়েয (রা) বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে, কারুন ছিল মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই। ইবনে ইসহাক (রা) এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, কারুন মূসা (আ)-এর চাচা ছিল।

---

১. *অর্থাৎ অপরাধীরা তো এইদাবি করেই থাকে যে, আমরা খুব ভালো লোক। তারা কবে এ কথা স্বীকার করে যে, তাদের মধ্যে কোনো দোষ আছে? তাদের শাস্তি তাদের অপরাধ স্বীকার করার উপর নির্ভর করে না। তাদের পাকড়াও করার সময় তাদেরকে এ কথা জিজ্ঞেস করে পাকড়াও করা হয় না যে, বলো, তোমাদের অপরাধ কী?*

২. *অর্থাৎ জান্নাত, যা আসল সাফল্যের স্থান।*

কাতাদাহ (রা) বলেছেন, কারুনকে 'উজ্জ্বল' বলে সম্বোধন করা হতো। কেননা, সে যখন তাওরাত পাঠ করতো, তখন তার কণ্ঠ হতে সুমধুর আওয়াজ ভেসে আসত। কিন্তু সে আল্লাহর দুশমন ও মুনাফিক ছিল। যেমন ছিল সামিরী। আল্লাহ তা'আলা কারুনকে তার ধন সম্পদসহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। শাহর ইবনে হাওসাব (রা) বলেছেন, কারুন স্বীয় জাতির উপর গর্ব করার উদ্দেশ্যে নিজের জামা এক বিঘত লম্বা করে পরিধান করতো। আল্লাহ তা'আলা কারুনের প্রচুর সম্পদ ও ধন ভাণ্ডারের কথা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেছেন। তার ধনভাণ্ডারের এত পরিমাণ চাবি ছিল যে, সে চাবির থোকাগুলো শক্তিশালী বড় একদল লোক উত্তোলন করতে সক্ষম হতো না। এক বর্ণনা মতে সে চাবিগুলো ছিল চামড়ার তৈরি। সে চাবিগুলো গাধা বহন করতো। তাকে তার জাতির ভাল লোকেরা (উপদেশদাতারা) ভাল করে নসীহত করেছেন যে, আল্লাহ তোমাকে যা কিছু (আর্থিক সম্পদ) প্রদান করেছেন, এগুলোর উপর গর্ব করা ঠিক হবে না। কেননা, আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। আল্লাহ যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন, তা দ্বারা আখেরাতের ঘর (সফলতা) তালাশ করো। উপদেশদাতাগণ তাকে বুঝিয়েছেন যে, এই প্রাপ্ত সম্পদ দ্বারা পরকালের শান্তি অর্জন করো, যা চিরস্থায়ী। আর পৃথিবীর অংশও তুমি নিয়ে নিবে। আর সৃষ্টির উপর অনুগ্রহ করো, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জবাবে কারুন বলেছিল, তোমরা যে সব বিষয়ের কথা বলছ, আমি এসবের মুখাপেক্ষী নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যাকিছু দান করেছেন, তা আমার জ্ঞানের কারণেই দান করেছেন। যা আমি পাওয়ার যোগ্যতা রাখি। আল্লাহ তা'আলার কাছে যদি আমার মর্যাদা না হতো এবং আমি যদি তার বন্ধু (হাবীব) না হতাম, তবে আমাকে এত ধন-সম্পদ দান করতেন না। আল্লাহ তা'আলা তার কথাকে খণ্ডন করে দিয়ে বলেন, তার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের অনেক মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন। যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ছিল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। অর্থাৎ আমি আগের অনেক উম্মতকে তাদের গুনাহের কারণে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং শাস্তি প্রদান করেছি। তারা কারুনের চেয়েও শক্তিশালী ছিল এবং প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল। কারুনের কথা যদি সত্য ও সঠিক হতো তবে আমি তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী লোকদেরকে ধ্বংস করতাম না। অনুরূপভাবে সে (কারুন) আমার বন্ধু (হাবীব) হওয়ারও কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে না এবং তার প্রতি আমার একটুও নেক দৃষ্টি আছে, সে প্রমাণও তার কাছে নেই। যেমন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— তোমাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে (তাদের কথা আলাদা)। এরাই ঐ সব লোক, যাদের জন্যে তাদের আমলের দ্বিগুণ বিনিময় রয়েছে। আর তারা উঁচু দালানে শান্তি ও নিরাপদে থাকবে। –সূরা সাবা : ৩৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি, তা দিয়ে তাদের জন্যে সকল প্রকার মঙ্গল (কল্যাণ) ত্বরান্বিত করেছি? না, বরং তারা বুঝে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন— সে (কারুন) বলল, এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি। কারো কারো ধারণা, সে (কারুন) রসায়ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল। আর কিছু সংখ্যকের ধারণা, সে ইসমে আজম জানত। যে কারণে সে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিও ঠিক নয়। কারণ, রসায়ন তো কাল্পনিক ও শৈল্পিক (কারিগরী সম্বন্ধীয়)। যা বস্তুর মূলকে পরিবর্তন করতে পারে না এবং স্রষ্টার সৃষ্টির সাদৃশ হতে পারে না। আর ইসমে আজম দ্বারা তো কাফিরের দো'আ কবুল হতে পারে না। আর কারুন ছিল আন্তরিকভাবে কাফের এবং বাহ্যিকভাবে মুনাফিক। এ যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। এতে দুটি বাক্যের মধ্যে কোনো সাম স্যতা বজায় থাকে না। আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে।

কারুন তার জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁক-জমকসহকারে। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন, কারুন অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে সুসজ্জিত হয়ে উৎকৃষ্ট বাহন ও অগণিত দাস-দাসী

নিয়ে গর্বের সাথে শহরে বের হলো। যখন দুনিয়ার লোভীরা কারুনের এ বিলাসিতা দেখতে পেল, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা ও কামনা করে বলতে লাগল, আহ! যদি আমাদেরও কারুনের মতো অনুরূপ ধন-সম্পদ হতো! তারা কারুনের ধন-সম্পদের উপর ঈর্ষা করতে লাগল। তাদের এ কথা তখনকার পরহেযগার, সংযমী ও পার্থিব সম্পদের প্রতি বিমুখ লোকেরা শুনে তাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য আফসোস! আল্লাহ প্রদত্ত পুরস্কার বেশি উত্তম তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার পরকালে অধিক উত্তম এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও স্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ধৈর্যশীল ছাড়া এটা কেউই পাবে না। অর্থাৎ পৃথিবীর এ শান-শওকত, আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে দেখেও এর থেকে বিমুখ থাকতে পারে কেবল তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ হেদায়েতের আলো দান করেছেন এবং অন্তরকে দৃঢ় করেছেন। যাকে তার নিজ অনুগ্রহে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং লক্ষ্য স্থলে পৌছার তাওফীক দিয়েছেন। কোনো কোনো বুযুর্গ এ সম্পর্কে কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সেই দৃষ্টিকে পছন্দ করেন, যে দৃষ্টি সন্দেহযুক্ত বস্তুকে এড়িয়ে চলে এবং জৈবিক চাহিদার সময় পূর্ণ জ্ঞানকে সংরক্ষণ রাখে। আল্লাহ তা'আলা কারুনের জাঁক-জমক ও দাম্ভিকতাসহ স্বীয় জাতির উপর শহর প্রদক্ষিণের পরিণতি সম্পর্কে বলেন, "তাকে আমি তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম"।

ইবনে আব্বাস ও সুদ্দী (রা) বলেছেন, একদিন কারুন এক ব্যভিচারী মহিলাকে সম্পদের লোভ দেখিয়ে এ কাজের জন্য রাজি করল যে, সে (মহিলা) মূসা (আ) সম্পর্কে বড় বড় মজলিসে এবং লোকের মাঝে গিয়ে মূসা (আ)-এর সামনে বলবে যে, তুমি আমার সাথে ব্যভিচার করেছ। বর্ণিত আছে মহিলাটি এরূপ বলায় মূসা (আ) মহিলাটির দিকে ফিরে তাকে কসম দিয়ে বললেন, তুমি সত্য সত্য বল, কে তোমাকে এরূপ মিথ্যা বলার ব্যাপারে প্ররোচিত করেছে?

মহিলাটি সত্য বলল যে, কারুন তাকে এ সম্পর্কে প্ররোচিত করেছিল। সে (মহিলাটি) আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল এবং তওবা করল। তখন মূসা (আ) সিজদায় গিয়ে কারুনের জন্য বদদো'আ করেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জমিনকে আপনার আদেশ মান্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তখন মূসা (আ) কারুনকে তার ঘর-বাড়ীসহ গ্রাস করার জন্য জমিনকে নির্দেশ দিলেন। বাস্তবে তাই হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

বর্ণিত আছে, একদিন কারুন জাঁক-জমকের সাথে উত্তম পোষাক পরিধান করে দাস-দাসী ও বাহন নিয়ে মূসা (আ)-এর মজলিসের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। এ সময় মূসা (আ) লোকদেরকে আল্লাহর বিশেষ বিশেষ দিবসসমূহের মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। মজলিসের লোকেরা যখন কারুনকে জাঁক-জমকের সাথে তাদের পার্শ্ব দিয়ে যেতে দেখল, তখন অধিকাংশ লোকেরা মূসা (আ) থেকে মুখ ফিরিয়ে কারুনের দিকে তাকালো। তখন মূসা (আ) কারুনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কারুন! তোমাকে এভাবে গর্বের সাথে চলতে কে বাধ্য করেছে? সে বলল, হে মূসা (আ)! আপনাকে যদিও নবুওয়াত প্রদান করে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমাকে সম্পদের মাধ্যমে আপনার উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আপনি যদি চান, তবে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আমার জন্য বদদো'আ করুন। আর আমিও আপনার জন্য বদদো'আ করি। তখনই উভয়ই নিজ নিজ জাতিসহ বের হলেন। মূসা (আ) কারুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি প্রথমে বদদোয়া করবে, না আমি করব? কারুন বলল, আমি করছি। কারুন বদদো'আ করল, কিন্তু কবুল হলো না।

তারপর হযরত মূসা (আ) কারুনকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি আমি বদদো'আ করব? সে (কারুন) বলল, হ্যাঁ করুন। তখন হযরত মূসা (আ) দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! যমীনকে নির্দেশ দিন, যাতে সে (যমীন) আমার নির্দেশ মানে। তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে মূসা (আ)-কে জানিয়ে দিলেন যে, আমি যমীনকে তোমার নির্দেশ মানার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, হে জমিন! কারুনকে পাকড়াও কর। তখন যমীন তার পা পর্যন্ত গ্রাস করল। তারপর বললেন, আরো গ্রাস কর। তখন হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করল। এরপর কাঁধ পর্যন্ত। তারপর বললেন, ওর ধনভাণ্ডার ও ধনসম্পদগুলোও গ্রাস কর। যমীন তার সম্পদগুলো গ্রাস করা শুরু করল। সে এ

সব কিছুই দেখছিল। এরপর মূসা (আ) হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, হে যমীন! বনু লাওয়ী' অর্থাৎ কারুন ও তার সঙ্গীদের সকলকে গ্রাস কর। তখন জমিন তাদের সকলকে গ্রাস করে ফেলল।

হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, তারা (কারুন ও তার সঙ্গীরা) প্রতিদিন একটি আদম সন্তানের দেহ পরিমাণ (ভূমি গর্ভে) প্রোথিত হচ্ছে। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত (প্রোথিত) হতে থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তারা সপ্ত যমীন পর্যন্ত প্রোথিত হবে। অধিকাংশ মুফাসসির ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেগুলো আমি এড়িয়ে গিয়েছি।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— তার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাহায্যকারী ছিল না। অর্থাৎ সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না এবং অন্য কেউও না। অনুরূপভাবে সূরা তারিকে বর্ণিত হয়েছে, তার শক্তিও নেই, সাহায্যকারীও নেই। যখন কারুন ও তার সাথীদের উপর শাস্তি বর্ষণ শুরু হলো এবং তাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন সবকিছু ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেল, তখন যে লোকেরা কারুনের সম্পদ ও জাঁক-জমকপূর্ণ চালচলন দেখে অনুরূপ সম্পদ পাওয়ার জন্যে খুব কামনা করেছিল, তারা তাদের ভ্রান্ত চিন্তা ও বুঝের জন্যে খুব অনুতপ্ত হলো এবং আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করল। আল্লাহ তা'আলাই তার বান্দার জন্যে উত্তম ব্যবস্থা করে থাকেন। এ কারণেই তারা বলেছিল— আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি দয়া না করতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো কাফেররা সফলকাম হয় না। -সূরা কাসাস : ৮২

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আখেরাতের আবাসস্থল (ঘর) তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে অনিষ্ট ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। আখেরাতের আবাসস্থল স্থায়ী। এ ঘর (জান্নাত) যিনি পাবেন, তিনি গর্ব করবেন এবং যে এর থেকে বঞ্চিত হবে, সে আফসোস করবে ও লজ্জিত হবে। আর এ ঘর (জান্নাত) তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে অহঙ্কার ও গর্বের সাথে চলে না এবং বিপর্যয় ও বিবাদ সৃষ্টি করতে চায় না। ফাসাদ (বিপর্যয়) এমন পাপ কাজকে বলা হয়, সেটা সংযুক্ত ও সংক্রামক। অর্থাৎ সে পাপ কাজের বোঝা (দায়) অন্যের কাছ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। যেমন, মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা এবং তাদের জীবনোপায় বিনষ্ট করে দেয়া এবং তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করা এবং তাদের কল্যাণ কামনা না করা। আল্লাহ বলেন, উত্তম পরিণতি পরহেযগারদের জন্যে। কারুনের এ খারাপ পরিণতি ঘটেছিল মিশর থেকে বের হবার পূর্বেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তাকে ও তার আবাসগৃহকে ভূগর্বে প্রোথিত করলাম। আবাসগৃহ বলতে তার প্রাসাদকে বুঝানো হয়েছে। মিশর থেকে বের হবার পর সে মাদইয়ানেই উদভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে ফিরতে ছিল। আবাসগৃহে মহল্লাকেও বলা হয়ে থাকে। যাতে কতগুলো ঘর ও মনযিল থাকে।

আল্লাহ তা'আলা কারুনের জঘন্য কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- আমি মূসাকে আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম, ফেরআউন, হামান ও কারুনের নিকট। কিন্তু তারা বলেছিল, এতো যাদুকর ও মিথ্যাবাদী। -সূরা মুমিন : ২৩-২৪

আল্লাহ তা'আলা সূরা আনকাবুতে আদ, সামুদ জাতির কথা বর্ণনা করার পরে বলেন, মূসা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল; তখন তারা দেশে দম্ভ করতো; কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারে নি। তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, তাদের কাউকেও আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো জুলুম করেন নি; তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। -সূরা আনকাবুত : ৩৯-৪০

যাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়েছিল সে ছিল কারুন। আর যাকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল সে ছিল ফেরআউন, হামান ও তার সৈন্যবাহিনী। নিশ্চয়ই তারা ছিল মহা পাপী।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায সম্পর্কে বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করে (অর্থাৎ নামায যথাযথভাবে আদায় করে) কিয়ামতে (সে) নামায তার জন্যে নূর, দলীল ও মুক্তির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের

হেফাযত করে না, (অর্থাৎ যথাযথভাবে নামায আদায় করে না) তার জন্য কোনো নূর, দলীল এবং মুক্তির কারণও হবে না এবং কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি কারুন, ফেরআউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথী হবে। –মুসান্দে আহমদ

হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! এ কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারুনকে নবীরূপে। –সূরা মারয়াম : ৫১-৫৩

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত (রাসূলের মর্যাদা ও দায়িত্ব) ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সুতরাং আমি যা প্রদান করলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। –সূরা আরাফ : ১৪৪

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে মূসা (আ)-এর উপর মর্যাদা দিও না। নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনে সব লোকই বেহুশ (সংজ্ঞাহীন) হবে। আমি সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব। তখন আমি দেখতে পাব যে, মূসা (আ) আরশের স্তম্ভ ধরে আছেন। আমার জানা থাকবে না যে, সংজ্ঞাহীন হয়ে আমার পূর্বেই সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন, না তূর পাহাড়ে অচেতন হয়ে পড়ার বিনিময়ে তিনি এ বেহুঁশী থেকে রক্ষা পেয়েছেন? –বোখারী ও মুসলিম সূত্রে বর্ণিত

এ হাদীস সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি বলেছিলেন তার বিনয় ও নম্রতার কারণে। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী এবং ইহকাল ও পরকালে আদম সন্তানের সর্দার। এ কথাটি সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এর বিপরীত হওয়াটা অবাস্তব, অযৌক্তিক ও অসম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— আমি তো আপনার নিকট তেমনই ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম। অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, যাদের কথা পূর্বে আমি আপনাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা আপনাকে বলি নি এবং মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। –সূরা নিসা : ১৬৩-১৬৪

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— হে ঐ সব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তাদের বানানো কথা থেকে তাকে দায়মুক্ত করে দিলেন। আর তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত ছিলেন। –সূরা আহযাব : ৬৯

কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদার দৃষ্টান্ত এটিও একটি যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ভাই হারুন (আ) সম্পর্কে এ আরয করেছিলেন যে, হে আমার রব! আমার ভাইকে আমার সাহায্যকারী করে দিন। আল্লাহ তা'আলা তার বাসনা পূরণ করে দেন এবং অতিরিক্ত তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে।

অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা ও ধৈর্যশীলতার হাদীস নিম্নে বর্ণিত হলো। হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার সাহাবাগণের মাঝে কিছু জিনিস বণ্টন করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, এ বণ্টনে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে এ খবরটি তাঁকে জানালাম। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন যে, আমি রাগের প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন তার চেহারা মোবারকে দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাকে এর চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। (বোখারী)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কারো দোষ ত্রুটি সম্পর্কে কোনো কথা আমার কাছে পৌঁছাবে না। কারণ, আমি

চাই তোমাদের মাঝে স্বচ্ছ অন্তর নিয়ে অবস্থান করতে। বর্ণনাকারী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে কিছু মাল আসল। তিনি সেগুলো বন্টন করে দিলেন। অতঃপর আমি দু'ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তারা একজন অন্যজনকে বলছিল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ ﷺ এ বন্টন দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের গৃহ (জান্নাত) কামনা করেন নি। অতঃপর তারা দু'জনে থেমে গেল। আমি তাদের দু'জনের কথা শুনলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাদেরকে বলেছেন, কারো কোনো কথা যেন আপনার কাছে না পৌঁছাই। আমি অমুক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে এরূপ এরূপ কথা বলতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক লাল (বর্ণ) হয়ে গেল। এ কথায় তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। অতঃপর বললেন, আমার কথা ছেড়ে দাও, মূসা (আ)-কে এর চেয়ে অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। –মুসনাদে আহমদ

বোখারী ও মুসলিম শরীফে মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, (মি'রাজের রাতে) রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে গমন করার সময় দেখতে পেলেন যে, তিনি তার কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। মুসলিম (রহ) হাদীসটি হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) হযরত আনাস ইবনে মালেক ইবনে সাআদ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনি মি'রাজের রাতে ষষ্ঠ আকাশে মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে গমন করেছিলেন। এ সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইনি হলেন মূসা (আ)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সালাম দেওয়ার পরে তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, নেককার নবীকে ও নেককার ভাইকে। অতঃপর যখন আমি তাকে অতিক্রম করি, তখন তিনি কেঁদে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কিসে আপনাকে কাঁদালো? তিনি বললেন, আমি এজন্যে ক্রন্দন করছি যে, এ বালক (রাসূলুল্লাহ সা) আমার পরে প্রেরিত। অথচ তাঁর উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে বেশি জান্নাতে যাবে। হযরত ইবরাহীম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল সপ্তম আকাশে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ষষ্ঠ আকাশে এবং মূসা (আ)-এর সাথে সপ্তম আকাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অধিকাংশ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে ষষ্ঠ আকাশে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সপ্তম আকাশে বসে সাক্ষাৎ হয়েছিল। এ সময় হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামুরের সাথে পিঠ দিয়ে টেক লাগানো অবস্থায় বসেছিলেন। যে বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ (সত্তর হাজার) ফেরেশতাদের বায়তুল মামুর তাওয়াফ করার আর পালা আসবে না। সম্মিলিত ঐক্যমত এই যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ এর উপর দিন রাতে মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (এই নামায নিয়ে) মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন মূসা (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করেন, যাতে তিনি নামায কমিয়ে দেন। কারণ, আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করেছি। আপনার উম্মত তো কর্ণ, চক্ষু ও মনের দিক হতে খুবই দুর্বল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসা (আ) হতে আল্লাহ তা'আলার কাছে বার বার আসা-যাওয়া করতে থাকেন। প্রতিবারেই নামাযের ওয়াক্ত কমতে থাকল। শেষ পর্যন্ত দিন রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযেরই সাওয়াব প্রদান করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ হতে আমাদের নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং হযরত মূসা (আ) উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে তাশরীফ এনে বললেন, আমার সামনে সকল উম্মতদেরকে হাজির করা হয়। তখন আমি একটি বড় জামাআতকে দেখতে পেলাম যে, ধরনী ছেয়ে ফেলেছিল। আমাকে বলা হলো, এই মূসা (আ) যিনি তার জাতির মধ্যে রয়েছেন। অর্থাৎ এটি মূসা (আ)-এর জাতি ইমাম বুখারী (রা) সংক্ষিপ্তাকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (রা) হাদীসটি দীর্ঘ করে বর্ণনা করেছেন, হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর কাছে হাজির ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে গতরাতে বিধ্বস্ত হওয়া তারকাটিকে দেখতে পেয়েছে? আমি বললাম, আমি দেখেছি। কিন্তু আমি সেটির প্রতি এত আগ্রহী ছিলাম না। কেননা, আমাকে বিচ্ছু ইত্যাদি দংশন করেছিল। তখন সাঈদ (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর তুমি কি করলে? আমি বললাম, আমি ঝাড়ফুঁক করিয়েছিলাম। সাঈদ (রা) বললেন, কিসে তোমাকে এই ঝাড়-ফুঁকের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? আমি বললাম, এক হাদীস থেকে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যে হাদীসখানা আমাকে শাবী (রা) বুরাইদা আসলামী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কু'দৃষ্টি কিংবা দংশন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই শুধু ঝাড়-ফুঁক। সাঈদ বললেন, তিনি খুবই ভাল কাজ করলেন, যিনি শ্রুত হাদীস আমার পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। অতঃপর হযরত সাঈদ বলেন, আমাকে ইবনে আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সামনে সমস্ত উম্মতকে পেশ করা হলো। তখন আমি এক নবীর সাথে একদল লোক দেখলাম। আর এক নবীর সাথে এক কি দু'জন লোক দেখলাম। এক নবীকে দেখলাম তার সাথে কোনো লোকজনই নেই। এরপর আমার সামনে বৃহৎ একটি দল এসে উপস্থিত হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দলটি কি আমার? উত্তরে বলা হলো, না, এ হলো মূসা (আ) ও তার দল। তারপর আমাকে বলা হলো, আপনি দিগন্তের দিকে তাকান, সেখানে বৃহৎ একটি দল ছিল। তারপর বলা হলো, এদিকে তাকান, দেখলাম সেদিকেও বৃহৎ একটি দল ছিল। অতঃপর বলা হলো, এদিকেও আর একটু তাকান, দেখলাম সেখানেও বিরাট এক দল। তখন আমাকে বলা হলো, এরা সবাই আপনার উম্মত। এর মধ্যে সত্তর হাজার এমন লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসেবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে চলে যাবে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে নিজ গৃহে তাশরীফ নিলেন। অতঃপর লোকেরা এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। কেউ বলতে লাগল, বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী কে? কোনো কোনো লোক বললেন, জান্নাতে প্রবেশকারী দল সম্ভবত তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র সোহবত সাহর্যে লাভ করেছেন। কেউ বললেন, সম্ভবত তারা (জান্নাতে বিনা হিসেবে প্রবেশকারী) হবেন, যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীকও করে নি। অন্যান্য লোকেরাও এভাবে তাদের অভিমত উপস্থাপন করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় (ঘর থেকে বের হয়ে তাদের মাঝে) তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, তোমরা পরস্পরে কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করছ? তারা যে সব কথা নিজেরা বলাবলি করছিলেন, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা সেসব লোক যারা দাগ দেয় না (আগের লোক পশুদেরকে এবং নিজ শরীরে রোগের কারণে লোহা দ্বারা দাগ দিত। এর থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে) ঝাড়-ফুঁকও করে না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং যারা কেবল নিজ রবের উপরই ভরসা রাখে। এ কথা শুনে উককাশা ইবনে মুহসিন আসাদী (রা) বললেন, আমি কি তাদের একজন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ। সাথে সাথে অন্য আর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে অনুরূপ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমিও কি তাদের মধ্যে একজন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উককাশা তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে।

এ হাদীসটি বিভিন্ন বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আমি কিয়ামতের বর্ণনায় জান্নাতের বৈশিষ্ট্য আলোচনাকালে এ হাদীস পেশ করেছি।

কুরআন মাজীদে মূসা (আ)-এর আলোচনা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে অনেক বর্ণনা করেছেন। তার কাহিনী কুরআন মাজীদে কোথাও বিস্তারিতভাবে কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে বার বার বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর উত্তম প্রশংসা করেছেন। অধিকাংশ স্থানে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হযরত মূসা (আ)-এর কথাও উল্লেখ করেছেন।

সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আর যখনই আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো রাসূল ঐ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থনকারী হিসেবে এসেছেন, যা তাদের কাছে পূর্ব হতেই ছিল, তখন ঐ আহলে কিতাবদের মধ্যে এক দল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পেছনে ফেলে রেখেছে, যেন তারা এ বিষয়ে কিছুই জানে না।

–সূরা বাকারা

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে অন্য আয়াতে বর্ণনা করেন— আলিফ লাম মীম। আল্লাহ তিনি, যিনি চিরজীবী ও চিরস্থায়ী সত্তা, তিনি সারা জাহানের ধারক। আসলে তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি আপনার উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যসহ এসেছে এবং যা আগের কিতাবগুলোকে সত্য বলে ঘোষণা করছে। এর আগে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইনজীল নাযিল করেছেন। আর তিনি কষ্টিপাথর অবতীর্ণ করেছেন (যা হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দেয়)। এখন যারা আল্লাহর বিধি-বিধান কবুল করতে অস্বীকার করে তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। আল্লাহ অসীম ক্ষমতার মালিক এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার যোগ্য। –সূরা আল ইমরান : ১-৪

সূরা আনআমে আল্লাহ তা'আলা বলেন— তারা আল্লাহ তা'আলার সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করে নি; যখন তারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট (ওহী, কিতাব ইত্যাদি) কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। বলুন, কে অবতীর্ণ করেছেন মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্যে আলো ও পথনির্দেশ ছিল, তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ করো ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃ পুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল? (এ প্রশ্নের জবাবে) বলে দিন, আল্লাহই (তা নাযিল করেছেন)। অতঃপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও। আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি; যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দ্বারা তুমি মক্কা ও এর চার পাশের লোকদেরকে সতর্ক করো, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হেফাযত করে। –সূরা আনআম : ৯১-৯২

আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাওরাত ও তারপর কুরআন মাজীদের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন– তার পর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যা সৎ কর্মপরায়ণদের জন্যে সম্পূর্ণ উপদেশ, যা সবকিছুর বিশদ বিবরণ, পথনির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ, যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। (হে আল্লাহর অবাধ্যকারীরা) এ কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি, যা কল্যাণময়। সুতরাং এটার অনুসরণ করো এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। –সূরা আনআম : ১৫৪-১৫৫

সূরা মায়িদায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ, যারা আল্লাহর বাধ্যগত ছিল, তারা ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীগণ ও বিদ্বানগণ। কারণ, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করোনা, আমাকেই ভয় করো এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মানে বিক্রি করো না। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফের। (সূরা মায়িদা : ৪৪) এ সূরায় তিনি (আল্লাহ) আরো বলেন—

(আমার আদেশ ছিল যে) যারা ইনজীলকে মানে, তারা যেন আল্লাহ এতে যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারেই বিচার-ফায়সালা করে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারা ফাসেক[১]। (হে

১. *যারা আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে তিনটি ফায়সালা দিয়েছেন। ১) তারা কাফের। ২) তারা জালেম এবং ৩) তারা ফাসেক। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কারো হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ ফায়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে আল্লাহর হুকুম সঠিক বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ ফায়সালা করে, সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না, কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কুফর, 'যুলুম' ও 'ফিসক' এর সঙ্গে শরীক করে। তেমনিভাবে যে সব ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথে চলে সে সব ব্যাপারেই কাফের, যালিম ও ফাসিক। আর যে ব্যক্তি কোনো কোনো ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোনো কোনো ব্যাপারে বিপথগামী, তার ঈমান ও ইসলামে 'কুফর, 'যুলুম' ও ফিসক' এর ভেজাল ঠিক সে অনুপাতেই থাকে, যে অনুপাতে সে অনুগত ও বিপদগামী হয়।*

রাসূল!) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে। আর আল কিতাব থেকে যা কিছু এর সামনে মওজুদ রয়েছে তার সত্যতা প্রমাণ করে[১] এবং এর সংরক্ষণ করে। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে (আইন) অনুযায়ী (জনগণের) মধ্যে বিচার-ফায়সালা করুন। আর যে সত্য আপনার নিকট এসেছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুকরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে শরীঅতে ও কাজের তরীকা ঠিক করে দিয়েছি। যদিও আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মত বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি তা করেন নি) যাতে তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সে ব্যাপারে তোমাদের পরীক্ষা নিতে পারেন। কাজেই তোমরা কেন কাজে একে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের (ঐসব বিষয়ে আসল সত্য) জানিয়ে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করেছিল। -সূরা মায়িদা : ৪৭-৪৮

কুরআন মাজীদ সমস্ত আসমানী কিতাব সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছে এবং কুরআনকে সমস্ত কিতাবের সত্যয়নকারী বানানো হয়েছে। পূর্বের কিতাবসমূহে যেসব পরিবর্তন, মনগড়া ব্যাখ্যা সংযুক্ত করা হয়েছে, কুরআন মাজীদ সে সম্পর্কে খবর দিয়েছে। কেননা, আহলে কিতাবকে যদিও কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু তারা সঠিকভাবে তা সংরক্ষণ করতে পারে নি এবং তার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করেছে। আর এগুলো হলো তাদের জ্ঞানের ও বুঝের স্বল্পতার কারণে এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা এবং অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে। তাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ। এ কারণেই তাদের কিতাবে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে এমন সব ভ্রান্ত ও অমূলক কথা পাওয়া যায়, যা অশোভনীয় ও ভিত্তিহীন। তাদের কিতাবে না পাওয়া যায় রাসূল ﷺ-এর কোনো গুণাবলীর কথা, আর না আছে তার পরিচয়মূলক কোনো কথা।

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আমি তো মূসা ও হারুনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ, মুত্তাকীদের জন্য যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। এটা মঙ্গলজনক উপদেশ, আমি এটা নাযিল করেছি। তবুও কি তোমরা একে অস্বীকার করো। -সূরা আম্বিয়া : ৪৮-৫০

সূরা কাসাসে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— কিন্তু যখন আমার কাছ থেকে তাদের নিকট সত্য পৌছে গেল, তখন তারা বলতে লাগল, মূসাকে যা কিছু (মু'জিযা) দেওয়া হয়েছিল তা (এ নবীকে) কেন দেওয়া হয়নি? (প্রশ্ন হলো) ইতোপূর্বে মূসাকে যা কিছু দেওয়া হয়েছিল[২] (এ সত্ত্বেও) লোকেরা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলল, দুটোই যাদু[৩], যার একটি অপরটিকে সাহায্য করে। আমরা কোনোটাকেই মানি না। (হে নবী!) তাদেরকে বলুন, ঠিক আছে! তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো কিতাব আন, যা এ দুটোর চেয়ে বেশি হেদায়াতদাতা। তাহলে আমি তা-ই মেনে চলব। -সূরা কাসাস : ৪৮-৪৯

---

১. *এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও কথাটি এভাবেও বলা যেত, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্য থেকে যা কিছু আসল ও সঠিক অবস্থায় বাকি আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এখানে 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ' এর স্থলে 'আল কিতাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ তত্ত্ব জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং ঐ সব কিতাব, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তা সবই আসলে একই কিতাব। এগুলোর রচনাকারীও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্যও একই। তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই, যা সেই গ্রন্থাবলির মাধ্যমে মানবজাতিকে দেয়া হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাষা এবং ভঙ্গির। একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই কথা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনকে আল কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফি' তথা নেগাহবান ও সংরক্ষক বলার অর্থ হচ্ছে সকল সত্য-সঠিক শিক্ষা, যা অতীতের সব আসমানি কিতাবে দেয়া হয়েছিল, সে সবই কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে হেফাযত করে দিয়েছে। ঐসব শিক্ষার কোনো অংশই এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে না।*

২. *অর্থাৎ মক্কার কাফেররা, হযরত মূসা (আ)-কে কবে মান্য করেছিল যে, এখন তারা বলছে হযরত মূসা (আ)-কে যে মু'জিযা দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ ﷺ-কে কেন তা দেওয়া হয় নি?*

৩. *অর্থাৎ কুরআন ও তাওরাত উভয় কিতাব। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'কিতাব (তাওরাত ও কুরআন মাজীদ) এবং দু রাসূলের প্রশংসা করেছেন। কোনো এক সফর হতে জিনেরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে। -সূরা আহকাফ : ৩০*

যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয়, "পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওরাকা ইবনে নওফেলকে এ ঘটনা জানালেন। নওফেল বললেন, ইনিই সেই পবিত্র ও সম্মানিত (ফেরেশতা) যিনি মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর কাছে আগমন করেছিলেন। মোটকথা হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়ত ছিল মহান ও পবিত্র। তার উম্মতের সংখ্যাও ছিল অনেক। তার উম্মতের মধ্যে অনেকে ছিলেন নবী, আলিম, আবেদ (সাধক), জ্ঞানী, দরবেশ, বাদশাহ, সর্দার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু তারা চলে যাবার পরে তাদের পরবর্তী লোকেরা নিজেদের শরীঅতকে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছে। ফলে তাদেরকে বানর ও শুকরের আকৃতি করে দেয়া হয়েছিল।

তারপর হতে তারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হতে লাগল। তাদের এ শাস্তির ঘটনা খুবই দীর্ঘ। উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহীরা যাতে কিছু উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে আমি অতি সংক্ষেপে এ ব্যাপারে কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলারই উপর আমি একমাত্র ভরসা রাখি।

মূসা (আ)-এর হজ্ব পালন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আযরাক' উপত্যকা অতিক্রমকালে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন উপত্যকা? লোকেরা বললেন, এটি 'আযরাক' উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মনে হচ্ছে আমি যেন মূসা (আ)-কে দেখছি। তিনি যেন উপত্যকার সামনে দিয়ে আগমন করছেন এবং তালবিয়া (আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক...) পাঠ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য (অনুগ্রহ) লাভ করেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হাবশা' গিরিপথে পৌঁছলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন স্থান? লোকেরা বলল, এটি হাবশা। অর্থাৎ হাবশা নামক ঘাঁটি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মনে হচ্ছে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা (রা)-কে দেখতেছি যে, তিনি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় লাল বর্ণের উষ্ট্রীর উপর সাওয়ার আছেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম ছিল খেজুরের ছালের। এ সময় তিনি তালবিয়া পড়ছেন। -মুসনাদে আহমদ

ইমাম মুসলিম (রহ) এ হাদীসটি দাউদ ইবনে আবী হিন্দ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিবরানী, ইবনে আব্বাস (রা) হতে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন যে, মূসা (আ) লাল বর্ণের ষাড়ের উপর সাওয়ার হয়ে হজ্ব করেছিলেন।

মূসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, মুজাহিদ (রা) বলেছেন, আমরা একদিন ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় সবাই দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলাপ করছিলেন। মুজাহিদ (রা) বললেন, দাজ্জালের কপালের উপর ك ف ر লেখা থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইবরাহীম (রা)-এর আকৃতি (চেহারা) তোমাদের সাথী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ [সা]) এর অনুরূপ। আর মূসা (আ) এমন একজন ব্যক্তি, যার মাথার চুলগুলো ছিল ঘন এবং যিনি লালবর্ণের উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে আছে, উষ্ট্রীর লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের। মনে হলো আমি তাকে দেখছি এবং তিনি যেন উপত্যকা হতে তালবিয়া পাঠ করতে করতে অবতরণ করছেন। এরপর ইমাম আহমদ (রা) মুসনাদে আহমদে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং মূসা ও ইবরাহীম (রা)-কে দেখেছি। ঈসা (আ)-এর বর্ণ ছিল লাল, মাথার চুল ছিল ঘন এবং বক্ষ ছিল প্রশস্ত। মূসা (আ) ছিলেন বিশাল দেহের অধিকারী এবং তার মাথার চুলগুলো ছিল মধ্যম (অর্থাৎ বেশি ঘনও নয় এবং পাতলাও নয়)।

লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ইবরাহীম (আ) কিরূপ ছিলেন? উত্তরে তিনি ﷺ বললেন, তোমাদের সাথী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ [সা]-এর দিকে লক্ষ্য করে বললেন। মুসনাদে আহমদে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি মি'রাজের রাতে মূসা বিন ইমরান (আ)-কে দেখেছি, তিনি দীর্ঘ দেহ ও ঘন চুলবিশিষ্ট ছিলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি শানুয়া এলাকার একজন লোক। (শানুয়া ইয়ামনের একটি

এলাকার নাম)। আমি ঈসা ইবনে মরিয়মকে দেখলাম, যিনি মধ্যম দেহবিশিষ্ট এবং লাল সাদা মিশ্রিত বর্ণের ছিলেন। তার মাথার চুল মধ্যম ছিল।

হাদীসটি কাতাদাহ (রা)-এর হাদীস থেকেও বর্ণিত আছে। মুসনাদে আহমদে অন্য আর এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাতে মূসা (আ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মূসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য ও দৈহিক গঠনও বর্ণনা করেন। তিনি ﷺ বলেন, মূসা (আ) ছিলেন বড় মাথাবিশিষ্ট। মনে হচ্ছিল যেন তিনি শানুয়া গোত্রের লোক। এ সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম (রা)-এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি ﷺ ঈসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন যে, তিনি মধ্যম দেহবিশিষ্ট এবং রক্ত বর্ণের ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন গোসলখানা থেকে এই মাত্র গোসল করে বের হয়েছেন। তিনি ﷺ আরো বললেন যে, আমি ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তার সন্তানদের মধ্যে দৈহিক গঠনে ও আকৃতিতে আমার সাথেই তার অধিক মিল রয়েছে।

হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন ফেরেশতা আযরাঈলকে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। তিনি যখন মূসা (আ)-এর কাছে পৌঁছেন, তখন তিনি তাকে এক চড় মারেন। মালাকুল মওত ফিরে এসে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন, যিনি মৃত্যু চান না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি তাঁর কাছে গিয়ে বলো, আপনি ষাড়ের পৃষ্ঠের উপর হাত রাখুন। আপনার হাতের নিচে যতগুলো পশম আসবে, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে এক বছর করে আপনাকে হায়াত দেয়া হবে। হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদেগার! এরপর কি হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরপর মৃত্যু হবে। তখন মূসা (আ) বললেন, তবে তা এখনই করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপরে মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করলেন, আমাকে পবিত্র ভূমির নিকটবর্তী নিয়ে যাওয়া হোক। (পবিত্র ভূমি দ্বারা সম্ভবত বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে)। (বর্ণনাকারী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমি যদি সেখানে হাজির থাকতাম তবে আমি তোমাদেরকে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম। যেটা রাস্তার পাশে লাল টিলার কাছে অবস্থিত। (বোখারী)

মুসনাদে আহমদে আবু হুরায়রা (রা) হতে অন্য সূত্রে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল মওত মূসা (আ)-এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, আপনার রবের নির্দেশের জবাব দিন। (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য প্রাণ দিতে রাজি হয়ে যান) তখন হযরত মূসা (আ) মালাকুল মওতের চোখের উপর এক চড় মারলেন। যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে গেল। ফেরেশতা (মালাকুল মওত) আল্লাহ তা'আলার কাছে ফিরে এসে আরয করলেন, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন, যিনি মৃত্যু চান না এবং তিনি চড় মেরে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহ তার চোখ পূর্বের মতো ভাল করে দিলেন এবং তাকে বললেন; তুমি মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে বলো, যদি আপনি আরো পার্থিব জীবন (হায়াত) আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে ষাড়ের পিঠের উপর হাত রাখুন। আপনার হাতের নিচে যতগুলো পশম পড়বে প্রতিটি পশমের বিনিময়ে আপনাকে এক বছর করে হায়াত দান করা হবে। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, তারপর কী হবে? আল্লাহ বললেন, এরপর মৃত্যু হবে। মূসা (আ) আরয করলেন, (যদি এ-ই হয়) তবে এখনি আমার মৃত্যু দান করুন।

প্রসঙ্গত আলোচনা

ইবনে হিব্বান (রা) উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে বলেন যে, আযরাঈল যখন মওতের সংবাদ নিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আগমন করেছিলেন তখন মূসা (আ) তাকে চিনতে পারছিলেন না। কারণ তিনি (মালাকুল মওত) এমন আকৃতিতে আগমন করলেন, যাতে তাকে চিনা সম্ভব ছিল না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) বেদুইনের আকৃতিতে আগমন করেন। তিনি ﷺ (প্রথমেই) তাকে দেখে চিনতে পারলেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-এর কাছে যুবকদের আকৃতিতে ফেরেশতা আগমন করেছিলেন। তারা তাদেরকে চিনতে পারেন নি। অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ)-এর কাছেও আযরাঈল (মানুষরূপে) আগমন করেছিলেন। এ কারণে হযরত মূসা (আ) তাকে চড় মেরেছিলেন। যাতে ফেরেশতার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেননা, তিনি (মানুষরূপী ফেরেশতা) হযরত মূসা (আ)-এর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছিলেন।

ইবনে হিব্বান (রা) অন্য এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মালাকুল মওত মূসা (আ)-এর কাছে তার রূহ কবযের জন্য আগমন করেন। মালাকুল মওত এসে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার প্রাণ নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন। আপনি আপনার রবের নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হন। মূসা (আ) মালাকুল মওতের চোখের উপর চড় মারলেন, এতে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তী হাদীস অনুরূপ, যেরূপ বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে হিব্বান (রা) হাদীসটি সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলেছেন। তা হলো এই যে, হযরত মূসা (আ) যখন মালাকুল মওতকে চড় মারার জন্য হাত উঠিয়েছিলেন, তখন ফেরেশতা বলেছিলেন যে, আপনি আপনার রবের নির্দেশের জবাব দিন। (অর্থাৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন) তার এ কথাটি হাদীসের বাহ্যিক অর্থের সাথে অমিল। কারণ, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ) ফেরেশতাকে চড় মারার পূর্বেই তিনি (ফেরেশতা) তাকে বলেছিলেন, আপনি আপনার রবের নির্দেশের জবাব দিন। যদি মূসা (আ) চড় দেওয়ার পূর্বেই ফেরেশতা তাকে আল্লাহ তা'আলার আদেশে সাড়া দেয়ার কথা বলেছিলেন কথাটি মেনে নেয়া হয়, তবে এজন্য চড় দিয়েছিলেন যে, তিনি ফেরেশতাকে চিনতে পারেননি। এছাড়া কারণ ছিল, মূসা (আ) তার জীবনে আনেক কাজ করার নিয়ত করেছিলেন। তার ধারণা ছিল, আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি তীহ ময়দান থেকে বের হবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করবেন, অতঃপর সেখানে বসে তার কাজগুলো সমাপ্ত করবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত করে রেখেছেন যে, হযরত মূসা (আ) তীহ ময়দানেই তার ভাই হারুন (আ)-এর পরে ইন্তিকাল করবেন। এ বিষয়টি সামনেই আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে তীহ ময়দান থেকে বের করেন, হযরত মূসা (আ) এবং সেখান থেকে তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসেও নিয়ে যান হযরত মূসা (আ)। আহলে কিতাব ও অধিকাংশ আলেমের মতে এ কথাটি ঠিক নয়। তারা বলেন, হযরত মূসা (আ) তীহ ময়দানেই ইন্তেকাল পান।

আল্লাহ তা'আলার কাছে মূসা (আ) যে দো'আ করেছিলেন, সেটিই এর স্পষ্ট প্রমাণ। তিনি যখন (হায়াত বৃদ্ধি করার চেয়ে) মওতকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র ভূমি (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর নিকটে নিয়ে যাওয়া হোক। যদি মূসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতেন, তবে তিনি এ দো'আ করতেন না। যখন তীহ ময়দানে তার ইন্তেকালের সময় সন্নিকট হলো, তখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট যেতে খুব আগ্রহ পোষণ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি তার জাতির লোকদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যাতে তারা তাকে সেখানে নিয়ে যান। তার কবর হিজর (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর নিকটবর্তী এলাকায়। এ কারণেই সর্দারে দু'আলম রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যদি আমি সেখানে হাজির থাকতাম, তবে লাল টিলার কাছে অবস্থিত তার কবর তোমাদেরকে দেখাতাম।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে রাতে আমাকে আকাশে (ভ্রমণের জন্য) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সে রাতে আমি মূসা (আ)-এর কাছ নিকট গমন করেছিলাম। এ সময় আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি লাল টিলার পাশে অবস্থিত তার কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।

ইমাম মুসলিম (রহ)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কয়েকজন সাহাবী (রা) হাতে বর্ণিত আছে। তারা বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, আমি হারুন (আ)-কে অমুক পাহাড়ের কাছে বসে মৃত্যু দিব। তখন মূসা (আ) ও হারুন (আ) উভয়ে সেই পাহাড়ের কাছে গিয়ে হাজির

হলেন। সেখানে এমন এক কুদরতী বৃক্ষ ছিল, যার অনুরূপ বৃক্ষ আর কখনো দেখা যায়নি। সেখানে একটি সুন্দর ঘরও ছিল। সে ঘরে একখানা খাট ছিল। সেটি ছিল উত্তম বিছানা দ্বারা সুসজ্জিত। ঘরটি থেকে সুঘ্রাণ আসছিল। হারুন (আ) পাহাড়ে বৃক্ষের নিচে এমন একখানা সুন্দর ঘর দেখতে পেয়ে, তার প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি মূসা (আ)-এর কাছে বললেন, হে মূসা! আমার মনে চায় এ খাটের উপর একটু আরাম করতে। মূসা (আ) বললেন, আপনি শুয়ে পড়ুন। হযরত হারুন (আ) আরয করলেন, হে মূসা! আমার ভয় হলো, যদি এ ঘরের মালিক এসে পড়ে, তবে আমাকে তিরস্কার করবে এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। মূসা (আ) বললেন, আপনি কোনো ভয় করবেন না, এ দায়িত্ব আমার। আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন। হারুন (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, আপনিও আমার সাথে শুয়ে পড়ুন। যদি ঘরের মালিক এসে পড়ে, তবে আমাদের দু'জনের উপরেই রাগান্বিত হবেন। তখন তারা দু'জনেই শুয়ে পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু মৃত্যু এসে শুধু হারুন (আ)-কেই স্পর্শ করল। মূসা (আ) স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, হারুন (আ) তাঁকে বলছেন, হে মূসা (আ)! তুমি আমার সাথে একটু কৌশল করেছো। মূসা (আ) জাগ্রত হয়ে সেখানে কিছুই দেখতে পেলেন না। সুন্দর কাজে সজ্জিত খাট হারুন (আ)সহ আকাশে পৌঁছে গিয়েছিল। অতঃপর মূসা (আ) তার জাতির কাছে একা চলে আসলে লোকেরা প্রচার করে দিল যে, মূসা (আ) হিংসাবশত হারুন (আ)-কে হত্যা করে ফেলেছে। গোত্রের লোকেরা মূসা (আ)-এর চাইতে হারুন (আ)-কে বেশি ভালবাসতো। আর বেশি ভালবাসার কারণ ছিল এই যে, হারুন (আ) মূসা (আ)-এর তুলনায় একটু নরম মেযাজের ছিলেন। আর মূসা (আ) স্বভাবগতভাবেই একটু কঠোর ছিলেন। মূসা (আ) এ খবর শুনে জাতির লোকদেরকে বললেন, তোমাদের জন্যে আফসোস! আমি কি আমার সহোদর ভাইকে কখনো হত্যা করতে পারি? কিন্তু লোকেরা যখন কোনোভাবেই তার কথা বিশ্বাস করছে না এবং তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতেই রইল, তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত হারুন (আ)-এর মৃতদেহ খাটসহ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে এনে দিলেন। যা সবাই স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন।

একদা হযরত মূসা (আ) ও ইউশা (আ) কোথাও গমন করছিলেন। হঠাৎ চারদিকে ভীষণ কালো অন্ধকার হয়ে গেল। ইউশা (আ) এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে মূসা (আ)-কে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, কিয়ামত হয়ে গেছে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। মূসা (আ) তার জামা থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌঁছে গেলেন) হযরত ইউশা (আ)-এর হাতে জামাটি রয়ে গেল। ইউশা (আ) মূসা (আ)-এর জামাটি নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে গমন করলেন। তারা ইউশা (আ)-এর উপর হত্যার অপবাদ এনে বলল যে, তিনি মূসা (আ)-কে হত্যা করেছেন। এমনকি তারা ইউশা (আ)-কে হত্যা করতে উদ্যত হলো। ইউশা (আ) তাদের কাছে তিন দিনের সময় চাইলে, তাকে এ সুযোগ দেয়া হলো। এই তিন দিনে যারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাদের সবাইকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নযোগে দেখানো হলো, যে ইউশা (আ) মূসা (আ)-কে হত্যা করেননি। বরং তাকে আমি (আল্লাহ) আমার কাছে উঠিয়ে নিয়েছি। অতঃপর বনী ইসরাঈল হযরত ইউশা (আ)- কে ছেড়ে দিল।

হযরত মূসা (আ)-এর সাথে দু'জন লোক ব্যতীত অন্য সবাই দুর্ধর্ষ জাতি জাব্বারীনের এলাকায় (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে) যেতে অস্বীকার করেছিল। এরা দু'জন হলেন হযরত ইউশা (আ), কালিব ইবনে ইউকন্না (আ)। কালিব মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর বোন মারিয়ামের স্বামী ছিলেন। এ দু'জনের আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বর্ণনা করেছেন, হযরত মূসা (আ) একদল ফেরেশতাদের কাছ থেকে গমন করার সময় দেখতে পেলেন যে, তারা একটি কবর খনন করছেন। হযরত মূসা (আ) এরূপ সুন্দর কবর আর কখনো দেখেননি। মূসা (আ) বললেন, হে আল্লাহর ফেরেশতাগণ! কার জন্য এ কবর খনন করছেন? তারা বললেন, আল্লাহর এক সম্মানিত বান্দার জন্য খনন করছি। আপনি যদি এ সম্মানিত বান্দা হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে চান,

তবে এ কবরে প্রবেশ করুন ও সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং নিজ রবের দিকে খেয়াল করুন। আর নিজকে খুব হালকা করুন। মূসা (আ) এরূপ করলেন। তারপর সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করলেন। এরপর ফেরেশতাগণ জানাযার নামায আদায় করেন এবং দাফন-কাফন করেন। আহলে কিতাব ও অন্যান্য আলেমগণ বলেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল হয়েছিল একশত বিশ বছর বয়সে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আগে মালাকুল মওত ফেরেশতা মানুষের কাছে (মানুষরূপে) প্রকাশ্যে আগমন করতেন। তাই মালাকুল মওত মূসা (আ)-এর কাছেও এরূপ প্রকাশ্যে আগমন করেন। এ সময় তিনি তাকে এক চড় মেরেছিলেন, যাতে তার চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার কাছে গিয়ে আরয করলেন, হে আমার রব! আপনার বান্দা মূসা (আ) চড় মেরে আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। তিনি যদি আপনার সম্মানিত বান্দা না হতেন, তবে আমিও তাঁকে কিছু একটা করতাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দার কাছে ফিরে গিয়ে বলো, আপনার হাত একটি ষাড়ের চামড়া অথবা যেকোনো চামড়ার উপর রাখেন। আপনার হাতের নিচে যত পরিমাণ পশম হবে, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে আপনাকে এক বছর করে হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। ফেরেশতা মূসা (আ)-এর কাছে এসে এ কথা বললেন। হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তারপরে কি হবে? তিনি বললেন, তারপরও মৃত্যু। মূসা (আ) বললেন, তবে এখনই হোক। তখন ফেরেশতা মূসা (আ)-কে উত্তম সুগন্ধির সুবাস গ্রহণ করান। অতঃপর তার রূহ কবয করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মালাকুল মওতের চোখ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তারপর থেকে আযরাঈল লোকদের কাছে গোপনে আসতে আরম্ভ করেন।

হযরত ইউশা (আ)-এর নবুওয়াত ও বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব গ্রহণ

ইউশা ইবনে নুন ইবনে আফরাসীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)। আহলে কিতাবগণের মতে ইউশা হূদ (আ)-এর চাচাতো ভাই। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে আলোচনা প্রসঙ্গ তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— স্মরণ করুন! যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন তারা অগ্রসর হলো, মূসা তার সঙ্গীকে বলল।" -সূরা কাহাফ : ৫১

বোখারী শরীফের হাদীসে প্রথমে তাঁর বংশ তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইউশা ইবনে নুন ইনিই। তার নবুওয়াত সম্পর্কে আহলে কিতাবগণ সকলেই একমত। এতে কারো কোনো মতপার্থক্য নেই। সামিরী নামক একটি দল, হযরত মূসা (আ)-এর পরে ইউশা (আ)-এর নবুওয়াত ব্যতীত অন্য আর কারো নবুওয়াতে বিশ্বাসী নয়। কারণ, তাদের তাওরাত কিতাবে ইউশা (আ)-এর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। তারা ইউশা (আ) ছাড়া অন্যদের নবুওয়াতকে অস্বীকার করে। অথচ তাদের কিতাবেই অন্যান্য নবীদের নবুওয়াতের সত্যায়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা। এ অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। ইবনে জারীর প্রমুখ মুফাসসিরগণ (রা) মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ)-এর শেষ বয়সে তার নবুওয়াতকে হযরত ইউশা (আ)-এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছিল। তখন মূসা (আ) ইউশা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করতেন, পরওয়ারদেগার আপনার কাছে কি নাযিল করেছেন? একবার ইউশা (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, হে মূসা (আ)! যখন আপনার কাছে ওহী নাযিল হতো, তখন তো আমি একবারও আপনার কাছে জিজ্ঞেস করিনি যে, আল্লাহ আপনার কাছে কি নাযিল করেছেন? বরং আপনি নিজেই (যা প্রয়োজন বলে দিতেন। এ কথায় মূসা (আ) মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং মৃত্যু কামনা করতে লাগলেন।

এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, মূসা (আ)-এর শেষ জীবন পর্যন্ত তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী ও যাবতীয় নির্দেশাবলী নাযিল হতো এবং এ অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তার মহান দরবারে উঠিয়ে নিয়ে যান। মূসা (আ) পৃথিবীতে বসে সর্বদায় আল্লাহ তা'আলার মর্যাদাবান ও সম্মানিত

বান্দারূপে ছিলেন। (অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্যও তার মর্যাদা ও সম্মানের লাঘব হয় নি) যা মালাকুত মণ্ডতের ঘটনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রা) তার বর্ণনাটি আহলে কিতাবের কিতাব থেকে সংগ্রহ করে থাকেন, তবে সেখানে কথা হলো এই যে, তাদের কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে যে, মূসা (আ)-এর উপর শেষ জীবন পর্যন্ত ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। বনী ইসরাঈলের যখনই কোনো মাসয়ালা কিংবা কোনো জটিল বিষয় সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হতো, তখনই তারা হযরত মূসা (আ)-এর খেদমতে চলে যেতেন। (মূসা (আ) আল্লাহর আদেশে তাদেরকে সবকিছু বলে দিতেন)। এ কথা তাদের তাওরাত কিতাবের 'তাবূতুশ শাহাদা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

আহলে কিতাব 'তৃতীয় সফর' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও হারুন (আ)-কে আদেশ দেন যে, তারা যেন বনী ইসরাঈলকে তাদের গোত্র অনুযায়ী বণ্টন করে দেন এবং বারটি গোত্রের জন্যে আলাদা আলাদাভাবে এক একজন সর্দার নিযুক্ত করে দেন। যারা তাদের দেখাশুনা করবেন। এ সবকিছু যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে করা হয়েছিল। যাতে তারা তীহ ময়দান থেকে বের হবার পরেই দুর্ধর্ষ জাব্বারীন জাতির মোকাবিলা করতে পারে। এ নির্দেশটি প্রদান করা হয়েছিল তীহ ময়দানে চল্লিশ বছর উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরার শেষের দিকে। এ কারণে কেউ কেউ বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল, এ কারণে তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ হতেই সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করাবেন। তাই তার ধারণা মতে এর পূর্বে তার ইন্তেকাল হতে পারে না। আর মালাকুল মওত ফেরেশতা মানব সুরতে তাঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন বলে, তাঁকে মূসা (আ) চিনতে পারেননি। এ কারণে (না চিনে) তাকে চড় মেরেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক এটা নির্দিষ্ট ছিল যে, বায়তুল মুকাদ্দাস হযরত মূসা (আ)-এর হাতে বিজয় হবে না; বরং হযরত ইউশা (আ)-এর হাতে বিজয় হবে।

এরূপভাবে আমাদের নবী সর্দারে দু'জাহান রাসূলুল্লাহ ﷺ সিরিয়ার রোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিয়ত করেছিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে তাবুক পর্যন্ত পৌছেও ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী নবম হিজরীতে তিনি ﷺ তাবুক থেকে ফেরে আসেন এবং দশম হিজরীতে হজ্ব করেন। অতঃপর মদীনায় এসে উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পদক্ষেপ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীর আলোকেই ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, শেষ দিবসেও না এবং আল্লাহ ও তার রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দ্বীন অনুকরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

–সূরা তাওবা : ২৯

এ আদেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা (রা)-এর নেতৃত্বে এক বাহিনী প্রস্তুত করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। এ সময় উসামা (রা) 'জারুফ' নামক স্থানে সৈন্যদের সাথে শিবিরে অবস্থান করছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে এ বাহিনীকে পুনঃপ্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। যখন আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও পরিবেশ নিজেদের অনুকূলে আসে এবং শিরক ও কুফরীর অবসান ঘটে, তখন হযরত আবু বকর (রা) চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ করা আরম্ভ করেন। পারস্য, সিরিয়া ও রোম সম্রাটের বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিজয় দান করেন এবং দুশমনদেরকে তার অধীনস্ত করে দেন। এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কেও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, বনী ইসরাঈল থেকে সৈন্য বাছাই করে তাদেরকে কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত করো এবং প্রতিটি গোত্রের জন্যে একজন করে 'নেতা' নিয়োগ করে দাও।

যেমন, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আল্লাহ বনী ইসরাঈলের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা[১] নিয়োগ করেছিলেন। তাদের আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথেই

১. *'নকীব' এর অর্থ পরিদর্শক ও অনুসন্ধানকারী। বনী ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল। আল্লাহ তা'আলা..... [অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]*

আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং আমার রাসূলদেরকে মানো ও তাদের সাহায্য করো আর আল্লাহকে করযে হাসানা দান করো তাহলে আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দেবো এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগানে দাখিল করব, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা বহমান থাকবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা সঠিক পথ২ হারিয়ে ফেলেছে। -সূরা মায়েদা : ১২

অর্থাৎ তোমরা যদি আমার আদেশাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং পূর্বের মতো যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ না করো, তবে আমি তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে জান্নাত উপহার দেব। এরূপভাবে হুজুরে আকরাম ﷺ-এর সাথে যে আরবীগণ হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল তাদের সম্পর্কেও এরূপ বিধান নাযিল হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— যে সব মরুবাসী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলুন, তোমরা আহূত হবে এক প্রবল-পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ আদেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। -সূরা ফাতহ : ১৬

এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে বলেছেন, এরপরও তোমাদের কেউ কুফরী করলে, সে সরল (সত্য) পথ হারাবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের (বনী ইসরাঈলের) কুকর্ম ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করেন। যেমন, তারপর খৃস্টানদেরকে তাদের পারস্পরিক ধর্মীয় মতভেদের কারণে ভর্ৎসনা করছিলেন। আল হামদু লল্লাহ! এর বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

যাহোক আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা যুদ্ধে পারদর্শী এবং বিশ কিংবা তার উর্ধ্ববয়সী, তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে দল গঠন করার জন্যে আদেশ দিলেন এবং প্রতিটি দলের জন্য একজন করে নেতা নিয়োগ করার জন্যে বললেন।

প্রথম দলটি ছিল রুবেলের সন্তানগণ। কারণ, ইনি ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর প্রথম সন্তান। এ দলে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ছিচল্লিশ হাজার পাঁচশ (৪৬,৫০০) জন। ইয়াসুর ইবনে শাদইয়াসুরকে তাদের নেতা (দলপতি) বানানো হয়েছিল।

দ্বিতীয় দলটি ছিল আল শামউন এর গোত্র। এ দলের সংখ্যা ছিল উনষাট হাজার তিনশ (৫৯,৩০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন শালো মায়ল ইবনে হোরাইয়া শদাই।

তৃতীয় দলটি ছিল আল ইয়াহুদা এর গোত্র। এদের সংখ্যা ছিল চুয়াত্তর হাজার ছয়শ (৭৪,৬০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন নাহশুন ইবনে আফইয়াদাব। চতুর্থ দলটি ছিল আল আয়সাখার এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল চুয়ান্ন হাজার চারশ' (৫৪,৪০০) জন। তাদের নেতা ছিল নাশায়েল ইবনে সাওগার।

পঞ্চম দলটি ছিল ইউসুফ (আ)-এর বংশধর। তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার চারশ (৪০,৪০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন ইউশা ইবনে নূন (আ)।

ষষ্ঠ দল ছিল আল মীসাকা এর গোত্র। এদের সংখ্যা ছিল একত্রিশ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ (৩১,৬৫০) জন। তাদের নেতা ছিলেন জামলীল।

সপ্তম দলটি ছিল বিন ইয়ামীনের বংশধর। তাদের সংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার চারশ (৩৫,৪০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন আবীদান।

অষ্টম দল ছিল হুদ-এর বংশধর। তাদের সংখ্যা ছিল, পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শ পঞ্চাশ (৪৫,৬৫০) জন। তাদের নেতা ছিলেন, আল ইয়াসাফ ইবনে রাওয়ীল।

..... তাদের প্রতিটি গোত্রের জন্য একেকজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে নিজ গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে বেদ্বীন ও অসৎ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

২. 'সাওয়া-আসসাবীল' এর অর্থ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার অর্থ সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের পায়ে মাড়ানো অনিশ্চিত পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।

নবম দল ছিল আল ইয়াসীর এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল একচল্লিশ হাজার পাঁচশ (৪১,৫০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন ফাজয়ীল।

দশম দল ছিল দান এর বংশধর। তাদের সংখ্যা ছিল, বাষট্টি হাজার সাতশ (৬২,৭০০) জন। তাদের নেতা ছিলেন আখীরা।

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইয়াহুদীদের নিজস্ব কিতাব থেকেই সংগৃহীত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

লাওয়ী গোত্র এদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাদেরকে যোদ্ধাদের দলভুক্ত করতে নিষেধ করে ছিলেন। কারণ, তাদের দায়িত্ব ছিল আলাদা। তারা গম্বুজ উঠানো, বানানো এবং গুছানোর দায়িত্বে সেনাদের খেদমতে নিয়োজিত ছিল। তাদের সংখ্যা ছিল বাইশ হাজার (২২,০০০) জন।

কাজের সুবিধার জন্যে এদের আবার কতগুলো উপদল গঠন করে ছিলেন। এ সমস্ত লোক সেনাদের দেখাশুনা, পাহারা এবং তাবু খাটানো ও গুছানো ইত্যাদির দায়িত্বে থাকতেন। এ সমস্ত লোক তাদের চার পাশে ডানে, বায়ে, সামনে, পিছনে থেকে পাহারা দিতেন। লাওয়ী গোত্র ছাড়া বাকি এগার দলের মোট জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ একাত্তর হাজার পাঁচ শত ছাপ্পান্নজন। দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে কিছুটা সন্দেহ আছে। কারণ তাদের কিতাব থেকে প্রথমে যে সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে, সেটা যদি সঠিক হয় তবে দ্বিতীয় হিসাবের সংখ্যা কোনোভাবেই পূর্বের সংখ্যার অনুরূপ হয় নি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

পথ অতিক্রম করার সময় লাওয়ী গোত্রটি বনী ইসরাঈলের মাঝেই অবস্থান করতেন। তাঁরা গম্বুজ হেফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। বনী ইসরাঈলের সকলেই তাদেরকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করতেন। তাদের ডানে থাকতেন রুবেল বংশধরগণ। বামে থাকতেন বনুদান। আর বুন নাফতারী পেছনে থাকতেন। মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে আলেমগণকে নেতৃত্বদান করেছিলেন। যেমন তাদের পূর্বে তাদের পিতা ও পিতামহগণও নেতৃত্ব দিয়ে এসেছিলেন। পূর্বপুরুষ থেকেই এই ধারাবাহিকতা চলে আসছিল। এদের মধ্যে প্রথম ছিলেন নাদাব, এর পরে ছিলেন হুবকারাহ, আবিহা এবং ইয়াসমার। যারা মূসা (আ)-কে বলেছিল যে, "তুমি এবং তোমার প্রতিপালক তাদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসা আছি।" তারা কেউই জীবিত ছিল না। এ বর্ণনাটি ইকরামা (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এবং সুদ্দী (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা), ইবনে মাসউদ (রা) এবং কিছু সংখ্যক সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ হতে প্রবীণ আলেমগণ বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ) উভয়েই তীহ ময়দানে এর আগে ইন্তেকাল করেছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রা)-এর বর্ণনা মতে, রায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন এ মূসা (আ)। ইউশা (আ) তাঁর সেনা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন।

ইসহাক (রহ) তাঁর রায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ সম্পর্কে বালআম ইবনে আউর এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন— (হে নবী!) তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান, যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, পর সে সেটাকে বর্জন করে। পরে শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে বিপদগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। তার অবস্থা কুকুরের মতো, ওর উপরে আপনি বোঝা চাপিয়ে দিলে সে হাঁপাতে থাকে এবং আপনি বোঝা না চাপিয়ে দিলেও সে হাঁপায়। যে জাতি আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থাও এরূপ, আপনি বৃত্তান্ত পাঠ করুন, যাতে তারা চিন্তা করে। যে জাতি আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি অত্যাচার করে, তাদের অবস্থা কত মন্দ! (সূরা আরাফ : ১৭৫-১৭৭) বালআম ইবনে বাওর-এর বিস্তারিত ঘটনা আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

বালআম ইবনে বাউরের ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ এর বর্ণনা মতে, সে (বালআম ইবনে বাউর) ইসমে আযম জানত। তার জাতির লোকেরা তাকে মূসা (আ) ও তাঁর জাতির বিরুদ্ধে বদদো'আ করতে বলেছিল। প্রথমে সে বদদো'আ

করতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু যখন তার জাতির লোকেরা এ ব্যাপারে তাকে খুব পীড়াপীড়ি করল, তখন সে তার গাধার পৃষ্ঠে আরোহন করে বনী ইসরাঈলের সেনাবাহিনীর দিকে রওয়ানা হলো। যখন সেনাবাহিনীর কাছাকাছি পৌঁছল, তখন গাধাটি অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। বালআম গাধাটিকে আঘাত করায় সেটি বসে পড়ল এবং সেটির যবান খুলে গেল। গাধাটি বালআমকে লক্ষ্য করে বলে উঠল তুমি কি দেখছ না যে, আমার সামনে ফেরেশতাগণ রয়েছেন, যারা আমার চেহারার উপর আঘাত করে আমাকে সামনে এগুতে বাঁধা দিচ্ছেন। তুমি কি আল্লাহর নবী ও মুমিনগণকে বদদো'আ দেয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছ? এরপরও বালআম গাধাটিকে বেত্রাঘাত করে সেটিকে জোরপূর্বক সামনে অগ্রসর হলো। যখন সে 'হাসবান পাহাড়' পর্যন্ত পৌঁছল, তখন মুসা (আ)-এর সেনাবাহিনীকে দেখতে পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার জন্য হাত উঁচিয়ে বদদো'আ শুরু করল। কিন্তু তার যবান তার নিয়ন্ত্রণে রইল না। মুসা (আ)-এর জাতির জন্য অভিশাপ করতে চাইল, কিন্তু তার যবান থেকে মুসা (আ)-এর জাতির জন্যে দো'আ এবং তার নিজ জাতির জন্যে বদদো'আ বেরিয়ে আসল। তার জাতির লোকেরা তাকে তিরস্কার করলে, সে এ ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করল। সে বলল, আমি কি করব যবান আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। যবান থেকে এটা অস্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে গেছে। তারপর তার জিহ্বা বাইরে নাভী পর্যন্ত ঝুলে পড়ল। সে তার জাতিকে বলল, (তোমাদের কথা শুনে) আমি ইহকাল, পরকাল উভয়ই হারালাম, তবে এখনো প্রতারণা ও কৌশল অবলম্বন করা যায়। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন! তোমাদের সুন্দরী নারীদেরকে সুসজ্জিত করে তাদের কাছে কিছু কিছু আসবাবপত্র এবং মালামাল দিয়ে সেগুলো বিক্রি করার জন্যে বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। নারীদের আসল কাজ থাকবে সৈন্যদেরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করা। এভাবে করলে সম্ভবত তারা অন্যায় ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যদি তাদের একটি লোকও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। (অর্থাৎ তারা এ মহা অপরাধের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে) তারা তার কথা অনুযায়ী তাদের সুন্দরী নারীদেরকে সুসজ্জিত করে বনী ইসরাঈলের সৈন্যদের মাঝে প্রেরণ করল। নারীদের মধ্যে 'কসতী' নাম্নী এক রূপসী সুন্দরী মহিলা বনী ইসরাঈলের 'যামরী ইবনে শালওম' নামক এক নেতার কাছে মাল নিয়ে গেল। কথিত আছে এ ব্যক্তি ছিলেন আল শামউন দলের নেতা। সে এ নারীটিকে তার শিবিরে নিয়ে গেল এবং উভয়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হলো। এদিকে বনী ইসরাঈল প্লেগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। এর কারণ অনুসন্ধান করা শুরু হলো। ফানহাস ইবনে আয়যার ইবনে হারুন নামক এক ব্যক্তির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি নিজ বর্শা হাতে নিয়ে সেই দু' অপরাধীর কাছে পৌঁছে তাদের দু'জনকে শিবিরে আটক করলেন। অতঃপর দু'জনকে বাইরে বের করে জনসমক্ষে তাদেরকে বর্শায় বিদ্ধ করলেন। তারপর তাদের লাশ বর্শায় করে উপরের দিকে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! যারা আপনার অবাধ্য, তাদের প্রতি আমাদের আচরণ এরূপই। অতঃরপর প্লেগ ব্যাধি প্রশমিত হলো। সেই প্লেগ ব্যাধিতে এক সময় সত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল। কারো মতে বিশ হাজার। ফানহাস তার পিতা আয়যার ইবনে হারুনের একমাত্র সন্তান ছিলেন। বনী ইসরাঈল ফানহাস এর সন্তানদের জন্য কুরবানীর পশুর সিনা, ভুঁড়ি, চোয়াল ইত্যাদি রেখে দিতেন। এছাড়াও পছন্দনীয় জিনিসপত্রও তাদের প্রদান করতেন। (অর্থাৎ ফানহাস এর বংশের লোকেরা তাদের কাছে খুব সম্মানের পাত্র ছিলেন)।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রা) বালআম ইবনে বাওর সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, সেটি সঠিক। এটা প্রাচীন কালের কয়েকজন আলেমও বর্ণনা করেছেন। তবে ইসহাক (রা) এটা সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত মুসা (আ) প্রথমবার বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার জন্যে যে ইচ্ছা করেছেন, এ ঘটনাটি সে সময়ের। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনাকারী তা বুঝতে পারেনি। আমি তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছি যে, মুসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেননি। সম্ভবত এটা অন্য আর একটি ঘটনা, যা তীহ ময়দানে বসে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ সে বর্ণনায় 'হাসবান' পাহাড়ের উল্লেখ আছে। আর পাহাড়টি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ আলেমের মতে, হযরত হারুন (আ) তীহ ময়দানে ইন্তেকাল করেছেন এবং এর দু'বছর পরে হযরত মুসা (আ) ইন্তেকাল করেন। তিনি তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলেন। যা কবুল হয়েছিল। যা হোক বনী ইসলাঈলকে যিনি তীহ ময়দান থেকে বের করে বায়তুল

মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ)। আহলে কিতাব ও অন্যান্য ইতিহাসবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউশা (আ) বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে জরদান নদী পার হয়ে উরায়হা দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছেন। উরায়হা দুর্গটি ছিল শহরের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু ও মজবুত দুর্গ। সেখানের অধিবাসীও ছিল অনেক বেশি। বনী ইসরাঈল ছয় মাস পর্যন্ত উক্ত দুর্গটি ঘেরাও করে রাখেন। তারা একদিন মজবুত একটি শিকল দুর্গের প্রাচীরের উপর নিক্ষেপ করে, সবাই মিলে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে শিকলটি টান মারলেন। ফলে প্রাচীর ফেটে গিয়ে রাস্তা হয়ে গেল। বনী ইসরাঈলের লোকেরা সেই পথ দিয়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত মালামালগুলো নিজেরা নিয়ে নিলেন। তারা বার হাজার নারী পুরুষকে হত্যা করলেন। তারা অনেক বাদশাহর সাথে যুদ্ধ করেছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউশা (আ) সিরিয়ার একত্রিশ জন রাজার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, বনী ইসরাঈলরা উপরিউক্ত শহরটি শুক্রবার মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। বিজয় এখনো হয়নি। এদিকে সূর্য অস্ত যাবার উপক্রম এবং পরবর্তী সপ্তাহের প্রথম দিন (শনিবার) প্রায় আগত। যে (দিনটি) ছিল তাদের উপাসনার দিন। যে দিনে (শনিবার) কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ করা ও কোনো কিছু শিকার করা তাদের জন্য জায়েয ছিল না। হযরত ইউশা (আ) বললেন, হে সপ্তাহের প্রথম দিন! তুমি আল্লাহর আদেশের অনুগত এবং আমিও আল্লাহর আদেশের অনুগত। হে আল্লাহ! আপনি চন্দ্রকে উদয় হওয়া থেকে বিরত রাখুন। হযরত ইউশা (আ)-এ শহরটি বিজয় করতে যতক্ষণ সময় লেগেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রকে থামিয়ে রেখেছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ রাতটি ছিল প্রথম মাসের চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমার রাত। সূর্যের ঘটনাটি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। যা শীঘ্রই বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

চাঁদের ঘটনাটি আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এটি হাদীসের বিপরীত কোনো বর্ণনা নয়। তবে চাঁদের কাহিনীর সাথে কিছু বৃদ্ধি আছে। এগুলো সত্যও বলা যায় না এবং মিথ্যাও বলা যায় না। কিন্তু আহলে কিতাবরা সেখানে বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছে উরায়হা বিজয় কালে। এ বর্ণনায় সন্দেহ রয়েছে। তবে স্পষ্টভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়টিই ছিল তখনকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উরায়হা বিজয় ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এ হাদীসখানা মুসনাদে আহমদে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্যের কার্যক্রম কোনো মানুষের জন্য স্থগিত করে রাখা হয়নি। শুধু যখন ইউশা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন (তাঁর আবেদনে) চাঁদের গতি স্থগিত করা হয়েছিল।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউশা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেছিলেন। আর সূর্যের ঘটনা ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় কালে। যা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি। এটাও প্রতীয়মান হয় যে, এটা ছিল হযরত ইউশা (আ)-এর একটি মোযেজা। এ হাদীস দ্বারা নিম্ন লিখিত হাদীসটির দুর্বলতাও প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, সূর্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। এ সময় আলী ইবনে আবী তালিব আসর নামায পড়ে নিয়েছিলেন।'

ঘটনাটি এরূপ যে, একবার হযরত আলী (রা)-এর কোলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লের, যার কারণে আলী (রা) আসরের নামায আদায় করতে পারেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরয করলেন, তিনি যেন সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেন। যাতে নামায আদায় করতে পারেন। অতঃপর সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হলো। এ হাদীসখানা দুর্বল। আহমদ ইবনে মালেক মিশরী (রা) বলেছেন বিশুদ্ধ। কিন্তু সহীহ হাদীস গ্রন্থে এর কোনো স্থান নেই। এ হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছেন আহলে বাইতের একজন অপরিচিতা মহিলা। যার সম্পর্কে কারো কোনো ধারণা নেই। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

মুসনাদে আহমদে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন নবী জিহাদের ঘোষণা দিয়ে তার জাতিকে বললেন, আমার সাথে সেই ব্যক্তি (যুদ্ধে) অংশগ্রহণ করবে না, যিনি নতুন

বিবাহ করেছেন। অর্থাৎ যার এখন পর্যন্ত বাসর রাত হয়নি। আর এমন ব্যক্তিও এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, যিনি পাকা ভবন নির্মাণ করেছেন কিন্তু ভবনের ছাদ দেয়নি। আর এমন ব্যক্তিও অংশগ্রহণ করতে পারবে না, যিনি বকরী বা গর্ভবতী উষ্ট্রী ক্রয় করেছে ও তার বাচ্চা প্রসবের অপেক্ষায় রয়েছে। অতঃপর সেই নবী জিহাদ আরম্ভ করলেন এবং আসরের সময় একটি জনপদে এসে পৌঁছলেন। তিনি (নবী) সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সূর্য! তুমিও আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত। হে আল্লাহ! আপনি এ সূর্যকে আমার জন্য কিছু সময় স্থির করে রাখুন। আল্লাহ তা'আলা নবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ দিন সূর্যকে শহর বিজয় করা পর্যন্ত স্থির করে রাখলেন। বিজয়ের পর তারা গণীমতের মালামালগুলো এক স্থানে জমা করলেন, যাতে আগুন এসে সেগুলো খেয়ে যায়। কিন্তু আগুন সেগুলো খেলো না।

আল্লাহর নবী বললেন, হে আমার জাতি! তোমাদের মাঝে নিশ্চয়ই কোনো আত্মসাৎকারী ব্যক্তি আছে। সুতরাং সকলে আমার হাতে বায়আত কর। (অর্থাৎ আমার হাতের উপর তোমাদের হাতগুলো রাখ) সকলেই এরূপ করলেন। অথঃপর এক ব্যক্তির হাত নবীর হাতের সাথে মিশে রইলো। তখন নবী সে ব্যক্তিকে বললেন, তোমার গোত্রের সকল লোকদের আমার হাতে বায়আত হতে হবে। অতঃপর সকলেই তাদের হাত নবীর হাতের উপর রাখলো। তাদের থেকে দুই অথবা তিনজনের হাত নবীর হাতের সাথে মিশে রইলো। তখন আল্লাহর নবী তাদেরকে বললেন, তোমরা মাল আত্মসাৎকারী। তোমরা যেসব মাল আত্মসাৎ করেছ, তা বের করে আনো। তারা গাভীর মাথার পরিমাণ স্বর্ণ বের করে দিল। তারপর সেই স্বর্ণ পূর্বের মালের সাথে মিশিয়ে রাখা হলো। তখন আগুন এসে মালগুলো ভক্ষণ করল।

আগেকার উম্মতের কারোর জন্য গণীমতের মাল গ্রহণ করা জায়েয ছিল না। কিন্তু আমাদের উম্মতে মুহাম্মদিয়া ﷺ-এর জন্য জায়েয করা হয়েছে। অতঃপর যখন বনী ইসরাঈলের সৈন্য বাহিনী শহরের দরজায় এসে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, তোমরা মাথানত করে (রুকু অবস্থায়) বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করত তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শহরে প্রবেশ করো। যেহেতু তিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করে বিজয় দান করেছেন। আর মুখে حطة (হিততাতুন) শব্দটি বলবে। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের পূর্বের অপরাধগুলো মাফ করুন। এ কারণে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রবেশের সময় সাওয়ারীতে বসে তাঁর মাথা বিনয়ের সাথে এবং আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপনে এতখানি ঝুঁকিয়েছিলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক সাওয়ারীর গদীর সাথে লেগে গিয়েছিল। আর এ সবকিছু করেছিলেন আল্লাহর দরবারে বিনয়, নম্রতা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে। এ সময় তার সাথে বিশাল সেনা বাহিনী ছিল। যারা চার দিক বেষ্টন করে রেখেছিলেন। বিশেষ করে সবুজ কাপড় পরিহিত সেনা বাহিনীর মাঝে উপস্থিত ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি ﷺ মক্কা শরীফে আগমন করেই গোসল করেন। অতঃপর আট রাকাআত শোকরানা নামায আদায় করেন। এটাই আলেমগণের প্রসিদ্ধ অভিমত। কারো মতে এটা ছিল চাশতের নামায। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ চাশতের সময় এ নামায পড়েছিলেন।

বনী ইসরাঈল আল্লাহর আদেশ অমান্য করল এবং শব্দের মধ্যেও পরিবর্তন করে বলল, তারা তাদের নিতম্বের উপর ভর করে حبة فى شعيرة (দানার মধ্যে গম) বলতে বলতে শহরে প্রবেশ করল। মোটকথা তারা আদেশ অমান্য করল এবং এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– (সে কথা স্মরণ কর) যখন তাদেরকে বলা হলো যে, এ এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে থাক এবং ওখানকার (ফসলাদি) থেকে তোমাদের পছন্দ মতো রুজি গ্রহণ কর। আর 'হিত্তাতুন, হিত্তাতুন' বলতে থাক এবং শহরের দরজায় সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের দোষ-ত্রুটি মাফ করে দেবো এবং সৎ লোকদেরকে আরো কিছু দান করব। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অপরাধী ছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তারা সে কথা বদলে দিলো। এর ফল এরূপ হলো যে, তাদের অপরাধের কারণে আসমান থেকে আযাব পাঠালাম। –সূরা আরাফ : আয়াত ১৬১-১৬২

অতঃপর মনে করে দেখ! যখন আমি তোমাদেরকে বললাম, তোমাদের সামনে যে এলাকা রয়েছে, তাতে ঢুকে পড়। এতে যা উৎপাদন হয়, তা যেভাবে চাও মজা করে খাও; কিন্তু এলাকায় ঢুকার সময় এর দরজায় নত হয়ে ঢুকবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে[১]। তাহলে তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবো এবং নেক লোকদের উপর আরো বেশি দয়া করব। কিন্তু যে কথা বলা হয়েছিল, যালিমরা তা পরিবর্তন করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত আমি যালিমদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম। তারা যে অপরাধ করেছিল এটা তারই শাস্তি ছিল। –সূরা বাকারা : আয়াত ৫৮-৫৯

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নতশিরে প্রবেশ করার অর্থ হলো, বিনয়ের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করা। মুজাহিদ, যিহাক ও সুদ্দী (রা) বলেন, দরজা দ্বারা এখানে 'বাবে হিত্তা' কে বুঝানো হয়েছে, যা বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের 'বায়তুল ঈলার' দরজা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নিজ মাথাকে উঁচু করে গর্বের সাথে প্রবেশ করে। ইবনে আব্বাস (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা)-এর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা হাদীসে রাসূল ﷺ-এর মধ্যেও পাওয়া যায়। যার বর্ণনা সামনেই আসবে।

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিল, দরজা দিয়ে মাথানত (সিজদা) অবস্থায় (শহরে) প্রবেশ কর এবং মুখে বল হিত্তাতুন (ক্ষমা করুন)। তবে তোমাদের অন্যায়গুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারা এ শব্দটি পরিবর্তন করে বলল ও মাথা উঁচু করে প্রবেশ করল। অন্য সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, দরজা দিয়ে নতশিরে হিত্তাতুন ক্ষমা করুন বলে শহরে প্রবেশ করো। তবে আমি তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেব। তারা শব্দ পরিবর্তন করে ও মাথা উঁচু করে শহরে প্রবেশ করল। তারা বলল حبة فى شعيرة (দানার মধ্যে গম চাই)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের অন্যায়ের কারণে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল এবং তাদের উপর আসমান থেকে শাস্তি অবতীর্ণ হলো। যা ছিল প্লেগ রোগ। এ রোগ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয়ই এ ব্যাধি (প্লেগ) সেই শাস্তিরই একটি অংশ, যার দ্বারা তোমাদের পূর্বের উম্মতদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

ইমাম নাসাঈ (রা) ও ইবনে আবী হাতেম (রা) অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্লেগ সেই শাস্তির অংশ যার দ্বারা তোমাদের পূর্বে উম্মতদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

যিহাক (রা) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে বর্ণিত رجز অর্থ শাস্তি। মুজাহিদ, আবু মালিক, সুদ্দী, হাসান ও কাতাদাহ (রহ)-এরও এ অভিমত। আবুল আলীয়া (রা) বলেন, رجز অর্থ আল্লাহর শাস্তি। শা'বী (রহ) বলেছেন, رجز অর্থ প্লেগ অথবা বরফ খণ্ডন। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রহ) বলেছেন, رجز অর্থ প্লেগ রোগ।

বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে বনী ইসরাঈলগণ সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন। আল্লাহর নবী ইউশা (আ) আল্লাহর কিতাব তাওরাত অনুযায়ী তাদেরকে সব কাজের নির্দেশ দিতেন। হযরত ইউশা (আ) একশ' সাতাইশ (১২৭) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুসা (আ)-এর পরে তিনি ২৭ বছর জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ মুসা (আ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল একশ বছর।

১. *'হিত্তাতুন' এর দু'প্রকার অর্থ হতে পারে। ক) আল্লাহর নিকট নিজেদের গুনাহের জন্য মাফ চাইতে চাইতে যাওয়া। খ) লুট-মার ও পাইকারি হত্যার বদলে জনগণের দোষ মাফ করা এবং সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করতে করতে যাওয়া।*

হযরত খিযির (আ)-এর ঘটনা

হযরত খিযির (আ) প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ) তাঁর কাছে ইলমে লাদুন্নী (আত্মিক জ্ঞান) অর্জন করার জন্য গিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফে এ দু'জনের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা আমি আগে করেছি। আমি এখানে হযরত খিযির (আ) সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করব। হযরত খিযির (আ)-এর নাম, বংশ তালিকা, নবুওয়াত এবং তার এখনো জীবিত থাকা সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ আছে। আমি এ ব্যাপারে আমার শক্তি সামর্থ অনুযায়ী এখানে আলোচনা করব।

হাফেজ ইবনে আসাকির (রা) বলেছেন, তিনি হচ্ছেন খিযির (আ) ইবনে আদম (আ)। অর্থাৎ তিনি হযরত আদম (আ) থেকেই সৃষ্টি হয়েছেন। ইবনে আসাকির (রা) তার এ কথার সমর্থনে বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, খিযির (আ) আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান। তিনি যাতে দাজ্জালকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারেন সে পর্যন্ত তাঁকে হায়াত দান করা হয়েছে। অর্থাৎ দাজ্জাল প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন।

আবু হাতিম সুহায়ল (রা) বলেছেন, আমি আমার শায়খগণ থেকে শুনেছি, যাদের মধ্যে আবু ওবায়দা (রা) প্রমুখ ছিলেন, আদম সন্তানের মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী হবেন হযরত খিযির (আ)। তাঁর নাম হচ্ছে যাযরুন ইবনে কাবীল ইবনে আদম (আ)। আবু হাতিম (রা) বলেছেন, ইসহাক (রহ) বলেছেন, আদম (আ)-এর ইন্তেকালে সময় যখন ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তার সন্তানদেরকে আছে দিলেন যে, যখন সেই তুফান আসবে, তখন তোমরা আমার দেহটিকেও তোমাদের সাথে নৌকায় উঠিয়ে নেবে। যেখানে তোমরা নৌকা হতে অবতরণ করবে, সেখানে তোমরা আমার মৃতদেহটি দাফন করবে।

যখন প্লাবন (তুফান) শুরু হলো, তখন তাঁরা (সন্তানগণ) তাঁদের সাথে আদম (আ)-এর মৃতদেহটিও নৌকায় উঠিয়ে নিলেন। যখন নৌকা থেকে অবতরণ করলেন, তখন হযরত নূহ (আ) সন্তানগণকে বললেন, পবিত্র মৃতদেহটি তিনি স্থানে দাফন করতে ওসীয়ত করেছেন, সেখানেই দাফন করো।

তাঁরা বললেন, জমীন এ পবিত্র দেহটি দাফন করার উপযোগী হয়ে উঠেনি। এখনো এটি নির্জন ও ভীতিপ্রদ হয়ে রয়েছে। তখন হযরত নূহ (আ) এ দাফন কাজে তাঁদেরকে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁদের মনে এ ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বললেন, হযরত আদম (আ) দো'আ করেছিলেন যে, তাঁকে সেই ব্যক্তি দাফন করবেন, যিনি দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী হবেন। ফলে আদম (আ)-এর পবিত্র মৃতদেহ তাঁদের সাথে সাথেই রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত খিযির (আ) এ মৃতদেহ দাফন করেন। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করেন, ততদিন খিযির (আ)-কে জীবিত রাখবেন।

ইবনে কুতায়বা (রহ) 'আল মারেফ' গ্রন্থে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, খিযির (আ)-এর নাম ছিল বালিয়া। তিনি তাঁর বংশ তালিকা এরূপ বর্ণনা করেছেন। বালিয়া ইবনে মালকান ইবনে ফালিগ ইবনে আবির ইবনে শালিখ ইবনে আরফাখাশ ইবনে আম ইবনে নূহ।

ইসমাঈল ইবনে আবু ওয়াইস (রা) বলেছেন, আমাদের কাছে যতটুকু বর্ণনা এসে পৌঁছেছে সে মোতাবেক হযরত খিযির (আ)-এর নাম মামার ইবনে মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নাসর ইবনে লায়েদ।

কোনো কোনো আলেমের মতে তার বংশ তালিকা এরূপ—

যাযরুন ইবনে আমায়েল ইবনে ইয়াফায ইবনে আল আয়স ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)। এটাও বর্ণিত আছে যে, তার নাম আরমায়া ইবনে খালকিয়া। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। এক বর্ণনা মতে,

খিযির (আ) হযরত মুসা (আ)-এর যুগের ফেরআউনের পুত্র ছিলেন। এ বর্ণনাটি খুবই গরীব বা দুর্বল। ইবনে জাওযী (রা) বলেছেন, এর বর্ণনাকারী হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আইয়ূব। যিনি আবু লুহাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। এরা দু'জনেই দুর্বল। (অর্থাৎ তাদের বর্ণনা নিশ্চিত বলে মনে করা যায় না)। এক বর্ণনায় আছে, তিনি হলেন, মালিকের পুত্র। আর মালিক হচ্ছেন হযরত ইলইয়াস (আ)-এর ভাই। এর বর্ণনাকারী হলেন সুদ্দী (রহ)।

এক বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন বাদশাহ যুল কারনাইনের সৈন্য বাহিনীর আমীর। কেউ কেউ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে একজনের পুত্র। এক বর্ণনা মতে, তিনি বাশতাছির ইবনে লাহরাছিবের কালের নবী ছিলেন। ইবনে জারীর (রা) বলেছেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তিনি ছিলেন আফরীদুন ইবনে আসফীয়ান বাদশাহর যুদের প্রথম দিকের লোক। তিনি মুসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত ছিলেন।

হাফেজ ইবনে আসাকির (রা) বলেছেন, খিযির (আ)-এর মাতা ছিলেন রোমী। আর তাঁর পিতা ছিলেন পারস্য দেশীয়। আগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের লোক এবং ফেরআউনের যুগ তিনি পেয়েছিলেন।

হযরত আবু যুরআ (রহ) হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো এক রাতে আসমানে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। তখন তিনি এক উত্তম ঘ্রাণ (সুঘ্রাণ) পেয়েছিলেন। তিনি জিবরাঈল (আ)-কে বললেন, এ সুগন্ধি কিসের? জিবরাঈল (আ) বললেন, এ সুগন্ধি মাশিত এবং তার দুই পুত্র ও তার স্ত্রীর থেকে আসছে। আর সুগন্ধির ঘটনাটি নিম্নরূপ—

হযরত খিযির (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের একজন। তার সাথে এক ধর্মযাজকের পরিচয় হয়। ধর্মযাজক তার কাছে আসলে তাকে তিনি ইসলাম ধর্মের সবকিছু শিখান। হযরত খিযির (আ) বয়প্রাপ্ত হলে তার পিতা তাকে এক মহিলার সাথে বিবাহ করান। হযরত খিযির (আ) তাকেও ইসলাম শিখান এবং তার থেকে এ ওয়াদা নেন যে, তিনি যেন এই কথা গোপন রাখেন। যেহেতু হযরত খিযির (আ) স্ত্রীর কাছে গমন করতেন না। তাই তিনি তাকে তালাক প্রদান করেন। এরপরে পিতা তাকে অন্য একটি বিবাহ করান। খিযির (আ) সেই দ্বিতীয় স্ত্রীকেও ইসলাম শিখান এবং তার থেকেও সেই ওয়াদা নেন। পরে তিনি একই কারণে দ্বিতীয় স্ত্রীকেও তালাক প্রদান করেন। এই তালাকপ্রাপ্তা দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বিষয়টি গোপন রাখলেন। আর একজন স্ত্রী ওয়াদা ভঙ্গ করে তা প্রকাশ করে দিল। তারপর হযরত খিযির (আ) সেখান থেকে গোপনে সমুদ্রের এক দ্বীপে এসে পৌঁছেন। সেখানে দুই জন লোক কাঠ সংগ্রহ করছিল। তারা তাঁকে দেখতে পেলেন। তাদের একজন খিযির (আ)-এর কথা গোপন রাখলেন এবং অন্যজন প্রকাশ্যে বলে দিলেন যে, আমি খিযির (আ)-কে দেখেছি। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সাথে আর কে তাঁকে দেখেছে? সে বলল, অমুক ব্যক্তি দেখেছে। তখন তার বর্ণনা অনুযায়ী সেই ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি পূর্বের মতই অস্বীকার করে গেলেন এবং তার কথা প্রকাশ করলেন না। যার ফলে অন্য ব্যক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সে সময় মিথ্যাবাদীর শাস্তি মৃত্যু ছিল। তাই তাকে হত্যা করা হলো। আর খিযির (আ)-এর নাম গোপনকারী লোকটি খিযির (আ)-এর তালাকপ্রাপ্তা সেই মহিলাটিকে বিবাহ করলেন, যে মহিলাটি প্রথমে হযরত খিযির (আ)-এর ওয়াদা অনুযায়ী তাঁর কথা গোপন রেখেছিলেন। এই মহিলা ফেরআউনের গৃহের দাসী ছিলেন। একদিন তিনি (দাসী) ফেরআউনের কন্যার মাথার চুল চিরুনী দ্বারা বিন্যাস করছিলেন। হঠাৎ করে চিরুনীখানা তার হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। এ সময় তার মুখ থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে গেল যে, 'ফেরআউন বিনাশ হোক'। পরিচারিকার মুখে এই কথা শুনে কন্যা তার পিতা ফেরআউনকে খবর দিলো। এ দাসীর দুই পুত্র ও স্বামী ছিল। ফেরআউন তাদেরকে লোক পাঠিয়ে হাজির করল এবং তাদেরকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার জন্য আদেশ করল। কিন্তু তারা কোনোভাবেই রাজি হলেন না। তারা ইসলামের উপর অবিচল রইল। কোনোভাবেই যখন তাদেরকে রাজি করাতে পারল না, তখন ফেরআউন তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে বলল, তোমরা যদি ইসলাম ত্যাগ না করো তবে আমি

তোমাদেরকে হত্যা করব। তাঁরা উত্তরে বললেন, হত্যা করবে এতে কোনই আপত্তি নেই। তবে আমাদের প্রতি আপনার এটা অনুগ্রহ হবে যদি আপনি আমাদের দু'জনকে একই কবরে দাফন করেন।

হযরত জিবরাঈল (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এর চাইতে অধিক সুবাস আর আপনি পাবেন না। এরা জান্নাবাসী। এই সুবাস তাদের কবর থেকে আসছে। ফেরআউনের কন্যার ঘটনাটি পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। হযরত খিযির (আ) সংশ্লিষ্ট চিরুনি ও অন্যান্য ঘটনা সম্ভবত উবাই ইবনে কাব অথবা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, হযরত খিযির (আ)-এর উপাধি ছিল আবুল আব্বাস। এটাই গ্রহণযোগ্য মত বলে প্রমাণিত হয়। 'খিযির' হযরত খিযির (আ)-এর উপাধি। উপাধি দ্বারা তিনি সুপরিচিত। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাঁর নাম খিযির হওয়ার কারণ এই যে, তিনি একবার শুষ্ক ও শুভ্র ঘাসের উপর অবস্থান করেছিলেন। এরপর সে শুষ্ক ঘাসগুলো সবুজ বর্ণের হয়ে গেল।

হাদীসের অর্থে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি যেখানে আগমন করেছিলেন সে জায়গাটির ঘাস শুভ্র ও শুষ্ক ছিল। কেউ বলেন, সে জায়গাটিতে কোনো ঘাসই জন্ম হতো না। কেউ বলেছেন, শুষ্ক ঘাস ছিল। কেউ বলেছেন, হাদীসে 'শুষ্ক ঘাসের' কথাই বলা হয়েছে। যা মাথার চুলের সাথে তুলনা করা হয়েছে। (যা শুভ্র হয়ে থাকে) খাত্তাবী (র) বলেছেন, খিযির (আ)-কে খিযির এজন্য বলা হয় যে, তার চেহারা ছিল চাকচিক্য ও সৌন্দর্যময়। এ অভিমতগুলো হাদীসের বিপরীত নয়। কারণ সব কারণই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, খিযির (আ)-এর নাম খিযির এ কারণে রাখা হয়েছে যে, তিনি শুষ্ক ঘাসের উপর নামায আদায় করলে সে ঘাসগুলো সবুজ বর্ণের রূপ ধারণ করতো। হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, তার নাম খিযির বলার কারণ হলো যখন তিনি কোথাও বসে নামায আদায় করতেন, তখন তাঁর চারপাশ সবুজ বর্ণের হয়ে যেত। প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আ) ও ইউশা (আ) যখন তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে 'মাছ হারিয়ে যাওয়ার স্থানে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন সমুদ্রের তীরে সবুজ চত্বরে খিযির (আ)-কে দেখতে পেলেন। এ সময় তিনি চাদর মুরি দিয়ে শায়িত ছিলেন। চাদরের এক প্রান্ত মাথার নিচে ছিল, আর অন্য প্রান্ত পায়ের নিচে ছিল। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে বসে সালাম কে দিলো? আপনি কি মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি মূসা। অতঃপর খিযির (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী বনী ইসরাঈলের নবী? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। পরবর্তী কাহিনী কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খিযির (আ) নবী ছিলেন।

হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ

১. হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াতের প্রথম দলীল, আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۞

অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে এমন এক বান্দার, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম আর তাকে আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। –সূরা কাহফ : আয়াত ৬৫

২. দ্বিতীয় দলীল; আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۞ قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞

মুসা (আ) তাকে বললেন, আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি যাতে আপনি আমাকে ঐ ইলম শেখাবেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আপনি আমার সাথে সবর করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয়ে আপনার কিছুই জানা নেই, সে বিষয়ে আপনি কিভাবে সবর করবেন। মুসা (আ) বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীই পাবেন। আমি কোনো বিষয়ে আপনার অবাধ্য হব না। তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে। তবে আপনি যদি আমার সাথে চলতে চান তাহলে আমি নিজে আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। –সূরা কাহফ : আয়াত ৬৬-৭০

খিযির (আ) যদি নবী না হয়ে শুধু ওলী হতেন, তবে হযরত মুসা (আ)-এর সাথে তাঁর এরূপ কথাবার্তা হতো না এবং মুসা (আ)-ও তাকে এভাবে কথা বলতেন না। আর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-কে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য তাঁর কাছেই প্রেরণ করেছিলেন। অন্য আর কারো কাছে প্রেরণ করেননি। তিনি নবী না হলে তিনি নিষ্পাপ হতেন না। যেখানে হযরত মুসা (আ) নিষ্পাপ। সেখানে তিনি একজন ওলীর থেকে যিনি নিষ্পাপ হওয়া জরুরি নয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য এত আগ্রহী হতেন না। মুসা (আ) তার কাছে গমন করাটাকে এত গুরুত্ব মনে করেছিলেন যে, যদি এজন্য তার যুগ যুগ ধরে তাকে অনুসন্ধান করতে হতো, তবুও তিনি যুগ যুগ ধরে তাঁকে অনুসন্ধান করতেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (খিযির [আ]) নবী ছিলেন। অতঃপর হযরত মুসা (আ) যখন তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার শর্তসমূহ মেনে নিয়ে তার সাথে থাকতে রাজি হলেন। এতেও প্রমানিত হয় যে, তাঁর কাছেও ওহী আসত। তবে হযরত খিযির (আ)-কে অতিরিক্ত বিশেষ জ্ঞান ও নবুওয়াতের গোপন ভেদ দান করা হয়েছিল, যা হযরত মুসা (আ)-কে দান করা হয়নি। উপরিউক্ত কথাগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, তিনি নবী ছিলেন। কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াত শরীফ এর প্রমাণ বহন করে।

৩. হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াতের তৃতীয় দলীল এই যে, হযরত খিযির (আ) একটি বালককে যে হত্যা করলেন, তা আল্লাহ তা'আলা পক্ষ হতে ওহী প্রাপ্ত হয়েই করেছিলেন। এটাও তার নবুওয়াতের আর একটি প্রমাণ। কারণ কোনো ওলীর জন্য ইলহাম প্রাপ্ত হয়ে কাউকে হত্যা করা বৈধ হতে পারে না। কারণ তার নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ, ঘটনাক্রমে তাঁর থেকে পাপ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে। আর খিযির (আ) বালকটিকে এ ধারণায় হত্যা করেছিলেন যে, এ বালকটি বড় হয়ে কুফরীতে লিপ্ত হবে এবং মাতা-পিতাকেও পাপ কাজে প্ররোচিত করবে। এ ভবিষ্যতের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসে থাকে। তার সাহায্য ও শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। আমি (ইবনে কাসীর) শায়খ আবুল ফারাহ ইবনে জাওযী (রা)-কে দেখেছি, তিনি হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াত প্রমাণে উপরিউক্ত দলীলগুলো গ্রহণ করেছেন। আল্লামা কেরমানী (র)-ও এ দলীল উল্লেখ করেছেন।

৪. হযরত খিযির (আ)-এর নবুওয়াতের চতুর্থ দলীল এই যে, হযরত খিযির (আ) যখন মুসা (আ)-কে সব কাজের রহস্য এবং উদ্দেশ্য বলে দিলেন এবং মুসা (আ)-এর কাছে যখন সবকিছু সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো, তারপর খিযির (আ) মুসা (আ)-কে বললেন, এসব কাজ আমার নিজ ইচ্ছায় করিনি; বরং আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আদেশে করেছি। এ কথায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন।

বেলায়েত ওলীর বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। এটা নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। তবে তার ফেরেশতা হওয়ার বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। যখন এ কথাটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, খিযির (আ) নবী ছিলেন। তখন এ কথা বলার আর কোনো সুযোগ নেই যে, ওলীগণ কখনো অদৃশ্য অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ের রহস্য জেনে থাকেন। এমনকি শরীয়তের জ্ঞান দ্বারাও নয়। এ প্রসঙ্গে কোনো দলীল এবং নির্ভরযোগ্য কিছু নেই, যার দ্বারা এর প্রমাণ পেশ করতে কেউ সক্ষম হবে।

খিযির (আ) কি এখনো জীবিত?

অধিকাংশ আলেমের অভিমত খিযির (আ) এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। বর্ণিত আছে, তিনি নূহ (আ)-এর মহা প্লাবনের পরে আদম (আ)-কে দাফন করেছিলেন। এজন্য তাঁর পিতার দোয়ায় তিনি দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী

হুয়ে যান। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি 'আবে হায়াত' পান করেছিলেন। এ কারণে তিনি জীবিত আছেন। আরো কিছু বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এখনো জীবিত আছেন। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

হযরত মুসা (আ) যখন খিযির (আ) থেকে পৃথক হতে যাচ্ছেন, তখন খিযির (আ) বললেন, এখনই আপনার ও আমার সম্পর্কের ইতি। যে বিষয় আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছি।

এ উপদেশ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস বর্ণিত আছে। বায়হাকী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। যখন মুসা (আ) খিযির (আ) নিকট হতে চলে যেতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। খিযির (আ) বললেন—

১) সর্ব অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবেন। ২) মানুষের উপকার করবেন। ৩) মানুষের ক্ষতি করবেন না। ৪) রাগান্বিত হবেন না। ৫) তোষামোদ ও খোশামোদ করবেন না। ৬) বিনা উদ্দেশ্যে চলবেন না। (অর্থাৎ অযথা ভ্রমণ করবেন না। অন্য এক সূত্রে এর সাথে আরো সংযুক্ত করা হয়েছে যে, ৭) আশ্চর্য কিছু দেখা ব্যতীত হাসবেন না।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বলেছেন, খিযির (আ) বলেন, হে মুসা (আ)! লোকেরা ইহকাল সম্পর্কে যতটুকু নিমগ্ন থাকে, ততটুকু পরিমাণ ইহকালীন শাস্তিতে তাদেরকে নিপতিত করা হয়।

বিশর ইবনে হারিস আল হাফী (রা) বলেছেন, মুসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন। তখন খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর তার আনুগত্যকে সহজ করুন।

এ সম্পর্কে একখানা মারফু হাদীস বর্ণিত আছে। যা ইবনে আসাকির (রা) যাকারিয়া ইবনে ইয়াইইয়া আল কিসাদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ যাকারিয়া একজন মিথ্যাবাদী। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তারপর বললন, অতঃপর তার কাছে হযরত খিযির (আ) তাশরীফ আনেন। তিনি ছিলেন শুভ্র ও সুগন্ধি মাখা কাপড় পরিহিত এক যুবক। তিনি এসে মুসা (আ)-কে বললেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। হে মুসা ইবনে ইমরান আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম দিয়েছেন। মুসা (আ) বললেন, তিনি নিজেই শান্তিদাতা। তাঁকেও সালাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যার নেয়ামত আমি গণনা করতে অক্ষম। তার শুকরিয়া আদায়ের শক্তি আমার নেই, তার সাহায্য ব্যতীত। তারপর মুসা (আ) বললেন, আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে এমন কিছু উপদেশ দিবেন যা আপনার অনুপস্থিতিতে আমার উপকারে আসবে। তখন খিযির (আ) বললেন, হে জ্ঞান অন্বেষণকারী! বক্তার পেরেশানী শ্রোতার চাইতে কম থাকে। সুতরাং কোনো কিছু বর্ণনা কালে নিজ সাথীদেরকে পেরেশানীতে ফেলবেন না। জেনে রাখুন, আপনার অন্তরটি একটি পাত্রের অনুরূপ। আপনি সর্বদা লক্ষ্য রাখবেন, আপনি কি জিনিস দ্বারা এ পাত্রটি পূর্ণ করছেন? দুনিয়া হতে এড়িয়ে থাকুন। দুনিয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করুন। এ দুনিয়া আপনার (চিরস্থায়ী) ঘর নয় এবং এটা স্থায়ী ঠিকানাও নয়। আপনাকে এখানে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। দুনিয়া থেকে পরকালের সম্বল সংগ্রহ করুন। স্বীয় আত্মাকে ধৈর্যের উপর মজবুত রাখুন, তবেই গুনাহ হতে রক্ষা পাবেন।

হে মুসা (আ)! আপনি যদি জ্ঞান অর্জন করতে চান, তবে এজন্য নিজকে প্রস্তুত করুন। কারণ জ্ঞান তিনিই অর্জন করতে পারেন, যিনি সেজন্য প্রস্তুত থাকেন। আর অতিরিক্ত কথা বলবেন না এবং অযথা কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। কারণ অতি কথন আলেমগণকে সমালোচনার পাত্র করে তোলে এবং জ্ঞানের স্বল্পতা প্রকাশ পায়। বরং আপনি সর্ব অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। কারণ তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং যোগ্যতার নিদর্শন। মূর্খ ও প্রতারকদের থেকে দূরে থাকুন। বোকাদের ব্যাপারে সহনশীলতার পরিচয় দিন। কারণ এগুলো জ্ঞানীদের কাজ এবং জ্ঞানীদের সৌন্দর্য। যখন আপনাকে কোনো মূর্খ গালি দেবে, তখন আপনি ধৈর্যধারণ করবেন এবং চুপ থাকবেন। এসব লোকদেরকে শালীনতার সাথে বর্জন করবেন। কারণ উত্তর দিলে তার মূর্খতা ও গালি আগের চেয়েও বৃদ্ধি পাবে।

হে ইবনে ইমরান! নিজকে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ধারনা করুন। অহেতুক সর্দারী ও নেতৃত্ব দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করে।

হে ইবনে ইমরান! এমন বন্ধদ্বারকে উন্মুক্ত করবেন না। যে দ্বার সম্পর্কে আপনার জানা নেই যে, এটি কে (কি কারণে) বন্ধ করেছে। আর এমন দ্বার বন্ধ করবেন না, যে দ্বার সম্পর্কে আপনার জানা নেই যে, এটি কে উন্মুক্ত রেখেছে।

হে ইবনে ইমরান! যে ব্যক্তির দুনিয়ার প্রয়োজন পূর্ণ হয় না, দুনিয়ার প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট থাকে, নিজকে হীন মনে করে অর্থাৎ খুব নিঃস্ব ও গরীব মনে করে আর অধিক মাল হাসিলের জন্যই লেগে থাকে এবং তার জন্য যা নির্ধারিত সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অভিযোগ করে, এমন ব্যক্তি কি করে ধর্মনিষ্ট (সাধক) হতে পারে? যে নিজ কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, সে কিভাবে কামভাব থেকে বেঁচে থাকবে? মূর্খতার অন্ধকারে যে আচ্ছন্ন সে কিভাবে তার অর্জিত জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারে? কারণ দৃশ্যত যদিও সে পরকালমুখী, মূলত সে দুনিয়া লোভী।

হে মুসা (আ)! যা কিছু শিক্ষা করবেন, তা আমল করার জন্যই শিখবেন। এজন্য শিখবেন না যে, তা দিয়ে আপনি বক্তৃতা করবেন। অর্থাৎ নিজে আমল করবেন না, কিন্তু লোকদের কাছে তা আমল করার জন্য বলবেন। আমল করার উদ্দেশ্যে এরূপ জ্ঞান যদি আপনি অর্জন করতে পারেন, তবে সে জ্ঞান আপনার জন্য হবে সাফল্য।

হে মুসা ইবনে ইমরান! সাধনা ও তাকওয়াকে আপনার আবরণ বানিয়ে নিন। আর ইলম ও যিকিরকে আপনার কালাম বানিয়ে নিন। বেশি পরিমাণে নেক কাজ করুন। কারণ, পাপ কাজ তো নিজের থেকে হতেই আছে। অন্তরে সর্বদা আল্লাহর ভয় রাখুন। এটা হবে আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির মাধ্যম। আর সর্বদা মঙ্গলজনক কাজ করতে থাকবেন। আপনি যদি আমার এ কথাগুলোকে মূল্যায়ন করেন, তবে আপনি উপদেশ পেয়ে গেলেন। তারপর হযরত খিযির (আ) মুসা (আ) থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং মুসা (আ) বিচ্ছেদ বেদনায় সেখানে বসে কাঁদতে লাগলেন।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

হাফেজ আবু নাঈম ইসপাহানী (রহ) হযরত আবু উসামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে খিযির সম্পর্কে কিছু কথা বলব? সাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অবশ্যই বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খিযির (আ) একদিন বনী ইসরাঈলের বাজারে ঘোরাফিরা করছিলেন। একজন অভাবী ব্যক্তি তাকে দেখে তার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বলল, আমাকে কিছু দান করুন, আল্লাহ আপনাকে বরকত দেবেন। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আল্লাহ যা চান তাই করেন। আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা তোমাকে দান করতে পারি। ফকীর পুনরায় ভিক্ষা চেয়ে বলল, আমি আপনার কাছে আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু প্রার্থনা করছি। কারণ আপনার নিকট হতে কোনো দান না পেয়ে আমি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে আপনার মধ্যে বরকত অনুভব করেছি। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তোমাকে দান করার মতো আমার কাছে কিছুই নেই। তবে তুমি আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দাও। ফকীর বলল, আপনি কি সত্য কথা বলছেন? খিযির (আ) বললেন, আমি তোমাকে সত্য কথাই বলছি। কারণ তুমি আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছ। সুতরাং আমার প্রতিপালকের পবিত্র নামের কারণে আমি তোমাকে আজ খালি হাতে ফিরিয়ে দেব না। তাই তুমি আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর ফকীর তাঁকে নিয়ে বাজারে চারশ দিরহামে বিক্রি করেন। ক্রেতা (মনিব) তাঁকে অনেকদিন ধরে কাজ কাম থেকে বিরত রাখেন অর্থাৎ তাঁকে কোনো দায়িত্ব দিলেন না। খিযির (আ) তাঁর মনিবকে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কোনো কাজের উদ্দেশ্যে ক্রয় করেছেন। সুতরাং আপনি আমাকে কোনো কাজের নির্দেশ দিন। মনিব বললেন, আমার কাছে এটা খুবই অপছন্দ যে, আমি আপনার মতো একজন বৃদ্ধ ও বয়ুর্গ মানুষের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেব। তিনি বললেন,

আমার উপর বোঝা হবে না। মনিব বলল, তাহলে এ পাথরগুলো এখান থেকে সরিয়ে ফেল। অথচ সেই পাথরগুলো একদিনে সরাতে হলে কমপক্ষে ছয়জন লোক প্রয়োজন। এ নির্দেশ দিয়ে মনিব জরুরি কাজে বাইরে চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখতে পেলেন যে, অল্পসময়ের মধ্যে সব পাথর তিনি সরিয়ে ফেলেছেন। মনিব বলল, আপনি খুব ভাল কাজ করেছেন। আপনি এমন ক্ষমতা দেখালেন, যা আমি ভাবতেও পারিনি। তারপর মনিব একদিন কোথাও সফরে যাবার সময় খিযির (আ) তাঁকে বললেন, আমাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিয়ে যান। মনিব বললেন, আপনাকে কোনো কষ্টকর কাজের নির্দেশ দিতে আমার মন চায় না। তিনি বললেন, আমার জন্য কোনই কষ্ট হবে না। তখন মনিব বললেন, আপনি আমার ঘর নির্মাণের জন্য কিছু ইট বানিয়ে পোড়াবেন। মনিব সফরে চলে গেলেন। সফর থেকে ফিরে এসে তার ঘর দালান দেখতে পেলেন। মনিব বিস্মিত হয়ে খিযির (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো আপনার পরিচয় কী? আসলে আপনি কে? খিযির (আ) বললেন, আপনি আমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা চাওয়ার কারণেই আমি আপনার গোলাম হয়েছি। আমি কে তা আপনাকে আমি বলছি, আমি সেই খিযির যার সম্পর্কে আপনি (লোক মুখে) শুনেছেন। আমার কাছে এক ফকীর কিছু ভিক্ষা প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু তাকে দেয়ার মতো আমার কাছে কিছুই ছিল না। এরপর সে আল্লাহর নাম নিয়ে আমার কাছে ভিক্ষা কামনা করেছে। আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়ার কারণে আমাকে বিক্রি করার জন্য তাঁকে বলেছি। তারপর সে (ফকির) আমাকে আপনার কাছে বিক্রি করেছে। আমি আপনাকে বলছি, যদি কোনো ব্যক্তির কাছে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা না দেয়, তাহলে সে কিয়ামতের দিন গোস্ত বিহীন শরীর নিয়ে হাজির হবে। সে কোনো হাড্ডি দ্বারা নড়াচড়া করতে পারবে না।

মনিব বললেন, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। হে আল্লাহ তা'আলরা নবী! আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। খিযির (আ) বললেন, এতে কোনো সমস্যা হয়নি। আপনি ঠিক কাজই করেছেন এবং সাওয়াব হাসিল করেছেন। মনিব বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আমার ঘর এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কে আপনি আমাকে আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী মিমাংশা দিন। আমি আপনাকে আপনার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলাম। খিযির (আ) বললেন, আমি আকাঙ্ক্ষা আপনি আমাকে মুক্ত করে দেবেন। যাতে আমি আমার প্রভুর ইবাদত করতে পারি। তখন তিনি (মনিব) খিযির (আ)-কে মুক্ত করে দিলেন। তারপর খিযির (আ) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাকে গোলাম বানিয়েছেন এবং পরে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

এ হাদীস খানার বর্ণনাকারী এমন একজন ব্যক্তি যিনি অপরিচিত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত। ইবনে জাওযী (র) এ হাদীসটি আব্দুল ওহাব ইবনে যাহোক (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে আসাকির (র) সুদ্দী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খিযির (আ) ও ইলইয়াস (আ) দু'জন ভাই ছিলেন। তাঁদের পিতা ছিলেন একজন বাদশাহ। একবার ইলইয়াস (আ) তাঁর পিতাকে বললেন, আমার ভাই খিযিরের বাদশাহীর প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। যদি আপনি তাঁকে বিবাহ করিয়ে দেন, তবে হয়তো তাঁর সন্তানের মধ্যে কেউ এরূপ হতে পারেন যিনি রাজত্বের দায়িত্বগ্রহণ করে বাদশাহী পরিচালনা করবেন। বাদশাহ খিযির (আ)-কে এক সুন্দরী রূপসী মেয়েকে বিবাহ করিয়ে দেন। খিযির (আ) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আমার কোনো স্ত্রীর প্রয়োজন নেই। তুমি যদি চাও, তবে তোমাকে আমি মুক্ত করে দিতে পারি। আর যদি চাও, তবে আমার সাথে থেকে তুমি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পার। আর আমার গোপন বিষয়গুলো কোন সময় প্রকাশ করবে না। স্ত্রী বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার সাথেই থাকব। এরপর থেকে সে (স্ত্রী) তার সাথে অবস্থান করতে লাগলেন। এভাবে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু তাদের কোনো সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি।

একদা বাদশাহ খিযির (আ)-এর স্ত্রীকে ডেকে বললেন, তুমি যুবতী আর আমার পুত্রও যুবক। তোমাদের সন্তান না হওয়ার কারণ কি? স্ত্রী উত্তরে বললেন, সন্তান তো আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই হয়ে থাকে। তিনি যদি

চান তবে হবে। আর যদি না চান তবে হবে না। বাদশাহ তার পুত্র খিযির (আ)-কে ডেকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য বললেন। খিযির (আ) স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন। অতঃপর বাদশাহ খিযির (আ)-কে পুনরায় এমন এক মেয়েকে বিবাহ করিয়ে দিলেন, যার পৃষ্ঠে সন্তান ছিল। খিযির (আ) বাসর রাতে তাঁকেও সেই কথা বলে দিলেন, যা তিনি পূর্বের স্ত্রীকে বলেছিলেন। স্ত্রী পূর্বের স্ত্রীর মতো তাঁর সাথে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এক বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর বাদশাহ পুত্রবধূকে ডেকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধূ বলল, আপনার পুত্রের স্ত্রীর প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। তখন পিতা পুত্র খিযির (আ)-কে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। কিন্তু এ খবর পেয়ে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। লোকেরা বহু তালাশ করেও তার কোনো সন্ধান পান নি।

বর্ণিত আছে দ্বিতীয় স্ত্রী তাঁর গোপন বিষয় সম্পর্কে পিতার কাছে প্রকাশ করে দেয়ার কারণে হযরত খিযির তাকে হত্যা করেছিলেন। এ কারণে তিনি পলায়ন করেছিলেন। আর প্রথমতঃ যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। সে স্ত্রী শহরের কিছু দূরে এক নির্জন স্থানে বসে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। একদিন একটি লোক তাঁর কাছ দিয়ে গমন করার সময় তার সাথে পরিচয় হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তার কাছে তিনি (স্ত্রী) বিবাহ বসেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুটি সন্তানও দান করেন। আল্লাহর কি করুণা। সেই (তালাকপ্রাপ্ত) স্ত্রী ফেরআউনের ঘরের বাঁদি হিসেবে চাকরি লাভ করেন। তার দায়িত্ব ছিল ফেরআউনের কন্যার মাথার চুলগুলো আঁচড়িয়ে সুবিন্যস্ত করে দেয়া। একবার তিনি (বাঁদি) মাথার চুল আঁচড়াতে ছিলেন হঠাৎ তার হাত থেকে চিরুনিটি নিচে পড়ে গেল। তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে চিরুনিটি তুলে নিলেন। ফেরআউনের কন্যা বলে উঠল, তুমি কি আমার পিতার নাম নিয়েছ? বাদি বললেন, না আমি সেই মহান সত্তার নাম নিয়েছি, যিনি আমার, তোমার এবং তোমার পিতারও পালনকর্তা। কন্যা পিতার কাছে এ খবর পৌঁছিয়ে দিলো। ফেরআউন তার পরিষদবর্গকে নির্দেশ দিলো, উত্তপ্ত ও প্রজ্বলিত তামার ডেগের তেল গরম করে তার মধ্যে এ মুসলমান মহিলাকে তার সন্তানসহ নিক্ষেপ করো। মহিলা প্রজ্বলিত অগ্নির ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেয়ে একটু ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে তার দুধের বাচ্চা বলে উঠল, আম্মাজান! ধৈর্যধারণ করুন। কারণ, আপনি সত্যের উপর আছেন। তখন তার দেহ সেই প্রজ্বলিত তামার মধ্যে উৎসর্গ করেন এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আল্লাহর রহমত খুবই প্রশান্তদায়ক।

হাফেজ আসাকির (রা) এ ঘটনা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন। আহলে কিতাবগণ! তাদের কিতাবে তাদের কিছু সংখ্যক বুযুর্গ থেকে বর্ণনা করেন যে, খিযির (আ) তাদের কাছে আসা-যাওয়া করতেন এবং সালাম বিনিময়ও করতেন। তাদের পরিচয়ও তিনি অবগত ছিলেন। অথচ তিনি মুসা (আ)-কে চিনেননি। যেখানে আল্লাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। এমনকি হযরত মুসা (আ)-কে তার পরিচয় দিতে হয়েছে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের নবী মুসা। এ কারণে আহলে কিতাবের এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের সময় খিযির (আ)-এর উপস্থিতি

হাফেজ আবু বকর বায়হাকী (রা) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন সাহাবীগণ তার চারপাশে বসে ক্রন্দন করছিলেন। ইত্যবসরে এক (অপরিচিত) ব্যক্তি সেখানে আগমন করলেন। যিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তার চিবুক ভরা দাঁড়িগুলো চিকচিক করছিল। তিনি সাহাবীগণকে অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলেন এবং সাহাবীগণের সাথে তিনিও ক্রন্দন করতে লাগলেন। তারপর সাহাবীগণের দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর জন্য প্রতিটি মসীবতে ধৈর্য ধারণকারী, উত্তম ব্যক্তি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিটি হারানো জিনিসের প্রতিদান রয়েছে। ক্ষতি পূরণের প্রতিদান অন্যরকম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তার দিকেই মনোনিবেশ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি এ মসীবতের বিনিময়ে রহমতের (কুদরতী) দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। তোমরাও তার

রহমতের অপেক্ষায় থাক। কারণ মসীবতগ্রস্ত তো সে ব্যক্তি যার ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তারপর তিনি চলে গেলেন। সাহাবীগণ পরস্পরকে বলাবলি করতে লাগলেন, কেউ কি একে চিন? ইনি কে? হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত আলী (রা) বললেন, জী, হ্যাঁ, আমরা তাঁকে চিনি। ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (দ্বীনী) ভাই খিযির (আ)।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ) তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আলী ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যখন ইন্তেকাল হয়, তখন শোক প্রকাশকারীগণ একটি আওয়াজ শুনতে পান যে, কে যেন বলছে, প্রতিটি মসীবতে ধৈর্য ধারণকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে। প্রতিটি মানুষ চলে যাওয়ার পরেই তার স্থলাভিষিক্ত রয়েছেন। প্রতিটি হারিয়ে যাওয়া বস্তুর ক্ষতিপূরণ (বিনিময়) রয়েছে।

অতএব আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করো এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করো। মসীবতগ্রস্ত তো সে ব্যক্তি যে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে। আলী ইবনে হুসাইন (রহ) উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এ কথাগুলো কার? এ কথাগুলো হচ্ছে হযরত খিযির (আ)-এর।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাব (রহ) মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রহ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, একবার হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) এক লোকের জানাযার নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে তিনি একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অদৃশ্য থেকে কে যেন বলছে, আমার আসার পূর্বে জানাযা পড়াবেন না। আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। হযরত ওমর (রা) তার অপেক্ষা করলেন। অবশেষে তিনি এসে কাতারে শামিল হলেন। তারপর তিনি মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি তাকে শাস্তি দেন, তবে আপনার বান্দা অবশ্যই অপরাধী, আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনার রহমতের মুখাপেক্ষী। যখন তাকে দফন করা হলো তখন তিনি বললেন, হে কবরবাসী! তোমার জন্য সুসংবাদ, তুমি গণক, জ্যোতিষী, মাল (সম্পদ) সঞ্চয়কারী, ধনভাণ্ডার রক্ষক ও ঘুষদাতা ছিলে না।

অতঃপর হযরত ওমর (রা) (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, এ ব্যক্তিকে আটক করো। আমরা তার কাছে তার জানাযার নামায ও তার কথাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। আর তাঁর কাছে জানতে চাই, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, কিন্তু তিনি লোকের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অতঃপর লোকেরা দেখতে পেল যে, তাঁর পদচিহ্ন ছিল এক হাত পরিমাণ লম্বা। হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! ইনি ছিলেন হযরত খিযির (আ)। যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অবগত করেছেন।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি এক রাতে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি সেখানে এক ব্যক্তিকে কাবা ঘরের গিলাফ ধরে এ দো'আ করতে শুনলাম– হে মহান সত্তা! যার শ্রবণ, অন্যের শ্রবণে বাঁধা পায় না। কারণ একই সময় তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রার্থনা শুনতে পান) যিনি, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নে বিব্রত হন না। হে মহান সত্তা! যিনি বার বার বিনয়কারীর বিনয়ে ও প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় বিরক্ত হন না। আমাকে আপনার ক্ষমার শীতলতা ও রহমতের প্রশান্তি দান করুন।

হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তাঁকে বললাম, তুমি যে দো'আ করলে এটা আবার আমাকে শোনাও। তখন তিনি আমাকে বললেন, আপনি কি আমার দো'আ শুনেছেন? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে খিযিরের প্রাণ। (অর্থাৎ তিনি খিযির ছিলেন) যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পরে এ দো'আটি পাঠ করবে তার পাপ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেবেন, তা যদি সমুদ্রের তুফান ও বৃক্ষের পাতাসমূহ এবং সমস্ত নক্ষত্রের সমপরিমাণ হয়। আরবি দো'আটি নিম্নরূপ—

يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ سَمْعٌ مَنْ سَمِعَ . وَيَا مَنْ لَا تُغَلِّطُهُ الْمَسَائِلُ . وَيَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ الْحَاحُ الْمُلِحِّيْنَ وَلَا مَسْأَلَةُ السَّائِلِيْنَ أَرْزُقْنِيْ بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ .

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ) থেকে উপরিউক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত আলী (রা) কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন, এ সময় এক লোককে দেখতে পেলেন যে, তিনি কাবা শরীফের গেলাফ ধরে বলছেন—

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ . وَيَا مَنْ لَا تَغْلَطُهُ السَّائِلُوْنَ وَيَا مَنْ يُبْرِمُهُ الْحَاحُ الْمُلْحِحِيْنَ أَرْزُقْنِيْ بُرُوْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ .

এতদশ্রবণে হযরত আলী (রা) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আপনার দো'আটা আমাকে পুনরায় শুনান। তিনি বললেন, আপনি কি আমার দোয়াটা শুনেছেন? আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, শুনেছি। তখন তিনি দো'আটি শুনিয়ে বললেন, প্রতি নামাযের পরে এটি পাঠ করবে। সেই মহান সত্তার শপথ, যার কুদরতী হাতে খিযিরের প্রাণ, তোমার পাপ যদি আকাশের তারকা, আকাশের বৃষ্টি এবং পৃথিবীর কঙ্কর ও তার মাটি পরিমাণও হয়, তবু পলকের পূর্বেই আল্লাহ তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুরায়েয (র) ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খিযির (আ) ও ইলইয়াস (আ) প্রতি বছর হজ্বের সময় একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। একজন অন্যজনের মাথা মুণ্ডন করে দিতেন এবং এ কথা বলে একজন অন্যজন থেকে বিদায় নিতেন—

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ . لَا يَسُوْقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللّٰهُ . مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ السُّوْءَ إِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ . مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ . مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। মাশাআল্লাহ কল্যাণ প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। মাশাআল্লাহ অকল্যাণ হতে রক্ষাকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার থেকেই সকল প্রকার নিয়ামত এসে থাকে। মাশাআল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ দো'আটি তিনবার করে পাঠ করবে, সে উপদ্রব হতে নিরাপদে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) এ কথাও বলেছেন যে, সে ব্যক্তি শয়তান (এর কুমন্ত্রণা, যালিম) বাদশাহ (এর জুলুম) সর্প ও বিচ্ছুর দংশন হতে নিরাপদে থাকবে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, প্রতি বছর আরাফার দিবসে আরাফাতের ময়দানে জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল (আ) ও খিযির (আ) সমবেত হন।

ইবনে আসাকির বলেছেন, 'ইলইয়াস (আ) ও খিযির (আ) প্রতি রমযানের রোজা বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে রাখতেন এবং প্রতি বছর হজ্ব আদায় করতেন এবং যমযম কূপ থেকে একবার পানি পান করতেন, যা পরবর্তী বছর পর্যন্ত যথেষ্ট হতো। (অর্থাৎ পরবর্তী বছর হজ্বের মওসুমে আবার যমযমের পানি পান করতেন। এর মধ্যে আর কিছুই আহার করতেন না।)

ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, দামেশকের জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ওলীদ ইবনে আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান এক রাতে সে মসজিদে ইবাদতে মগ্ন থাকার ইচ্ছা করলেন। ওলীদ তার লোকজনদেরকে আদেশ দিলেন, সে রাতে যেন মসজিদ খালি রাখা হয়। এ আদেশের প্রেক্ষিতে মসজিদ সম্পূর্ণরূপে খালি করা হলো। রাতের বেলা ওলীদ মসজিদে প্রবেশ করলেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন যে, একটি লোক তাঁর এবং আল খিদরা দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। ওলীদ মসজিদের খাদেমদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলেছিলাম না যে, এ রাতে আমার ইবাদতের জন্য তোমরা মসজিদকে খালি করে

রাখবে? তারা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইনি হলেন খিযির (আ)। যিনি প্রতি রাতে এসে এখানে ইবাদত করেন।

ইবনে আসাকির (রহ) আরো বর্ণনা করেন যে, রিবাহ ইবনে ওবায়দাহ (রহ) বলেছেন, আমি এক লোককে দেখতে পেলাম যে, তিনি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)-এর হাতের ওপর ভর দিয়ে চলছেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, এ লোকটি পাদুকা বিহীন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ)-এর নামায আদায় শেষে তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার হাতে যিনি ভর দিয়ে চলছিলেন, তিনি কে ছিলেন? তিনি বললেন, হে রিবাহ! তুমি কি সে লোকটিকে দেখেছ? আমি আরয করলাম, জী হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাকে একজন সৎ মানুষ মনে করছি। তুমি যাকে দেখেছ, তিনি ছিলেন আমার ভাই খিযির (আ)। তিনি আমাকে হাত ধরে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আমি একজন সম্মানিত হব এবং ন্যায় পরায়ন শাসক হব।

উপরিউক্ত বর্ণনা ও ঘটনা তাদের জন্য উৎকৃষ্ট প্রমাণ, যারা বিশ্বাস করেন যে, হযরত খিযির (আ) এখনো জীবিত আছেন। তবে উপরিউক্ত সকল হাদীস অত্যন্ত দুর্বল। অনেক বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে এবং অনেক বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যাদের নাম আমি (অনুবাদক) বিভিন্ন কারণে তরজমায় বর্ণনা করিনি এবং অনেক সূত্রকেও আমি এড়িয়ে গিয়েছি।

আব্দুর রাযযাক (রহ) বলেন, আবু সাঈদ (রহ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জাল সম্পর্কে একখানা দীর্ঘ হাদীসে বলেছেন দাজ্জাল যখন আত্মপ্রকাশ করবে (মদীনা শরীফে তার জন্য প্রবেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে) তখন মদীনা শরীফের একজন সর্বোত্তম ব্যক্তি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হয়ে বলবেন, তুমি কি সেই দাজ্জাল! যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বলেছেন। দাজ্জাল বলবেন, তোমার ধারণা কী? আমি যদি কাউকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করে দেই এরপরও কি তোমরা আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবেন, না। তখন সে দাঁড়ান উপস্থিত এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করবে। যখন ঐ ব্যক্তি জীবিত হবে, তখন লোকেরা বলবে আল্লাহর কসম! এখন আমরা তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে, তুমিই দাজ্জাল। সে দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু তা করতে সক্ষম হবে না। বর্ণনাকারী বলেছেন যে, আমার কাছে এরূপ বর্ণনাও এসেছে যে, দাজ্জালের গর্দানে তামার একটি প্লেট ঝুলানো থাকবে। আর এরূপ বর্ণনাও আসছে যে, সে ব্যক্তিকে দাজ্জাল জীবিত করে পুণরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সক্ষম হবে না, সে ব্যক্তি হলো খিযির (আ)। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে অনেক মন্তব্য রয়েছে। যা বিভিন্ন কারণে অনুবাদে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি হযরত খিযির (আ) ইন্তেকাল করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম বোখারী, ইবরাহীম হারবী, আবুল হোসাইন ইবনে মুনাদী, শায়খ আবুল ফরাজ ইবনে জাওযী (রহ)। শায়খ ইবনে জাওযী (রহ) এ প্রসঙ্গে একখানা কিতাবও প্রণয়ন করেছেন। যে কিতাবের নাম 'ইজালাতুল মুনতাযির ফী শরহে হালাতিল খিযির'।

উপরিউক্ত বুযুর্গগণ হযরত খিযির (আ)-এর ইন্তেকালের স্বপক্ষে কয়েকটি প্রমান পেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ .

অর্থ : (হে নবী) আমি আপনার পূর্বেও কোনো মানুষের জন্য চিরন্তন জীবন রাখিনি। –সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৩৪

সুতরাং খিযির (আ) যদি মানুষ হয়ে থাকেন, তবে এ হুকুমের আওতায় তিনি অবশ্যই পড়বেন। তাঁর আলাদা বিশেষত্ব কোনো বিশুদ্ধ হাদীস ব্যতীত মনে করা ঠিক নয়। আর বিশুদ্ধ কোনো হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত নয়। যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সেটা ভিন্ন কথা। তবে এ ব্যাপারে এমন কোনো নিশ্চিত (বিশুদ্ধ) বর্ণনা ও হাদীস বর্ণিত হয়নি, যা গ্রহণ করা যরুরী। আল্লাহ তা'আলার এ বাণীও দলীলরূপে তাঁরা পেশ করেছেন—

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۞

অর্থ : (ঐ কথা স্মরণ কর) আল্লাহ নবীদের থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি। তোমাদের নিকট যে শিক্ষা আগে থেকেই আছে ঐ শিক্ষার সত্যতা ঘোষণা করে কাল যদি অন্য কোনো রাসূল তোমাদের কাছে আসেন তাহলে তোমাদেরকে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং তাঁকে সাহায্য করতে হবে[১]। এ কথা বলে আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ কথা স্বীকার করছ এবং এ বিষয়ে আমার ওয়াদা পালনের দায়িত্ব কি কবুল করছ? তারা বলল : হ্যাঁ, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। –সূরা আলে ইমরান : ৮১

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সকল নবী (আ) থেকে অবশ্যই ওয়াদা নিয়েছেন। হযরত খিযির (আ) যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সময় জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনতেন এবং তার সাহায্য করতেন। এবং তিনি তার উম্মতগণ থেকেও এ ওয়াদা নিতেন যে, যদি তাদের জীবনে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাশরীফ আনেন, তবে সবাই যেন তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর সাহায্য করে।

সুতরাং হযরত খিযির (আ) যদি নবী বা ওলী হন, তবে এ প্রতিশ্রুতির আওতায় তিনিও পড়বেন। যদি খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময় জীবিত থাকতেন, তবে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র খেদমতে হাজির হতেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতেন এবং তাঁকে সাহায্য করতেন এবং তার হেফাযতের জন্য দুশমনদের মোকাবিলা করতেন। কারণ তিনি যদি ওলী হন, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তার চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। আর যদি নবী হন তবে হযরত মুসা (আ) তাঁর চাইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।

ইমাম আহমদ (রহ) তাঁর মুসনাদে উল্লেখ করেছেন, হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম! যার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ। যদি মুসা (আ) জীবিত থাকতেন তবে তাঁরও আমার অনুসরণ করতে হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় সকল নবীগণের জীবিত হওয়া যদি ধরে নেয়া হয়, তবে সকলের জন্যই সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর উপর ঈমান আনা জরুরী হতো এবং তার শরীয়ত ও তার উপর অর্পিত বিধান তাঁদের জন্য মেনে নিতে হতো। মি'রাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল নবীদের ইমামতি করাটাও প্রমাণ বহন করে যে, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল নবীদের সর্দার। সর্বশেষ নবীর মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মিরাজের রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসার পর হযরত জিবরাঈল (আ) তার পবিত্র হাত ধরে ইমামতের আসনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি ﷺ নবীদের ইমামতি করেছিলেন। এ কথাটি এখন সবার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত খিযির (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদিয়া ﷺ-এর অন্তর্ভুক্ত হতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

---

১. *অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে বরাবর এ বিষয়ে ওয়াদা নেয়া হয়েছে। এখানে এতটুকু কথা আরো বুঝে নেওয়া দরকার যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে প্রত্যেক নবীর কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা নেয়া হয়েছে বা তিনি নিজের উম্মতকে তাঁর পরবর্তী কোনো নবীর আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে তাঁর (পরবর্তী নবীর) প্রতি ঈমান আনার উপদেশ দিয়েছেন। আর কুরআন মাজীদে নবী কারীম ﷺ-কে সুস্পষ্টভাবে 'খাতিমুন নাবিয়্যীন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।*

শরীয়ত অনুপাতে নির্দেশ দিতেন। তিনি এই শরীয়তের বহির্ভূত কোনো হুকুম দিতেন না। কারণ হযরত ঈসা (আ) পাঁচজন শ্রেষ্ঠ নবীর অন্যতম একজন এবং বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হয়েও তার জন্য এই হুকুম। কোনো বিশুদ্ধ হাদীসে এ কথাটি বর্ণিত হয়নি যে, হযরত খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোথাও মিলিত হয়েছেন এবং তাঁর সাথে কোনো জেহাদে শরীক হয়েছেন। বদরের যুদ্ধের দিন সত্য ও সত্যায়িত নবী রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে মুমিনদের বিজয় ও কাফেরদের পরাজয় কামনা করে এ দো'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! যদি মুমিনরা আজ (এ যুদ্ধে) ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাদের পরে এ পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না। তাই এ যুদ্ধে মুসলমানদের নেতৃবৃন্দ এবং ফেরেশতাগণের সর্দার জিবরাঈল (আ) পর্যন্ত শরীক হয়েছিলেন। যেমন হাসান ইবনে সাবেত (রা) বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে তার কবিতায় বলেছেন,

যখন বদর প্রান্তরে কাফেরদের মুখমণ্ডলের ওপর হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আঘাত করছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ)-ও আমাদের পতাকাতলে শামিল ছিলেন।

যদি হযরত খিযির (আ) জীবিত থাকতেন, তবে সেই বদর যুদ্ধে অবশ্যই মুমিনগণের পতাকাতলে শামিল থাকতেন। কাজী আবু ইয়ালী মুহাম্মাদ ইবনে হুসাইন ইবনে ফারা হাম্বলী (রহ) বলেছেন, আমাদের এক সাথীর কাছে খিযির (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি জবাবে বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি নিজেই বললেন যে, আবু হাতের ইবনে গাবারী থেকে এরূপ এক বর্ণনা পাওয়া গেছে যে, হযরত খিযির ইন্তেকাল করেছেন।

তিনি আরো বলেছেন, খিযির (আ) যদি জীবিত থাকতেন তবে তিনি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হতেন। ইবনে জাওযী (র) তাঁর 'উজালা' গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন। যদি এরূপ বলা হয় যে, তিনি সর্বক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাকে কেউ দেখেননি। তবে এর উত্তর হচ্ছে এই যে, এ কথাটা মেনে নেয়া সম্ভব না। কারণ এতে সুস্পষ্ট বর্ণনা, সাধারণ নিয়ম ও কুরআন মাজীদের আয়াতকে বাদ দিয়ে শুধু ধারণাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। যা কোনোভাবেই বৈধ নয়। যদি খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে জীবিত থাকতেন, তবে তার গুরুত্বপূর্ণকাজ হতো এটাই যে, তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে দায়িত্ব পালন করতেন, মিথ্যা ও পরিবর্তিত হাদীসসমূহ বাতিল বলে ঘোষণা করতেন, মানুষদেরকে বেদআত ও পাপ কাজ হতে বিরত রাখতেন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কাফেরদের মোকাবিলা করতেন, জুমার দিনে ও নামাযের জামায়াতে মুসলমানদের সাথে শরীক হতেন, মুসলমানদের কল্যাণে এগিয়ে আসতেন এবং কাফেরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতেন, আলেম ও নেতৃবৃন্দকে সঠিক পথে পরিচালিত করতেন এবং ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতেন। কিন্তু তার সম্পর্কে প্রচারিত আছে যে, তিনি শহরে, জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছেন। এমন সব লোকদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যারা সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত। এসব কিছুর চাইতে উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করাই তার জন্য সঠিক ছিল। এসব আলোচনার পর এ কথাটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।

মুসনাদে আহমদে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের শেষ দিকে একদিন ইশার নামায আদায় করলেন। অতঃপর সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, এ রাতে তোমাদের কি ধারণা? জেনে রেখো! আজকের দিনে এ পৃথিবীতে যারা বেঁচে আছেন, একশ' বছর পরে তারা কেউই বেঁচে থাকবেন না।

মুসনাদে আহমদে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইন্তেকালের কিছুদিন পূর্বে বা এক মাস পূর্বে বলেছিলেন, কোনো কোনো শ্বাস গ্রহণকারী অথবা তিনি বলেছিলেন, যারা বর্তমানে পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। তারা একশ' বছরের মধ্যেই মারা যাবে।

মুসনাদে আহমদে অপর এক সূত্রে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার ইন্তেকালের এক মাস পূর্বে) বলেছেন, লোকেরা আমার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। অথচ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই। আমি আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছি, এমন কোনো প্রাণী পৃথিবীতে বর্তমান নেই, যে একশ' বছরের অধিক বেঁচে থাকবে।

তিরমিযী শরীফেও হযরত জাবের (রা) থেকে অনুরূপ একখানা হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ) বলেছেন, উল্লিখিত হাদীস হযরত খিযির (আ)-এর এখনো বেঁচে থাকাটা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে। আলেমগণ বলেন, যদি খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র যিন্দেগী না পেয়ে থাকেন, যেটা সঠিক বলে প্রমাণিত, তবে এ ব্যাপারে আর কোনই জটিলতা থাকে না। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে, খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র যিন্দেগী পেয়েছিলেন, তবে অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে তিনি এখন জীবিত নেই। কারণ উল্লিখিত হাদীসের আওতায় তিনিও পড়ে গেছেন। এখন পর্যন্ত এমন কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায়নি যে, উপরোক্ত হাদীসের পরে তাঁর জন্য বিশেষ কোনো হাদীস বর্ণিত আছে। যা মেনে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হাফেজ আবুল কাসেম সুহাইলী (রহ) খিযির (আ)-এর বর্তমানেও বেঁচে থাকাকে প্রধান্য দিয়েছেন এবং এটা অধিকাংশ আলিমদের মত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁর ইন্তেকালে পরে শোক প্রকাশও করেছেন। এটা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু এ হাদীসগুলোর সূত্রের মধ্যে দুর্বলতা আছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হযরত ইলইয়াস (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা সূরা সাফফাতে মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করার পর ইরশাদ করেন—

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۞ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۞ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ۞ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞

অর্থ : নিশ্চয়ই ইলইয়াসও রাসূলগণের একজন ছিলেন। (স্মরণ কর) যখন তিনি তার কাওমকে বললেন, তোমরা কি ভয় করো না? তোমরা কি 'বা'আল (বাছুরের মূর্তি)-কে ডাক সকল স্রষ্টার সেরা স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়ে -যিনি তোমাদের এবং তোমাদের আগের বাপ-দাদাদেরও রব। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা মনে করল। কাজেই এখন তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য পেশ করা হবে। অবশ্য আল্লাহর ঐসব বান্দাহদের ছাড়া যাদেরকে খালেস করে নেওয়া হয়েছিল। আর আমি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ইলইয়াসের সুনাম-সুখ্যাতি জারি রেখেছি। ইলইয়াসের প্রতি সালাম। নিশ্চয়ই আমি এভাবেই নেক লোকদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। অবশ্যই তিনি আমার মুমিন বান্দাহদের একজন। –সূরা সাফফাত : ১২৩-১৩২

মুফাসসিরগণ বলেন, ইনি হলেন ইলইয়াস তাশাবী। তাঁর বংশ পরম্পরা এরূপ বর্ণিত হয়েছে, ইবনে ইয়াসীন ইবনে ফাখাস ইবনে আযযার ইবনে হারুন (আ)। আর এক বর্ণনা মতে, ইলইয়াস ইবনে আযের ইবনে আযযার ইবনে হারুন ইবনে ইমরান।

আলেমগণ বলেন, ইলইয়াস (আ)-কে বা'আল অধিবাসীদের কাছে নবী করে প্রেরণ করা হয়েছিল। বা'আল দামেশকের পূর্ব প্রান্তরে একটি নগরী। আল্লাহর নবী ইলইয়াস (আ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিলেন। তাদেরকে বুঝালেন, তোমরা তোমাদের দেবতার উপাসনা ত্যাগ করো। তাদের মূর্তির (দেবতার) নাম ছিল বা'আল।

আর এক বর্ণনা মতে সে ছিল বা'আল নাম্নী এক মহিলা। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। তবে প্রথম বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ যে, এটি ছিল তাদের মূর্তির নাম। যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা কি সতর্ক হবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহকে ত্যাগ করবে, যিনি (আল্লাহ) তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রতিপালক?

কাফেররা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং তার বিরোধিতা করেছিল। এমনকি তাঁকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্পও করেছিল। বর্ণিত আছে, তিনি তাদের থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। হযরত কাআব ইবনে আহবার (রা) বলেলেন, ইলইয়াস (আ) তাঁর জাতির বাদশাহ থেকে পলায়ন করে একটি গুহার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর আত্মগোপন করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা সে বাদশাহকে ধ্বংস করে দেন এবং তার স্থলে অন্য একজন বাদশাহ সিংহাসনে বসেন। হযরত ইলইয়াস (আ) সে বাদশাহর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বাদশাহ তার জাতির প্রায় সকল লোকসহ ইসলাম কবুল করেন। মাত্র দশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বাদ থেকে যায়। তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়।

ইবনে আবিদদুনইয়া (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত ইলইয়াস (আ) তার জাতি থেকে পালিয়ে এসে এক গুহার মধ্যে বিশ রাত অথবা চল্লিশ রাত আত্মগোপন করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার গায়েবী মাখলুক তাঁর খাবার পৌঁছাতেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সাদ বলেন, হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়েব কলবী (রহ) আমার কাছে বলেছেন যে, তাঁর পিতা বলেছেন, (হযরত আদম (আ)-এর পরে) প্রথম নবী হযরত ইদরীস (আ), এরপর হযরত নূহ (আ), এরপর ইবরাহীম (আ), এরপর ইসমাঈল (আ), এরপর ইসহাক (আ), এরপর ইয়াকুব (আ), এরপর ইউসুফ (আ), এরপর লূত (আ), এরপর হুদ (আ), তারপর সালেহ (আ), তারপর শোয়াইব (আ), তারপর মুসা (আ), তারপর হারুন (আ), (যিনি ছিলেন ইমরানের বংশধর) তারপর ইলইয়াস তাশাবী (আ) ইবনে ইমরান ইবনে কাহিস ইবনে লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)।

তবে উপরিউক্ত বর্ণনার ক্রমবিন্যাসের মধ্যে কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। মাকহুল (রহ) হযরত কাআব রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, চারজন নবী জীবিত আছেন। দু'জন পৃথিবীতে তারা হলেন, ইলইয়াস (আ) ও খিযির (আ)। আর দু'জন আকাশে, তাঁরা হলেন ইদরীস (আ) ও ঈসা (আ)। আমি পূর্বে এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক বুযুর্গের অভিমত বর্ণনা করেছি। যেমন এক বর্ণনা এরূপ আছে যে, হযরত খিযির (আ) ও হযরত ইলিয়াস (আ) প্রতি রমযান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হতেন এবং প্রতি বছর তাঁরা হজ্ব আদায় করতেন, এ সময় তারা যমযমের পানি এত বেশি পরিমাণ পান করে নিতেন যে, আগামী এক বছর পর্যন্ত তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এরূপ হাদীসও বর্ণিত আছে যে, তারা দুজনে আরাফার ময়দানে প্রতি বছর হাজির হতেন। এ বর্ণনার ব্যাপারে এটাও বলা হয়েছে যে, এগুলো বিশুদ্ধ নয়। তবে পূর্বের দলীল প্রমাণ দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হযরত খিযির (আ) ইন্তেকাল করেছেন এবং অনুরূপভাবে হযরত ইলিয়াস (আ)-ও ইন্তেকাল করেছেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) ইলইয়াস (আ) সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিয়েছেন, যার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সম্ভবত তিনি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে আনা হয়েছে। যা না সত্য বলা যায়, না মিথ্যা বলা যায়। এর বিশুদ্ধতা সুদূর পরাহত। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ)-কে যখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার জন্য আবেদন করলেন। এরপর তাঁর কাছে একটি জন্তু প্রেরণ করা হলো। সে জন্তুটির বর্ণ ছিল অগ্নিবর্ণ।

তিনি সেটির উপর আরোহন করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জ্যোতির্ময় করলেন। তার থেকে আহার ও পানাহারের স্বাদ উঠিয়ে নিলেন। তাকে ফেরেশতাসূলভ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে দিলেন। তাকে আসমানী এবং যমীনী উভয় বানিয়ে দিলেন। এ বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

এরূপভাবে বায়হাকীতে আর একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা একটি স্থানে অবস্থান করলে সেখানের একটি উপত্যকা থেকে এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করো, যে উম্মত রহমতপ্রাপ্ত ও ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং যাদের তওবা গ্রহণযোগ্য। আনাস (রা) বলেন, আমি উপত্যকার সেই আওয়াজের দিকে ঝুঁকে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। যার দেহের উচ্চতা তিন'শ হাতের চেয়ে বেশি। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আনাস ইবনে মালেক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় আছেন? আমি বললাম, তিনি অতি নিকটেই আছেন। তিনি আপনার কথা শুনছেন। তখন তিনি বললেন, তাঁকে গিয়ে আমার কথা বলবে, আপনার ভাই ইলইয়াছ আপনাকে সালাম বলেছেন।

আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সব ঘটনা জানালাম। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে আসলেন এবং পরস্পরে সালাম বিনিময় করলেন ও মুয়ানাকা করলেন। এরপর দু'জনে বসে কথা

বলতে লাগলেন। ইলইয়াস (আ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি বছরে শুধু একবার আহার করি। আজ এ সময়টি আমার আহারের সময়। আসুন, আমরা দু'জনে একত্রে আহার করি। অতঃপর দু'জনের সামনে আকাশ থেকে একখানা দস্তরখানা আসল। যার মধ্যে রুটি, মাছ ও তরকারী জাতীয় এক প্রকার খাদ্য সাজানো ছিল। তাঁরা দুজনেই একত্রে খেলেন এবং আমাকেও খেতে দিলেন। তারপর আমরা আসরের নামায আদায় করলাম। অতঃপর তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় নিয়ে চলে আসলেন। (আনাস (রা) বলেন) আমি তাঁকে মেঘের মধ্য দিয়ে আকাশ পানে যেতে দেখেছি।

ইমাম বায়হাকী (রহ) নিজেই এ হাদীসখানা সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি দুর্বল হাদীসের পর্যায়ে। যারা উপরোক্ত হাদীসকে দুর্বল এবং অশুদ্ধ বলেন, তাদের বক্তব্য হলো এই যে বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ) নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করেনি; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁর কাছে গমন করেছেন। এটা কোনোভাবেই হতে পারে না। কারণ তিনি ﷺ হলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তার কাছে সালাম পৌছান অশোভনীয়; বরং তার কাছে হাজির হয়ে সালাম পেশ করাই শোভনীয় ছিল। আর এটিও অসম্ভব ব্যাপার যে, তিনি বছরে একবার আহার করেন। অথচ এর পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে আহার ও পানাহারের স্বাদ বা অনুভূতি উঠিয়ে নিয়েছেন। এ হাদীসে আরো একটি অসম্ভব ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বছরে একবার যমযমের পানি পান করতেন, যা পরবর্তী বছর পর্যন্ত তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য রয়েছে। তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং এ বর্ণনা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

ইবনে আসাকির (রা) অন্য এক সূত্রে এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং এটির দুর্বলতাও স্বীকার করেছেন। তবে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তিনি এ হাদীছখানা দুর্বল বলেন। অন্য সূত্রে সেটি আবার বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি ছিল তাবুক যুদ্ধের সময়ের ঘটনা। সেখানে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আনাস (রা) ও হযরত হুযায়ফা (আ)-কে তার কাছে পাঠালেন। তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে দুই বা তিন হাত উঁচু। তিনি আসতে অক্ষম বলে ওজর পেশ করেছেন। সেখানে এ কথাও উল্লেখ করা আছে যে, তাঁরা দু'জন (রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইলইয়াস (আ) যখন একত্র হলেন, তখন তারা দু'জনেই জান্নাতী খানা আহার করেছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ) বললেন, আমি চল্লিশ দিনে শুধু এক লোকমায়ই তৃষ্ট থাকি। আর দস্তর খানের মধ্যে রুটি, আংগুর, কলা, খেজুর ইত্যাদি ছিল। তাতে পিয়াজ-রসুন জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কিছু ছিল না। এখানে এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে খিযির (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, আমার সাথে তাঁর বছরের শুরুতে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আপনার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শীঘ্রই সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাতের সময় আপনি তাঁকে আমার সালাম বলবেন।

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি হযরত খিযির (আ) ও ইলইয়াস (আ) জীবিত আছেন বলে মনে করা হয় আর হাদীসও বিশুদ্ধ বলে ধরা হয় তবে এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ দু'জনের সাক্ষাৎপর্ব প্রথম নবম হিজরীতে হয়েছিল। (অর্থাৎ এর পূর্বে আর সাক্ষাৎ হয়নি) যেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না। অতএব, এ হাদীসটি যে মনগড়া তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ইবনে আসাকির (রহ) কর্তৃক ইলইয়াস (আ)-এর একত্র হওয়া সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীসগুলো সবই অশুদ্ধ। কারণ এ হাদীসগুলোর সূত্র দুর্বল অথবা বর্ণনাকারী অপরিচিত ইত্যাদি। এ বর্ণনাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম বর্ণনাটি হচ্ছে নিম্নরূপ। আবু বকর ইবনে আবিদ দুনইয়া বলেন, সাবেত (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি যাসআব ইবনে যোবায়ের (রহ)-এর সাথে কুফার একটি স্থানে অবস্থান করছিলাম। তখন আমরা দু'রাকাত নামায পড়ার জন্য একটি উদ্যানে প্রবেশ করলাম। আমি নামাযে—

حٰمٓ ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۔

অর্থ : হামীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, বড়ই মেহেরবান। –সূরা মুমিন : ১-৩

এ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেই এক লোক উজ্জ্বল রং এর একটি গাধার পৃষ্ঠে আরোহন করে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি চাঁদর পরিহিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ (পাপ ক্ষমাকারী) বললে, তার পরে يَا غَفِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِىْ (হে পাপ ক্ষমাকারী, আমার পাপ ক্ষমা করুন) বলবে। আর যখন তুমি বলবে قَابِلِ التَّوْبِ (তওবা কবুলকারী) তারপর বলবে يَا قَابِلَ التَّوْبِ تَقَبَّلْ تَوْبَتِىْ (হে তওবা কবুলকারী! আমার তওবা কবুল করেন) আর যখন তুমি বলবে شَدِيْدِ الْعِقَابِ (কঠোর শাস্তিদাতা) তারপর বলবে يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ (হে কঠোর শাস্তিদাতা! আমাকে শাস্তি দিবেন না) আর যখন তুমি বলবে ذِى الطَّوْلِ তখন বলবে يَا ذَى الطَّوْلِ تَطَوَّلْ عَلَىَّ رَحْمَةً (হে প্রশস্তকারী! আমার উপর অনুগ্রহ করুন)। হযরত সাবেত (রা) বলেন, আমি চারপাশে তাকিয়ে কোন লোক দেখতে পেলাম না। আমি সেখান থেকে বের হয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়ামানী চাদর পরিহিত একটি লোক সাদা (উজ্জ্বল) রং এর গাঁধার উপর সাওয়ার হয়ে কি তোমাদের নিকট থেকে চলে গেছেন? তারা উত্তরে বলল, এ ধরনের কোনো লোক আমাদের কাছ থেকে চলে যাননি। তখন আমরা ধারণা করলাম যে, ইনি আর কেউ নন, ইনিই হলেন হযরত ইলইয়াস (আ)। আল্লাহ তা'আলা তার সম্পর্কে বলেন– কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য হাজির করা হবে। –সূরা সাফফাত : আয়াত ১২৭

অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তির জন্য হাজির করা হবেই, পৃথিবীতে ও আখিরাতে অথবা শুধু আখিরাতে। মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণের কাছে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ তাদের প্রতি উভয় জায়গাই শাস্তি আসতে পারে। পরে আল্লাহ বলেন, তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, তারা নিরাপদে থাকবে। তারপর আল্লাহ বলেন– আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। অর্থাৎ তার উত্তম ও সুআলোচনা সকলের কাছে জারি রেখেছি। সকলেই তার ব্যাপারে উত্তম আলোচনা করেন। এ কারণেই পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থাৎ হযরত ইলইয়াস (আ)-এর উপর এবং তার অনুগতদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ইবনে মাসউদ (রা) প্রমুখ এভাবে বর্ণনা করেন যে, سَلَامٌ عَلٰى اِدْرِيْسَ (ইদরীস (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক।) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, ইলিয়াস (আ)-ই হচ্ছেন ইদ্রীস (আ)। অর্থাৎ এ দুটি নাম এক লোকেরই। যিহাক ইবনে মাহাহিম (রহ) এ অভিমত সমর্থন করেছেন। কাতাদাহ এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, এরা দু'জন দু ব্যক্তি। যার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হযরত হিযকীল (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

অর্থ : তুমি ঐসব লোকের অবস্থা চিন্তা করেছ কি, যারা মরণের ভয়ে তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েছিল? অথচ তারা সংখ্যায় হাজার হাজার ছিল। আল্লাহ তাদেরকে বললেন, মরে যাও। এরপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন[১]। সত্যি বলতে কি আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই মেহেরবান; কিন্তু বেশির ভাগ লোকই শুকরিয়া আদায় করে না। –সূরা বাকারা : ২৪৩

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইউশা (আ)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত কালিব ইবনে ইউসুফ বনী ইসরাঈলের নেতা নির্বাচিত হন। যখন হযরত কালিবের ইন্তেকাল হয়, তখন বনী ইসরাঈলগণ হযরত হিযকীল (আ)-কে তাদের খলীফা মনোনীত করেন। তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধের পুত্র। তাই বৃদ্ধের পুত্র হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। হযরত হিযকীল (আ)-ই তার সম্প্রদায়ের মৃত লোকদের জীবিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, এক জনপদের লোকেরা তাদের এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়লে মৃত্যুর ভয়ে সে এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে অবস্থান করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে আদেশ দিলেন, তোমরা মরে যাও। সবাই মারা গেল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের লাশগুলো হিংস্র জানোয়ারের শিকার থেকে নিরাপদে রাখেন। তাদের লাশগুলো দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানে পড়ে থাকে। একবার হযরত হিযকীল (আ) সে স্থান দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি এ লাশগুলো দেখে খুব বিস্মিত ও পেরেশান হলেন এবং হাকীকত সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁকে গায়েবীভাবে বলা হলো আপনি কি এটা চান যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে আপনার সামনে জীবিত করে দেবেন? তিনি আরয করলেন, হ্যাঁ। আমি এটা চাই। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত হিযকীল (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি লাশগুলোর হাড্ডিগুলোকে লক্ষ্য করে বলো, তোমরা গোশত দ্বারা আবৃত হয়ে যাও এবং পরস্পরে সংযুক্ত হয়ে যাও। হযরত হিযকীল (আ) আল্লাহর আদেশে তাদেরকে এভাবে হওয়ার জন্য বললেন। তখন সব মৃত সম্প্রদায় সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে জীবিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আসবাত (রহ) বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তারা উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'ওয়াসিত' শহরে 'দাওয়ারদান' নামক একটি এলাকা ছিল। সেখানে মহামারী ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়লে সেখানের অধিকাংশ অধিবাসীরা এলাকা ছেড়ে অন্য এক জনপদে গিয়ে অবস্থান করে। আর যারা সেখানে থেকে গিয়েছিল (অর্থাৎ স্বীয় এলাকা ত্যাগ করেনি) তারা প্লেগ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। আর যারা দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছিল তাঁরা বেঁচে রইল। যখন মহামারী চলে গেল, তখন পালিয়ে যাওয়া লোকেরা পুনরায় স্বদেশে চলে আসে। প্রথমে যারা জনপদে ছিল তাদের অধিকাংশই মারা গিয়েছিল। কিছু সংখ্যক বেঁচে রয়েছিল, তারা ফিরে আসা লোকদের জীবিত থাকতে দেখে অনুতাপ করে বলতে লাগল হায়! আমরাও যদি তাদের সাথে দেশ ছেড়ে চলে যেতাম তবে আমাদের এত সংখ্যক লোকের মৃত্যু

১. এখানে বনী ইসরাঈলের মিসর থেকে বের হয়ে আসার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সূরা মায়েদার ৪র্থ রুকুতে আল্লাহ তাআলা এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

হত না। আল্লাহ না করুক, আবার যদি প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে তবে আমরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবই। আল্লাহর কুদরত পরবর্তী বছর পুনরায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়লে সব লোকেরা দেশ ত্যাগ করে চলে গেল। প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি লোক স্বদেশ ছেড়ে একটি উপত্যকায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে এখানেও পাকড়াও করল। উপত্যকার উপর থেকে একজন ফেরেশতা এবং নিম্নের দিক হতে একজন ফেরেশতা জোর আওয়াজে বললেন, তোমরা মরে যাও। এতে সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এদের মৃত দেহগুলো পড়ে রইল। একদিন আল্লাহর নবী হযরত হিযকীল (আ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এরূপ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে, খুব আশ্চর্যান্বিত ও পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি পেরেশেন অবস্থায় নিজ জিহ্বা (মুখের মধ্যে) নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এবং এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতে রেখে পরিস্থিতি নিয়ে খুব চিন্তা করতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা তার এ পেরেশানী দেখে ওহী প্রেরণ করলেন। আপনি কি চান যে, আমি এদেরকে পুনরায় কিভাবে জীবিত করব তা আপনাকে আমি দেখাব? হিযকীল (আ) বললেন, জী হ্যাঁ। আমি তা দেখতে চাই। হযরত হিযকীল (আ) শুধু এ চিন্তাই করছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই মৃত দেহগুলোকে (তার কুদরত দ্বারা) কিভাবে পুনরায় জীবিত করবেন? হিযকীল (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হলো; এদেরকে ডাক দিন। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়গুলো! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা গোস্ত দ্বারা আবৃত হয়ে যাও। তখন হাড়গুলো গোস্ততে ভরে গেল এবং শরীরে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। এমনকি সে কাপড়গুলোও তাদের পরনে দেখা গেল, যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তারা মারা গিয়েছিল। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তখন তারা সবাই দাঁড়িয়ে গেল। বর্ণনাকারী আসবাত (রা) বলেন, মানসুর (রা) মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তাদের মৃত দেহগুলো জীবিত হয়ে এই কালিমা পাঠ করতে ছিল—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই।

অতঃপর তারা জীবিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসে, যারা তাদেরকে মৃত মনে করেছিল। তবে মৃত্যুর আলামত তাদের চেহারায় রয়ে গেল। তারা যে কাপড়ই পরিধান করতো তা (দ্রুত) পুরাণ হয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুবরণ করল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তারা সংখ্যায় ছিল চার হাজার। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্য এক বর্ণনায় আট হাজারের কথাও বর্ণিত আছে। আবু সালেহ (রা)-এর মনে নয় হাজার, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে চল্লিশ হাজারেরও একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে জুরায়েয (রহ) আতা (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার মহান কুদরত মানুষদেরকে দেখানোর জন্য এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে, কোনো কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন আল্লাহ তা'আলার লিখনকে খণ্ডন করতে পারে না। অধিকাংশ আলেম বলেন যে, এ ঘটনাটি ছিল একটি বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা।

ইমাম আহমদ, বোখারী ও মুসলিম (রহ) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ওমর (রা) সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা করে যখন 'সূরাগ' পর্যন্ত গিয়ে পৌছলেন, তখন আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রা) তার সাথীদের নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য সেখানে পৌছেন। তাঁরা হযরত ওমর (রা)-কে জানালেন যে, সিরিয়ার প্লেগ রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। অতঃপর মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে পরামর্শে বসা হলো। হযরত ওমর (রা)-এর সামনেই পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ এক দলের মত হচ্ছে, তারা এখান থেকে ফিরে যাবে। আর এক দলের মত হলো সামনে অগ্রসর হবে)। তারপর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাশরীফ আনলেন। তিনি জরুরি কাজে বাইরে ছিলেন। তিনি এসে বললেন, এ সম্পর্কে আমার কিছু কথা জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, 'যখন কোনো এলাকায় (প্লেগ) মহামারী দেখা দেয়, আর তোমরা সেখানে অবস্থান করছ, তখন তোমরা সে এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র (পালিয়ে) যেও না। আর যখন কোনো এলাকা সম্পর্কে তোমরা শোনবে যে, সেখানে

মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে তোমরা গমন করো না। তারপর হযরত ওমর (রা) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন এবং সেখান থেকে ফিরে যান।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, যখন হযরত ওমর (রা) সিরিয়ায় যাত্রা নিলেন তখন হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁকে খবর দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, এ মহামারী (রোগ) দ্বারা পূর্বের উম্মতদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। সুতরাং যখন তোমরা কোনো এলাকা (বা দেশ) সম্পর্কে জানতে পারবে যে, সেখানে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, তখন সেখানে প্রবেশ করো না। আর এমন কোনো এলাকায় (বা দেশে) যদি এ প্লেগ (মহামারী) রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর তোমরা সেখানে অবস্থান করছ, তখন তোমরা সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেও না। বর্ণনাকারী বলেছেন, তারপর হযরত ওমর (রা) ফিরে গেলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেছেন, হিযকীল (আ) বনী ইসরাঈলের মাঝে কতদিন অবস্থান করেছিলেন সে সম্পর্কে কোনো সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়নি। মোটকথা তিনি দীর্ঘ একটি সময় বনী ইসরাঈলের মাঝে অবস্থান করেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তার সান্নিধ্যে নিয়ে যান। পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের পর বনী ইসরাঈল আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ভঙ্গ করে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে থাকে। এমনকি তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের সেই মূর্তিগুলোর মধ্যে একটি মূর্তির নাম ছিল 'বা'আল'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হযরত ইলইয়াস ইবনে ইয়াসীন (আ)-কে নবী করে প্রেরণ করেন।

আমি (ইবনে কাসীর) হযরত ইলইয়াস (আ) সম্পর্কে হযরত খিযির (আ)-এর পরেই বর্ণনা করেছি। কারণ অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ তাঁদের দু'জনের আলোচনা একত্রেই করে থাকেন। তারপরও হযরত ইলইয়াস (আ)-এর কাহিনী সূরায়ে সাফফাতে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আ)-এর পরেই পেশ করেছেন। সুতরাং আমিও সেই ধারাটি অনুকরণ করেছি। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত খিযির (আ)-এর পরে হযরত ইলইয়াস (আ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)-এর ঘটনা

হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)-এর কথা আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমে নবীগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ط وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۞

অর্থ : (ঐ বংশেরই) ইসমাঈল, আল-ইয়াসাআ, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)। এদের প্রত্যেককে আমি দুনিয়ার সবার উপর ফযীলত দান করেছি। –সূরা আনআম : আয়াত ৮৬

সূরা সোয়াদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ط وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۞

অর্থ : (হে নবী!) স্মরণ করুন, ইসমাইল, আল-ইয়াসাআ ও যুলকিফলের কথা; এরা প্রত্যেকেই ছিল গুণীজন। –সূরা সোয়াদ : আয়াত ৪৮

ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, হযরত ইলইয়াস (আ)-এর পরে ছিলেন হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)। আল-ইয়াসাআ (আ) বনী ইসরাঈলকে হযরত ইলইয়াস (আ)-এর শরীয়তের দিকে লোকদেরকে দাওয়াত দিতে থাকেন। তার ইন্তেকালের পরে তাদের মাঝে পর্যায়ক্রমে খলীফা আসতে থাকেন। পরবর্তীতে বনী ইসরাঈল বিদআত ও অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তারা নবীগণ পর্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করে। তাদের মধ্যে একজন অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিল। কথিত আছে, হযরত যুলকিফল সেই অত্যাচারী রাজার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যে, যদি সে তওবা করে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে, তবে তিনি তার জান্নাতের যিম্মাদার। এ কারণেই তিনি যুলকিফল নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)-এর পিতার নাম ছিল 'আখতুব'। হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (রহ) তার ইতিহাস গ্রন্থের 'ইয়া' অক্ষরের বর্ণনায় বলেছেন, হযরত ইয়াসা (আ)-এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ—

হযরত আল-ইয়াসাআ আসবাত ইবনে আদী ইবনে শুতালিম ইবনে আফরায়ীম ইবনে ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল (আ)।

কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইলইয়াস (আ)-এর চাচাতো ভাই। এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইলইয়াস (আ) যখন 'বা'লাবাক্কার' বাদশাহ থেকে অতি গোপনে কাসিয়ুন পর্বতে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন তাঁর সাথে হযরত আল-ইয়াসাআ (আ)-ও ছিলেন। অতঃপর হযরত ইলইয়াস (আ)-এর ইন্তেকাল হলে হযরত আল-ইয়াসাআ (আ) বনী ইসরাঈলের খলীফা হন। তাঁকেও আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ তথ্য বর্ণনাকারী হলেন, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ)। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক বলেন যে, তিনি 'বানিয়াশে' অবস্থান করতেন। ইবনে আসাকির (রা) বলেন, আল-ইয়াসাআ (আ)-এর নাম কয়েকভাবেই উচ্চারণ করে পড়া যায়। তবে এটা একজন নবীর-ই নাম। (আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ) বলেন) আমি যুলকিফলের ঘটনা হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনার সাথেই বর্ণনা করেছি। কেননা বর্ণিত আছে যে, তিনি আইয়ূব (আ)-এর বংশধর। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবহিত।

হযরত শামুয়েল (আ)-এর ঘটনা

বংশ পরম্পরা

শামুয়েল ইবনে আলী ইবনে আলকামা ইবনে ইয়ারখাম ইবনে আলইয়াহু ইবনে তাহু ইবনে সাওফ ইবনে আলকামা ইবনে মাহিছ ইবনে 'আমুছা ইবনে আযরুবা।

মাকাতিল (রহ) বলেন, শামুয়েল (আ) ছিলেন হারুন (আ)-এর বংশধর। মুজাহিদ (রহ) বলেন, ইনিই শামুয়েল ইবনে হালফাকা। তিনি এর পূর্বের বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেননি।

সুদ্দী (রহ), হযরত ইবনে আব্বাস (রা), হযরত ইবনে মাসউদ (রহ) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন এবং সা'লাবী (রহ) প্রমুখও বলেন যে, গাযওয়া ও আসকালান এলাকার আমালিকা জাতি বনী ইসরাঈলের উপর জয়লাভ করে। আমালিকা জাতি বনী ইসরাঈলের অনেক লোককে হত্যা করে এবং তাদের অধিকাংশকে বন্দী করে। লাওয়ী বংশে বহুদিন পর্যন্ত নবী প্রেরণের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের মধ্য হতে একজন গর্ভবতী নারী আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি পুত্র সন্তানের জন্য দো'আ করেন। আল্লাহ তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন। মহিলা পুত্রটির নাম রাখলেন ইশমুয়েল। ইবরানী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, ইসমাঈল। অর্থাৎ আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনেছে। পুত্রটি যখন যৌবনে উপনীত হলো, তখন মা তাঁর কলিজার টুকরাকে সেখানকার মসজিদে প্রেরণ করেন এবং মসজিদে অবস্থানকারী এক নেককার ব্যক্তির কাছে তাঁকে অর্পণ করেন, যাতে তাঁর কাছ থেকে পুত্র কিছু দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতে পারে এবং ইবাদত করতে পারে। পুত্রটি মসজিদেই অবস্থান করতে লাগলো। বেশ কিছুদিন পরে যখন তার বয়স আর একটু বেড়ে গেল, একদিন তিনি উস্তাদের নিকটেই ঘুমিয়েছিলেন। হঠাৎ মসজিদের এক কোণ থেকে তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন। আওয়াজ শুনে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে পড়লেন। উস্তাদ ধারণা করেছিলেন, সম্ভবত শামুয়েল (আ) ভয় পেয়েছেন। তাই তাঁকে নির্ভয় করার জন্য উস্তাদ তাঁকে বললেন, এসব কিছুই না, তুমি শুয়ে পড়ো। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন। হযরত শামুয়েল (আ) পুনরায় অনুরূপ আওয়াজ শুনতে পেলেন। সেবারেও উস্তাদ অনুরূপ কথা বলে তাঁকে নির্ভয় করেছিলেন। তৃতীয়বারেও অনুরূপ ঘটনা ঘটল। এবারে তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে ডাকছেন এবং তিনি তাঁর কাছে এসে বলছেন যে, আল্লাহ পাক আপনাকে আপনার জাতির কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। পরবর্তী ঘটনা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর তোমরা কি ঐ ব্যাপারেও চিন্তা করেছ, যা মুসার পর বনী ইসরাঈলের নেতাদের মধ্যে ঘটেছিল? তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করো, যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী জিজ্ঞেস করলেন, এরূপ হবে না তো যে, তোমাদের যুদ্ধের হুকুম দেয়ার পর তোমরা যুদ্ধ করবে না? তারা বলল, এরূপ কী করে হতে পারে যে, আমাদেরকে আমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিকে আমাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে, এতদসত্ত্বেও আমরা লড়াই করব না? কিন্তু যখন তাদেরকে লড়াইয়ের হুকুম দেয়া হলো, তখন অল্প কিছু লোক ছাড়া তারা সবাই পেছন ফিরে গেল। আল্লাহ জালেমদের প্রত্যেককে চেনেন। তাদের নবী তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা শুনে বলল, আমাদের উপর বাদশাহ হয়ে বসার অধিকার তার কী করে হলো? তার তুলনায় বাদশাহ হওয়ার অধিকার আমাদেরই অধিক। সে তো কোনো বড় ধনী লোক নয়। নবী জবাব দিলেন, আল্লাহ তোমাদের বদলে তাকেই বাছাই করেছেন এবং তাকে মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক দিয়েই উপযুক্ত যোগ্যতা দান করেছেন। আর এটা আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে যে, তিনি যাকে চান তাকেই তার রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ বড়ই প্রশস্ততার অধিকারী এবং সবকিছু সম্পর্কে তাঁর জানা

আছে। তাদের নবী তাদেরকে আরো বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন এই যে, তাঁর বাদশাহীর আমলেই ঐ সিন্দুক তোমরা ফিরে পাবে, যার মধ্যে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সান্ত্বনার জিনিস রয়েছে। তার মধ্যে মূসা ও হারুন (আ) বংশধরদের ছেড়ে যাওয়া বরকতের জিনিস রয়েছে এবং যাকে এখন ফেরেশতারা বহন করছে। যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। অতঃপর যখন তালুত সেনাবহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ এক নদীতে তোমাদেরকে যাচাই করবেন। যে এর পানি পান করবে সে আমার সাথী নয়। আমার সাথী শুধু সে-ই, যে তা থেকে পিপাসা মিটাবে না। অবশ্য কেউ যদি এক-আধ আজলা পান করে তো করল। কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই ঐ নদী থেকে পুরোপুরি পান করল।

যখন তালুত ও তাঁর সাথী মুসলমানরা নদী পার হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে গেল, তখন তারা তালুতকে বলল আজ জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে লড়াই করার কোনো শক্তিই আমাদের নেই১। কিন্তু যারা মনে করতো, একদিন তাদেরকে আল্লাহর সাথে দেখা করতেই হবে তারা বলল, অনেকবারই এমন হয়েছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় এক ছোট দল এক বড় দলের উপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় বের হলো তখন তারা দোয়া করল, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সবর দান করো। আমাদের কদম মযবুত রাখ এবং কাফের সম্প্রদায়ের উপর আমাদের বিজয় দান করো।

অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফেরদের মেরে তাড়িয়ে দিলো এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তিনি যে যে বিষয়ে চাইলেন, সেসব বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দলকে আর একটা দল দিয়ে দমন করতে না থাকতেন, তাহলে দুনিয়ার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের উপর আল্লাহ বড়ই দয়াশীল (তিনি এভাবে ফিতনা-ফাসাদ দমন করার ব্যবস্থা করতে থাকেন)। –সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৬-২৫১

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত জাতির নবী ছিলেন শামুয়েল (আ)। আর এক বর্ণনা মতে তিনি ছিলেন শামউন নামক এক নবী। কেউ বলেছেন, শামুয়েল ও শামউন (আ) একজনই। কারো মতে তিনি হলেন ইউশা (আ)। এ অভিমতটি আল্লামা ইবনে জারীর (রহ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী অত্যন্ত দুর্বল ও অবাস্তব। কারণ আল্লামা ইবনে জারীর (রহ) তার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইউশা (আ)-এর ওফাত এবং শামুয়েল (আ)-এর নবুওয়াতের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান ছিল চারশ ষাট বছর।

মোটকথা বনী ইসরাঈলকে যখন দুশমনরা যুদ্ধে পরাজিত করতে লাগল ও তাদের কোণঠাসা করে ফেলল, তখন তারা তাদের সে যুগের নবীর কাছে আবেদন করল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারণ করুন। যাতে আমরা তার পতাকাতলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি। তাদের এ আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী বলেছিলেন, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ আবশ্যিক (ফরজ) করে দেয়া হয়, তবে খুবই সম্ভব যে, তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে। তখন তারা বলল, যুদ্ধ করতে আমাদেরকে কিসে বিরত রাখবে? যখন আমাদেরকে আমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ করতে আমরা বাধ্য। আমাদের সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী রক্ষা করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকে তাদের নবী বলেছিল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে (বাদশাহ করে) প্রেরণ করেছেন। তালুতের বংশ তালিকার ব্যাপারে আল্লামা সা'লাবী (রহ) বলেছেন, তার বংশ তালিকা হল— তালুত ইবনে কায়েস ইবনে আফিল ইবনে সারু ইবনে তাহরাত ইবনে আফীহ ইবনে উনায়স ইবনে বিনইয়ামীন ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল (আ)। হযরত ইকরামা ও সুদ্দী (রহ) বলেছেন,

১. সম্ভবত ঐ কথা ঐসব লোকের, যারা এর আগে নদীতে নিজেদের বে-সবরীর পরিচয় দিয়েছিল।

মূলত সাকাহ (পানি পরিবেশক) ছিলেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেন, তিনি ছিলেন একজন দাব্বাগ (চামড়া পরিশোধক)।

এ ছাড়াও তাঁর ব্যাপারে আরো অনেক কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত। এ কারণেই বনী ইসরাঈল তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের উপর বাদশাহী করার যোগ্যতা তিনি কিভাবে রাখেন? বাদশাহী করার অধিকার তার চেয়ে আমাদের বেশি। তাকে সম্পদের প্রশস্ততা ও ঐশ্বর্য প্রদান করা হয়নি। সুতরাং তিনি আমাদের (ঈসায়ীদের) উপর কিভাবে বাদশাহী করতে পারেন?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞান উভয় দিকের যোগ্যতা তাকে প্রচুর পরিমাণে দান করা হয়েছে।

কথিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত শামুয়েল (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলেন যে, (তোমার কাছে বক্ষিত) এই (নির্ধারিত) মাপকাঠির সমান যেই ব্যক্তির উচ্চতা হবে এবং যে লোকের আগমনে তোমার কাছে বক্ষিত শিং এর মধ্যে রাখা তেল উথলিয়ে উঠবে, সে লোকই হবে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ।

তারপর বনী ইসরাঈলের সব লোকেরা নবীর কাছে এসে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু তালুত ব্যতীত আর কেউই সফলকাম হলো না। শর্তগুলো তাঁর দ্বারাই পূরণ হলো। সুতরাং হযরত শামুয়েল (আ) তালুতকে বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা দিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে বললেন, আল্লাহ তাকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।

এখানে জ্ঞান দ্বারা যুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞানকে কিংবা সাধারণ জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। আর দেহের সমৃদ্ধ দ্বারা দেহের উচ্চতা অথবা সৌন্দর্যে ও রূপে সবার চেয়ে বেশি বুঝানো হয়েছে। বাহ্যিকভাবে প্রমানিত হয় যে, তিনি (তালুত) নবী (আ)-এর পরেই ছিলেন। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান তাকেই তার রাজত্ব দান করেন। সৃষ্টি জগতের সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই হুকুমে চলে। সবকিছুই তার সৃষ্টি। সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তাঁরই কুদরতী হাতে। আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং মহাজ্ঞানী।

তাদেরকে নবী (আ) বললেন, তার বাদশাহীর আলামত এই যে, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক (তাবুত) আসবে। তাতে তোমাদের পালনকর্তা পক্ষ থেকে প্রশান্তি থাকবে এবং মুসা ও হারুন (আ)-এর বংশীয়গণের রেখে যাওয়া অবশিষ্ট (সম্পদ) মওজুদ থাকবে। যেটা ফেরেশতাগণ বহন করে নিয়ে আসবেন, সেটাই তোমাদের জন্য বরকতের জিনিস, যদি তোমরা মুমিন হও। এটা (বাদশাহী) ছিল তালুতের আর একটি বরকত। তার কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের মহা বরকতের বস্তু তাবুত ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যেটি তাদের কাছ থেকে তাদের দুশমনরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। এ তালুত বাদশাহর কারণেই তারা বিজয় লাভ করেছিল। উল্লিখিত আয়াতে যে বলা হয়েছে, যাতে রয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বরকত। এক বর্ণনা মতে এর অর্থ সেটি ছিল স্বর্ণের তস্তুরী। যাতে নবী (আ)-গণের পবিত্র আত্মা ধৌত করা হতো। এক বর্ণনা মতে, তাতে ছিল এক প্রকারের বিশেষ শক্তিশালী প্রবাহমান বায়ু। আর এক বর্ণনা মতে, তাতে বিড়াল সদৃশ্য একটি প্রাণী ছিল। যুদ্ধের সময় সেটি যখন আওয়াজ দিত তখন বনী ইসরাঈল তাদের বিজয় নিশ্চিত বলে মনে করতো।

হযরত মুসা (আ) ও হারুন (আ)-এর বংশের অবশিষ্ট (সম্পদ) সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, সেটা ছিল তাওরাতের ফলকের খণ্ড এবং মান্না। অর্থাৎ সেই খাদ্য যা আকাশ থেকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল। আর তাবুত (সিন্দুক)-টি ফেরেশতাগণ বহন করে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ তোমরা স্বচক্ষে দেখতে পাবে যে, ফেরেশতাগণ সেটি বহন করছে ও ফেরেশতাগণকে তোমরা দেখতে পাবে। যাতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন এবং তার দলীল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পার। তালুতের বাদশাহী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এটাই বলেছেন যে, এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

বর্ণিত আছে, আমালিকা জাতি তাবুত (সিন্দুক)-টি বনী ইসরাঈল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশান্তি ও মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর বংশীয় লোকদের রেখে আসা অবশিষ্ট (সম্পদ) মওজুদ ছিল। আর এক বর্ণনা মতে তাওরাত কিতাবও তাতে ছিল। আমালিকা জাতির সিন্দুকটি নিয়ে তাদের একটি মূর্তির নিচে রেখে দেয়। পরদিন তারা সিন্দুকটি মূর্তির উপরে দেখতে পেল। তারা সিন্দুকটিকে নিয়ে পুনরায় মূর্তিটির নিচে রেখে দিল। এবারেও তারা অনুরূপভাবে সিন্দুকটি মূর্তির উপরে দেখতে পেল। এভাবে কয়েকবার হওয়ার পরে তারা বুঝতে পারল যে, এটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত। অতঃপর তারা সিন্দুকটি সেখান থেকে সরিয়ে একটি জনপদে রেখে দেয়। হঠাৎ সেই এলাকার লোকেরা ঘাড় ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে পড়ল। এ ব্যাধিটি যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং এতে প্রত্যেকেই আক্রান্ত হতে লাগল, তখন তারা সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়ীর অনুরূপ এক প্রকার গাড়ীতে রেখে, দুটি ষাড়কে গাড়ীটির সামনে বেঁধে দিয়ে ষাড় দুটিকে তাড়া করে বনী ইসরাঈলের বসতির দিকে পাঠিয়ে দেয়। ষাড় দুটি সিন্দুকটিকে নিয়ে বনী ইসরাঈলের এলাকায় প্রবেশ করল। বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতারা ষাড় দুটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলেন। আর বনী ইসরাঈলগণ অনুরূপভাবেই প্রত্যক্ষ করল, যেভাবে তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন। ফেরেশতারা কিভাবে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলেন, তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতারা নিজেরাই সিন্দুকটি বহন করেছিলেন। আয়াত দ্বারাও এটা বুঝা যায়। যদিও প্রথম পদ্ধতির কথাই অধিকাংশ মুফাসসির বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বের হলো, তখন সে বলল, একটি নদী দ্বারা তোমাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন। যে কেউ তা থেকে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে কেউ এর পানি পান করবে না, সে আমার দলভুক্ত। তা ছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও।

–সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেন, এ নদীটির নাম ছিল ইর্দান (জর্দান) নদী। এ নদীটি এজন্য মর্যাদাবান যে, কুরআন মাজীদের প্রথমেই তার আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক তালুত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে পরীক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীর তীরে পৌছে বললেন, যে এর থেকে পান করবে সে আমার সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। আর যে এক কোষের বেশি অথবা আদৌ পান করবে না, সে অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন— তাদের অল্প কিছু সংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই পানি পান করল। সুদ্দী (রহ) বলেছেন, সৈন্য সংখ্যা ছিল আশি হাজার। এদের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার সৈন্য পানি পান করেছিল। আর মাত্র চার হাজার সৈন্য পানি পান করে নি।

ইমাম বোখারী (রহ) তার বোখারী শরীফে আবু ইসহাক (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেছেন, আমরা (কিছু সংখ্যক সাহাবী) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কোনো এক জায়গায় বসা ছিলাম। তখন আমরা (সাহাবীগণ) আলোচনা করছিলাম যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা তালুত বাহিনীর যারা নদী পার হয়েছিলেন তাদের সমান ছিল। তার সাথে মাত্র তিনশ দশ জনার চাইতে কিছু বেশি লোক নদী পার হয়েছিলেন। সুতরাং এ হাদীসের আলোকে হযরত সুদ্দী (রহ) তালুত বাহিনীর যারা নদী পার হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা যে আশি হাজার বলেছেন এর মধ্যে সন্দেহ রয়েছে। কারণ বায়তুল মুকাদ্দাসে আশি হাজার লোক অবস্থান করে যুদ্ধ করবে সেখানকার অবস্থা (তখন) সেরূপ ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর তালুত এবং তার সহযাত্রী মুমিনগণ যখন তা অতিক্রম করল, তখন তারা বলল, জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার কোনো শক্তিই আজ আমাদের নেই। অর্থাৎ যখন তারা নিজেদের সংখ্যা কম এবং দুশমনের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন হযরত তালুত তাদেরকে খুব করে বুঝালেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন— যাদের ধারনা ছিল আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটবে তারা বলল, বার বার দেখা গেছে যে, আল্লাহর হুকুমে কত

ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলের ওপর বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা সাহসী, বাহাদুর, অশ্বারোহী, ঈমানদার এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল তারা উপরিউক্ত কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন— তারা যখন যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীর সম্মুখীন হলো, তখন তারা বলল, হে আমাদের রব! আমাদেরকে সবর দান করুন। আমাদের সুদৃঢ় করে দিন এবং এ কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান করুন। –সূরা বাকারা : আয়াত ২৫০

অর্থাৎ আমাদেরকে এমন ধৈর্য দান করুন, যাতে আমাদের অন্তর সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং অন্তর যেন বিচলিত না হয়। আর যুদ্ধের ময়দানে যেন আমরা দৃঢ়পদ থাকি। আর আমাদেরকে দুশমনদের মোকাবিলায় সাহায্য করুন। আল্লাহ তা'আলা তার ধৈর্যশীল বান্দাদের প্রার্থনা কবুল করেন।

অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে (জালুত ও তার সৈন্য বাহিনীকে) পরাজিত করেন। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও সাহায্যেই তালুত বাহিনী বিজয়ী হয়েছেন। তারা তাদের নিজস্ব কোনো শক্তি বা কৌশলে বিজয়ী হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, যখন তোমরা হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন— এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন, তা তাকে শিক্ষা দিলেন। –সূরা বাকারা : ২৫১

হযরত দাউদ (আ) তালুত বাহিনীর মধ্যে একজন সৈন্য ছিলেন। কুরআনের আয়াত দ্বারা তার বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ (আ) সবচেয়ে বড় কাফের (জালুত)-কে হত্যা করেন। যার কারণে তাদের সমস্ত বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে যায় এবং সৈন্য বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। এটা ছিল ভয়াবহ এক যুদ্ধ। শুধু বাদশাহ (জালুত)-কে হত্যা করার কারণেই তাদের বহু ধন-সম্পদ ও মালামাল গণীমত হিসেবে (বনী ইসরাঈল) লাভ করেন এবং তাদের বড় বড় নেতাকে বন্দী করতে সক্ষম হন। এ যুদ্ধে কালিমা ও ঈমান কুফর ও মিথ্যা মাবুদের ওপর বিজয় লাভ করে এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ কাফেরদের উপর জয়ী এবং সত্যদ্বীনের মোকাবিলায় বাতিল ধর্ম ও তার অনুসারীরা পরাজিত হয়।

সুদ্দী (রহ) বলেছেন, দাউদ (আ) তাঁর পিতার সন্তানদের মধ্যে ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তারা ছিলেন মোট তের ভাই। হযরত তালুত বনী ইসরাঈলকে যুদ্ধের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যে কথা বলেছিলেন, হযরত দাউদ (আ) তা শুনে ছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি জালুতকে হত্যা করতে পারবে আমি তার কাছে আমার পুণ্যবতী কন্যাকে বিবাহ দিব এবং আমার শাসন ক্ষমতার মধ্যে তাঁকে শরীক করে নিব। হযরত দাউদ (আ) ধনুক দিয়ে পাথর নিক্ষেপে দক্ষ ছিলেন। তিনি বনী ইসরাঈলের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। চলার পথে একটি বড় পাথর তাঁকে আওয়াজ দিয়ে বলল, তুমি আমাকে তোমার সাথে নিয়ে নাও। কারণ তুমি আমার দ্বারাই জালুতকে হত্যা করতে পারবে। দাউদ (আ) পাথরটিকে তুলে নিলেন। কিছু দূর চলার পরে আর একটি পাথর থেকে অনুরূপ আওয়াজ শুনলেন। সেটিও তিনি তুলে নিলেন। তৃতীয় বারেও এরূপ একটি পাথরের আওয়াজ শুনে সেটিকেও নিয়ে নিলেন।

দাউদ (আ) তিনটি পাথর থলের মধ্যে নিয়ে চলতে লাগলেন। যথাস্থানে পৌছে উভয় দল (বনী ইসরাঈল ও জালুত বাহিনী) মোকাবিলা হলো। প্রথমতঃ জালুত সামনে এগিয়ে এসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করল। হযরত দাউদ (আ) এগিয়ে গেলেন। জালুত তাঁকে বলে, তুমি ফিরে যাও। তোমাকে হত্যা করা আমি ভাল মনে করি না। হযরত দাউদ (আ) উত্তর দিলেন, তুমি ভালমনে না করলেও আমি তো তোমাকে হত্যা করা ভাল মনে করি।

অতঃপর দাউদ (আ) পাথর তিনটি ধনুকের মতো নিজ হাতিয়ারে রেখে ঘুরাতে থাকেন। ফলে পাথার তিনটি মিলে একটি পাথর হয়ে গেল। তারপর সেই পাথরটি তিনি জালুতের উপর সজোরে নিক্ষেপ করলে, তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে জালুতের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। হযরত তালুত নিজ

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার কন্যাকে দাউদ (আ)-এর সাথে বিবাহ দেন এবং নিজ রাজত্বের কর্তৃত্বে তাঁকে অংশীদার করেন। এরপর থেকে বনী ইসরাঈলের মাঝে হযরত দাউদ (আ)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি সবার কাছে খুব প্রিয় হয়ে গেলেন। হযরত তালুতের চেয়েও লোকজন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, কিছুদিন পরেই তালুত হযরত হযরত দাউদ (আ)-এর উপর হিংসা করতে লাগলেন। এমনকি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে ফেললেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলেন। আলেমগণ তালূতকে এ অন্যায় কাজে বাঁধা দেয়ায় সে (তালুত) ক্রোধান্বিত হয়ে বাঁধা প্রদানকারী আলেমগণের অধিকাংশকেই হত্যা করলেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা তালুতকে তওবা করার তাওফীক দিলেন। অর্থাৎ তার অন্যায় কাজের অনুশোচনা সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি তার এ অন্যায় কাজের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হলেন এবং খুব আফসোস করতে লাগলেন। তিনি অধিকাংশ সময় বন-জঙ্গলে গিয়ে এত ক্রন্দন করতেন যে, তার চোখের পানিতে জমীন ভিজে যেত। একবার তিনি (অদৃশ্যভাবে) এক শব্দ শুনতে পেলেন যে, হে তালুত। তুমি আমাদেরকে হত্যা করেছ, তখন আমরা জীবিত ছিলাম। তুমি আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছ, এখন আমরা মৃত।

এ শব্দ শুনে তালুত আরো বেশি করে ক্রন্দন করতে লাগলেন। তিনি একজন আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আমার তওবা কি আল্লাহর কাছে কবুল হতে পারে? তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কি কোনো আলেমকে জীবিত রেখেছ? শেষ পর্যন্ত একজন পূণ্যবতী মহিলার সন্ধান পাওয়া গেল। মহিলাটি তালুতকে নিয়ে হযরত ইউশা (আ)-এর কবরের কাছে চলে গেলেন।

আহলে কিতাবগণ বলেছেন, মহিলাটি আল্লাহ তাআলার কাছে দো'আ করলেন, যাতে ইউশা (আ) কবর থেকে উঠে আসেন। হযরত ইউশা (আ) কবর থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কি সংঘটিত হয়েছে? মহিলাটি বললেন, না। তবে আপনার কাছে এ তালুত জানতে চাচ্ছেন যে, তাঁর তওবা কবুল হবে কিনা?

ইউশা (আ) বললেন, জী হ্যাঁ। সে (তালুত) যদি রাজত্ব ত্যাগ করে এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়তে থাকে, তবে তার তওবা কবুল হবে। এ কথা বলেই হযরত ইউশা (আ) দ্বিতীয়বার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। অতঃপর তালুত হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে রাজত্ব অর্পণ করে তিনি রাজত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরকে নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং এ যুদ্ধ অবস্থায়ই শহীদ হন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তাকে (দাউদকে) রাজ্ব ও হিকমত দান করেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন।

ইবনে জারীর (রহ) তার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত সূত্রে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটির কিছু কিছু বিষয়ের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে নবীকে প্রেরণ করে তালুতকে তাঁর তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন আল ইয়াসাআ ইবনে আখতুব (আ)।

ইবনে জারীর (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হযরত সালাবী (রহ) বলেন, সেই পূণ্যবতী মহিলা তালুতকে নিয়ে হযরত ইউশা (আ)-এর কবরের নিকটে আসলেন। ইউশা (আ) তাঁর ইন্তেকালের পরে তালুতের এ অন্যায় কাজের জন্য তালুতকে খুব ভর্ৎসনা করলেন। এ বর্ণনাটি যুক্তিযুক্ত ও সঠিক।

তালুত ইউশা (আ)-কে স্বপ্নে দেখেছিলেন। সম্ভবত স্বপ্নের মাধ্যমেই এরূপ কথাবার্তা হয়েছিল। কবর থেকে উঠে কথা বলা নবীদের মুজিযা। যা কোনো মহিলার মাধ্যমে প্রকাশ হতে পারে না। মুজিযা নবীদের মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে জারীর (রহ) বলেছেন, আহলে কিতাবদের ধারণা মতে তালুতের বাদশাহী থেকে আরম্ভ করে তাঁর সন্তান-সন্ততিসহ শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত সময়কাল ছিল চল্লিশ বছর।

হযরত দাউদ (আ)-এর ঘটনা

[হযরত দাউদ (আ)-এর দৈহিক আকৃতি, মহত্ত্ব, রাজত্ব ও নবুওয়াতের প্রমাণ ও নিদর্শন সম্পর্কে বর্ণনা]

বংশ পরম্বরা

দাউদ ইবনে ঈশা ইবনে আওয়ীদ ইবনে আবের ইবনে সালুমুন ইবনে নাহশুন ইবনে আবি নাযিব ইবনে ইয়ামহ ইবনে হাসিরূন ইবনে ফারিয ইবনে ইয়াহুযা ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম খলীল (আ)। হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ তাআলার বান্দা ও নবী এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর খলীফা ছিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বেঁটে। তাঁর চক্ষুদ্বয় ছিল নীল বর্ণের। তিনি ছিলেন স্বল্পকেশ বিশিষ্ট এবং পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন (সুন্দর) চরিত্রের অধিকারী ও সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধীকারী।

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ) জালুতকে হত্যা করেছিলেন। এ ঘটনর কারণে বনী ইসরাঈল বাদশাহ তালুতকে ছেড়ে দাউদ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাঁকে বেশি ভালবাসতে থাকে। এমনকি তালুতের পরিবর্তে তাঁকে বাদশাহ হিসেবে পাওয়ার জন্য তাদের অন্তরে খুব আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তারপর তালুত ও দাউদ (আ)-এর মধ্যে যে ঘটনা ঘটে তা একটু আগে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ঘটনায় হযরত দাউদ (আ) বাদশাহর সিংহাসনে আসীন হন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে তাকে উচ্চ মর্যাদা বিশিষ্ট নবুওয়াত প্রদান করেন। এভাবে হযরত দাউদ (আ) ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল উভয় একই সাথে লাভ করেন। যদিও এর পূর্বে নবুওয়াত ও বাদশাহী ভিন্ন ভিন্নভাবে দুটি গোত্রে চলে আসছিল। (অর্থাৎ নবুওয়াত, লাওয়ী ইবনে ইয়াকুব (আ)-এর বংশের মধ্যে থাকত এবং বাদশাহী থাকত ইয়াহুয়া ইবনে ইয়াকুব (আ)-এর মধ্যে) কিন্তু আল্লাহ তাআলার মেহেরেবানীতে দাউদ (আ) এ দুটো মর্যাদাবিশিষ্ট পদ (নবুওয়াত ও বাদশাহী) এক সাথে লাভ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "অবশেষে আল্লাহর হুকুমে তারা কাফিরদের মেরে তাড়িয়ে দিলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং তিনি যে যে বিষয়ে চাইলেন, সেসমস্ত বিষয়ে তাকে জ্ঞান দান করলেন। এভাবে আল্লাহ যদি মানুষের একটা দলকে আর একটা দল দিয়ে দমন না করতেন তাহলে দুনিয়ার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুনিয়ার মানুষের উপর আল্লাহর বড়ই দয়া (তিনি এভাবে ফিতনা-ফাসাদ দমন করার ব্যবস্থা করতে থাকেন)। –সূরা বাকারা : ২৫১

উক্ত আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা এমনও আছে যে, যদি আল্লাহ পৃথিবীতে বাদশাহী শাসন জারি না করতেন, তবে শক্তিশালী লোকেরা দুর্বল লোকদেরকে খেয়ে ফেলত (অর্থাৎ খতম করে দিত)।

অন্য বর্ণনায় আছে, পৃথিবীতে বাদশাহ আল্লাহর ছায়াস্বরূপ। আমীরুল মুমিনীন ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন, আল্লাহ বাদশাহর দ্বারা এমন কিছু (খারাপ কাজ) নির্মূল করেন, যা কুরআন মাজীদ দ্বারা করেন না।

ইবনে জারীর (রহ) তার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন জালুত তালুতকে তার সাথে মোকাবিলা করার জন্য আহ্বান জানাল, তখন তালুত তার সৈন্য বাহিনীকে জালুতের মোকাবিলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। হযরত দাউদ (আ) সামনে অগ্রসর হয়ে জালুতের মোকাবিলায় এগিয়ে আসলেন। তিনি এক পাথর মেরে জালুতের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেছেন, এরপরেই হযরত দাউদ (আ)-এর নাম ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। তালুতের নাম আর কোথাও শোনা যাচ্ছিল না। তারপর লোকেরা তালুতকে বাদ দিয়ে দাউদ (আ)-কে তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করলেন।

অপর এক বর্ণনা মতে, এ কাজ হযরত শামুয়েল (আ)-এর নির্দেশে করেছিল। কেউ কেউ বলেন, তালুত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বেই হযরত দাউদ (আ)-কে বাদশাহর আসনে বসিয়েছিলেন।

ইবনে জারীর (রহ) বলেছেন, অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, জালুত পরাজিত হওয়ার পরেই তালুত রাজ্যের দায়িত্ব হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে অর্পণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক অবগত।

ইবনে আসাকির (রহ) সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত দাউদ (আ) জালুতকে 'কাসরে হাকীমের' কাছে বসে হত্যা করেছিলেন। এর অতি নিকটে যে নদীটি অবস্থিত, সেটির কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ আছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে বিরাট মর্যাদা প্রদান করেছিলাম। (আমি হুকুম দিলাম যে) হে পাহাড়! এর অনুগত হয়ে যাও এবং এ হুকুমটি আমি পাখিদেরকেও দিয়েছি। আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছি এ হেদায়েত দিয়ে যে, বর্ম তৈরি করুন এবং কড়া সঠিক আকারে রাখেন। (হে দাউদের পরিবার!) নেক আমাল করো। তোমরা যা কিছু করো তা আমি দেখছি। –সূরা সাবা : ১০-১১

আল্লাহ তা'আলা আরও বর্ণনা করেন– "আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; আমিই ছিলাম এসব কিছুর কর্তা। আর আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না? –সূরা আম্বিয়া : ৭৯-৮০

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম লৌহবর্ম বানানোর নিয়ম শিক্ষা দেন। এছাড়াও তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মতো নরম করে দেন, যাতে তা দিয়ে তিনি যেভাবে চান সেভাবেই বর্ম (যুদ্ধের পোশাক) নির্মাণ করতে পারেন এবং দুশমনের মোকাবিলায় (যুদ্ধে) তা কাজে লাগাতে পারেন।

এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আদেশ দেন যে, (যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরি করতে পার) এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করতে পার। অর্থাৎ বুন এত পাতলা হবে না, যাতে (স্বাভাবিকভাবেই) ভেঙে যেতে পারে। মুজাহিদ, ইকরামা, ও কাতাদাহ (রহ)-ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ ও আ'মাশ (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য লোহাকে এত নরম করে দিয়েছিলেন যে, আগুনের তাপ ও হাতুড়ি ব্যতীতই তা হাত দ্বারা যেভাবে ইচ্ছা মোড়াতে পারতেন। হযরত কাতাদাহ (রহ) বলেছেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিরাপদ লৌহবর্ম (যুদ্ধের পোশাক) তৈরি করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত দাউদ (আ)। এর আগে শুধু লোহার পাতের বর্ম (যুদ্ধের পোশাক) তৈরি করা হতো (যেটা তেমন নিরাপদ ছিল না এবং খুবই পাতলা ছিল)।

ইবনে শাওয়াব (রহ) বলেছেন, দাউদ (আ) দিনের বেলা একটি লৌহ বর্ম তৈরি করে তা ছয় দিরহামে বিক্রি করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, মানুষের নিজ হাতের উপার্জিত খাদ্যই সর্বোৎকৃষ্ট ও হালাল খাদ্য। আর আল্লাহর নবী নিজ হাত দ্বারা উপার্জন করে তা দিয়ে আহার করতেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– "(হে নবী!) আপনি আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন; সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতসমূহকে, যেন তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করেন এবং সমবেত বিহঙ্গগুলোকেও; সকলেই ছিল তার অভিমুখী। (অর্থাৎ অনুগত) আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।

–সূরা সোয়াদ : ১৭-২০

ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (রা) বলেছেন, উক্ত আয়াতে দাউদ (আ) সম্পর্কে যে বলা হয়েছে, 'আমার শক্তিশালী বান্দা'। এখানে শক্তিশালী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য প্রদর্শনে দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিলেন। হযরত কাতাদাহ (রহ) বলেন, তাঁকে ইবাদত করার (শারীরিক ও মানসিক) শক্তি এবং ইসলামী জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল।

কাতাদাহ (রহ) আরো বলেছেন যে, দাউদ (আ) সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে থেকে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন এবং দিনের বেলা রোযা রাখতেন।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর নামায ছিল সবচেয়ে পছন্দের নামায। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা ছিল সবচেয়ে পছন্দের রোযা। তিনি রাতের প্রথম অর্ধেক ঘুমাতেন, আর এক তৃতীয়াংশ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে কাটাতেন ও শেষের এক ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমাতেন। তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।

শত্রুর সাথে লড়াই থেকে তিনি কখনো পালিয়ে আসতেন না। (অর্থাৎ তিনি যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ় থাকতেন) 'পর্বতমালাকে ও বিহঙ্গকুলকে' তার অনুগত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, সকাল ও সন্ধ্যা এরা তাঁর সাথে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতেন। আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে এত সুন্দর কণ্ঠ ও উঁচু আওয়াজ দান করেছিলেন যে, (সে সময়) অন্য আর কাউকে এত সুন্দর কণ্ঠ দেয়া হয়নি। যখন তিনি যাবূর কিতাব তিলাওয়াত করতেন, তখন তাঁর সুমধুর কণ্ঠ শুনে উপর থেকে উড়ে যাওয়া পাখীরা পর্যন্ত থেমে যেত। পাখীরাও তাঁর সুরের সাথে সুর মিলিয়ে গুন গুন করতো এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতো। এরূপে পর্বতগুলোও তাঁর তিলাওয়াতে সাড়া দিত এবং সকাল-সন্ধ্যা তার সাথে তাসবীহ পাঠ করতো।

ইমাম আওযায়ী (রহ) বলেছেন, আমার কাছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের (রা) বলেছেন, হযরত দাউদকে এত সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল, যেরূপ কণ্ঠস্বর আর কাউকে দেয়া হয়নি।

এমনকি তিনি যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন পাখীকুল ও হিংস্র জন্তুগুলো পর্যন্ত তার পাশে এসে সমবেত হতো। তারা দাউদ (আ)-এর সুরে এত মোহিত হয়ে যেত যে, ক্ষুধা ও পিপাসায় সেখানে বসে মরে যেত। তারপর ক্ষুধা ও পিপাসা নিবারণের জন্য তার কাছ থেকে সরে যেত না। নদীর স্রোত তাঁর সুমধুর আওয়াজ শুনে থেমে যেত। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেন, তার সুমধুর আওয়াজ যে শুনত সে আত্মহারা হয়ে পড়ত।

দাউদ (আ) আল্লাহ তা'আলার কিতাব যাবূর এমন সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করতেন যে, জ্বীন, ইনসান, পক্ষী ও জন্তুগুলো পর্যন্ত তার সুমধুর আওয়াজে থমকে দাঁড়াতো। এমনকি তারা এমনভাবে অচেতন হয়ে পড়তো যে, সেখানে বসেই ক্ষুধা ও পিপাসায় অনেকে মারা যেত। অর্থাৎ ক্ষুধা ও পিপাসার অনুভূতি পর্যন্ত তাদের ছিল না।

আবু আওয়ানা (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মালিক (রহ) বলেন, দাউদ (আ) যখন যাবূর পাঠ করতেন, তখন তাঁর সুমধুর আওয়াজের আকর্ষণে কুমারী মেয়েদের কুমারিত্বের আবরণ ছিন্ন হয়ে যেত। বর্ণনাটি দুর্বল।

আব্দুর রাজ্জাক (রহ) ইবনে জুরায়েয (রহ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আতা (রহ)-এর কাছে সুর দিয়ে কুরআন মাজীদ পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছেন, এতে কি অসুবিধা আছে? আমি হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহ)-এর কাছে শুনেছি, হযরত দাউদ (আ) সারেঙ্গি (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) ইত্যাদি বাজাতেন এবং যাবূর তিলাওয়াত করতেন। এই সুমধুর আওয়াজে আকর্ষণ সৃষ্টি হতো। তিনি নিজে কাঁদতেন এবং অন্যদেরকেও কাঁদাতেন। ইসলামী শরীয়তে বাদ্য বাজানো হারাম।

মুসনাদে আহমদে, হযরত উরওয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু মুসা আশআরী (রা)-এর সুর শুনে বলেছেন, আবু মুসা আশআরীকে দাউদ (আ)-এর সুরের অনুরূপ সুর প্রদান করা হয়েছে। [এ হাদীসটি ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রহ)-এর শর্তে বর্ণিত। কিন্তু সে পদ্ধতিতে তিনি (বর্ণনাকারী) বর্ণনা করেননি]।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আবু মুসা আশআরী (রা)-কে দাউদ (আ)-এর বাঁশীর অংশ প্রদান করা হয়েছে (বর্ণনাটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুপাতে বর্ণিত)।

আবু উসমান তিরমিযী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, আমি বরবত (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) ও বাঁশী, উভয়ের আওয়াজ (সুর) শ্রবণ করেছি। কিন্তু আবু মুসা আশআরী (রা)-এর মতো সুমধুর আওয়াজ কারো (কণ্ঠে) শুনিনি। কিন্তু এত সুমধুর সুর হওয়া সত্ত্বেও হযরত দাউদ (আ) যাবূর কিতাব অতি দ্রুত পাঠ করতেন।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাউদের জন্য ক্বিরাত (পাঠ)-কে সহজ করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁর বাহনের উর 'জীন (গদী) লাগানোর নির্দেশ দিয়ে যাবূর পাঠ শুরু করতেন। জীন লাগানোর পূর্বেই তাঁর (কিতাব) তিলাওয়াত শেষ হয়ে যেত। দাউদ (আ) নিজের হাতের অর্জিত আয় দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

অনুরূপভাবে ইমাম বোখারী (রহ) তাঁর বর্ণনায় উক্ত হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রাজ্জাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের বর্ণনায় 'কুরআন' দ্বারা যাবূর কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। এটা ছিল দাউদ (আ)-এর একটি মুজেযা যে, তিনি সুমধুর সুরসহই অতি দ্রুত কিতাব (যবূর) পাঠ করতে পারতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি দাউদকে যাবূর প্রদান করেছি। যাবূর প্রসিদ্ধ একখানা আসমানী কিতাব।

ইমাম আহমদ (রহ)-এর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, যাবূর রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাবে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য বিস্ময়কর মূল্যবান ও জ্ঞানময় উপদেশ।

হযরত দাউদ (আ)-এর রাজ্য শাসন

আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়ে ছিলাম প্রজ্ঞা (নবুওয়াত) ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা। –সূরা সোয়াদ : ২০

ইবনে আবী হাতিম (রহ) ও ইবনে জারীর (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রহ) থেকে বর্ণনা করেন, দু' ব্যক্তি একটি গাভী সংক্রান্ত পারস্পরিক বিবাদ নিয়ে হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে হাজির হলো। তারা দু'জনেই গাভীটিকে নিজ গাভী বলে দাবি করল। একজন অন্য জনের উপর এই অভিযোগ আনল যে, সে আমার গাভী জোরপূর্বক নিয়ে এসেছে। কিন্তু বিবাদী অস্বীকার করল। রাত পর্যন্ত এ ঝগড়া চলল। অতঃপর রাতে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন যে, বাদীকে তুমি হত্যা করো। সকালবেলা হযরত দাউদ (আ) বাদীকে বললেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাকে হত্যা করার জন্য। সুতরাং সত্য করে বলো, সঠিক ঘটনা কী? সে বলল, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর নবী! আমি আমার দাবিতে সত্য। কিন্তু আসল ঘটনা হলো এ যে, আমি অনেক আগে এর পিতাকে হত্যা করেছিলাম। তখন হযরত দাউদ (আ) তাকে হত্যা করার জন্য আদেশ জারি করলেন। জল্লাদ বাদীকে হত্যা করল। এ ঘটনায় বনী ইসরাঈলের মাঝে হযরত দাউদ (আ)-এর প্রভাব, মর্যাদা ও সম্মান আরো বৃদ্ধি পেল। বনী ইসরাঈলের সকলেই বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে তার অনুগত হতে শুরু করল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটাই উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার সেই বাণীর, আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী— তাকে দিয়েছিলাম হিকমত (প্রজ্ঞা) এর অর্থ নবুওয়াত প্রদান করেছি।

পরে যে ফয়সালাকারী ও বাগ্মিতার কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে শুরায়হ শা'বী (রহ), কাতাদা (রহ) ও আব্দুর রহমান প্রমুখ (রহ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, বাদীর সাক্ষী ও বিবাদীর শপথ। মুজাহিদ ও সুদ্দী (রহ) বলেন, এর অর্থ ফায়সালা এবং সঠিক বুঝে উপনীত হওয়া। মুজাহিদ (রহ) আরো একটি অভিমত পেশ করেছেন যে, এর অর্থ মীমাংসার কথা বলা এবং যথাযথ (সঠিক) আদেশ জারি করা।

ইবনে জারীর (রহ) এ অভিমতটি সমর্থন করেছেন। উল্লিখিত ব্যাখ্যা হযরত আবু মুসা আশআরী (রহ)-এর পেশকৃত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যখন মিথ্যা সাক্ষী দেয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেল, তখন হযরত দাউদ (আ)-কে এসব ঝগড়া বিবাদ মিমাংশা এবং সত্যকে উদঘাটন করার জন্য একটি শিকল প্রদান করা হলো।

শিকলটি আকাশ থেকে রায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। যখনই দু ব্যক্তির মধ্যে কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতো। তখনই এদের মধ্যে যে সত্য ও ন্যায়ের উপর থাকতো সে এ শিকল নিজ হাত দ্বারা ধরতে সক্ষম হতো। আর যে মিথ্যাবাদী সে শিকল স্পর্শ করতে পারত না। এভাবে তখন মিমাংসা করা হতো।

একবার এক লোক অপর এক লোকের কাছে একটি হীরা আমানত রাখে। লোকটি (হীরার মালিক) যখন তার হীরার দাবি করে তখন সে তা অস্বীকার করে এবং হীরাটি সে একটি (ফাঁকা বিশিষ্ট) লাঠির মধ্যে রেখে দেয়। তারা উভয়ে এর মীমাংসার জন্য শিকলটির কাছে গেল। হীরার মালিক শিকলটি নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (যার কাছে হীরা আমানত রাখা হয়েছিল) বলা হলো, এখন তুমি শিকল স্পর্শ করো। সে হীরা ভর্তি লাঠিটি মালিকের কাছে দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তুমি তো জান যে, আমি তার (মালিকের) প্রাপ্য দিয়ে দিয়েছি। এই বলে সে শিকলটির কাছে গিয়ে অতি সহজেই সেটি স্পর্শ করলো। এ ঘটনায় বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করল। বাদী, বিবাদী উভয়ই সত্য প্রমাণিত হলো। বনী ইসরাঈলও খুব পেরেশানীতে পড়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকেই শিকল তাদের থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো। এ ঘটনাটিই বিভিন্নভাবে তাফসিরকারগণ বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাক (রহ) ইবনে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَأُ الْخَصْمِ ۘ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ إِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلٰى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝ إِنَّ هٰذَآ أَخِيْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِيْ فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلٰى نِعَاجِهٖ ۖ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ أَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

অর্থ : (হে নবী!) আপনার কাছে কি ঐ মামলাকারীদের খবর পৌঁছেছে, যারা দেয়াল টপকিয়ে তার মহলে পৌঁছে গিয়েছিল? যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন তিনি তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না। আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে ঠিক ঠিক সত্যসহ মীমাংসা করে দিন, বে ইনসাফী করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিন। এ হচ্ছে আমার ভাই। এর কাছে নিরানব্বইটি দুম্বী আছে। আর আমার আছে মাত্র একটি। সে আমাকে বলে যে, এ দুম্বাটিও আমাকে দিয়ে দাও। কথায় সে আমাকে দাবিয়ে[১] ফেলল। দাউদ জবাব দিলেন, এ লোক তার দুম্বার সাথে তোমার দুম্বাটি শামিল করার দাবি করে অবশ্যই তোমার উপর জুলুম করেছে। নিশ্চয়ই যারা একসাথে বসবাস করে তারা অনেক সময় একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে শুধু তারাই এ থেকে বেঁচে থাকে, যারা ঈমান রাখে ও নেক আমল করে। আর এমন লোক কমই হয়। (এ কথা বলতে

১. অভিযোগকারী এ কথা বলেনি যে, আমার দুম্বা ছিনিয়ে নিয়েছে; বরং এই কথা বলেছে, আমার কাছে আমার দুম্বাও চাচ্ছে এবং এও চাচ্ছে যে, আমি নিজে আমার দুম্বা তাকে সোপর্দ করে দিই। সে বড়লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ পড়ছে।

বলতেই) দাউদ বুঝে নিলেন যে, আমি আসলে তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন তিনি তার রবের কাছে মাফ চাইলেন ও সিজদায় পড়ে গেলেন এবং তাঁর দিকে রুজু হলেন (সিজদার আয়াত)। তখন আমি তার অপরাধ মাফ করে দিলাম[২]। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য আমার নিকটবর্তী হওয়ার মর্যাদা রয়েছে এবং ভালো পরিণামও আছে। -সূরা সোয়াদ : আয়াত ২১-২৫

প্রাচীন ও বর্তমান কালের অনেক মুফাসসির (রহ) দাউদ (আ) এর এ ঘটনা সম্পর্কে অনেক ইসরাঈলী কিসসা কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যার মধ্যে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা ও বানোয়াট। সুতরাং আমি কুরআন মাজীদে বর্ণিত কিছু ঘটনা বর্ণনা করাটাই যথেষ্ট মনে করেছি। অন্য সব ঘটনা বর্ণনা থেকে বিরত রয়েছি। আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকেই সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

সূরা সোয়াদের সিজদার আয়াতে সিজদা করা আবশ্যিক (ওয়াজিব) না এটা শুধু কৃতজ্ঞতা (শুকর) প্রকাশার্থে, এ নিয়ে ইমামগণ (রহ)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন এ সিজদা ওয়াজিব। আবার কেউ বলেছেন, এ সিজদা ওয়াজিব নয়। এটা শোকরানার সিজদা। ইমাম বোখারী (রহ) হযরত আওয়ামের (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে সূরায়ে সোয়াদের সিজদার আয়াতে সিজদা করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তুমি কি আল্লাহর বাণী পাঠ করো না? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুব। এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান ও আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকেও; আর এই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।

-সূরা আনআম : ৮৪

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং (হে নবী!) আপনি তাদের পথ অনুসরণ করুন। -সূরা আনআম : ৯০

সুতরাং সুস্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, দাউদ (আ) সেই নবীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অনুকরণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে। সূরা সোয়াদের আয়াতে হযরত দাউদ (আ) সিজদা করেছিলেন। তার অনুসরণে রাসূলুল্লাহ ﷺও সিজদা করেছেন। (হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূরা সোয়াদে সিজদা করার স্বপক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট দলীল প্রমাণ এখানে স্পষ্ট।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত আব্বাস (রা) সূরা সোয়াদের সিজদা প্রসঙ্গে বলেছেন, এটা আবশ্যক সিজদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি এ আয়াতে সিজদা করতেন। সুতরাং সিজদা করাটাই উত্তম। বোখারী শরীফসহ বিশুদ্ধ অনেক কিতাবে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

নাসাঈ শরীফে বর্ণিত আছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা সোয়াদে) সিজদা করেছিলেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, এ সিজদা দাউদ (আ) তওবাস্বরূপ করেছিলেন। আমরা এ সিজদা কৃতজ্ঞতা (শুকর) জ্ঞাপন করার লক্ষ্যে করব।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপরে বসে সূরায়ে সোয়াদ সম্পূর্ণ পাঠ করলেন। তিনি সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে মিম্বার থেকে নিচে নেমে সিজদা করলেন। উপস্থিত লোকেরাও তার অনুকরণে সিজদা করলেন। অন্য আর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সোয়াদ পাঠ করেন। যখন তিনি সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন উপস্থিত লোকেরা সিজদা করতে

২. *এর দ্বারা জানা যায়, হযরত দাউদ (আ) অবশ্যই দোষ করেছিলেন। আর তা এমন কোনো দোষ ছিল, যা দুষ্কার মামলার মতোই। তাই এ মকদ্দমার ফায়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সঙ্গে তার মনে হলো, এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিল না যে, তা ক্ষমা করা যেত না কিংবা ক্ষমা করলেও তাঁকে তার উচ্চ মর্যাদা হারাতে হতো। আল্লাহ তাআলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করলেন তখন শুধু তাকে ক্ষমা করা হয়নি; বরং দুনিয়া ও পরকালে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাও বহাল রাখা হয়েছে।*

উন্নত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সিজদা (দাউদ (আ)) নবীর তওবার সিজদা ছিল। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখেছি যে, তোমরা (সিজদার জন্য) উঠে দাঁড়িয়ে গিয়েছ। সুতরাং তিনিও নিচে উঠে এসে সিজদা করলেন। মুসনাদে আহমদে ইমাম আহমদ (রহ) বর্ণনা করেন, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে। একবার তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, (তার সামনে) সূরা সোয়াদ লেখা হচ্ছে। যখন সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছা হলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, কলম-দোয়াত এবং অন্য যা কিছু সেখানে ছিল সবগুলো সিজদায় পড়ে গেছে। তারপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি ﷺ বললেন, (সূরা সোয়াদ পাঠকালে) এ আয়াতের স্থানে সর্বদা সিজদা করতে থাক।

তিরমিযী ও ইবনে মাজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি। আমি যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করেছি, তখন গাছের সাথে সাথে গাছটিও সিজদায় ঝুঁকে পড়েছে। আমি তাকে সিজদা অবস্থায় এ কথা বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! এর বিনিময়ে আপনি আপনার কাছে আমার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করে দিন এবং পুরস্কার হেফাযত করে রাখুন। এর বিনিময়ে আমার পাপসমূহ মাফ করে দিন। আর আপনি আমার এ সিজদা কবুল করুন যেভাবে আপনি আপনার বান্দা দাউদ (আ) থেকে কবুল করেছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি (সাথে সাথে) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সিজদার আয়াত পাঠ করলেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সিজদা অবস্থায় সেই দো'আটিই করতে শুনেছি, যা সেই লোকটি বর্ণনা করেছিল। ইমাম তিরমিযী (রহ) বলেছেন, হাদীসটি গরীব। কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেছেন, দাউদ (আ) তার এ সিজদায় একটানা চল্লিশ দিন অতিবাহিত করতেন। মুজাহিদ, হাসান প্রমুখ (রহ)-ও এই মত পোষণ করেন। এ বর্ণনাটি এক মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর এক বর্ণনাকারী হচ্ছেন, ইয়াযীদ রাক্কাশী। এ ব্যক্তি দুর্বল। তার বর্ণনা প্রায়ই গ্রহণযোগ্য হয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তার সে অন্যায় ক্ষমা করলাম। নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দর বাসস্থান।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে সে আমার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ন্যায় বিচারকগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাহমানের ডান দিকে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবে। আর আল্লাহ রহমানুর রহীমের উভয় (কুদরতী) হাত-ই ডান দিকে এবং তা বরকতময়। এ (ন্যায় বিচারক) লোকগণ হলো, যারা নিজ পরিবারে, সকল নিদর্শনের ক্ষেত্রে এবং তার উপর যে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এসব কিছুতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে, ন্যায় বিচারক বাদশাহ সবার চেয়ে প্রিয় ও নিকটতম হবে। আর জালিম (অত্যাচারী) বাদশাহ সবার চেয়ে ঘৃণিত এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য হবে।

ইবনে আবী হাতিম (রহ) থেকে বর্ণিত। জাফর ইবনে সুলায়মান (রহ) বলেছেন, আমি মালিক ইবনে দীনার (রহ) থেকে, وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ (আমার কাছে তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও সুন্দর বাসস্থান।) দাউদ (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যা এরূপ বলতে শুনেছি যে, হযরত দাউদ (আ) কিয়ামতের দিন আরশে আজীমের পর্দার পার্শ্বে দাঁড়ানো থাকবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, হে দাউদ! অদ্য তোমার সেই সুমধুর সুরে আমার তাসবীহ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করো, যেই সুর দিয়ে তুমি পৃথিবীতে থাকাকালীন আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে। হযরত দাউদ (আ) আরয করবেন, হে আমার প্রভু! সেটা এখন কিভাবে হবে? আপনি তো আমার থেকে সেই সুমধুর সুর নিয়ে গিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ

আমি পুনরায় তোমাকে সেই সুমধুর সুর প্রদান করছি। তারপর হযরত দাউদ (আ)-এর সুমধুর আওয়াজে গোটা জান্নাতবাসী বিমোহিত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۞

অর্থ : (আমি তাকে বললাম) হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। কাজেই আপনি জনগণের মধ্যে সত্যসহ শাসন করুন এবং নফসের কথামতো চলবেন না। তাহলে সে আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। কারণ তারা হিসাব-নিকাশের দিনটিকে ভুলে গেছে। -সূরা সোয়াদ : ২৬

খলীফা (প্রতিনিধি) করার অর্থ হলো, দেশের বাদশাহ নিযুক্ত করা এবং মানুষের সকল কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা। আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত আয়াতসমূহে দাউদ (আ)-কে সত্যের অনুসরণ এবং ন্যায়-ইনসাফভিত্তিক মিমাংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে সেটাই সত্য। এর বাইরে যা কিছু রয়েছে সেগুলো মনগড়া এবং নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মনগড়া এবং প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী যে চলবে, তার জন্য কঠিন শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত দাউদ (আ) তার সময়ে মানুষের নেতা ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। ন্যায়, ইনসাফ, ইবাদত, সাধনা ও পরহেযগারীতে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। তার এবং তার পরিবারের দিন রাতের কোনো একটি সময় ইবাদত বিহীন কাটত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- হে দাউদের পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা ইবাদত করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ। -সূরা সাবা : ১৩

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ) আবী জলদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হযরত দাউদ (আ)-এর দো'আসমূহ পাঠ করেছি। তিনি এ দো'আ করেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কৃতজ্ঞতা কিরূপে প্রকাশ করব? সেখানে আপনার অনুগ্রহ ছাড়া আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোনো যোগ্যতাই রাখি না। তখন তার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হলো, হে দাউদ! তোমার কি জানা নেই, তোমার সাথে যে নেয়ামতসমূহ রয়েছে সেগুলো আমারই দান? দাউদ (আ) আরয করলেন, কেন নয় হে আমার প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বললেন- তোমার এ কথাতেই আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।

ইমাম বায়হাকী (রহ) বলেন, হযরত ইবনে শিহাব (রহ) বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা এভাবে করেছিলেন যে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا يَنْبَغِىْ لِكَرَمِ وَجْهِهٖ وَعَزَّ جَلَالُهٗ ـ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। যা তার মহান সত্তার উপযোগী এবং তার মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী।

তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করলেন, হে দাউদ! তুমি সংরক্ষক ফেরেশতাগণকে (তাঁদের সাওয়াব লিখায়) দুর্বল করে দিয়েছ।

আবু বকর ইবনে দুনিয়া (রহ) ও আলী ইবনে জাদ (রহ) সূত্রে হযরত সাওরী (রহ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) 'যুহদ' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, আমার কাছে সুফিয়ান সাওরী (রহ) এক ব্যক্তির সূত্রে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ) বলেছেন, দাউদ (আ)-এর বংশের হিকমতসমূহ ছিল—

১. জ্ঞানীদের জন্য জরুরী যে, সে চারটি সময়ের ব্যাপারে কখনো অন্যমনস্ক থাকবে না (অর্থাৎ এ সময়গুলো একাগ্রতা ও গুরুত্বের সাথে কাজে লাগাবে)।

—নিজ প্রভুর কাছে মুনাজাত করার সময়।

—নিজ কৃতকর্মের হিসাব করার সময়।

—নিজ উস্তাদ, মুর্শিদ বা বন্ধু-বান্ধবদের সংসর্গ লাভের সময়, যারা তার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করেন এবং তাকে সৎকাজের উপদেশ দেন।

—নিজ আরাম-আয়েশের সময়। অর্থাৎ নিজ আত্মার প্রশান্তির জন্য একটি সময় কাজে লাগাবে। কারণ এ বিষয়টি তার ইবাদতের জন্য সহায়ক হবে।

২. একজন জ্ঞানীর জন্য জরুরী যে, সে তার সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাবে এবং নিজ যবানকে সংযত রাখবে এবং নিজ অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখবে। জ্ঞানীদের জন্য এটাও জরুরী যে, তিনটি উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করবে না।

—নিজ পরকালের (মুক্তির) পথ অন্বেষণের জন্য।

—নিজ রিযিক উপার্জনের জন্য অথবা বৈধভাবে চিত্ত-বিনোদনের জন্য।

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) হযরত দাউদ (আ)-এর জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর অনেক আকর্ষণীয় বাণী ও উপদেশ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর এ বাণীগুলোও রয়েছে—

১. ইয়াতীমের প্রতি পিতার অনুরূপ সহানুভূতিশীল হও।

২. জেনে রাখ! আজ তুমি যা বপণ করবে, কাল সেটার ফলই তুমি পাবে। এটি দুর্বলসূত্রসহ মারুফ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) বলেছেন—

৩. হে পাপের বীজ বপণকারী! তুমি এ ফসল দ্বারা শুধু কাঁটা ও বিপদই পাবে।

৪. হযরত দাউদ (আ) থেকে এ উপদেশও বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, কোনো সভার নির্বোধ ব্যক্তি হচ্ছে, কোনো মৃতব্যক্তির শিয়রে গায়কের মতো।

৫. তিনি এ মূল্যবান উপদেশও করেছেন যে, ধন-সম্পদ লাভের পরে তা হারিয়ে গরীব হয়ে যাওয়া এতটা অমঙ্গল নয়, যতটা অমঙ্গল সৎপথ প্রাপ্তির পরে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া।

৬. তিনি এ উপদেশও দিয়েছেন যে, জেনে রাখ! নিজের যে বিষয়টি মজলিসে প্রকাশ হওয়াটা তুমি অপছন্দ করো, সেটা থেকে তুমি একাকীত্বেও বিরত থেক।

৭. তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে সেরূপ ওয়াদা করো না, যা তুমি রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, এরূপ ওয়াদা তোমাদের দু'ভাইয়ের মাঝে শত্রুতা ও ক্রোধের সৃষ্টি করবে।

ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একাধিক নারীকে বিবাহ করতে দেখে তিরস্কার করে লোকদের কাছে বলতে লাগল, তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য করো, যিনি আহারে তৃপ্ত হন না এবং নারীদের বিবাহ করা ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। এভাবে ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ বশতঃ বলতো, যদি তিনি সত্যিই নবী হতেন তবে নারীদের প্রতি তার আকর্ষণ থাকত না। ইয়াহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিংসা ও ঈর্ষাপরায়ণ এবং কঠোর সমালোচক ছিল হুয়াই ইবনে আখতাব। তার সমালোচনা ও হিংসার কথা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— "তাহলে এরা কি অন্যদের সাথে এ কারণে হিংসা করে যে, আল্লাহ তাদের উপর নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করেছেন? যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে তারা যেন জেনে রাখে! আমি তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব, হিকমত ও বিশাল রাজত্ব প্রদান করেছি। –সূরা নিসা : আয়াত ৫৪

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আগের নবী (আ) গণকেও অনুরূপভাবে নেয়ামত প্রদান করেছেন। যারা ছিলেন তোমাদের জাতি বনী ইসরাঈলের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন হযরত সুলায়মান (আ)-এর এক হাজার স্ত্রী ও বাঁদি ছিলেন। তাদের মধ্যে সাতশ' ছিলেন স্বাধীন স্ত্রী আর তিনশ' ছিলেন বাঁদি। আর হযরত দাউদ (আ)-এর ছিলেন একশজন স্ত্রী। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল উরিয়া। যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছেন হযরত সুলায়মান (আ)।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর তুলনায় তাঁদের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। কালবী (রহ)-ও অনুরূপ সংখ্যা বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ (রহ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তিনি প্রশ্নকারীর উত্তরে বলেন, এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একটি সংরক্ষিত মহা মূল্যবান তথ্য দিচ্ছি। তা হচ্ছে, আমি তোমাকে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযার ব্যাপারে বলছি। (শোন!) দাউদ (আ) খুব বেশি রোযা রাখতেন এবং রাত ভর জেগে ইবাদত করতেন। তিনি একজন বীর সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে কখনো তিনি পিছ পা হননি। তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাউদ (আ)-এর রোযা হচ্ছে সর্বোত্তম রোযা।

দাউদ (আ) যাবূর কিতাব সত্তরটি সুরে তিলাওয়াত করতেন। তিনি রাতের নির্জনতায় এক রাকাআত নামায এমনভাবে পড়তেন যে, নামাযরত অবস্থায় তিনি নিজেও কাঁদতেন এবং তাঁর নিকটে যারা থাকতেন সবাই কাঁদতেন। তাঁর সুর (লোকদেরকে পরকালের) চিন্তায় নিমজ্জিত করে দিত। তাঁর সুমধুর সুরে লোকদের মধ্যে চেতনা ফিরে আসতো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, তুমি যদি শোনতে চাও তবে আমি তোমাকে তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)-এর রোযা সম্পর্কেও কিছু তথ্য দিতে পারি। হযরত সোলায়মান (আ) প্রতি মাসের শুরুতে তিন দিন, মাঝে তিনদিন এবং মাসের শেষে তিন দিন রোযা রাখতেন। অর্থাৎ রোযা দিয়ে মাস শুরু করতেন এবং রোযা দিয়ে মাস শেষ করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রশ্নকারীকে আরো বললেন, তুমি যদি শুনতে চাও, তবে আমি তোমাকে নিষ্কলুষ কুমারী নারীর পুত্র (অর্থাৎ) ঈসা (আ)-এর রোযা সম্পর্কেও তথ্য শুনাতে পারি। তিনি সর্বদা রোযা রাখতেন। তিনি যবের ছাতু দিয়ে আহার করতেন এবং পশুর পশম দ্বারা তৈরিকৃত পোষাক পরতেন। তিনি যা পেতেন তাই খেতেন। কোনো কিছু না পাওয়াতে, তাঁর কোনো চাওয়া-পাওয়ার আবদার ছিল না। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না যে, মারা যাবার (ব্যাধিগ্রস্ত হবার) আশঙ্কা থাকবে, তাঁর কোনো ঘর-বাড়ী ছিল না যে, যা বিরান (নষ্ট) হবার আশঙ্কা থাকবে। যেখানেই রাত হতো, সেখানেই জায়নামায বিছিয়ে ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। সমস্ত রাত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন, এমতাবস্থায় ভোর হয়ে যেত। তিনি একজন সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। তাঁর শিকারের লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তিনি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে বসতেন এবং তাদের সমস্যাবলী শুনে তার যুক্ত সমাধান করতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন।

(হে প্রশ্নকারী!) তুমি যদি শুনতে আরো আগ্রহী হও, তবে আমি তোমাকে তাঁর সম্মানিতা মাতা মরিয়াম বিনতে ইমরানের রোযা সম্পর্কেও তথ্য শুনাতে পারি। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, এর পরবর্তী দু'দিন রোযা রাখতেন না। তুমি যদি আগ্রহী হও তবে আমি তোমাকে, নবীয়ে আরাবী, সাইয়্যেদুল মুরছালীন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর রোযা সম্পর্কেও তথ্য শুনাতে পারি। তিনি প্রতি সোমবার ও প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখতেন। অধিকাংশ সময় তিনি চন্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ রোযা রাখতেন। তিনি বলতেন, এ তিনদিন রোযা রাখা সারা বছরের রোযা রাখার সমপরিমান।

হযরত দাউদ (আ)-এর বয়স

হযরত আদম (আ)-এর কিসসায় তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনার শুরুলগ্নেই আলোচনা করা হল যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ মোবারক থেকে তাঁর সকল সন্তানদের বের করে আনেন। এ সময় আদম

(আ) নবী (আ)-গণকেও এর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এক নবীকে উজ্জলময় চেহারা দেখে আল্লাহ তা'আলার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদেগার! ইনি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ তোমার সন্তান দাউদ। আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাঁর জীবন কত বছর? আল্লাহ তা'আলা বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) বললেন, হে আল্লাহ! তাঁর হায়াত বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জবাব আসল, এরূপ হতে পারে না। হ্যাঁ, তুমি এ দাবী করতে পার যে, তোমার বয়স থেকে তাঁকে কিছু প্রদান করা হোক। হযরত আদম (আ)-এর হায়াত ছিল এক হাজার বছর। আদম (আ) থেকে চল্লিশ বছর নিজ সন্তান দাউদ (আ)-কে দান করে দিলেন। পরে হযরত আদম (আ)-এর কাছে যখন মউতের ফিরিশতা এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, আমার আয়ু তো এখনও চল্লিশ বছর বাকী আছে। আদম (আ) তাঁর হায়াত দান করার কথা তখন ভুলে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে আদম (আ)-কে হাজার বসর হায়াত পূর্ণ করে দিলেন। আর হযরত দাউদ (আ)-কেও একশত বছর হায়াত প্রদান করলেন। (অর্থাৎ উভয়ের হায়াত ঠিক রাখলেন।) এ হাদীসটি অনেক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এটি বিশুদ্ধ। ইবনে জারীর (রহ) বলেন, আহলে কিতাব মনে করেন, হযরত দাউদ (আ)-এর বয়স হয়েছিল সত্তর বসর। অর্থাৎ তিনি সত্তর বছর হায়াত পেয়েছিলেন। এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা ও অগ্রহণযোগ্য উক্তি। তবে তাদের এ উক্তিটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে যে, হযরত দাউদ (আ) চল্লিশ বছর বাদশাহী করেছিলেন। কারণ, আমাদের কাছে এর বিপরীত কোন বর্ণনা নেই।

হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাত

মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। তিনি যখন ঘরের বাইরে যেতেন তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে যেতেন। তাঁর ফিরে আসার পূর্বে কেউ ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। একবার তাঁর স্ত্রী হঠাৎ ঘরের আঙ্গিনায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে হযরত দাউদ (আ) ভর্ৎসনা করবেন। এর মধ্যেই হযরত দাউদ (আ) এসে গেলেন। তিনি আগত লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? তিনি (আগন্তুক লোকটি) উত্তরে বললেন, আমি সেই ব্যক্তি, যে বাদশাহদেরকে ভয় করে না এবং কোন বাধা (অন্তরায়) যাকে (তার লক্ষ্য) থেকে ফিরাতে পারে না। সাথে সাথে হযরত দাউদ (আ) বললেন, তবে আল্লাহর কসম! আপনি মালাকুল মউত। আল্লাহর নির্দেশ (মউত) কে স্বাগতম। কিছুক্ষণ পরে তাঁর রূহ কবয করা হলো। গোসল, কাফন ও অন্যান্য কাজ শেষ করার পরে সূর্যের প্রখরতা বেড়ে গেল। তখন হযরত সোলায়মান (আ) পাখীদেরকে বললেন, দাউদ (আ)-এর উপর ছায়া প্রদান কর। তখন পাখীরা (ডানা মেলে) দাউদ (আ)-এর পবিত্র মৃত্যুদেহটিকে ছায়ায় আবৃত করে ফেলল। যখন রাতের আঁধার ছেয়ে এলো হযরত সোলায়মান (আ)-এর নির্দেশে পাখীগুলো তাদের পাখাগুলো সংকুচিত করে নিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ [illegible] উপরোক্ত কথা বলার সময়, আমাদেরকে (হাতের) ইশারা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, পাখীগুলো কিভাবে তাদের ডাকা বিস্তৃত করেছিল এবং কিভাবে সংকুচিত করেছিল। ছায়া প্রদানকারী পাখীগুলোর মধ্যে বড় ডানা বিশিষ্ট বাজ পাখীও ছিল। হাদীসের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

সুদ্দী (রহ) থেকে বর্ণিত; হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) শনিবার দিন আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন। পাখীরা তাঁর পবিত্র দেহের উপর ছায়া দান করেছিল।

হযরত হাসান (রহ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর ওফাত হয়েছিল একশত বছর বয়সে এবং তিনি বুধবারে আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন। আবুস সাকান হাজারী (রহ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) ও আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন। হযরত দাউদ (আ) এবং তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আ)-ও আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন। ইবনে আসাকির (রহ) এটি বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় তাফসীরকার থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) যখন মিহরাবের সিড়ি থেকে উপস্থিত হন। ফিরিশতা (মালাকুল মাউত) হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে আরয করলেন, আমাকেও আপনার সাথে নীচে অবতরণ করার অথবা উপরে ওঠার অনুমতি দিন। অতঃপর ফিরিশতা বললেন, হে নবী! আপনার নির্দিষ্ট বছর, মাস, দিন (হায়াত) ও রিযিক সবকিছুই শেষ হয়ে গেছে। তখন হযরত দাউদ (আ) সিড়ির উপর সিজদায় পড়ে গেলেন এবং ফিরিশতা সিজদারত অবস্থায় তাঁর রূহ কবয করলেন।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, প্রখর রোদের মধ্যে বিপুল জনসাধারণ হযরত দাউদ (আ)-এর জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। এর মধ্যে শুধু চল্লিশ হাজার বনী ইসরাঈলের আলেমই ছিলেন। বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ)-এর ওফাতের পরে দাউদ (আ)-এর মত আর কারও ওফাতের জন্য শোক প্রকাশ করেনি। লোকেরা গরমে পেরেশান হয়ে হযরত সোলায়মান (আ)-এর কাছে আরয করলেন যে, আমাদেরকে এ প্রচণ্ড গরম থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আ) বাইরে নেমে পাখীগুলোকে ডেকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে লোকদের উপর ছায়া প্রদানের জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উপস্থিত সবাইকে পাখীগুলো ছায়া প্রদান করল। লোকগুলো একের সাথে অপরে মিলে বসেছিল। পাখীগুলো তাদের উপর ডানা মেলে এমনভাবে তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছিল যে, বায়ুর প্রবেশ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

বনী ইসরাঈল পেরেশান হয়ে আবার হযরত সোলায়মান (আ)-এর কাছে অভিযোগ জানালে, তিনি পাখীগুলোকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা তাদের উপর বায়ু প্রবাহ বন্ধ করে দিওনা। বরং সূর্যের তাপ থেকে তাদেরকে রক্ষা কর। পাখীগুলো সাথে সাথে হযরত সোলায়মান (আ)-এর নির্দেশ পালন করলেন। অতঃপর সব লোকেরা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পেল এবং তাদের উপর উন্মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। এটাই সর্বপ্রথম হযরত সোলায়মান (আ)-এর বাদশাহীর নিদর্শন ও প্রমাণ।

হাফেজ আবূ ইয়ালা (রহ) হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় কোন ফিতনায় পড়েনি এবং তাঁরা [দাউদ (আ)-এর আদর্শকেও] পরিবর্তন করেনি। হযরত মাসীহ এর শিষ্যরা মাসীহ এর পথ ও মতের উপরে দুইশ বছর অটল ছিল। এ হাদীসটি গরীব। হাদীসটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, আল্লাহ তা'আলারই সর্বাধিক অবহিত।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর ঘটনা

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আ)-এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ—

সোলায়মান ইবনে দাউদ ইবনে ঈশা ইবনে আবেদ ইবনে আবের ইবনে সালমূন ইবনে নাহশুন ইবনে আমীন নব ইবনে ইরাম ইবনে হাসিরুন ইবনে ফারিস ইবনে ইয়াহুযা ইবনে ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। তিনি নবীর সন্তান নবী ছিলেন। বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি দামেশকে প্রবেশ করেছিলেন। ইবনে খাবুলা (রহ) বলেন, তাঁর বংশ তালিকায় ফারিস নামটি ভুল। তিনিও সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর একটি বংশ তালিকা পেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۭ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ۝

অর্থ : সোলায়মান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং বলেছিল, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে (নবুওয়াত ও রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনীয়) সবকিছু দেয়া হয়েছে, এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। -সূরা নামল : ১৬

অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর নবুওয়াত ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী ছিলেন। হযরত লূত (আ)-এর ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারী হযরত সোলায়মান (আ) একা কিভাবে হবে? (কারণ, নবীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁর সন্তান-সন্ততিরা হতে পারে না) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সুস্পষ্ট প্রমাণ।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমরা (নবীরা) আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যাই না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, আমরা (নবীরা) অন্য মানুষের মতো ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কাউকে করে যাই না। বরং আমাদের সম্পদসমূহ সদকা হয়ে যায়। আমাদের রেখে যাওয়া সম্পদগুলো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিরা এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরা গ্রহণ করতে পারে না, বরং গরীব, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করা হয়। কারণ, পৃথিবীর ধন-সম্পদ নবী (আ)-গণের কাছে অনুরূপ তুচ্ছ ও ঘৃণিত বস্তু, যেরূপ তুচ্ছ ও ঘৃণিত নবীগণের প্রেরক মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সোলায়মান (আ) বলেছেন—

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ "হে মানুষ! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।"

অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আ) সব ধরনের পাখীদের ভাষা বুঝতে পারতেন এবং মানুষদেরকে পাখীদের সেই ভাষা ও তাৎপর্য বুঝিয়ে বলতেন।

আবু বকর বায়হাকী (রহ) আবু মালিক (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত সোলায়মান (আ) একটি চড়ুই পাখীর কাছ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। এ সময় চড়ুই পাখীটিকে দেখতে পেলেন যে, সেটি আর একটি স্ত্রী চড়ুই পাখীর কাছে বসে মাথা নাড়াচ্ছে। তখন সোলায়মান (আ) তাঁর সাথীগণকে বললেন, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ, ওরা কি বলছে। তিনি বললেন, চড়ুই পাখীটি নারী চড়ুই পাখীটিকে বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে। পুরুষ পাখীটি বলছে, তুমি আমার সাথে বিবাহ বস। তুমি দামেশকের যে অট্টালিকায় থাকতে ইচ্ছা করো সেখানেই আমি তোমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিব। তারপর সোলায়মান (আ) বললেন, এরূপ বলার কারণ, দামেশকের অট্টালিকাগুলো পাথর দ্বারা নির্মিত। সেখানে কেউ বসবাস করতে পারে না। বরং এরূপ (বিবাহের) প্রস্তাবকারীরা মিথ্যাবাদীই হয়ে থাকে। (সম্ভবত এই চড়ুই পাখীটিও বিবাহ করার জন্য চড়ুই পাখীটিকে ধোঁকা দিয়েছিল)।

ইবনে আসাকির (রহ) বায়হাকী থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য জীব-জন্তু ও সমস্ত সৃষ্টির সাথেও তাঁর এরূপ অবস্থা ছিল। আল্লাহ তা'আলার বাণী এর স্পষ্ট প্রমাণ। কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আ) বলেছেন—

وَأُتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. "আমাকে (নবুওয়াত ও রাজত্বের) সকল কিছুই প্রদান করা হয়েছে।"

অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহীর জন্য যা কিছু প্রয়োজন, সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধের সামগ্রী, মানব, জ্বীন, পক্ষীকুল, হিংস্র জানোয়ারের বাহিনী এবং তাদের কথা বুঝার জ্ঞান ও তার ব্যাখ্যা এবং তাদের সাথে কথাবলার ভাষা সবকিছুই তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। এ কারণেই সোলায়মান (আ) বলেছেন, নিশ্চয়ই এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে এসব নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সমস্ত কিছুই আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۞ حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

অর্থ : সোলায়মানের জন্য জ্বীন, মানুষ ও পাখিদের বাহিনী জমা করা হয়েছিল এবং এদের সবাইকে পুরা নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো। (একবার সোলায়মান ঐ বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন) যখন তারা পিঁপড়ার এলাকায় পৌছল, তখন একটা পিঁপড়া বলল, হে পিঁপড়ারা! তোমরা গর্তে ঢুকে যাও। এমন যেন হয় না যে, সোলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষে মারবে আর তারা তা টেরও পাবে না। সোলায়মান এ কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, যাতে আমি তোমার ঐ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ এবং এমন নেক আমল করি, যা তুমি পছন্দ করো। আর তোমার রহমতে আমাকে তোমার নেক বান্দাহদের মধ্যে শামিল করো। –সূরা নামল : আয়াত ১৭-১৯

আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দা ও নবী এবং নবীর পুত্র হযরত সোলায়মান (আ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি একবার জ্বীন, মানব ও পাখীকুলের বিশাল বাহিনীকে নিয়ে সফরে বের হলেন। জ্বীন, মানুষ তার সাথে সাথে চলছে এবং পাখীরা তার উপরে ছায়া দিয়ে চলছে। তারা (পাখীরা) নিজ ডানা বিস্তার করে রোদের তাপ ও উষ্ণতা এবং পেরেশানী থেকে সোলায়মান (আ)-কে ও তার বাহিনীকে হেফাযত করছিল। সমস্ত পাখীগুলো সুশৃঙ্খলভাবে কাতারবন্দী হয়ে এমন সুন্দরভাবে চলছিল যে, একটি পাখীও আগ-পিছ হয়নি। এভাবে চলতে চলতে তারা এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় গিয়ে পৌছল। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞

অর্থ : যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো যেন সোলায়মান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে। –সূরা নামল : ১৮

পিপীলিকার সর্দার একদিকে পিপীলিকাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল, অপরদিকে হযরত সোলায়মান (আ) এবং তার বাহিনীর অপারগতার কথাও পিপীলিকাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। সে (পিপীলিকার সর্দার) বলেছিল, আমি তোমাদেরকে গৃহে প্রবেশ করার নির্দেশ এজন্য দিয়েছি যে, হতে পারে হযরত সোলায়মান (আ)-এর অজান্তেই তার বাহিনী আমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে। হযরত সোলায়মান (আ) ও তার বাহিনী থেকে জুলুম বা অন্যায় সংঘটিত হওয়ার কথা বলেনি।

ওহাব (রহ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আ) একটি বিছানায় (সিংহাসনে) আসীন অবস্থায় তায়েফের একটি এলাকা অতিক্রম করছিলেন। তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। পিপীলিকার সর্দারের নাম ছিল 'জারসা'। সে তার গোত্র 'বনু শিসবান' এর নেতা ছিল। সে (পিপীলিকার সর্দার) ছিল খোড়া। এ বর্ণনাটি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য ও অমূলক। তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো এই যে, সোলায়মান (আ) যদি কোনো বিছানায় বা সিংহাসনে আসীন থাকতেন, তবে সে অবস্থায় পিপীলিকা পদদলিত হওয়ার কোনই ভয় থাকত না। কারণ, সে আসনে (সোলায়মান আ)) তাঁর বাহিনী ও যাবতীয় আসবাবপত্র উঠিয়ে নিতেন; বরং এ সফরে যেখানে পিপীলিকা পদদলিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, হযরত সোলায়মান (আ) ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। এ আসীন (সিংহাসন) সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা হলো এই যে, হযরত সোলায়মান (আ) পিপীলিকাদের সর্দারের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। পিপীলিকাদের সর্দারের কথাগুলো ছিল সঠিক এবং প্রশংসাযোগ্য। যে কারণে হযরত সোলায়মান (আ) একটু মুচকি হাসলেন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্যদের চেয়ে এক বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন। আর মূর্খদের সেসব উক্তিও একেবারে ভ্রান্ত ও অমূলক যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর পূর্বে পাখী ও জীব-জন্তু মানুষের সাথে সরাসরি কথা বলতো। এরপর হযরত সোলায়মান (আ) এতে তাদের থেকে এই ওয়াদা নিয়েছেন যে, তারপর থেকে এই পাখী ও অন্যান্য জীব-জন্তু তার ব্যতীত অন্য আর কারো সাথে যেন কথা না বলে। এটা মূর্খদের একটি হাস্যময় উক্তি। এ উক্তি একমাত্র তারাই করতে পারে যারা জ্ঞানশূন্য। কারণ যদি এ কথা সত্যিই হয়ে থাকে তবে হযরত সোলায়মান (আ)-এর (পাখী ও জীব-জন্তুর ভাষা বুঝার জ্ঞান) এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোনো মূল্যই হয় না এবং এটা তার জন্য কোনো গর্ব বা সম্মানের কথাও হয় না। কারণ যদি পাখী ও জীব-জন্তুর ভাষা সব মানুষই বুঝতে পারত। সেখানে নবীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর থাকল কোথায়? হযরত সোলায়মান (আ) যে পাখী ও জীব-জন্তু থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন, এটাও তার সম্পর্কে একটি মিথ্যা প্রচারণা। যার কোনই প্রমাণ নেই।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর কথা কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছিলেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে তাওফীক দিন যাতে আমি আপনার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি এমন নেক কাজ করতে পারি, যাতে আপনি রাজি। আর আমাকে আপনি আপনার নিজ অনুগ্রহে (রহমতে) আপনার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করুন।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রতি যে দয়া প্রদান করা হয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা তিনি সঠিকভাবে যাতে আদায় করতে পারেন, তার তাওফীক আল্লাহ তা'আলার দরবারে কামনা করেছিলেন এবং নেক আমল করা তাঁর জন্য সহজ করে দেয়া এবং ইন্তেকালের সময় তাঁকে নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাদের সকল দোয়া কবুল করে নেন।

পিতা-মাতার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সোলায়মান (আ)-এর মাতার কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি (মাতা) ছিলেন অত্যন্ত ইবাদতগুযার নেককার মহিলা।

হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর মাতা বলেছেন, নিশ্চয়ই রাতের অধিক ঘুম (নিদ্রা) বান্দাকে কিয়ামতের দিন (আমলের দিক দিয়ে) নিঃস্ব ও অসহায় বানিয়ে দেবে। ইবনে মাজাহ (রা) অনুরূপ হাদীস তাঁর চারজন শায়খ থেকে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রাজ্জাক (রহ) যুহরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত সোলায়মান (আ) তাঁর সাথীদের নিয়ে বৃষ্টির জন্য দো'আ করার উদ্দেশ্যে বাইরে বের হন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি পিপীলিকা তার একটি পা উপরের দিকে উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে। তখন সোলায়মান (আ) তাঁর সাথীদেরকে বললেন, চল আমরা ফিরে যাই। বৃষ্টির পানি অবশ্যই বর্ষিত হবে। কারণ পিপীলিকাও বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করছে। তার দো'আ কবুল করা হয়েছে।

ইবনে আসাকির (রহ) এটি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হযরত সোলায়মান (আ)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছেন যে, নবীদের মধ্যে একজন নবী বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আর উদ্দেশ্যে লোকজনসহ বাইরে বের হন। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি পিপীলিকা একটি পা আকাশের দিকে উঠিয়ে রেখেছে। তখন সেই নবী (তাঁর সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা ফিরে যাও। এ পিপীলিকার কারণে তোমাদের প্রার্থনা কবুল করা হয়েছে।

সুদ্দী (রহ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আ)-এর বাদশাহীর যমানায় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি লোকদেরকে ইস্তিগফারের জন্য বাইরে বের হওয়ার আদেশ দিলেন। সেখানে একটি পিপীলিকাও তার পায়ের উপর দাঁড়িয়ে হাতগুলো প্রসারিত করে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করছিল। পিপীলিকাটি বলছিল, হে আল্লাহ! আমিও তোমার সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি। তোমার দয়া ব্যতীত আমার আর কোনো উপায় নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–(আর এক সময়) সুলায়মান পাখিদের খোঁজ-খবর নিলেন এবং বললেন, কী ব্যাপার! আমি অমুক হুদহুদ পাখিটিকে দেখছি না যে! সে কি কোথাও উধাও হয়ে গেল? আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো অথবা তাকে যবেহ করে ফেলব। তা না হলে তাকে আমার নিকট সঙ্গত কারণ দেখাতে হবে। অল্প কিছু সময় পরেই সে এসে বলল, আমি এমন কতগুলো তথ্য পেয়েছি, যা আপনার জানা নেই। আমি সাবা[১] সম্পর্কে নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। আমি সেখানে এক মহিলাকে সে জাতির শাসক হিসেবে দেখলাম। তাকে সব রকমের সাজ-সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। আর তার সিংহাসন খুবই জমকালো। আমি দেখলাম যে, সে এবং তার কাওম আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সিজদা করে। আর শয়তান[২] তাদের আমলকে তাদের কাছে সুন্দর করে দেখাচ্ছে এবং তাদেরকে সঠিক পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাই তারা সোজা রাস্তা পায় না। (শয়তান তাদেরকে গোমরাহ করেছে) যাতে তারা ঐ আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও জমিনের গোপনীয় জিনিসগুলো বের করেন এবং যিনি তোমরা যা গোপন করো তাও জানেন আর যা প্রকাশ করো তাও জানেন। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি মহান আরশের মালিক (সিজদার আয়াত)। সুলায়মান বললেন, এখনই আমি দেখে নিচ্ছ যে, তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যুকদের মধ্যে গণ্য। আমার এ চিঠি নিয়ে যাও, তাদের দিকে ফেলে দাও, তারপর তাদের থেকে একটু সরে থাক এবং লক্ষ্য করো যে, তারা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়। রানী[৩] বলল, হে আমাদের দরবারের লোকেরা! আমার দিকে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ফেলা হয়েছে। আর তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এসেছে এবং আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের নামে শুরু করা হয়েছে। (চিঠিতে লেখা আছে) আমার অবাধ্য হয়ো না এবং মুসলিম হয়ে[৪] আমার কাছে হাজির হয়ে যাও। (চিঠির কথা শুনিয়ে) রানী বলল, হে কাওমের সরদারগণ! আমার এ ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ দিন। আপনাদেরকে বাদ দিয়ে তো আমি কোনো বিষয়ের

১. 'সাবা দক্ষিণ আরবের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জাতি ছিল। এদের রাজধানী ছিল মারেব (সানআ থেকে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত)।

২. কথার ধরন থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে, এখান থেকে ২৬নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত হুদহুদের কথার উপর আল্লাহ তা'আলা নিজে আরো কিছু কথা বলেছেন।

৩. মাঝখানের কাহিনী বাদ দিয়ে এখন সেই সময়ের কথা বলা হচ্ছে, যখন হুদহুদ রানীর সামনে পত্র ফেলে দিয়েছিল।

৪. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে অথবা হুকুমের অনুগত হয়ে।

ফায়সালা করি না। তারা জবাবে বলল, আমরা শক্তিশালী ও যোদ্ধা জাতি। তবে সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার কী আদেশ দেওয়া উচিত। রানী বলল, কোনো বাদশাহ যখন কোনো দেশে ঢুকে পড়ে তখন সেখানে তারা গোলোযোগ সৃষ্টি করে এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদেরকে অপমানিত করে। তারা এ রকমই করে থাকে। আমি তাদের কাছে একটা হাদিয়া পাঠাচ্ছি। তারপর দেখি আমার দূত কী জবাব নিয়ে আসে। যখন (রানীর দূত) সুলায়মানের কাছে পৌঁছল তখন তিনি বললেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দিয়ে আমাকে সহায্য করতে চাও? যা কিছু আল্লাহ আমাকে দিয়ে রেখেছেন তা এর চেয়ে অনেক বেশি, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। বরং তোমাদের হাদিয়া নিয়ে তোমরাই খুশি থাক। হে দূত! যারা তোমাকে পাঠিয়েছে তাদের কাছে ফিরে যাও। আমরা তাদের বিরুদ্ধে এমন বাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবিলা তারা করতে পারবে না। আর তাদেরকে এমন লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বের করব যে, তারা অপদস্ত হয়ে থাকবে। -সূরা নামল : ২০-৩৭

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ) ও হুদহুদ পাখীর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। পাখীরা পালাক্রমে সোলায়মান (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হতো। যেমন কখনো হুদহুদ পাখীদের উপস্থিতির পালা থাকতো। কখনো অন্যান্য পাখীদের উপস্থিতির পালা থাকতো। এছাড়াও সোলায়মান (আ) যখন যাকে ডাকতেন, সাথে সাথে এসে হাজির হতো।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর দরবারে হুদহুদ পাখীর দায়িত্ব ছিল এই যে, যখন সোলায়মান (আ) কোথাও ভ্রমণে বের হতেন ও মরু প্রান্তরে বসে পানির প্রয়োজন হয়ে পড়তো, তখন এ হুদহুদকে পানির সন্ধানে প্রেরণ করা হতো।

আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখীর মধ্যে এমন এক বিশেষ যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, জমিনের যত নিচেই পানি থাকনা কেন সে তা জানতে পারত যে, এই জমিনের তলদেশে পানি রয়েছে। অতঃপর হুদহুদ নবী (আ) কে পানির সন্ধান দিত। সে ভিত্তিতে লোকেরা সে জায়গাটি খনন করে পানি বের করে নিতেন। এভাবে একদিন হযরত সোলায়মান (আ) হুদহুদকে আহ্বান করলেন। কিন্তু সে (হুদহুদ) দরবারে হাজির ছিল না। তাকে না পেয়ে সোলায়মান (আ) বললেন, ব্যাপার কি? হুদহুদকে দেখছি না যে, অর্থাৎ সে তো এখানে হাজির নেই অথবা আমার নজরে পড়ছে না। যদি সে অনুপস্থিত থাকে, তবে অবশ্যই ওকে আমি কঠিন শাস্তি দেব। এখানে পাখীটিকে শাস্তি প্রদানের ধমক দেয়া হয়েছে। মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। অথবা আমি তাকে যবেহ করব অথবা সে তার এই অপারগতার কোনো যথাযথ কারণ দর্শাবে, যা তাকে এ শাস্তি থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুদহুদ এসে হাজির হলো, অর্থাৎ সে (হুদহুদ) অল্পসময় অনুপস্থিত ছিল। সোলায়মান (আ)-এর এ ঘোষণার একটু পরেই হুদহুদ এসে উপস্থিত হলো এবং সোলায়মান (আ) কে বলল, "আমি এমন একটি বিষয় অবগত হয়ে এসেছি, যা আপনি জানেন না এবং সাবা (সম্প্রদায়) থেকে সুনিশ্চিত (নির্ভরযোগ্য) সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক মহিলাকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখলাম। তাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে এবং তার কাছে এক বিশাল সিংহাসন আছে।

বর্ণিত আছে, 'সাবা' ইয়ামেন দেশের এক বিরাট রাজ্য। সেখানকার রাজত্ব (বাদশাহী) বংশানুক্রমে চলে আসছিল। এভাবে চলতে চলতে পালাক্রমে এক বাদশাহর কন্যা সাবা রাজ্যের সিংহাসনের অধিকারী হন। উক্ত বাদশাহর এ কন্যা ছাড়া আর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। এ কারণে সে (কন্যা) বাদশাহর স্থলাভিষিক্ত হন। সালাবী প্রমুখ (রহ) বলেছেন, এ বিলকীস তাঁর পিতার মৃত্যুর পরে রাজত্ব পরিচালনা করছিলেন। অন্য আর একটি সম্প্রদায় তাদেরকে পরাভূত করে সেখানে জোর-জুলুমের রাজত্ব চালাতে শুরু করল। বিলকীস সেই যালিম বাদশাহর কাছে নিজের বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে তার সাথে বিবাহ বসেন। একদিন বিলকীস যালিম স্বামীকে মদ পান করিয়ে অচেতন অবস্থায় তার দেহ মস্তক থেকে বিচ্ছিন্ন করে কর্তিত মস্তকটি তার দরজায় লটকিয়ে রাখে। তখন লোকেরা এ সাহসিকতার দৃশ্য দেখে বিলকীসকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করে। বিলকীস ছিল সীরাকের কন্যা। এক বর্ণনা মতে তার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

বিলকীস বিনতে সীরাহ ইবনে যী জাদান ইবনে হারেস ইবনে কায়েস ইবনে সায়ফী ইবনে সাবা ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়ারাব ইবনে কুহতান। বিলকীসের পিতা একজন প্রখ্যাত বাদশাহ ছিলেন। তিনি এ ওয়াদা করেছিলেন যে, ইয়ামেনের কোনো মেয়েকে বিবাহ করবেন না। তিনি একজন জিন মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। যার নাম ছিল রায়হানা বিনতে সাকান। তারই গর্ভে ভূমিষ্ট হয়েছিল এই বিলকীস। বিলকীসের শুদ্ধ ও সঠিক নাম ছিল 'তালকামা'। কিন্তু সে বিলকীস নামে পরিচিত।

সালাবী (রহ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিলকীস এর কথা উল্লেখ করায় তিনি বলেন, এমন সম্প্রদায় কখনই সফল হতে পারে না, যারা মহিলাকে নেতা বানায়।

সালাবী (রহ) আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, বিলকীসের পিতা-মাতার মধ্য হতে একজন জিন ছিলেন। হাদীছটি গরীব এবং এর সূত্র দুর্বল।

বোখারী শরীফে ইমাম বোখারী (রহ) আওফ-হাসান সূত্রে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন এ খবর গিয়ে পৌছল যে, পারস্যবাসীরা পারস্য সম্রাটের কন্যাকে তাদের বাদশাহ বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন, এমন জাতি কখনই উন্নতি লাভ করতে পারবে না যারা মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। এই হাদীসের অনুরূপ হাদীস তিরমিযী, নাসাঈ শরীফেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী (রহ) এক হাসান সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুদহুদ বলেছিল, তাকে সবকিছু প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ যে বাদশাহী সিংহাসন বিলকীস লাভ করেছিল, যা হিরা-মোতি ও স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা জড়ানো ছিল। তারপর হুদহুদ পাখী সোলায়মান (আ)-এর কাছে বিলকীসের নাফরমানীর কথা উল্লেখ করে বলেছে যে, শয়তান বিলকীসকে আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে ভুলিয়ে রেখেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা যমীনে উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মানুষ যা কিছু গোপন করে, যা প্রকাশ করে, সবকিছুই তিনি (আল্লাহ) বেশি জানেন। অর্থাৎ সকল অনুভূতি তিনি জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি'। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে আরশে আজীম (মহান আরশ), এর মোকাবিলায় সমস্ত সৃষ্টি একত্র হয়েও যদি আরশ তৈরি চেষ্টা করে, তাতেও ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ তারা কোনোভাবেই পারবে না। তারা (সাবা সম্প্রদায়) আল্লাহ তা'আলার পরিবর্তে সূর্যের পূজা করাকে উপাসনা (ইবাদত) মনে করতো। হুদহুদ এ খবর বিস্তারিতভাবে সোলায়মান (আ)-কে অবগত করেছিল। তখন হযরত সোলায়মান (আ) এক খানা পত্র তার কাছে প্রেরণ করলেন। যে পত্রখানায় আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকে আহ্বান করা হয়েছিল। পত্রে তাকে এ আহ্বানও জানানো হয়েছিল যে, তুমি আমার শাসন মেনে চলো এবং বিনয়ের সাথে আমার কাছে এসে উপস্থিত হও। যেমন তিনি বলেন, আমার উপর দিয়ে গর্ব করো না। অর্থাৎ আমার আনুগত্য থেকে ফিরে থেক না; বরং আমার অনুগত হয়ে আমার কাছে চলে এসো। অর্থাৎ বিনা দ্বিধায় আমার কাছে দ্রুত উপস্থিত হওয়াকে তোমার জন্য কল্যাণ মনে করে লও। অতঃপর হুদহুদ পাখী সোলায়মান (আ)-এর পত্র নিয়ে বিলকীসের কাছে পৌছল। এ ঘটনার পর থেকেই পাখীর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ চালু হয়। সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ সুরাইয়া তারকার সাথে যেমন তুলনা হয় না নিম্নস্তরের মাটির সাথে, তেমনি তুলনা হয় না সোলায়মান (আ)-এর এ পত্রের সাথে অন্য কোনো পত্রের। হুদহুদ পাখী হযরত সোলায়মান (আ)-এর এমন অনুগত ছিল, যেমন অনুগত থাকে কোনো অনুগত আজ্ঞাবহ দাস তার মালিকের।

মুফাসসিরগণ বলেন, পাখীটি পত্র নিয়ে বিলকীসের রাজ প্রাসাদে পৌছে দেখতে পেল যে, বিলকীস তাঁর শয়ন কক্ষে নিরিবিলি বসা আছেন। হুদহুদ পাখী পত্রখানা তার সামনে রেখে কক্ষের এক কোণায় দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। হুদহুদ দেখল, বিলকীস পত্রখানা পাঠ করে এ সম্পর্কে পরামর্শ করা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তার পরিষদবর্গ রাজ দরবারে একত্রিত করলেন। বিলকীস তাদের সামনে সোলায়মান (আ)-এর পত্রের বিষয়গুলো পাঠ করে শুনালেন। পত্র পাঠ শেষে বিলকীস সবার কাছে এ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তারপর বিলকীস অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার পরিষদবর্গ ও উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের পরামর্শ ছাড়া আমি একা

কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। তারা তাদের সম্রাজ্ঞী বিলকীসকে বললেন, যদি আপনার যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকে তবে আপনি জেনে রাখুন, আমরা যুদ্ধে খুব পারদর্শী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ও সাহসী। তারপরও আপনি যে সিদ্ধান্ত দিবেন সেটাই আমরা আন্তরিকভাবে মেনে নেব। সুতরাং আপনি নিজেই আমাদের ও আপনার কল্যাণের কথা চিন্তা করে যেটা ভাল মনে করবেন সেটাই গ্রহণ করুন। অতঃপর বিলকীস এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন, যে সিদ্ধান্ত তাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে উত্তম ও সঠিক ছিল। বিলকীস নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, এ পত্র প্রেরক সোলায়মান (আ)-এর কখনই পরাজয় হতে পারে না। তাঁর সাথে মোকাবিলা করেও বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয়। তাদের বিরোধিতাও করা যায় না এবং তাদের সাথে কোনো প্রতারণা করাও যায় না। সর্বদিক বিবেচনা করে বিলকীস বললেন, রাজা বাদশাহদের এটা বৈশিষ্ট্য যে, যখন তারা কোনো জনপদে প্রবেশ করেন তখন সেটাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এরাও এরূপ করবে। অর্থাৎ বাদশাহ যদি এ রাজ্যে প্রবেশ করেন তবে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আমাদের অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। আর সকল প্রকার কঠোরতা, ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আমার উপরই বর্তাবে। সুতরাং তাদের কাছে কিছু উপহার সামগ্রী প্রেরণ করে দেখি প্রেরিত লোকেরা কি খবর নিয়ে ফিরে আসে। অর্থাৎ বিলকীস তার রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে প্রচুর উপহার সামগ্রী প্রদান করে এর বিনিময়ে সোলায়মান (আ)-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিল। তার ধারণা ছিল এ মূল্যবান উপহার পাওয়ার পর হয়তো সোলায়মান (আ) এর রাগ কিছু প্রশমিত হতে পারে এবং তার প্রতি একটু নমনীয় হতে পারেন। কিন্তু বিলকীসের জানা ছিল না যে, হযরত সোলায়মান (আ) একজন মুসলমান। তিনি কাফিরের উপহার গ্রহণ করবেন না। এতদ্ব্যতীত তার সৈন্য বাহিনীর জন্য বিলকীসের গোটা বাহিনীকে বিনাশ করে দেয়া কোনো ব্যাপারই ছিল না। এ কারণে 'যখন দূত সোলায়মান (আ)-এর কাছে আগমন করল, তখন সোলায়মান (আ) বললেন, তোমরা কি ধন-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তুর থেকে বেশি উত্তম। বরং তোমরা তোমাদের উপহার নিয়ে সুখে থাক। অথচ এ উপহার সামগ্রী ছিল প্রচুর ও অতিমূল্যবান রত্নসম্ভার। যার বর্ণনা মুফাসসিরগণ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপর সোলায়মান (আ) বিলকীসের দূতকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে বলে দিলেন, তার কাছে ফিরে যাও। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এমন এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করব, যার প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে লাঞ্ছিত করে সেখান থেকে বহিষ্কার করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (তিনি দূতকে বললেন) এ উপহার সামগ্রী নিয়ে যাও। যার কাছে তোমরা এই উপহার নিয়ে এসেছ, তাকে আল্লাহ তা'আলা এর চেয়ে উত্তম ও মূল্যবান বস্তু দান করেছেন। আমি তোমাদের মোকাবিলা করার জন্য সৈন্যবাহিনীসহ আসছি। যার মোকাবিলা করার দুঃসাহস তোমাদের নেই। আল্লাহর নবীর এই ঘোষণা যখন তারা বিলকীসের কাছে নিয়ে পৌঁছাল, তখন বিনয়ের সাথে সোলায়মান (আ)-এর অনুগত হওয়া ছাড়া তার জন্য আর কোনো পথ ছিল না। বিলকীসের আগমনের খবর পেয়ে হযরত সোলায়মান (আ) যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তার বর্ণনা কুরআন মাজীদে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন— সোলায়মান আরো বলল, হে আমার পরিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে? এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান হতে ওঠার পূর্বেই আমি সেটা এনে দিব এবং এ কাজে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি সেটা আপনাকে এনে দেব। সোলায়মান যখন সেটা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন, তখন সে বলল, এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ।

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিজেরই মঙ্গলের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, আমার প্রতিপালক দয়ালু, মহানুভব। সোলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করে পরিবর্তন করে দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায় কিনা? সেই নারী যখন আসল, তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, এটা তো যেন সেটাই। আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা

হয়েছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করতো তা-ই তাকে সত্য হতে বিরত রেখেছে। সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে সেটা দেখল তখন সে সেটাকে এক গভীর জলাশয় মনে করল এবং সে তার পদদ্বয় অনাবৃত করল। সোলায়মান বলল, এতো স্বচ্ছ স্ফটিকমন্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম, আমি সোলায়মানের সাথে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি।

-সূরা নামল : ৩৮-৪৪

হযরত সোলায়মান (আ) একজন শক্তিশালী জিনকে বিলকীসের সেই রাজ সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য বললেন, যে সিংহাসনটি বিলকীস রাজ দরবারে বসে নিজে ব্যবহার করতেন। সোলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীসের আগমনের পূর্বে সিংহাসনটি নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলে এক শক্তিশালী জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। অর্থাৎ আপনার দরবার শেষ হওয়ার পূর্বেই তা আমি এনে দেব। বর্ণিত আছে যে সোলায়মান (আ)-এর দরবার ও মজলিস দ্বিপ্রহরের পূর্বেই শেষ হয়ে যেত। জিনটি বলল, এ পূর্বেই আমি সেই দূরদেশ থেকে সিংহাসনটি এনে হাজির করবই। আমি এ কাজে বিশ্বস্ত ও ক্ষমতাবান। অর্থাৎ আমি বিলকীসের সিংহাসনটি আপনার কাছে পৌছে দেয়ার যোগ্যতা ও শক্তি রাখি। আর সিংহাসনে যে সব হিরা, মোতি ও স্বর্ণ-রৌপ্য রয়েছে, সেসব কিছু যথাযথভাবে বিশ্বস্ততার সাথে আপনার কাছে পেশ করব। (অর্থাৎ তার থেকে কিছু আত্মসাৎ করব না)।

কিতাবের ইলম যার ছিল সে বলল অর্থাৎ এ কথাটি যে বলেছিল, তিনি ছিলেন অন্য আর একজন জিন, যাকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ মত এই যে, ইনি ছিলেন, সোলায়মান (আ)-এর খালাতো ভাই। তার নাম ছিল আসাফ ইবনে বারখিয়া। এক বর্ণনাতে তিনি ছিলেন মানুষ। এক বর্ণনা মতে ইনি জিনদের মধ্যে একজন মুমিন জিন। তিনি 'ইসমে আযম' জানতেন। কারো মতে, ইনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলেম। এ সম্পর্কে একটি দুর্বল বর্ণনা রয়েছে যে, ইনি ছিলেন হযরত সোলায়মান (আ) নিজেই।

আল্লামা সোহাইলী (রহ) বলেছেন, বাক্যের বাহ্যিক বর্ণনায় এ অভিমতটি সম্পূর্ণরূপে ভুল ও অযৌক্তিক। কেউ কেউ এরূপ মতও প্রকাশ করেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ)।

যিনিই হন না কেন তিনি বলেছেন, আমি সিংহাসনটি আপনার কাছে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই নিয়ে আসব। উল্লিখিত কথাটির ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. আপনার দূত আপনার দৃষ্টির শেষ সীমানায় পৌছে পুনরায় আপনার কাছে এসে পৌছার পূর্বেই আমি সিংহাসনটি আপনার কাছে এনে দিব।

২. আপনার মজলিসের সর্বশেষ প্রান্তে যে লোকটি আপনার চোখের দৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, সে লোকটি আপনার কাছে এসে পৌছতে যতটুকু সময় লাগবে, সে সময়ের পূর্বেই আমি সিংহাসনটি এনে দেব।

৩. আপনার মজলিসের সর্বশেষ প্রান্তের লোকটির প্রতি আপনার দৃষ্টি একাধারে যতক্ষণ (বিনা পলকে) রাখতে পারবেন, ততটুকু সময়ের পূর্বেই আমি বিলকীসের সিংহাসন আপনার কাছে এনে দেব।

৪. তবে সব চাইতে বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে, আপনার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে চোখ বন্ধ করার পূর্বে বিলকীসের সিংহাসনটি খুব দূরে হওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছে এনে হাজির করব।

হযরত সোলায়মান (আ) আল্লাহ তা'আলার কুদরত প্রত্যক্ষ করলেন যে, তিনি সিংহাসনটিকে তার কাছে দেখলেন। অর্থাৎ সোলায়মান (আ) বিলকীসের সিংহাসনটি তার চোখের পলক ফেলার সময়ের মধ্যেই পেয়ে গেলেন। অথচ এই সিংহাসনটি ছিল সুদূর ইয়ামানের শহরে। ইয়ামান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সিংহাসনটি এত অল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখন সোলায়মান (আ) বললেন, এটা আমার প্রভুর অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। আর যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তা তো তার নিজের

কল্যাণের জন্যই করে। অর্থাৎ এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা তিনি (কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী) নিজেই উপকৃত হবেন। আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক! আমার প্রভু অমুখাপেক্ষী মেহেরবান। অর্থাৎ আল্লাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের কৃতজ্ঞতার মুখাপেক্ষী নন এবং কাফেরদের কুফরী ও অবাধ্যতায় তার বিন্দুপরিমাণও ক্ষতি নেই। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আ) একটি জিনকে নির্দেশ দিলেন যে, এই সিংহাসনটি যে রূপে সাজানো আছে, তা পরিবর্তন করে অন্যরূপে সাজাও। যাতে আমরা বিলকীসের দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের পরিচয় পেতে পারি। এ কারণে সোলায়মান (আ) বলেছিলেন, আমরা দেখব বিলকীস সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যখন রাণী আসলো তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সিংহাসনটি কি এরূপ? বিলকীস বলল, মনে হচ্ছে 'এটাই সেটি'। বিলকীসের বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর এ কথাই প্রকাশ করেছে যে, বিলকীস নিশ্চিতভাবে বলেননি যে, এ সিংহাসনটি আমারই। কারণ তার ধারণায় তার সিংহাসটি তো সুদূর ইয়ামানে রেখেই এসেছিল এবং সে এটাও জানত না যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরূপ কুদরত সংঘটিত হতে পারে। এ কারণে সে বলেছিল, এটা সেটার প্রায় কাছাকাছি, মনে হচ্ছে যেন সেটাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর সেই অনুগ্রহের কথা বলছেন, যা বিলকীস নিজেই স্বীকার করেছে।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে—

وَ أُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۞

অর্থ : আমাদের ইতোপূর্বেই (সোলায়মান (আ)-এর মাহাত্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে) জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল এবং আমরা আত্মসমর্পণও করেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করতো, (সোলায়মান) তার থেকে তাকে নিবৃত্ত করেছিল, সে ছিল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। -সূরা নামল : ৪২-৪৩

অর্থাৎ সোলায়মান (আ) তাকে সূর্যের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকার জন্য বলেছিলেন। বিলকীস তার সম্প্রদায়সহ সূর্যের উপাসনা করতো। এ সূর্যের পূজা করতো সে তার পিতৃপুরুষদের অনুকরণে। এছাড়া তার কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোনো দলীল বা নিদর্শন ছিল না।

বিলকীস সোলায়মান (আ)-এর কাছে আগমনের আগেই সোলায়মান (আ) জিনদেরকে একটি প্রাসাদ সুন্দর করে নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে প্রাসাদটি হবে কাঁচ দ্বারা বেষ্টিত। এবং এর নিচে থাকবে ঝর্ণা, যাতে পানি প্রবাহিত হতে থাকবে। সে পানিতে থাকবে বিভিন্ন রকমের মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। ঝর্ণার উপরটি কাঁচ দ্বারা আবৃত থাকবে। এরূপেই প্রাসাদ নির্মাণ করা হলো। বিলকীস আগমন করলে হযরত সোলায়মান (আ) তাকে সেই প্রাসাদে প্রবেশ করার জন্য বললেন।

হযরত সোলায়মান (আ) পূর্বেই সেই নব নির্মিত প্রাসাদে তাঁর শাহী তখতে (রাজ সিংহাসনে) উপবিষ্ট ছিলেন। কাঁচের নিচ থেকে পানি এমন স্বচ্ছতার সাথে প্রবাহিত হতেছিল যে, উপরের কাঁচ নজরেই আসছিল না।

বিলকীস যখন তা (প্রাসাদ) দেখলো তখন সেটাকে একটি পানির হাউজ মনে করে সে কাপড় উন্মোচন করে তার পদদ্বয় অনাবৃত করল। সোলায়মান বললেন, এটা এমন এক প্রাসাদ যার ভিত্তিই হয়েছে কাঁচ দ্বারা। তখন বিলকীস বলল, ۞ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ : হে পরওয়ারদেগার! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি, (এখন) আমি সোলায়মানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনলাম। -সূরা নামল : ৪৪

বর্ণিত আছে, তখন অনেক জিনেরা চেয়েছিল যে, বিলকীস তার পদদ্বয় থেকে কাপড় উন্মোচন করুক, যাতে তার পায়ের গোছায় যে পশম রয়েছে, তা সোলায়মান (আ)-এর নজরে পড়ে যায়। এতে হয়তো সোলায়মান

(আ) বিলকীসকে বিয়ে করতে রাজি হবেন না। কারণ বিলকীসের মা ছিল একজন জিন। যদি বিলকীসকে হযরত সোলায়মান (আ) বিয়ে করেন, তবে জিনদের উপর বিলকীসের কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে যাবে। কয়েকজন মুফাসসির বর্ণনা করেছেন, বিলকীসের পা ছিল পশুর ক্ষুরের মতো। এ বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। আর প্রথম বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারেও সন্দেহ আছে।

বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আ) যখন বিলকীসকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন, তখন প্রথমে বিলকীসের পায়ের গোছার পশম কিভাবে ফেলে দেয়া যায়, সে ব্যাপারে লোকদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, লোকেরা কাঁচি অথবা ক্ষুর দ্বারা পশমগুলো কেটে ফেলার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বিলকীস এতে কোনোভাবেই রাজি হলেন না। তারপর সোলায়মান (আ) এ ব্যাপারে জিনদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তারা পশম বিনাশকারী এক প্রকার মলম বানিয়ে দিল। (যা বর্তমানে অনেক মহিলারাও ব্যবহার করে থাকে)। অতঃপর জিনেরা তাঁর জন্য একটা হাম্মামখানা (গোসলখানা) নির্মাণ করে। তিনি হাম্মামখানায় প্রবেশ করেই তার উষ্ণতা অনুভব করেন এবং তখন তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, উহ! কষ্ট, কষ্ট। সাবাঈ প্রমুখ (র) বলেন, হযরত সোলায়মান (আ) বিলকীসকে বিয়ে করার পরে তাকে ইয়ামেনের রাণী হিসেবেই বহাল রাখেন এবং তাকে ইয়ামেনে পাঠিয়ে দেন। তারপর সোলায়মান (আ) প্রতি মাসে তিন দিন বিলকীসের কাছে অবস্থান করেন। তিনি বিলকীসের কাছে তিন দিন থাকার পর চলে আসতেন।

সোলায়মান (আ) তার বিশেষ বাহন বায়ুচালিত সিংহাসনে যাতায়াত করতেন। তিনি জিনদেরকে তাঁর জন্য ইয়ামানে তিনটি প্রাসাদ তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে প্রাসাদ তিনটির নাম ছিল, গামদান, বায়তুন ও সালেহীন।

ইবনে ইসহাক (রহ) হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, সোলায়মান (আ) বিলকীসকে বিয়ে করেননি; বরং তিনি বিলকীসকে হামদানের বাদশাহর সাথে বিয়ে করিয়ে দেন এবং তাকে ইয়ামেনের রাণী হিসেবে বহাল রাখেন। সোলায়মান (আ) জিনের বাদশাহ যাওবাকে বিলকীসের অনুগত করে দিয়েছিলেন। তবে প্রথম বর্ণনাটি শুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ۭ نِعْمَ الْعَبْدُ ۭ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ۝ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝ فَقَالَ اِنِّىْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝ رُدُّوْهَا عَلَىَّ ۭ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰي كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

অর্থ : আমি দাউদকে দান করলাম সোলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে ধাবনোদ্যত (দ্রুতগামী) উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হলো, তখন সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। (তিনি হুকুম দিলেন যে) এগুলোকে পুনরায় আমার সামনে আনয়ন করো। তারপর সে এগুলোর পদ ও তলদেশ ছেদন করতে লাগল। আমি তো সোলায়মান কে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ, তারপর সোলায়মান আমার অভিমুখী হলো। –সূরা সোয়াদ : ৩০–৩৪

সোলায়মান (আ) বললেন—

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۝ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۝ هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে দান করো এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়। তুমি তো পরম দাতা! তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো এবং শয়তানদেরকে (অর্থাৎ জিনদেরকে) যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং সুশৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেকে। এসব আমার অনুগ্রহ, এ থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এজন্য তোমাকে হিসেব দিতে হবে না এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। –সূরা সাদ : আয়াত ৩৫–৩৯

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে (পুত্র হিসেবে) দান করেছিলেন। এরপরেই আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রশংসা করেছেন যে, সে ছিল উত্তম বান্দা ও সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। অর্থাৎ তাঁর অন্তর সদা-সর্বদা আল্লাহ তা'আলার দিকেই নিবিষ্ট থাকতো।

তিনি আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে খুব ক্রন্দন করতেন এবং তাঁর নির্দেশাবলীর পূর্ণ অনুসরণ করতেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর উৎকৃষ্ট ঘোড়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যে ঘোড়াটি ছিল দ্রুতগতিযুক্ত। অর্থাৎ সেটি তিন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে চতুর্থ পাও উপরের দিকে জাগিয়ে রাখে। উৎকৃষ্ট জাত এবং দ্রুতগামী ঘোড়ার এটা ছিল বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এভাবে যে ঘোড়া দাঁড়াবে, বুঝতে হবে সে ঘোড়াটি উত্তম ও উৎকৃষ্ট ঘোড়া এবং সেটি দ্রুতগামী। তখন সে বলল, "আমি তো আমার প্রভুর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এ দিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। (এরপর বললেন) এগুলো পুনরায় আমার সামনে আনয়ন করো। অতঃপর সে সেগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল। অর্থাৎ ঘোড়াগুলোর গলদেশ ও গোড়ালীর উপরের অংশ (চামড়া) ছুরি দিয়ে কর্তন করতে লাগলেন। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে পর্দার আড়ালে চলে গেছে, এর অর্থ সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।'

কথিত আছে, হযরত সোলায়মান (আ) ঘোড়াগুলোর দেখাশুনায় এত মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর আসরের ওয়াক্ত চলে গিয়েছিল এবং সূর্যও অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত আলী (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী (রা) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। উপরিউক্ত ঘটনায় বাহ্যিকভাবে যদিও প্রতীয়মান হয় যে, বিনা ওযরে ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়া অর্থাৎ যথাসময়ে আদায় না করা কিভাবে জায়েয হতে পারে? আমি এর জবাবে বলতে চাই যে, হয়তো হযরত সোলায়মানের শরীয়তে (নামাযে) এভাবে দেরি করার অবকাশ ছিল। আর জিহাদে ব্যবহার করার জন্য ঘোড়াগুলোকে দেখাশুনা করতে গিয়ে তাঁর নামাযে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল।

কোনো কোনো আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাযে একটু বিলম্ব করেছিলেন। আর তখন সেটা শরীয়তে বৈধ ছিল। অতঃপর 'সালাতুল খাওফ' (ভয়ের নামায) দ্বারা তা রহিত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রমুখ এ অভিমত পোষণ করেন। আমি এর বিশদ ব্যাখ্যা তাফসীরে ইবনে কাসীরের সূরা নিসায় 'সালাতুল খাওফে' বর্ণনা করেছি।

কিছু সংখ্যক আলেমের মতে ভুলবশত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খন্দকের দিন আসরের নামাযে বিলম্ব হয়েছিল। তাঁরা (আলেমগণ) হযরত সোলায়মান (আ)-এর এ কাজটিও (নামাযে বিলম্ব হওয়া) ভুলবশত হয়েছিল বলে বর্ণনা করেন।

উক্ত ব্যাখ্যা তাঁরাই বর্ণনা করেছেন, যারা আড়ালে যাওয়ার অর্থ, সূর্য অস্তমিত হওয়া বলেছেন। কয়েকজন মুফাসসির এর বিপরীতে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী توارت بالحجاب এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'ঘোড়াগুলো আড়াল হয়ে গিয়েছে।' আর তাদের মতে সময় (ওয়াক্ত) শেষ হয়েছিল না। 'সে ঘোড়াগুলোর পদ ও গলদেশ ছেদন করল।" এর অর্থ হচ্ছে, ঘোড়াগুলোর গলদেশ ও পায়ের গোড়ালীর ঘাম তিনি মুছিয়ে দেন'। হযরত ইবনে জারির (র.) এরূপ অর্থ বর্ণনা করেছেন। উবাই (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ ঘাম মুছিয়ে দেয়ার

বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে জারিরের (র.) এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করার কারণ এই যে, একজন নবী বিনা কারণে তাঁর কোনো সম্পদ নষ্ট করতে পারেন না এবং বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করতে পারেন না। তবে এ যুক্তিপূর্ণ কথায় কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, হতে পারে এটা তাঁর শরীয়তে বৈধ ছিল। যেমন আমাদের কয়েকজন আলেম বলেন, যদি কোনো মুসলমান এ ভয় করে যে, তার পশু, বকরী, ভেড়া ও অন্যান্য জন্তুসমূহ কাফেরদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, তখন সেগুলোকে জবেহ করে শেষ করে দেয়া মুসলমানদের জন্য এ কারণে বৈধ, যাতে সেগুলো দ্বারা কাফেররা কোনো প্রকার শক্তি অর্জন না করতে পারে।

হযরত জাফর ইবনে আবী তালেবের (রা) মৃতার যুদ্ধে ঘোড়াগুলো হত্যা করার কারণ এটাই ছিল। বর্ণিত আছে, সোলায়মান (আ)-এর ঘোড়ার সংখ্যা ছিল অনেক। কারো মতে দশ হাজার, কারো মতে বাইশ হাজার। এ ঘোড়াগুলোর মধ্যে বিশটি ঘোড়া ছিল ডানা বিশিষ্ট অর্থাৎ দ্রুতগামী।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ হতে মদীনায় ফিরে এসে যখন নিজ গৃহে তাশরীফ আনলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা)-এর আলমারীর পর্দাটি বাতাসে সরে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-এর কাপড়ের পুতুলগুলো দেখতে পেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এগুলো কী? আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, এগুলো আমার কাপড়ের পুতুল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে পুতুলগুলোর মধ্যে দু'ডানা বিশিষ্ট একটি ঘোড়া দেখে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়াটির উপরে ডানা কিসের? আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেননি যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর ঘোড়ার ডানা ছিল? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপভাবে হাসলেন যে, আমি তাঁর মাড়ির দাঁত মোবারক দেখতে পেলাম।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, যখন হযরত সোলায়মান (আ) ঘোড়াগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ছেড়ে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে উত্তম বস্তু প্রদান করেন। অর্থাৎ বায়ুকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর অনুগত করে দেন। ফলে বায়ু এক প্রাতকালে এক মাসের পথ এবং এক বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করতে পারতেন। আবু দাহমা (রহ) ও আবু কাতাদাহ (রহ) হতে বর্ণিত আছে, এরা দু'জন বহুবার বায়তুল্লাহ ভ্রমণ করেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা কোনো এক সফরে জনৈক বেদুঈনের কাছে পৌঁছলাম। সে আমাদের কাছে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে আমাকে ইলম (দ্বীন) শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার ভয়ে তুমি যে বস্তু পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তার বিনিময় তার চেয়েও উত্তম বস্তু প্রদান করবেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী, "আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; তারপর সে (সোলায়মান) আমার অভিমুখী হলো।" ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম (রা)-সহ অনেক মুফাসসির বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর বেশির ভাগ বরং সবগুলোই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগৃহীত। এর অধিকাংশ মনগড়া আজব কিসসা কাহিনী। এ ব্যাপারে আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে সাবধান করে দিয়েছি। এখানে আমি শুধু আয়াতের উল্লেখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছি। ইসরাঈলী বর্ণনানুযায়ী হযরত সোলায়মান (আ) তাঁর শাহী সিংহাসন থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর ফিরে আসেন। এরপর তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়। সুতরাং খুব মজবুত করে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করা হয়েছিল। আমি প্রথমে আলোচনা করেছি বায়তুল মুকাদ্দাসের সর্ব প্রথম নির্মাতা ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)। এ সম্পর্কে হযরত আবু যার (রা)-এর একখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু যার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করে ছিলেন, সর্বপ্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মসজিদে হারাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ। আবু যার (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দুটি মসজিদের নির্মাণের মধ্যে কত পরিমাণ সময়ের ব্যবধান? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, চল্লিশ বছরের ব্যবধান। আর এটা তো স্পষ্ট যে, কাবা ঘরের প্রতিষ্ঠাতা হযরত

ইবরাহীম (আ) ও হযরত সোলায়মান (আ)-এর মাঝে সময়ের ব্যবধান এক হাজার বছরের চেয়েও বেশি। সুতরাং এ কথাটিই যথাযথ যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৌহিত্র হযরত ইয়াকুব (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার পরে আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন রাজত্ব কামনা করেছেন, যেরূপ রাজত্ব (বাদশাহী) তাঁর পরে অন্য আর কাউকে দেয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনে খুজায়মা, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (রহ) সনদ (সূত্র)-সহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সোলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস প্রতিষ্ঠা করার সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি বিষয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। আমরা কামনা করছি যে, তৃতীয় বিষয়টি আমাদের জন্য কবুল হোক। তিনি একটি দো'আ করেছিলেন যে, তাঁকে এমন ফায়সালা বা মীমাংসা করার যোগ্যতা দান করা হোক, যে ফায়সালা আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হুকুমের বাইরে যেন তাঁর কোনো ফায়সালা না হয়)।

দ্বিতীয় দো'আ করেছিলেন, তাঁকে এমন রাজত্ব প্রদান করা হোক, যেন তেমন রাজত্ব তাঁর পরে আর কাউকে দান করা না হয়। তাঁর এ দুটো দো'আই কবুল করা হয়েছে।

তৃতীয় দো'আ করেছিলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে বের হবেন এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে এ মসজিদে নামায আদায় করা, তার পাপসমূহ এভাবে ক্ষমা করে দেয়া, মনে হবে যেন সে ঐদিন সদ্য প্রসূতের মতো সর্ব প্রকার পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আশা করি, আমাদের জন্যে এ তৃতীয় দোয়াটি কবুল করা হয়েছে অর্থাৎ পবিত্র কাবা ঘরে নামাযের জন্যে।

হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রথম দোয়া ছিল, "হে আল্লাহ! আমাকে এমন ফায়সালা করার যোগ্যতা দান করুন, যে ফায়সালা আপনার ফায়সালার অনুরূপ।" (অর্থাৎ যে ফায়সালার প্রতি আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে) এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান (আ) ও তাঁর পিতার ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন– আমি ঐ নেয়ামত দাউদ ও সুলায়মানকেও দিয়েছিলাম। তারা দু'জন যখন একটা ক্ষেতের মামলায় ফায়সালা দিচ্ছিলেন, যে ক্ষেতে রাতের বেলায় গোত্রের ছাগলগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন আমি তাদের বিচার দেখছিলাম। ঐ সময় আমি সুলায়মানকে সঠিক ফায়সালা বুঝিয়ে দিলাম, আর আমি দু'জনকেই হুকুম ও ইলম দিয়েছিলাম। –সূরা আম্বিয়া : ৭৮-৭৯

কাজী শুরায়হ (রহ) ও অন্যান্য প্রাচীন যুগের আলেমগণ উপরিউক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন, এক গোত্রের একটি আঙ্গুর বাগান ছিল। কোনো এক রাতে অন্য এক গোত্রের কতগুলো বকরী সে বাগানে প্রবেশ করে আঙ্গুর গাছগুলো শেষ করে ফেলল। উভয় গোত্রে হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে ফায়সালার জন্য উপস্থিত হলো। দাউদ (আ) বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ একটা মূল্য নির্ধারণ করে বাগানের মালিককে দিয়ে দেয়ার জন্য বকরীর মালিককে নির্দেশ দিলেন। ফায়সালার পরে তারা উভয় গোত্র বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। পথে হযরত সোলায়মান (আ)-এর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর নবী তোমাদের জন্য কি মিমাংশা করেছেন? তারা বলল, এরূপ মিমাংশা করেছেন। সোলায়মান (আ) বললেন, যদি আমি এর ফায়সালা করতাম তবে এভাবে করতাম যে, বকরীগুলো বাগানের মালিককে দিয়ে দিতাম। সে বকরীগুলো পালন করে সেগুলোর বাচ্চা ও দুধ দ্বারা উপকৃত হতে থাকতো, আর আঙ্গুরসহ বাগানটি বকরীর মালিককে দিতাম। যখন বাগানটি পূর্বের মতো রূপ ধারণ করতো (অর্থাৎ বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে যেরূপ বাগানটি ছিল সেরূপ যখন হতো) তখন বকরীগুলো প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতাম। হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে এ কথা পৌঁছলে তিনি তার পূর্বের মিমাংশা বাতিল করে দেন এবং সোলায়মান (আ)-এর মিমাংশা অনুযায়ী রায় প্রদান করেন।

উল্লিখিত ঘটনার অনুরূপ বোখারী ও মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দুই মহিলা নিজ নিজ শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে একত্রে কোথাও যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে একটি সন্তানের উপর আক্রমণ করে শিশুটিকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। অবশিষ্ট

সন্তানটি সম্পর্কে দুই মহিলা নিজের সন্তান দাবি করে ঝগড়া করতে লাগল। বড় মহিলাটি ছোট মহিলাটিকে বলল, তোমার সন্তান বাঘে নিয়ে গেছে। এ অবশিষ্ট সন্তানটি আমার। ছোট মহিলাটি বড় মহিলাকে বলল, তোমার কথা মিথ্যা। বরং তোমার সন্তানটি বাঘে নিয়ে গেছে। এটি আমার সন্তান। অবশেষে উভয় মহিলা মিমাংশার জন্য হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে চলে গেল। দাউদ (আ) উভয়ের কথা শুনে শিশুটি বড় মহিলাকে দিয়ে দিলেন। মিমাংশা শেষে উভয় (মহিলা) বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো। এ সময় হযরত সোলায়মান (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি এ মিমাংসার কথা শুনে বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা করো। তিনি একখানা ছুরি এনে বললেন, আমি শিশুটিকে দু'টুকরো করে তোমাদের উভয়কেই দিয়ে দিচ্ছি। এ কথা শোনামাত্রই ছোট মহিলা বলে উঠল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। শিশুটিকে আপনি হত্যা করবেন না। ওটি তারই। তাকে দিয়ে দিন। এ কথা শুনে হযরত সোলায়মান (আ) শিশুটিকে ছোট মহিলাকে দিয়ে দিলেন। কারণ শিশুটিকে হত্যা করা তার আপন মায়ের আদৌ সহ্য হয়নি। তাই প্রমাণিত হয়ে গেছে শিশুটির আপন মা কে?

সম্ভবত তাঁদের শরীয়তে উভয় প্রকার মীমাংসার সুযোগ ছিল। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আ)-এর মীমাংসাটিই অধিক উত্তম ও যথাযথ ছিল। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রথমে হযরত সোলায়মান (আ)-এর মিমাংসার প্রশংসা করেছেন। তারপর দাউদ (আ) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি পাহাড়গুলো ও পাখিদেরকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম, যারা তাসবীহ করছিল। এসব কাজের কর্তা আমিই ছিলাম। তোমাদের উপকারের জন্য আমি তাঁকে বর্ম বানানোর কারিগরি শিল্প শিক্ষা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে একে অপরের আঘাত থেকে বাঁচাতে পারে। তাহলে কি তোমরা শোকরগুযার হবে? আমি সুলায়মানের জন্য প্রবল বাতাসকে অনুগত বানিয়ে দিয়েছিলাম, যা তাঁর হুকুমে ঐ দেশের দিকে বয়ে যেত, যার মধ্যে আমি বরকত রেখেছি। আমি সব বিষয়েই ইলমের অধিকারী ছিলাম। আমি শয়তানের মধ্য থেকে অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তার জন্য ডুবুরির কাজ করতো এবং এ ছাড়া আরো অন্যান্য কাজ করতো। আমিই এসবের তদারককারী ছিলাম।

–সূরা আম্বিয়া : ৭৯-৮২

আল্লাহ তা'আলা সূরা সোয়াদে হযরত সোলায়মান (আ) সম্পর্কে বলেন, 'তখন আমি তার অধীন করে দিলাম বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো এবং শয়তানকে (জিনদেরকে) যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরো অনেকে। এসব আমার অনুগ্রহ। এর থেকে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না। এবং আমার নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। –সূরা সোয়াদ : ৩৬-৪০

হযরত সোলায়মান (আ) যখন আল্লাহ তা'আলার রাজির জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়াগুলোর মায়া অন্তর থেকে দূর করে দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চেয়ে উত্তম বস্তু বায়ুকে তাঁর অধীন করে দিলেন। যে বায়ু দ্রুত গতিযুক্ত ও আরামদায়ক ছিল। সে বায়ু তাঁর নির্দেশে মৃদু গতিতে যেখানে তিনি ইচ্ছা করতেন সেখানেই নিয়ে যেতেন। অর্থাৎ সোলায়মান (আ) যদি কোনো দেশে বা শহরে যেতে ইচ্ছা করতেন, তখন বায়ু তাকে সেখানেই নিয়ে যেত। তাঁর একটা আসন ছিল। যেটি ছিল কাঠ দ্বারা নির্মিত। সেটি এমন এক বিস্ময়কর আসন (সিংহাসন) ছিল যে, হযরত সোলায়মান (আ) যা কিছু আসবাবপত্র চাইতেন, এমনকি নির্মিত প্রাসাদ, এছাড়া অন্যান্য মালপত্র, যেমন ঘোড়া, মানুষ, জিন ও পশুপক্ষী সমস্তকিছু সে আসনে উঠিয়ে নিতে পারতেন এবং বাতাস সে সবসহ আসনটিকে সোলায়মান (আ)-এর নির্দেশে এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে যেত।

ভ্রমণ বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোথাও যেতে হলে তিনি বাতাসকে নির্দেশ দিতেন। সাথে সাথে আসনটি নিচে নেমে আসত। প্রথমে সৈন্যবাহিনী ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আসনে উঠানো হতো। অতঃপর বাতাস আসনটিকে আকাশ ও যমীনের মাঝখানে নিয়ে যেত। তারপর তিনি মৃদু গতিতে চলার নির্দেশ দিলে বায়ু আসনটি নিয়ে ধীর গতিতে চলতে থাকত। যখন সোলায়মান (আ) কোথাও দ্রুত যেতে আগ্রহী হতেন, তখন তিনি বায়ুকে দ্রুত গতিতে চলার নির্দেশ দিতেন। তখন বায়ু আসনটিকে নিয়ে খুব দ্রুত বেগে চলতে থাকতো। তিনি যেখানে যেতে

চুম্বা করতেন, আসনটি সেখানে গিয়ে অবতরণ করতো। তিনি দিনের প্রথম ভাগে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে করে এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত ইসতাখার শহরে দ্বিপ্রহরে গিয়ে পৌঁছতেন এবং দিনের বেলা দীর্ঘ সফর শেষ করে সন্ধ্যার সময় পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস এসে পৌঁছতেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন— আর সোলায়মানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছি। সকালে তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত এবং সন্ধ্যায় তার চলা এক মাসের পথ পর্যন্ত। আমি তার জন্য গলিত তামার ঝরণা বহমান করে দিয়েছি। আর এমন সব জিনকে তার অধীন করে দিয়েছি, যারা তার রবের হুকুমে তার সামনে কাজ করতো। তাদের মধ্যে যে আমার হুকুম অমান্য করতো তাকে আমি জ্বলন্ত আগুনের আযাবের মজা ভোগ করতে দিতাম। তিনি যা চাইতেন তারা তা-ই তৈরি করতো, উঁচু উঁচু দালান, ছবি১, পুকুরের মতো বড় বড় থালা এবং এমন বিরাট ডেগ, যা নড়ানো যায় না।

হযরত সোলায়মান (আ) সকালে দামেশক থেকে যাত্রা করে দ্বিপ্রহরে ইসতাখার শহরে গিয়ে পৌঁছতেন এবং সেখানে দুপুরের খানা খেতেন। তারপর বিকেল বেলা সেখান থেকে যাত্রা করে কাবুলে গিয়ে রাত যাপন করতেন। দামেশক ও ইসতাখার শহরের দূরত্ব ছিল এক মাসের পথ। অনুরূপ ইসতাখার থেকে কাবুলের দূরত্বও ছিল এক মাসের পথ।

ভূতত্ত্ববিদগণ বলেছেন, জিনেরা হযরত সোলায়মান (আ)-এর জন্য ইসতাখার শহরটি বানিয়েছিল। এখানে প্রাচীনকাল থেকে তুর্কীদের আবাসস্থল ছিল। অনুরূপভাবে আরো কিছু কিছু শহর জিনেরা সোলায়মান (আ)-এর জন্য বানিয়ে ছিল। যেমন তাদামুর (এটি সিরিয়ার কাছে অবস্থিত) বায়তুল মুকাদ্দাস, বাবে বারীদ ও বাবে জাবরুন, যা সিরিয়ায় অবস্থিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন 'আমি তার জন্য গলিত তামার এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদাহ প্রমুখ (রহ.) বলেছেন, কুরআন মাজীদে বর্ণিত قطر (কিত্‌র) দ্বারা তামা বুঝানো হয়েছে। কাতাদাহ (রহ.) বলেছেন, এ তামা ইয়ামানের মাটির নিচে (খনী আকারে) ছিল। আল্লাহ তা'আলা সেগুলো তাঁর জন্য প্রবাহিত করে দেন। সুদ্দী (রহ) বলেছেন, প্রাসাদ ও অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন তা সেই প্রবাহিত তামা দিয়ে তিনদিনের মধ্যে তৈরি করা হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তার প্রভুর অনুমতিক্রমে জিনদের অনেকে তার সামনে কাজ করতো। আর তাদের মধ্যে যারা আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি তাকে (জাহান্নামের) জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ) এর জন্য এমন কতক জিন অবাধ্যগত করে দিয়েছিলেন যে, তারা তাঁর নির্দেশকে কখনই অমান্য করতো না। যখন যে নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হতো তা তারা যথাযথভাবে পালন করতো। যদি কেউ সোলায়মান (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করতো, সাথে সাথে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন। তারা সোলায়মান (আ)-এর জন্য প্রাসাদ ইত্যাদি যা কিছু চাইতেন তা তৈরি করতো। এ অনুগত জিনেরা অতি সুন্দর ও মনোরম প্রাসাদ ও শহর তৈরি করতো এবং প্রাচীর খোদাই করে প্রতিচিত্র (মূর্তি) অঙ্কন করতো। তাঁর শরীয়তে এসব কাজের অনুমোদন ছিল। আর তারা তৈরি করতো বড় বড় পুকুরের ন্যায় পাত্র (থালা)।

ইবনে আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা এরূপই করেছেন। আবার অনেকে হাউজের মতো বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, যিহাক প্রমুখ (রহ) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 'সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদকায় ডেগ' এর অর্থ, এমন বিশাল ডেগ তারা তৈয়ার করতো, যা কোনোভাবেই স্থানান্তরিত করা যেত না। মুজাহিদ (রহ) প্রমুখ এরূপ অর্থ করেছেন। জিন ও বায়ুর অনুগত হওয়া এবং অন্যান্য সব কিছু আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-এর

১. ছবি মানে মানুষ বা পশুর ছবি হওয়া জরুরি নয়। হযরত সোলায়মান (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়াতের অনুসারী ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর শরীয়াতে কোনো জীবের ছবি তৈরি করা তেমনিভাবেই হারাম ছিল, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়াতে হারাম রয়েছে। -সূরা সাবা : আয়াত ১২-১৩

প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ প্রদান করেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য সোলায়মান (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো।"

জিনদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর (অধীন করে দিলাম) শয়তানদেরকে, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী'। অর্থাৎ কোনো কোনো জিন সোলায়মান (আ)-এর জন্য অট্টালিকা নির্মাণে নিয়োজিত ছিল। কোনো কোনো জিন সমুদ্রের তলদেশ থেকে হীরা-মোতি ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিল। কোনো কোনো জিন সোলায়মান (আ)-এর নির্দেশকে অমান্য করার কারণে শিকলাবদ্ধ ছিল। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ)-কে এ সৃষ্টি জগতের এমন কিছু বিষয়ের কর্তৃত্ব দান করেছিলেন, যা তাঁর পরে অন্য আর কোনো বাদশাহকে প্রদান করা হয়নি।

বোখারী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটি জিন শয়তান গত রাতে আমার নামাযের একাগ্রতা বিনষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিনটিকে ধরার শক্তি দিয়েছেন। আমি জিনটিকে ধরে রাখি। যাতে তোমরা সবাই সেটিকে দেখতে পার। কিন্তু হঠাৎ আমার ভাই সোলায়মান (আ)-এর দো'আটি আমার স্মরণ হয়ে গেল।

তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছিলেন, হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন বাদশাহী দান করুন, যেরূপ বাদশাহী আমার পরে অন্য আর কেউ যেন লাভ না করে। এ কারণে আমি জিনটিকে লাঞ্ছিত করে ছেড়েদিলাম। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (রহ.)-ও এ হাদীসটি শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু দারদা (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি তাঁকে (নামায অবস্থায়) এ প্রার্থনা করতে শুনেছি, আমি তোমার থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর লা'নতের দ্বারা তোমাকে লা'নত দিচ্ছি। এভাবে তিনবার তিনি বললেন। তারপর তিনি তাঁর হাত মোবারক এমনভাবে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন মনে হচ্ছিল, যেন তিনি কোনো কিছু ধরতে চাচ্ছেন। নামায শেষ করার পরে আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে নামাযে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি, যা ইতোপূর্বে আমরা আপনাকে আর কোনো নামাযের মধ্যে বলতে শুনিনি। আমরা আপনার হাতকে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতেও দেখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর দুশমন ইবলীস আগুনের একটি শিখা নিয়ে আমার সামনে হাজির হয়েছিল। সে অগ্নিশিখাটি আমার চেহারার উপরে নিক্ষেপ করার জন্য বারবার চেষ্টা করছিল। তখন আমি উপরিউক্ত দো'আটি তিনবার পাঠ করেছিলাম। আমি তিনবার তার প্রতি আল্লাহর লা'নত দিয়েছি। কিন্তু সে কোনোভাবেই পিছপা হচ্ছিল না। তারপর আমি তাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েছিলাম। আল্লাহর কসম! আমার ভাই সোলায়মান (আ)-এর সেই দো'আটি যদি আমার মনে না পড়তো, তবে আমি ইবলীসকে আটক করে রেখে দিতাম এবং সকাল বেলা মদীনার বালকেরা তাকে দিয়ে খেলা করতো। ইমাম নাসায়ী (রহ.) এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ফজরের নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর পিছনে ছিলাম। তিনি ﷺ কিরাআত পাঠ শুরু করলে কিরাআতে কিছুটা অস্পষ্ট লাগল। নামায শেষে তিনি ﷺ বললেন, ইবলীস এখানে এসে হাজির হয়েছিল। (সে আমার কিরাআত উলটে দিতে চেয়েছিল।) আমি হাত বাড়িয়ে তার গর্দান চেপে ধরলাম। তার মুখ থেকে লালা বেরিয়ে আসতে লাগল। এমনকি সেই লালার শীতলতা আমি আমার হাতের আঙ্গুলে অনুভব করি। যদি আমার ভাই সোলায়মান (আ)-এর দো'আ স্মরণ না হতো তবে সেটিকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতাম। সকাল বেলা ওকে নিয়ে মদীনার বালকেরা খেল-তামাশা করতো। সুতরাং যতদূর সম্ভব তোমরা চেষ্টা করবে যে, যাতে তোমার ও কিবলার মাঝে নামায অবস্থায় কেউ অবস্থান না করে। মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ (রহ)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কোনো কোনো বুজুর্গ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর এক হাজার স্ত্রী ছিল। একটি বর্ণনা প্রথমবার এর বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ শক্তি দান করেছিলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একবার সোলায়মান (আ) বলেছিলেন, আজ রাতে আমি (আমার) সত্তর জন স্ত্রীর কাছে গমন করব। আর প্রতিটি স্ত্রী একজন বীর মুজাহিদ ও সাহসী সন্তান জন্ম দেবে। যারা (বড় হয়ে) আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে।

এ সময় সোলায়মান (আ)-এর এক সাথী 'ইনশাআল্লাহ' বলেছিলেন। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আ) ইনশাআল্লাহ বলেননি। তারপর সে রাতে শুধু একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোনো স্ত্রীর গর্ভবতী হননি। আর সে স্ত্রীও একটি অপূর্ণাঙ্গ (হস্ত-পদহীন) সন্তান প্রসব করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তবে প্রতিটি স্ত্রীই পূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করতো ও তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতো।"

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত সোলায়মান (আ) একবার বলেছিলেন, আজ রাতে আমি (আমার) একশত স্ত্রীর কাছে গমন করব। প্রত্যেক স্ত্রী একটি করে সন্তান প্রসব করবে। যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। এ সময় তিনি ইনশাআল্লাহ বলেনি। এরপর একজন স্ত্রী ব্যতীত কোনো স্ত্রীই সন্তান প্রসব করেনি। আর সে স্ত্রীও অপূর্ণাঙ্গ একটি (হস্ত-পদহীন) সন্তান প্রসব করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তবে একশ স্ত্রীর গর্ভে একশ' সন্তানই ভূমিষ্ট হতো। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতো। ইমাম আহমদ এ হাদীসখানা ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইসহাক ইবনে বাশার (রহ.) সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এক মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে যে, হযরত সোলায়মান (আ)-এর চারশ স্বাধীন স্ত্রী ও ছয়শ বাঁদী ছিল। তিনি এই এক হাজার স্ত্রীর কাছে গমনেরই ইচ্ছা করেছিলেন এবং অনুরূপ মন্তব্যই করেছেন। কিন্তু অবশেষে মাত্র একজন স্ত্রী একটি অপূর্ণাঙ্গ (হস্ত-পদহীন) সন্তান প্রসব করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সময়ও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু এ বর্ণনা ইসহাক ইবনে বাশারের সনদের কারণে দুর্বল। কারণ এ ব্যক্তি বিশ্বস্ত নন।

হযরত সোলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা রাজত্বের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। তাঁর রাজত্বও ছিল সম্পূর্ণ প্রশস্ত। সৈন্য-সামন্ত ছিল অসংখ্য। এমন কিছু সৈন্যবাহিনী তাঁকে প্রদান করা হয়েছে যা ইতোপূর্বে কাউকে প্রদান করা হয়নি, আর পরেও তা কেউ লাভ করতে পারবেন না। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে।' আর তিনি দো'আ করেছিলেন, "হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এরূপ রাজত্ব দান করুন, যেরূপ রাজত্ব আমার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না। নিশ্চয়ই আপনি মহা দানশীল।" আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শুধু এসব নেয়ামত দান করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তাঁকে বললেন, 'এগুলো আমার অনুগ্রহ। অতএব এগুলো কাউকে দান কর অথবা নিজে রেখে দাও, এর কোনো হিসাব হবে না।" এটা রাজত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যথায় নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য এ রকম হয় না। সে ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষেই সবকিছু তাঁকে করতে হয়। আমাদের নবী জনাব হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-কে এ দুটি পদমর্যাদার যেকোনো একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছিল। তিনি শুধু বান্দা ও রাসূল হওয়াকে পছন্দ করেছিলেন। কিছু কিছু বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্পর্কে হযরত জিবরাঈলের (আ) কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইঙ্গিতে 'বিনয়ী' পছন্দ করার জন্য বলেছিলেন। তখন তিনি ﷺ আবদ বান্দা ও রাসূল এ পদটিকে পছন্দ করেছিলেন। অতঃপরে আল্লাহ তা'আলা খিলাফতকে কিয়ামত পর্যন্ত জারি করে দিয়েছেন। সুতরাং এক দল মুসলমান সর্বদা বিজয়ী থাকবেই, ইনশাআল্লাহ। এতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ ও প্রশংসা। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে হযরত সোলায়মান (আ)-এর প্রতি তাঁর প্রদত্ত নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেন, তারপর পরকালের সফলতা ও নেয়ামতের কথাও বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তার জন্য পরকালে আমার কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা ও নৈকট্যের মর্যাদা।'

হযরত সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বকাল, আয়ুষ্কাল ও ওফাত

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۞

অর্থ : তারপর যখন সুলায়মানের উপর আমি মউতের ফায়সালা জারি করলাম তখন জিনদেরকে তার মউতের খবর দেওয়ার জন্য ঐ ঘুনপোকা ছাড়া আর কোনো জিনিসই ছিল না, যা তার লাঠিকে খেয়ে চলছিল। এভাবে যখন সুলায়মান পড়ে গেলেন, তখন জিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যদি তারা গায়েবী ইলম জানত, তাহলে এমন অপমানজনক আযাবে তারা পড়ে থাকত না। –সূরা সাবা : ১৪

ইবনে জারীর ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রহ.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নবী সোলায়মান (আ) যখন নামায আদায় করতেন, তখন তাঁর সামনে একটি (সাজারা) চারা গাছ দেখতে পেতেন। তিনি গাছটির কাছে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার নাম কী? গাছ বলতো আমি অমুক গাছ। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কোন কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমার থেকে আরো গাছ উৎপন্ন করার জন্য, না কোনো রোগের ওষুধ হিসেবে? যদি উৎপন্ন করার জন্য বলতো তবে সেটি রোপন করা হতো। আর যদি ওষধের জন্য বলতো তবে ওষধের কাজে ব্যবহার করা হতো। একবার তিনি নামায আদায় করছিলেন। আর একবার সালাতের অবস্থায় তিনি তাঁর সামনে একটি গাছ দেখতে পেয়ে সেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? বলল, খারব, সোলায়মান (আ) জিজ্ঞেস করলেন, কি কাজের উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? গাছটি বললো, এই ঘর (বায়তুল মুকাদ্দাস)-কে বিধ্বস্ত ও বীরান করার জন্য। অর্থাৎ গাছটি সোলায়মান (আ)-কে তাঁর ওফাতের ইঙ্গিত দিয়েছে। তখন সোলায়মান (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! এক বৎসর জিনদের কাছ থেকে আমার মৃত্যুর খবরটি গোপন রাখুন। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, জিনেরা গায়েবের খবর জানে না।

অতঃপর সোলায়মান (আ) সেই গাছটি দ্বারা লাঠি তৈরি করেন এবং সেটিতে ভর দিয়ে ইন্তেকাল করেন এবং এক বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। আর এদিকে জিনেরা নির্মাণ কাজ করতে থাকে। অবশেষে উই পোকা যখন লাঠিটি খেয়ে শেষ করে ফেলে তখন সোলায়মান (আ) (মাটিতে) পড়ে যান। এর থেকে মানুষ জানতে পারল যে, জিনেরা যদি অদৃশ্যের খবরই জানতো তবে এক বছর পর্যন্ত এ লাঞ্ছনার কাজে নিয়োজিত থাকত না। অর্থাৎ জিনেরা নির্মাণ কাজকে তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক কাজ বলে মনে করতো। ইবনে আব্বাস (রা) এভাবে অর্থ করেন যে, "অতঃপর জিনেরা পোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এবং তাদের কাছে পানিসহ আসল।"

হযরত সুদ্দী (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সোলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস এসে কখনো একাধারে এক বছর, দু'বছর এবং কখনো এক মাস ও দু'মাস অবস্থান করতেন। কখনো এর চাইতে বেশি বা কম সময়ও থাকতেন। এ সময় তিনি তাঁর আহারের জন্য খাদ্যদ্রব্য সাথে করে নিয়ে আসতেন। যে বার তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বার তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মৃত্যুর লক্ষণাদি দেখতে পান। যখনই তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়াতেন তখনই তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি চারা গাছ উদগত হতে দেখতে পেতেন। তিনি সে চারা গাছটির কাছে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার নাম কি? সেটি বলত, এই নাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করতেন, তোমার সৃষ্টি কি শুধু গাছ উৎপন্নের জন্য না কোনো ওষুধের জন্য? সেটি বলত অমুক ওষুধের জন্য। তখন তিনি সেটি সেই ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন।

একবার তিনি একটি নতুন চারা গাছ দেখতে পেলেন। তিনি সেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? গাছটি বলল, আমার নাম 'খারব' অর্থাৎ বিনাশকারী। আমার সৃষ্টিতে এ ঘর বিধ্বস্ত হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

কি কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? গাছটি বলল, এই বায়তুল মুকাদ্দাস বিনাশের জন্য আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আ) বললেন, এটা কিভাবে হতে পারে যে, আমার জীবিত থাকা অবস্থায় (আমার চোখের সামনে) আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত করবেন? সুতরাং আমার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী বলে মনে হয়। অতঃপর সোলায়মান (আ) গাছটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার মৃত্যু ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ধ্বংসে তোমাকে স্পর্শ করবেই। অতঃপর সোলায়মান (আ) চারা গাছটিকে উঠিয়ে মসজিদের সন্নিকটস্থ একটি বাগানে রোপণ করে দিলেন। এরপর তিনি পুনরায় মিহরাবে প্রবেশ করলেন এবং সেই গাছের লাঠির উপর ভর করে নামায পড়তে শুরু করেন। এই দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। শয়তান ও জিনদের কাছে সোলায়মান (আ)-এর ইন্তেকালের বিষয়টি অজানা রয়ে গেল। জিন ও দৈত্যরা সবাই পূর্বের মতই নির্মাণ কাজে ব্যস্ত রইল। তারা ভয় করছিল যে, কাজের মধ্যে কোনো ত্রুটি হলে সোলায়মান (আ) মসজিদ থেকে বের হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কোনো কোনো জিন শয়তান এ সময় মিহরাবের পার্শে গিয়ে সোলায়মান (আ)-এর কাছে জমায়েত হতে লাগল। তারা মিহরাবের সামনে ও পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আর শয়তান মসজিদের এক দরজা থেকে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যেত। সুলায়মান (আ)-এর দৃষ্টি কোনো শয়তানের প্রতি পড়লে সে জলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেত। তারপরও তারা মসজিদে প্রবেশ থেকে বিরত থাকত না। এক শয়তান এ উদ্দেশ্যে মসজিদে প্রবেশ করল যে, সে দেখবে, সোলায়মান (আ) কি করছেন। সে মসজিদে প্রবেশ করে সোলায়মান (আ)-এর কোনো সাড়া শব্দ পেল না এবং সে জাগলও না। শয়তান খুব সাহস করে সোলায়মান (আ)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেল যে, তিনি জীবিত নেই। এ অবস্থা দেখে শয়তান দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে সবাইকে খবর দিলো যে, হযরত সোলায়মান (আ) অনেক আগেই ইন্তেকাল করেছেন। লোকেরা মসজিদের দরজা খুলে তাঁকে বের করে আনলেন। তারা দেখতে পেল যে, সোলায়মান (আ)-এর লাঠি উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু সোলায়মান (আ) কত আগে ইন্তেকাল করেছেন তার সঠিক তারিখ ও সময় কেউই নিরূপণ করতে পারল না। তারা মাটি থেকে একটি উই পোকা তুলে অন্য একটি লাঠির উপর ছেড়ে দিল। পোকাটি দিন রাত (চব্বিশ ঘন্টা) সেটি কাটতে থাকল। তারপর এর থেকে হিসাব করে দেখা গেল যে, প্রায় এক বছর আগে সোলায়মান (আ) ইন্তেকাল করেছেন।

সবল দুষ্ট জিনগুলোর এক বছর পর্যন্ত হযরত সোলায়মান (আ) এর ইন্তেকালের খবর না হওয়ায়, তারা সারা বছর পূর্ণ উদ্যমের সাথে মনপ্রাণ দিয়ে নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল। আর মানুষেরা নিশ্চিত হলো যে, মূলত শয়তানের (জিনের) অদৃশ্য সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই অর্থাৎ তারা গায়েবের কিছুই জানে না।

যদি গায়েবের খবর জানতো তবে হযরত সোলায়মান (আ)-এর ইন্তেকালের পরে তারা এভাবে লাঞ্ছনাদায়ক কাজে কখনই নিয়োজিত থাকত না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি যখন সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন তার মৃত্যু সম্পর্কে জানাল মাটির পোকা, যা সোলায়মানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সোলায়মান পড়ে গেল তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি গায়েবের বিষয়ে অবগত থাকত, তা হলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।

এ ঘটনায় লোকদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জিনেরা গায়েবের খবর কিছুই জানে না। ওদের দাবি সব মিথ্যা। অতঃপর শয়তান (জিন)গুলো মাটির পোকাগুলোর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, তোমরা যদি আমাদের খাদ্য আহার করতে, তবে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য তোমাদের কাছে পৌছাতাম। যদি তোমরা কোনো পানীয় বস্তু পছন্দ করতে তবে সর্বোৎকৃষ্ট পানীয় পরিবেশন করতাম। তবে এটা আমরা অবশ্যই করব যে, তোমাদের কাছে পানি ও মাটি পৌছাতে থাকব। বর্ণনাকারী বলেন, আজ যেখানেই এ উই পোকা হয়ে থাকে সেখানেই তাদের জন্য পানি ও মাটি পৌছে থাকে। এটা সকলেই দেখতে পায় যে, অনেক ঘরের কাঠের মধ্যে উই পোকার সাথে মাটি থাকে। শয়তানই ওদের (পোকার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে এগুলো সরবরাহ করে থাকে। এ বর্ণনার মধ্যে আংশিক বর্ণনা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। যা সম্পর্কে সত্য মিথ্যা কিছুই মন্তব্য করা

যায় না। আবু দাউদ শরীফে হযরত খায়সামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ) মালাকুল মাওতকে বলেছিলেন, আমার রূহ হরণ করার সময় যখন এসে যাবে এর পূর্বে আপনি আমাকে সে সংবাদটি জানাবেন। মালাকুল মাওত বললেন, এটা কখনই হতে পারে না যে, আমি আপনার মৃত্যুর সময়টি পূর্বেই আপনাকে জানিয়ে দেব। কারণ, যে ব্যক্তির মৃত্যু হবে, সে ব্যক্তির নাম সম্বলিত একটি পত্র আমার নিকট ঐ সময় দেয়া হয়।

আব্দুর রহমান ইবনে জায়েদ (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সোলায়মান (আ) মালাকুল মাওতকে বলেছিলেন, আমার রূহ কবয করার নির্দেশ যখন আপনার কাছে আসবে, তখন আপনি আমাকে বিষয়টি অবগত করবেন। একদিন মালাকুল মাওত তাঁর কাছে এসে বললেন, হে সোলায়মান! আপনার ব্যাপারে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, এখন আপনার মাত্র আর অল্প কিছু হায়াত বাকি আছে। তখন সোলায়মান (আ) শয়তান (জিন)দেরকে ডেকে একটি দরজা বিহীন কাঁচের প্রাসাদ নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তাতে একটি লাঠির উপর টেক লাগিয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। অতঃপর মালাকুল মাওত সেখানে প্রবেশ করে তাঁর রূহ মোবারক কবয করে নিলেন। হযরত সোলায়মান (আ) এ কাজটি মৃত্যু থেকে এড়িয়ে যাবার জন্য করছিলেন না, (নাউজু বিল্লাহ) বরং তাঁর মহান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে শয়তানগুলো তাঁর মওতের খবর না পায়। যাতে তারা তাঁকে জীবিত মনে করে তাদের কাজে পূর্ণ উদ্যমের সাথে নিয়োজিত থাকে। পরে আল্লাহ তা'আলা (উই) পোকা প্রেরণ করেন। সেগুলো এসে সোলায়মান (আ)-এর লাঠিটি কাটতে শুরু করে। যখন উইপোকা লাঠিটির মধ্যভাগ কেটে ফাঁকা করে ফেলল। তখন তাঁর ভার লাঠি সহ্য করতে না পারায় সেটি ভেঙে গেল এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।

জিনেরা যখন এ অবস্থা দেখতে পেল তখন দ্রুত তারা ভেগে গেল এবং নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিল। ইসহাক ইবনে বাশার মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক সূত্রে যহরী (রহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সোলায়মান (আ) মাত্র ৫২ বছর জীবিত ছিলেন। আর তিনি বাদশাহী করেছিলেন চল্লিশ বছর। ইসহাক (রহ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আ)-এর রাজত্বকাল ছিল বিশ বছর।

ইবনে জারীর (রহ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আ)-এর বয়স হয়েছিল ৫০ বছরের কিছু বেশি এবং তিনিই তাঁর রাজত্বের চতুর্থ বছরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সোলায়মান (আ)এর পরে তাঁর পুত্র 'রূহবিয়াম' সতের বছর রাজত্ব করেন। ইবনে জারীর (রহ) বর্ণনা করেন যে, এর পর বনী ইসরাঈলের রাজত্ব খণ্ড বিখণ্ড হয়ে শেষ হয়ে যায়।

শা'ইয়া ইবনে আমসিয়া (আ)-এর ঘটনা

বর্ণিত আছে, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, শা'ইয়া ইবনে আমসিয়া (আ) হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া (আ)-এর পূর্বে আগমন করেন। তিনি সেই নবী (আ)-দের একজন, যাদেরকে হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর আগমনের সুখবর জানানো হয়েছিল। তাঁর সময় হিযকিয়া নামক এক বাদশাহ রায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় বনী ইসরাঈলের শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত শা'ইয়া (আ)-এর অনুসারী এবং একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। বনী ইসরাঈলের মাঝে বিভিন্ন ধরনের বিদআত ছড়িয়ে পড়লে, সে সময়ের বাদশাহ (মানসিক) পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পায়ে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়। এভাবে রাজ্যে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়লে বাবেলের বাদশাহ সানহারীব বায়তুল মুকাদ্দাসে সৈন্য প্রেরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, বাবেলের বাদশাহ এত বেশি সংখ্যক সৈন্য সমবেত করেছিলেন যে, ছয় লক্ষ্য সৈন্য পাতাকাবাহী ছিল (আর পতাকা সম্ভবত প্রতিটি গোত্রের জন্য আলাদা আলাদা ছিল। এতে বুঝা যায়, সৈন্যের সংখ্যা হবে অনেক বেশি)। বনী ইসরাঈলের অত্যন্ত পেরেশান ও ভীত হয়ে পড়ল। বাদশাহ নবী শা'ইয়া (আ)-কে বললেন, সানহারীব ও তাঁর সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কি কোনো ওহী আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছেন? তিনি বললেন, তার ব্যাপারে আমার কাছে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়নি। এর কিছুদিন পর

নবীর প্রতি ওহী আসল যে, বাদশাহর মৃত্যুর সময় খুব নিকটবর্তী। তিনি বাদশাহকে এই (মৃত্যুর) খবর দিলেন। (এ খবর শুনে) বাদশাহ কিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করেন ও আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করেন এবং অত্যন্ত বিনয়, ধৈর্য ও একনিষ্ঠভাবে দু'চোখের পানি ফেলে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দো'আ করেন, "হে আল্লাহ!, হে রাজাধিরাজ ও সকল মাবুদের মাবুদ, হে মহান সত্ত্বা, হে দয়ালু করুণাময়, যাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না! আমার আমল, কাজ ও বনী ইসরাঈলের উপর আমার সুশাসন মেহেরবানী করে স্মরণে রাখুন এবং আমার প্রতি দয়া করুন। আর আমার এসব কিছুর তাওফীক আপনার পক্ষ থেকেই হয়েছে। আপনি আমার বাহ্যিক ও গোপন বিষয়গুলো খুব অবগত।

আল্লাহ তা'আলা বাদশাহর দো'আ কবুল করেন এবং হযরত শা'ইয়া (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে সু-সংবাদ জানিয়ে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা বাদশাহর ক্রন্দনে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর হায়াত আরো পনের বছর বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁর দুশমন সানহারীবের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। হযরত শা'ইয়া (আ) বাদশাহকে এ সু-সংবাদ দিলে তিনি (বাদশাহ) সুস্থ হয়ে যান এবং তাঁর অন্তর থেকে দুশমনের ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়। বাদশাহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদাবনত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেন, হে আল্লাহ! আপনি যাকে চান তাকে রাজত্ব প্রদান করেন। আর যার থেকে চান তার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে যান। আপনি যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন। আর যাকে চান তাঁকে অপমানিত করেন। আপনি অদৃশ্য ও বর্তমানকে খুব জানেন। আপনিই আদি, আপনিই অন্ত। প্রকাশ্যও আপনি, অপ্রকাশ্যও আপনি, আপনিই অনুগ্রহশীল। আপনিই অসহায়দের দোয়া কবুল করে থাকেন। এভাবে বাদশাহ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দু'চোখের পানি ফেলিয়ে এ দোয়া করে সিজদা থেকে মাথা উঠালেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত শা'ইয়া (আ)কে ওহী প্রেরণ করলেন যে, তুমি বাদশাহকে জানিয়ে দাও, বাদশাহ যেন ডুমুর ফলের পানি (রস) তার ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দেয়। এতে তার ক্ষতস্থানটি ভাল হয়ে যাবে এবং সে সুস্থ হয়ে যাবে। হযরত শা'ইয়া (আ) বাদশাহকে এরূপ করার জন্য বললেন। বাদশাহ এরূপ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এদিকে সানহারীবের অসংখ্য সৈন্যকে আল্লাহ তা'আলা মরণব্যাধিতে আক্রান্ত করলেন। ফলে সে (সানহারীব) ও তার সৈন্যদের মধ্যে মাত্র পাঁচজন ব্যতীত আর সকল সৈন্য মারা গেল। সেই বাকি পাঁচজনের মধ্যে বৃদ্ধ নসরও ছিল। পরে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ তাদেরকে ধরিয়ে আনান। অতঃপর তাদের পায়ে বেড়ি পড়িয়ে সত্তর দিন শহরের অলিতে-গলিতে লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদেরকে ঘুরানো হয়। তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন দুটি করে আটার রুটি খেতে দেয়া হতো। তারপর তাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে (বন্দীখানায়) রাখা হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী শা'ইয়ার কাছে ওহীর মাধ্যমে তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বলেন। যাতে তারা দেশে ফিরে গিয়ে তাদের লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার শাস্তি সম্পর্কে অবগত করাতে পারে। তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। সানহারী ফিরে গিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের কাছে সব ঘটনা বলল। এ কথা শুনে যাদুকর ও গণকেরা বলল, (হে সানহারীব!) আমরা আপনাকে আগে থেকেই তাদের প্রতিপালক ও তাদের নবীগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমাদের কথার কোনই কর্ণপাত করেন নি। এরা এমন একটি দল, যতক্ষণ তাঁদের সাথে তাঁদের প্রভু (আল্লাহ) থাকবেন, ততক্ষণ তাঁরা কোনোভাবেই ধ্বংস হবে না।

সানহারীবের মনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা হলো। অতঃপর সানহারীব সাত বছর বেঁচে থেকে মারা গেল। ইবনে ইসহাক (রহ) বলেন, বনী ইসরাঈলের বাদশাহ হিযকিয়ার মৃত্যুর পরে অন্য বাদশাহর শাসনামলে দেশে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফিতনা-ফাসাদ, অন্যায়-অপরাধে দেশ ভরপুর হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত শা'ইয়া (আ)-কে ওহী প্রেরণ করেন যে, তুমি বাদশাহ ও তার পরিষদবর্গের সামনে গিয়ে তাঁদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করো এবং লোকদেরকে সৎ উপদেশ প্রদান কর এবং আল্লাহর শাস্তির সংবাদ জানিয়ে দাও। নবী তাদের কাছে গিয়ে দাওয়াত দিলেন। নবীর দাওয়াত শেষে উপস্থিত

লোকেরা তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিছনে ছুটলো। কিন্তু তারা নবীকে ধরতে পারল না। কারণ নবী শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য যখন অত্যন্ত পেরেশান হয়ে একটি বৃক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সেই বৃক্ষটি দু'ভাগ হয়ে তাঁর সামনে এসে গেল। নবী দ্রুত বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে সাথে সাথে বৃক্ষটি পূর্বের মতো মিলে গেল। এদিকে বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশের সময় শয়তান নবীর কাপড় টেনে ধরায় কাপড়ের একটু কোণা বাইরে রয়ে যায়।

শত্রু বৃক্ষটির কাছে এসে নবীর কাপড়ের একটু অংশ বাইরে দেখে অনুভব করল যে, নবী নিশ্চয়ই এই বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। যালিমরা বৃক্ষটি দ্বিখণ্ডিত করল। এ সময় আল্লাহর নবী, দ্বীনের আহ্বায়ক ও আল্লাহর নবী শা'ইয়া (আ)-এর দেহ মোবারকও দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আরমিয়া ইবনে হালকিয়া (আ)-এর ঘটনা

তিনি ছিলেন লাবী ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর। যিহাক (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরমিয়া ইবনে হালকিয়া (আ) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, ইনিই হলেন হযরত খিযির (আ)। কিন্তু এ বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ও বিস্ময়কর। এটা শুদ্ধ নয়। ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে যে, আরমিয়া (আ) হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-এর শাহাদাতের পরে তাঁর প্রবাহমান রক্তের কাছে হাজির হয়ে রক্তকে সম্বোধন করে বললেন, হে রক্ত! তুমি লোকদেরকে পরীক্ষায় নিপতিত করেছ। সুতরাং এখন থেমে যাও। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-এর শাহাদাতের রক্ত সর্বদা প্রবাহিত হচ্ছিল। যে কারণে বহু মসীবত এসে হাজির হতো। ইবন আবিদ্ দুনিয়া (রহ) বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত আরমিয়া (আ) আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করেছেন, হে প্রভু! আপনার বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে আপনার প্রিয় বান্দা কে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে বান্দা আমার অধিক স্মরণ করে এবং সমস্ত সৃষ্টির মায়া মহব্বত অন্তর থেকে দূরীভূত করে শুধুমাত্র আমার স্মরণেই মশগুল থাকে। যে (বান্দা) মৃত্যুকে ভয় করে না এবং পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে থাকার বাসনাও যার অন্তরে নেই। পার্থিব সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশে সে শান্তি লাভ করে না; বরং এসমস্ত আরাম-আয়েশ থেকে দূরে থাকাকেই পছন্দ করে। এসব বান্দাদের জন্য আমি আমার ভালবাসা আবশ্যক করে দিয়েছি এবং আমি তাঁদেরকে তাঁদের প্রার্থনার চাইতেও অধিক পুরস্কার প্রদান করব।

বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের দুঃখজনক ঘটনা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ط اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞ وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۞ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ز وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ط فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ۞ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ج وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ز وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ۞

অর্থ : এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাঁকে এ তাকিদ দিয়ে বনী ইসরাঈলের জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছিলাম যে, আমাকে ছাড়া আর কাকেও উকিল বানিও না।১ তোমরা ঐ লোকদের সন্তান, যাদেরকে নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই নূহ এক শোকরগোজার বান্দাহ ছিলেন। তারপর আমি আমার কিতাবে২ বনী ইসরাঈলকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে দুই বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং বিরাট বিদ্রোহ করবে। শেষ পর্যন্ত যখন প্রথম বিদ্রোহের সময় এলো তখন হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার এমন বান্দাহদেরকে পাঠালাম, যারা বড়ই জোরদার ছিল এবং তারা তোমাদের দেশে ঢুকে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।৩ এটা এমন এক ওয়াদা ছিল, যা পুরা হওয়ারই কথা। এরপর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিলাম এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দিয়ে সাহায্য করলাম ও তোমাদের সংখ্যা আগের চেয়ে বাড়িয়ে দিলাম। তোমরা যদি ভালো কাজ করে থাক তাহলে তা তোমাদের জন্য ভালোই ছিল। আর যদি মন্দ কাজ করে থাক তাহলে তা তোমাদের জন্যই মন্দ প্রমাণিত হলো। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় এলো তখন আমি অন্য দুশমনকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিলাম, যাতে তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাস) তেমনিভাবে ঢুকে পড়ে যেমনিভাবে আগেরবার দুশমনরা ঢুকেছিল এবং যে জিনিসের উপরই তাদের হাত পড়ে তা-ই যেন ধ্বংস করে দেয়।৪ তোমাদের রব হয়তো এখন তোমাদের উপর দয়া করবেন। কিন্তু তোমরা যদি আবার আগের মতো আচরণ করো তাহলে আমিও আবার তোমাদের শাস্তি দেবো এবং যারা নিয়ামতের নাশোকরী করে তাদের জন্য আমি দোযখকে জেলখানা বানিয়ে রেখেছি।৫ –সূরা বনী ইসরাঈল : ২–৮

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেছেন, যখন বনী ইসরাঈল পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নবী আরমিয়া (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন যে, হে নবী! আপনি আপনার জাতির কাছে গিয়ে বলুন,

তাদের অন্তর আছে, অথচ বুঝছে না।
তাদের চোখ আছে, অথচ দেখছে না।
তাদের কর্ণ আছে, অথচ শোনছে না।

---

১. 'ওয়াকীল' মানে তরসার পাত্র। অর্থাৎ যার উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায়, যার হাতে সবকিছু তুলে দেওয়া যায়, হেদায়াত ও সাহায্যের জন্য যার কাছে ধরণা দেওয়া যায়।

২. 'কিতাব' বলতে এখানে শুধু তাওরাতকে বোঝানো হয়নি; বরং সকল আসমানি কিতাবকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের কয়েক জায়গায়ই এর জন্য পরিভাষা হিসেবে 'আল কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য বিবরণ অনুযায়ী এই ঘটনাটি হিজরতের এক বছর আগে ঘটেছিল। হাদীস ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীবিষয়ক বহু বইয়ে সাহাবীগণ এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এরূপ বর্ণনাকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ২৫ পর্যন্ত পৌঁছেছে। কুরআন মাজীদে শুধু বায়তুল্লাহ (হারাম শরীফ) থেকে মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) পর্যন্ত যাওয়ার কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হাদীসে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মাকদিস হয়ে সাত আসমান পার হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে হাজির হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সফরের ধরণ কেমন ছিল, এটা কি স্বপ্নে ঘটেছিল, না জাগ্রত অবস্থায় ঘটেছিল? নবী কারীম ﷺ কি নিজে সশরীরে গিয়েছিলেন, না শুধু রূহানীভাবে তাঁকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল? কুরআনের ভাষা-ই এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দান করে। তিনি পবিত্র, যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, এই কথা দ্বারা বিবরণ শুরু করায় বোঝা যায়, এটা কোনো বিরাট অসাধারণ ঘটনা; যা আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক ক্ষমতায় সম্ভব হয়েছিল। স্বপ্নে এমন কিছু দেখা বা রূহানীভাবে দেখার এতটা গুরুত্ব হতে পারে না যে, তা বর্ণনা করার জন্যই এরূপ ভূমিকার প্রয়োজন হতে পারে। 'সকল প্রকার অক্ষমতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাহকে স্বপ্নে বা রূহানীভাবে এসব কিছু দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া এক রাতে তাঁর দাস-বান্দাহকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ কথা দ্বারা সশরীরের যাওয়ার পক্ষেই যুক্তি পেশ করে। স্বপ্নে বা রূহানী সফরের জন্য এ শব্দগুলো কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য এ কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে, এ ঘটনা শুধু রূহানী ছিল এবং বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ-কে সশরীরের নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বহু গায়েবী জিনিস দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪. এখানে সেই ভয়াবহ ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে, যা আসূরীয় ও বাবিলনীয় কাণ্ডম এবং বনী ইসরাঈলের উপর আপতিত হয়েছিল।

৫. এর দ্বারা রোমক জাতিকে বোঝানো হয়েছে, যারা বায়তুল মাকদাসকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল ও বনী ইসরাঈলকে মেরে ফিলিস্তিন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলেই আজ দু'হাজার বছর যাবৎ তারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

আমি তাদের পিতৃপুরুষদেরকে মঙ্গল ও কামিয়াবির পথপ্রদর্শন করেছি। সুতরাং তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, তারা আমার অনুসরণ করে কি লাভ করেছে? আর যারা আমার অবাধ্য হয়েছে (তাদেরকে জিজ্ঞেস করো) তারা কি সফলতা লাভ করেছে?

যারা আমার ফরমান মেনে চলেছে, তারা কি কখনো দুর্ভাগা হয়েছে? পশুগুলোও তাদের নিজ আবাস্থলের কথা মনে রেখে সেদিকে ফিরে যায়। অথচ এ নাফরমান লোকেরা সে আমলগুলো ত্যাগ করে চলছে, যে আমল করে তাদের পিতৃপুরুষগণ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছেন। তাদের বংশধরেরা তাদের সে পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে শান্তি ও কল্যাণ তালাশ করছে। তাদের আলেম ও পণ্ডিতগণ আমার সত্য পথকে প্রত্যাখ্যান করছে। তাদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আমার ছাড়া অন্যের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের জ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান দ্বারা আদৌ উপকৃত হতে পারবে না। তাদের বাদশাহ ও তারা আমাকে ও আমার রাসূলকে অস্বীকার করেছে। তারা তাদের অন্তরে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র লক্কায়িত রেখেছে।

তাদের মুখ এবং অন্তর এক নয়। মুখ দ্বারা তারা মিথ্যা কথা প্রকাশ করছে। আমি আমার মহত্ত্ব ও মর্যাদার শপথ করে বলছি যে, তাদের উপর আমি এমন সৈন্য বাহিনী নিয়োগ করব, যারা তাদের ভাষা (কথা) বুঝবে না, তাদের চেহারা চিনতে পারবে না এবং তাদের মসীবতে, কষ্টে, ক্রন্দনে এবং আহ! শব্দে, যাদের হৃদয়ে দয়া ও অনুগ্রহের উদ্রেক হবে না। তাদের প্রতি আমি এমন কঠিন হৃদয়, যালিম স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ প্রেরণ করব, যার সৈন্য বাহিনী মেঘমালার মতো সর্ব স্থানে ছড়িয়ে পড়বে। তাদের পতাকাতে সঞ্চারণের শব্দ হবে, বাজ পাখির পালক সঞ্চারণের শব্দের মতো। তাদের অশ্ববাহিনীর আক্রমণ ঈগল পাখির ছোবলের মতো হবে। তারা জনপদগুলোকে ধ্বংস করবে। জনপদের অধিবাসীদের অন্তরে আতঙ্ক ও ভয় সৃষ্টি করবে। সেই জনপদের অধিবাসীদের জন্য আফসোস! আমি তাদেরকে হত্যার দ্বারা লাঞ্ছিত করব এবং ক্রীতদাসদেরকে তাদের প্রশাসক নিযুক্ত করব। বিবাহের আসর থেকে বর-কনের চিৎকার ভেসে আসবে। শ্রুত হবে সর্বত্র হর্ষধ্বনি (ঘোড়ার ডাক) ও বাঘের ভয়ঙ্কর গর্জন। প্রাসাদ ও মনোরম অট্টালিকাগুলোকে বানিয়ে দিব হিংস্র জীব-জন্তুর আবাসস্থল। ধুলো-বালিতে গোটা শহর ছেয়ে যাবে। সম্মান ও মর্যাদা হারিয়ে তারা হবে লাঞ্ছনার পাত্র। আরাম-আয়েশ ও স্বাধীনতা সবকিছু হারিয়ে তারা দাসত্বের শিকলে বন্দি হবে। তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্য বিলুপ্ত করে তাদের চেহারাকে করা হবে কুৎসিত চেহারার অধিকারী। তাদের আরাম-আয়েশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে তাদের দুশমনরা। তাদের শরীর পচে গলে হয়ে যাবে যমীনের খড়কুটা ও আবর্জনা। আর হাড্ডিগুলো পড়ে থাকবে খোলা ময়দানে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন রকমের কঠিন আযাবে আপতিত করব। এরপর আমি আকাশকে নির্দেশ দিব তাদের জন্য লৌহ সদৃশ হতে এবং জমিনকে নির্দেশ দিব তাদের জন্য তামার মতো কঠিন হতে। এতে আকাশ থেকে কোনো বৃষ্টি বর্ষণ হবে না এবং যমীনেও কোনো ফসল উৎপন্ন হবে না। তারপর ফসল কর্তন করার সময় বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সেগুলো নষ্ট করে দেব। তারপরও যদি কিছু ফসল হয়, তবে তা (ফসল) কাটার মৌসুমে আমি বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে সেগুলো নষ্ট করে দিব। এরপরও যদি কিছু ফসল সংগৃহীত হয় তবে সেগুলো থেকে বরকত উঠিয়ে নেব। তারপর যদি তোমরা চিৎকার দিয়ে দু'চোখের পানি ফেলেও আমার কাছে (মুক্তির জন্য) প্রার্থনা করো সে প্রার্থনা আমি শুনব না। যদি কিছু চাও, তা তোমাদেরকে আর দেয়া হবে না। তোমাদের ক্রন্দন ও চীৎকারে তোমাদের প্রতি আমি দয়াশীল হব না। তোমরা যদি বিনয়ী, নম্রচিত্ত ও আত্মোৎসর্গকারীও হও, তবুও আমি তোমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাব না।

ইবনে আসাকির (রহ) এটি বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনে বামার (রহ) বলেছেন, ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরমিয়া (আ)-কে যখন বনী ইসরাঈলের মাঝে নবী করে প্রেরণ করেন, তখন বনী ইসরাঈলরা গোমরাহীতে ভীষণভাবে নিমজ্জিত ছিল। এমনকি তারা নবীদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। যখন তাদের জুলুম, অপরাধ, অন্যায়, নির্যাতন ও পাপ সীমালঙ্ঘন করে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের যথাযথ শাস্তি দেয়ার জন্য বুখত নসরের মনে তাদের উপর বিজয় লাভ করার এক

প্রথম আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। তাই বুখত্ নসর তাদের প্রতি সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের জন্য হযরত আরমিয়া (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন। আল্লাহ তা'আলা নবীকে জানিয়ে দেন, (হে নবী!) আমি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করতে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে তাদের অপরাধের কারণে শাস্তি প্রদান করব। তুমি বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে যে পাথরটি রয়েছে, তার উপর দাঁড়িয়ে যাও। আমার ওহী ও নির্দেশ সেখানে বসে তোমার কাছে পৌছবে।

তখন হযরত আরমিয়া (আ) ভীত ও চিন্তিত অবস্থায় পাথরটির উপর দাঁড়ালেন এবং স্বীয় পরিধেয় জামা ছিড়ে ফেলেন এবং মাথার উপরে ধুলোবালি মাখেন। অতঃপর সে অবস্থায়ই সিজদায় লুটে পড়ে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে আরয করেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করতেন তবে খুবই ভাল হতো! কারণ, আপনি দয়া করে আমাকে বনী ইসরাঈলের শেষ নবী বানিয়েছেন। আর আমার কারণেই এখন বায়তুল মুকাদ্দাস ও বনী ইসরাঈল বিনাশ হবে?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! তুমি সিজদা হতে মাথা উত্তোলন কর। হযরত আরমিয়া (আ) মাথা উঠালেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি বনী ইসরাঈলের শাসনকর্তা কাকে বানাবেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এমন ব্যক্তিকে আমি তাদের শাসনকর্তা বাদশাহ বানাব, যে একজন অগ্নিপূজক। যে আমার শাস্তিকে ভয় করে না এবং আমার থেকে পুন্যেরও আশা করে না। হে আরমিয়া! তুমি উঠে দাঁড়াও এবং আমার ওহী শ্রবণ করো। আমি তোমাকে বনী ইসরাঈল ও তোমার নিজের ব্যাপারে খবর দিচ্ছি। আমি তোমাকে পৃথিবীতে নবী হিসেবে প্রেরণের পূর্বেই তোমাকে পছন্দ করেছি। তোমার মায়ের গর্ভাশয়ে তোমার আকৃতি-গঠনের পূর্বেই তোমাকে মর্যাদা দান করেছি এবং তোমার মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি এবং পূর্ণ যৌবনে পদার্পন করার পূর্বেই তোমাকে নবী হিসেবে মনোনীত করেছি এবং বিরাট এক কাজের আঞ্জাম দেয়ার জন্য তোমাকে বাছাই করেছি। সুতরাং তুমি প্রস্তুত হও এবং বাদশাহকে সঠিক পথপ্রদর্শন করো এবং তাকে সঠিক পথ-নির্দেশনা দাও।

তারপর থেকে হযরত আরমিয়া (আ) বাদশাহকে সঠিক পথপ্রদর্শন করত তাকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে লাগলেন। আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত আরমিয়া (আ)-এর প্রতি ওহীও নাযিল হতে থাকল। কিন্তু তারা অন্যায় ও পাপ থেকে মোটেই বিরত থাকল না। বরং ফিতনা-ফাসাদ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাদশাহ সানহারীব তার সৈন্য বাহিনীসহ তাদের উপর যখন হামলা করার উদ্যোগ নিয়েছিল, তখন কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করে ছিলেন সে কথাও তারা ভুলে গেল।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ)-এর প্রতি পুনরায় ওহী অবতীর্ণ করলেন যে, (হে নবী!) আমি তাদের প্রতি যে নির্দেশ জারি করছি, তা তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও এবং তাদের প্রতি আমার যে অনুগ্রহ রয়েছে, সেগুলো তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও। আর তাদেরকে তাদের অন্যায়, অপরাধ ও পাপ কাজ সম্পর্কে সাবধান করে দাও। হযরত আরমিয়া (আ) আরয করেন, হে প্রভু! আপনার শক্তি না পেলে, আমি দুর্বল। আপনার আশ্রয় না পেলে, আমি অপারগ ও অক্ষম। আপনি যদি আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন না করেন, তবে আমি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হব।

আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন এবংমর্যাদা না দেন, তবে আমি লাঞ্ছিত হব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি অবগত নও যে, সকল বিষয় (কাজ) গুলোই আমার ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। আর সকল সৃষ্টি ও কাজ আমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। সকল অন্তর ও যবান আমারই (কুদরতী) হাতে। (অর্থাৎ আমারই নিয়ন্ত্রণে)। আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী তা পরিবর্তন করে থাকি। সুতরাং আমারই আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ। আমিই প্রথম, আমার পূর্বে আর কোনো কিছুরই সৃষ্টি নেই। আমার একটি নির্দেশেই সকল বস্তু, আকাশ, যমীন এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুই সৃষ্টি লাভ করেছে। আর তাওহীদ ও কুদরত শুধু আমারই বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ এককসত্তা ও গোটা সৃষ্টির উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র আমিই।) আমার কাছে যা সংরক্ষিত আছে, তা আমি ব্যতীত আর

কেউই জানে না। আমি এমন সত্তা যে, আমি সমুদ্রের সাথে কথা বলেছি এবং সে (সমুদ্র) আমার কথা বুঝতেও পেরেছে। আমার নির্দেশকে সে যথাযথভাবে পালন করেছে। আমি তার জন্য সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছি। সে সেই সীমানা অতিক্রম করেনি। সমুদ্রের তরঙ্গ পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আমার নির্ধারিত সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেই ভীত শঙ্কিত হয়ে বিনয় ও আনুগত্যতার সাথে আমার নির্দেশ পালন করে।

(হে আরমিয়া!) আমি তোমার সাথেই আছি। আমি সাথে থাকাকালীন কোনো অমঙ্গল কিছুই তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। আমি তোমাকে এক বৃহৎ জাতির কাছে (নবী করে) প্রেরণ করেছি। যাতে তুমি আমার বিধানসমূহ তাদের কাছে পৌঁছাতে পার। তোমার অনুসারীদেরকে যে ছওয়াব দেয়া হবে, সেই পরিমাণ ছওয়াব তোমাকেও প্রদান করা হবে। এতে তাদের ছওয়াব মোটেই কমবে না। সুতরাং তুমি তোমার জাতির কাছে যাও এবং তাদেরকে বলো, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতৃপুরুষদের নেক কাজগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তোমাদেরকে রেখে গেছেন। হে নবীদের বংশধর! একটু চিন্তা করে দেখ, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ আমার আনুগত্য করে কতটুকু উপকৃত হয়েছে। আর তোমরা আমার অবাধ্য হয়ে কি লাভ করেছ? তোমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখেছ, যে আমার অবাধ্য হয়ে সফল হয়েছে? আর এরূপ ব্যক্তিকেও কি দেখেছ, যে আমার নির্দেশাবলী মেনে বিফল হয়েছে? জীব-জন্তুরাও তাদের আবাসস্থলগুলোর কথা স্মরণ রেখে সে দিকে ফিরে যায়। আর এ জাতি ধ্বংসের চারণভূমিতে বিচরণ করছে। তারা সে নির্দেশগুলো অমান্য করছে, যে নির্দেশগুলো মেনে চলার কারণে আমি তাদের পিতৃপুরুষদেরকে (পৃথিবীতে) সম্মানিত করেছি। আর তাদেরই বংশধরেরা সে পথ ত্যাগ করে ভ্রান্ত পথে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার আশায় ঘুরছে। তাদের জ্ঞানীরা ও বৈরাগ্য জীবনযাপনকারী ধর্মীয় যাজকরা আমার বান্দাদেরকে তাদের অনুসারী বানিয়ে নিয়েছে। তারা (অন্ধ বিশ্বাসে) তার উপাসনা করে। এ ধর্মীয় যাজকরা আমার কিতাব ছাড়া তাদের মনগড়া নীতির অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাদেরকে মূর্খ বানিয়ে রেখেছে, লোকদেরকে আমার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে রেখেছে এবং লোকদেরকে আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে প্রতারণার ফাঁদে নিমজ্জিত করে রেখেছে। আমার বান্দারা, একমাত্র আমারই ইবাদত করবে। আর আমিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। সেখানে তারা ধর্মযাজকদের প্রতারণায় পড়ে তাদেরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের নেতৃবৃন্দ ও আমীরগণ আমার অনুগ্রহ লাভ করে বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আমার হিকমত ও কৌশল সম্পর্কে তারা ছিল বেপরোয়া। পার্থিব মোহ তাদেরকে প্রতারণার বেড়াজালে ঘিরে রেখেছে। আমার কিতাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আমার ওয়াদাকে তারা ভুলে গিয়েছে। আমার কিতাবকে পরিবর্তন করছে, আমার সাথে দুঃসাহস করে আমার সাথে প্রতারণা করছে এবং আমার রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে।

আমার মহত্ত্ব অতি পবিত্র, আমার মর্যাদা, মাকাম ও শান অতি উচ্চ। আমার রাজত্বে ও কর্তৃত্বে কেউ কি শরীক হতে পারে? কোনো মানুষের পক্ষে কি এটা সম্ভব যে, সে আমার আনুগত্য বাদ দিয়ে অন্য কারো আনুগত্য করবে? আমি কি কোনো বান্দাকে এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করতে পারি যে, সে নিজকে উপাস্য দাবি করতে পারে? অথবা আমি কি কাউকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজের অনুমতি দিতে পারি? তাদের ফকীহগণ ও আলেমগণ কিতাবকে ইচ্ছামতো পাঠ করে এবং রাজা বাদশাহদের অনুগত চলে। তাদের রাজা বাদশাহগণ ধর্মের মধ্যে নতুনত্ব কিছু (বিদআত) সৃষ্টি করার জন্য এবং কিতাব পরিবর্তন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এই আলেম ও ফকীহগণ আমার অবাধ্য হয়ে তাদের আনুগত্য করে এবং আমার ওয়াদা ভঙ্গ করে। এ আলেম ও ফকীহগণ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও মূর্খ। কারণ, তারা তাদের ইলম (জ্ঞান) দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি। নবীর বংশধরেরা কঠিন সমস্যা ও ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত। এরপরও তারা আমার সাহায্য এরূপভাবে কামনা করে, যেভাবে সাহায্য পেয়েছিল তাদের পিতৃপুরুষগণ। আর তারা ধারণা করে থাকে যে, সততা ও নেক আমল ছাড়াই তারা তাদের পিতৃপুরুষের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলার দয়া পাওয়ার যোগ্য।

তারা কি স্মরণ করে না যে, তাদের পিতৃপুরুষ দ্বীনের জন্য কত কষ্ট, ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। অন্যদের মতো প্রতারকের না পড়ে তাঁরা দ্বীনের উপর দৃঢ় রয়েছে। আমার দ্বীন ও নির্দেশের মোকাবিলায় তাঁরা তাঁদের জান,

তে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তাঁদের (আমলের) কারণে আমি তাঁদের বংশধরকে সুযোগ দিয়েছি, যাতে তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আমার দিকে ফিরে আসে। আমি তাদেরকে মাফ করে দিয়েছি এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি এবং তাদের আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছি। যাতে তারা আমার উপদেশ গ্রহণ করে। আর আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীনকে সজীব রেখেছি। যাতে ফল-ফলাদি উৎপন্ন হতে পারে। তাদেরকে আমি সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং দুশমনদের উপর বিজয়ী করেছি। কিন্তু এত কিছু অনুগ্রহ লাভ করার পরেও তাদের অবাধ্যতা, অহংকার ও নাফরমানী আরো বৃদ্ধি পেল। তারা আমার নৈকট্য থেকে দূরে যেতে লাগল। এভাবে কতদিন আর চলতে পারে? তারা কি আমার সাথে উপহাস করছে? না আমার সাথে তারা ছলনা করছে? না তারা আমার সামনে বীরত্ব ও দুঃসাহস প্রদর্শন করছে? আমি আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি, আমি তাদেরকে এমন কঠিন মসীবত দ্বারা পাকড়াও করব, যে মসীবতে চরম ধৈর্যশীল ও সহনশীল এবং সহিষ্ণু ব্যক্তিও পেরেশান হয়ে যাবে। সে মসীবতে বন্ধ হয়ে যাবে বিচারকের বিচার কার্য, হ্রাস পাবে জ্ঞানীদের জ্ঞান, ব্যর্থ হবে কৌশলীদের কৌশল। তারপর আমি তাদের উপর এমন এক অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্দয় বাদশাহ নিযুক্ত করে দিব, যার লালটে ও ভয়ে থর থর করে সব কাঁপতে থাকবে। তার অন্তরে থাকবে না কোনো প্রকার মায়া, মমতা ও দয়া। আমি কসম করে বলছি, বিশাল সৈন্যবাহিনী তার পিছনে এরূপে সারিবদ্ধ হয়ে চলবে, যেমন রাতের আঁধার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার সৈন্যরা মেঘমালার মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। তার সৈন্যবাহিনীর পতাকার শব্দ ঈগল পাখীর পালক উড়া শব্দের মতো হবে। তারা ঈগল পাখীর মতো ঘুরে ঘুরে আক্রমণ করবে। জনপদগুলোকে জনশূন্য ও বিধ্বস্ত করে দিবে। জনপদগুলো হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমিতে পরিণত হবে। সে (অত্যাচারী বাদশাহ) রাজ্যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সৃষ্টি করবে রক্তারক্তি, মারামারি ও খুনাখুনির এক ভয়াবহ পরিবেশ, তার অন্তর হবে কঠিন পাথরের মতো শক্ত। সে কাউকে হত্যা করতে মোটেই চিন্তা করবে না ও বিলম্বও করবে না। সে না কারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে, না কারো দিকে তাকাবে। সে কারো কথা শুনবে না। সে সিংহের গর্জনের মতো চীৎকার দিয়ে বাজারের অলিতে-গলিতে ঘোরাফিরা করবে। যে শব্দে সবার দেহ থর থর করে কাঁপতে থাকবে। তার শব্দ শুনে কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তিও ভয়ে চিৎকার করতে থাকবে। কিন্তু সে কারো কথা বুঝতে পারবে না। আমার মর্যাদার শপথ! তাদের ঘরগুলোকে আমি আমার কিতাব তিলাওয়াত ও আমার পবিত্রতা বর্ণনা থেকে খালি করে দেব। তাদের মাহফিল, মজলিস ও আলোচনা সভায়, আমার কথা ও উপদেশ বর্ণনা করা বন্ধ করে দিব। তাদের মসজিদসমূহ মসজিদের আবাদকারীদের থেকে খালি করে দিব। মসজিদের আগন্তুক ও দর্শক তারাই বাকি থাকবে, যারা মসজিদের নির্মাণকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সুসজ্জিত করে রাখবে, যারা তাতে রাত্র যাপন করবে, যারা দ্বীন শিখাবে পার্থিব স্বার্থ অর্জনের জন্য। আর ধর্মীয় জ্ঞান (ফিকাহ) শিখবে পার্থিব উদ্দেশ্যে। আমি তাদেরকে সম্মানের পরিবর্তে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত রাখব। শান্তি ও সুখময় জীবনের বদলে তাদের উপর অবতীর্ণ করব বিভিন্ন রকমের কঠিন মসীবত ও শাস্তি। রেশমী পোষাকের পরিবর্তে তাদেরকে পরিধান করাব মোটা ও জীর্ণ পোষাক। উৎকৃষ্ট আত্মা ও দেহের পরিবর্তে তাদেরকে প্রদান করব মৃত লাশ। রাজ মুকুট ও রাজকীয় পোষাকের বদলে তাদেরকে সুসজ্জিত করব লোহার বেড়ি ও শিকল দ্বারা। তাদের রাজ প্রাসাদ ও সুরক্ষিত মজবুত দুর্গগুলোকে করে দেব বিরান ও হিংস্র জন্তুদের আবাসস্থল। ঘোড়ার আওয়াজের পরিবর্তে তারা শুনতে পাবে সিংহের ভয়ঙ্কর গর্জন। আর প্রদীপ বাতির বদলে তারা দেখতে পাবে চারদিকে অগ্নির ধোঁয়া। স্ত্রীদের চুড়ি ও অলঙ্কারাদির বদলে পাবে লোহার বেড়ি, মোতির হারের পরিবর্তে পাবে লোহার শিকল। আর সুগন্ধিযুক্ত তেলের বদলে পাবে ধুলোবালি। তুল তুলে নরম বিছানার বদলে তাদেরকে শহর ও বাজারের অলি-গলিতে রাত দিন ঘুরতে হবে এবং বিষাক্ত হাওয়া তাদেরকে স্পর্শ করবে। এরপরেও আমি তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিয়ে লাঞ্ছিত করব এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেব। এমনকি তাদের কেউ যদি সুউচ্চ মজবুত পর্বতেও বসবাস করে, তবে আমার এ শাস্তি সেখানেও গিয়ে পৌঁছবে এবং তাকে পাকড়াও করবে। আমি তাদের জন্য আকাশকে নির্দেশ দেব লোহা সদৃশ হবার জন্য। আর যমীনকে নির্দেশ দেব তামার মতো কঠিন হবার জন্য। তারপর আকাশ থেকে

কোনো বৃষ্টি বর্ষণ হবে না এবং যমীন থেকেও কোনো ফল-ফলাদি উৎপন্ন হবে না। যদি কিছু উৎপন্ন হয়, সেগুলোও ধ্বংস করে দেব। তারপরও যদি কিছু (খাদ্য) অবশিষ্ট থাকে তবে তাতে বরকত হবে না। এ কঠিন বিপদের সময় তারা যদি আমাকে ডাকে, আমি সে ডাকে সাড়া দেব না। তারা যদি কিছু চায়, আমি তা তাদেরকে দেব না। তারা যদি দু'চোখের পানি ঝরিয়ে কাঁদতেও থাকে তবুও আমি তাদের প্রতি রহম করব না। তারা যদি বিনয় ও অনুগত হয়ে আমার মুখাপেক্ষী হয়, তবুও আমি তাদের থেকে আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিব। তারা যদি আমার কাছে আরয করে, হে আল্লাহ! আপনি আপনার অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি আমাদেরকে বিশেষ এক মর্যাদা দান করেছেন। আমাদের মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন। আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদকে আমাদের মাঝেই রেখেছেন। অতঃপর আপনি আমাদেরকে দেশে শক্তিশালী করেছেন এবং সেখানকার রাজত্ব দান করেছেন। আপনি আমাদেরকে ও আমাদের পিতৃ পুরুষকে শৈশবকাল হতেই লালন-পালন করেছেন এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়েছেন। তারপর আপনি মেহেরবানী করে এ বৃদ্ধাবয়স পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আপনি আমাদের প্রতি পরিপূর্ণ নেয়ামত ও রহমত দান করেছেন। আমরা যদিও পরিবর্তন হয়ে গেছি। কিন্তু আপনি পরিবর্তন হননি। যদিও আমরা পরিবর্তন হয়ে গেছি, কিন্তু আপনার নেয়ামত, অনুগ্রহ ও করুণা পরিপূর্ণভাবেই আমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। তারা যদি এভাবে বলে, তখন উত্তরে আমি বলব, 'আমি প্রথমে আমার বান্দার প্রতি রহমত ও নেয়ামত নাযিল করি। যদি তারা (আমার এই নেয়ামত ও রহমত লাভ করে আমার দ্বীনকে) কবুল করে, তবে আমি নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দেই। আর যদি তারা এর বৃদ্ধি চায় তবে আমি বৃদ্ধি করে দেই। তারা যদি শোকর করে, তবে আমি আমার নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেই। আর তারা যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, (অর্থাৎ দ্বীন কবুল না করে) আমিও পরিবর্তন হয়ে যাই। তারা পরিবর্তন হলে আমি ক্রোধান্বিত হয়ে যাই। আর যখন আমি রাগান্বিত হই, তখন তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করি। আমার ক্রোধের সামনে কেউ টিকে থাকতে পারে না।

হযরত কা'ব (রা) বলেন, এরপর হযরত আরমিয়া (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে প্রভু! আমি যা কিছু শিখেছি তা আপনার দয়ায় ও অনুগ্রহেই শিখেছি। আমার মধ্যে যে অযোগ্যতা ও দুর্বলতা রয়েছে, তাতে আপনার সামনে কিছু বলা বা আরয করা আমার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। কিন্তু আপনিই আপনার অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা আজ পর্যন্ত আমাকে জীবিত রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরেই আপনার শাস্তির ভয় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। বনী ইসরাঈলের এই সীমালঙ্ঘন করা আমার দুর্বলতা ও অযোগ্যতার কারণেই। আমি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের মাঝে অবস্থান করছি, তারপরও তারা আপনার নাফরমানীতে নিমজ্জিত। আমি তাদেরকে তাদের নাফরমানী থেকে বিরত রাখতে পারিনি। আপনি যদি আমাকে শাস্তি দেন, আমি তা পাওয়ার যোগ্য। আর যদি আমার প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে সেটা আপনার বিশেষ দয়া ও মেহেরবানী। হে পরওয়ারদেগার! আপনি পবিত্র। আমরা আপনার গুণগান ও প্রশংসা করছি। আপনি বরকতময়! আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং আপনি মহান। হে পরওয়ারদেগার! যে শহরে আপনার নবীর আগমন ও বাসস্থান, সে শহরটি কি আপনি ধ্বংস করে দেবেন? হে পরওয়ারদেগার! আপনি পবিত্র আমরা আপনার প্রশংসা ও গুণগান করছি। আপনি বরকতময় এবং মহান। আপনি কি এই বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ এবং এর চার পাশকে বিরান ও বিধ্বস্ত করবেন, যে মসজিদকে আপনি আপনার যিকিরের কারণে মর্যাদা দান করেছেন? হে মহান প্রভু! আপনি কি সেই লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবেন ও শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন, যারা আপনার প্রিয় বান্দা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। যারা আপনার সাথে কথোপকথনকারী হযরত মূসা (আ)-এর উম্মত। যারা আপনার মনোনীত বড় নবী হযরত দাউদ (আ)-এর জাতি। হে প্রভু! এরপর আপনার শাস্তি থেকে কোনো জনপদ ও শহর রক্ষা পেতে পারে? আর কোনো বান্দা আপনার ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারে? হে প্রভু! আপনি কি ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর বংশধর এবং আপনার সাথে একান্তে আলাপকারী মূসা (আ)-এর জাতির উপর অগ্নিপূজক শাসক নিযুক্ত করবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আরমিয়া! যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়ে চলে, সে আমার শাস্তি সম্পর্কে খুবই সচেতন। আমি

তাদের পূর্ববর্তীদেরকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছিলাম, তা শুধু আমার আনুগত্য করার কারণে। তাদের অন্যান্য লোক যদি আমার অবাধ্য হয়ে চলে, তবে আমি তাদেরকে আমার অবাধ্যদের অন্তর্ভুক্ত করব। এখন পর্যন্ত আমি তাদেরকে আমার দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখছি।

হযরত আরমিয়া (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আপনি ইবরাহীম (আ) কে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর কারণে আমাদেরকে হেফাজত করেছেন। মূসা (আ)-এর সাথে একান্তে কথা বলে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আমরা তাঁদের ওসীলা দিয়ে আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং আমাদের উপর এমন শত্রুকে শাসক বানাবেন না, যে আমাদের অস্তিত্বকে মিটিয়ে দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, হে আরমিয়া! আমি তোমাকে তোমার মাতৃগর্বে বসেই পবিত্র করেছি এবং এখন পর্যন্ত অবসর দিয়েছি। (অর্থাৎ হেফাজত করেছি) তোমার জাতির লোকেরা যদি ইয়াতীম, অনাথ, অসহায় গরিব ও মুসাফিরদের সাহায্য করতো এবং তাদের প্রতি খেয়াল রাখতো তবে আমি তাদেরকে শক্তিশালী করতাম এবং আশ্রয় দিতাম। আর পরকালে তাদের স্থান হতো আমার জান্নাতে। যে জান্নাতের বৃক্ষগুলো অত্যন্ত মসৃণ ও সুন্দর। যার পানি অত্যন্ত মিষ্ট ও পবিত্র। যে পানি কখনো হ্রাস পায় না। সে জান্নাতের ফলমূল কখনো শেষ হয় না এবং নষ্টও হয় না। কিন্তু হে আরমিয়া! আমিই তোমার কাছে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি। আমি তাদের জন্য ছিলাম অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু প্রতিপালক। আমি সব রকমের দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন ও পেরেশানি থেকে রক্ষা করেছিলাম। তাদের প্রাণকে জীবন্ত ও সজীব করে রেখেছিলাম। অবশেষে তারা ভেড়ার মতো শক্তিশালী হয়ে একে অপরকে শিং দিয়ে আঘাত করতে শুরু করল। তাদের জন্য খুবই আফসোস! যে আমাকে সম্মান করে তাকেই আমি সম্মান করি। যে আমার দ্বীনকে ত্যাগ করে তাকে আমি অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করি। এদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার নাফরমানী করে খুব ভীত হয়ে পড়েছিল। আর এরা আমার নাফরমানী করে প্রকাশ্যে ও নির্ভয়ে। এমনকি তারা মসজিদে, বাজারে, বৃক্ষের ছায়ায় ও পাহাড়ের চূড়ায় বসে পাপ করছে। আকাশ ও জমিন তাদের পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পাহাড়-পর্বত তাদের পাপে থর থর করে কাঁপছে। জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীরা তাদের পাপ দেখে ঘৃণায় এলাকা ত্যাগ করে তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

তারা এ পাপ থেকে কোনোভাবেই বিরত থাকল না, আমার কিতাব থেকে কোনো শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করল না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আরমিয়া (আ) যখন তাঁর জাতির কাছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী ও পয়গাম পৌছালেন, তখন তারা আল্লাহ তা'আলার সাবধান বাণী ও শাস্তির কথা ভালভাবে শুনলো। তারপর তারা নবীর অবাধ্য হয়ে তাকে মিথ্যাবাদী বলল। তারা নবীকে দোষারোপ করে বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যারোপ করছ। তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ এ যমীন ও মসজিদকে তাঁর ইবাদত ও তাওহীদ থেকে খালী করে দেবেন? এই যমীনে যদি কোনো মসজিদ না থাকে, না থাকে ইবাদত করার কোনো লোক, তবে তার কে তাঁর ইবাদত করবে? হে আরমিয়া (আ)! তুমি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা প্রচার করছো। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। অতঃপর তারা আরমিয়া (আ)-কে পাকড়াও করে জেলখানায় আবদ্ধ করে রাখল। তারপরেই আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন বুখত নসরকে। বুখত নসর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনী ইসরাঈলের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। তার সৈন্যবাহিনী বনী ইসরাঈলের এলাকায় পৌছে তাদেরকে আটক করল। তারপর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছির তার বিবরণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন— 'তারা শহরেরর মধ্যে প্রবেশ করল। অর্থাৎ বুখত নসরের সৈন্যবাহিনী বনী ইসরাঈলকে যখন আটক করে ফেলল, তখন তারা অপারগ ও অক্ষম হয়ে বুখত নসরের আনুগত্য স্বীকার করে শহরের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করে দিল।

অতঃপর অগ্নিপূজক সৈন্যরা শহরের অলি-গলিতে দলে দলে প্রবেশ করল। বুখ্‌ত নসর জাহেলী যুগের আচার-আচরণ প্রদর্শন করত বনী ইসরাঈলের প্রতি কঠোর আদেশ জারি করল। এ আদেশের প্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলের এক তৃতীয়াংশকে হত্যা করে খতম করা হয় এবং এক তৃতীয়াংশের গলায় গোলামীর লাঞ্ছনার জিঞ্জির পরিয়ে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ তাদেরকে গোলাম বানানো হয়।) শুধু পঙ্গু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদেরকে মুক্তি দিয়ে তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। তারপর লাশগুলোকে ঘোড়ার খুর দ্বারা দলিত করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। শিশুদেরকে ধরে সাথে করে নিয়ে যায় এবং মহিলাদেরকে ও বালিকাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় বাজারে ঘুরানো হয়। তাদের সৈন্যদেরকে ধ্বংস করে দেয়। দুর্গ ও প্রাসাদগুলোকে বিনাশ ও বিরান করে দেয়। মসজিদগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। জ্বালিয়ে দেয় তাওরাত কিতাবকে। অতঃপর বুখ্‌ত নসর দানিয়াল (আ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। যার কাছে বুখ্‌ত নসরের পক্ষ থেকে চিঠি লেখা হয়েছিল।

বুখ্‌ত নসর তাঁর সাক্ষাৎ পেল না। তিনি এর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা চিঠিটি গ্রহণ করলেন। দানিয়াল (আ)-এর পরিবারের মধ্যে জীবিত ছিলেন, হিযকিলের পুত্র ছোট দানিয়াল, মীশাঈল, আযরাঈল ও মিখাঈল। তারপর বুখ্‌ত নসর, তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস জনপদে প্রবেশ করে এবং সমস্ত সিরিয়াকে তছনছ করে ফেলে এবং বনী ইসরাঈলকে অবাধে হত্যা করে। সবকিছু ধ্বংসের শেষে বুখ্‌ত নসর দেশে ফিরে যেতে শুরু করল। সব মালামাল লুট করে নিল। বন্দীদেরকে আগে প্রেরণ করল। বনী ইসরাঈলের আলেম, জ্ঞানীজন ও নেতৃবৃন্দের শিশু বন্দীরা সংখ্যা ছিল নব্বই হাজার। বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করে মসজিদকে অপমান করল। মসজিদের ভেতরে শুকর যবেহ করল। বন্দীদের মধ্যে সাত হাজার লোক ছিল হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব (আ) ও তার ভাই বিন ইয়ামীনের বংশের। আট হাজার ছিল ঈশা ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশের। চৌদ্দ হাজার ছিল ইয়াকূব (আ)-এর দুই পুত্র যবানুন ও নাফতালী বংশের। চৌদ্দ হাজার ছিল দান ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশের। আট হাজার ছিল ইয়াসতাখির ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশের। দুই হাজার ছিল যাবালুন ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশের। চার হাজার ছিল, রূবেল ও লাবী ইবনে ইয়াকূব (আ)-এর বংশের। আর বার হাজার ছিল বনী ইসরাঈলের অন্যান্যদের বংশের থেকে। মোটকথা এই সকলকে নিয়ে বুখ্‌ত নসর দেশের দিকে রওয়ানা হয়ে বাবেল শহরে গিয়ে হাজির হলো।

ইসহাক ইবনে বাশার (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা) বলেছেন, বুখ্‌ত নসরের ধ্বংসের কাজ যখন শেষ হয়েছিল, তখন তাকে বলা হলো যে, বনী ইসরাঈলের একজন লোক ছিল- যিনি তাদেরকে এ মসীবত ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে খুব সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে আপনার সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, তোমাদের কাছে এমন এক ব্যক্তি আসবে, যে তোমাদের নওজোয়ানকে হত্যা করবে, শিশুদেরকে বন্দী করবে, মসজিদগুলোকে ধ্বংস করবে এবং উপাসনালয়সমূহ জ্বালিয়ে দিবে। কিন্তু তাঁদের কথা তাঁর জাতির লোকেরা শুনেনি। তাঁকে তারা মিথ্যাবাদী বলেছে। তাঁকে দোষারোপ করেছে। অবশেষে তাঁকে আটক করে জেলে আটকিয়ে রেখেছে।

বুখ্‌ত নসর এ কথা শ্রবণ করে, তাঁকে জেল থেকে বের করে আনার আদেশ দিল। আরমিয়া (আ)-কে জেল থেকে বের করে বুখ্‌ত নসরের সামনে হাজির করা হলো। তারপর বুখ্‌ত নসর হযরত আরমিয়া (আ)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার জাতির লোকদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান করেছিলেন? তিনি বললেন, অবশ্যই আমি তাদেরকে খুব সাবধান করেছিলাম। আপনি এগুলো স্পষ্ট করে কিভাবে জানতে পারলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নবী করে এদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বুখ্‌ত নসর জিজ্ঞেস করল, তারা কি আপনাকে মারপিট করেছে এবং জেলে আটকিয়ে রেখেছে? আরমিয়া (আ) উত্তরে বললেন, জি হ্যাঁ। বুখ্‌ত নসর বলল, কত বড় জঘন্য জাতি। যারা নিজ নবীকে

মিথ্যাবাদী বলে এবং নিজ প্রতিপালকের বাণীকে মিথ্যা বলে। বুখত নসর হযরত আরমিয়া (আ) কে বলল, আপনি কি আমার সাথে যাবেন? আমি আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করব ও আপনার সকল সমস্যা দূর করব। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আপনি আপনার নিজ দেশে অবস্থান করতে পারেন। এখানে আমি আপনার নিরাপত্তা প্রদান করব। হযরত আরমিয়া (আ) বললেন, আমি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে আছি। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী চলব ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরই আশ্রয় ও নিরাপত্তায় থাকব। বনী ইসরাঈলও যদি তাঁর আদেশ মতো চলতো, তবে তারা তাঁর আশ্রয় ও নিরাপত্তা থেকে বেরিয়ে আসত না এবং তারা তোমাকে কখনই ভয় করতো না এবং অন্যকেও ভয় করতো না। তুমি তাদের কোনই বিনাশ করতে পারতে না।

হযরত আরমিয়া (আ)-এর কথা শুনে বুখত নসর তাঁকে রেখে চলে গেল। অতঃপর আরমিয়া (আ) নিজ এলাকা ইলিয়ায় অবস্থান করতে থাকেন। এ বর্ণনাটি কিছুটা গরিব। এর মধ্যে উপদেশ, হিকমত ও আকর্ষণীয় বিষয় বর্ণনাও রয়েছে।

হিশাম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সায়িব কালবী (রা) বলেছেন, বুখত নসর লাহরাসব বাদশাহকে রোমে সৈন্য পাঠানো নির্দেশ দিয়েছিল। সে বলখ শহর নির্মাণ করেছিল। তার উপাধি ছিল 'খানসা'। বুখত নসর (বনী ইসরাঈলের উপর আক্রমণ করে) বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের হত্যা করে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে। বনী ইসরাঈলদের ধ্বংস করার পরে সিরিয়ায়ও একদল সৈন্য প্রেরণ করে। এ বাহিনীর সেনাপতি ছিল পারস্যের বাদশাহ বাহ্‌মান। তিনি বাশতাসব ইবনে লহবারের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। বনী ইসরাঈলগণ আল্লাহ তা'আলার রাসূলের উপর জুলুম-অত্যাচার করার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল।

ইবনে জারীর (রহ) হযরত সায়ীদ ইবনে মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বুখত নসর দামেশকে আগমন করে দেখতে পেল যে, সেখানকার একটি আবর্জনা ফেলার স্থান থেকে সবেগে রক্ত উত্থিত হচ্ছে। বুখত নসর লোকদের কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাকে জানানো হলো, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যুগ থেকেই এভাবে দেখে আসছি। এ রক্তের উপর যখনই কোনো আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়, তখনই রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে আরো দ্রুতবেগে উত্থিত হতে থাকে। বুখত নসর সেই আবর্জনা ফেলার স্থানে সত্তর হাজার মুসলমান ও অন্যান্যদের হত্যা করে। তারপর রক্ত উঠা বন্ধ হয়ে যায়। এ বর্ণনার সূত্র সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব পর্যন্ত বিশুদ্ধ। এর আগে হাফেজ ইবনে আসাকির (আ)-এর। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। কারণ, হযরত যাকারিয়া (আ) বুখত নসরের এক যুগ পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্ভবত এ রক্ত অন্য কোনো নবীর অথবা পূর্বেকার কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

হিশাম ইবনে কালবী (রহ) বলেছেন, বুখত নসর বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করলে বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ তার সাথে সন্ধি করেছিলেন। বুখত নসর কর ইত্যাদি গ্রহণ করে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ফিরে যায়। বুখত নসর 'তিবরীয়া' নামক এলাকা পর্যন্ত পৌছে খবর পেল যে, সন্ধি করার কারণে বায়তুল মুকাদ্দাসের বাদশাহর প্রতি বনী ইসরাঈলের লোকেরা ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। বুখত নসর এ সংবাদ পেয়ে বনী ইসরাঈলদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করে। তাদের যোদ্ধাদেরকে হত্যা করে এবং শিশুদেরকে বন্দী করে। বর্ণনাকারী এর সাথে সংযুক্ত করে বলেছেন, আমরা এভাবেও বর্ণনা পেয়েছি যে, তারপর বুখত নসর হযরত আরমিয়া (আ)-কে বন্দীখানা থেকে বের করে নিয়ে আসে। তিনি বুখত নসরের কাছে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা, জেলে আবদ্ধ করা ও তাদেরকে সাবধান করে দেয়ার সব ঘটনা খুলে বলেন।

বুখত নসর নবীর মুখে এ কথা শুনে বলল, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগা! যারা নিজ নবীর নাফরমানী করে। তারপর বুখত নসর হযরত আরমিয়া (আ)-কে তার সাথে যাওয়া ও না যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে

দিলেন এবং সে হযরত আরমিয়া (আ)-এর সাথে সুন্দর আচরণ করলেন। এরপর বনী ইসরাঈলের অবিশষ্ট লোকেরা হযরত আরমিয়া (আ)-এর কাছে এসে তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে বলল, আমরা খুবই অপরাধ করেছি। আমরা আপনার প্রতি জুলুম করেছি। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করছি। অতএব, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়া করেন। তিনি যেন দয়া করে আমাদের তওবা কবুল করেন। হযরত আরমিয়া (আ)-দো'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা নবীকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, তারা এখনো আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়নি। যদি তাদের এ কথা সত্যিই হয়ে থাকে তবে তারা যেন আপনার সাথে এ শহরে বসবাস করে। হযরত আরমিয়া (আ) তাদেরকে এ ওহীর কথা জানালেন। তারা বলল, আমরা এ শহরে কিভাবে অবস্থান করব? এ শহর তো ধ্বংস হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে এবং আল্লাহ এখানকার অধিবাসীদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এ অজুহাতে তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাস করতে অস্বীকার করল।

ইবনে কালবী (রহ) বলেছেন, এ সময় থেকেই বনী ইসরাঈল পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। একদল হিজাযে চলে যায়। একদল ইয়াসরেবে চলে যায়। একদল চলে যায় ওয়াদিউল কুররায়। একটি ক্ষুদ্র দল মিশরে চলে যায়। বুখ্‌ত নসর এ ক্ষুদ্র দলটির জন্য মিশরের বাদশাহর কাছে এ মর্মে একখানা চিঠি লিখে যে, এ লোকদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু মিশরের বাদশাহ তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তারপর বুখ্‌ত নসর বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে দ্রুত আক্রমণ চালিয়ে মিশরের বাদশাহকে পরাজিত করল এবং তাদের শিশুদেরকে বন্দী করল। তারপর সে পশ্চিম দেশসমূহে আক্রমণ চালিয়ে বিজয় বেশে পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে গেল। বায়তুল মুকাদ্দাস, মিশর, ফিলিস্তিন ও পশ্চিম দেশসমূহ থেকে অসংখ্য বন্দী ও মালামাল সাথে নিয়ে সে দেশে ফিরে যায়। সেই বন্দীদের মধ্যে হযরত দানিয়াল (আ)-ও ছিলেন।

এ দানিয়াল (আ) হলেন, দানিয়াল ইবনে হিযকিল ছোট দানিয়াল। বড় দানিয়াল নন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ)-ও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

হযরত দানিয়াল (আ)-এর ঘটনা

ইবনে আবিদ্ দুনিয়া (রহ) আব্দুল্লাহ ইবনে আবি হোযায়ল (রহ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, বুখত নসরের হাতে দুটি সিংহ আটক হয়। সে সিংহ দু'টিকে একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করে। অতঃপর হযরত দানিয়াল (আ)-কেও সেই কূপে ফেলে দেয়। কিন্তু সিংহ দুটি হযরত দানিয়াল (আ)-এর কোনই অনিষ্ট করেনি। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা করলেন কিছু দিন দানিয়াল (আ)-কে এই কূপে রাখবেন। সুতরাং তিনি সেখানে নিরাপদেই অবস্থান করতে রইলেন। মানবিক চাহিদা অনুযায়ী তাঁর ক্ষুধা পেলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুদূরে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত হযরত আরমিয়া (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, খাদ্য প্রস্তুত করে হযরত দানিয়াল (আ)-কে আহারের ব্যবস্থা করো। হযরত আরমিয়া (আ) আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে। আর এখান থেকে কত দূরে অবস্থিত ইরাকের বাবেল শহর। এখান থেকে কিভাবে সেখানে খাদ্য নিয়ে যাব? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমার সেখানে পৌছার ব্যবস্থা করব। হযরত আরমিয়া (আ) খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য এরূপ এক বাহন প্রেরণ করলেন, যে বাহন তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে সেই কূপের কাছে নিয়ে আসল। কূপের কাছে লোকের আলাপ পেয়ে হযরত দানিয়াল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কে? আরমিয়া (আ) বললেন, আমি আরমিয়া। দানিয়াল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে এখানে কে নিয়ে এসেছে? আরমিয়া (আ) বললেন, আপনার প্রভু। দানিয়াল (আ) বললেন, তবে আমার প্রভু কি আমাকে স্মরণ করেছেন? আরমিয়া (আ) বললেন, হ্যাঁ। তখন হযরত দানিয়াল (আ) বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য। যিনি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি সে বান্দাহকে কখনো ভুলেন না, যে তাঁর স্মরণ করে। সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি তাঁর উপর ভরসাকারীদেরকে অন্যের উপর ছেড়ে দেন না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি ধৈর্যের বিনিময় (বিপদ থেকে) মুক্তি দেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি আমার মসীবত ও অস্থিরতার পরে আমাকে মসীবত ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সমস্ত প্রশংশা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি আমাদেরকে সেই মুহূর্তে রক্ষা করেছেন, যখন আমাদের পাপের কারণে আমাদের ধারণায় কিছুটা ভ্রম দেখা দিয়েছিল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য, যিনি আমাদের সেই মুহূর্তের একমাত্র ভরসাস্থল, যখন আমরা সবার থেকে নিরাশ হয়ে পড়ছি।

আবু খালিদ ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, আবুল আলীয়া (রহ) বলেছেন, যখন আমরা বসরার নিকটবর্তী তুসতর শহর বিজয় করি, তখন আমরা হরমুজান বাদশাহর কোষাগারে একটি খাটে একটি মৃতদেহ দেখতে পেলাম। তার মাথার কাছে একখানা আসমানী কিতাব ছিল। আমরা সে কিতাব খানা নিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর খেদমতে পৌছালাম। হযরত ওমর (রা) হযরত কাব (রা)-কে ডেকে এনে এর অনুবাদ করার জন্য বললেন, তিনি আরবীতে এর অনুবাদ করলেন। অতঃপর আমিই সর্বপ্রথম আরাবী ব্যক্তি কিতাবখানা পাঠ করলাম। আমি এটি আমাদের আসমানী কিতাব কুরআন মাজীদের মতো পাঠ করেছিলাম। বর্ণনাকারী আবু খালিদ ইবনে দীনার (রহ) বলেছেন, আমি আবুল আলীয়া (রহ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, তাতে কি লেখা ছিল? তিনি বললেন, তাতে লেখা ছিল, "তোমাদের আচার, আচরণ ও অন্যান্য বিষয়ের কথা এবং তোমাদের বিভিন্ন কথাবার্তা এবং পরবর্তীতে ঘটিতব্য বিষয়াবলী।' তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপরে আপনারা এ মৃত দেহটিকে কি করলেন? তিনি বললেন, আমরা দিনের বেলায় তেরটি ভিন্ন ভিন্ন কবর খনন করে রাতের বেলায় একটি কবরে তাকে দাফন করলাম। এবং সবগুলো কবর একই রকম করে দিলাম। যাতে লোকেরা তার কবর খুঁজে বের করতে না পারে। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা এ ব্যক্তি থেকে কি আশা করতো? আবুল আলীয়া (আ) বলেছেন, যখন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়ে যেত, তখন লোকেরা তাঁর

খাট নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হতো এবং তাঁর ওসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করতো। তাঁর বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ হতো।

বর্ণনাকারী আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি এ লোকটির ব্যাপারে কি জানেন, তিনি কে ছিলেন, আবুল আলীয়া বললেন, তিনি দানিয়াল নামে পরিচিত ছিলেন। বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ধারণামতে কত বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন? আবুল আলীয়া (রহ) জবাবে বললেন, তিনশত বছর পূর্বে। বর্ণনাকারী আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর শরীর মাটিতে বিনাশ হয় না এবং কোনো জন্তু-জানোয়ার, পশুপক্ষীও তাঁদের দেহ ভক্ষণ করে না। এ বর্ণনার সূত্র আবুল আলীয়া (রহ) পর্যন্ত বিশুদ্ধ। তবে এ কথাটি চিন্তার বিষয় যে, এ ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ যদি আবুল আলীয়া (রহ)-এর বর্ণনানুযায়ী তিনশ বছর আগে সঠিক হয়, তবে এ ব্যক্তি নবী হতে পারে না। বরং ইনি হয়তো কোনো একজন বুজুর্গ ব্যক্তি হবেন। কারণ, বুখারী শরীফের সুস্পষ্ট হাদীছ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যবর্তী সময় কোনো নবী আগমন করেননি। এ দুইজন অতি মর্যাদাসম্পন্ন নবীর মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল চারশ বছর। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী ছয়শ বছর। কারো বর্ণনা মতে ছয়শ বিশ বছর। কারো মতে হযরত দানিয়াল (আ)-এর ওফাত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের আটশ বছর আগে। এ মৃতব্যক্তি হযরত দানিয়াল (আ)-ও হতে পারেন। কারণ, তাঁকে পারস্যের বাদশাহ বন্দী করেছিল। যে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবুল আলীয়া (রহ) পর্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত দানিয়াল (আ)-এর নাক ছিল এক বিঘত লম্বা। আর হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার নাক ছিল এক হাত লম্বা। এ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি অনেক আগের একজন নবী ছিলেন। আবু বকর ইবনে আবিদ দুনয়া (রহ) তাঁর লিখিত 'আহকামুল কুবুর' কিতাবে আশআসের আহমারী সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত দানিয়াল (আ) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর দাফন যেন উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ-এর হাতে হয়। পরবর্তীকালে যখন হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) 'তুসতর' নগরী বিজয় করেন, তখন হযরত দানিয়াল (আ)-এর মৃতদেহ একটি সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় পেলেন। তাঁর শিরাগুলো ও লোমকূপগুলো আগের মতই (নড়তে) ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি দানিয়াল (আ)-এর তথ্য দেবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হবে। 'হারকুস' নামক এক ব্যক্তি দানিয়াল (আ)-এর তথ্য দিয়েছিলেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) হযরত ওমর (রা) কে এ খবর পাঠালে হযরত ওমর (রা) হযরত দানিয়াল (আ)-কে দাফন করার জন্য নির্দেশ দেন এবং তথ্য প্রদানকারী হারকুসকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বললেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ব্যাপারে জান্নাতের সুখবর দিয়েছেন। অতঃপর আবিদ দুনিয়া (রহ) বলেছেন, হযরত আবু মুসা (রা) হযরত দানিয়াল (আ)-এর মৃতদেহের সাথে একখানা আসমানী কিতাব, চর্বি ভর্তি একটি পাত্র, কিছু দিরহাম ও একটি আংটি পেয়েছিলেন। হযরত আবু মুসা (রা) বিস্তারিত বর্ণনা লিখিত আকারে হযরত ওমর (রা) কে অবগত করেন। হযরত ওমর (রা) পত্রের উত্তরে বলেছিলেন, আসমানী কিতাবখানা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর চর্বি থেকে কিছু অংশ আমার জন্য প্রেরণ করো। বাকি চর্বি ওখানে রেখে দাও এবং মুসলমানগণকে বলো, তারা যেন এ চর্বি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করে। দিরহামগুলো তাদের মাঝে বিতরণ করে দাও। আর আংটিটি আমি তোমাকে উপহার হিসেবে প্রদান করলাম।

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ) আরো বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত দানিয়াল (আ) এর মৃতদেহ যখন দেখতে পেলেন, তখন লোকেরা তাঁকে জানালেন যে, ইনি হলেন হযরত দানিয়াল (আ)। তখন হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) হযরত দানিয়াল (আ)-এর মৃতদেহটি বুকের সাথে মিশিয়ে নিলেন এবং চুমু খেলেন। তারপর হযরত ওমর (রা)-এর কাছে এই খবর লিখে পাঠালেন এবং পত্রে এ কথাও উল্লেখ করলেন যে, তাঁর কাছে প্রায় দশ হাজার দিরহাম পাওয়া গেছে। এর থেকে বহুলোক কর্জ নিচ্ছে। যারা ফেরত দিয়ে যায়, তারা ভালই থাকে। আর যারা ফেরত না দেয় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আর তাঁর কাছে একটি সিন্দুক রয়েছে।

হযরত ওমর (রা) আবু মুসা আশয়ারী (রা)-কে আদেশ দিলেন যে, হযরত দানিয়াল (আ)-কে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করিয়ে, কাফন পরিয়ে এমনভাবে (অতি গোপনে) দাফন করবে, যাতে কেউ তাঁর কবরের সন্ধান না পায়। আর দিরহাম (ধন-সম্পদ) সম্পর্কে বললেন যে, সেগুলো সরকারি কোষাগারে জমা করো। আর সিন্দুকটি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আর আংটিটি আবু মুসা আশয়ারী (রা)-কে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হলো। আবু মুসা আশয়ারী (রা) বললেন, তিনি জেলখানা থেকে চারজন বন্দীকে ডেকে এনে তাদের দ্বারা নদীর পানি (বাঁধ দিয়ে) আটকিয়ে তার তলদেশে কবর খনন করিয়ে সেখানে হযরত দানিয়াল (আ)-এর লাশ দাফন করান। যেহেতু এ চারজন বন্দী ছাড়া, এ দাফনের খবর আর কেউ জানে না, তাই দাফন কাজ শেষে এ চারজনকে হত্যা করা হয়। (কাফেরদের সাথে যুদ্ধে তারা বন্দী হয়েছিল। তাই তাদেরকে হত্যা করা বৈধ ছিল)। সুতরাং এখন এ দাফনের খবর একমাত্র হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর অন্তরেই গোপন রয়ে গেল। ইবনে আবিদ দুনিয়া (রা) বলেন, ইবনে আবী যনাদ (রা) বলেছেন, আমি হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর পুত্র হযরত আবু বুরদাহ-এর হাতে একটি আংটি দেখেছি। যাতে দুটি সিংহ ও সিংহ দুটির মাঝে এক লোকের ছবি অংকিত ছিল। সিংহ দুটি সেই লোককে জিহ্বা দ্বারা চাটছে। হযরত আবী বারদাহ বললেন, এটি সেই মৃতব্যক্তির আংটি, যিনি এ শহরবাসীর কাছে দানিয়াল নামে পরিচিতি। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) তাঁকে দাফন করার সময় এই আংটিটি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। আবু বারদাহ বললেন, হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) সেই এলাকার জ্ঞানী ও পন্ডিতগণের কাছে এ আংটিতে অঙ্কিত ছবির রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা উত্তরে বললেন, যে বাদশাহর শাসনামলে হযরত দানিয়াল (আ)-এর আবির্ভাব হয়েছিল, সে বাদশাহর কাছে হযরত দানিয়াল (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে দেশের একদল গণক ও জ্যোতিষী এবং কয়েকজন বিজ্ঞ লোক এসে বলল, হে মহারাজ! অমুক রাতে এমন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করবে, যে শিশুটি বড় হয়ে আপনার রাজত্বকে ধ্বংস করে দেবে এবং আপনার বাদশাহীকে নিপাত করে দেবে। তখন বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! সে রাতে যে শিশুই ভূমিষ্ঠ হবে তাকেই হত্যা করা হবে। কিন্তু হযরত দানিয়াল (আ) যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন বাদশাহর লোকেরা তাঁকে সিংহের পালের মধ্যে ছেড়ে চলে যায়। যাতে লোকজনের দৃষ্টি সেদিকে না পড়ে। কিন্তু সিংহগুলো হযরত দানিয়াল (আ)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আদর করে জিহ্বা দ্বারা চাটতে লাগল এবং তাঁর সাথে খেলতে আরম্ভ করল। এভাবে আল্লাহ তা'আলা সিংহের দ্বারা হযরত দানিয়াল (আ)-কে রক্ষা করান। পূর্ণ জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে নিরাপদে পালিত হন। আবু বারদাহ (রা) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর বরাত দিয়ে বলেন, এ জনপদের আলেমগণ বলেছেন, তারপর হযরত দানিয়াল (আ) তাঁর আংটিতে এ দৃশ্য অঙ্কিত করে রাখেন। যাতে এটি দেখে আল্লাহ তা'আলার সেই করুণা কথা স্মরণ আসে এবং তাঁকে না ভুলেন। এ বর্ণনাটি হাসান পর্যায়ের।

বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংসের পর পুণঃ নির্মাণ এবং বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয়বার একত্রিত হওয়া

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন—

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۚ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

অর্থ : অথবা উদাহরণস্বরূপ ঐ লোকটির দিকে দেখ, যে এমন এক বস্তি পার হয়ে যাচ্ছিল, যার ছাদ উল্টে উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে লোকটি বলল, এ জনপদটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ একে কেমন করে আবার জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ তার জান কবজ করে তাকে একশ' বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তিনি তাকে আবার জীবিত করে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তুমি কতদিন পড়েছিলে? সে বলল, একদিন বা কয়েক ঘন্টা পড়েছিলাম হয়তো। আল্লাহ বললেন, তোমার উপর দিয়ে একশ' বছর এ অবস্থায়ই কেটে গেছে। এখন তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে একটু দেখ যে, তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অপরদিকে তোমার গাধাটির দিকে দেখ (এর হাড্ডি পর্যন্ত পচে যাচ্ছে)। আর আমি এ উদ্দেশ্যে এমন করেছি, যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটা নিদর্শন বানিয়ে দিতে পারি। তারপর দেখ, হাড্ডিসার এ কঙ্কালকে আমি উঠিয়ে কীভাবে তাতে গোশত লাগিয়ে দেই। এভাবে যখন আসল সত্য তার সামনে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন সে বলে উঠল; আমি জানি যে, আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান। -সূরা বাকারা : ২৫৯

হিশাম ইবনে কালবী (রহ) বলেছেন, হযরত আরমিয়া (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, আমি বায়তুল মুকাদ্দাসকে আবাদ করব। তুমি সেখানে যাও এবং সেখানেঅবস্থান করো। আরমিয়া (আ) সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানে বাস করতে লাগলেন। এ সময়ও বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল জনশূন্য এক বিধ্বস্ত এলাকা। এ অবস্থা দেখে তিনি (হতবাক হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এখানে অবস্থান করার জন্য আদেশ দিয়েছেন এবং আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ) এই জনমানবহীন নির্জন অঞ্চলটিকে পুনরায় আবাদ করবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ বিধ্বস্ত শহরটিকে কবে পুনঃনির্মাণ করবেন এবং কিভাবে কখন এটিকে আবাদ করবেন? এ চিন্তা করতে করতে তিনি একটু ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিল একটি গাধা ও কিছু খাদ্যদ্রব্য। এ এক ঘুমে তাঁর সত্তর বছর কেটে গেল। এ সময়ের মধ্যে বুখত নসর ও তার বাদশাহ লাহরাসব মারা যায়। লাহরাসব একশ বিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। লাহরাসব মারা যাওয়ারর পর তার পুত্র বাশতাসব বাদশাহ হন। তার সময়েই বুখত নসরের মৃত্যু হয়। বাশতাসবের কাছে সিরিয়া থেকে খবর আসে যে, এ শহরটি বিধ্বস্ত ও মানবশূন্য হয়ে পড়েছে। গোটা ফিলিস্তিন বন্য হিংস্র জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনো মানুষের নাম-গন্ধ বলতে কিছু নেই। তখন সে বাদশাহ (বাশতাসব) বাবেল শহরে ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা স্বইচ্ছায় তাদের নিজ দেশে যেতে ইচ্ছুক, তারা যেতে পারে। তারপর বাদশাহ হযরত দাউদ (আ)-এর এক বংশধরকে সেখানে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ নিযুক্ত করে তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি সেখানে পৌছে সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাসকে পূর্বের মতো জাঁক-জমক করে তুলবে। এরপর বনী ইসরাঈল নিজ দেশে ফিরে গেল এবং সেখানে গিয়ে তারা এলাকাটি আবাদ করল। শহর পুনরায় জনবসতিতে জাঁক-জমক হয়ে উঠল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আরমিয়া (আ)-এর চোখ খুলে দিলেন। তিনি জাগ্রত হয়ে শহরটির অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন এত অল্পসময়ের মধ্যে এ বিধ্বস্ত নগরটি কিভাবে নির্মিত হলো এবং কিভাবে এটি জাঁকজমক পূর্ণ হয়ে উঠল ও কিভাবে আবাদ হলো! তিনি মনে মনে ভেবে ছিলেন যে, তিনি মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে ছিলেন। নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে তিনি দেখেছিলেন নগরটি বিধ্বস্ত ও মানবশূন্য এক অনাবাদী এলাকা। আর নিদ্রা থেকে উঠে তিনি শহরটিকে নির্মিত অবস্থায় ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় দেখতে পেলেন। এ অল্প সময়ের ব্যবধানে এ বিরাট পরিবর্তন দেখে তিনি বলে উঠলেন, "আমি জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে পুনরায় নিজ দেশে আবাদ করিয়ে তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকর জীবন প্রদান করলেন। এভাবে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। অবশেষে (তাদের কৃতকর্মের কারণে) রোমীয়গণ তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে পরাজিত করে। এ পরাজয়ের পর বনী ইসরাঈল তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে।

ইবনে জারীর (রহ) অনুরূপভাবে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'লাহরাসব বাদশাহ ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ও সৎ বাদশাহ। তাঁর সৎচরিত্র ও সুন্দর আচরণের কারণে এলাকার লোকেরা এবং অন্যান্য বাদশাহগণ তাঁকে খুব ভালবাসতেন। এ বাদশাহ নগর নির্মাণ, খাল খনন, জিযিয়া (কর) আদায় করতেন এবং জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু ও সুন্দর মিমাংশা দিতেন। একশ বছর পরে যখন তিনি রাজ্য পরিচালনায় একটু দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তিনি তাঁর পুত্র বাশতাসবকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর সার্বিক দায়িত্ব অর্পণ করেন। তার শাসনামলেই অগ্নিপূজকদের আবির্ভাব হয়। তাদের সূচনা এভাবে হয় যে, জরদাশত নামক এক লোক হযরত আরমিয়া (আ)-এর সাথে থাকত। তার কিছু কাজে হযরত আরমিয়া (আ) অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে অভিশাপ দিলেন। এতে জরদাসত ধবল (শ্বেত) রোগে আক্রান্ত হয়। অতঃপর সে আজারবাইজানে গিয়ে বাশতাসবের সাথে মিলিত হয়ে তাঁর সাথী হয়ে যায়। এরপর সে (জরদাশত) নিজস্ব চিন্তাধারার উপর অগ্নিপূজা শুরু করে এবং বাশতাসবকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে তাকেও পথভ্রষ্ট করে। বাশতাসব নিজে এ নব আবিষ্কৃত ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী হয় এবং জনগণকেও এ ধর্ম পালন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। যারা অস্বীকার করেছে তাদের সবাইকে হত্যা করেছে। বাশতাসবের পরে তার পুত্র বাহমান পারস্যের শাসক হয়। প্রসিদ্ধ ও নামকরা বাদশাহদের মধ্যে বাহমানও ছিল একজন।

বুখত নসর দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিল। সে উপরিউক্ত তিন জন বাদশাহর শাসনামলেই তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মোটকথা ইবনে জারীর (রহ)-এর বর্ণনানুযায়ী এ বায়তুল মুকাদ্দাস জনপদ থেকে অতিক্রমকারী ব্যক্তি ছিলেন হযরত আরমিয়া (আ)। হযরত ওহবি ইবনে মুনাব্বিহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহ) প্রমুখ অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আর হযরত আলী (রা), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা), হাসান (রহ), কাতাদাহ (রহ), সুদ্দী (রহ) ও সোলায়মান ইবনে বরদাহ (রহ) প্রমুখ বলেন যে, এ ব্যক্তি হলেন হযরত উযায়ের (আ)। এ বর্ণনাটি প্রাচীন ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ বুযুর্গদের কাছে প্রসিদ্ধ ও গ্রহণীয়।

হযরত উযায়র (আ)-এর ঘটনা

হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, হযরত উযায়র (আ)-এর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ—

উযায়র ইবনে জারওয়াহ, কোনো কোনো বর্ণনা মতে সুরায়ক ইবনে আদিয়া ইবনে আয়ুব ইবনে দারাযিনা ইবনে উরাঈ ইবনে তাকী ইবনে উসবু' ইবনে ফিনহাত ইবনে আযির ইবনে হারুন ইবনে ইমরান। এক বর্ণনা মতে উযায়র (আ)-এর পিতার নাম ছিল 'সারাকা'। কিছু কিছু বর্ণনায় আছে যে, উযায়র (আ)-এর কবর দামেশকে অবস্থিত। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি উযায়র সম্পর্কে জানি না যে, তিনি নবী ছিলেন তা নবী ছিলেন না। তারপর আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (রহ) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনে বিশর ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হযরত উযায়র সেই ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে বুখত নসর বন্দী করেছিল। এ সময় তিনি শিশু ছিলেন। যখন তিনি চল্লিশ বছর বয়সে আগমন করেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলম ও হিকমত দান করেন। তাওরাত কিতাব মুখস্থে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী আর কেউ ছিলেন না। নবী (আ)-গণের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হতো। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে তাকদীর সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন নবীগণের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেয়া হয়। কিন্তু এ বর্ণনা সূত্রটি দুর্বল এবং সনদের ধারাবাহিকতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। এর কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। ইসহাক ইবনে বিশর (রহ) আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উযায়র (আ) এক ব্যক্তিই যাকে আল্লাহ তা'আলা একশ বছর মৃত অবস্থায় রেখে পরে পুনরায় জীবিত করেছিলেন। ইসহাক ইবনে বিশর (রহ) আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উযায়র (আ) একজন প্রজ্ঞাবান ও পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। চলার পথে বিশ্রামের জন্য একটি বিধ্বস্ত মানবহীন এলাকায় যাত্রা বিরতি করলেন। তখনো প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। তিনি তাঁর সাওয়ারী গাধাটির পৃষ্ঠ থেকে নিচে অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে খাদ্যদ্রব্য ভরতি দুটি ঝুড়ি ছিল। একটি ঝুড়িতে ছিল ডুমুর এবং অন্য ঝুড়িটিতে ছিল আঙ্গুর। তিনি বিধ্বস্ত একটি ভবনে বিশ্রাম নিলেন। তারপর নিজ থলে থেকে একটি পাত্র বের করে তাতে আঙ্গুর নিংড়িয়ে রস বের করলেন। তারপর শুকনা রুটি বের করে সেই আংগুর রসের মধ্যে ভিজালেন, যাতে রুটি কিছুটা নরম হয় ও সুস্বাদু (মিষ্ট) হয়। কিছু পরে খাবেন বলে রুটির পাত্রটি পার্শ্বে রেখে তিনি একটু চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। শোয়া অবস্থায় বিধ্বস্ত ভবনের চাদের দিকে তাঁর নযর পড়ল। তিনি দেখতে পেলেন যে, ভবনটি তার স্তম্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর অধিবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদের পুরাতন হাড্ডিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর যবান থেকে তৎক্ষণাৎ স্বাভাবিক অবস্থায়ই বের হলো, 'انى يحى هذه الله بعد موتها' "তাদের মৃত্যুর পরে আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় কিভাবে জীবিত করবেন? আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করতে পারবেন না, এ সন্দেহ কখনই তাঁর ছিল না। বরং পুনরায় জীবিত করার কথা চিন্তা করে অবাক হয়ে তিনি এ কথা বলেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর কাছে পাঠালেন। তিনি এসে হযরত উযায়র (আ)-এর রূহ কবয করলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা একশ বছর পর্যন্ত তাঁকে মৃত অবস্থায় রাখেন। যখন একশ বছর পূর্ণ হলো এবং এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বনী ইসরাঈলের মাঝে বহু ঘটনা ঘটে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উযায়র (আ)-এর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। যিনি এসে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে উযায়র (আ)-এর অন্তরকে সৃষ্টি করলেন, যাতে তিনি অনুধাবন করতে পারেন এবং চোখ বানিয়ে দিলেন, যাতে দিনি দেখতে পারেন। অর্থাৎ তিনি চোখ দ্বারা দেখে যাতে বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ মৃতকে কিভাবে জীবিত করবেন। তারপর উযায়র (আ)-এর পুনঃসৃষ্টির কার্যক্রম শুরু হয়। তিনি এগুলো সমস্ত স্বচক্ষে অবলোকন করলেন এবং সাথে সাথে অনুধাবন করলেন। প্রথমে তাঁর বিক্ষপ্ত হাড্ডিগুলোকে একত্রিত করে তা গোশত দ্বারা আবৃত করা

হলো। এরপর গোশতগুলো চামড়া দ্বারা ঢেকে দেওয়া হলো। তারপর তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হলো। উযায়র (আ) এসব দৃশ্যগুলো স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। তারপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন। ফেরেশতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কত সময় অবস্থান করছেন? তিনি উত্তরে বললেন, একদিন বা দিনের কিছু সময়। কারণ, তিনি দিনের প্রথমভাগে বিশ্রামে গিয়েছিলেন। আর ফেরেশতা যখন তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিলেন, তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। ফেরেশতা বললেন, না বরং আপনি এখানে একশ বছর অবস্থান করেছেন। আপনি আপনার খাদ্রদ্রব্য ও পানীয়'র দিকে তাকিয়ে দেখেন। যা এখন পর্যন্ত নষ্ট হয়নি। শুকনা রুটি এখন পর্যন্ত শুকনাই রয়েছে। আঙ্গুরের রস সে অবস্থায় আছে। এ দুটির মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। অনুরূপভাবে ডুমুর এবং আঙ্গুর ফলগুলোও তরতাজা অবস্থায় রয়েছে। হযরত উযায়র (আ)-এর অন্তরে এত দীর্ঘ সময় অবস্থান করা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। ফেরেশতা বললেন, আপনি যদি আমার এ কথা অবাস্তব ও মিথ্যা মনে করেন, তবে আপনি আপনার গাধাটির প্রতি দৃষ্টি করুন। উযায়র (আ) গাধাটির দিকে তাঁকিয়ে দেখেন যে, সেটির হাড্ডি পর্যন্ত পুরনো হয়ে গেছে এবং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ফেরেশতা আল্লাহর হুকুমে বিক্ষিপ্ত পুরনো হাড্ডিগুলোকে একত্রিত হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। সেগুলো দ্রুত এসে একত্রিত হয়ে গেল। উযায়র (আ) এসব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছিলেন। তারপর সেই হাড্ডিগুলোর উপর রগ সংযোগ করে দেয়া হলো। এরপর গোশত দ্বারা তা পরিপূর্ণ করে উপরে চামড়া দ্বারা আবৃত করে দেয়া হলো। তারপর ফেরেশতা তাতে রূহ সঞ্চার করে দিলেন। সাথে সাথে গাধাটি জীবিত হয়ে আকাশের দিকে নিজ মাথা ও কর্ণ খাড়া করে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার দিতে লাগল। গাধাটি সম্ভবত মনে করেছিল যে, কিয়ামত আরম্ভ হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

অর্থ : এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ করো। কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ করো; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। যখন এটা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান'।

~সূরা বাকারা : ২৫৯

অতঃপর উযায়র (আ) তাঁর সেই সাওয়ারী গাধাটির পিঠে আরোহণ করে নিজ এলাকায় চলে যান। এলাকার লোকেরা কেউই তাঁকে চিনতে পারল না। আর তিনি নিজেও তাঁর নিজ বাড়ী-ঘর চিনতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অনুমান করে নিজ গৃহে পৌঁছলেন। সেখানে অন্ধ লেংড়া এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেলেন। যার বয়স ছিল একশ বছর। এ বৃদ্ধা ছিলেন সে ঘরের আযাদকৃত এক দাসী। উযায়র (আ) যখন এই ঘর থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, তখন এ বৃদ্ধা ছিল বিশ বছরের এক যুবতী। তখন তিনি উযায়র (আ)-কে ভালভাবে চিনতেন। হযরত উযায়র (আ) সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৃদ্ধা এটা কি উযায়রের ঘর? বৃদ্ধা উত্তর দিলেন হ্যাঁ।

অতঃপর বৃদ্ধা কেঁদে দিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, আমি এত বছর পর্যন্ত কারো মুখে উযায়রের নাম শুনিনি। লোকেরা তাঁর কথা একেবারেই ভুলে গেছে। তখন হযরত উযায়র (আ) বললেন, আমিই উযায়র। আল্লাহ তা'আলা আমাকে একশত বছর পর্যন্ত মৃত্যু অবস্থায় রেখেছিলেন। অতঃপর আমাকে পুনরায় জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা অবাক হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! দীর্ঘ একশ বছর পর্যন্ত উযায়র তো আমাদের থেকে হারিয়ে গেছেন। কারো কাছে তাঁর কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি। আপনি কিভাবে উযায়র হতে পারেন?

উযায়র (আ) বললেন, আপনি বিশ্বাস করুন আমি নিশ্চয়ই উযায়র। তখন বৃদ্ধা বললেন, উযায়র তো এমন ব্যক্তি, 'মুস্তাজাবুদ দাওয়াত' ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দোয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবুল হয়ে থাকে। তিনি কারও

রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করলে তার রোগ নিরাময় হয়ে যেত। কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য দোয়া করলে তার বিপদ দূর হয়ে যেত। সুতরাং আপনি আমার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন। তবে আমি আপনাকে দেখে বলতে পারব। আপনি সত্যিই উযায়র কিনা? তখন উযায়র (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য দোয়া করলেন এবং তাঁর নিজ পবিত্র হাত বৃদ্ধার চোখের উপর বুলালেন। সাথে সাথে বৃদ্ধা দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। বৃদ্ধা যেহেতু লেংড়া ছিলেন, তাই উযায়র (আ) তার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে আপনি দাঁড়ান। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তার পা ভাল হয়ে গেল এবং তিনি (বৃদ্ধা) দাঁড়িয়ে গেলেন। বৃদ্ধার মনে হলো যেন, তিনি রশির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। অতঃপর বৃদ্ধা উযায়র (আ) কে স্বচক্ষে দেখে বলে উঠলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনিই উযায়র'। তারপর বৃদ্ধা বনী ইসরাঈলের এলাকায় গিয়ে তাদের এক মজলিসে হাজির হলেন। সে মজলিসে উযায়র (আ)-এর এক পুত্রও হাজির ছিলেন। তার বয়স ছিল একশ আঠার বছর। সে মজলিসে উযায়র (আ)-এর পুত্র ছাড়াও তাঁর পৌত্ররাও (অর্থাৎ পুত্রের পুত্রগণও) হাজির ছিলেন। তাঁরা সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বৃদ্ধা সে মজলিসে গিয়ে বললেন, উযায়র তোমাদের কাছে ফিরে এসেছেন। লোকেরা বৃদ্ধাকে মিথ্যাবাদী বলল। বৃদ্ধা তাঁদের কাছে তাঁর নিজের পরিচয় বর্ণনা করে বললেন, আমি তোমাদের অমুক পরিবারের আযাদ কৃতদাসী। এ উযায়র আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে আমি আমার দৃষ্টি শক্তি পুনরায় ফিরে পেয়েছি এবং আমার পঙ্গুত্ব ভাল হয়ে গেছে। এখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। উযায়র আমার কাছে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রেখেছিলেন। পুনরায় তাকে জীবিত করেছেন। বৃদ্ধার কাছে এ কথা শুনে সমস্ত মানুষ অবাক হয়ে তাঁকে দেখার জন্য তাঁর বাড়ীতে গেল এবং তাঁকে ভালরূপে দেখতে লাগল। উযায়র (আ)-এর পুত্র তাঁকে দেখে বললেন, আমার পিতার দু কাঁধের মাঝে একটি কালো দাগ আছে। তখন তিনি কাঁদের কাপড় সরিয়ে ফেললে সেই কালো দাগটি সবাই দেখে নিশ্চিত হলো যে, ইনিই উযায়ের (আ)। তারপর বনী ইসরাঈলগণ বলল, আমাদের মাঝে হযরত উযায়র (আ) ব্যতীত অন্য আর কেউ তাওরাতের পূর্ণ হাফেজ ছিলেন না। বুখত নসরের তাওরাতের কপি জ্বালিয়ে দেয়াতে তাওরাতের শুধু সেই অংশই এখন বাটি রয়েছে, যতটুকু লোকেরা মুখস্থ করে রেখেছিল। সুতরাং আপনি সম্পূর্ণ তাওরাত কিতাব লিখে আমাদের কাছে পেশ করুন।

উযায়র (আ)-এর পিতা বুখতে নসরের সময় তাওরাতের কপি মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। সেই স্থানটির সন্ধান হযরত উযায়র (আ) ছাড়া আর কেউ জানতেন না। সুতরাং হযরত উযায়র (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সে স্থানে গেলেন এবং মাটি খুড়ে তাওরাতের সেই কপি বের করলেন। কিতাবের পাতাগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এবং লেখাও মুছে গিয়েছিল। তারপর উযায়র (আ) (বিশ্রামের জন্য) একটি বৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে বসলেন। বনী ইসরাঈলের লোকেরাও তাঁর চার পাশে বসে গেলেন। ইত্যবসরে আকাশ থেকে দুটি অগ্নিশিখা নিচে পতিত হয়ে হযরত উযায়রের পেটের মধ্যে প্রবেশ করল। সাথে সাথে তাঁর সম্পূর্ণ তাওরাত কিতাব স্মরণ হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ তাওরাত লিখে বনী ইসরাঈলের কাছে পেশ করলেন। এ কারণে বনী ইসরাঈল হযরত উযায়র (আ)-কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে।

তিন কারণে বনী ইসরাঈলগণ হযরত উযায়র (আ) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে।

১. তাঁর নতুন করে সম্পূর্ণ তাওরাত কিতাব লিখে দেয়া।

২. দুটি অগ্নিশিখা আকাশ থেকে পতিত হয়ে তাঁর পেটের মধ্যে প্রবেশ করার অলৌকিক ঘটনা।

৩. তাঁর বনী ইসরাঈলের তত্ত্বাবধায়ক ও নেতা হওয়া।

হযরত উযায়র (আ) 'সাওয়াদ' এলাকায় অবস্থিত হযরত হিযকিল (আ)-এর বাসস্থানে বসে তাওরাত শরীফ লিখেছিলেন এবং সেখানকার যে অধিবাসীরা ধ্বংস হয়েছিল, তাদের নাম ছিল 'সায়িরাবায'।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হযরত উযায়র (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী (আমার ইচ্ছা) আপনাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন বানাব। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য এটি এরূপ এক নিদর্শন ছিল যে, তিনি (উযায়র

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুত্র ও পৌত্রদের সাথে একই মজলিসে বসতেন। তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা বৃদ্ধ ছিলেন। আর তিনি নিজে ছিলেন যুবক। কারণ, তাঁর ওফাত হয়েছিল চল্লিশ বছর বয়সের সময়। যখন তিনি পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন, তখনো তাঁর বয়স সেই চল্লিশ বছরই থেকে যায়।

আবু হাতেম সিজিসতানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর এ বর্ণনাকে কবিতা আকারে বর্ণনা করেছেন। অনুবাদ—

'মাথার চুল ছিল তাঁর কালো, হননি তিনি বুড়ো,
পৌত্ররা সবাই তাঁর আগে হয়ে গেছেন বুড়ো।
পুত্ররা তাঁর যখন হয়েছেন বৃদ্ধ, লাঠি দিয়ে চলে,
তার দাড়ি তখনো কালো, মাথার চুল তার জ্বলে।

পুত্র তাহার যখন বার্ধক্যতায় পড়ে যায়,
দাঁড়াতে চাইলেও শিশুর মতো পড়ে আছাড় খায়।
লোকের সাথে চলে পুত্র নব্বই বছর ধরে,
পরের বিশটি বছর সে (পুত্র) অচল হয়ে পড়ে।

পুত্রের বয়স নব্বই বছর পার হয় যখন,
পিতার বয়স চল্লিশ বছর মাত্র তখন।
জ্ঞানী হলে বুঝতে পারবে এ প্রসঙ্গে মর্মতা,
বুঝতে তুমি ব্যর্থ হলে এটা তোমার অক্ষমতা।

হযরত উযায়র (আ)-এর নবুওয়াত

হযরত উযায়র (আ) বনী ইসরাঈলের নবীদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন। ইনি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ)-এর পরের এবং হযরত ইয়াহইয়া ও যাকারিয়া (আ)-এর পূর্বের নবী। বনী ইসরাঈলের কারো যখন তাওরাত কিতাব মুখস্থ ছিল না, (সবাই তাওরাত ভুলে গিয়েছিল) তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত উযায়র (আ)-এর অন্তরে তাওরাতকে অন্তঃস্থিত করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাওরাতকে মুখস্থ করে বনী ইসরাঈলের কাছে বর্ণনা করেন।

ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশে এক ফেরেশতা আকাশ থেকে এক ঝলক নূর নিয়ে অবতরণ করেন এবং তা হযরত উযায়র (আ)-এর পেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। এ নূরের বরকতে ও আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহে তাঁর তাওরাত মুখস্থ হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ তাওরাতকে তিনি লিখে দেন। একটি অক্ষরও বাদ পড়েনি। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (আ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী قال اليهود عزير ابن الله 'ইয়াহুদীরা বলে থাকে, উযায়র আল্লাহর পুত্র' এর অর্থ কি?

ইয়াহুদীদের এরূপ কথা বলার কারণ কি? আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) উত্তরে বললেন, উযায়র (আ) বনী ইসরাঈলের জন্য সম্পূর্ণ তাওরাতকে মুখস্থ করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈল বলেছিল, হযরত মুসা (আ)-ও কিতাব দেখা ছাড়া সম্পূর্ণ তাওরাত মুখস্থ শোনাতে পারতেন না। অথচ হযরত উযায়র (আ) লেখা ও কিতাব ব্যতীতই মুখস্থ তাওরাতকে আমাদের কাছে পেশ করেছেন। এ কারণে বনী ইসরাঈলের একদল লোক উযায়রকে আল্লাহর পুত্র বলে আখ্যায়িত করে। এ কারণে অধিকাংশ আলেম বলেন, তাওরাত সাযিলের ধারাবাহিকতা হযরত

উযায়র (আ)-এর যামানায় এসে শেষ হয়েছে। উযায়র (আ) যদি নবী না হন, তবে এটি হওয়া এক বিস্ময়কর ধারণা।

হাসান বসরী (রহ) ও আতা ইবনে আবী রিবাহ মাকাতিল ইবনে সোলায়মান থেকেও এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আতা (রহ) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ওসমান ইবনে আতা খোরাসানীও তাঁর পিতা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, হযরত উযায়র (আ) ও বুখত নসরের সময়-কালটি ছিল 'ফাতরতের' যুগে। (অর্থাৎ এ সময় আসমানী ওহীর সিলসিলা বিরতি ছিল) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মারয়াম পুত্র (ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)- এর সাথে ভালবাসা ও নৈকট্যের দিক দিয়ে আমিই অধিক নিকটতম। কারণ আমার ও তাঁর মাঝে কোনো নবী আসেন নি। (বোখারী)

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেছেন, হযরত উযায়র (আ) হযরত সোলায়মান ও হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যবর্তী সময় আগমন করেছিলেন। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) বলেছেন, হযরত উযায়র (আ) হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু মূসা (আ) অনুমতি দেননি। কারণ উযায়র (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে তাকদীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন। তখন উযায়র (আ) এ বলে ফিরে গেলেন যে, ক্ষণিকের লাঞ্ছনার চেয়ে শতবার মৃত্যু শ্রেয়। হযরত উযায়র (আ)-এর এ উক্তিটি জনৈক কবি কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন।

অনুবাদ—

'বীর বাহাদুর মুক্ত আযাদ স্বাধীনচেতা যিনি
মোকাবিলায়, দুঃখ কষ্টে ধৈর্য ধরেন তিনি।
কিন্তু যদি মেযবান থেকে বিমুখ হয়ে আসে,
তার চাইতে মৃত্যুকে সে অনেক ভালোবাসে।'

অতএব, ইবনে আসাকির (রহ) প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা), নাওফ আল বাকালী ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ) প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'হযরত উযায়র (রা) তাকদীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন, এ কারণে তাঁর পবিত্র নাম নবীগণের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, এ কথার বাস্তবতা কি? এ কথাটি ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এটি সংগৃহীত। নাওফ আল বাকালী (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত উযায়র (আ) কোনো এক মুনাজাতে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করেছিলেন, হে প্রভু! আপনি নিজ কুদরতী হাতে সমস্ত মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর কাউকে আপনি সৎপথে পরিচালিত করেন। আবার কাউকে পথভ্রষ্ট করেন, এর কারণ কি? আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উযায়র (আ)-কে বলা হলো, তুমি এরূপ প্রশ্ন থেকে বিরত থাক। কিন্তু তিনি পুনরায় এ প্রশ্নটি করলেন। এবারেও তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো, তুমি এসমস্ত প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। অন্যথায় আমি নবীদের তালিকা থেকে তোমার নাম বাদ দিয়ে দেব। আমার কাজের উপর প্রশ্ন করার অধিকার কারো নেই। আর মানুষকে তার কর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে হবে। এ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উযায়র (আ) যদি দ্বিতীয় বার অনুরূপ প্রশ্ন করতেন তবে তার নাম নবীদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হতো। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার অনুরূপ প্রশ্ন করেননি। সুতরাং নবীদের তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়েনি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নবীদের মধ্যে একজন নবী কোনো এক বৃক্ষের তলায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করল। এতে সে (নবী) বিচ্ছুটিকে ধরে আগুনে জালিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানালেন, তুমি একটি বিচ্ছুর দংশনের জন্য তাকে এত কঠিন শাস্তি দিলে?

হযরত মুজাহিদ (রহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে যে নবীর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন হযরত উযায়র (আ)। হযরত হাসান বসরী (রহ) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ছিলেন উযায়র (আ)। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা

হযরত যাকারিয়া (আ) একজন নবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- যাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। (হে নবী!) এটা তার বান্দাহ যাকারিয়ার উপর আপনার রবের রহমতের বিবরণ, যখন তিনি তাঁর রবকে চুপে চুপে ডেকেছিলেন। তিনি আরয করলেন, হে আমার রব! আমার হাড় পর্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মাথা বার্ধক্যে চকমক করছে। হে আমার রব! আমি কখনো তোমার কাছে দোয়া চেয়ে ব্যর্থ হইনি। আমার পর আমার বন্ধুদের পক্ষ থেকে অনিষ্টের ভয় করি। আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (এ অবস্থায়) তোমার খাস মেহেরবানী থেকে আমাকে এমন একজন ওয়ারিশ দান করো, যে আমারও ওয়ারিশ হবে এবং ইয়াকুবের বংশেরও ওয়ারিশ হবে। হে রব! তাকে একজন পছন্দনীয় মানুষ বানিয়ে দাও। (জবাব দেওয়া হলো) হে যাকারিয়া! আমি আপনাকে একটি পুত্র সন্তানের সুখবর দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। এর আগে আমি এ নামের কোনো মানুষ পয়দা করিনি। যাকারিয়া আরয করলেন, হে আমার রব! কেমন করে আমার সন্তান হবে? আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছি। (জবাব এল) এ রকমই হবে।[১] আপনার রব বলছেন, এটা তো আমার জন্য সামান্য ব্যাপার। এর আগে আমি আপনাকে পয়দা করেছি, যখন আপনি কিছুই ছিলেন না। যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব! আমার জন্য কোনো নিদর্শন ঠিক করে দাও। আল্লাহ বললেন, আপনার জন্য এটাই নিদর্শন যে, আপনি একটানা তিনদিন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবেন না। তারপর তিনি মেহরাব থেকে বের হয়ে তার কাওমের কাছে এলেন এবং তিনি ইঙ্গিতে তাদেরকে হেদায়াত করলেন যে, তোমরা সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ করো। হে ইয়াহইয়া! আল্লাহর কিতাবকে মযবুতভাবে ধরুন।[২] আমি তাঁকে ছোট বয়সেই হুকুম[৩] দ্বারা ধন্য করেছি। আমার পক্ষ থেকে তাকে নরম দিল বানিয়েছি এবং পাক-পবিত্র করেছি। তিনি বড়ই মুত্তাকী ছিলেন। তিনি পিতা-মাতার খুব বাধ্য ছিলেন। অহঙ্কারী ও নাফরমান ছিলেন না। তার উপর সালাম, যেদিন তিনি পয়দা হলেন, যেদিন তিনি মরবেন এবং যেদিন তাকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে।

সূরা আল ইমরানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ج قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ج اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاۗءُ ۞ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۞

অর্থ : এ অবস্থা দেখে যাকারিয়া নিজের রবের কাছে দোআ করলেন, হে আমার রব! তোমার কাছ থেকে আমাকে নেক সন্তান দান করো। তুমিই দো'আ শুনে থাক। যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাকে ডেকে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তিনি আল্লাহর

১. অর্থাৎ তুমি বুড়ো এবং তোমার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের সন্তান হবে।

২. মাঝখানের এই বিবরণ এখানে বাদ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ ফরমান অনুযায়ী হযরত ইয়াহইয়া (আ) জন্ম নিয়েছিলেন এবং যুবকরূপে বেড়ে উঠেছিলেন।

৩. 'হুকুম' অর্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার শক্তি। ইজতিহাদের ক্ষমতা, দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক বুঝ, বৈষয়িক ব্যাপারে সঠিক মতামত দেওয়ার যোগ্যতা এবং সব ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা দেয়ার অধিকার।

পক্ষ থেকে এক বাণীর সত্য প্রমাণকারী হিসেবে আসবেন। তাঁর মধ্যে নেতাসুলভ গুণ থাকবে, পূর্ণরূপে নিয়ম পালনকারী হবেন, নবুওয়াতের অধিকারী হবেন এবং সৎলোকদের মধ্যে গণ্য হবেন। যাকারিয়া বললেন, হে আমার রব! আমার ঘরে ছেলে কোথা থেকে হবে? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, আর আমার বিবিও বন্ধ্যা। এর জবাব এলো, এ রকমই হবে, আল্লাহ যা চান তা-ই করেন। যাকারিয়া নিবেদন করলেন, 'হে আমার রব! তাহলে আমার জন্য কোনো আলামত ঠিক করে দাও।' আল্লাহ বললেন, এর আলামত এই যে, আপনি তিনদিন পর্যন্ত ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কারো সাথে কথা বলবেন না (বা বলতে পারবেন না), এ সময়ের মধ্যে আপনার রবকে বেশি করে মনে করবেন এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ করতে থাকবেন। -সূরা আল ইমরান : ৩৮-৪১

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- তারপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে প্রদান করেছিলাম ইয়াহইয়া এবং তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করেছিলাম। তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করতো, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। -সূরা আম্বিয়া : ৯০

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- এবং যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলইয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম। এরা ছিল সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত'। -সূরা আনআম : ৮৫

হাফেজ আবুল কাসেম ইবনে আসাকির (রহ) তাঁর 'হাফেল' নামক প্রসিদ্ধ কিতাবে বর্ণনা করেছেন, যাকারিয়া (আ)-এর পিতার নাম বারখিয়া। অন্য এক বর্ণনা মতে তাঁর পিতার নাম দান। আর এক বর্ণনা মতে তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ-

যাকারিয়া ইবনে লাদুন ইবনে মুসলিম ইবনে সাদুক ইবনে হাশবান ইবনে দাউদ ইবনে শালুম ইবনে বাহনাশাত মাত ইবনে আয়নামান ইবনে রাহরীয়াম ইবনে সোলায়মান ইবনে দাউদ। তাঁর উপাধি ছিল আবু ইয়াহইয়া নবী (আ)। যাকারিয়া (আ) তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া (আ)-এর সন্ধানে দামেশকের বুসায়না নগরে গিয়েছিলেন। বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ) শাহাদত বরণ করেন, তখন তাঁর পিতা হযরত যাকারিয়া (আ) দামেশকেই ছিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ)-এর নাম উচ্চারণের সময় নামের শেষোক্ত অক্ষর আলিফযুক্ত ইয়াটি একটু টেনে পড়া যায়। আর না টেনেও পড়া যায়। আর এক বর্ণনা মতে তাঁর নাম ছিল যাকারা। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে আদেশ দিলেন যে, হে নবী! হযরত যাকারিয়া সম্পর্কে লোকদের কাছে বর্ণনা করুন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বার্ধক্য হওয়া সত্ত্বেও এবং তার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও একটি পূর্ণবান শিশু সন্তান দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া থেকে কারো নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটা আপনার প্রভুর অনুগ্রহের বর্ণনা তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, যখন সে তার প্রভুকে ডেকেছিল নির্জনে (অতি গোপনে)।

হযরত কাতাদাহ (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র ও নিষ্কলুষ আত্মাকে ভালভাবেই জানেন এবং ক্ষীণ আওয়াজকে ভালভাবেই শোনেন।

কোনো কোনো বুযুর্গ বলেছেন, 'হযরত যাকারিয়া (আ) রাতের বেলা দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে নির্জনে মুনাজাত করে আরয করতেন, হে রব! হে রব! হে রব! আল্লাহ তা'আলা বান্দার উত্তরে বলতেন, জী- বান্দা, জী-বান্দা, জী বান্দা। অতঃপর যাকারিয়া (আ) আরয করতেন, প্রভু! আমার হাঁড় অতি দুর্বল। আমার মাথায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকাশ পেয়েছে, (অর্থাৎ চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে)। অর্থাৎ আগুন কাঠকে যেভাবে গ্রাস করে শেষ করে দেয়, অনুরূপ বার্ধক্য আমাকে গ্রাস করেছে এবং মাথার কালো চুলকে সাদা বানিয়ে দিয়েছে। যেমন, জনৈক কবি তাঁর কাব্যে লিখেছেন—

'মাথার দিকে চেয়ে দেখ মোর কিরূপ রং দেখা যায়,
যেন সূর্যের আলো আছে লেগে কালো মেঘের কিনারায়।

কালো জায়গা ধবধব করছে এমনভাবে শুভ্রতায়,
শুকনো কাষ্ট জ্বলে যেমন অগ্নির যদি ছোঁয়া পায়।
সুরাইয়া নামক তারার মতো চেহারা মোর জ্বলছিল,
বার্ধক্যরূপ অগ্নি এসে সেই চেহারা শেষ করিল'।

অর্থাৎ দুর্বলতা ও বার্ধক্য হযরত যাকারিয়া (আ)-কে ঘিরে ধরেছিল। উল্লিখিত আয়াতেরই এই অর্থ যে, "আমার শরীর দুর্বল হয়ে গেছে এবং মাথায় বার্ধক্যের ছাপ প্রকাশ পেয়েছে।" অর্থাৎ কাঁচা চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে।

হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে বলেছিলেন যে, "আমি আপনাকে ডেকে কখনো ব্যর্থ হইনি" এর অর্থ আমি যখনই যে কোনো কাজে আপনার কাছে দো'আ করেছি, আপনি সাথে সাথে তা কবুল করেছেন।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সন্তানের জন্য যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল এবং এজন্য তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দোয়াও করেছিলেন, তা হযরত মারইয়াম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও বিস্ময়কর নেয়ামত অবলোকন করে।

বর্ণিত আছে, হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ) হযরত যাকারিয়া (আ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখাশুনা করতেন। যাকারিয়া (আ) যে সময়ই (বায়তুল মুকাদ্দাসে) মারয়াম (আ)-এর কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর সম্মুখে অসময়ের বিভিন্ন ধরনের ফল দেখতে পেতেন। এগুলো হচ্ছে বুযুর্গদের অলৌকিক ঘটনা। এরূপ বিস্ময়কর জিনিস দেখে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর মনে এ চিন্তার উদ্রেক হলো যে, যিনি অকালে ও অসময়ে (মওসুম ছাড়াই) বিভিন্ন ধরনের ফল ও খাদ্যদ্রব্য তাঁর প্রিয় বান্দাকে প্রদান করতে সক্ষম, তিনি বার্ধক্য ও বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও সন্তান দান দান করতে অবশ্যই সক্ষম। এ প্রসঙ্গেই কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে, 'যাকারিয়া তাঁর প্রতিপালকের কাছে দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আপনার নিকট থেকে আমাকে সৎবংশধর দান করেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। –সূরা আল ইমরান : ৩৮

আমি আশঙ্কা করছি আমার পর আমার স্বজাতিদের সম্পর্কে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। স্বজাতি দ্বারা এখানে সে সব আত্মীয়-স্বজনদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ আত্মীয়তার দাবিতে মৃতের সম্পত্তির অধিকারী যাকারিয়া (আ) তাদের থেকে এই আশঙ্কা করছিলেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে সম্ভবত এরা বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও নির্দেশাবলী থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ কারণে তিনি এমন একটি সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেছিলেন, যে সন্তান হবে মুত্তাকী, পরহেযগার, সৎ এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি। সুতরাং তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করেছিলেন, "আপনি আপনার তরফ থেকে (নবুওয়াত ও বনী ইসরাঈলের রাজত্বে) এমন উত্তরাধিকারী প্রদান করুন, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকুবের বংশের। হে আমার পরওয়ারদেগার! তাকে করো সন্তোষভাজন।"

অর্থাৎ যেরূপে ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর থেকে নবী হয়েছে এবং আপনি তাঁদেরকে নবুওয়াত ও ওহীর দ্বারা মর্যাদা দান করেছেন, অনুরূপ আমাকে পুত্র সন্তান দান করে তাঁকেও আপনার পক্ষ থেকে এরূপ অনুগ্রহ (নবুওয়াত ও ওহী) দান করুন। এখানে উত্তরাধিকারী বলতে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়নি। যেমন- শিয়াদের ভ্রান্ত আকীদা (বিশ্বাস) তারা উত্তরাধিকারী বলতে ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মনে করে। ইবনে জারীর (রহ) শিয়াদের এ মতকে সমর্থন করেছেন। তিনি আবু সালেহ থেকে এর স্ব-পক্ষের দলীলও বর্ণনা করেছেন। শিয়াদের এ মত ভ্রান্ত হওয়ার কয়েকটি কারণ ও দলীল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

(এক) আল্লাহ তা'আলার বাণী 'সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী'। এখানে নবুওয়াত ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যার আলোকে বুখারী ও মুসলিমসহ সুন্না এবং মুসনাদে নামক গ্রন্থে

কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম (আ)-এর বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমরা (নবীরা) আমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না; বরং আমাদের মৃত্যুর পরে তা সদকা (দান) রূপে বন্টন হবে।"

এ জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবু বকর (রা)-কে বলেছিলেন, "আমার নিজ সম্পদ আমার ওফাতের পর আত্মীয়তার সূত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে কাউকে যেন দেয়া না হয়।" আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা), তাঁর চাচা আব্বাস (রা)। হযরত আবু বকর (রা) উপরিউক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই এদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজ পরিত্যক্ত সম্পদ প্রদান থেকে বিরত রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, ইমাম তিরমিযী (রহ) উপরিউক্ত হাদীসখানা বহুবচন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমরা নবীরা (আমাদের সম্পত্তির) কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না।" ইমাম তিরমিযী (রহ) এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলেছেন।

তৃতীয় কারণ এই যে, এ পৃথিবী (পার্থিব জীবন) নবীগণের কাছে খুবই তুচ্ছ বস্তু। সুতরাং তারা এ পৃথিবীর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেননি এবং এর প্রতি কোনো খেয়ালও রাখেননি। সুতরাং তাঁরা তাঁদের সন্তানদের জন্য ধন-সম্পদের কামনা কোনোভাবেই করতে পারেন না।

চতুর্থ কারণ এই যে, হযরত যাকারিয়া (আ) ছুতার কাঠ মিস্ত্রী পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। যেমন- হযরত দাউদ (আ) নিজ হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। নবী (আ)-গণের এটা বৈশিষ্ট্য নয় যে, তাঁরা এত পরিমাণ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখবেন, যা তাঁদের ইন্তেকালের পর সন্তানেরা ভোগ করবেন। বিষয়টি অতীব সুস্পষ্ট।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হযরত যাকারিয়া (আ) ছুতার ছিলেন"। ইবনে মাজাহ ও মুসলিম (রহ) ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার বাণী— 'হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। যার নাম হবে ইয়াহইয়া। এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া {(আ)-সহ এক সন্তান} এর সুসংবাদ দিচ্ছেন।" যখন হযরত যাকারিয়া (আ) নিশ্চিত হলেন যে, তাঁকে আল্লাহ এক পুত্র সন্তান দান করবেন, তখন অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বিস্মিত হয়ে আরয করলেন, হে প্রভু! আমার পুত্র সন্তান কিভাবে হবে?

আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমি তো পূর্ণ বার্ধক্যে পৌঁছেছি। বর্ণিত আছে, এ সময় যাকারিয়া (আ)-এর বয়স ছিল সত্তর বছর। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এর চেয়ে বয়স আরো বেশি হয়েছিল। অর্থাৎ একদিকে আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, অন্যদিকে আমি দুর্বলকারী বার্ধক্যে পৌঁছেছি, এ অবস্থায় আমরা সন্তানের কামনা কিভাবে করতে পারি?

যেমন- হযরত ইবরাহীম (আ) ও আনন্দচিত্তে ও বিস্মিত হয়ে সুসংবাদ বাহক ফেরেশতাগণকে বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে এ অবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্ধক্য আমাকে পেয়ে বসেছে, বলো! তোমরা কি বিষয়ে আমাকে সুসংবাদ দেবে? তাঁর স্ত্রী হযরত সারা বলেছিলেন, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এ আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক আশ্চর্য ব্যাপার।' তারা (ফেরেশতারা) বলল—

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۭ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

(ইবরাহীমের স্ত্রী) বলল, হায়! আমার পোড়া কপাল।[১] আমার কি সন্তান হবে? আমি তো বুড়ি হয়ে গিয়েছি আর আমার স্বামীও বুড়ো হয়ে গেছে। এটা তো বড়ই আজব কথা। (ফেরেশতারা) বলল, তুমি আল্লাহর হুকুমের

১. এর অর্থ এই নয় যে, হযরত সারা বস্তুত এ কথায় খুশি না হয়ে উল্টো নিজের দুর্ভাগ্য মনে করেছিলেন। আসলে বিস্ময়কর ব্যাপারে সাধারণত যে ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, এটা তেমনই একটি কথা।

উপর অবাক হচ্ছ? হে ইবরাহীমের পরিবার! তোমাদের উপর তো আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই প্রশংসার যোগ্য ও অত্যন্ত মহান। -সূরা হূদ : ৭২-৭৩

এরূপভাবে তাঁরা হযরত যাকারিয়া (আ)-কেও উত্তর দিয়েছিলেন যে, এরূপেই হবে, আপনার প্রভু বলেছেন। এ কাজ আমার জন্য অতি সহজ, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম, যখন তুমি কোনো কিছুই ছিলে না।'

আল্লাহ তা'আলা সূরা আম্বিয়ায় বর্ণনা করেন—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ز وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۞

অর্থ : তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে (পুত্র হিসেবে) ইয়াহইয়াকে দান করলাম। এর জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য বানালাম। এসব লোক অবশ্যই নেক কাজে তৎপর ছিলেন এবং তারা আগ্রহ ও ভয়ের সাথে আমাকে ডাকতেন। আর আমার প্রতি তারা অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। -সূরা আম্বিয়া : ৯০

স্ত্রীকে ক্ষমতাসম্পন্ন করার অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীর স্রাব বন্ধ ছিল। তা চালু হলো, তিনি একটু কটুভাষী ছিলেন। তা তাঁর থেকে দূর করে দেয়া হলো। হযরত যাকারিয়া (আ) যখন সন্তান সুসংবাদ পেলেন তখন আরয করলেন, "হে প্রভু! আমার জন্য একটি নিদর্শন নির্ধারণ করে দিন। অর্থাৎ এমন একটি আলামত নির্ধারণ করুন, যাতে আমি বুঝতে পারি যে, এখন আমার স্ত্রী আমার থেকে সেই সন্তান গর্ভধারণ করেছে। তখন বলা হলো, তোমার আলামত এই যে, তুমি একাধারে তিন দিন ইঙ্গিত ছাড়া কোনো মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে (এই তিনদিনের জন্য) তোমার কথা বলার শক্তি থাকবে না। তুমি শুধু ইঙ্গিতে কথা বলার শক্তি পাবে। অথচ তুমি শারীরিকভাবে ও মানসিকভাবে পূর্ণ সুস্থ থাকবে। এ সময় হযরত যাকারিয়া (আ)-কে জবানে, দিলে ও খেয়ালে বেশি পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার যিকির করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর তাঁর কাছে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করেন যে, সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। এ মহা আনন্দের সুসংবাদ পেয়ে তিনি মিহরাব থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাইরে বের হয়ে লোকদেরকে উল্লিখিত কথাগুলো ইঙ্গিতে বুঝালেন যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ হচ্ছে যে, এখন সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ তা'আলার যিকির করা এবং আমার সাথে ওহীর মধ্যে কথা বলা। মুজাহিদ সুদ্দী (রহ) বলেছেন, ওহী দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কথাগুলো লিখিতভাবে পেশ করা। মুজাহিদ (রা) থেকে এক বর্ণনা এরূপও আছে যে, এর অর্থ ইঙ্গিতে কথা বলা। কাতাদাহ ও ওহাব (রহ)-ও এ মত পোষণ করেন যে, ইঙ্গিতে কথা বুঝিয়ে বলা। মুজাহিদ, ইকরামা, ওহাব, সুদ্দী ও কাতাদাহ (রহ) বলেন, যাকারিয়া (আ)-এর যবান (কথা বলার শক্তি) কোনো রোগ ছাড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, যাকারিয়া (আ)-এর যবান খোলা ছিল। এ কারণে তিনি তাসবীহ পাঠ করতে পারছিলেন। কিন্তু তিনি কারো সাথে কথা বলার ক্ষমতা রাখতেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে ইয়াহইয়া! এ কিতাব দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং আমি তাকে শৈশবেই হিকমত তথা জ্ঞান দান করেছিলাম। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে সন্তান দানের সাথে সাথে তাঁকে কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান) প্রদানের সখবরও দিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ) বলেন, মুয়াম্মার (রা) বলেন, কয়েকজন বালক হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে বালক অবস্থায় বলেছিল, এসো, আমরা খেলাধুলা করি। বালক ইয়াহইয়া (আ) উত্তর দিলেন যে, আমাকে খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার উপরিউক্ত বাণীর তাৎপর্য এ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে। পরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার পক্ষ থেকে তাকে দেয়া হয়েছে রহমত করুণা। এ বাণী প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নানান দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে, তা আমি জানি না। অন্য এক বর্ণনায়, কাতাদাহ ও যিহাক (রহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ রহমত। অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে যাকারিয়ার উপর দয়া বর্ষণ করেছি, যার ফলে সে

সন্তান লাভ করেছেন। ইকরামা (রহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হানানা দ্বারা মহব্বত (ভালবাসা)-কে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ এভাবেও হতে পারে যে, আমি মানুষের অন্তরে বা তার মাতা-পিতার অন্তরে তার জন্য খুব মহব্বত ঢেলে দিলাম।

আর তাকে দান করেছিলাম 'পবিত্রতা'। এর অর্থ আমি তাকে নেক চরিত্রের অধিকারী এবং সর্ব প্রকার দোষত্রুটি থেকে পূতঃপবিত্র করে পয়দা করেছি। আর তাঁকে বানিয়েছি মুত্তাকী (পরহেযগার বান্দা)। তারপর মাতা-পিতার সাথে তাঁর সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে ছিল পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না অবাধ্য উদ্ধত। তার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, যেদিন তার মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উঠবে হবে।

এ তিনটি সময় (জন্মের সময়, মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থিত হওয়ার সময়) মানুষের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সময়। সময়ের প্রতিটি সময় মানুষ এক জগত থেকে অন্য জগতে চলে যায়। আর এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন সময়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্য রহমত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে নিরাপদে রাখা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে জনৈক কবি সুন্দর কথা বলেছেন—

যখন জন্ম তুমি নিয়েছিলে ভবে,
একা তুমি কেঁদেছিলে হেসেছিল সবে।
এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি, কাঁদিবে ভুবন।

সাঈদ ইবনে আরুবা (রহ) কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, একদিন হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাৎ হলে, ঈসা (আ) ইয়াহইয়া (আ)-কে বললেন, আপনি আমার জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কারণ, আপনি আমার চেয়ে উত্তম। হযরত ইয়াহইয়া (আ)-ও ঈসা (আ)-কে অনুরূপ কথা বললেন, আপনি আমার জন্য ক্ষমা কামনা করুন। কেননা, আপনি আমার চেয়ে উত্তম। তখন হযরত ঈসা (আ) ইয়াহইয়া (আ)-কে বললেন, আপনিই আমার চেয়ে উত্তম। কারণ, আমি নিজেই আমার নিজের উপর শান্তির কথা ঘোষণা করেছি। (সূরা মারয়ামের ৩৩ নং আয়াতে যার বর্ণনা রয়েছে যে, আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উঠব।) আর আপনার উপর আল্লাহ তা'আলা নিজে শান্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যার বর্ণনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। (তার প্রতি শান্তি, যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে, যেদিন মৃত্যু হবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উঠবে।)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেন যে, সে হবে নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং সৎ লোকদের মধ্যে একজন নবী। হযরত যাকারিয়া (আ) দোয়া করেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে আপনার পক্ষ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন।'

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আদম সন্তানের মধ্যে কেউ নেই, যার দ্বারা কোনো গুনাহর কাজ সংঘটিত হয়নি বা কোনো গুনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করেনি। একমাত্র হযরত ইয়াহইয়াহ ইবনে যাকারিয়া (আ) ব্যতীত। আর কেউ এ কথা বলতে পারে না যে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার চাইতে উত্তম।'

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী আলী ইবনে যায়েদ জাদআন সম্পর্কে সমালোচনা আছে। তাঁর হাদীস ইমামগণ সঠিক নয় বলেছেন।

ইবনে শিহাব বলেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের এক মজলিসে আগমন করলেন। তিনি এসে দেখতে পেলেন যে, তাঁরা নবী (আ)-গণের পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন। একজন

বলছিলেন, মুসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে আলাপকারী। একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার রূহ এবং তার কালিমা অর্থাৎ নিদর্শন। অপর একজন বললেন, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার খলীল (বন্ধু)। এভাবে তাঁরা আলোচনা করছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, শহীদ ইবনে শহীদের কথা তো তোমরা বলছ না। যিনি (পশুর) লোমের তৈরি পোষাক ব্যবহার করতেন এবং গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। যাতে তিনি কোনো প্রকার পাপে জড়িয়ে না পড়েন। ইবনে ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ শহীদ দ্বারা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-এর কথা বুঝিয়েছিলেন। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইবনে লাহইয়া সম্পর্কে কিছু সমালোচনা আছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, ইবনুল আস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তিনি ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানই কিয়ামতের দিন কিছু না কিছু গুনাহ (অপরাধ)সহ অবশ্যই উপস্থিত হবে। কেবল হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) ব্যতীত। এটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি যার থেকে এ হাদীস শুনেছেন, তাঁর নাম উহ্য রেখে তার পরবর্তী বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে কিয়ামতের দিন গুনাহ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সামনে হাজির হবে। কেবল হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ছাড়া। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– (তিনি নেতা এবং স্ত্রী বিরাগী) তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি জমিন থেকে একটা কিছু উঠিয়ে বললেন, তাঁর সাথে শুধু এরূপ কিছু থাকতে পারে। তারপর তিনি একটি পশু যবেহ করলেন।

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাসান ও হুসাইন জান্নাতবাসী যুবকদের সর্দার। তবে দুই খালাতো ভাই হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আ) ছাড়া। অর্থাৎ তাঁদের দু'জনের তিনি সর্দার হবেন না।

আবু নায়ীম থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবু সোলায়মান বলেছেন, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া (আ) দু'জনে একত্রে কোথাও ভ্রমনে যাচ্ছিলেন। চলার পথে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে এক মহিলার ধাক্কা লাগল। তখন হযরত ঈসা (আ) হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে বললেন, আজ আপনার দ্বারা এমন একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। আমার ধারণায় যা কখনো মাফ হবার নয়। হযরত ইয়াহইয়া (আ) জিজ্ঞেস করলেন, হে খালাতো ভাই! সে অপরাধটি কি? তিনি বললেন, এক মহিলার সাথে আপনার ধাক্কা লেগেছে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এ সম্পর্কে আমার কোনই খবর নেই। হযরত ঈসা (আ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনার দেহ তো আমার দেহের সাথে একত্রেই রয়েছে। কিন্তু আপনার রূহ (আত্মা) কোথায় রয়েছে? ইয়াহইয়া (আ) বললেন, আমার রূহ আরশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। আর আমার রূহ যদি জিবরাঈল (আ) পর্যন্ত পৌছে শান্তি লাভ করে, তবে আমি বুঝব যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে বিন্দু পরিমাণও জানতে পারিনি। কিন্তু এ বর্ণনাটি একেবারেই গরীব পর্যায়ের এবং ঈসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত।

হযরত ইসরাঈল, খায়সামা থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আ) দু'জন ছিলেন খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত ঈসা (আ) পশমের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ) পশুর পশমের তৈরি পোশাক পরিধান করতেন। তাঁদের কারো কাছে কোনো দিনার বা দেরহাম অথবা দাস-দাসী ছিল না। তাদের এমন কোনো ঠিকানা (আবাসস্থল) ছিল না যেখানে তারা বসবাস করতেন। যেখানে রাত হতো সেখানেই তাঁরা অবস্থান করতেন। পরস্পরের বিদায় মুহূর্তে হযরত ইয়াহইয়া (আ) হযরত ঈসা (আ)-কে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। ঈসা (আ) বললেন, কখনো রাগ হবেন না। ইয়াহইয়া (আ) বললেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব না। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) বললেন, ধন-সম্পত্তির প্রতারণায় (মোহে) পড়বেন না। উত্তরে ইয়াহইয়া (আ) বললেন, এটা হতে পারে। হযরত যাকারিয়া (আ) স্বাভাবিকভাবে ইন্তেকাল করেছেন না শাহাদাতবরণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) থেকে বিভিন্ন বর্ণনা আছে।

আবদে মানআম ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত যাকারিয়া (আ) নিজ গোত্র থেকে পালিয়ে একটি গাছের মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁর পিছনে পিছনে এসে ঐ গাছটি করাত দ্বারা চিরে ফেলে। করাত যখন তাঁর শরীরের এব পার্শ্ব স্পর্শ করল তখন কেঁদে দিলান। আল্লাহ তায়ালা যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন, (হে নবী!) আপনার এ ক্রন্দনের আওয়াজ যদি বন্ধ না হয়, তবে আমি সমস্ত যমীনকে উল্টিয়ে দিব। (যাতে তারা এই জুলুমের শাস্তি ভোগ করে)। অতঃপর তার কান্না থেমে গেল এবং তাঁর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। এক মারফু হাদীছেও একথা বর্ণিত হয়েছে। যা শীঘ্রই বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, গাছের মধ্যে যিনি প্রবেশ করেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত শোয়াইব (আ)। আর হযরত যাকারিয়া (আ) স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

মুসনাদে আহমদে ইমাম আহমদ (রহ) হারিস আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দিয়ে বললেন, এগুলো তুমি নিজে আমল কর এবং বনী ইসরাঈলকেও আমল করতে বলো। কিন্তু তিনি এগুলো আমল করার ব্যাপারে একটু শিথিলতা করেন। হযরত ঈসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এগুলো আপনি আমল করবেন এবং বনী ইসরাঈলকে আমল করতে আদেশ দেবেন। এখন আপনি সেগুলো কি বনী ইসরাঈলের লোকদের কাছে পৌছাবেন, না আমি পৌছাব? হযরত ইয়াহইয়া (আ) বললেন, হে আমার খালাতো ভাই! আপনি যদি পৌছান, তবে আমি আশঙ্কা করছি, আমাকে শাস্তি দেয়া হবে অথবা মাটিতে প্রোথিত করা হবে। অতঃপর হযরত ইয়াহইয়া (আ) বনী ইসরাঈলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে হাজির হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। সবাই এসে হাজির হলো। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর ইয়াহইয়া (আ) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মিম্বরের উপর আরোহণ করে প্রথমে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেগুলো আমাকে আমল করার জন্য বলেছেন এবং তোমাদেরকে আমল করার জন্য আমাকে বলতে বলেছেন। সেই পাঁচটি বিষয় হলো এই—

১. তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। শুধুমাত্র তারই ইবাদত করবে। এর উদাহরণ এরূপ যে, মনে করো কোনো লোক স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকা-কড়ি দ্বারা একটি গোলাম ক্রয় করেছে। সে গোলাম কাজ করে উপার্জিত টাকা পয়সা অন্য আর একজনকে দিচ্ছে। এখন তোমরা বলো, সেই ব্যক্তি এমন গোলাম কি পছন্দ করবে? (কখনই করবে না)। তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'আলা। তিনিই তোমাদের একমাত্র রিযিক দাতা। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

২. আমি তোমাদেরকে নামাযের নির্দেশ দিচ্ছি। তোমরা যখন নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে দাঁড়াও, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তাঁর রহমতের কুদরতী দৃষ্টি নিবিষ্ট করেন। সুতরাং তোমরা একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে। নামাযের সময় অন্য দিকে মনোযোগ দিবে না।

৩. আমি তোমাদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিচ্ছি। রোযা রাখার উদাহরণ এরূপ যে, যেমন কোনো একটি দলের এক ব্যক্তির কাছে মিশকের কৌটা আছে। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের চেয়েও অধিক পছন্দনীয়।

৪. আমি তোমাদেরকে দান-সদকা করার আদেশ দিচ্ছি। এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কোনো এক ব্যক্তিকে তার শত্রুরা বন্দী করে তার হাত পা বেঁধে তাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ সময় সেই বন্দী লোকটি তার শত্রুদেরকে বলল, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদের বদলে মুক্ত করে দেবে? এতে তারা রাজি হলে সে কমবেশি অর্থ-সম্পদ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করে নিল।

৫. আমি তোমাদেরকে বেশি বেশি করে আল্লাহ তা'আলার যিকির করার জন্য আদেশ দিচ্ছি। এর উদাহরণ এরূপ যেমন কোনো ব্যক্তির পিছনে তার শত্রুরা দ্রুত ধাওয়া করছে। এ সময় সে একটি মজবুত দুর্গে প্রবেশ করে শত্রুর হাত নিজেকে থেকে রক্ষা করে নিল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহ তা'আলার যিকির করে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে নিজেকে ঐ মজবুত দুর্গের চাইতেও বেশি হেফাযতে রাখতে পারে।

বর্ণনাকারী বলেছেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি জিনিসের উপর আমল করার জন্য আদেশ দিচ্ছি। যে জিনিস আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমাকে এদেশ দেয়া হয়েছে।

১. জামাআতের সাথে (দলবদ্ধভাবে) থাকা।
২. আল্লাহর রাসূলের কথা শ্রবণ করা।
৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য করা।
৪. (দ্বীনের জন্য) হিজরত করা।
৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

যে ব্যক্তি জামাআত (দল) থেকে এক বিঘতও সরে যাবে, সে যেন ইসলামের রজ্জুকে তার গর্দান থেকে খুলে ফেলে। তবে সে যদি পুনরায় ফিরে আসে সেটা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি মূর্খতার যুগের রীতিনীতির দিকে লোকদেরকে ডাকবে, সে জাহান্নামী। আরয করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! সে ব্যক্তি যদি সালাত আদায়কারী ও সিয়াম পালনকারীও হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদিও সে নামায আদায়কারী হয় ও রোযা পালনকারী হয় এবং নিজকে মুসলমান বলে মনে করে।

হে লোকসকল! তোমরা মুসলমানদেরকে তাদের নামেই ডাকবে। যে নাম আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রেখে দিয়েছেন। আবু আলা, ইবনে মাজাহ ও হাকিম (রহ)-ও এটি বর্ণনা করেছেন। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ) বর্ণনা করেন, রাবী ইবনে আনাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরাম থেকে আমাদের কাছে এরূপ বর্ণনা এসেছে, যা তাঁরা বনী ইসরাঈলের আলেমগণ থেকে শুনেছেন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) পাঁচটি কালিমা (নির্দেশ)-সহ পাঠানো হয়েছে। এ আলেমগণ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ) অধিকাংশ সময়ে নির্জনে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। তিনি নির্জনে ও একাকিত্বে থাকাটা পছন্দ করতেন। তিনি গাছের পাতা খেতেন এবং নদীর প্রবাহিত পানি পান করতেন। কখনো টিড্ডি দিয়ে আহার করতেন। এরপরও তিনি নিজকে সম্বোধন করে বলতেন, হে ইয়াহইয়া! তোমার চাইতে অধিক নেয়ামতের অধিকারী আর কে আছে? ইবনে আসাকির (রহ) বর্ণনা করেন, একদা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর মাতা-পিতা পুত্রের তালাশে বের হলেন। তালাশ করতে করতে তাঁরা তাঁকে জর্দান নদীর পারে দেখতে পেলেন। তারা পুত্রের কাছে এসে তাঁর ইবাদত, সাধনা ও আল্লাহ-ভীতি দেখে খুব কাঁদতে লাগলেন।

মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর খাদ্য ছিল সবুজ ঘাস। তিনি আল্লাহর ভয়ে এত কাঁদতেন যে, যদি তাঁর চোখের উপর আলকাতরার লেপন থাকতো, তাও চোখের পানিতে উঠে যেত।

ইবনে শিহাব (রহ) বলেছেন, একদা আমি ইদ্রীস খাওলানী (রহ)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি বিভিন্ন উপদেশমূলক কাহিনী বলছিলেন। একপর্যায়ে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদের কাছে সেই ব্যক্তির নাম বলব, যিনি সবচেয়ে উত্তম খাদ্য আহার করতেন? তখন মজলিসের সবাই তাঁর দিকে নিবিষ্ট হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) সবার চেয়ে উত্তম খাদ্য খেতেন। তিনি বনের হিংস্র জানোয়ারের সাথে আহার করতেন। যাতে মানুষের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা যায় (কারণ, মানুষের সাহচর্যে তাঁর ইবাদতে বিঘ্ন ঘটতে পারে)।

ইবনুল মুবারক (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া (আ)-কে তিন দিন পর্যন্ত পাচ্ছিলেন না। তিনি পুত্রের তালাশে বের হলেন। তালাশ করতে করতে এক বনে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি (ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কবর খুড়ে তাঁর মধ্যে দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছেন। হযরত যাকারিয়া (আ) বললেন, হে পুত্র! আমি তিন দিন পর্যন্ত তোমাকে পাচ্ছি না। তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রান। আর তুমি এখানে বসে কবর খনন করে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করছো। পুত্র বললেন যে, হে আব্বাজান! আপনি কি আমাকে এ কথা বলেননি যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে এমন এক গভীর অরণ্য রয়েছে, যা চোখের পানি ছাড়া সাফ করা যাবে না। তখন যাকারিয়া (আ) বললেন, হে পুত্র! কথাটা সত্যিই। তুমি বেশি করে কাঁদ। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়েই অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) ও মুজাহিদ (রহ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আসাকির (রহ) ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ ও মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জান্নাতবাসীগণ প্রচুর নেয়ামত প্রাপ্তির কারণে নিদ্রা যেতে পারবেন না। সুতরাং আল্লাহ প্রেমিক বুযুর্গ ব্যক্তিদের উচিত, তাঁদের অন্তরে আল্লাহ প্রেমের যে নেয়ামত আছে, সে নেয়ামতের কারণে না ঘুমানো। (অর্থাৎ বেশি রাত জেগে আল্লাহর ইবাদত করা)। অতঃপর তিনি বলেন, নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও আল্লাহ প্রেমিকদের মধ্যে কতইনা পার্থক্য।

আলেমগণ বর্ণনা করেছেন, হযরত ইয়াহইয়া (আ) এত বেশি কাঁদতেন যে, চোখের পানি গড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর দু'গালে দাগ পড়ে যায়।

হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মারার কারণ

হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মারার কারণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, সে সময়ে দামেশকের কোনো এক রাজা তার এক মুহরাম আত্মীয়াকে (যাকে বিবাহ করা তার জন্য অবৈধ) বিবাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে। হযরত ইয়াহইয়া (আ) এ কাজে রাজকে বাধা দেন। এতে মহিলাটি ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হলো। একপর্যায়ে বাদশাহ ও মহিলাটির মধ্যকার সম্পর্ক যখন গভীর হয়ে ওঠে, তখন মহিলাটি রাজার কাছে ইয়াহইয়া (আ)-এর রক্ত দাবি করে (অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করার জন্য বলে)। রাজা মহিলার প্রেমে আসক্ত হয়ে তার কথামতো ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করার জন্য একজন জল্লাদ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। জল্লাদ তাঁকে হত্যা করে। অতঃপর রাজা হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর কর্তিত মস্তক ও তাঁর রক্ত একটা পাত্রে করে জল্লাদের মাধ্যমে মহিলার কাছে প্রেরণ করে। কথিত আছে মহিলাটি এ কর্তিত মস্তক ও রক্ত দেখা মাত্রই সাথে সাথে মারা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে সময়ের বাদশাহর স্ত্রী হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর প্রতি খুব আসক্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রী তাঁকে বশে আনার জন্য বহু চেষ্টা তদবীর করে। কিন্তু চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তিনি সরাসরি স্ত্রীর কুপ্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী নিরাশ হয়ে অতি কৌশলে বাদশাহর কাছে ইয়াহইয়া (আ) এর রক্ত দাবি করল (অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করতে বলল)। কিন্তু বাদশাহ' এই প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরক্ষণে ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করার জন্য জল্লাদ পাঠিয়ে দেয়। জল্লাদ তাঁকে হত্যা করে তাঁর কর্তিত মস্তক ও রক্ত একটা পাত্রে করে বাদশাহর স্ত্রীর সামনে নিয়ে উপস্থিত করে।

এ সম্পর্কে এক হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিরাজের রাতে যখন আকাশে হযরত যাকারিয়া (আ)-কে দেখতে পেলেন, তখন তাঁকে সালাম করলেন এবং বললেন, হে আবু ইয়াহইয়া! আমাকে আপনার (এবং ইয়াহইয়ার) হত্যা ব্যাপারে খবর দিন যে, কি কারণে কিভাবে বনী ইসরাঈল আপনাদের হত্যা করেছিল? তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! হযরত ইয়াহইয়া (আ) তাঁর সময়ে সর্বোত্তম ও সুদর্শন লোক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকী, পরহেযগার ও সম্মানী লোক। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজে বলেছেন, সে হবে নেতা এবং স্ত্রী বিরাগী।' মহিলাদের প্রতি তার কোনো অনুরাগ বা আকর্ষণ ছিল না। হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর প্রতি এক মহিলা আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সে মহিলা বনী ইসরাঈলের বাদশাহর স্ত্রী ছিল। সে (স্ত্রী) ছিল এক দুশ্চরিত্রা মহিলা। সে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে কুপ্রস্তাব দিলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান

করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মহিলার অসৎ উদ্দেশ্য থেকে রক্ষা করেন। এতে মহিলা (বাদশাহর স্ত্রী) ক্রুদ্ধ হয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। প্রতি বছর একটি নির্ধারিত সময়ে তাদের এক বার্ষিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হতো। এ অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হলো। বাদশাহর স্ত্রী বাদশাহকে সেই অনুষ্ঠানে বসে এমনভাবে অনুপ্রাণিত করল যে, বাদশাহ স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে তাকে বলল, (হে আমার প্রাণের স্ত্রী!) আজ তুমি আমার কাছে যা কিছু দাবি করবে, তা আমি অবশ্যই পূর্ণ করব। তখন স্ত্রী বলল, আমি তোমার কাছে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-এর রক্ত চাই। (অর্থাৎ তাঁকে হত্যা করতে হবে। বাদশাহ বলল, এটা ছাড়া অন্য আর কিছু দাবি করো। স্ত্রী বলল, না এটাই আমার দাবি। এছাড়া কোনো দাবি আমার নেই। শেষ পর্যন্ত বাদশাহ স্ত্রীর দাবী পূরণ করার জন্য জল্লাদকে ইয়াহইয়া (আ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিল। পূরণ করার গিয়ে যখন পৌছল তখন হযরত ইয়াহইয়া (আ) মিহরাবের মধ্যে নামায আদায় করছিলেন এবং আমি (যাকারিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পাশেই নামায আদায় করছিলাম। জল্লাদ হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করে তাঁর কর্তিত মস্তক ও রক্ত একটি পাত্রে রেখে দিল। অতঃপর জল্লাদ সেই কর্তিত মস্তক ও রক্তসহ পাত্রটি বাদশাহর স্ত্রীর কাছে নিয়ে উপস্থিত করল।

বর্ণনাকারী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যাকারিয়া (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ ঘটনার পর আপনার ধৈর্যধারণের অবস্থা কিরূপ ছিল? হযরত যাকারিয়া (আ) উত্তরে বললেন, আমি এ সময় নামাযেই রত ছিলাম। এতে আমার নামাযের একাগ্রতা মোটেই বিনষ্ট হয়নি (অথচ হযরত ইয়াহইয়া [আ] হযরত যাকারিয়া [আ]-এর অতি প্রাণপ্রিয় পুত্র ছিলেন)।

যাকারিয়া (আ) বলেছেন, জল্লাদ যখন ইয়াহইয়া (আ)-এর কর্তিত মস্তক বাঁদশাহর স্ত্রীর সামনে হাজির করল, সেদিন সন্ধ্যার সময় বাদশাহ, তার দুশ্চরিত্র অত্যাচারী স্ত্রী, পরিবার ও রাজ দরবারের সবাইকে মাটির মধ্যে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো। সকাল বেলা বনী ইসরাঈল বলল যাকারিয়ার রব যাকারিয়ার জন্য ক্রোধান্বিত হয়েছে। সুতরাং এস, আমরাও আমাদের বাদশাহর জন্য যাকারিয়ার উপর ক্রুদ্ধ হই এবং তাঁকে হত্যা করি। (যাকারিয়া [আ] বলেন) তারপরে তারা (বনী ইসরাঈল) আমাকে হত্যা করার জন্য আমার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। আমি জনৈক লোকের মাধ্যমে তাদের এ পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে তাদের থেকে পলায়ন করি। ইবলীস তাদের আগে আগে থেকে আমার যাওয়ার পথ তাদেরকে বলে দিচ্ছে। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তাদের পাকড়াও থেকে আমি কোনোভাবেই বাঁচতে পারব না, তখন একটি গাছ আমার সামনে এসে হাজির হলো এবং সেটি আমাকে ডেকে বলল, (হে যাকারিয়া!) আপনি আমার মধ্যে প্রবেশ করুন। সাথে সাথে গাছটি দু'ভাগ হয়ে গেল। আমি দ্রুত গাছটির মধ্যে প্রবেশ করলাম। ইবলীস সেখানে পৌছে আমাকে না পেয়ে, আমার চাদরটির এক কোণা ধরে ফেলল। সাথে সাথে গাছ মিশে গেলে চাদরের কোণা গাছের বাইরে রয়ে গেল। ইত্যবসরে বনী ইসরাঈল সেখানে পৌছে গেলে ইবলীস তাদেরকে বলল, তোমরা কি দেখনি, যাকারিয়া (আ) তো এ গাছটির মধ্যে ডুকে পড়েছেন। এই যে তাঁর চাদরের এক অংশ। তিনি তাঁর যাদুর বলে গাছের মধ্যে ঢুকতে সক্ষম হয়েছেন বনী ইসরাঈল বলতে লাগল, আমরা এখন এই গাছটিকে জ্বালিয়ে ফেলব। ইবলীস তাদেরকে পরামর্শ দিল, গাছটি জ্বালিয়ে না দিয়ে এটিকে করাত দিয়ে কেটে ফেল। যাকারিয়া (আ) বলেন। অতঃপর ওরা আমাকেসহ গাছটি কেটে ফেলল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত যাকারিয়া (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করাতের আঘাত অনুভব করেছিলেন? যাকারিয়া (আ) বললেন, বরং গাছটি আমার কষ্টকে আল্লাহর হুকুমে নিজে গ্রহণ করে নিয়েছিল। আমার রূহ আল্লাহ এ গাছটির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

হাদীসখানা অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের। আর ঘটনাটিও আশ্চর্যজনক। হাদীসখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ মারফু হাদীস) তা আদৌ ঠিক নয়। এ বর্ণনার মধ্যে এমন কিছু কথা আছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়। মিরাজের রাতে আকাশে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাক্ষাতের সময় এরূপ কথাবার্তা হয়েছে, তা মিরাজের হাদীসসমূহের কোনো হাদীসেই বর্ণিত হয়নি।

কয়েকটি হাদীছে শুধু এতটুকু বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'অতঃপর আমি দুই খালাতো ভাই অর্থাৎ ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-এর কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তাঁরা দু'জন ছিলেন সম্পর্কে খালাতো ভাই।

অধিকাংশ আলেমের মতামত ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর মা ছিলেন আয়েশা বিনতে ইমরান। যিনি ছিলেন মারইয়াম বিনতে ইমরানের আপন বোন। অপর এক বর্ণনা মতে, ইয়াহইয়া (আ)-এর মা আয়েশা ইমরানের স্ত্রী হান্নার বোন ছিলেন। এদিক দিয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর খালাতো ভাই হন না; বরং মারইয়াম (আ)-এর খালাতো ভাই হন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে কোন স্থানে শহীদ করা হয়েছিল এ ব্যাপারে মতভেদ আছে।

এক বর্ণনা মতে মসজিদে আকসার মধ্যে তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল। অন্য এক বর্ণনা মতে, তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল অন্য জায়গায় বসে। ছাওরী (রহ) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস প্রাঙ্গনে (যেখানে পাথর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে) সত্তরজন নবীকে শহীদ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-ও ছিলেন।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রা) বলেছেন, বুখ্ত নসর যখন দামেশকে আসে, তখন সেখানে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর রক্ত ফিনকি দিয়ে উত্থিত হতে ছিল। বুখ্ত নসর এ উত্থিত রক্ত সম্পর্কে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করলে, লোকেরা তাকে মূল ঘটনা অবহিত করল যে, এক মজলুম নবীকে বিনা অপরাধে এখানে শহীদ করে দেয়া হয়েছে।

বুখ্ত নসর এর প্রতিশোধ হিসেবে সত্তর হাজার বনী ইসরাঈলকে সেই রক্তের উপর যবেহ করে। এ বর্ণনার সূত্র হযরত সায়ীদ পর্যন্ত সঠিকভাবে এসেছে। এতে প্রমানিত হয় যে, ইয়াহইয়া (আ) দামেশকেই শহীদ হয়েছিলেন। বুখ্ত নসরের ঘটনা হযরত মাসীহ (আ)-এর পরে সংঘটিত হয়েছিল। হাসান বসরী (রহ) ও আতা (রহ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফেজ আসাকির (রহ) ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমের সূত্রে যায়েদ ইবনে ওয়াকিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, যখন লোকেরা দামেশকের মসজিদের পুনঃনির্মাণ কাজ শুরু করেন, তখন মসজিদের পশ্চিম দিকের কিবলার স্তম্ভের নিচ থেকে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর পবিত্র মস্তক বের করা হয়। আমি স্বচক্ষে তা অবলোকন করেছি। পবিত্র মস্তকের চামড়া ও চুলের কোনই পরিবর্তন হয়নি। তা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়ই ছিল। অন্য এক বর্ণনায় এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মনে হচ্ছিল যেন মস্তকটি এই মাত্র কর্তন করা হয়েছে। অতঃপর সেই পবিত্র মস্তক দামেশকের মসজিদের 'সাকাসিকা' নামক স্তম্ভের নিচে দাফন করা হয়।

হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ)-এর এক বর্ণনায় আছে, হযরত মুআবিয়া (রা)-এর গোলাম কাসিম (রহ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, দামেশকের এক বাদশাহর নাম ছিল হাদদাদ ইবনে হাদার। সে (বাদশাহ) তার পুত্রকে তার ভাইয়ের কন্যা আরায়লার সাথে বিবাহ দেয়। মহিলাটি ধনবতী মহিলা হিসেবে দামেশকে সুপরিচিত ছিল। দামেশকের নামকরা বাজারগুলো এ মহিলার নিয়ন্ত্রণেই ছিল। একবার বাদশাহর পুত্র তার স্ত্রীকে কসম খেয়ে তিন তালাক দিল। তারপর সে অনুতপ্ত হয়ে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর নিকট গিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে মাসআলা জিজ্ঞেস করল। হযরত ইয়াহইয়া (আ) বললেন, অন্যের কাছে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে (স্ত্রীকে) পুনরায় বিয়ে করা যাবে না।

হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর এ কথায় মহিলা (স্ত্রী) তাঁর প্রতি ক্রোধান্বিত হলো। সে (স্ত্রী) বাদশাহর কাছে ইয়াহইয়া (আ)-এর মস্তক দাবি করল। আর মহিলার মা তাকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু বাদশাহ (আ)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তারপর মহিলা এক ব্যক্তিকে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর কাছে পাঠাল। এ

সময় তিনি 'জায়রূন' নামক এক মসজিদের মিহরাবে নামায পড়ছিলেন। প্রেরিত লোকটি হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে হত্যা করে তাঁর পবিত্র মস্তক মহিলার সামনে নিয়ে আসে। এ সময় সেই কর্তিত মস্তক থেকে এ ধ্বনি ভেসে আসছিল যে, হে মহিলা! অন্যের সাথে তোমার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্বামীর সাথে তোমার পুনঃবিবাহ জায়েয হবে না। মহিলাটি হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর কর্তিত মস্তক একটি পাত্রে করে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। এ সময়ও তাঁর কর্তিত মস্তকটি থেকে অনুরূপ ধ্বনি ভেসে আসছিল। পবিত্র মস্তক যখন মহিলাটি তার অসৎ মায়ের সামনে রাখল, সাথে সাথে মহিলার (স্ত্রীর) পা দুটো যমীনে পুতে গেল। এরপর কোমর পর্যন্ত যমীনে প্রোথিত হয়ে গেল। এ ভয়াবহ দৃশ দেখে তার মা চিৎকার দিতে লাগল। এরপর মহিলার বুক পর্যন্ত মাটির মধ্যে চলে গেল। তখন তার মা এক লোককে মেয়ের মস্তকটি কেটে রাখার জন্য বলল, যাতে স্মৃতি স্বরূপ সেটি থেকে যায়। তারপর তার মস্তকটি কেটে মায়ের কাছে দেয়া হলো। কিন্তু যমীন এ মস্তকবিহীন পাপী দেহটি ভেতর থেকে উপরে নিক্ষেপ করল। তারপর তারা সবাই অপমানিত লাঞ্ছিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। সে থেকেই ইয়াহইয়া (আ)-এর এই শহীদী রক্ত ফিনকি দিয়ে উপরের দিকে উঠতেই ছিল। এরপর বুখ্ত নসর সেখানে এসে এই হত্যার প্রতিশোধে পঁচাত্তর হাজার যালিম বনী ইসরাঈলকে সেখানে যবেহ করে। তারপর সেই উথলিত রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) বলেছেন, ঐ উথলিত রক্তে ছিল সকল (শহীদ) নবীদের রক্ত মিশ্রিত। হযরত আরমিয়া (আ) সেখানে এসে রক্তকে সম্বোধন করে বললেন, হে রক্ত! তুমি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দিয়েছ। এখন তুমি আল্লাহ তা'আলার হুকুমে ঠাণ্ডা হয়ে যাও। অতঃপর উথলিত রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বুখ্ত নসর হত্যা ও ধ্বংসাযজ্ঞ থেকে বিরত থাকে। তার ভয়ে যারা দামেশক ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, বুখ্ত নসর সেখানেও পৌছে তাদেরকে ধাওয়া করে বহু সংখ্যক লোককে হত্যা করে ও অনেককে বন্দী করে। তারপরে বুখ্ত নসর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

হযরত ঈসা (আ)-এর ঘটনা

মারইয়াম বিনতে ইমরান (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের প্রথমে খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত আকীদাগুলো খণ্ডন করেছেন। তাদের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে, অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পূতঃপবিত্র। তাঁর কোনই সন্তান নেই। আর তাঁর সন্তানের কোনো প্রয়োজনও নেই।

একদা নাজরানের একদল খ্রিস্টান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে তাদের বাতিল আকীদা পেশ করে বলল, আল্লাহ তিন খোদার এক খোদা। আল্লাহ তৃতীয় খোদা। এ তিনজন খোদা হচ্ছে- আল্লাহ, ঈসা ও মারইয়াম (আ)। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-ইমরানের শুরুতে বলেন, ঈসা হলেন শুধু আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা ও প্রিয় রাসূল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (ঈসা [আ]-কে) তাঁর মায়ের উদরে অনুরূপভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেরূপ সৃষ্টি করেছেন তিনি (আল্লাহ) অন্যান্য বান্দাদেরকে। আল্লাহ তাঁকে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন। তিনি (আল্লাহ) প্রথমে হযরত আদম (আ)-কেও মাতা-পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এভাবে সৃষ্টি হওয়াটা খোদায়িত্বের কোনো প্রমাণ নয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে 'কুন' (হয়ে যাও) বলেছেন, সাথে সাথে তিনি সৃষ্টি হয়ে গেছেন। ঈসা (আ)-এর মাতা তাঁকে কিভাবে প্রসব করেছেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সূরা আলে ইমরানে এবং অন্য সূরায় বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে সূরা মারইয়ামেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى آدَمَ وَنُوحًا وَّآلَ إِبْرٰهِيمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ ۞ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى ۚ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۗ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

অর্থ : আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদেরকে গোটা দুনিয়াবাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে (নিজের রিসালতের জন্য) বাছাই করেছিলেন। তারা একই ধরনের লোক ছিলেন, যারা বংশানুক্রমে একে অপর থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ সবকিছুই শুনেন ও জানেন। (তিনি তখনো শুনছিলেন) যখন ইমরানের বিবি বলছিল যে, হে আমার রব! আমার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম, সে তোমারই কাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আমার পক্ষ থেকে এ দান তুমি কবুল করো। তুমি সবই শোন ও জান। তারপর যখন সে সন্তান প্রসব করল তখন সে বলল, হে আমার রব! আমার ঘরে তো মেয়ে জন্ম হয়েছে।' অথচ সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহর জানাই ছিল। আর ছেলে তো মেয়ের মতো হয় না। যা হোক (হে

আল্লাহ!) এর নাম মারইয়াম রাখলাম এবং আমি তাকে ও তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের ফিৎনা থেকে তোমার আশ্রয়ে তুলে দিলাম। অবশেষে তার রব ঐ মেয়ে সন্তানটিকে খুশির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো মেয়ে হিসেবে গড়ে তুললেন এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক বানিয়ে দিলেন। যাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতেন, তার কাছে কিছু না কিছু খাবার জিনিস পেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করতেন, মারইয়াম! এসব তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে? মারইয়াম জবাব দিত, আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে চান বে-হিসাব দান করেন। –সূরা আল ইমরান : ৩৩-৩৭

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- তিনি প্রথমে হযরত আদম (আ)-কে (নবী হিসেবে) নিযুক্ত করেছেন। অতঃপর তাঁর বংশধরদের মধ্য হতে ও পুণ্যবান ব্যক্তিদেরকে (নবী হিসেবে) নিযুক্ত করেছেন। তারপর আল্লাহ বলেন, তিনি (আল্লাহ) ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরকেও (নবী হিসেবে) কবুল করেছেন। এর মধ্যে ইসমাঈলের বংশধরও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। তারপরেই ইমরান (আ)-এর বংশের প্রশংসা করেছেন। এ ইমরান দ্বারা হযরত মারইয়াম (আ)-এর সম্মানিত পিতাকে বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) ইমরানের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

ইমরান ইবনে বাশিম ইবনে আমুন ইবনে মীশা ইবনে হিযকিয়া ইবনে আহরীফ ইবনে মাওসুম ইবনে আযাযিয়া ইবনে আমাসিয়া ইবনে ইয়াউস ইবনে আহরিহু ইবনে ইয়াযাম ইবনে ইয়াহফাশাত ইবনে আয়েশা ইবনে আয়ান ইবনে রাহাবিআম ইবনে সুলায়মান ইবনে দাউদ (আ)।

আবুল কাসিম ইবনে আসাকির (রহ) বলেন, হযরত মারইয়ামের বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ, মারইয়াম বিনতে ইমরান ইবনে মাসান ইবনুল আযের ইবনুল ইয়াত্তদ ইবনে আখনার ইবনে সাদুক ইবনে আয়াযুয ইবনুল ইয়াফীম ইবনে আয়বুদ ইবনে যারয়াবীল ইবনে শালতাল ইবনে ইউহইয়ানা ইবনে বারশা ইবনে আমুন ইবনে মীশা ইবনে হিযকিয়া ইবনে আহায ইবনে মাওসাম ইবনে আযরিয়া ইবনে ইউরাম ইবনে ইউশাফাত ইবনে আইশা ইবনে ইবা ইবনে রাহরিয়াম ইবনে সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)। প্রথমে বর্ণিত বংশ তালিকার সাথে এ তালিকার অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে কারো কোনো মতবিরোধ নেই যে, মারইয়াম (আ) দাউদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন।

হযরত মারইয়াম (আ)-এর পিতা হযরত ইমরান যে তাঁর সময়কালে বনী ইসরাঈলের একজন পুণ্যবান ও সঠিক পুরুষ ছিলেন, এ সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত নেই। হযরত মারইয়াম (আ)-এর মাতা হাননা বিনতে ফাকুদ ইবনে কাবীলও একজন সৎ ও সতী সাধ্বী মহিলা ছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, সে যুগের প্রসিদ্ধ নবী হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-এর বোনের স্বামী ছিলেন। এ বোনের নাম ছিল আশইয়া। আরেক বর্ণনা মতে, হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-এর খালার স্বামী ছিলেন। তার নামও ছিল আয়েশা। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, মারইয়াম (আ)-এর মায়ের কোনো সন্তান ছিল না। তিনি ছিলেন নিঃসন্তানী। একদিন তিনি দেখতে পেলেন যে, একটি পাখী তার বাচ্চাকে খুব আদর করছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর অন্তরে সন্তানের খুব আগ্রহ সৃষ্টি হলো। তিনি সেই সময় মানত করলেন যে, আল্লাহ যদি তাঁকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন, তবে তিনি তাঁর পুত্রটিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে উৎসর্গ করে দেবেন। তারপরই তাঁর মাসিক স্রাব শুরু হয়ে যায়। এরপর তিনি পবিত্র হলে তাঁর স্বামী তাঁর সাথে মিলিত হন এবং হযরত মারইয়াম (আ) তাঁর গর্ভে আসেন। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۖ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ۖ

অর্থ : তারপর যখন সে তাকে প্রসব করল তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। অথচ সে যা প্রসব করেছিল আল্লাহ তা সম্যক অবগত। আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের দিক দিয়ে (পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মতো নয়)। -সূরা আলে ইমরান : ৩৬

সে কালে লোকেরা বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য সন্তান মানত করতো। তারা বড় হয়ে মসজিদের খেদমত আঞ্জাম দিত। হযরত মারইয়াম (আ)-এর মা বললেন, "আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম।"

এর দ্বারা অনেকে এ দলীল গ্রহণ করে থাকে যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিবসেই তার নাম নির্দিষ্ট করা উচিত। অনুরূপভাবে বোখারী ও মুসলিম শরীফেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার নবজাতক শিশুকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পবিত্র মুখ দ্বারা কোনো মিষ্ট খাবার চিবিয়ে শিশুটির মুখে দিয়ে দিলেন। (তাবারক হিসেবে কোনো বুযুর্গ থেকে এরূপ করা সুন্নাত)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটির নাম আব্দুল্লাহ রেখে দিলেন। হযরত হাসান (রহ)-এর বর্ণিত হাদীসে সামুরা (রা) থেকে মারফু হাদীস বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক শিশু তার আকীকার বিনিময়ে বালা মসীবত থেকে নিরাপদে থাকে। শিশু জন্মের সপ্তম দিবসে তার (শিশুর) পক্ষ থেকে এ আকীকা করতে হয় এবং এ সময় তার নামও রাখতে হয় এবং মাথার চুল মুণ্ডনও করতে হয়।

ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী গ্রন্থকার এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। কয়েকটি বর্ণনায় يُسَمَّى (নাম করণ) এর স্থলে يُذَبَّحُ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ হয়, পশু যবেহ করে রক্ত প্রবাহিত করা।

মারইয়াম (আ) বলেছিলেন, আমি একে এবং এর ভবিষ্যত বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ আশ্রয় নিচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে মান্নতের দোয়া কবুল করেছিলেন, অনুরূপ এ দো'আটিও কবুল করলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রত্যেক সন্তানকেই শয়তান স্পর্শ করে থাকে। যে কারণে সন্তান (ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়) চিৎকার করে ক্রন্দন করে থাকে কেবল মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত। তারপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, যদি তোমরা চাও তবে হযরত মারইয়াম (আ)-এর উল্লিখিত দোয়া করতে পার, যে দোয়াটি কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে—

إِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য আপনার আশ্রয় নিচ্ছি। -সূরা আলে ইমরান : ৩৬

মুসনাদে আহমদে অন্য এক হাদীসে, কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক নবজাতককে শয়তান তার আঙ্গুল দ্বারা স্পর্শ করে, কেবল মারয়াম বিনতে ইমরান এবং তার পুত্র ছাড়া।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মা তার যে শিশুকেই ভূমিষ্ঠ করে, প্রতিটি শিশুকেই শয়তান মায়ের কোলে বসেই জোরে আঘাত করে। কেবলমাত্র মারইয়াম (আ) ও তার পুত্র ব্যতীত। (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন) তোমরা কি দেখনি যে, সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কিভাবে জোরে চিৎকার দিতে থাকে? লোকেরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কেন আমরা দেখি না? (নিশ্চয়ই আমরা তা দেখেছি)। তখন তিনি ﷺ বললেন, এ (চিৎকার দেয়ার) সময় শয়তান তাকে মায়ের কোলে বসে আঘাত করতে থাকে। উক্ত বর্ণনাটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত। কিন্তু ইমাম মুসলিম (রহ) এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

কায়িস (কিছু শাব্দিক পার্থক্যসহ) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রতিটি নবজাতককে শয়তান একবার অথবা দুবার আঁচড় দেয় কেবলমাত্র ঈসা ইবনে মারয়াম ছাড়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন মাজীদের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন—

وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۔

অর্থ : আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার ও তার বংশধরদের জন্য আপনার আশ্রয় নিচ্ছি।

মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক বনী আদমকে তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান তার পার্শ্বদেশে (আঙ্গুল ইত্যাদি দ্বারা) খোঁচা মারে। কেবলমাত্র ঈসা ইবনে মারইয়াম ছাড়া। যখন শয়তান তাকে স্পর্শ করতে আসলো, তখন পর্দা এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এ হাদীসখানা বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বর্ণিত। মারইয়াম (আ)-এর মাতা দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেন। আল্লাহ তা'আলার বলেন—

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ۔

অর্থ : তারপর তার প্রতিপালক তার দোয়া উত্তমরূপে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করলেন। আর তাকে যাকারিয়ার যিম্মায় রেখে দিলেন। –সূরা আলে ইমরান : ৩৭

অধিকাংশ মুফাসসির বর্ণনা করেছেন, মারইয়াম (আ) জন্ম হওয়ার পরেই তাঁর মা তাঁকে (সন্তানকে) কাপড় দিয়ে জড়িয়ে মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন। তিনি মসজিদের খেদমতে ও তত্ত্বাবধানে যে খাদেমকে পেলেন এবং সেখানে যাদেরকে ইবাদতে পেলেন তাঁদের কাছে তাঁকে (সন্তানকে) রেখে আসলেন। এ কন্যা সন্তানটি ছিল তাঁদের ইমাম ও নেতার কন্যা। সুতরাং তাঁকে লালন-পালন করার জন্য সবাই এগিয়ে আসলেন। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই চাচ্ছেন এ কন্যা সন্তানের যিম্মাদার হতে। মুফাসসিরগণ যদিও এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু স্পষ্টভাবে প্রমানিত হয় যে, মারইয়াম (আ)-এর মা মারইয়ামকে দুগ্ধ পান করার মেয়াদ শেষে শিশুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ও কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করেছিলেন। যা হোক ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকেই চাচ্ছেন যে, মারইয়াম (আ)-কে নিজ যিম্মায় পালন করবেন। এ সময়ে হযরত যাকারিয়া (আ) নবী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন শিশু মারইয়ামের ভগ্নিপতি বা খালু। এ কারণে তিনি মারইয়ামকে লালন-পালনের খুব আগ্রহ করেছেন এবং তাঁর ধারণায় এ ব্যাপারে তিনিই হকদার বেশি। কিন্তু লোকেরা এ সম্পর্কে মোটেই ছাড় দিলো না। তারা যাকারিয়া (আ)-কে বললেন, এ ব্যাপারে লটারি হবে। এ লটারিতে আপনিও শরীক হবেন। শেষ পর্যন্ত লটারির ব্যাপারে সবাই একমত হলো। লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর নাম উঠল। প্রকৃতপক্ষে খালা তো মায়ের মতই। এ কারণে এ লটারি ভালই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখেছিলেন। লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ) বিজয়ী হলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ یُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَیُّهُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ۝

অর্থ : এটা হলো অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যা (হে নবী!) আপনাকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করেছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে এজন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, আপনি তখন তাদের নিকট ছিলেন না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনো আপনি তাদের নিকট ছিলেন না। –সূরা আল ইমরান : ৪৪

লটারি এ নিয়মে হয়েছিল যে, আগ্রহী ব্যক্তিরা সবাই তাদের নিজ নিজ কলম এক স্থানে জমা করে রেখে দিলো। অতঃপর তারা একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে জমাকৃত কলমগুলো থেকে একটি উঠানো জন্য বলল। এ লটারিতে হযরত যাকারিয়া (আ) জিতে গেলেন। অর্থাৎ বালকটি তাঁর কলমটিই উঠালেন। কিন্তু লোকেরা এতে রাজি হলো না। তারা দ্বিতীয়বার লটারির প্রস্তাব দিলে পুনরায় লটারি হয়। এবার লটারির নিয়ম এভাবে করা হলো যে, সবাই নিজ নিজ কলম নদীতে ফেলে দিবে। যার কলম পানির স্রোতের বিপরীত দিকে যাবে, তিনিই মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালনের যিম্মাদার হবেন। এ কথা অনুযায়ী সবাই নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এবারেও হযরত যাকারিয়া (আ)-এর কলম বিপরীত দিকে চলতে লাগল। আর অন্যদের কলমগুলো নদীর স্রোতের দিকেই ভেসে চলে গেল। এবারেও লোকেরা সন্তুষ্ট হতে পারল না। তারা বলল, এবার আমাদের সর্বশেষ প্রস্তাব এই যে, আর একবার লটারি ধরা হোক। এবার লটারির নিয়ম নির্ধারণ হলো যে, সবাই নিজ নিজ কলম নদীতে নিক্ষেপ করবে। যার কলম স্রোতের দিকে ভেসে যাবে, তিনিই জিতে যাবেন। এবারেও দেখা গেল হযরত যাকারিয়া (আ)-এর কলম স্রোতের দিকে ভেসে যাচ্ছে। আর অন্যান্যের কলম স্রোতের বিপরীত দিকে চলছে। এবার হযরত যাকারিয়া (আ) সর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালনের যিম্মাদার হলেন। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং আত্মীয়তা ও অন্যান্য দিক দিয়েও হযরত যাকারিয়া (আ)-ই মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালনের সর্বাধিক হকদার ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۭ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

অর্থ : যখনই যাকারিয়া মিহরাবের মধ্যে তার কাছে আসত, তখনই তার কাছে খাবার দেখতে পেত। সে জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম! এসব (খাবার) কোথা থেকে তোমার কাছে এসেছে? সে (জবাবে) বলতো, এসব আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে অগণিত রিযিক দান করেন।'

–সূরা আলে ইমরান : ৩৭

মুফাসসিরগণ বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) মারইয়াম (আ)-এর জন্য মসজিদে একটি সুন্দর স্থান করে দিলেন। যেখানে মারইয়াম (আ) ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারতেন না। মারইয়াম (আ) সেখানে বসে একাকী আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। মসজিদের দেখাশুনার দায়িত্ব যথাসময়ে পালন করে বাকি সময়গুলো তিনি আল্লাহর ইবাদতেই কাটিয়ে দিতেন। তাঁর ইবাদতের কথা সবার কাছে প্রচার হয়ে গেল। তাঁর উত্তম চরিত্র, ইবাদত, সাধনা, বুযুর্গী ও কারামত সম্পর্কে লোকদের মাঝে আলোচনা চলতে লাগল। এ আলোচনাগুলোর মধ্যে একটি আলোচনা ছিল এই যে, হযরত যাকারিয়া (আ) যখন মারইয়াম (আ)-এর কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি সেখানে বিস্ময়কর ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দেখতে পেতেন। গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল দেখতে পেতেন। এসমস্ত দেখে হযরত যাকারিয়া (আ) মারইয়াম (আ)-কে জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম! এসব ফল-ফলাদি ও খাদ্যদ্রব্য কোথা থেকে এসেছে? মারইয়াম (আ) উত্তরে বলতেন, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে বেহিসাব রিযিক (খাদ্য) প্রদান করেন। এ সময় হযরত যাকারিয়া (আ)-এর অন্তরে একটি পুত্র সন্তানের আগ্রহ পয়দা হয়। যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল। এ অবস্থায়ও তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করলেন, হে প্রভু! আমাকেও আপনার পক্ষ থেকে এক পূতঃ পবিত্র নেককার সন্তান দান করেন। নিশ্চয়ই আপনি দো'আ শ্রবণকারী। কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) এই দোয়া করেছিলেন যে, হে মহান সত্তা, (আল্লাহ তা'আলা!) আপনি যেভাবে হযরত মারইয়াম (আ)-কে বিনা মওসুমে ফল-ফলাদি ও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করেছেন, অনুরূপভাবে আমাকেও একটি পুত্র সন্তান প্রদান করুন। যদিও এর সময় এখন নেই। এর পরবর্তী ঘটনা যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۞ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۞ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۞ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۞ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۞ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۠ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۞

অর্থ : তারপর ঐ সময় এল, যখন ফেরেশতারা মারইয়ামকে বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে বাছাই করেছেন ও পবিত্রতা দান করেছেন এবং গোটা দুনিয়ার মেয়েদের উপর আপনাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে তাঁর খিদমতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। হে মারইয়াম! আপনার রবের অনুগত হয়ে থাকুন। তার সামনে সিজদারত থাকুন এবং যারা তার নিকট নত হয়ে থাকে, তাদের সাথে আপনিও নত হয়ে থাকুন। হে নবী! এসবই গায়েবী খবর, যা আমি ওহীর মারফতে আপনাকে জানাচ্ছি। যখন হায়কালের খাদেমগণ মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে তা ঠিক করার জন্য নিজ নিজ কলম ফেলেছিল তখন তো আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আপনি ঐ সময়ও হাজির ছিলেন না, যখন তাদের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। আর যখন ফেরেশতারা বলল, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে তাঁর একটি কথার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সম্মানিত হবেন এবং আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবেন। তিনি দোলনায় থাকাকালেও মানুষের সাথে কথা বলবেন এবং বড় হয়েও (কথা বলবেন)। আর তিনি এক নেক ব্যক্তি হবেন। এ কথা শুনে মারইয়াম বললেন, হে আমার রব! আমার ঘরে কোথা থেকে বাচ্চা হবে? আমার শরীরে তো কোনো লোক হাতও লাগায়নি। জবাব পাওয়া গেল, এরকমই হবে, আল্লাহ যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কোনো কাজ করার ফায়সালা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, 'হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়।' (ফেরেশতারা আগের কথার জের টেনে বলল) আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেবেন এবং তাওরাত ও ইনজীলের ইলম শেখাবেন। আর তাঁকে

বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠাবেন। (যখন তিনি রাসূল হিসেবে বনী ইসরাঈলের কাছে এলেন তখন তিনি বললেন) আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সামনে মাটি দিয়ে পাখির আকারে একটি মূর্তি বানাচ্ছি এবং তাকে ফুঁক মেরে দিচ্ছি। এটা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যাচ্ছে। আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মগত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করে দিই এবং মৃতকে জীবিত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা কী খাও এবং তোমাদের ঘরে কী জমা করে রাখ। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এর মধ্যে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে। আর আমি ঐ শিক্ষা ও হেদায়াতের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছি, যা তাওরাতের শিক্ষা থেকে এখনো আমার সামনে রয়েছে। আমি এজন্যও এসেছি যে, তোমাদের জন্য এমন কতক জিনিস হালাল করে দেবো, যা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল।[১] দেখ, আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের জন্য নিদর্শন নিয়ে এসেছি। তাই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমারও রব, তোমাদেরও রব। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো, এটাই সরল মযবুত রাস্তা। -সূরা আল-ইমরান : ৪২-৫১

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ফেরেশতাগণ হযরত মারইয়াম (আ)-কে সুসংবাদ জানালেন যে, আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীর সমস্ত নারীদের মধ্য হতে মনোনীত করেছেন। তাঁর পবিত্র উদর থেকে পিতাবিহীন এমন এক মহান ব্যক্তিকে সৃষ্টি করবেন, যিনি হবেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ নবী। তিনি মাতৃক্রোড়ে মানুষের সাথে কথা বলবেন। অর্থাৎ দুধ পান করা বয়সের সময়ই (শিশুকালে) কথা বলবেন। তিনি লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেবেন। এরপর আল্লাহ হযরত মারইয়াম (আ)-কে বললেন যে, তুমি অধিক পরিমাণে ইবাদত বন্দেগী ও রুকু সিজদা করো। যাতে এ মর্যাদার ও সম্মান অধিকারী হতে পার।

তিনিও আল্লাহর ইবাদতে এত সাধনা ও কষ্ট করেছিলেন যে, দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে করতে তাঁর পবিত্র পা ফেটে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর, তার মাতা পিতার উপর ও তাঁর কলিজার টুকরার উপর রহমত প্রদান করুন।

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই যে, ফেরেশতাগণ বলেন, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত ও পবিত্র নারী হিসেবে কবুল করেছেন। তিনি আপনাকে অসৎ চরিত্র থেকে পবিত্র রেখেছেন এবং সচ্চরিত্র দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। আর সে যুগের সকল নারীদের উপর মর্যাদা দান করেছেন। যেমন বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তাকে পৃথিবীর মানুষের উপর নিযুক্ত করেছি। এ ঘোষণা সত্ত্বেও এ কথা সবার কাছে স্পষ্ট যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ উভয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন। এজন্য উম্মতে মুহাম্মাদী ﷺ সমস্ত উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হযরত মারইয়াম (আ)-কেও অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, হে মারইয়াম! আল্লাহ আপনাকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিন্তু যদি ইমাম ইবনে হাযম (রহ)-এর অভিমত গ্রহণ করা হয় যে, নারীরাও নবী হতে পারেন। তবে এ মত অনুযায়ী মূসা (আ)-এর মাতা এবং সারা (আ) ও ঈসা (আ)-এর মাতাও নবী হবেন এবং হযরত মারইয়াম (আ) নবী মূসা (আ)-এর মাতা ও সারার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন। আর উক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তিনি তার পূর্বের, পরের ও তাঁর সময়ের সকল নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবেন।

কিন্তু ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে অধিকাংশ আলেম বর্ণনা করেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত এই যে, নবুওয়াত পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত। নারীদের মধ্য হতে কেউ নবী হননি। এ মত অনুযায়ী হযরত মারইয়াম (আ) নবী ছাড়া একজন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নারী হবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, মারয়াম তনয় মাসীহ শুধু একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তার পূর্বেও অনেক

১. অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের অমূলক ধারণা, বিশ্বাস, তোমাদের সন্ন্যাসীদের কঠোর সাধনা এবং অমুসলিম জাতিসমূহের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর আসল আইনের অতিরিক্ত যে বিধি-নিষেধ চালু রয়েছে আমি তা বাতিল করে দেবো এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যা হালাল ও হারাম করেছেন, আমিও তা-ই হালাল ও হারাম করে দেবো।

রাসূল অতিবাহিত হয়েছে এবং তার মা সিদ্দীকা (মহা সত্যবাদিনী) ছিল। এ মত অনুসারেই মারইয়াম (আ) তাঁর পূর্বের ও পরের নারীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহিলা হতে পারেন। হাদীসে মারইয়াম (আ)-এর বর্ণনা, আসিয়া বিনতে মাযাহেম ও খাদীজাতুল কুবরা (রা) এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের সাথে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ (রহ) বিভিন্ন সূত্রে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী হলেন মারইয়াম বিনতে ইমরান। আর নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

ইমাম আহমদ (রহ) বলেন, হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পৃথিবীর সমস্ত নারীদের মধ্যে চারজন নারী-ই সর্বোত্তম। মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ। আরো বিভিন্ন সূত্রে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উষ্ট্রে আরোহিণী নারীদের মধ্যে সব চাইতে উত্তম নারী হচ্ছে কুরাইশের সতী নারী। তারা তাদের শিশু সন্তানদেরকে খুব স্নেহ করে এবং স্বামীর অনুগত থেকে স্বামীর সবকিছুর প্রতি খুব খেয়াল রাখে। তারপর আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান কখনো উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সাওয়ার হননি। –মুসনাদে আহমদ

ইমাম মুসলিমও এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদে অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, উষ্ট্রের উপর আরোহণকারিনী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নারী কুরাইশ নারী। তারা তাদের শিশু সন্তানকে অধিক স্নেহ ও ভালবাসার সাথে লালন-পালন করে এবং তারা স্বামীর অল্প সম্পদে তুষ্ট থাকে। তারপর হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (অবশ্যই) জানতেন যে, হযরত মারইয়াম (আ) কখনো উষ্ট্রের পৃষ্ঠে সওয়ার হননি।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার মাটিতে চারটি রেখা আঁকলেন। তারপর তিনি (উপস্থিত সকল সাহাবীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, এ রেখাগুলো কিসের? সাহাবীগণ আরয করলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জান্নাতী নারীদের মধ্যে চারজন সর্বোত্তম নারী হলো খাদীজা বিনতে খুওয়াইলাদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিনতে মাযাহেম।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি হযরত ফাতেমা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তুমি তাঁর পবিত্র মুখের কাছে গিয়ে তাঁর পবিত্র যবানে কিছু কথা শুনে প্রথমে তুমি কেঁদেছিলে। দ্বিতীয়বার আবার কিছু শুনে হেঁসেছিলে, এর কারণ কি? ফাতেমা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে আমাকে বলেছেন যে, তিনি ﷺ এ অসুখেই ইন্তেকাল করবেন। এ কথা শুনে আমি কেঁদেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি ﷺ আমাকে বলেছিলেন, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তার সাথে গিয়ে মিলিত হব এবং আমি জান্নাতী মহিলাদের সর্দার হব। তবে মারয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া। আমি (আব্বার পবিত্র মুখে) এ কথা শুনে হেসেছিলাম। এ হাদীসখানা সহীহ গ্রন্থে বিদ্যমান। এর সনদ (সূত্র) মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী বর্ণিত আছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত চারজন নারীর অবশিষ্ট দু'জনের চেয়ে এ দু'জন (ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ ও মারইয়াম বিনতে ইমরান) শ্রেষ্ঠ।

অনুরূপভাবে মুসনাদে আহমদে আবু সাঈদ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফাতেমা জান্নাতী নারীদের সর্দার। তবে মারইয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া।

মোটকথা মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ﷺ উল্লিখিত চারজন নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাসূলুল্লাহ ﷺ মারইয়াম বিনতে ইমরানের নাম আলাদাভাবে বলেছেন, এর কারণ এও হতে পারে যে, হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান হযরত ফাতেমা (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর এও হতে পারে যে, উভয়ই পদমর্যাদা ও

শ্রেষ্ঠত্বের দিক বিবেচনায় সমান। তবে প্রথম ধারণা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে একখানা হাদীস পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতী নারীদের সর্দার হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান। তারপর ফাতেমা, এরপর খাদীজা, অতঃপর ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া।

উপরিউক্ত হাদীসে নামগুলো যদি ক্রমান্বয়ে (যার পরে যার স্থান) হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, তবে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার পরে হযরত ফাতিমা (রা)। এর পূর্ববর্তী যেসব হাদীসে এই চারজন মহিলার নাম পেশ করা হয়েছে, সেখানে ক্রমবিন্যাস করে (অর্থাৎ তারপরে এর স্থান এভাবে) স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। যার কারণে সেই হাদীসসমূহ দ্বারা তাদের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে কিছুই বুঝা যায়নি। তবে ইবনে হাদিম (রহ) এ হাদীসটি অন্য সূত্রে শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াই বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ একখানা হাদীছ ইবনে মারদুইয়া, কুররাহ থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌছেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে পূর্ণতায় কেউই পৌছেনি। তবে তিনজন নারী ছাড়া, মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং খাদীজা বিনতে খুওয়াইলাদ। আর আয়েশার মর্তবা নারীদের উপর এরূপ, যেমন সারীদ (গোশতের ঝোলে ভেজানো রুটি)-এর প্রাধান্য সমস্ত খাদ্যের উপর। আবু দাউদ (রহ) ছাড়া অধিকাংশ হাদীস বিশারদ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌছেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেউই পূর্ণতায় পৌছেনি। তবে ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও মারইয়াম বিনতে ইমরান ছাড়া। আর আয়েশার মর্যাদা সকল নারীদের উপর এরূপ, যেমন সারীদের প্রাধান্য সমস্ত খাদ্যের উপর। এ হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম বোখারী ও মুসলিম (রহ) উভয়ই এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের মধ্যে পূর্ণতা কেবল মারইয়াম (আ) ও আসিয়া এ দুইজন নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। সম্ভবত তাঁদের দু'জনের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাঁদের সময়কালে ছিল। কারণ তাঁরা দু'জনেই দুই নবীকে শিশুকালে লালন-পালন করেছেন। আসিয়া করেছিলেন হযরত মূসা (আ)-কে লালন-পালন। আর মারইয়াম বিনতে ইমরান করেছেন তাঁর সন্তান আল্লাহর রাসূল ও বান্দা হযরত ঈসা (আ)-কে। সুতরাং এর দ্বারা তাঁদের ছাড়া অন্য নবীর উম্মতের নারীদের পূর্ণতায় পৌছা হাদীসের বিপরীত বুঝা যায় না। যেমন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে খাদীজা ও ফাতিমা (রা)। হযরত খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আসেন নবুওয়াতের পনের বছর পূর্বে। সে সময় থেকে নবুওয়াতের পরেও বিশ বছর পর্যন্ত তিনি আন্তরিকতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুপরামর্শদাতা ও একান্ত বিশ্বস্ত। ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার ব্যক্তিগত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য বোনদের তুলনায় অধিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কারণ তিনি তার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তার কাছে থেকে পিতার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেছেন। আর অন্যান্য বোনেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছেন। হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে প্রিয়তমা সহধর্মিনী। তিনি ছিলেন কুমারী। একমাত্র হযরত আয়েশা (রা) এই মর্তবা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তিনি তাঁর গোটা জীবন শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতেই উৎসর্গ করেছেন। অন্য কারো সাথে তাঁর বিবাহ হয়নি। তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী কোনো মহিলা এই উম্মতের মধ্যে নেই এবং এর পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও ছিল না। 'ইফকের' ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন তার উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্রতা ঘোষণা করে সপ্ত আসমান থেকে আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পরেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শরীফ প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি দ্বীনের জটিল জটিল বিষয়ের সমাধান দিতেন এবং সংস্কারমূলক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিতেন। উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই ছিলেন। অনেক আলেমের মতে খাদীজা (রা)-এর চেয়েও তিনি শ্রেষ্ঠ। তবে উত্তম পন্থা হলো এই যে, উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ ব্যাপারে মন্তব্য না করে নীরবতা পালন করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত

আয়েশা সম্পর্কে বলেছেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যান্য নারীদের উপর এরূপ, যেমন সারীদের প্রাধান্য সমস্ত খাদ্যের উপর। এখানে নারীরা বলতে সকল নারীও হতে পারে, আবার উপরোল্লিখিত চারজন নারী ছাড়া অন্যান্য নারীও হতে পারে এ কারণেই এ মতভেদ।

যা হোক এখন মূল আলোচনায় আসি। আল্লাহ পবিত্র করেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন পৃথিবীর সকল নারীদের মধ্যে হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (রা)-কে। পূর্বের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, এটাও হতে পারে যে, তাঁকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর পূর্বের ও পরের পৃথিবীর সকল নারীদের মধ্যে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতে মারইয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মাযাহেম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীদের অন্তর্গত হবেন। তাফসীর গ্রন্থে কোনো কোনো আলেম (অর্থাৎ বিবাহিত স্ত্রী ও কুমারী স্ত্রী) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, অবিবাহিতা স্ত্রী দ্বারা মারইয়াম বিনতে ইমরানকে এবং বিবাহিতা স্ত্রী দ্বারা ফেরআউনের আসিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

তাবারানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে মারইয়াম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং মুসার বোনের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দেবেন। অন্য এক বর্ণনায় শেষের দিকে কিছু বৃদ্ধিসহ বর্ণিত আছে যে, হাদীসের বর্ণনাকারী বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যবানে এ কথা শুনে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার বরকত হোক।

আবু দাউদ থেকে বর্ণিত আছে। হযরত খাদীজা (রা) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে তাশরীফ নিলেন। তিনি ﷺ খাদীজা (রা)-কে বললেন, হে খাদীজা! তোমার যে কষ্ট ও পেরেশানী দেখছি তা কি আমার জন্য? (অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে এ কারণে?) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে, তোমার সাথে এবং মারইয়াম বিনতে ইমরানের সাথে এবং মুসা (আ)-এর বোন কুলসুমের সাথে এবং ফেরআউনের স্ত্রী আসিয়ার সাথে আমার বিবাহ করিয়ে রেখেছেন। খাদীজা (রা) আরয করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি এরূপ (কাজ) আপনার সাথে করেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, জী হ্যাঁ। এ কথা শুনে খাদীজা (রা) বললেন, আপনার এ বিবাহ ও আপনার সন্তানদের জীবন বরকতপূর্ণ হোক।

ইবনে আসাকির (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, খাদীজা (রা) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে তাশরীফ নিলেন। তিনি ﷺ খাদীজা (রা)-কে বললেন, হে খাদীজা! যখন তুমি গিয়ে তোমার সতীনদের সাথে মিলিতে হবে, তখন তাঁদের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে। খাদীজা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি কি আমার পূর্বেও কাউকে বিবাহ করে ছিলেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না', কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম বিনতে ইমরান, আসিয়া বিনতে মাযাহেম এবং মুসা (আ)-এর বোন কুলসুমের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিয়েছেন।

ইবনে আসাকির (রহ)-এর এক বর্ণনায় হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার সুসংবাদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করেন। তাঁরা পরস্পরে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় হযরত খাদীজা (রা) সেখান থেকে কোথাও গমন করছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁকে দেখে আরয করলেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! ইনি কে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইনি আমার উম্মতের সিদ্দীকা। (অর্থাৎ আমার স্ত্রী খাদীজা)। হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য এক সুসংবাদ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সালাম জানিয়েছেন এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যে জান্নাত অত্যন্ত প্রশস্ত এবং মূল্যবান ইয়াকুত পাথর দ্বারা তৈরি। সেখানে নেই কোনো প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি এবং নেই কোনো প্রকার হৈ চৈ ও কোলাহল। হযরত খাদীজা (রা) এই সুসংবাদ শুনে বললেন, আল্লাহ শান্তিদাতা। তাঁর থেকেই শান্তি নাযিল হয়। আপনাদের দু'জনের উপরই আল্লাহ তা'আলার রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর রাসূলের উপর তাঁর রহমত নাযিল হোক। খাদীজা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, জমরুদ পাথরের নির্মিত ঘরটি কেমন? তিনি বললেন, মোতির নির্মিত। সে ঘরটি মারইয়াম

বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মাযাহেম এর ঘরের মাঝখানে। এরা দু'জনই কিয়ামতের দিন আমার স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত।

সহীহ হাদীসে এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজার প্রতি আল্লাহর সালাম ও তাঁর সুসংবাদ। আর এমন জান্নাতেরও সুসংবাদ, যা জমরুদ (মূল্যবান পাথর) দ্বারা নির্মিত। আর ইয়াকুত পাথর দ্বারা সেটি জড়ানো থাকবে। সে জান্নাতে থাকবে না কোনো হৈ চৈ ও কোলাহল। সেখানে থাকবে না কোনো ক্লান্তি ও কষ্ট। কিন্তু এ হাদীসটি দুর্বল এবং সনদের মধ্যে সন্দেহ আছে।

ইবনে আসাকির (রহ) বর্ণনা করেছেন, কাআব ইবনে আহবার (রা) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রা) তাঁর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথর প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি (কা'আব) বললেন, পাথরটি একটি বাগানের উপর স্থাপিত। আর বাগানটি জান্নাতের ঝর্ণাসমূহের একটি ঝর্ণার উপর স্থাপিত। আর সেই বাগানটির মধ্যে বসে হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মাযাহেম জান্নাতবাসীদের (শোনানোর) জন্য ছন্দ রচনা করতে থাকবেন। এমতাবস্থায়ই কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। তবে এ বর্ণনাটি কাআব ইবনে আহবারের। তিনি ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। এটি কারো কারো বানোয়াট বর্ণনা।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের বিবরণ

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বর্ণনা করেন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ ۘ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا ۖ فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ۖ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذٰلِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۚ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞ فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۞ وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞ فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۞ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ ۚ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا ۞ يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ ۚ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۖ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا ۞ وَّجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ ۖ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۞ وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ ۖ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۞ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ ۙ سُبْحٰنَهٗ ۚ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۞ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۞

অর্থ : (হে নবী!) এ কিতাবে মারইয়ামের অবস্থা বর্ণনা করুন, যখন সে আপন লোকজন থেকে আলাদা হয়ে পূর্বদিকে নির্জনবাসী হয়ে গেল। তারপর সে তাদের থেকে পর্দার আড়াল হয়ে গেল। আমি আমার রূহকে (অর্থাৎ ফেরেশতাকে) তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে একজন পূর্ণ মানুষের আকারে হাজির হয়ে গেল। মারইয়াম হঠাৎ বলে উঠল, তুমি যদি কোনো মুত্তাকী লোক হয়ে থাক, তাহলে আমি তোমার নিকট থেকে রাহমানের কাছে আশ্রয় চাই। সে বলল, আমি তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমাকে এজন্য পাঠানো হয়েছে যে, তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করব। মারইয়াম বলল, আমার সন্তান কেমন করে হবে? আমাকে তো কোনো মানুষ ছোঁয়ওনি এবং আমি কোনো বদকার মেয়েও নই। ফেরেশতারা বলল, এ রকমই হবে। তোমার রব বলছেন, এমনটা করা আমার জন্য অতি সহজ। আর আমি এটা এ জন্য করব যে, (ঐ ছেলেকে) আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে রহমত বানাব। আর এ কাজ অবশ্যই হবে। তারপর মারইয়াম ঐ ছেলেকে গর্ভে ধারণ করল এবং এ গর্ভ নিয়ে দূরে এক জায়গায় চলে গেল। এরপর প্রসব-বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের নিচে পৌঁছিয়ে দিলো। সে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাও না থাকত।[১] ফেরেশতা তার পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বলল, তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচ থেকে ঝরনা বহমান করে দিয়েছেন। তুমি খেজুরের ডালায় একটু ঝাঁকি দাও, তোমার উপর তরতাজা পাকা খেজুর টপটপ করে পড়বে। এখন তুমি খাও ও পান করো এবং তোমার চোখ ঠান্ডা করো। তুমি যদি কোনো মানুষকে দেখতে পাও, তাহলে বলে দাও, আমি রাহমানের জন্য রোযা মান্নত করেছি। তাই আজ কারো সাথে কথা বলব না। তারপর সে ঐ শিশুকে নিয়ে কাওমের কাছে ফিরে এল। লোকেরা বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো বড় পাপ করে বসেছ। হে হারুনের বোন![২] তোমার বাপ তো কোনো খারাপ লোক ছিলেন না। তোমার মাও তো বদকার মহিলা ছিলেন না। মারইয়াম (নিজে কথা না বলে) শিশুটির দিকে ইশারা করল। লোকেরা বলল, আমরা এর সাথে কী কথা বলব, যে দোলনায় পড়ে থাকা একটা বাচ্চা মাত্র। শিশুটি বলে উঠল, আমি আল্লাহর বান্দাহ![৩] তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং নবী বানিয়েছেন। আর যেখানেই আমি থাকি না কেন, আমাকে বরকতময় বানিয়েছেন এবং যতদিন আমি জীবিত আছি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের হুকুম দিয়েছেন। আর আমাকে আমার মায়ের হক আদায়কারী বানিয়েছেন।[৪] আমাকে তিনি অহঙ্কারী ও হতভাগা

১. যে মুহূর্ত ও পরিস্থিতিতে এ কথা বলা হয়েছে, তা বিবেচনা করলে বোঝা যাবে, হযরত মারইয়াম (আ) প্রসবযন্ত্রণার কারণে এ কথা বলেননি; বরং এই চিন্তায় বলেছিলেন যে, পিতা ছাড়া এ শিশু জন্ম নিয়েছে, একে নিয়ে আমি কোথায় যাব? এ কারণেই গর্ভাবস্থায় তিনি একাকী দূরবর্তী এক জায়গায় চলে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর মা ও বংশের লোক দেশেই ছিলেন।

২. অর্থাৎ হারুন-বংশীয় কন্যা। আরবী বাগধারায় কোনো বংশের কোনো ব্যক্তিকে সেই বংশের ভাই বা বোন বলে অভিহিত করা হয়। কাওমের লোকদের এ কথার অর্থ হচ্ছে, আমাদের সব থেকে বড় দীনি পরিবারের মেয়ে হয়ে তুমি এ কী করে বসলে!

৩. এ ছিল সেই নিদর্শন, এর আগে ২১নং আয়াতে যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবজাত শিশু দোলনায় শোয়া অবস্থায়ই কথা বলতে শুরু করায় সকলের কাছে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ শিশু কোনো পাগলাত শিশু হতে পারে না; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা অলৌকিক নিদর্শন। সূরা আলে ইমরানের ৪৬নং আয়াত ও সূরা মায়িদার ১১০নং আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ) দোলনায় কথা বলেছিলেন।

৪. মাতা-পিতার হক আদায়কারী বলা হয়নি; বরং শুধু মায়ের হক আদায়কারী বলা হয়েছে। এর দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয়, হযরত ঈসা (আ)-এর কোনো পিতা ছিল না। আরেকটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে, কুরআন মাজীদের সকল জায়গাতেই তাঁকে 'ঈসা ইবনে মারইয়াম' বলা হয়েছে।

বানাননি। আমার উপর সালাম, যেদিন আমি পয়দা হয়েছি, যেদিন আমি মরব এবং যেদিন আমাকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে।১ তিনিই হলেন মারইয়ামের পুত্র ঈসা! আর এটাই হলো তাঁর সম্পর্কে ঐ সত্য কথা, যার মধ্যে মানুষ সন্দেহ করছে। এটা আল্লাহর কাজ নয় যে, তিনি কাউকে পুত্র বানাবেন। তিনি পাক-পবিত্র। তিনি যখন কোনো ফায়সালা করেন, তখন তিনি বলেন, হয়ে যাও। আর অমনি তা হয়ে যায়।২ (ঈসা বলেছিলেন যে) আল্লাহ আমারও রব, তোমাদেরও রব। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। এটাই সরল, মজবুত পথ। কিন্তু এরপর বিভিন্ন দল আপসে মতভেদ করতে লাগল। তাই যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য ঐ সময়টা বড়ই ধ্বংসের হবে, যখন তারা এক মহা দিন দেখতে পাবে। -সূরা মারইয়াম : আয়াত ১৬-৩৭

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা আরো বর্ণনা করেন-

وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ط وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ ۞ وَالَّتِىْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

অর্থ : আমি যাকারিয়াকেও ঐ নিয়ামত দিয়েছিলাম। যখন তিনি তার রবকে ডাকলেন, হে আমার রব! আমাকে একা ছেড়ে দেবেন না। আপনিই তো সেরা ওয়ারিশ। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে (পুত্র হিসেবে) ইয়াহইয়াকে দান করলাম। এর জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য বানালাম। এসব লোক অবশ্যই নেক কাজে তৎপর ছিলেন এবং তারা আগ্রহ ও ভয়ের সাথে আমাকে ডাকতেন। আর আমার প্রতি তারা অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। ঐ মহিলার কথা, যে তার সতীত্বের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল৩। আমার রূহ থেকে তার গর্ভে ফুঁ দিয়ে দিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে দুনিয়াবাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম। -সূরা আম্বিয়া : ৮৯-৯১

প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর মাতা মারইয়াম (আ) জন্মের পূর্বে মান্নত করেছিলেন, তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ কর দেবেন। মারইয়াম (আ) তাঁর খালু বা ভগ্নিপতি যাকারিয়া (আ)-এর তত্ত্বাবধানে সেখানে থাকেন। তিনি মারইয়াম (আ)-এর জন্য মসজিদের এক কোণায় একটি হুজরা (কক্ষ) বানিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে হযরত মারইয়াম (আ) ও হযরত যাকারিয়া (আ) ছাড়া আর কারো প্রবেশ করার অনুমতি ছিল না। হযরত মারইয়াম (আ) বয়সঃপ্রাপ্তা হওয়ার পরে তিনি আল্লাহর ইবাদতে এত মশগুল হয়ে পড়েন, যা দেখে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর মনেও তাঁর উপরে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। ঈর্ষান্বিত হওয়ার সবচেয়ে বড় বিষয়গুলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পৃথিবীর সকল নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর ফেরেশতা দ্বারা তাঁকে এ সুসংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আরো সুসংবাদ দিয়েছেন, এক মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র সন্তানের। যে (সন্তান) বিনা পিতায় সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর মানুষের জন্য নিদর্শন হবে। আর এ শিশু পরবর্তীতে নবী হবেন। এ সুসংবাদে হযরত মারইয়াম (আ) অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, পিতা কিভাবে সন্তান হবে। কারণ তার তো স্বামী নেই। তিনি কখনো বিবাহ বসেননি। তখন ফেরেশতা বলল, আল্লাহ তা'আলা

১. এ অলৌকিক নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সে সময়ই বনী ইসরাঈলের প্রতি তাঁর সতর্কীকরণের দায়িত্ব পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তাই যখন যুবক হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ) নবুওয়াতের কাজ শুরু করলেন, তখন বনী ইসরাঈল তাঁকে শুধু অস্বীকারই করল না; বরং তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। তাঁর সম্মানিতা মায়ের প্রতি মিথ্যা করার অপবাদ দিতেও তখন তারা লজ্জাবোধ করল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন শাস্তি দিলেন, যা তিনি অন্য কোনো কাওমকেই দেননি।

২. ইসায়ীদের প্রতি এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার 'ইতিমামে হুজ্জাত' বা যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সাবধান করার দায়িত্ব পালন করা। অলৌকিকভাবে কারো জন্ম হওয়াটাই এ কথার প্রমাণ নয় যে, তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মাআযাল্লাহ (এ পাপ ধারণা থেকে আল্লাহ বাঁচান!) গণ্য করতে হবে।

৩. অর্থাৎ হযরত মারইয়াম (আ)।

যা ইচ্ছা করেন, তা করতে সক্ষম। আল্লাহ যা করতে চান, তা কুন (হয়ে যাও) বলার সাথে সাথেই হয়ে যায়। হযরত মারইয়াম (আ) আল্লাহ তা'আলার আদেশের সামনে মাথা অবনত করলেন। তবে তিনি এ কথাও জানতেন যে, এটা একটি কষ্ট সাধনার ব্যাপার এবং মানুষের কাছে জবাবদিহিতার বিষয়। কারণ, মানুষেরা তো প্রকৃত অবস্থা জানবে না। তারা শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে মন্তব্য করবে। মারইয়াম (আ) শুধু মাসিক ঋতু চলাকালে অথবা জরুরি কোনো কাজে, যেমন পানি অথবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য মসজিদ থেকে বের হতেন। একদা তিনি কোনো জরুরি কাজে মসজিদ থেকে বের হয়েছিলেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল ফেরেশতা মানব আকৃতিতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে মারইয়াম (আ) বললেন, "তুমি যদি মুত্তাকী পরহেযগার হও, তবে তোমার থেকে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আবুল আলীয়া (রহ) বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ) এ কথা এজন্য বলেছিলেন যে, পরহেযগার ব্যক্তি জ্ঞানী ও সংযমী হয়ে থাকেন। এ কারণে বলেছিলেন যে, তুমি যদি পরহেযগার হও, তবে আমার কাছ থেকে চলে যাও। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে 'তাকীয়্যা' নামক এক পাপী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল। মারইয়াম (আ) সেই লোকটিকে মনে করে এ কথা বলেছিলেন। তবে এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে দুর্বল ও মিথ্যা বর্ণনা।

মারইয়াম (আ)-এর কথায় জিবরাঈল বললেন, আর কিছু না আমি তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফেরেশতা)। অর্থাৎ আমি কোনো মানুষ নই। আমি এসেছি এজন্য যে, আপনাকে এক পবিত্র সন্তান দান করব। সে (মারইয়াম) বলল, আমার সন্তান কিভাবে হবে? আমাকে তো কোনো মানুষ স্পর্শ করেনি আর আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতা বললেন, অনুরূপভাবেই হবে। তোমার প্রভু বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ সাধ্য। আর এটা আমি এজন্য করছি যে, তাঁকে আমি মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই যে, হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছি ছাড়া মাতা-পিতা আর হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করেছি নারী ছাড়াই, শুধু পুরুষ থেকে। আর এখন হযরত ঈসাকে সৃষ্টি করছি বিনা পিতায়। এটা আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ। অর্থাৎ সে শিশু অবস্থায়ই মানুষের জন্য সৌভাগ্য ও রহমতের কারণ হবে। লোকদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। তারপরেই বলা হয়েছে, এটাতো নির্ধারিত ব্যাপার। এ কথাটি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, তার এ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ)-ও এ অর্থ করেছেন। ইবনে জারীর (রহ)-ও এ মতকে গ্রহণ করেছেন। আর এটাও হতে পারে যে, এর অর্থ মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ফুঁক দেয়া। যেমন কুরআন মাজীদের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে—

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا .

অর্থ : মারইয়াম বিনতে ইমরান, যে তার সতীত্বকে রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। -সূরা তাহরীম : ১২

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-এর জামার প্লেটে বুকের দিকের খোলা অংশে ফুঁক দিয়েছিলেন। সে ফুঁক গিয়ে তাঁর লজ্জাস্থান পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এভাবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, যেভাবে নারীরা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে তাঁর স্বামীর সহবাসের দ্বারা। তবে এ কথাটি একেবারেই ভুল এবং অসত্য যে, জিবরাঈল (আ) মারইয়াম (আ)-এর মুখে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর এ কথাটিও ভুল যে, ঐ রূহ স্বয়ং মারইয়াম (আ)-এর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর মুখের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন। এ বর্ণনা কুরআন মাজীদের বর্ণনার পরিপন্থী। কুরআন মাজীদের পবিত্র বাণী দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত জিবরাঈল আমীনকে মরইয়াম (আ)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁকেই 'রূহুল আমীন' বলা হয়। তিনি মানব আকৃতিতে এসে মারইয়াম (আ)-এর জামার প্লেটে ফুঁক দিয়েছিলেন। তিনি মারইয়াম (আ)-এর লজ্জাস্থান বরাবর ফুঁক দেননি, নাউযুবিল্লাহ; বরং জামার প্লেটের বরাবর যে ফুঁক দিয়েছিলেন, সেই ফুঁক লজ্জাস্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। পর আমি তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ তার মধ্যে রূহ ও ফুঁক প্রবেশ করেছিল। রূহ তাঁর শরীরে প্রবেশ

করেছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে ফুঁক প্রবেশ করেনি। অনুরূপ আল্লামা সুদ্দী (রহ) সনদসহ সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, অতঃপর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল' অর্থাৎ গর্ভে পুত্র এল। এরপর তাকে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে গেল। হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভ ধারণ করার পর অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন যে, লোকেরা তাঁর সম্পর্কে অপবাদ ছড়াবে। এ সম্পর্কে কোনো কোনো বুযুর্গ একটি কাহিনী পেশ করেছেন। এ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ)-ও রয়েছেন। কাহিনীটি এই যে, মারইয়াম (আ) এর গর্ভের আলামত যখন প্রকাশ পেল, তখন সর্বপ্রথম তা বনী ইসরাঈলের একজন পরহেযগার ও মুত্তাকী ব্যক্তির দৃষ্টি গোচর হলো। তাঁর নাম ছিল ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব। তিনি ছিলেন মারইয়াম (আ)-এর খালাতো ভাই। তিনি এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কারণ তিনি মারইয়াম (আ)-এর পবিত্রতা, তাকওয়া বিশ্বস্ততা এবং পরহেযগারী সম্পর্কে ভাল করেই জানতেন। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় দেখছেন। এটা তাঁর কাছে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হতে লাগল। একবার তিনি মারইয়াম (আ)-এর কাছে এসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এ সময় তিনি মারইয়াম (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে মারয়াম! বীজ ছাড়া কি ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন হতে পারে? মারইয়াম (আ) বললেন, জী হ্যাঁ, হতে পারে। তুমি বলো, প্রথমে ক্ষেতকে কে সৃষ্টি করেছেন? এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষের স্পর্শ ছাড়া কোনো নারীর সন্তান হতে পারে? মারইয়াম (আ) বললেন, জী হ্যাঁ, হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে বিনা মাতা-পিতায় সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার রহস্যটি আমাকে বল। মারইয়াম (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শনের। যার নাম হবে মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম। সে ইহকাল এবং পরকালে সম্মানিত ও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন হবে এবং আল্লাহ তা'আলার অতি প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সে শিশু এবং বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষের সাথে কথা বলবে। পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সাথেও মারইয়াম (আ)-এর এরূপ আলাপ হওয়ার ঘটনা বর্ণিত আছে। যাকারিয়া (আ) ও মারয়াম (আ)-এর কাছে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। মারইয়াম (আ) তাঁকেও এ জবাব দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

হযরত সুদ্দী (রহ) সনদসহ সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মারইয়াম (আ) একবার তাঁর বোনের কাছে গিয়েছিলেন। বোন তাঁকে বললেন, আমি যে গর্ভবতী তা কি তুমি অনুভব করতে পেরেছ? হযরত মারইয়াম (আ) বললেন, হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছি। আর আমিও তো গর্ভবতী। তারপর তাঁর বোন তাঁর গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং ইয়াহইয়া (আ)-এর মা মারইয়াম (আ)-কে বললেন, আমি অন্তর চোখে দেখেছি যে, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে, সে সন্তান তোমার গর্ভের সন্তানকে সিজদা করবে (অর্থাৎ তাকে সম্মান করবে এবং তোমার সন্তান অতি কালেমার সত্যায়নকারী অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে হযরত ইয়াহইয়া (আ) সমর্থন ও সত্যায়ন করবেন।

আবুল কাসিম (রহ) বলেছেন, হযরত মালিক (রহ) বলেছেন, আমি অন্য বর্ণনায় পেয়েছি যে, হযরত ইয়াহইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ) দু'জন পরস্পরে খালাতো ভাই। উভয়ে এক সময়ই গর্ভবতী হন। ইয়াহইয়া রয়েছে সে সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে সিজদা করবে। হযরত মালিক (রা) বলেন, এর দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ও মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভাল করার ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন।

হযরত মুজাহিদ (রহ) বলেছেন, হযরত মারইয়াম (আ) বলতেন, আমি যখন নির্জনে একাকীত্বে থাকতাম তখন এই শিশু আমার সাথে কথা বলত। আর যখন আমি লোক সমাজে বা কোনো মজলিসে থাকতাম, তখন সে (সন্তান) পেটের মধ্যে বসে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতেন। এ কথাটি অতীব স্পষ্ট যে, হযরত মারইয়াম

(আ)-ও সকল মহিলাদের মতো নয় মাস গর্ভধারণ করার পর সন্তান প্রসব করেছিলেন। যদি এর ব্যতিক্রম কিছু হতো, তবে তার উল্লেখ করা হতো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও ইকরামা (রহ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভকাল ছিল আট মাস। ইবনে আব্বাস (রা)-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করার পর-ই সন্তান প্রসব করেন। কেউ কেউ বলেন, মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করার পরে খুব তাড়াতাড়ি সন্তান প্রসব করেছিলেন। এ অভিমত যারা পোষণ করেন, তাঁরা নিম্নের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন।

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ۞ فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ

অর্থ : পর সে গর্ভে তাকে ধারণ করল। এবং এ গর্ভ নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। –সূরা মারইয়াম : ২২-২৩

অর্থাৎ গর্ভবতী হওয়ার সাথে সাথেই প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল। তবে বিশুদ্ধ মত এই যে, প্রতিটি বিষয়ের বা ঘটনার পরে আর একটি বিষয় বা ঘটনা একটু ব্যবধানসহ হয়। যেমন- কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তারপর যমীন তরতাজা (সবুজ-শ্যামল) হয়ে ওঠে। অর্থাৎ কিছুকাল ব্যবধানে জমিন সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারপর আমি শক্রকে গোশত পিণ্ডে পরিণত করি। এরপর পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে। তারপর অস্থি পঞ্জরকে গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। অতঃপর তাকে অন্য এক রূপে সৃষ্টি করি। আল্লাহ মহান, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা। এখানে প্রতিটি বিষয়কে দ্রুত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর অতিক্রম করতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। যা বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মাঝে এ কথা প্রচার হয়ে গেল যে, মারইয়াম (আ) অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। এ খবর শুনে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘরে যারা আসা যাওয়া করতো, তারা তার ঘরে আসা বন্ধ করে দিল। কোনো কোনো কাফেররা জনৈক ইউসুফ নামক এক ব্যক্তির নামে এ দুর্নাম রটিয়ে দিলো যে, তার দ্বারা মারইয়াম (আ)-এর এরূপ ঘটনা ঘটেছে। ইউসুফ মসজিদে মারইয়াম (আ)-এর সাথে একত্রে ইবাদত বন্দেগী করতেন। মারইয়াম (আ) লোক-চক্ষুর অন্তরালে বহুদূরে চলে যান। আল্লাহ তা'আলা বলেন, প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের তলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। অর্থাৎ যখন মারইয়াম (আ)-এর প্রসব বেদনার কষ্ট শুরু হয়ে গেল, তখন তিনি অপারগ হয়ে খেজুর বৃক্ষের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। তার কাছে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং তিনি খেজুর গাছের ডাল ধরে বসে রইলেন। ইমাম নাসাঈ (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা) থেকে এক মারফু হাদীসে বর্ণিত আছে যে, খেজুর গাছে তলে মারইয়াম (আ) আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে জায়গাটির নাম 'বাইতুল লাহম'। রোমের জনৈক বাদশাহ এ স্মৃতি রক্ষার জন্য এখানে একটি সৌধ নির্মাণ করেছেন।

সেখানে পৌছে মারইয়াম বলল—

قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞

অর্থ : হায়! আমি যদি কোনোরূপে এর পূর্বে মারা যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। –সূরা মারইয়াম : ২৩

মারইয়াম (আ)-এর এ কথা দ্বারা অনেকে দলীল দিয়ে করে থাকেন যে, কঠিন মসীবত ও ফিতনা ফাসাদের সময় মৃত্যু কামনা করা বৈধ (তবে আত্মহত্যা নয়)। মারইয়াম (আ) এ (মৃত্যুর) কামনা এজন্য করেছেন যে, তিনি জানতেন যে, লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাবে। তিনি যতই ইবাদতকারী, রাত জাগরণকারী ও মসজিদে ইতেকাফকারী এবং বিশ্বাসী ও নবীর বংশধর হন না কেন, লোকেরা তাঁর কথা মোটেই বিশ্বাস করবে না; বরং তাকে মিথ্যাবাদী বলবে। এ চিন্তা করে তিনি মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেন, তা কামনা করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَا .

অর্থ : তারপর পায়ের দিক থেকে তাকে আহ্বান করল। –সূরা মারইয়াম : ২৪

এ আহ্বানকারী কে? এ ব্যাপারে দুটি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা এই যে, আহ্বানকারী হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আওফী (রহ) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) শুধু লোকদের মাঝে (জনসম্মুখে) গিয়ে কথাবার্তা বলেছেন। (শিশু অবস্থায় জনসম্মুখে যাওয়ার পূর্বে কোনো কথা বলেননি) সুদ্দী, সায়ীদ ইবনে যোবায়ের, আমর ইবনে মায়মুন, যিহাক ও কাতাদাহ (রহ) তাঁরাও এ অভিমত পোষণ করেন যে, এ আহ্বানকারী ছিলেন হযরত জিবরাঈল আমীন।

মুজাহিদ, হাসান, ইবনে যায়েদ ও সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রহ)-এর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এ আহ্বানকারী ছিলেন মারইয়াম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ)। ইবনে জারীর (রহ) এ অভিমতকে সমর্থন করেছেন। সূরা মারইয়ামের ২৪নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا .

অর্থ : তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার পাদদেশে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সেটি দুর্বল।

ইবনে জারীর (রহ) এ অভিমত সমর্থন করেছেন। হাসান, রাবী ইবনে আনাস ও ইবনে আসলাম (রহ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আহ্বানকারী দ্বারা মারইয়াম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে খাও, পান করো ও চক্ষু শীতল করো।

কেউ কেউ বলেছেন, খেজুর কাণ্ডটি শুকনা ফলবিহীন ছিল। আরেক বর্ণনা মতে এটি প্রথম থেকেই ফলবান ছিল। (আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।) তবে এটাও হতে পারে যে, খেজুর বৃক্ষটি শুকনাই ছিল। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা বলে সেটি ঐ সময় ফলবান হয়ে গেছে। কারণ হযরত ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ট হয়েছিলো শীতকালে। এ সময়টি ফলের মওসুম নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী—

تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

অর্থ : তোমার উপর সুপক্ক তাজা ফল পতিত হবে। –সূরা মারইয়াম : ২৫

আল্লাহ তা'আলার এ কথা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এটি মারইয়াম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহসূচক বাণী।

আমর ইবনে মায়মুন বলেছেন, প্রসূতি মহিলাদের জন্য শুষ্ক খেজুর বা তাজা খেজুরের চেয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য আর কিছু নেই। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত বাণী তিলাওয়াত করেন। হযরত আলী ইবনে আবী তালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের শুকনা খেজুর গাছকে সম্মান করো। কারণ সেটি সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, যেই মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর গাছসমূহের মধ্যে খেজুর গাছ চাড়া অন্য আর কোনো এমন গাছ নেই, যার নরের (পুরুষজাতের) কলি নারী (মাতৃ) জাতের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু এ বর্ণনাটি দুর্বল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের প্রসূতি স্ত্রীদেরকে পাকা ও তাজা খেজুর দ্বারা ভালোবাস। যদি তাজা ও পাকা খেজুর পাওয়া না যায়, তবে শুষ্ক খেজুর (খোরমা) দ্বারা ভালোবাস। অর্থাৎ প্রসূতিকে পাকা ও তাজা খেজুর খাওয়াবে, তা না পাওয়া গেলে শুকনা খেজুর (খোরমা) খাওয়াবে।

গাছ-সমূহের মধ্যে সে বৃক্ষের চেয়ে আর কোনো বৃক্ষ আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক প্রিয় ও সম্মানিত নয়, যে বৃক্ষের নিচে হযরত মারইয়াম বিনতে ইমরান (অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়) আশ্রয় নিয়েছিলেন (অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষ)। এ হাদীছের একজন বর্ণনাকারী দুর্বল।

আল্লাহ তা'আলার বর্ণনা করেন—

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۙ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا .

অর্থ : যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সওম মান্নত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথাই বলব না। –সূরা মারইয়াম : ২৬

এ কথাটিও তাঁর যিনি নিচে বসে আহ্বান করেছিলেন। আর এখানে 'বলে দিও' দ্বারা ইশারা ইত্যাদি দ্বারা বুঝানোর কথা বলা হয়েছে যে, আমি নীরবতা ও মৌনতার রোযা করুণাময় আল্লাহ তা'আলার জন্য মান্নত করেছি। তাঁদের শরীয়তে তখন রোযা ছিল মৌনতা ও নীরবতা অবলম্বন এবং পানাহার থেকে বিরত থাকা।

কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইবনে আসলাম (রহ)-ও এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমাদের শরীয়তে মুহাম্মাদী ﷺ -এ (পানাহার থেকে বিরত থাকার মতো সারাদিন) এরূপ নীরবতার ও মৌনতা রোযার বিধান নেই। এতে রোযার ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا .

অর্থ : তারপর মারইয়াম সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল, হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারুণ ভগ্নী, তোমার পিতা তো অসৎ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ছিল না ব্যভিচারিণী। –সূরা মারইয়াম : ২৭-২৮

অধিকাংশ আলেম আহলে কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈল কিছুদিন পর্যন্ত মারইয়াম (আ)-কে তাদের মাঝে না পেয়ে তারা তাঁর তালাশে বেরিয়ে পড়ে। তারা যখন মারইয়াম (আ)-এর কাছ থেকে অতিক্রম করছিল, তখন তারা সে স্থানটি আলোকিত দেখতে পেল। হঠাৎ হযরত মারইয়াম (আ) তার শিশু সন্তান ঈসা (আ)-কে কোলে নিয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন লোকেরা এ কথা বলেছিল যে, হে মারইয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মারইয়াম (আ) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার চল্লিশ দিন পরে তাঁর গোত্রের লোকদের কাছে (শিশু সন্তানকে নিয়ে) গিয়েছিলেন। এরপরে তারা ইসরাঈলী পিতা ও মাতার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিল, হে হারুনের বোন। এক বর্ণনা মতে এ হারুন সে যুগের এক বিখ্যাত সাধক ও ওলী। তার ইবাদত, তাকওয়া ও সাধানার দিক লক্ষ্য করে তাঁকে মারইয়াম (আ)–এর ভাই বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রহ)-ও এ কথা বলেছেন। অপর এক বর্ণনা মতে, হযরত মুসা (আ)-এর ভাই হযরত হারুন (আ)-এর সাথে মারইয়াম (আ)-এর ইবাদত, তাকওয়া ও পরহেযগারীর তুলনা করে তাঁকে তাঁর বোন বলা হয়েছে। এখানে মুহাম্মাদ ইবনে কাব কারযী (রহ) থেকে একটি ভুল বর্ণনা আছে। তিনি সম্পর্কের দিক দিয়ে মারইয়াম (আ)-কে হযরত মুসা (আ) ও হারুন (আ)-এর আপন বোন বলেছেন। এটি ভুল হওয়ার কারণ, মারইয়াম (আ) এবং এ দু'জনের মাঝে বহু যুগের ব্যবধান ছিল। যা স্বল্প জ্ঞানীদের কাছেও স্পষ্ট। সম্ভবত হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কাআব কারযী (রহ) এবি ভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন যে, তাওরাতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুসা ও হারুন (আ)–এর বোন মারইয়াম (ফিরআউনের কবল থেকে) হযরত মুসা (আ)-এর মুক্তি পাওয়ার দিন দফ বাজিয়েছিলেন। এতে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, এ মারইয়াম হচ্ছেন সেই মারইয়াম। অথচ এরা দুজন সম্পূর্ণ

ভিন্ন। মুহাম্মদ ইবনে কাবের মতানুযায়ী এরা দু'জন একই ব্যক্তি হওয়া কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফের বর্ণনার স্পষ্ট পরিপন্থী। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর এক ভাই ছিল। যার নামও ছিল হারুন। হযরত মারইয়াম (আ)-এর কাহিনীর কোথাও এরূপ কোনো বর্ণনা নেই যে, তাঁর কোনো ভাই ছিল না। মুসনাদে আহমদে হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, একবার আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নজরানে পাঠালেন। নাজরানবাসীরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এ সম্পর্কে ধারণা কি যে, তোমরা কুরআন মাজীদে– (হে হারুনের বোন!) পাঠ করে থাক। অথচ হারুন (আ) ও মুসা (আ), হযরত ঈসা (আ)-এর অনেক আগে আগমন করেছিলেন। সুতরাং কুরআনে এ কথাটা কিভাবে বর্ণনা করা হলো? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে এসে এ কথাটি বললে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে বলিনি যে, তারা তাদের পূর্ববর্তী নবী ও নেক লোকদের নামানুসারে তাদের নাম রেখে থাকে? এ হাদীসটি মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি কি তোমাকে এ খবর দেইনি যে, তারা তাদের নবী ও নেক লোকদের নামের সাথে তাদের নাম মিলিয়ে রাখে?

কাতাদাহ (রহ) প্রমুখ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা 'হারুন' নামটি বেশি বেশি করে রাখতো। একবার তাদের এক জানাযায় বহু লোক একত্রিত হলো। সেখানে 'হারুন' নামের লোক সংখ্যাই ছিল কয়েক হাজার। আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক অবগত।

মোটকথা, বনী ইসরাঈলের লোকেরা হযরত মারইয়াম (আ)-কে বলেছিল, হে হারুনের বোন! হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী হারুন নামক তাঁর এক ভাই মুত্তাকী ও পরহেযগার হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর দিকে লক্ষ্য করে তারা মারইয়াম (আ)-কে বলেছিল, হে ঐ (পুণ্যবান) ব্যক্তির বোন! তোমার পিতা ও মাতা তো তোমার মতো এমন অসৎ ও ব্যভিচারিণী ছিলেন না। অর্থাৎ তুমি বংশগত ও পারিবারিকদিক থেকে পবিত্র ও পরহেযগার ছিলে। তারপরও তুমি কিভাবে এ অপবাদের ভার নিজ মাথায় তুলে নিলে? এভাবে তারা মারইয়াম (আ)-এর উপর অপবাদ দিলো এবং তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা কথা রটিয়ে দিয়ে তাঁর পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রকে কলঙ্কিত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলো। ইবনে জারীর (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বনী ইসরাঈল হযরত যাকারিয়া (আ)-কে এ সম্পর্কে অভিযুক্ত করে তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দিয়ে, তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রিত হলো। যাকারিয়া (আ) তাদের থেকে পালিয়ে গেলে তারা তাঁর পিছনে ধাওয়া করে। সাথে সাথে একটি বৃক্ষ দু'ভাগ হয়ে তাঁকে নিজ বক্ষে আশ্রয় দিলো। অভিশপ্ত শয়তান যাকারিয়া (আ)-এর চাদরের এক কোণ ধরে ফেললে সে অংশটুকু বৃক্ষের বাইরে রয়ে গেল। পরবর্তী ঘটনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো মুনাফিক হযরত মারইয়াম (আ)-এর এ ঘটনায়, তাঁর মামাতো ভাই ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব নাজ্জারকে দোষারোপ করে তার সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেয়। এরূপ অবস্থায় মারইয়াম (আ) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। তাঁর কথাগুলো কাউকেই বুঝাতে পারলেন না। আর নির্জনে গিয়ে তিনি যে আশ্রয় নেবেন, সে পরিবেশও ছিল না। এ অবস্থায় হযরত মারইয়াম (আ)-এর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা আরো বেড়ে গেল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁকে এই অপবাদ থেকে মুক্ত করে, তাঁর পবিত্রতা সবার সামনে স্পষ্ট করে দেবেন। এ আত্মবিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল নিয়ে মারইয়াম (আ) শিশু সন্তান (ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে নিজ হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ মারইয়াম (আ) জাতির লোকদের ইঙ্গিতে বললেন, এ শিশু সন্তানের সাথে তোমরা কথা বলে। এ সন্তানই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবেন। তখন দুষ্ট লোকেরা বলল, আমরা তার সাথে কিরূপে কথা বলব, সে তো কোলের শিশু। অর্থাৎ হে মারইয়াম! আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য তুমি এ শিশুটির কথা কিভাবে বললে? যে শিশুটি এখনো দুধের শিশু, কোলে বসে দুধ পান করছে। যার কোনো বুঝ শক্তি এখনো হয়নি। কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং কোনো কিছুর মিমাংশা দেয়ার মতো জ্ঞান তাঁর মধ্যে এখনো সৃষ্টি হয়নি। তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা মশকারা করছ?

তবে তুমি কি আমাদের উত্তর এড়িয়ে থাকার জন্য এ শিশুর কথা বলছ, যাতে আমরা তোমার এ অযৌক্তিক ও হাস্যকর কথা শুনে তোমার থেকে চলে যাই? দুষ্ট লোকেদের এসব কথা বলার মধ্যে, ইত্যবসরে কয়েক দিনের দুধের শিশু হঠাৎ করে সবার সামনে বলে উঠলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, যত দিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে এবং তিনি আমাকে আরো আদেশ করেছেন মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তিনি (আল্লাহ) আমাকে উদ্ধত ও দুর্ভাগা করেননি। আমার প্রতি শান্তি (কল্যাণ) যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যেদিন মৃত্যুবরণ করব। আর যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে (হাশরের ময়দানে) উত্থিত হব। হযরত ঈসা (আ)-এর পবিত্র মুখ থেকে এটাই ছিল সর্বপ্রথম কথা যে, আমি আল্লাহর বান্দা।

কতিপয় দুষ্ট ও যালিম ঈসায়ীরা যে দাবি করেছিল 'ঈসা আল্লাহর পুত্র'। হযরত ঈসা (আ) নিজেই সর্বপ্রথম তাদের সেই মিথ্যা কথা ও দাবিকে বাতিল ও নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ঈসা' অর্থাৎ আমি আল্লাহর পুত্র নই। আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারপর হযরত ঈসা (আ) তাঁর মায়ের নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা এভাবে প্রকাশ করেন যে, আল্লাহ আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন। ব্যভিচারের মাধ্যমে যার জন্ম হয়, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কখনো এ পবিত্র কিতাব ও নবুওয়াত দান করে সম্মানিত করেন না। তিনি আরো বললেন, আমি যেখানেই থাকিনা কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। অর্থাৎ আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকব, সেখানে বসেই আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের কথা বলব ও সেদিকে লোকদের দাওয়াত দেব এবং স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত দোষত্রুটি থেকে তিনি (আল্লাহ) যে পবিত্র, তা আমি বর্ণনা করব। তিনি (আল্লাহ) আমাকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন আমি জীবিত থাকি। এখানে সালাত দ্বারা তাঁর ইবাদত বন্দেগীর অবস্থা প্রকাশ পায় এবং যাকাত দ্বারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। মোটকথা এখানে আল্লাহ তা'আলার হক এবং বান্দার হক সঠিকভাবে আদায় করার ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর তিনি বললেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন আমার মায়ের অনুগত থাকতে। তিনি আমাকে উদ্ধত ও দুর্ভাগা করেননি। কারণ, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর কোনো পিতা ছিল না। তাই তাঁর সমস্ত খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার মা। আর আমাকে উদ্ধত ও দুর্ভাগা করেননি এর অর্থ আল্লাহ আমাকে কর্কষভাষী ও কঠোর স্বভাবের করেননি। আর আল্লাহ তা'আলার আদেশে ও সন্তুষ্টির বিপরীত কোনো কাজ আমার দ্বারা হবে না ইনশাআল্লাহ। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় তিনটি। একটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়, একটি মৃত্যুর সময়। আরেকটি পুনরুত্থিত হওয়ার সময়। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আল্লাহ তা'আলার শান্তি ও রহমত আমার জন্য রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রহমত ও শান্তি সর্ব দার জন্য সর্বাবস্থায় আমার প্রতি ছিল ও থাকবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং মিথ্যা কথাগুলোকে রহিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

অর্থ : আল্লাহর কাছে ঈসার উপমা আদমের মতো। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হুকুম দিয়েছেন যে, হয়ে যাও, আর সে হয়ে গেল।[১] এটাই আসল সত্য, যা আপনার রবের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। সুতরাং যারা সন্দেহ করে, আপনি তাদের মধ্যে শামিল হবেন না। হে নবী! এ ইলম আসার পর এখন যে কেউ আপনার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে তাকে বলে দিন, এসো, আমরা ও তোমরা নিজেরাও আসি এবং নিজ নিজ বিবি-বাচ্চাদেরও নিয়ে আসি, তারপর আল্লাহর কাছে দোআ করি, যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ুক। এটা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। আর সকল সত্য এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ-ই ঐ সত্ত্বা, যার ক্ষমতা সবার উপর ও যার হিকমত দুনিয়ার বুকে চালু রয়েছে। তারপর যদি এরা (এ শর্তে মুকাবিলায় আসতে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তারাই ফাসাদকারী) আল্লাহ তো ফাসাদকারীদের অবস্থা জানেনই। –সূরা আলে ইমরান : ৫৯–৬৩

এ ঘটনায় নাজরান থেকে ষাট সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। যাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল চৌদ্দ জন। তাদের মধ্যে কথা বলার মতো ব্যক্তিত্ব ছিল তিন জন। যারা ছিল তাদের সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। তাদের নাম হলো, আকিব, সাইয়েদ এবং আবু হারিসা বিন আলকামা। তারা এসে হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর সম্পর্কে বাদানুবাদ করতে লাগল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে সূরা আল ইমরানের শুরুতে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। তাতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত এবং তাঁর পূর্বে তাঁর মায়ের জন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা ﷺ-কে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যদি তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ফিরে না আসে, তবে তাদের সাথে মুবাহালা তথা একে অপরকে বদদোয়া করবে। অতঃপর নাসারারা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে মুবাহালা থেকে বিরত থাকলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সন্ধি করতে রাজী হলো। তাদের সর্দার আকিব তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, হে নাসারাগণ! তোমরা ভাল করেই অবগত আছে যে, যখন কোনো কওমের লোকেরা তাদের নবীর উপর অভিশাপ দেয় অর্থাৎ নবীর সাথে মুবাহালা করে, তখন সে কওমের ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মুবাহালা করো, তবে নিশ্চিত জেনে রাখ! তোমরাই নিপতিত ও পরাজিত হয়ে যাবে। যদি তোমরা মুহাম্মাদ-এর দ্বীন (ইসলাম)-কে নিজেদের (খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি ভালবাসার কারণে একান্ত মেনে নিতে না-ই পার, তবে (মুবাহালা না করে) চুপ করে এখান থেকে সরে যাও।

সর্দার আকিবের কথা তারা মেনে নিল এবং দেশে ফিরে যাবার জন্য তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইল আর বলল, আমরা ইসলাম তো কবুল করলাম না, তবে কর (জিযিয়া) দিতে আমরা প্রস্তুত আছি। আপনি আমাদের সাথে কর আদায় করে আনার জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা)-কে পাঠালেন।

এ ঘটনাটি আমি সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়টি কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ) বলেছেন, এ-ই মারইয়াম তনয় ঈসা (এটাই সত্য কথা যে সম্পর্কে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করে। অর্থাৎ ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র নন; বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার এক বান্দীর পুত্র।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহর জন্য এটা শোভনীয় নয় অর্থাৎ আল্লাহ এমন নন যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি এসব কিছু থেকে পবিত্র। যখন তিনি কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু 'কুন' (হয়ে যাও) বলেন, সাথে সাথে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর কোনো কিছু করতে কারো মুখাপেক্ষী হতে হয়

১. অর্থাৎ শুধু 'বিনা পিতা' জন্ম হওয়াই যদি কারো পক্ষে আল্লাহর ছেলে হওয়ার জন্য বড় যুক্তি হয়ে থাকে তাহলে আদম (আ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা খ্রিস্টানদের পক্ষে আরো বেশি উচিত ছিল। কারণ, মাসীহ (আ)-এর জন্ম তো মাত্র বিনা বাপে হয়েছিল; কিন্তু আদম (আ) তো মা ও বাপ উভয় ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিলেন।

না। তার কাজে বা সিদ্ধান্তকে বাঁধা দেয়ার মতো ক্ষমতা কারও নেই। তিনি কুন (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সবকিছুই করতে পারেন। হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর কথা কুরআন মাজীদের সূরা মারইয়ামের শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু। সুতরাং তার ইবাদত করো, এটাই সঠিক সরল পথ।

হযরত ঈসা (আ)-এর মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় শৈশবকালের ঘটনা সূরা মারইয়ামের এ পর্যন্তই শেষ। তারপর আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন–

অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং আফসোস! কাফিরদের প্রতি, মহাদিবস আগমনকালে।

অর্থাৎ সে সময় এবং তার পরবর্তী যুগের লোকেরাও হযরত মাসীহ (আ) সম্পর্কে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইয়াহুদীরা বলে, ঈসা (আ)- এর সৃষ্টি (জন্ম) ব্যভিচারের মাধ্যমে, তিনি ব্যভিচারিণীর পুত্র (নাউজু বিল্লাহ)। তারা তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী আকীদার উপর অটল রইল।

কোনো কোনো খ্রিস্টান কুফরীতে আর একটু অগ্রসর হয়ে বলল যে, ঈসা নিজেই আল্লাহ। তাদের অন্য এক দল বলল, না, তিনি আল্লাহর পুত্র। আর মুমিনগণ বলল, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর এক বান্দীর পুত্র। তিনি (মানুষের জন্য) আল্লাহর (পক্ষ থেকে) নিদর্শন এবং তাঁর (পবিত্র) রূহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তিনি পিতাবিহীন কুদরতীভাবে সৃষ্টি হয়েছেন।

শেষোক্ত দলটিই মুক্তিপ্রাপ্ত। এরা সবাই সাওয়াবের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্যপ্রাপ্ত। যারাই হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে মতভেদ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সাবধান বাণী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফিরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক তার কোনো শরীক নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল ও তার নিদর্শন। তাকে আল্লাহ তা'আলা মারইয়াম (আ)-এর কোলে অর্পণ করেছেন। (এই সাক্ষ্যদাতাকে)– আল্লাহ অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সে যেমন আমলই করুক না কেন। ওলীদ অন্য এক সূত্রে এর সাথে একটু সংযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন যে, সে (এই সাক্ষ্যদাতা) তাঁর খুশিমতে জান্নাতের আটটি দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম মুসলিম (রহ)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ ও অপবাদকারীদের অপবাদ থেকে পবিত্র

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামে বলেন, তারা বলে দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এমন এক ভয়াবহ বিষয়ের অবতারণা করেছ, যাতে আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে ও পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিপতিত হবে। যেহেতু তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামতের দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। –সূরা মারইয়াম : ৮৮-৮৯

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য সন্তান গ্রহণ করা কোনোরূপেই শোভনীয় নয়। কারণ, তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এবং মালিক। সকল সৃষ্টিই তাঁর মুখাপেক্ষী। তারা তাঁর মহান দরবারে বিনয়ের সাথে কেবলই আত্মসমর্পণ করে থাকে। আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর অনুগত দাস। সকলের প্রতিপালক তিনি। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং কোনো প্রতিপালকও নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ۭ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۡ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۡ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰۗىِٕكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۭ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝

অর্থ : হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না[১] এবং আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কোনো কথা আরোপ করো না। নিশ্চয়ই মারইয়াম-পুত্র ঈসা মাসীহ (এছাড়া আর কিছু নয় তিনি)। আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ফরমান, যা আল্লাহ মারইয়ামের নিকট পাঠিয়েছিলেন।[২] আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রূহ[৩] (যা মারইয়ামের পেটে বাচ্চার আকারে পরিণত হয়) সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আন। এ কথা বলো না যে (আল্লাহ) তিনজন। তোমরা বিরত থাক। তোমাদের জন্য এটাই ভালো। আল্লাহ তো একই মাত্র মাবুদ। তাঁর কোনো পুত্র হওয়া থেকে তিনি পবিত্র।[৪] আসমান ও জমিনের সব জিনিস তাঁরই মালিকানায় রয়েছে। আর এসব দেখাশোনা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ঈসা মাসীহ আল্লাহর বান্দাহ হওয়াতে লজ্জার বিষয় মনে করেননি। নিকটবর্তী ফেরেশতারাও তা মনে করে না। যে আল্লাহর দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করে এবং অহঙ্কার করে এমন সবাইকে ঘেরাও করে আল্লাহ তার সামনে হাজির করবেন। তখন ঐসব লোক, যারা ঈমান এনে নেক আমল করেছে, তাদের পুরস্কার পুরোপুরিই তাদেরকে দেওয়া হবে এবং আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরো অতিরিক্ত দান করবেন। আর যারা দাসত্ব করতে লজ্জাবোধ করতো এবং অহঙ্কার করতো, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা অভিভাবক ও সাহায্যকারী মনে করেছিল, তাদের কাউকে সেখানে পাবে না। -সূরা নিসা : ১৭১-১৭৩

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনি তো (আল্লাহ) সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তাঁর সন্তান কিভাবে হতে পারে? সন্তান তো সমতুল্য দু'জনার মিলনে হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার কেউ সমতুল্য বা সমকক্ষ নেই। সুতরাং তাঁর কোনো স্ত্রীও নেই। অতএব তাঁর সন্তান হতে পারে না। যেমন সূরা ইখলাসে আল্লাহ তা'আলা বলেন, (হে নবী!) আপনি বলুন, আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, তাঁর সমকক্ষ কেউ-ই নেই।

সূরা আনআমে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يُّؤْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ
وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۞

অর্থ : তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি নাযিল করেছেন। তারপর এর মাধ্যমে আমি সবরকম চারা জন্মায়েছি এবং তা থেকে সবুজ ক্ষেত-খামার ও গাছপালা সৃষ্টি করেছি। তারপর তা থেকে আমি থোকা থোকা শস্যদানা বের করেছি এবং খেজুর গাছের মাথি (শীষ) থেকে গোছায় গোছায় ফল পয়দা করেছি, যা ভারের চাপে ঝুঁকে পড়ে। আর আঙুর, যয়তুন ও বেদানার বাগান সাজিয়েছি, যার ফল একটার সাথে আর একটার মিল রয়েছে অথচ এক একটির গুণ আলাদা আলাদা। এসব গাছে যখন ফল ধরে এবং যখন পাকে তখন তোমরা এর অবস্থা (মনযোগ দিয়ে) দেখ। যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এসবের মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। এ সত্ত্বেও লোকেরা জিনকে আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে।[১] অথচ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা না জেনে না বুঝে তাঁর জন্য ছেলে ও মেয়ে বানিয়ে নিয়েছে। এরা যা কিছু (আল্লাহর উপর) আরোপ করে তা থেকে তিনি পবিত্র ও মহান। তিনিই আসমান ও জমিনের আদি স্রষ্টা। তার কোনো সন্তান কেমন করে হতে পারে? অথচ তাঁর কোনো বিবিই নেই। তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে তিনি ইলম রাখেন। তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। সব জিনিসের তিনিই স্রষ্টা। তাই তোমরা তাঁরই দাসত্ব করো। আর তিনিই প্রতিটি জিনিসের উপর দায়িত্বশীল। -সূরা আনআ'ম : ৯৯-১০২

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব ও তাদের অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পরিহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের উচিত, হযরত মাসীহ (আ) সম্পর্কে এ বিশ্বাস রাখা যে, তিনি শুধু আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর পবিত্রা ও নেক বান্দী মারইয়াম (আ)-এর পুত্র। যিনি (মারইয়াম) তাঁর লজ্জা স্থানকে হেফাযত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মারইয়াম (আ) গর্ভবতী হন এবং তাঁর থেকে হযরত ঈসা (আ) জন্মলাভ করেন।

তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রূহ। এ রূহকে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যেরূপ করা হয়েছে, বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর), নাকাতুল্লাহ (আল্লাহর উষ্ট্রী) ও আব্দুল্লাহ (আল্লাহর দাস)-কে। যেহেতু এসব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। আর এ সৃষ্টিকে স্রষ্টার দিকে নিসবত (সম্পর্কিত) করা হলে, এতে শুধু সেই সৃষ্টির মর্যাদা ও সম্মানই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এতে সৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টিগত দিক দিয়ে পার্থক্য ঘটে না। এ নিসবত দ্বারা তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত সৃষ্টিজীব হতে পারেন। এছাড়া সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আলাদা তাঁর আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-কেও শ্রেষ্ঠত্বে ও মর্যাদার দিক দিয়ে 'রূহুল্লাহ' (আল্লাহর রূহ) বলা হয়েছে। যেহেতু তাঁর পিতা ছিল না, এজন্য তাঁকে মারইয়াম তনয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপেই তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহর বাণী)-ও বলা হয়েছে। কারণ, তিনি পিতা ছাড়া আল্লাহর হুকুমে জন্ম লাভ করেছেন।

---

১. *অর্থাৎ নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা ও অনুমানে এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের পরিচালনায় ও মানুষের ভাগ্য রচনায় আল্লাহর সাথে অন্য কতক গোপন সত্তা শরীক আছে, কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেউ বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধন-দৌলতের দেবী, কেউ রোগ-ব্যাধির দেবী। আত্মা, শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবী সম্পর্কে এসব ধরনের মিথ্যা ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার মুশরিক জাতিগুলোর মধ্যে সবকালেই পাওয়া যায়।*

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সাদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর তাকে বলেছিলেন, 'হও' ফলে সে হয়ে গেল। –সূরা আলে ইমরান : ৫৯

সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন– ইয়াহুদীরা বলে, উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল, তারা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছে? –আয়াত : ৩০

ইয়াহুদ, নাসারা উভয় দলের প্রতিই আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন। তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছে এবং তাদের ভ্রান্ত ধারণা যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করেছেন (নাউজু বিল্লাহ)। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু থেকে পবিত্র। কাফিরেরা যা কিছু প্রচার করে তার স্বপক্ষে তাদের কাছে কোনই দলীল নেই। এগুলো শুধুমাত্র তাদের মনগড়া বানোয়াট কথা ও তাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুকরণ। অনুরূপভাবে কতিপয় ভ্রান্ত দার্শনিক যাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত রয়েছে, তাদের ধারণা যে, প্রথম আকল (জ্ঞান) আল্লাহ অবিনশ্বর সত্তা থেকে নির্গত হয়। যাকে প্রথম ভূমিকা স্তর বলা হয়। সেই প্রথম আকল থেকে দ্বিতীয় আকল (জ্ঞান ও নফস (আত্মা) ও আকাশ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় থেকে তৃতীয়, তৃতীয় থেকে চতুর্থ এভাবে আকলসমূহ দশটিতে গিয়ে পৌছে। নফস (আত্মা)-সমূহও নয়টিতে গিয়ে পৌছে। আকাশও নয়টিতে গিয়ে পৌছেছে। এ ব্যাপারে তারা (দার্শনিকগণ) মূর্খতার চরমে গিয়ে পৌছে, এরূপে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক দলীলসমূহ পেশ করে।

অনুরূপভাবে আরবের মূর্খ মুশরিকরা মনে করতো যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস, সম্মানিত ও নেতৃস্থানীয় জিনদের সাথে আল্লাহর বিবাহ হয়। যার থেকে ফেরেশতার জন্ম। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এ অপবাদকারীদের অপবাদ থেকে পবিত্র এবং আল্লাহ শিরক থেকেও পবিত্র।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী সাব্যস্ত করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। –সূরা যুখরুফ : ১৯

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– ইউনুসও ছিল রাসূলগণের একজন। (হে নবী!) স্মরণ করুন, যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌকায় পৌছল, অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাজিত হলো। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজকে ভর্ৎসনা দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো, তাহলে তাকে উত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো তার উদরে। তারপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ ওঠালাম। তাকে আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। এখন তাদেরকে (মক্কার কাফেরদেরকে) জিজ্ঞেস করুন, "তোমাদের প্রভুর জন্যই কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান? অথবা আমি কি ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম, আর তারা (তা) প্রত্যক্ষ করছিল? দেখ তারা এ বানোয়াট কথা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সুতানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেমন বিচার করো? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব উপস্থিত করো। তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কে (জিন ও আল্লাহর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) স্থির করেছে। অথচ জিনেরা জানে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য। তারা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।

–সূরা সাফফাত : ১৩৯-১৬০

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۞ لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ۞ وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّيْۤ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ۞

তারা বলে, 'দয়াময়' আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান। তারা তো (যাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলা হতো) তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই ইলাহ তিনি ব্যতীত, তাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। –সূরা আম্বিয়া : ২৬-২৯

সূরা কাহ্যফে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۞ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۞ وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۞ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۞

অর্থ : সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর বান্দাহর উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি। এ কিতাব সঠিক কথা ঠিক ঠিকভাবে বলে, যাতে সে মানুষকে আল্লাহর কঠিন আযাব থেকে সাবধান করে দেয় এবং যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে সুখবর দেয় যে, তাদের জন্য ভালো বদলা রয়েছে। তারা সেখানে চিরদিনের বাসিন্দা। আর যারা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে হিসেবে কবুল করেছেন, তাদেরকেও (এ কিতাব) ভয় দেখায়। এ বিষয়ে তাদের কোনো ইলম নেই এবং তাদের বাপ-দাদাদেরও ছিল না। বড়ো সাংঘাতিক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। তারা শুধু মিথ্যাই বলছে। –সূরা কাহাফ : ১-৫

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِيُّ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ۞ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۞

অর্থ : লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে ছেলে বানিয়ে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে এ সবকিছুরই তিনি মালিক। তোমাদের কাছে এ কথার কী দলিল আছে? তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলছ, যা তোমাদের জানা নেই? বলে দিন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ

করে তারা কখনো সফল হতে পারে না। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের মজা ভোগ করে নিক। এরপর আমারই কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারপর কুফরীর বদলায় তাদেরকে কঠোর আযাবের মজা ভোগ করাব।
-সূরা ইউনুস : ৬৮-৭০

উল্লিখিত মক্কী আয়াতসমূহে মাধ্যমে সকল কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা এবং তাঁদের দার্শনিক ও পন্ডিতদের সকল মিথ্যা কথাগুলো খণ্ডন করে, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আর এসব বাতিলপন্থীদের মাঝে থাকে পারস্পরিক দন্দ্ব ও মতভেদ। কারণ, বাতিলপন্থীরা ও কাফিরেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থাকে। তারা কোনো ব্যাপারেই একমত হতে পারে না, সত্য ব্যতীত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- এ (সত্য) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো, তবে তাতে তারা অনেক অসংগতি পেত। -সূরা নিসা : ৮২

এখন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সত্য বিষয়ে কখনো মতভেদ ও মতান্তর সৃষ্টি হয় না। আর বাতিল বিষয়ের মধ্যে মতভেদ ও মতান্তর সৃষ্টি হয়। যেমন এক ভ্রান্ত দল বলে থাকে, মাসীহই হলেন আল্লাহ। আর এক দল বলে থাকে মাসীহ আল্লাহর পুত্র। তৃতীয় একটি দল বলে থাকে, মাসীহ তিন খোদার একজন। আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদায় বর্ণনা করেন—

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অর্থ : হে রাসূল! আপনি বলুন, আল্লাহ মারইয়াম তনয় মাসীহ, তার মাতা এবং দুনিয়ার সবাইকে যদি ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাকে বাঁধা দেয়ার শক্তি কার আছে? আসমান ও জমিনের এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সববিষয়ে সর্ব শক্তিমান।
-সূরা মায়িদা : ১৭

এরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা খ্রিষ্টানদের কুফরী ও গোমরাহীকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান। তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক মালিক।

সূরা মায়িদার শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন- যারা বলে মারইয়াম তনয় মাসীহ (ঈসা)-ই আল্লাহ, তারা তো নিশ্চয়ই কুফরী করেছে। অথচ মাসীহ বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করো। যিনি আমারও প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। (জেনে রেখ!) যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তার উপর জান্নাত নিষিদ্ধ করে দেবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোনই সাহায্যকারী নেই। তারা কুফরী করছেই, যারা বলে যে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। যদি তারা এসব বানোয়াট কথা থেকে বিরত না থাকে, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবেই। তারা কেন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না? কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

মারইয়াম তনয় মাসীহ তো শুধু আল্লাহরই রাসূল। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাঁর মাতা মারইয়াম সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাঁরা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করতো। দেখ! আমি তাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি। এরপরও দেখ, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়। (সূরা মায়িদা : ৭২-৭৫) আল্লাহ তা'আলা খৃষ্টানদের কুফর ও শিরক প্রসঙ্গে বলছেন যে, বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, হযরত মাসীহকে (তারা) আল্লাহর সাথে শরীক করছে। অথচ মাসীহ (আ) নিজে বলছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। মাতৃগর্ভে তাঁকে অবয়ব দান করা হয়েছে। তিনি আল্লাহর ইবাদতকারী এবং তাঁর একত্ববাদের ঘোষণাকারী। তিনি আল্লাহর একত্ববাদে

অবিশ্বাসী মুশরিকদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। পরকালের স্থায়ী জীবনে তাদের দুর্ভোগের কথা জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে, অবশ্যই আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। অবাধ্যদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই। তারপর হযরত মাসীহ বলেছেন, যারা বলে আল্লাহ তিন খোদার তৃতীয়জন, সে কাফির। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

ইবনে জারীর (রহ) প্রমুখ বলেছেন, তিনের তৃতীয়জন এর অর্থ হচ্ছে; খ্রিস্টানরা আল্লাহকে তিন সত্তায় ভাগ করেছে। যাকে ত্রিত্ববাদ বলা হয়। পিতা, পুত্র এবং নিদর্শন। অর্থাৎ পিতার পক্ষ থেকে পুত্রের নিদর্শন। এ বিষয়টি আমি পরে আলোচনা করব। এ মতপার্থক্য তাদের মাঝে রাজা কিসতাতীন ইবনে কুসতুসের যুগ থেকেই চলে আসছিল। আর এটা শুরু হয়েছে হযরত মাসীহ (আ)-এর তিন'শ বছর পরে। আল্লাহ তা'আলা এ মুশরিকদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, 'তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না থাকে, তবে সে মুশরিকদেরকে ধমকিয়ে বলেছেন, 'তারা যা বলে তা থেকে যদি বিরত না থাকে, তবে সে কাফিরদের উপর নিপতিত হবে মর্মন্তুদ শাস্তি। অতএব তারা কেন আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে না। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। এরপর আল্লাহ তা'আলা মাসীহ (আ) ও তার মায়ের মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'তারা উভয়েই আহার করেন।' অর্থাৎ যিনি মাবুদ হন, তার কিভাবে পানাহারের প্রয়োজন হতে পারে? আল্লাহ তাদের ভ্রান্ত আকীদা (বিশ্বাস) থেকে পবিত্র।

আল্লামা সুদ্দী (রহ) বলেছেন, আল্লাহর বাণী 'যারা বলেছে, আল্লাহ তিনের তৃতীয়জন'। তারা কুফরী করছে। এর অর্থ, খ্রিস্টানগণ, ঈসা ও তাঁর মাতা সম্পর্কে মনে করে থাকে যে, তারা দু'জনই খোদা। এভাবে খ্রিস্টানদের এ কুফরী মতবাদকে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার শেষে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যখন বলবেন–(এসব নিয়ামতের কথা মনে করানোর পরে হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ বানাও এর উত্তরে ঈসা বলবে, সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোনো অধিকার আমার নেই, সে কথা বলা আমার কাজ ছিল না। যদি এরূপ কথা আমি বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা তো আপনি জানেন। কিন্তু আপনার অন্তরে যা কিছু আছে, তা তো আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি সব গায়েবী ইলম সম্পর্কে অবগত। আপনি আমাকে যা কিছু আদেশ করেছেন, তা ছাড়া তাদেরকে আমি আর কিছুই বলিনি। (আর তা এই যে) ঐ আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম, তত সময়ের জন্য তাদের উপর আমি সাক্ষী ছিলাম। যখন আমাকে আপনি তুলে নিলেন, অতঃপর আপনিই তাদের তদারককারী ছিলেন। আপনি তো সব জিনিসের উপরই সাক্ষী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহলে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে মাফ করে দেন, তাহলে আপনি তো শক্তিমান ও পরম জ্ঞান-বুদ্ধির মালিক। –সূরা মায়িদা : ১১৬-১১৮

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)–এর কাছে এ প্রশ্ন করবেন, তাঁর সামনে কাফিরদের কুফরীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে ভর্ৎসনা ও ধিক্কার দেয়ার জন্য। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরী সম্পর্কে পূর্ব অবহিত। হযরত ঈসা (আ) বলেছিলেন, যতদিন আমি তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলাম, ততদিন আমি আপনার নির্দেশে তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আর যখন আপনি আমাকে আপনার কাছে তুলে নিয়েছেন, তারপর আপনিই ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধায়ক। এখন আপনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন বা ক্ষমা করবেন, সেটা আপনার ইচ্ছাধীন।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আমি বর্ণনা করেছি যে, হযরত আবু যার (রা) বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত নামাযে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে কাটিয়ে দিয়েছেন। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি মহাপরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য শাফাআতের আবেদন করেছি। তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। তবে এ শাফাআত (শুধু) সে সব লোকেরা পাবে, যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুরই শরীক করেনি।

তারপর তিনি ﷺ নিম্নের আয়াত শরীফ পাঠ করেন। অনুবাদ, (হে নবী! স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ বলেন, হে ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার জননীকে মাবুদ নির্ধারণ করো। সে বলবে, আপনি পবিত্র। এমন কথা বলা কি আমার জন্য শোভনীয়, যা বলার অধিকার আমার নেই? যদি আমি তা বলতাম, তবে তা অবশ্যই আপনি জানতেন। (কারণ) আমার অন্তরের কথা আপনি জানেন। আর আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনি যা আমাকে আদেশ করেছেন, তা ছাড়া আমি তাদের কাছে আর কিছুই বলিনি। যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের (অবস্থা সম্পর্কে) খবর রেখেছি। যখন আপনি আমাকে তুলে নিয়েছেন। তখন আপনিই ছিলেন তাদের অভিভাবক। আপনি সর্ববিষয়ের সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। -সূরা মায়িদা : ১১৬-১১৮

অতঃপর রসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী পাঠ করেন- আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মাঝে যা কিছু (সৃষ্টি) রয়েছে, আমি এসব অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম, তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই তা করতাম; আমি তা করিনি। কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে তা মিথ্যা অপসারিত হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই; তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে (ফেরেশতা) তারা অহঙ্কার বশে তাঁর ইবাদত করা হতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিনরাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তারা অলসতা করে না। -সূরা আম্বিয়া : ১৬-২০

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যদি পুত্র সন্তান চাইতেন-ই তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা তাঁকে মনোনীত করে নিতেন।

তিনি পবিত্র ও মহান। তিনি আল্লাহ, এক, প্রবল পরাক্রমশালী। তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাতকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। জেনে রেখো! তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। -সূরা যুমার : ৪-৫

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন- বলুন, করুনাময় আল্লাহর কোনো সন্তান থাকলে, আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। তারা যা বলে তা হতে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী পবিত্র মহান। -সূরা যুখরুফ : ৮১-৮২

(হে নবী) আপনি বলুন, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তার অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সর্বপ্রথমে তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করুন। -সূরা ইসরা : ১১১

(হে নবী!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সমস্ত সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং কেউ-ই তাঁর সমতুল্য নেই।
-সূরা ইখলাস

সহীহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমাকে আদম সন্তানরা গালি দেয়। কিন্তু তাদের জন্য এটা উচিত নয় যে, তারা মনে করে আমার সন্তান আছে। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দেইনি এবং আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আমার সমতুল্য (সমকক্ষ) আর কেউ নেই।

সহীহ হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কষ্টদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তা'আলার চাইতে অধিক ধৈর্যশীল আর কেউ নেই। (দেখ) কাফিররা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করে। তারপরও আল্লাহ তাদেরকে রিযিক দান করেন এবং তাদেরকে (ইহকালে) নিরাপদে ও সুখ শান্তিতে রাখেন।

সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আরো বর্ণিত আছে। তিনি ﷺ বলেন, আল্লাহ যালিম (পাপী)-দেরকে অবকাশ দেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর থেকে আর তারা রেহাই পায় না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করেন– এরূপ আপনার পভুর শাস্তি। তিনি শাস্তি প্রদান করেন জনপদসমূহকে, যখন তারা জুলুম করে থাকে। নিশ্চয়ই তাঁর শাস্তি অতি কঠিন। –সূরা হুদ : ১০২

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন,– আমি সুযোগ দিয়েছি কত জনপদকে যখন ওরা ছিল যালিম, অতঃপর ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। –সূরা হাজ্ব : ৪৮

আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর ওদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। –সূরা লোকমান : ২৪

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন– (হে নবী!) বলুন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে, তারা সফলকাম হবে না। পৃথিবীতে তাদের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ; পরে আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর কুফরী হেতু ওদেরকে আমি কঠিন শাস্তির আস্বাদন করাব। –সূরা ইউনুস : ৬৯-৭০

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন– অতএব কাফেরদেরকে সুযোগ দাও; তাদেরকে সুযোগ দাও কিছু কালের জন্য। –সূরা তারিক : ১৭

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান, শৈশবকাল ও ওহীর সূচনা

প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছে 'বায়তুল লাহাম' নামক স্থানে। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ)-এর মতে তিনি মিশরে জন্মগ্রহণ করেছেন। হযরত মারইয়াম (আ) মিশরে সফর করেছিলেন। এ সময় তাঁর সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব আন নাজ্জার। হযরত মারইয়াম (আ) ও ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব যেই গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করে ছিলেন, সে গাধার পিঠের গদি ছাড়া তাদের মাঝে আর কোনো বস্তু আড়াল দেয়ার মতো ছিল না। তবে ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ)-এর এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। পূর্বে বর্ণিত এক হাদীসের আলোকে এ কথাটি স্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম বায়তুল লাহামে হয়েছে।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) বলেছেন, যেদিন হযরত ঈসা (আ) ভূমিষ্ঠ হন, সেদিন পূর্ব ও পশ্চিমের সকল মূর্তিগুলো মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। শয়তান খুব অস্থির ও চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ইবলীস তার শয়তানদেরকে এর প্রকৃতকারণ সম্পর্কে অবগত করেছিল যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শুভ জন্মের কারণে এরূপ অবস্থা হয়েছে। অতঃপর শয়তান দেখতে পেল যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁর মায়ের কোলে আছেন এবং ফেরেশতাগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছেন। সে (জন্মের) দিন আকাশে একটি বড় তারাও দেখা গিয়েছিল। পারস্যের বাদশাহ সেই বড় তারকাটি দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিল। সে (বাদশাহ) গণকদের কাছে এ তারকাটি উদিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিল। তারা উত্তর দিলো যে, সম্ভবত পৃথিবীতে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তারপর বাদশাহ তাঁর দূতদেরকে স্বর্ণ ও মূল্যবান উপহার নিয়ে নবজাতক হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করে। এ প্রতিনিধি দল সিরিয়ায় পৌঁছে সেখানকার বাদশাহর কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বাদশাহ তাদেরকে সঠিক তথ্য দিলো যে, 'ঈসা নামক একটি শিশু এক নেককার সতী মহিলার গর্ভে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। সে (নবজাতক) মায়ের কোলে বসে কথা বলছে। অতঃপর সিরিয়ার বাদশাহ তাঁর লোকদের দ্বারা দূতদেরকে তাদের উপঢৌকন সামগ্রীসহ হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিলো। যাতে তার লোক পরে হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করে। অর্থাৎ সিরিয়ার বাদশাহর উদ্দেশ্য ছিল, দূতগণ যখন তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসবে, তখন তার প্রেরিত লোক ঈসা (আ)-কে হত্যা করবে। যখন এ দূতগণ উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে হযরত মারইয়াম (আ)-এর কাছে পৌঁছলেন

এবং সেগুলো তাঁর কাছে দিয়ে তার থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, তখন জনৈক লোকের কাছে মারইয়াম (আ) শুনতে পেলেন যে, সিরিয়ার বাদশাহর প্রেরিত লোকেরা তাঁর সন্তান (ঈসা [আ])-কে হত্যা করবে। এ খবর জানতে পেরে হযরত মারইয়াম (আ) শিশু সন্তান সাথে নিয়ে সেখান থেকে মিশরে চলে যান এবং সেখানে অবস্থান করেন। হযরত ঈসা (আ)-এর বয়স যখন বার বছর হলো, তখনই তাঁর থেকে মুজিযা (অলৌকিক ঘটনা) প্রকাশ পেতে শুরু করলো। তাঁর এ মুজিযার খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। মিশর যার বাড়ীতে হযরত মারইয়াম (আ) ও তাঁর সন্তান অবস্থান করছিলেন, সেই বাড়ীর মালিকের কিছু মাল হাড়িয়ে গেল। তার বাড়ীতে গরীব, অসহায়, ভিক্ষুক ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা অবস্থান করতো। তিনি (বাড়ীর মালিক) এসব লোকদের প্রতিপালন ও সেবা শুশ্রূষা করতেন। সবাই চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়ল যে, এ মাল কে চুরি করলো? কাকে এ সম্পর্কে দায়ী করা যায়। অবশেষে হযরত ঈসা (আ) সেখানে অবস্থানরত একজন পঙ্গু ও অন্ধ ব্যক্তির কাছে গিয়ে অন্ধকে বললেন, তুমি পঙ্গু ব্যক্তিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দাও। সে (অন্ধ) লোকটি বলল, তাকে দাঁড় করানোর শক্তি আমার নেই। ঈসা (আ) বললেন, যখন তুমি বাড়ীর মালিকের মাল চুরি করেছিলে, তখন কিভাবে তাকে উঠিয়েছিলে? আর কিভাবে মালিকের ঘরের আলমারি থেকে মাল বের করেছিলে? এ কথা শুনে তারা দু'জনে (পঙ্গু ও অন্ধ) ভীত পড়ে পড়ল এবং মাল এনে হাজির করল। এ ঘটনায় সবার কাছে হযরত ঈসা (আ)-এর মর্যাদা ও সম্মান আরো বৃদ্ধি পেল।

আরো একদিনের ঘটনা, একদা বাড়ীর মালিক তার এক ভোজ অনুষ্ঠানে লোকদেরকে দাওয়াত দিল। পানাহারের শেষে সে সময়ের নিয়ম অনুযায়ী সবার সামনে শরাব পরিবেশন করার জন্য শরাবের পাত্র খোলা হলো। কিন্তু দেখা গেল কোনো পাত্রে শরাব নেই। সকল পত্রই খালি। বাড়ীর মালিক লজ্জিত ও পেরেশান হয়ে পড়ল। হযরত ঈসা (আ) এ খবর পেয়ে সে মজলিসে হাজির হলেন এবং প্রতিটি শূন্য পাত্রের মুখ ও হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন। সাথে সাথে প্রতিটি পাত্র বিশুদ্ধ শরাবে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ ঘটনায় অসংখ্য লোক হযরত ঈসা (আ) ও মারইয়াম (আ)-এর একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী হয়ে গেল। লোকেরা বহু মূল্যবান উপহার হযরত মারইয়াম ও ঈসা (আ) সামনে পেশ করল। কিন্তু তাঁরা তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ) তাঁর কলিজার টুকরাকে নিয়ে দ্বিতীয়বার বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে চলে গেলেন।

ইসহাক ইবনে বাশার (রহ) বলেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) প্রথম ব্যক্তি, যার শিশুকালে যবান খুলে গেছে এবং শিশু অবস্থায়-ই কথা বলেছেন। তিনি আল্লাহর এমন সব প্রশংসা করেছেন, যেরূপ প্রশংসা ইতোপূর্বে কখনো শোনা যায়নি। এ প্রশংসায় তিনি চাঁদ, সূর্য, পর্বত, নদী কোনো কিছুকেই বাদ দেননি। সমস্ত কিছুকেই আল্লাহর প্রশংসায় শামিল করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন থেকেও বান্দার অতি নিকটে। আর বান্দার অতি নিকটে থেকেও অতি উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আপনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের বাদশাহ (রাজাধিরাজ)। আপনি আপনার কালেমা (নির্দেশ) দ্বারা শূন্যের উপর সাতটি আকাশ লটকিয়ে রেখেছেন। এগুলো প্রথমে ধোঁয়ারূপে ছিল। অতঃপর আপনার নির্দেশে এ রূপ ধারণ করেছে। এসব আকাশে আপনার ফেরেশতারা আছে। যারা সর্বদা আপনার তাসবীহ পাঠে মগ্ন। এতে আপনি অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দিনকে সূর্যের দ্বারা আলোকিত করেছেন। আকাশে বজ্রধ্বনির ব্যবস্থা করেছেন। যা আপনার তাসবীহ পাঠ করে থাকে। আপনার সম্মানের কারণে অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলো এসে গোটা সৃষ্টিকে আলোকিত করে তোলে। আপনি আকাশে এমন আলোর ব্যবস্থা করেছেন, যাতে পথহারা পথিক পথের সন্ধান পেতে থাকে। হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনি আপনার কুদরতে এই উচ্ছলিত ও উত্তলিত সমুদ্রের পানির উপরে জমিনকে একেবারে বিছিয়ে দিয়েছেন। জমিনকে করে দিয়েছেন একেবারে অনুগত। আপনার আনুগত্যতায় যমীন হয়ে গেছে সম্পূর্ণরূপে পরম ও সহনশীল। আপনার নির্দেশে ও সম্মানে উত্তাল তরঙ্গ মাথা নত করেছে। আপনি সমুদ্রের পরে নদী, নদীর পরে ছোট ছোট ঝর্ণা, এরপর ছোট ছোট নালা সৃষ্টি করেছেন। আপনি জমিনে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষ এবং ফুল গাছ ও তরুলতা উৎপন্ন করেছেন। তারপর

যমীনে আপনি বৃহৎ পাহাড় তৈরি করেছেন। যমীনের তলদেশ পর্যন্ত পানির নালা সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত কিছুই আপনার অনুগত হয়ে আপনার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করছে।

হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র ও বরকতময় মহান সত্তা। কে আছে এমন যে আপনার নেয়ামতসমূহের বর্ণনা করে আপনার প্রশংসা করতে পারবে? আর কে আপনার যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করতে পারবে? আপনি মেঘমালাকে ছড়িয়ে দেন। আকাশকে মেঘ থেকে মুক্ত করেন। সঠিক মিমাংশা প্রদান করেন। আপনি উত্তম ফায়সালাকারী। আপনি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই। আপনি পবিত্র। আপনি আকাশসমূহকে লোকদের থেকে আড়ালে রেখেছেন। আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আপনাকে শুধু (প্রকৃত) জ্ঞানীরাই ভয় করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি এমন মাবুদ নয় যে, যাকে আমরা নিজেরা বানিয়ে নিয়েছি। আর আমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে আপনার কোনো সাহায্যকারী বা শরীক নেই। আপনার একত্ববাদ সম্পর্কে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি এক ও অমুখাপেক্ষী। আপনি কাউকে জন্ম দেননি, আপনাকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আপনার সমতুল্য ও সমকক্ষ আর কেউ নেই।

ইসহাক ইবনে বাশার (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) শিশুকালে মায়ের কোলে বসে (নির্দিষ্ট কিছু) কথাবার্তা বলেছিলেন। তারপর তাঁর কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কৈশোরে (অর্থাৎ যে বয়সে বালকেরা কথাবার্তা বলে থাকে) তিনি কথাবার্তা বলতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর যবান থেকে জ্ঞানগর্ভ ও হিকমতপূর্ণ কথা বের করে দিয়েছিলেন। অতঃপর ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা শুরু করে দেয়। এমনকি তারা (ইয়াহুদীরা) হযরত ঈসা (আ)-কে ব্যভিচারিণীর পুত্র বলতো। (নাউজুবিল্লাহ)

এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, (এবং তারা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিল) তাদের কুফরীর জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দেয়ার কারণে। হযরত মারইয়াম (আ) তাঁর পুত্র ঈসা (আ)-কে সাত বছরের সময় মকতবে (পাঠশালায়) পাঠান। ওস্তায যখনই তাঁকে কিছু শিখাতে চাইতেন এর পূর্বেই তিনি সে বিষয় তাঁকে বলে দিতেন। একবার ওস্তায তাঁকে 'আবজাদ' শিখালেন। হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন, এ বিষয়টি কি? ওস্তায বললেন, এ আবজাদ কি তা আমার জানা নেই। তখন ঈসা (আ) বললেন, নিজের যে বিষয় জানা নেই, সে বিষয় অন্যকে কিভাবে শিক্ষা দেবেন? ওস্তায বললেন, আচ্ছা তুমি আমাকে শিখিয়ে দাও। ঈসা (আ) বললেন, তবে আপনি আপনার আসন থেকে উঠুন। ওস্তায তার আসন থেকে উঠলেন এবং ঈসা (আ) সেখানে তাশরীফ নিয়ে বললেন, এখন আমার কাছে জিজ্ঞেস করুন? ওস্তায বললেন, আমাকে আবজাদ সম্পর্কে কিছু বলুন, এর অর্থ কি? হযরত ঈসা (আ) বললেন, 'আলিফ' দ্বারা الله ، الآء (আল্লাহর নেয়ামতসমূহ), 'বা' দ্বারা الله بهاء (আল্লাহর জ্যোতি), 'জীম' দ্বারা الله بهجة (আল্লাহর সৌন্দর্য)। এ জবাব শুনে ওস্তায আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ইনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'আবজাদ' এর ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হযরত ওসমান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি দীর্ঘ হাদীস দ্বারা প্রতিটি শব্দের উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু হাদীসটি মাওজু। বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

ইবনে লুহায়আ আব্দুল্লাহ ইবনে হুবায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) যখন বাল্যকালে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতেন, তখন বালকদের কাউকে ডেকে বলতেন, তোমার মা তোমার জন্য ঘরে কি খাবার রেখে দিয়েছে, তা আমি কি তোমাকে বলে দেব? সে বলত, বলে দিন। তখন বালক ঈসা (আ) বলতেন, তোমার মা এই এই জিনিস তৈরি করে ঘরে রেখে দিয়েছেন। সে (বালক) বাড়িতে এসে তার মায়ের কাছে বলত, তুমি যে খাবার তৈরি করে রেখেছ, তা আমাকে খেতে দাও। মা বলত, আমি কি খাবার তৈরি করে রেখেছি। পুত্র বলত, তুমি এই এই জিনিস তৈরি করে গোপনে রেখে দিয়েছ। মা পুত্রকে জিজ্ঞেস করল, তুমি এ খবর কোথায় পেলে? সে বলল,

আমাকে আমার খেলার সাথী ঈসা ইবনে মারইয়াম বলে দিয়েছেন। এরূপ অবস্থা দেখে লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! আমাদের ছেলেরা যদি ঈসা ইবনে মারইয়ামের (আ) সাথে থাকে, তবে তাঁর সংস্পর্শে ওরা নষ্ট হয়ে যাবে। অতঃপর লোকেরা তাদের ছেলেদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে আবদ্ধ করে রাখল। ঈসা (আ) একদিন বালকদের খোঁজে বের হলেন। তিনি একটি ঘরে তাঁদের হৈ চৈ আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? লোকেরা বলল, এখানে বানর ও শূকর আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ঈসা (আ) একথা শুনে বললেন, হে আল্লাহ! এটাই করে দিন। পরে সেই বালকগুলো বানর ও শূকরে পরিণত হয়ে গেল। ইবনে আসাকির এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে বাশার (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ঈসা (আ) বাল্যকালে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী অনেক অলৌকিক ঘটনা (মু'জিযা) দেখাতেন। তাঁর এ মু'জিযার সংবাদ ইয়াহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। হযরত ঈসা (আ)-ও বড় হয়ে গেলেন। বনী ইসরাঈল ঈসা (আ) সম্পর্কে মিথ্যা ও মনগড়া কথা উদ্ভাবন করতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলার আদেশে তাঁর মা মারইয়াম (আ) ঈসা (আ)-কে নিয়ে মিশরের উদ্দেশ্যেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি মারইয়াম তনয় এবং তাঁর মাকে করেছিলাম নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবনবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে। -সূরা মুমিনুন : ৫০

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু নিরাপদ জায়গাটি একদিকে উঁচু, অন্যদিকে সে উঁচু ভূমিতে থাকত প্রবাহিত ঝর্ণা। দুটি বিপরীত ধর্মী। এখানে কেউ কেউ বলেছেন, এ নিরাপদ জায়গা দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানকে বুঝানো হয়েছে। যা হলো রায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী খেজুর বাগান। যেমন কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে– "ফেরেশতা তার পায়ের দিক থেকে আহ্বান করে তাকে বলে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পদতলে তোমার প্রতিপালক একটি নহর (ঝর্ণা) সৃষ্টি করেছেন।
–সূরা মারইয়াম : ২৪

সুদ্দী (রহ) বলেছেন, এর দ্বারা ছোট নহর (ঝর্ণা) বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, সেটি ছিল দামেশকের একটি নহর। সম্ভবত দামেশকের নহরগুলোর সাথে তুলনা করা তাঁর উদ্দেশ্য। কারো মতে এ স্থানটি মিশরে ছিল। এটা ইসরাঈলী আলেমদের থেকে সংগৃহীত। ইসহাক ইবনে বাশার (রহ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আ) যখন তের বছর বয়সে উপনীত হন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মিশর ত্যাগ করে ঈলিয়ায় চলে যাও। তখন ঈসা (আ)-এর মায়ের খালাতো ভাই, তাঁদের দু'জনকে গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে ঈলিয়ায় পৌঁছি দেন। সেখানে বসে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ইঞ্জীল শরীফ অবতীর্ণ করেন এবং তাওরাত শিক্ষা দেন। আর তাঁকে মুজিযা প্রদান করেন। যেমন, মৃতকে জীবিত করা ও কুষ্ঠ রোগীকে রোগমুক্ত করা ইত্যাদি।

চার আসমানী কিতাব নাযিলের সময়কাল

আবু যুরআ দামেশকী (রহ) বর্ণনা করেছেন, তাওরাত মূসা (আ)-এর উপর ৬ রমযান নাযিল হয়। যাবুর তাওরাত নাযিলের চারশ' বিরাশি বছর পরে নাযিল হয়েছিল। হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর উপর ই ীল নাযিল হয়। ইঞ্জীল যাবুর নাযিলের এক হাজার পঞ্চাশ বছর পরে নাযিল হয়। আর কুরআন মাজীদ রাসূলুল্লাহ এর উপর নাযিল হয় ২৪ রমযান। কুরআন মাজীদের আয়াত– "রমযান মাস, এতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" –সূরা বাকারা : ১৮৫

এর ব্যাখ্যায় তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইঞ্জীল হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ১৮ রমযান নাযিল হয়। ইবনে জারীর (রহ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ঈসা (আ)এর উপর যখন ইঞ্জীল নাযিল হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। তিনি পৃথিবীতে ছিলেন তেত্রিশ বছর পর্যন্ত। এ তেত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা শীঘ্রই করা হবে; ইনশাআল্লাহ।

ইসহাক ইবনে বাশার (রহ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন, হে ঈসা! আমার দ্বীনের (প্রচার ও প্রসারের) ব্যাপারে প্রাণপন চেষ্টা করো এবং (মানসিকভাবে) দুর্বল হয়ে পড় না। আমার নিদর্শনগুলো শোন এবং তা মেনে চল। সে সতী ধর্মনিষ্ঠা ও কুমারী মহিলার পুত্র! তুমি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছ। তোমাকে আমি পৃথিবীর মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বানিয়েছি। তুমি আমারই ইবাদত করো এবং আমার উপরই ভরসা কর। তুমি আমার কিতাবকে শক্তভাবে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করো এবং সুরিয়ানী ভাষায় তার ব্যাখ্যা করো। যারাই তোমার সামনে আসে তাদেরকে সুন্দর করে বুঝিয়ে দাও যে, আমি (আল্লাহ) দাতা এবং সত্য। আমি (আল্লাহ) চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তাদেরকে আরো বলবে, তোমরা সবাই আরবের উম্মী নবীকে সত্য (নবী) বলে বিশ্বাস করবে। যিনি হবেন পায়ে জুতা পরিধানকারী ও হাতে লাঠি ব্যবহারকারী। তাঁর চক্ষু হবে খুব উজ্জ্বল ও কপাল হবে প্রশস্ত। যিনি হবেন উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী। তাঁর মাথার চুলগুলো হবে কোকড়ানো এবং দাঁড়ি হবে ঘন। তাঁর ভ্রুদ্বয় থাকবে মিলানো। তাঁর নাক হবে একটু লম্বা যা দেখতে অতিশয় সুন্দর। তাঁর দাঁতগুলো হবে খুব উজ্জ্বল ও তাঁর ঠোঁট সংলগ্ন (নিচে) থাকবে ছোট দাড়ি। তাঁর গর্দান থাকবে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল। মনে হবে যেন স্বর্ণ তাঁর ঘাড়ে জড়ানো হয়েছে। তাঁর বক্ষ থেকে নাভী পর্যন্ত কালো পশমের একটি রেখা থাকবে। মনে হবে যেন উজ্জ্বলময় স্বর্ণের একটি রেখা। এছাড়া তাঁর পবিত্র বক্ষে ও পেটে আর কোনো পশম থাকবে না। তাঁর হাত ও পায়ের তালুতে থাকবে গোস্ত। অর্থাৎ হাতের তালু ও পায়ের তালু ভরা থাকবে। তিনি কোনো দিক তাকালে পূর্ণ আপাদমস্তকসহ তাকাবেন। যখন তিনি পথ অতিক্রম করবেন, তখন মনে হবে যেন উপরদিক থেকে একটু ঝুঁকে নিচের দিকে নেমে আসছেন। তাঁর পবিত্র বক্ষ হবে প্রশস্ত। চেহারা মোবারক থেকে মনে হবে যেন মোতি ঝরছে। তাঁর ঘাম হতে মিশকের সুঘ্রাণ ছড়াবে। মোটকথা তাঁর মতো সুন্দর ও উজ্জ্বলময় চেহারার অধিকারী তাঁর পূর্বে কেউ ছিল না। আর তাঁর পরেও কেউ হবে না। তাঁর দেহের গঠন হবে অত্যন্ত সুন্দর ও লাবণ্যময়। তিনি অধিক নারীকে বিবাহ করবেন। তাঁর সন্তান-সন্ততি হবে কম। তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য জান্নাতে মূল্যবান ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত ঘর থাকবে। যেখানে থাকবে না কোনো প্রকার ক্লান্তি ও অশান্তি এবং থাকবে না সেখানে কোনো কোলাহল হৈচৈ।

হে ঈসা! তুমি হবে তাঁর (অর্থাৎ তাঁর দ্বীনের) শেষ যুগে যিম্মাদার। যেভাবে যাকারিয়া (আ) ছিল তোমার মায়ের যিম্মাদার। এ নবীর জন্য তাঁর উম্মত থেকে দু'জন শহীদ সন্তান হবে, যাদের মর্যাদা আমার কাছে সব মানুষের চাইতে অধিক হবে। কুরআন হবে তাঁর আসমানী কিতাব। তাঁর দ্বীনের নাম হবে ইসলাম। তাঁর প্রতি সালাম। তাঁর জন্য সুখবর, যে তাঁর সময়কাল পাবে এবং তাঁর মুখের বাণী শোনবে। হযরত ঈসা (আ) আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাঁর জন্য কি কি জিনিসের সুখবর রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা জানালেন, তাঁর জন্য এমন এক পবিত্র বৃক্ষের সুখবর রয়েছে, যে বৃক্ষটির শিকড় রিদওয়ান থেকে এবং তার পানি আসবে তাসনীম শরাব থেকে। এর স্নিগ্ধতা কর্পূরের চেয়েও প্রিয়। তার আস্বাদন আঙ্গিরের মতো। তার সুগন্ধি মিশকের চেয়েও অধিক। যে একবার সে পানি পান করবে, তার আর কোনোদিন পিপাসা লাগবে না। হযরত ঈসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আমাকেও তা থেকে পান করান। আল্লাহ তা'আলা জানালেন, সেই নবী তা থেকে পান না করা পর্যন্ত কোনো নবী তা পান করতে পারবে না। আর সেই নবীর উম্মত পান না করা পর্যন্ত তা থেকে কোনো নবীর উম্মত পান করতে পারবে না। হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নিব। ঈসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আপনি আমাকে কী কারণে আপনার কাছে উঠিয়ে নেবেন? আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় শেষ যুগে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেব। যাতে তুমি (শেষ) নবীর বিস্ময়কর নিদর্শনাবলী দেখতে পার। আর অভিশপ্ত দাজ্জালকে হত্যা করার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করতে পার। আমি তোমাকে পৃথিবীতে তাদের কাছে এক নামাযের ওয়াক্তের পরে পাঠাব। অতঃপর তুমি

তাদেরকে সেই নামায পড়াবে। অর্থাৎ তুমি তাদেরকে ইমামতি করার জন্য বলবে)। কারণ তারা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত এবং তাদের নবীর পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না।

হিশাম (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আ) আরয করলেন, হে প্রভু! আমাকে সেই রহমতপ্রাপ্ত উম্মত সম্পর্কে সংবাদ দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা হচ্ছে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মত। তারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় হবে নবীর সাদৃশ। তারা আমার অল্প নেয়ামতেই সন্তুষ্ট হবে। আর আমিও তাদের অল্প আমলে সন্তুষ্ট হব। এবং তাদেরকে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার কারণে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

হে ঈসা! জান্নাতবাসীদের মধ্যে তারাই সংখ্যায় অনেক বেশি হবে। কারণ, তাদের যবানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যত অধিক পরিমাণ জারি হবে, অনুরূপ আর কোনো উম্মতের যবানে জারি হয়নি। আর কোনো উম্মতের গর্দান সিজদায় এরূপ অবনত হয়নি যেরূপ আমার সিজদায় অবনত হবে এ উম্মতের গর্দান। ইবনে আসকির (রহ) এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ইবনে আসাকির (রহ) বলেন, ঈসা (আ)-এর কাছে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করেন, তোমার ধ্যান-খেয়ালে আমাকেই একমাত্র সাথী করে রাখ এবং পরকালের জন্য আমাকেই একমাত্র সম্বল (পুঁজি) মনে করে নাও। আর তুমি নফল ইবাদতের দ্বারা আমার সান্নিধ্য লাভ করো। আমি তোমাকে মহব্বত করব। আর একমাত্র আমার দিকেই নিবিষ্ট হও। (অর্থাৎ আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে মনে করো না)। বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করো। আল্লাহর কাজে সন্তুষ্ট থাক। প্রতিটি কাজ আমার সন্তুষ্টির জন্য করো। আমার আনুগত্যের মধ্যেই আমার সন্তুষ্টি রয়েছে। আমার অবাধ্যতা করো না। এর মধ্যে রয়েছে আমার অসন্তুষ্টি। আমার নৈকট্য লাভে এগিয়ে এসো। তোমার যবানকে আমার যিকির দ্বারা সতেজ রাখ। তবেই আমার মহব্বত (ভালবাসা) তোমার অন্তরে স্থান পাবে। (আল্লাহর ইবাদতে) রাত জাগরণ দ্বারা অলসতাকে দূর করো। জ্ঞানী হওয়াটাকে আবশ্যিক মনে করো। আমার (ইবাদতের) প্রতি আগ্রহী হও। আমার ভয়ে স্বীয় অন্তরকে মৃত্যুর প্রতি ন্যাস্ত করো। আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য রাত্র অতিবাহিত করো। তুমি আমার কাছে সেই দিনের তৃপ্তির জন্য স্বীয় অন্তরকে ক্ষুধার্ত রেখ (অর্থাৎ রোযা রেখ।) মঙ্গলের কাজে আত্মনিয়োগ করো। যেখানেই যাবে, মঙ্গলের কাজে নিয়োজিত থেক। মানুষের কাছে আমার বাণীগুলো পৌঁছিয়ে দাও। আমার বান্দাদের মধ্যে ন্যায় ইনসাফ কায়েম করো। তোমাকে অন্তরের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রদান করেছি। বিস্মৃতি রোগকে দূর করে দিয়েছি। চক্ষু থেকে গাফলতীর পর্দা সরিয়ে ফেলেছি। তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস চলা পর্যন্ত নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে চলো। (অর্থাৎ আমার আদেশের বাইরে চল না।)

হে ঈসা! যারা আমার প্রতি ঈমান আনবে, তারা আমাকে ভয় করবে। আর যারা আমার ভয়ে ভীত, তারা আমার পুরস্কারের আশা রাখে। অতএব আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি যে, এমন সব লোক আমার শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে, যারা নিজেরা পরিবর্তন হবে না এবং আমার নিয়ম-নীতিরও কোনোরূপ পরিবর্তন করবে না।

হে পবিত্র তাপসী কুমারীর পুত্র! এ পার্থিব জীবনে চোখের পানি ঝরাও, আর সেরূপ হও) যেরূপ কোনো লোক ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে, পার্থিব মোহ উপেক্ষা করে এবং দুনিয়ার মায়া-মহব্বত ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিজেকে বিলিন করে। মানুষের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। আর সালামের প্রচলন করবে। পৃথিবীর মানুষ যখন রাতের বেলা নিদ্রায় বিভোর থাকবে, তখন তুমি কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থার কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়ে জাগ্রত থাকবে। অর্থাৎ নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করবে। জেনে রেখো! কিয়ামতের দিন তোমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ তোমার কোনই কাজে আসবে না। বিলাসতা প্রিয় লোকেরা যখন হাসি-ঠাট্টা ও বিলাসিতায় ডুবে থাকে, তখন তুমি তোমার চক্ষুকে চিন্তার সুরমা দ্বারা মেখে রাখ। আর ধৈর্যধারণ করো এবং আল্লাহ তা'আলার সওয়াবের প্রতীক্ষায় থাক। ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আমার পক্ষ থেকে পুরস্কারের ওয়াদা রয়েছে। আর আমি যে ওয়াদা দিয়েছি, তা যদি তুমি লাভ করো, তবে তোমার জন্য রয়েছে সুসংবাদ। পৃথিবীর মায়া মহব্বত ত্যাগ করো। আল্লাহ তা'আলার কাছে কিয়ামতের দিন সওয়াবের আশা রেখ। দুনিয়াতে কোনো

বস্তুর স্বাদ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে যেও না। খুশি মনে পৃথিবীতে আমার বাণী পৌঁছাবে। দুনিয়ার অল্প জিনিসে সন্তুষ্ট থাক। তুমি তোমার এসব কিছুর বিনিময় আমার এখানে এসে (পরকালে) পাবে। দুনিয়াতে বসে পরকালের হিসাব কিতাবের কথা স্মরণ করে আমল করো। কারণ, পরকালে তোমাকে পার্থিব জীবনের আমল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে। পরকালে আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য যেসব পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছি, তা যদি তুমি দেখতে, তবে তোমার অন্তর আনন্দে অভিভূত হয়ে যেত এবং খুশিতে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যেত।

আবু দাউদ (রহ) তাঁর 'কিতাবুত তাকদীরে' বর্ণনা করেছেন, ইবনে তাউস (রহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর সাথে একবার ইবলীসের সাক্ষাৎ হয়। হযরত ঈসা (আ) ইবলীসকে বললেন, তুমি কি জান না যে, তোমার তাকদীরে যা লেখা আছে, তার ব্যতিক্রম কোনো মসীবত তোমার উপর আপতিত হবে না? ইবলীস হযরত ঈসা (আ)কে বলল, আপনি এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠুন এবং সেখান থেকে আপনি নিচের দিকে লাফিয়ে পড়ুন। অতঃপর দেখুন আপনি জীবিত থাকবেন কিনা। হযরত ঈসা (আ) বললেন, (হে ইবলীস!) তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কোনো বান্দার পক্ষে আমাকে পরীক্ষা করার অধিকার নেই। আমি যা ইচ্ছা তা-ই করব।

যহরী (রহ) বলেছেন, বান্দা তাঁর পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে পরীক্ষা করতে পারেন।

আবু দাউদ (রহ) হযরত তাউস (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদা শয়তান হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে হাজির হয়ে বলল, আপনি কি আপনাকে সত্যবাদী বলে মনে করেন না? (যদি করেন) তবে আপনি এ উঁচু স্থান হতে নিচে লাফিয়ে পড়ে দেখুন। ঈসা (আ) বললেন, (হে ইবলীস!) তোমার ধ্বংস হোক! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, হে আদম সন্তান! আমার কাছে তোমাদের ধ্বংসের কামনা করবে না। কারণ আমি যা ইচ্ছা তা-ই করব। খালিদ ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শয়তান (এক বুযুর্গ মানুষের রূপ ধরে) হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে থেকে দশ বছর অথবা দু'বছর ইবাদত করতে থাকে। একদিন শয়তান একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তার কিনারায় দাঁড়িয়ে হযরত ঈসা (আ)-কে বলতে লাগল, আমি যদি এখন থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ি, তবে কি আমার উপর সেই বিপদই আপতিত হবে, যা আমার ভাগ্যে (তাকদীরে) লেখা আছে? ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর এরূপ বান্দা নই যে, আমি আমার প্রতিপালক (আল্লাহ তা'আলা) কে পরীক্ষা করব; বরং আমার প্রভু যখন ইচ্ছা করেন, তখনই আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। তারপর হযরত ঈসা (আ) বুঝতে পারলেন যে, এই লোকটি মূলত অভিশপ্ত শয়তান। (সে আমাকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এসেছে।) তারপর হযরত ঈসা (আ) তার থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। ইবনে আবীদ দুনিয়া (রহ) আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত ঈসা (আ) এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে নামায পড়ছিলেন। এ সময় ইবলীস তাঁর কাছে হাজির হয়ে বলতে লাগল, আপনিই তো সে ব্যক্তি, যিনি বলেন যে, প্রতিটি বিষয়ই তাকদীর (ভাগ্য) অনুযায়ী হয়ে থাকে। ঈসা (আ) বললেন, সম্পূর্ণরূপেই সঠিক কথা। তখন শয়তান বলল, আপনি এ পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ুন এবং বলুন যে, এটাই আমার তাকদীরের ফয়সালা। ঈসা (আ) বললেন, হে অভিশপ্ত শয়তান! আল্লাহ তাঁর বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন। কিন্তু বান্দা আল্লাহ তা'আলাকে পরীক্ষা করতে পারে না।

ইবনে আবীদ দুনিয়া (রহ) হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর সাথে ইবলীসের দেখা হয়। ইবলীস ঈসা (আ) কে বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)! আপনার লালন-পালন কত বিস্ময়কর। আপনি শৈশবেই মাতৃক্রোড়ে বসে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। আপনার পূর্বে এরূপ আর কেউ কথা বলতে পারেনি। ঈসা (আ) বললেন, আমার লালন-পালন তো তিনিই করেছেন, যিনি আমাকে মাতৃক্রোড়ে বসে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু দিবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন। শয়তান বলল, আপনিও তো বেশ আল্লাহর ক্ষমতার পর্যায়ে আছেন যে, আপনি মৃতকে জীবিত

করতে পারেন। ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহ তো একমাত্র সেই মহান সত্তার, যিনি সর্বদা মৃত্যু দেন ও জীবিত করেন। আর আমার এ জীবিত করা শুধু আল্লাহ তা'আলার আদেশ। এই জীবিতকেও তিনি মৃত্যু দিবেন। অতঃপর পুনরায় জীবিত করবেন। তারপর শয়তান বলল, আল্লাহর কসম! আপনি আকাশেও মাবুদ এবং যমীনেও মাবুদ। তারপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর এক পাখা দ্বারা অভিশপ্ত শয়তানকে এমন জোরে চড় মারলেন, যাতে সে (শয়তান) সূর্যের কাছাকাছি পৌছে গেল। অতঃপর আরেক চড় মারলেন যাতে সে, উত্তপ্ত (এক) ঝর্ণায় গিয়ে পৌছল, তারপর এক চড় মেরে তাকে (শয়তানকে) সপ্তম সমুদ্রের তলদেশে পৌছিয়ে দিলেন এবং সেখানে তাকে প্রোথিত করে দেন। এক বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর সে (শয়তান) সেখানে বসে চীৎকার করতে শুরু করল। এমনকি সে কাদামাটির স্বাদ গ্রহণ করল। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। পরে একবার হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন সে (শয়তান) ঈসা (আ)-কে বলল, হে ঈসা! আপনার সাথে আমার যেরূপ সাক্ষাৎ হয়েছে, এরূপ সাক্ষাৎ আর কারো সাথে হয়নি। (অর্থাৎ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে আমি শান্তি ভোগ করেছি।)

হাফেজ আবু বকর খতীব (রহ) বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে ইবলীস শয়তানের উক্ত ঘটনা আরো কয়েকবার ঘটেছে। একবার হযরত ঈসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করছিলেন। ইবলীস শয়তান সেখানে এসে হযরত ঈসা (আ) কে বলল, আপনি বান্দা হতে পারেন না, আপনার মর্যাদা এরও অনেক উর্ধ্বে। তখন ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করলে হযরত জিবরাঈল (আ) ও মীকাঈল (আ) সেখানে হাজির হন এবং জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা দ্বারা ইবলীসকে খুব জোরে আঘাত করেন এবং তাকে উপত্যকায় ছুড়ে মারেন।

ফেরেশতাগণ চলে গেছেন এবং ইবলীস শয়তান আবার এসে ঈসা (আ) কে বলল যে, আপনি কখনই বান্দা হতে পারেন না। বান্দার বৈশিষ্ট্য আপনার মধ্যে নেই। আপনার ক্রোধ বান্দার ক্রোধের মতো নয়। আপনাকে আমি বলতে চাই যে, আমি আমার অনুসারী সকল শয়তানকে আপনার অনুসরণ করার জন্য আদেশ দেব। যখন মানুষ দেখবে যে শয়তান ও জিন আপনার অনুকরণ করছে, তখন তারাও আপনার ইবাদত করা শুরু করবে। তবে আমি এ মিথ্যা কথা বলি না যে, আপনিই একা মাবুদ; বরং আকাশেও একজন মাবুদ আছে। আর পৃথিবীতে আপনি মাবুদ থাকবেন। ইবলীসের এ কথা শুনে হযরত ঈসা (আ) জোরে ডাক দিলেন ও আল্লাহ তা'আলার স্মরণ করলেন। সাথে সাথে হযরত ইস্রাফীল (আ) আকাশ হতে অবতরণ করলেন এবং ইবলীসকে এক চড় মারলেন। অতঃপর ইবলীস হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলল, আপনার কারণে আমি কঠিনভাবে মার খেয়েছি। তরপর তাকে উত্তপ্ত প্রস্রবণে নিক্ষেপ করা হয়। সেখানে সাতজন ফেরেশতা তাকে ডুবিয়ে দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! ইবলীস তারপর আর কখনো হযরত ঈসা (আ) এর কাছে আগমন করেনি।

ইসমাইল আত্তার (রহ) আবু হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এই ঘটনার পর ইবলীসের অনুসারী শয়তানেরা তার কাছে হাজির হয়ে বলল, হে আমাদের সর্দার আজ আপনাকে খুবই দুর্বল ও ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ইবলীস ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলল, ইনি (ঈসা) নিষ্পাপ বান্দা। তাঁর উপর আমার কোনই ক্ষমতা চলে না। তবে আমি তাঁর অনেক অনুসারীকে পথভ্রষ্ট করব এবং তাদের অন্তরে কামনা-বাসনা জাগ্রত করে দেব। তারা একপর্যায়ে ঈসা (আ)-কে ও তাঁর মা মারইয়াম (আ)-কে মাবুদ হিসেবে মেনে নেবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন– হে ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো। যখন আমি 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযত করেছেন। আর তাঁকে সাহায্যকারী হিসেবে হাওয়ারীকে প্রদান করেছেন।

মৃত লোককে জীবিত করা

মৃত লোককে জীবিত করাও ছিল ঈসা (আ)-এর একটি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মুজিযা। আল্লাহ তা'আলার হুকুমে তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। সর্বপ্রথমে তিনি যেভাবে জীবিত করেছিলেন সে ঘটনাটি ছিল এরূপ—

একদা ঈসা (আ) একটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে কোথাও গমন করছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, ঐ কবরের পার্শ্বে বসে এক মহিলা খুব কাঁদছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহিলা! তোমার কি হয়েছে; তুমি কাঁদছ কেন? সে বললো, আমার একমাত্র কন্যার মৃত্যুতে আমি কাঁদছি। এখানেই তাকে দাফন করা হয়েছে। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে এ ওয়াদা করেছি যে, আমাকে আমার কন্যার মতো যে পর্যন্ত মৃত্যু না দেবেন অথবা কন্যাটিকে আমার সামনে জীবিত না করবেন, ততক্ষণ আমি এ কন্যার কবরের কাছ থেকে কোথাও যাব না। এখানেই থেকে থাকব। হযরত ঈসা (আ) বললেন, আচ্ছা! আমি যদি তোমার কন্যাকে দেখিয়ে দিতে পারি, তবে কি তুমি এখান থেকে ফিরে যাবে? মহিলা বলল, জী হ্যাঁ। আমি ফিরে যাব। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) দু'রাকআত নামায আদায় করে, কবরের কাছে গিয়ে আওয়াজ দিলেন যে, হে অমুক! তুমি দয়াময় আল্লাহ তা'আলার হুকুমে উঠে দাঁড়াও এবং বেরিয়ে আসো। ঈসা (আ)-এর এ আওয়াজে কবর থর থর করে কাঁপতে লাগল। দ্বিতীয়বার তিনি অনুরূপ ডাক দিলে কবর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফেটে গেল। ঈসা (আ) তৃতীয়বার অনুরূপ ডাক দিলেন। এ তৃতীয় ডাকের পর কবরের সেই কন্যাটি মাথা থেকে ধূলা-মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল। হযরত ঈসা (আ) মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এত দেরিতে উঠলে কেন? মেয়েটি বলল, আপনার প্রথম ডাকের পরে আল্লাহ তা'আলা আমার কবরে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে আমার হাড্ডিগুলোকে একত্রিত করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে জোড়া লাগিয়েছেন। দ্বিতীয় ডাকের পরে, আমার দেহের মধ্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) রূহ দান করা হয়েছে। তৃতীয় ডাকে আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আমার আশঙ্কা হয়েছিল যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। যে কারণে চিন্তা ও ভয়ে আমার চুলগুলো হঠাৎ সাদা হয়ে গেছে। অতঃপর মেয়েটি তার মাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হে আমার আম্মা! আমাকে দ্বিতীবার কবর থেকে উঠাতে কে আপনাকে প্ররোচিত করল? আম্মা! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সওয়াবের আশা করুন। এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আমার কোনই দরকার নেই। (পার্থিব জীবন আমার কাছে তুচ্ছ)। এরপর মেয়েটি হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আবেদন করল, হে আল্লাহর কালেমা ও রূহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে দ্বিতীয়বার আখেরাতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আর মুহূর্তের কষ্ট ও যাতনা যেন লাঘব করে দেন। হযরত ঈসা (আ) তার কথা শুনলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করলেন। অতঃপর মেয়েটির পুনরায় মৃত্যু হলো এবং কবরের মধ্যে চলে গেল। ঈসা (আ)-এর এ মুজিযা প্রকাশ হয়ে পড়লে ইয়াহুদীরা ঈসা (আ)-এর উপর আরো রাগান্বিত হলো।

দস্তরখানের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۞ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۞ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ قَالَ

اللّٰهُ اِنِّیْ مُنَزِّلُهَا عَلَیْكُمْ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّیْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

(হাওয়ারীদের ব্যাপারে এ ঘটনাও মনে থাকা দরকার) যখন হাওয়ারীরা[১] বলল, হে ঈসা ইবনে মারইয়াম! আপনার রব কি আসমান থেকে আমাদের জন্য খানা ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললেন, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহকে ভয় করো। তারা বলল, আমরা শুধু এটাই চাই, আমরা খাঞ্চা থেকে খানা খাব ও আমাদের দিল নিশ্চিন্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সত্য এবং আমরা এর সাক্ষী হয়ে থাকব। তখন ঈসা ইবনে মারইয়াম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের জন্য খানা ভর্তি খাঞ্চা নাযিল করুন, যা আমাদের ও আমাদের পরবর্তীদের জন্য খুশি উপলক্ষ্য হয় এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিশানা হয়ে থাকে। আমাদেরকে রিযিক দান করুন। আর আপনিই তো সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা। আল্লাহ বললেন, আমি তা তোমাদের উপর নাযিল করব। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি। -সূরা মায়িদা : ১১২-১১৫

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির ও হযরত সালমান ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে এ আসমানী দস্তরখানের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীদেরকে ত্রিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। ত্রিশ দিন রোযা রাখার পরে তাঁরা ঈসা (আ)-এর কাছে আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ দস্তরখান অবতীর্ণের আবেদন জানান। যাতে তাঁরা তা থেকে খেতে পারেন এবং মহা অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারেন এবং তারা মানসিকভাবে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। আর এ দিন তারা যাতে আনন্দ করতে পারেন এবং আসমান থেকে আগত খাদ্য ধনী-গরীব সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। হযরত ঈসা (আ) তাদেরকে এরূপ আবেদন করা থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তারা এর শোকর আদায় করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু তারা তা কিছুতেই শুনল না; বরং ঈসা (আ)-এর কাছে বারবার আরয করতে লাগল। অবশেষে ঈসা (আ) অপারগ হয়ে, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবনত মস্তকে চোখের পানি ঝরিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাদের প্রার্থিত বস্তু প্রেরণ করুন। তারপর আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে খাদ্য পরিপূর্ণ দস্তরখান (খাঞ্চা) নাযিল করলেন।

সকলে স্বচক্ষে দেখছিল যে, সে দস্তরখানটি দু'মেঘের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে যমীনের দিকে অবতীর্ণ হচ্ছে। যখন সেটি খুব নিকটে এসে গেল, তখন হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! শাস্তিস্বরূপ অবতীর্ণ করবেন না। হে আল্লাহ! আপনি এটিকে বরকত ও নিরাপদ হিসেবে নাযিল করুন। দস্তরখানটি এসে হযরত ঈসা (আ)-এর সামনে হাজির হল এবং তা রুমাল দ্বারা আবৃত ছিল। হযরত ঈসা (আ) দস্তরখান দেখে বলতে লাগলেন— بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ 'আল্লাহর নামে যিনি উত্তম রিযিকদাতা।'

অতঃপর ঈসা (আ) দস্তরখানটির উপর থেকে রুমাল সরিয়ে ফেললেন। এতে (দস্তরখানের) সাতটি মাছ সাতটি রুটি এবং সিরকা ছিল। বর্ণিত আছে যে, আনারসহ অনেক ফলও ছিল। খাদ্য থেকে সুঘ্রান আসতে লাগল। আল্লাহ এগুলোকে 'হয়ে যাও' নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে এভাবে প্রস্তুত হয়ে আকাশ থেকে জমিনে তাদের সামনে হাজির হলো। অতঃপর ঈসা (আ) তাদেরকে (হাওয়ারীদেরকে) তা খাওয়ার জন্য বললেন। তারা ঈসা

১. মাঝখানে হাওয়ারীদের আলোচনা এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদের সম্পর্কেই আরো এমন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; যা থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, মাসীহ (আ)-এর কাছে সরাসরি যেসব লোক শিক্ষা পেয়েছিলেন, তারা মাসীহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দাহ বলেই জানতেন। তাদের দূরতম চিন্তা ও কল্পনায়ও নিজেদের নবী সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে, তিনি খোদা বা খোদার শরীক কিংবা খোদার পুত্র ছিলেন। তা ছাড়া এ কাহিনী থেকে আরো জানা যায়, মাসীহ (আ) নিজেও তাঁদের সামনে নিজেকে আল্লাহর একজন বান্দাহ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

(আ)-কে বলল, আপনি প্রথমে না খাওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ এর থেকে খাব না। ঈসা (আ) বললেন, তোমরা তো প্রথমে এর জন্য দো'আ করেছিলে। সুতরাং তোমরাই প্রথমে আরম্ভ করো। কিন্তু তারা তা শুনল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) গরীব, অসহায়, ব্যাধিগ্রস্ত, খোড়া ও পঙ্গুদেরকে তা থেকে খাওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। তারা সংখ্যায় ছিল একশ'জন। তারা সবাই খেয়ে নিল। ফলে আল্লাহর মেহেরবানীতে ব্যাধিগ্রস্ত ও পঙ্গুরা সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে যারা প্রথম থেকে অস্বীকার করেছিল, তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। তারা বলতে লাগল! আহ! আমরা যদি প্রথমে খেয়ে নিতাম তবে আমরাও সুস্থ হয়ে যেতাম। কথিত আছে যে, এই খাদ্য পরিপূর্ণ দস্তরখান (খাঞ্চা) প্রতিদিন একবার আসমান থেকে অবতরণ করতো। আর লোকেরা তা থেকে খেয়ে নিতো। প্রথম ব্যক্তি যেভাবে পরিতৃপ্তিসহ খেতেন সর্বশেষ ব্যক্তিও অনুরূপ পরিতৃপ্তিসহ খেতেন।

এরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এ দস্তরখান থেকে শুধু গরীব ও অসহায়দের খেতে বলো। আর ধনী ব্যক্তিদেরকে বিরত থাকতে বলো। এ নির্দেশ মুনাফিক ও বহু লোকের কাছে অমনপুত হলো। তারা ব্যাপারে সমালোচনা শুরু করে দিলো। এর ফলে দস্তরখানা আসা বন্ধ হয়ে গেল এবং যারা সমালোচনা করেছিল তারা শূকরে পরিণত হলো।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রহ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈসা (আ)-এর নিকট আসমান থেকে যে দস্তরখান এসেছিল তাতে রুটি ও গোশত ছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা যেন খাদ্যের খেয়ানত না করে, খাদ্য জমা না করে এবং আগামীকালের জন্য রেখে না দেয়। কিন্তু খেয়ানত করেছে ও জমা করে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত তারা বানর ও শূকরে পরিণত হলো।

হযরত ঈসা (আ)-এর হালত ও কয়েকটি উপদেশ

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রহ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী সাথীগণ একবার ঈসা (আ)-কে খুঁজে পাচ্ছিল না। খুঁজতে খুঁজতে তারা সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দেখে যে, তিনি সমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করছেন। সমুদ্রের ঢেউ কখনো তাঁকে উপরে উঠায়, আবার কখনো নিচে নিয়ে যায়। তিনি একটি চাদর গায়ে দিয়ে আছেন। আর একটি চাদর (পাজামা হিসেবে) পরিধান করেছেন। তিনি যখন সমুদ্র থেকে হেঁটে হেঁটে লোকদের কাছে আসলেন, তখন এক লোক তাঁকে বললেন, হে নবী! আমরা কি (সমুদ্রের মাঝে) আপনার কাছে আসতে পারব না? ঈসা (আ) বললেন, কেন পারবে না। অতঃপর সে লোকটি এক পা পানির মধ্যে রেখে দ্বিতীয় পা দিতে গিয়েই জোরে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর নবী! আমি তো ডুবে যাচ্ছি। ঈসা (আ) বললেন, আমার কাছে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। হে দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি, আদম সন্তানের অন্তরে একটি দানা পরিমাণও যদি ঈমান (আল্লাহর প্রতি ইয়াকীন) থাকে, তবে সে ব্যক্তি পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।

ইবনে আসাকির (রহ) হযরত শা'বী (রহ) থেকে বলেছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে বসে যখন কিয়ামতের আলোচনা করা হতো, তখন তিনি চিৎকার দিয়ে উঠতেন ও বলতেন, মারইয়াম পুত্রের জন্য এটা উচিত নয় যে, তার কাছে বসে কিয়ামতের আলোচনা হবে আর সে চুপ করে বসে থাকবে।

একদিন হযরত ঈসা (আ) একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিলেন। সেখান দিয়ে ইবলীস যাচ্ছিল। সে (ইবলীস) ঈসা (আ)-কে বলল, হে ঈসা! তুমি কি এই কথা বলে থাক না যে, পৃথিবীর কোনো বস্তুর প্রতি তোমার মোহ নেই? এই পাথরটিও তো পৃথিবীর একটি বস্তু। তখন হযরত ঈসা (আ) শোয়া থেকে উঠে পাথরটি ইবলীসের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন, পৃথিবীর সাথে এটিও তোকে দিয়ে দিলাম।

হযরত ইসমাঈল (রহ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীন (সাথী)-দেরকে বলেছিলেন, যবের রুটি খাও, বিশুদ্ধ পানি পান করো এবং দুনিয়া থেকে শান্তি ও নিরাপদের সাথে বের হয়ে যাও। আমি সত্যের শপথ করে তোমাদেরকে বলছি, এই পার্থিব জীবনে যা স্বাদযুক্ত,

পরকালে তা বিস্বাদ। আর পার্থিব জীবনে যা কষ্টে, পরকালে তা সুখে। আল্লাহর (প্রকৃত) বান্দা এ পার্থিব জীবনে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না।

আবু মুসআব (রহ) মালিক (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদেরকে বলতেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা বিশুদ্ধ পানি পান করো এবং যবের রুটি ও সবজি খাও। গমের রুটি খাওয়া থেকে বিরত থাক। কেননা, তোমরা এর শোকর আদায় করতে পারবে না।

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রহ) বলেন, হযরত ঈসা (আ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে একটি কবরের পার্শ্বে দাঁড়ালেন। ঐ কবরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময়, তাঁর সাথীদের একজন বললেন, কবরটি সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ঈসা (আ) ঐ লোকটিকে বললেন, তুমি তোমার মায়ের গর্ভে এর চাইতেও সংকীর্ণ জায়গায় ছিলে। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তা প্রশস্ত করে দিলেন।

আবু ওমর যারীর (রহ) বলেছেন, ঈসা (আ) যখন মৃত্যুর কথা বর্ণনা করতেন, তখন তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতো। হযরত ঈসা (আ) এর অনেক হালত ও উপদেশ বর্ণিত আছে।

হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেয়া ও শুলে চড়াবার ইয়াহুদ ও নাসারাদের মিথ্যা দাবি

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞

এবং তারা লা'নত গ্রস্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য ও মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য। আর আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি, তাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি; কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। -সূরা নিসা : ১৫৬-১৫৭

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে এ আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। সে যুগের এক কাফির বাদশাহর সহযোগিতায় ইয়াহুদীরা ঈসা (আ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।

হাসান বসরী (রহ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহ) বলেছেন, সেই কাফির বাদশাহর নাম ছিল, দাউদ ইবনে নূরা। সে ঈসা (আ)-কে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল। তার আদেশে লোকেরা ঈসা (আ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবরুদ্ধ করে রাখে। সময়টি ছিল শুক্রবার দিবাগত শনিবার রাতের বেলা। যখন হত্যাকারীদের প্রবেশের সময় হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ) এর সাথীদের মধ্যে একজনকে তাঁর চেহারার সাদৃশ করে দেন। আর ঈসা (আ)-কে উপরে ফাঁকা জায়গা (ভেন্টি লেটার) দিয়ে আকাশে উঠিয়ে নেন। কক্ষে যারা ছিল তাঁরা তার এ তুলে নেয়ার দৃশ্য অবলোকন করেছিল। অতঃপর বাদশাহর লোকেরা তাদের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী কক্ষে প্রবেশ করে হযরত ঈসা (আ)-এর চেহারার সাদৃশ ঐ লোকটিকে দেখে ঈসা মনে করে তাকে ধরে এনে শুলে চড়াল এবং তাঁর মাথায় একটি কাঁটা রেখে দিল। সাধারণ নাসারাগণ যারা প্রকৃত অবস্থা দেখেনি, তারাও ইয়াহুদীদের এ মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে নিল যে, হযরত ঈসা (আ)-কে শুলে চড়ানো হয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন ঈসা (আ)-কে তাঁর আসমানে তুলে নিতে ইচ্ছা করলেন, তখন ঈসা (আ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। এ সময় তার সাথীদের সংখ্যা ছিল

ব্যক্তিকে। ঈসা (আ) সাথীদেরকে বললেন, আচ্ছা! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যার চেহারা আমার চেহারার সাদৃশ করে দেয়া হবে। অতঃপর তাকে আমার পরিবর্তে হত্যা করা হবে। এর প্রতিদান হিসেবে তাকে জান্নাতে আমার মর্যাদায় আমার সাথে অবস্থান করতে দেয়া হবে? তখন এক যুবক দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রাজি আছি। ঈসা (আ) তাঁকে বসিয়ে দিলেন। তারপর পুনরায় তিনি অনুরূপভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এবারেও সে যুবক দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন ঈসা (আ) বললেন, হ্যাঁ, তুমিই সেই ব্যক্তি। অতঃপর ঐ যুবকটির চেহারা হযরত ঈসা (আ)-এর চেহারার সাদৃশ করে দেয়া হলো। আর হযরত ঈসা (আ) কে কক্ষের উপরের ফাঁকা জায়গা থেকে সমানে তুলে নেয়া হলো। এই তুলে নেয়ার দৃশ্য কক্ষে অবস্থানকারী সবাই স্বচক্ষে দেখতে পেলো।

হযরত ঈসা (আ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দৈহিক আকৃতি

হযরত ঈসা (আ)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ

অর্থ : মারইয়াম তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল, তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মা ছিল মহা সত্যবাদিনী। -সূরা মায়িদাহ : ৭৫

মাসীহ শব্দের অর্থ সফরকারী। হযরত ঈসা (আ) ইয়াহুদীদের বানোয়াট ও মিথ্যা অপবাদ থেকে দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সফর করে ছিলেন। এ কারণে তাঁকে মাসীহ বলা হয়ে থাকে। উর্দু অনুবাদক বলেছেন, আমার অভিমত এই যে, মাসীহ অর্থ স্পর্শকারী। যেহেতু হযরত ঈসা (আ)-এর কারো শরীরে হাত দ্বারা স্পর্শ করলে ব্যাধিগ্রস্তরা সুস্থ হয়ে যেত। এ কারণে তাঁকে মাসীহ বলা হয়।)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে রাতে আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ মিরাজের রাতে) আমার সাথে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি খুব জোশ প্রবল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো। মনে হয়েছিল তিনি শানুয়া গোত্রের লোক। এ সময় ঈসা (আ)-এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ছিলেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট ও তাঁর চেহারার ছিল ফর্সা, উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণ। তখন তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন, তিনি এই মাত্র গোসলখানা থেকে (গোসল করে) বের হয়ে এসেছেন। ইবরাহীম (আ)-এর সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে তাঁর চেহারার সাথে সর্বাধিক মিল একমাত্র আমারই হয়েছে। -বোখারী

হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'মি'রাজের রাতে আমি ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) রক্তিম বর্ণের এবং তাঁর মাথার চুলগুলো ছিল কোঁকড়ানো ও তাঁর বক্ষ ছিল প্রশস্ত। মূসা (আ) দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট এবং সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। মনে হয়েছিল তিনি 'জাঠ' সম্প্রদায়ের লোক। (বোখারী)

বোখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। ঈসা (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ? সে (চোর) বলল, সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, কখনই না। আমি চুরি করিনি। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমার নিজ চোখকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছি। অর্থাৎ আল্লাহর কসমের সামনে আমার দেখা বিষয়টি প্রত্যাহার করেছি। হতে পারে আমার চক্ষু ভুল হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকল নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। তাদের দ্বীন এক এবং কথাবার্তা হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের। ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) আমার সবচেয়ে নিকটতম। কারণ আমাদের দু'জনের মধ্যে আর কোনো নবী নেই। তিনি যখন পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তাঁকে চিনতে পারবে। তিনি হবেন মধ্যম দেহবিশিষ্ট ও সুঠাম দেহের অধিকারী। তাঁর চেহারা

উজ্জ্বল রক্তিম বর্ণের। তাঁকে দেখলে মনে হবে যেন তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছে। যদিও তিনি কোনো ঝর্ণা বা নদীতে অবতরণ করে না থাকেন। তিনি পৃথিবীতে আগমন করে ক্রশ দণ্ড ভাঙ্গবেন, (ক্রশ হচ্ছে [+] এই চিহ্ন। যাতে খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত মতে ঈসা (আ) কে শূলী দেয়া হয়েছিল।) শূকর মেরে ফেলবেন, জিযিয়া (কর) রহিত করবেন। সকল মতাদর্শগুলোকে নিপাত করে দেবেন। তাঁর যুগে পৃথিবীতে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম থাকবে না। তাঁর যুগে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারাই দাজ্জালকে ধ্বংস করাবেন। সারা পৃথিবী বরকতময় ও শান্তিময় হয়ে যাবে। এমনকি উট, সিংহ, গরু, নেকড়ে বাঘ ও বকরী একই সাথে মাঠে চরে বেড়াবে। কিশোর বালকেরা সাপের সাথে খেলা করবে। কেউ কারো কোনো ক্ষতি করবে না। আল্লাহ তা'আলা যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন এরূপ শান্তিময় অবস্থা রাখবেন। তারপর ঈসা (আ)-এর ইন্তেকাল হবে। মুসলমানগণ তাঁর জানাযা পড়িয়ে তাঁকে দাফন করবেন। এক বর্ণনা আছে, ঈসা (আ) চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন।

কোনো এক ফজরের জামায়াতের ইকামতের সময়, ঈসা (আ) দামেশকের জামে মসজিদের সাদা মীনারের উপর নেমে আসবেন। মুসলমানদের ইমাম তাঁকে নামাযের ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করবেন। তিনি বলবেন, না তোমরা একে অন্যের উপর নেতা। এ উম্মত আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত। এক বর্ণনায় আছে, তিনি ইমাম সাহেবকে বলবেন, ইকামত আপনাদের জন্য বলা হয়েছে। আপনিই নামায পড়ান। নামায শেষে ঈসা (আ) মুসলমানদের সাথে বাহনে আরোহণ করে জিহাদ করবেন এবং দাজ্জালকে 'লুদ' ফটকের কাছে বসে হত্যা করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, তাওরাতে মুহাম্মাদ ﷺ ও ঈসা (আ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে লেখা আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ও ঈসা (আ) এরা দু'জন এক জায়গায় দাফন হবেন। এখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র রওজার পাশে একটি কবর পরিমাণ জায়গা খালি আছে।

শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। একজন নবী বা রাসূল দ্বারা অন্যজনকে সাহায্য ও মযবুত করেছেন। হযরত আদম (আ) থেকেই এই ধারাবাহিক সিলসিলা অব্যাহত ছিল। কখনো তো রাসূল নতুন শরীঅত ও কিতাব নিয়ে এসেছেন, আবার কখনো পূর্ববর্তী রাসূলের শরীঅত প্রচারের জন্য নবী-রাসূলের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল এটা জানতেন যে, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পূর্ণাঙ্গ দীন ও শরীঅত নিয়ে আসবেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সকল নবী-রাসূলের নিকট ছিল স্বীকৃত। তাই তো দেখা যায়, কোন কোন নবী মুসীবতে আল্লাহ্র দরবারে তাঁর নামের ওসীলায় দু'আ করে নাজাত পেয়েছেন। কোন কোন নবী তাঁর বংশে আখেরী নবী আসবেন বলে গর্ববোধ করেছেন। কোন নবী হয়ত তাঁর আগমনের সুসংবাদ তাঁর উম্মতকে শুনিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ) যে আখেরী নবীর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন পবিত্র কুরআনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বংশ তালিকা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মুনাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহর ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানা ইবনে খুযায়মা ইবনে মুদারিক ইবনে ইলয়াস ইবনে মুদার ইবনে নাযযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান।

আদনানের পরবর্তী তালিকার মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এজন্য আদনান পর্যন্ত বংশ তালিকা এখানে বর্ণনা করা হলো। আদনান পর্যন্ত বংশ তালিকার মধ্যে কারও কোন মতভেদ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۔

অর্থ : মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের লক্ষণ তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকবে। –সূরা ফাতহ : ২৯

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔

অর্থ : আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষদিনের আশা করে এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে। –সূরা আহযাব : ২১

وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۔

অর্থ : আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা (রাসূলুল্লাহ [সা]) তাঁকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমালো। –সূরা জিন : ১৯

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۫ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔

অর্থ : দেখ! তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যে থেকেই একজন। যা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর তাতে তিনি কষ্ট পান। তিনি তোমাদের হিতকামী। ঈমানদারদের জন্য তিনি বড়ই স্নেহশীল ও রহম দিল। এখন যদি এসব লোক আপনার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে তাহলে (হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। তাঁরই উপর আমি ভরসা করে আছি। আর তিনি মহান আরশের মালিক। –সূরা তাওবা : ১২৮-১২৯

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۔ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مَجْنُوْنٍ ۔ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۔ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۔ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۔

অর্থ : নূন, কলমের শপথ এবং (ঐ জিনিসের) শপথ, যা লেখকরা লিখছে।[১] আপনার রবের দয়ায় আপনি পাগল নন।[২] নিশ্চয়ই আপনার জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে, যা কখনো শেষ হবে না।[৩] আর নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরে রয়েছেন।[৪] শিগগিরই তোমরাও দেখতে পাবে যে, তোমাদের মধ্যে কে পাগলামিতে পড়ে আছে।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত প্রশংসা করেছেন, যেরূপ প্রশংসা তিনি আর কোন নবীর বেলায় করেননি। এজন্য সকল নবীদের মধ্যে তাঁর চরিত্র-ই হলো গোটা মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কথিত আছে যে, জান্নাতবাসীদের চরিত্র হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্রের সাদৃশ।

আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবী ﷺ-এর নম্রতা ও দয়দ্রতা সম্পর্কে বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۔

অর্থ : হে রাসূল! এটা আল্লাহর বড়ই রহমত যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুব নরম মেজাজবিশিষ্ট হয়েছেন। তা না হলে যদি আপনি কড়া হতেন ও পাষাণ মনের অধিকারী হতেন তাহলে তারা সবাই আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত। তাদের দোষ মাফ করে দিন, তাদের পক্ষে মাগফিরাতের দোআ করুন এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। তারপর যখন আপনি কোনো মতের উপর মযবুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ঐসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁরই ভরসায় কাজ করে।

–সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। কিয়ামতের কঠিন দিবসে, তাঁর সুপারিশ দ্বারা মানুষ ও জিন খুব উপকৃত হবে।

---

১. মুফাসসিরদের ইমাম মুজাহিদ (রহ) বলেন, কলম অর্থ ঐ কলম, যা দিয়ে যিকর বা কুরআন লেখা হচ্ছে। এর দ্বারা আপনি-আপনিই প্রমাণিত হয় যে, 'মা লেখা তস্কিল' কথাটির অর্থ হলো কুরআন মাজীদ।

২. এখানে মনে হয়, রাসূল ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু কাফিররা যে রাসূল ﷺ-কে পাগল বলত সে অপবাদেরই জবাব দেওয়াই হলো এর আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ কুরআন তথা ওহী লেখকদের হাতে যা লেখা হচ্ছে, তা নিজেই তাদের ঐ অপবাদের প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট।

৩. অর্থাৎ আপনার জন্য এ কারণে অগণিত ও অফুরন্ত পুরস্কার রয়েছে যে, আপনি মানুষের হেদায়াতের জন্য যে চেষ্টা করেছেন, তার বদলায় বড়ই বেদনাদায়ক কথা শোনা সত্ত্বেও আপনি এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৪. অর্থাৎ কুরআন ছাড়া আপনার উন্নত চরিত্রও এর স্পষ্ট প্রমাণ যে, কাফিররা আপনাকে পাগল বলে যে অপবাদ দিচ্ছে তা একেবারেই মিথ্যা। কেননা, উন্নত চরিত্র ও পাগলামি একত্র হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

অর্থ : আসলে আল্লাহ তো ঈমানদারদের উপর বিরাট মেহেরবানী করেছেন যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এমন এক নবী বানিয়েছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শুনান, তাদের জীবনকে পবিত্র করে সাজান এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। অথচ এর আগে এসব লোক স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে পড়েছিল। –সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ

হযরত ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর পরবর্তী পয়গম্বরের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করতেন। আর সেই পরবর্তী পয়গম্বর বলতে তিনি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা ﷺ-কে বুঝাতেন। কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ۔

অর্থ : স্মরণ কর, মারইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বানু ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল, আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। –সূরা সাফফ : আয়াত ৬

হযরত ঈসা (আ)-এর ঐ ঘোষণায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নাম 'আহমদ' বলা হয়েছে। 'আহমদ' শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে। ১) সে ব্যক্তি যে আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। ২) সেই ব্যক্তি যার সর্বাধিক প্রশংসা করা হয়েছে। অথবা বান্দাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক প্রশংসাযোগ্য।

কুরতুবী উল্লেখ করেন যে, তিনি দুনিয়াতে প্রশংসিত। কারণ, তাঁর মাধ্যমে হিদায়াত দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে ইলম ও হিকমতসহ পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে উপকৃত করা হয়েছে। এমনিভাবে আখিরাতেও শাফাআতের জন্য তিনি হবেন প্রশংসিত। তিনি প্রশংসাকারী তথা আহমদ, তিনি প্রশংসিত তথা মুহাম্মদ। আহমদ বলেই তিনি মুহাম্মদ।
–কুরতুবী, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ৮৪

উল্লেখ্য, একাধিক সহীহ্ হাদীস হতে প্রমাণিত যে, আহমদ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর অপর এক নাম। মহানবী ﷺ বলেছেন—

اِسْمِيْ فِي التَّوْرَاةِ اَحْمَدُ لِاَنِّيْ اَحْمَدُ اُمَّتِيْ عَنِ النَّارِ وَاِسْمِيْ فِي الزَّبُوْرِ الْمَاحِيْ مَحَا اللّٰهُ بِيْ عَبَدَةَ الْاَوْثَانِ وَاِسْمِيْ فِي الْاِنْجِيْلِ اَحْمَدُ وَاِسْمِيْ فِي الْقُرْاٰنِ مُحَمَّدٌ لِاَنِّيْ مَحْمُوْدٌ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۔

অর্থাৎ, তাওরাতে আমার নাম আহ্ইয়াদ (রক্ষাকারী), কারণ আমার উম্মতকে আমি জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করবো, যাবূরে আমার নাম মাহী (বিলুপ্তকারী), কারণ আল্লাহ্ পাক আমার দ্বারা মূর্তিপূজা বিলুপ্ত করে দিবেন। ইনজীলে আমার নাম আহমদ এবং আল-কুরআনে আমার নাম মুহাম্মদ। কেননা, আমি আসমান ও দুনিয়াবাসীর মধ্যে প্রশংসিত (প্রাগুক্ত)।

হযরত জুবায়র ইবনে মুতইম হতে ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী ও নাসাঈ এই অর্থেরই একাধিক হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও রাসূলে কারীম ﷺ-এর এই নাম সুপরিচিত ছিল। হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিতের কবিতার একটি ছত্র তার প্রমাণ—

صَلَّى ٱلٰهُ وَمَنْ تَحْتَ بِعَرْشِهِ * وَالطَّيِّبُوْنَ عَلَى الْمُبَارَكِ اَحْمَدُ.

"আল্লাহ্ এবং তাঁর আরশের চতুষ্পার্শ্বে সমবেত অসংখ্য ফেরেশতা ও সকল পবিত্র আত্মা মহান বরকতগুলো আহমদ-এর প্রতি সালাত পেশ করেন।"

রাসূলে কারীম ﷺ-এর পূর্বে কারো নাম 'আহমদ' ছিল বলে আরবী সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে পাওয়ায় যায় না। আর রাসূলে কারীমের সময় হতে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম উম্মতের মধ্যে তাঁর এই নাম সুপরিচিত ও সর্বজন বিদিত হয়ে আছে।

খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্তমানে প্রচুর রদবদল হওয়া সত্ত্বেও ঈসা (আ)-এর বাণী বলে যা উক্ত হয়েছে, তাতেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আগমনের সুসংবাদ রয়েছে।

প্রথমত, ঈসা (আ) স্বর্গরাজ্য তথা আল্লাহ্র দেয়া বিধানে পরিচালিত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আসন্ন বলে তাঁর একাধিক বাণীতে উল্লেখ করেছেন (মথি ৬:১০)। লূক সুসমাচারে আছে, ঈসা (আ) তাঁর ১২ জন অনুসারীকে ডেকে সেই স্বর্গরাজ্যের সুসংবাদ দানের কথা বলেছিলেন (লূক : ১-৪) আর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, সেই ধরনের আসমানী কর্তৃত্ব ঈসা (আ)-এর শরীঅতের মাধ্যমে তাঁর সূত্রে কিংবা তাঁর অনুসারীদের যুগেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর শরীঅতের মাধ্যমেই তা যমীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

–রহমাতুল্লাহ্ হিন্দী, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১১৭৪-১১৭৫

দ্বিতীয়ত, মথি সুসমাচারে অন্য স্থানে আছে, হযরত ঈসা (আ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মত সম্পর্কে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তা নিম্নরূপ—

"কিন্তু যারা প্রথম এমন অনেক লোক শেষে পড়বে এবং যারা শেষের এমন অনেক লোক প্রথম হবে। কেননা, স্বর্গরাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য যিনি প্রভাতকালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাবার জন্য বাইরে গেলেন। তিনি মজুরদের সাথে দিনে এক সিকি বেতন স্থির করে তাদেরকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাইরে গিয়ে দেখলেন অন্য কয়েকজন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যা ন্যায্য তোমাদেরকে দিব; তাতে তারা গেল। আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাইরে গিয়ে আরও কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আর তাদেরকে বললেন, কিজন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়িয়ে আছ? তাহারা তাকে বলল, কেউই আমাদেরকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। পরে সন্ধ্যা হলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে বললেন, মজুরদেরকে ডেকে মজুরী দাও। শেষ জন হতে আরম্ভ করে প্রথম জন পর্যন্ত দাও। যারা এগার ঘটিকা পর্যন্ত কর্মরত ছিল, তারা এসে এক একজন এক এক সিকি পাইল। যারা প্রথমে লাগছিল, তারা এসে মনে করল, আমরা বেশী পাব; কিন্তু তারাও এক এক সিকি পেল। তারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করে বলতে লাগল, শেষের এরা ত এক ঘণ্টা মাত্র খেটেছে, আমরা সমস্ত দিন খেটেছি ও রৌদ্রে পুড়েছি। আপনি এদেরকে আমাদের তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই! তোমার যা পাওনা তা নিয়ে চলে যাও। আমার ইচ্ছা কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে? এরূপে যারা শেষের তারা প্রথম হবে এবং যারা প্রথম তারা শেষে পড়বে।" –মথি ১৯:৩০; ২০:১০১৬

এই সুসংবাদে হযরত ঈসা (আ) দৃষ্টান্তের আকারে দুনিয়ার জাতিসমূহের কর্মময় জীবন এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নেয়ার ও প্রতিদানের তুলনা করেছেন। প্রথমের শ্রমিকরা হল হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেকার জাতিসমূহ, দ্বিতীয় দল হযরত মূসা (আ)-এর নিজের উম্মত বনূ ইসরাঈল, তৃতীয় দল হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মত খৃষ্টানগণ এবং নতুন ও সর্বশেষ দল সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতগণ।

পৃথিবীর বয়সের দৃষ্টিকোণ হতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের তুলনায় হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের জীবনকাল যেন দিনের শেষ প্রহর এবং ছওয়াব ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে এই সর্বশেষ উম্মতকে তাদের পূর্বেকার উম্মতদের সমপরিমাণ দেয়ার অর্থ এটাই। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অন্য সকল উম্মতের তুলনায় তাদের মর্যাদা অধিক। এখানে শেষে যারা আসবে তাদের দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতে মুহাম্মদী। এই মর্মে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-ও বলেছেন- نَحْنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ "আমরাই শেষে আসা অগ্রগামী লোক।"

–বুখারী, কিতাবুল উযূ, ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, ৩৪৫

উপরিউক্ত তিন দলের প্রতিদানের বিষয়টি মহানবী ﷺ এক উপমায় নিম্নরূপ বর্ণনা করেন—

مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَ النَّصَارٰى فَقَالُوْا مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً، هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِيْ أُوْتِيْ مَنْ أَشَاءُ.

অর্থাৎ, তোমাদের ও আহলে কিতাবদের উপমা সেই ব্যক্তির সাথে হতে পারে, যে অনেক মজুর নিয়োগ করে এবং বলে সকাল হতে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাত মজুরীতে কে আছ, যে আমার জন্য কাজ করবে? তখন ইহুদীরা কাজ করল। এমনিভাবে তিনি আরো বললেন, দুপুর হতে আসর পর্যন্ত এক কীরাত মজুরীতে কে আছ আমার জন্য কাজ করবে? তখন নাসারাগণ কাজ করল। অতঃপর তিনি বললেন, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত মজুরীতে কে আছ আমার জন্য কাজ করবে? আর তোমরাই (মুসলমানরা) সেই দল। অতঃপর ইহুদী ও নাসারাগণ রাগান্বিত হয়ে বলল, আমাদের কি হল যে, আমরা বেশী কাজ করলাম এবং কম মজুরী পেলাম? তখন কর্তা বললেন, তোমাদের হক বা নির্ধারিত পাওনার কম দিয়েছি কি? তারা বলল, না। তিনি বললেন, এটা আমার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা আমি বেশী দিব।

–বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাবু আল-ইজারাত ইলা-নিসফিন-নাহার, ফাতহুল বারী, পৃঃ ৪৪৫-৪৪৭

তৃতীয়ত, হযরত ঈসা (আ) আর একটি উপমায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতের আগমন সম্পর্কে সসংবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী। আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। আর যোহনের [হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর] সাক্ষ্য এই ঃ যখন ইয়াহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া জেরুসালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃষ্টানই। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি এলিয় নহি। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাহাকে কহিল, আপনি কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন তাহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন? তিনি কহিলেন, আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমার প্রভুর পথ

স্মরণ কর, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। তাহারা ফরিশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃষ্টও নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন (১ : ১০-২৫)?

এ বর্ণনা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বনূ ইসরাঈলরা হযরত ঈসা মাসীহ ও হযরত ইল্ইয়াস (আ) ছাড়া আরো একজন নবীর জন্য প্রতীক্ষমাণ ছিল। তিনি হযরত ইয়াহ্ইয়াও নন। এই ভাববাদী নবীর আগমন সংক্রান্ত বিশ্বাস বনূ ইসরাঈলীদের মধ্যে এমন সর্বজন বিদিত ছিল যে, 'সেই নবী' বলাই তাকে বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু এ থেকে এ কথাও জানা গেল যে, যে নবীর প্রতি তারা ইংগিত করত, তার আগমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে যখন এই প্রশ্ন করা হল, তখন তিনি এ কথা বলেননি যে, তোমরা কোন্ নবীর কথা জিজ্ঞাসা করছ, আর তো কোন নবীর আগমন হবার নয়।

বস্তুত উক্ত বাণীতে তৃতীয় আরেকজন নবী আগমনের সুসংবাদটি এতই পরিষ্কার যে, খৃষ্টানরা অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করা ব্যতীত ইতিহাসের এই প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগই থেকে গিয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যদি সেই নবী না হন, তবে কে সেই নবী? কারণ, ঈসা (আ)-এর পরে আর কোন নবী এসেছেন বলে তো তারা দাবী করে না। আর ইহুদীরা যেমনিভাবে হযরত মাসীহ (আ)-এর আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল কিন্তু তাঁর আগমনের পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল, অনুরূপভাবে ইহুদী-খৃষ্টান উভয়ে সেই নবী-এর আত্মপ্রকাশের জন্য চরমভাবে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই নবীর আগমনের পর গোষ্ঠীগত ও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তারা তাঁকে অস্বীকার করে বসল। এ বিষয়টি আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাদের একদল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে থাকে। (সূরা বাকারা : আয়াত ১৪৬)

চতুর্থত, যোহন সুসমাচারে একজন নবীর আগমনের কথা বারবার ভবিষ্যদ্বাণী রূপে ঘোষিত হয়েছে। তাতে ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর যে সকল গুণ উল্লেখ করা হয়, তা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর গুণাবলীর সাথে অনেকটা মিলে যায়। যোহন সুসমাচারে আসা ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ—

১. "তোমাদের নিকট থাকতে থাকতেই আমি তোমাদের নিকট এই কথা বললাম। কিন্তু সেই মহান পবিত্র আত্মা, যাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদেরকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদেরকে যা যা বলেছি, সে সকল স্মরণ করিয়ে দিবেন।" (১৪ ঃ ২৫-২৭)

২. "তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফোরকালীত) তোমাদের নিকট আসবে না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাকে পাঠিয়ে দিব।" -১৬ ঃ ৭; আরো দ্র ঃ ১৬ ঃ ১২-১৫

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উক্ত প্রতিশ্রুত নবীই ছিলেন হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

আরবের অধিবাসী

আরবের অধিবাসী প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১) আরাবুল বায়িদাহ্ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব। ২) আরাবুল আরিবা বা বিশুদ্ধ আরব। ৩) আরাবুল মুস্তাআরিবা বা অভ্যাগত আরব অর্থাৎ বনী ইসমাঈল।

আরাবুল বায়িদাহ প্রসঙ্গে আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদ সর্বপ্রথম আরবের দক্ষিণাংশে তারপর ছামূদ আরবের উত্তরাংশে উপনিবেশ স্থাপন ও প্রভুত্ব বিস্তার করে। এদের স্বাধীন অস্তিত্ব এখন আর বর্তমান নেই।

আরাবুল আরিবা প্রসঙ্গে বনী আমালিকা ও বনী কাহ্তান সম্প্রদায়দ্বয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বনী আমালিকা ব্যাবিলন হতে আসিরীয় নরপতিগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ক্রমে ইয়েমেন, হিজায, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কতিপয় লোক মিসরে প্রবেশ করে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করে। এই বংশে মিসরের বহু ফিরআওন জন্মগ্রহণ করে। কাহ্তান বংশীয় বনূ জুরহুম আরবের দক্ষিণাংশ হতে হিজাযে প্রবেশ করে বনী আমালিকাকে বিধ্বস্ত ও হিজায হতে বিতাড়িত করে সেখানে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করে।

কাহ্তান ইবনে আবির ইবনে সালিহ ইবনে আরফাসদ ইবনে সাম ইবনে নূহ প্রায় ২২০০ পূর্ব-খৃষ্টাব্দে মেসোপটেমিয়া হতে বহির্গত হয়ে আরবের দক্ষিণাংশ ইয়েমেনে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। মা'রাব হয় তার রাজধানী। তাঁর তেরজন পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে আবদুশ শামস পার্শ্ববর্তী ভূ-ভাগ জয় করে শিবা (বিজয়ী) নাম গ্রহণ করেন এবং তাঁরই নামানুসারে মা'রাব ক্রমে শিবা (Sheba) নামে খ্যাত হয়।

কাহ্তানের অবশিষ্ট দ্বাদশ পুত্র আরবের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র আরবভূমি তাদের করতলগত হয়। মদীনার আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়দ্বয় এই কাহ্তান বংশীয় ছিল।

শিবার পুত্রদের মধ্যে হিমইয়ার ও কুহ্লানের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত হিমইয়ার, তারপর কুহ্লান পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং তাদের বংশধরগণ পঞ্চম খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত ইয়েমেনের রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। এই বংশীয় নরপতিগণ তুব্বা নামে খ্যাত। এই বংশে রানী বিলকীস এবং রাজা যুলকারনায়ন ও রাজা যূ-নাওয়াস জন্মগ্রহণ করেন।

৩৪৩ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট কনস্টান্টাইন ইয়েমেন রাজ-দরবারে এক দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁর চেষ্টায় ইয়েমেন রাজ্যের স্থানে স্থানে গির্জা নির্মিত হয়। ক্রমে নাজরানের বনূ হারিছ ইবনে কা'ব সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং নাজরান খৃষ্টীয় ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অতঃপর ইয়েমেনের শিবা-বংশীয় নরপতি আস-আদ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র যূ-নাওয়াস ইহুদী ধর্মের বিস্তার ও খৃষ্টীয় ধর্মের নিধন সাধন মানসে খৃষ্টানদেরকে অতি নির্মমভাবে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে নিহত করতে আরম্ভ করেন।

খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী রোম-সম্রাট এই ভীষণ অত্যাচার-বার্তা শ্রবণ করে ৫২৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়ার শাসনকর্তাকে এর প্রতিবিধান করতে আদেশ করেন। তদনুযায়ী হারিছ আবিসিনিয়া হতে এক বিরাট সেনা বাহিনীসহ অভিযান পরিচালনা করে যূ-নাওয়াসকে পরাভূত ও নিহত করেন। ইয়েমেন রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং হারিছ শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর ৫৩৭ খৃষ্টাব্দে কা'বা আক্রমণকারী আবরাহা হারিছকে নিহত করে ইয়েমেনের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইয়েমেন, হাযরামাওত, সাহরা ও ওমান পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট খসরু-পারভেয বাজানকে এই ভূভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাজান ৬২৭ খৃষ্টাব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অনতিবিলম্বে এই ভূভাগ মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মুক্তা'রিবা বা বনী ইসমাঈল ঃ ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ) যখন মক্কায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তখন মক্কার চারপাশে কাহ্তান বংশীয় বনূ-জুরহুম সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। হযরত ইসমাঈল (আ) ঐ সম্প্রদায়স্থ মিগাস ইবনে আমর নামীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দুহিতা বিবাহ করে মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন।

কা'বা

হযরত ইবরাহীম (আ) স্নেহের দুলাল প্রাণপ্রতিম পুত্রকে আল্লাহ্র আদেশক্রমে মক্কায় স্থানান্তরিত করেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে ত্যাগ করেননি। সময় সময় এসে পুত্রের খোঁজখবর নিতেন।

কালক্রমে পিতা-পুত্রে মিলিত হয়ে পবিত্র মক্কাভূমিতে জগতের আদি ইবাদতগাহ কা'বাগৃহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তখন কা'বায় ছাদ, কপাট ও চৌকাঠ ছিল না। দৈর্ঘ্যে ৩১ হাত, প্রস্থে ২২ হাত, উচ্চে ৯ হাত পরিমিত ও তার ভিত্তি সমতল ছিল।

কা'বার মুতাওয়াল্লী

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবাত কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁর মাতামহ মিগাস কা'বার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং বহুকাল পর্যন্ত তাঁরই বংশে কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ ন্যস্ত থাকে। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে হিমইয়ার বংশীয় বনূ খুযাআ ইয়েমেন হতে অভিযান করে বনূ জুরহুমকে পরাভূত করে এবং হিজাযের দক্ষিণাংশ ও মক্কার শাসনভার এবং কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ গ্রহণ করেন। পঞ্চম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে ইসমাঈল বংশীয় কুসাই ইবনে কিলাব তৎকালীন বনী খুযাআ বংশীয় কা'বার শেষ মুতাওয়াল্লী হুলায়েলের দুহিতাকে বিবাহ করে কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ ও মক্কার নেতৃত্ব লাভ করেন।

কা'বায় প্রতিমা

বনূ খুযাআ বংশীয় আমর ইবনে লোহী নামক কা'বার জনৈক মুতাওয়াল্লী একবার সিরিয়ায় গিয়েছিল। সেখানে লোকদেরকে প্রতিমাপূজায় লিপ্ত দেখে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কেন এদের পূজা কর? তারা বলল, এদের পূজায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, যুদ্ধে জয়লাভ হয় এবং দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আমর সেখান থেকে কতিপয় প্রতিমা এনে কা'বার চারপাশে প্রতিষ্ঠিত করে। তার অনুকরণে মক্কায় ও ক্রমে আরবের বিভিন্নস্থানে বহু দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ও মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে।

কুরায়শ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর ত্রয়োদশ পূর্বপুরুষ নযর ইবনে কিনানাহ বিচ্ছিন্ন ইসমাঈল বংশধরগণকে একত্র করে এক পরাক্রান্ত জাতির ভিত্তি পত্তন করেন। এ জন্য তাঁকে কুরায়শ অর্থাৎ জাতি-প্রতিষ্ঠাতা নাম প্রদান করা হয় এবং ক্রমে তাঁর বংশধরগণও কুরায়শ নামে অভিহিত হতে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ স্বয়ং, তাঁর পরবর্তী খলীফা চতুষ্টয় এবং তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবা কুরায়শ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

কুসাই

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর পঞ্চম-পূর্বপুরুষ কুসাই ইবনে কিলাব বনূ খুযাআ কা'বার শেষ মুতাওয়াল্লী হুলায়েলের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং হুলায়েলের মৃত্যুর পর তিনি কা'বার মুতাওয়াল্লী পদ ও মক্কা নগরীর কর্তৃত্বভার লাভ করেন। কুসাই আরব ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। নযর ইবনে কিনানাহ যে জাতি গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কুসাই তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও অতুল প্রতিভাবলে তা সুসম্পন্ন করেন। তাঁর নেতৃত্বে কুরায়শ এক পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী জাতিতে পরিণত হয়। তিনি সর্বপ্রথমে মক্কায় দারুন-নাদ্ওয়া নামে এক জাতীয় পরামর্শ-গৃহ (House of council) প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর সভাপতিত্বে এই গৃহে রাজনৈতিক ও সামাজিক গূঢ় বিষয়সমূহ আলোচিত ও নির্ধারিত হতে থাকে। তিনি পুরাতন কা'বা ভূমিসাৎ করে ছাদহীন কা'বা নির্মাণ করেন এবং তীর্থযাত্রীদেরকে আহার ও পানি সরবরাহ করার জন্য 'রিফাদাহ' ও 'সিকায়াহ' নামে দুটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। আহার ও পানির সুব্যবস্থা হওয়ায় দেশ-দেশান্তর হতে বহু লোক কা'বা তীর্থে সমাগত হতে থাকে। কুসাই মক্কার একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। শাসন-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, কর আদায় বিভাগ এবং কা'বার তত্ত্বাবধান তাঁর হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে ৪৮০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

কুসাইর ছয়টি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুদ্দার ও দ্বিতীয় পুত্র আবদে মানাফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুসাই অন্তিমকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুদ্দারকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আবদুদ্দারের মৃত্যুর পর মক্কার নেতৃত্ব ও কা'বার কর্তৃত্ব নিয়ে আবদুদ্দার ও আবদে মানাফের পুত্রগণের মধ্যে গৃহ-বিবাদের সূচনা হয় এবং ক্রমে তা ভীষণ আকার ধারণ করে। উভয় দল অসির সাহায্যে এই সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মক্কার কতিপয় উদারচেতা লোকের মধ্যবর্তিতায় আপোস-নিষ্পত্তি

হয়ে যায়। আবদুদ্দার পুত্রের হাতে নাদ্ওয়াহ্ অর্থাৎ পরামর্শ গৃহের সভাপতিত্ব ও হিজাবাহ অর্থাৎ কা'বার তত্ত্বাবধান এবং আবদে মুনাফের পুত্র আবদে শামসের হাতে সিকায়াহ ও রিফাদাহ অর্থাৎ হজ্জ যাত্রীদের পানি সরবরাহ ও আহারের ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়। আবদে শামস নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁর অধিকার ভ্রাতা হাশিমকে প্রদান করে বৈরাগ্য জীবন বেছে নেন।

হাশিম অত্যন্ত প্রতিভাবান, কার্যক্ষম ও বাণিজ্যপটু লোক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম কুরায়শদের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রথা প্রচলন করেন। তিনি শীত ঋতুতে ইয়েমেনে ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সিরিয়ায় বাণিজ্যের জন্য গমন করতেন। তিনি রোম-সম্রাট হতে ঐ প্রদেশদ্বয়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর অনুকরণে কুরায়শ সম্প্রদায় সিরিয়া ও ইয়েমেনে বহুল পরিমাণে বাণিজ্য করতে আরম্ভ করে।

বনূ হাশিম ও বনূ উমাইয়া

হাশিমের বংশধরগণ বনূ হাশিম ও আবদে শামসের পুত্র উমাইয়ার বংশধরগণ বনূ উমাইয়া নামে খ্যাত। হাশিম বংশে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ উমাইয়া বংশে আবূ সুফিয়ান, আমীর মুআবিয়া, ইয়াযীদ এবং উমাইয়া বংশীয় খলীফাগণ জন্মগ্রহণ করেন।

আবদুল মুত্তালিব

হাশিম একবার বাণিজ্যার্থে সিরিয়ায় যাত্রাকালে কিছু দিন ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনায় অবস্থান করেন এবং সেখানকার বনূ নাজ্জার বংশীয়া সাল্মা নাম্নী এক রূপবতী মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের কিছু দিন পর ৫১০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি গাজ্জানগরে কালগ্রাসে পতিত হন। এই পরিণয় ফলে শায়বা নামে তার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই বালক আট বছর বয়স পর্যন্ত মদীনার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হয়। তারপর তার পিতৃব্য মুত্তালিব তাকে মক্কায় নিয়ে আসেন। মক্কায় এসে পিতৃব্যের নামানুসারে সে আবদুল মুত্তালিব (মুত্তালিবের দাস) নামে অভিহিত হতে লাগল।

হাশিম তার কর্তব্য কার্যগুলি অতি দক্ষতার সাথে নির্বাহ করেন। একবার মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি সিরিয়া হতে প্রচুর গম আমদানী করে মক্কাবাসীর জীবন রক্ষা করেন। তিনি বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা গুণে কুরায়শের হৃদয়রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা মুত্তালিব তাঁর স্থলবর্তী মনোনীত হন। তিনি হাশিমের ন্যায় দানশীলতায় মক্কায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। মক্কাবাসী তাঁর বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'আলফায়েয' আখ্যা প্রদান করেছিল। ৫২০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি ইয়েমেনের অন্তর্গত কাজওয়ানে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুত্তালিব মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শায়বা আবদুল মুত্তালিব নামগ্রহণ করে মক্কার সাধারণতন্ত্রের অধিনায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন।

আবদুল মুত্তালিবের দশ পুত্র এবং ছয় কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হারিছ সর্বজ্যেষ্ঠ ও আবদুল্লাহ্ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন।

আবদুল্লাহ্

আবদুল মুত্তালিব মানত করেছিলেন তাঁর সন্তানগণ তাঁর জীবদ্দশায় সুস্থ দেহে যৌবনে পদার্পণ করলে তিনি এক পুত্রকে দেবতার সম্মুখে কা'বায় বলি দিবেন। কালক্রমে তাঁর এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তিনি পুত্রগণসহ কা'বায় আসলেন এবং লটারির মাধ্যমে তাঁর এক পুত্রকে বলির জন্য মনোনীত করতে কা'বার পুরোহিতকে অনুরোধ করলেন। পুরোহিত লটারি নিক্ষেপ করল। লটারি অষ্টাদশ বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ্কে নির্দেশ করল। আবদুল মুত্তালিব তাকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করত। কিন্তু তাকে বলি না দিয়ে দেবতার বিরাগভাজন হতে সাহসী হলেন না। ইত্যবসরে আবদুল্লাহ্র কনিষ্ঠা সহোদরা ভগিনী ওমায়মা এই নিদারুণ সংবাদ শুনে অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে পিতার সমীপবর্তী হলেন এবং এই ভীষণ কার্যের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর

কাতর ক্রন্দন সহ্য করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে পুত্রের পরিবর্তে দশটি উষ্ট্র বলি দেয়ার জন্য পুরোহিতকে পুনরায় লটারি নিক্ষেপ করতে বললেন। কিন্তু এবারও আবদুল্লাহ্‌র নামে লটারি উঠল। পুনরায় কুড়িটি উষ্ট্রের উপর লটারি নিক্ষেপ করা হল। তখনো আবদুল্লাহ্‌র নামে লটারি উঠল। ক্রমে উষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। অবশেষে একশত উষ্ট্রের সময় আবদুল্লাহ্‌র স্থলে উষ্ট্রের নামে লটারি উঠল। আবদুল মুত্তালিব একশত উষ্ট্র বলি দিয়ে প্রাণপ্রতিম পুত্রের প্রাণ রক্ষা করলেন।[১]

আবদুল্লাহ বিবাহ

কুসাইর ভ্রাতা যুহরা বংশীয় ওয়াহ্‌বের আমিনা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী, অশেষ গুণবতী কন্যা ছিল। আবদুল মুত্তালিব মহাসমারোহে শুভদিনে শুভক্ষণে আমিনাকে আবদুল্লাহ্‌র সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন।

আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু

আবদুল্লাহ্ তার পিতামহ হাশিমের ন্যায় সুখে দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে পারলেন না। তিন দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করলেন। সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পথে পীড়িত হয়ে মদীনায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন এবং পিতার মাতুলালয়ে সমাহিত হলেন। আমিনা গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে পুত্র পিতৃহারা হলেন।

মহানবী ﷺ-এর বংশ-পরিচয়

মহানবী ﷺ-এর বংশধারা সমগ্র পৃথিবীর বংশাবলী হতে অধিক সম্ভ্রান্ত ও উত্তম। দালায়েলে আবূ নাঈমে মারফূ' রিওয়ায়াত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) বলেছেন, 'আমি পৃথিবীর উদয়াচল হতে অস্তাচল পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি, কিন্তু বনূ হাশিম অপেক্ষা উত্তম কোন বংশ-পরম্পরা দেখিনি। (মাওয়াহিব)

বস্তুত এটা এমন এক বাস্তব সত্য যে, মক্কার কাফিরগণ এবং তাঁর পরম শত্রুরাও তা অস্বীকার করতে পারেনি। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) কাফির থাকা অবস্থায় রোম-সম্রাটের সম্মুখে তা স্বীকার করেছিলেন। অথচ তিনি তখন কামনা করতেন যে, সুযোগ পেলে মহানবী ﷺ-এর প্রতি কলংক আরোপ করবেন।

পিতার দিক হতে মহানবী ﷺ-এর বংশ-পরম্পরা এরূপ

মুহাম্মদ ﷺ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবন কুসাই ইবনে কিলাব (হাকীম) ইবনে মুররাহ্ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহ্‌র ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযায়মাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুযার ইবনে নিযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান। এ পর্যন্ত মহানবী ﷺ থেকে তাঁর বংশধারা বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত রয়েছে। স্বীয় বংশধারা বর্ণনাকালে তিনি বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈলের অধঃ পুরুষ থেকে কিনানাহকে নির্বাচন করেছেন। কিনানার সন্তান থেকে কুরায়শকে, কুরায়শ থেকে বনূ হাশিমকে আর বনূ হাশিম থেকে আমাকে বাছাই করেছেন। সুতরাং আমি উত্তম পূর্বপুরুষের সর্বোত্তম সন্তান।

ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম অপর এক সূত্রক্রমে মহানবী ﷺ-এর বংশধারা আদনান থেকে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত সম্পৃক্ত করেছেন। যা নিম্নরূপ—

আদনান ইবনে উদ্ ইবনে মুকাব্বিম ইবনে নাহূর ইবনে তাইরাহ ইবনে ইয়া'রাব ইবনে ইয়াশ্‌জুব ইবনে নাবিত ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম খলীলুর রহমান ইবনে তারুহ (যে আযর নামে খ্যাত) ইবনে নাহূর ইবনে সারুগ ইবনে রাউ' ইবনে কালিখ্ ইবনে আইবার ইবনে শালিখ ইবনে আরফাখশায ইবনে সাম ইবনে নূহ ইবনে লামক ইবনে মাত্তুশালিখ ইবনে উখ্‌নুখ (যিনি ইদরীস নবী (আ) নামে খ্যাত) ইবনে ইয়ারূদ ইবনে মুহ্‌লীল ইবনে কাইনান ইবনে ইয়ানিশ ইবনে শীছ ইবনে আদম (আ)।

মহানবী ﷺ-এর মাতৃকুলীয় বংশধারা

মুহাম্মদ ইবনে আমিনা বিনতে ওয়াহব ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব (হাকীম)। ষষ্ঠ পুরুষ কিলাব তথা হাকীমের মধ্যেই মহানবীর মাতৃ ও পিতৃ উভয় কুলীয় বংশধারা এক হয়ে যায়। আর এরা সকলেই ইবরাহীম খালীলুল্লাহর তনয় ইসমাঈল যাবীহুল্লাহর উত্তর-পুরুষ।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রাক্কালে প্রকাশিত মহানবী ﷺ-এর বরকতসমূহ

মহানবী ﷺ-এর মুহতারামা জননী বিবি আমিনা বলেন, যখন মহানবী ﷺ তাঁর গর্ভে স্থিতি লাভ করলেন, তখন তাঁকে স্বপ্নে সুসংবাদ দান করা হয় যে, "তোমার গর্ভে যে সন্তানটি রয়েছে তিনি এই উম্মতের সরদার। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হবেন, তখন তুমি এরূপ প্রার্থনা করবে ঃ আমি তাঁকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম। আর তাঁর নাম রাখবে মুহাম্মদ ﷺ।" -সীরাতে ইবনে হিশাম

বিবি আমিনা বলেন, "মুহাম্মদ আমার গর্ভে আগমন করার পর আমি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখতে পেলাম। যার ফলে বসরা নগরী ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমার দৃষ্টিগোচর হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

বিবি আমিনা বলেন, "আমি কোন নারীকে মুহাম্মদ অপেক্ষা হাল্কা ও ক্লেশহীন গর্ভ ধারণ করতে দেখিনি। সাধারণত নারীদের গর্ভাবস্থায় যে বমি বমি ভাব বা অবসাদ অবস্থা ইত্যাদি হয়ে থাকে অনুরূপ কিছুই আমার অনুভূত হয়নি। এছাড়া আরো বহু ঘটনা রয়েছে যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

মহানবী ﷺ-এর শুভজন্ম

অধিকাংশ আলিমের মতে 'আসহাবে ফীল'-এর বছর মহানবী ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ আসহাবে ফীল যে বছর কা'বাঘর আক্রমণ করেছিল, সেই বছরের রবীউল আওয়াল মাসে সোমবার মহানবী ﷺ-এর শুভজন্ম হয়। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে আবাবীল নামক কতিপয় ক্ষুদ্র পাখীর মাধ্যমে পরাভূত করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা ফীল-এ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আসহাবে ফীল-এর ঘটনা ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল ঘটেছিল। এতে বুঝা যায়, মহানবী ﷺ-এর জন্ম হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের ৫৭১ বছর পরে হয়েছিল।

হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিখেছেন ঃ হযরত আদম (আ) এবং হযরত নূহ (আ)-এর মধ্যে এক হাজার দুইশত বছরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত নূহ (আ) হতে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত এক হাজার একশত বিয়াল্লিশ বছর, হযরত ইবরাহীম (আ) হতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত পাঁচশত পঁয়ষট্টি বছর, হযরত মূসা (আ) হতে হযরত দাউদ (আ) পর্যন্ত পাঁচশত উনসত্তর বছর, হযরত দাউদ (আ) হতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এক হাজার তিনশত ছাপ্পান্ন বছর এবং হযরত ঈসা (আ) হতে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাঝখানে ছয়শত বছর অতিবাহিত হয়েছে।

এই হিসাবে হযরত আদম (আ) হতে মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হচ্ছে পাঁচ হাজার চারশত বত্রিশ বছর। আর বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত আদম (আ)-এর বয়স ছিল নয়শত ষাট বছর। এ হিসেবে হযরত আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের প্রায় ৬৩৯২ বছর পরে অর্থাৎ সপ্তম সহস্রাব্দে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এই পৃথিবীতে শুভাগমন করেছিলেন। -তারীখে ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হতে-প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০

মহানবী ﷺ-এর জন্মের সময় পারস্য রাজ-প্রাসাদের ১৪টি গুম্বজ ভূমিকম্পে ধসে পড়ে। পারস্যের শ্বেত উপসাগর সহসাই শুকিয়ে যায়। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিজে নিজেই নিভে যায়- যা বিগত এক হাজার বছর যাবত মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হয়নি। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৫)

বস্তুত এ ছিল অগ্নি-উপাসনা ও যাবতীয় গোমরাহীর পরিসমাপ্তির ঘোষণা এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, মহানবীর ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় তাঁর স্নেহময়ী জননীর উদর হতে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয়, যার আলোতে উদয়াচল ও অস্তাচল আলোকিত হয়ে উঠে। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, মহানবী ﷺ যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন তিনি উভয় হাতের উপর ভর দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে নিলেন এবং আকাশের দিকে তাকালেন। (মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া)

আবদুল্লাহ্‌র ইন্‌তিকাল

মহানবী ﷺ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তাঁর সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্‌কে তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব মদীনা প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ্ তাঁকে গর্ভাবস্থায় রেখে মদীনা চলে যান। ঘটনাক্রমে সেখানেই তাঁর ইন্‌তিকাল হয়ে যায়। এ ভাবেই ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই পিতৃছায়া তাঁর মাথার উপর থেকে অপসৃত হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৭)

দুগ্ধপান ও শৈশব

শিশু মুহাম্মদ ﷺ কে প্রথমে তাঁর শ্রদ্ধেয়া জননী এবং এরপর আবূ লাহাবের দাসী ছুওয়ায়বা স্তন্যদান করেন। তারপর হালীমা সা'দিয়া এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তারা দুধপান করাবার জন্য নিজ সন্তানদেরকে আশে-পাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিত। এতে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করত এবং তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষাও আয়ত্ত করে নিত। আর এ কারণেই গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষ্য শিশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়শই শহরে গমন করত।

হালীমা সা'দিয়া (রা) বলেন, "আমি দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে বানূ সা'দ গোত্রের অন্য মহিলাদের সাথে তায়েফ হতে মক্কায় গমন করি। সে বছর দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। আমার কোলেও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল। কিন্তু (দারিদ্র্য ও উপবাসের দরুন) তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ আমার স্তনে ছিল না। সারা রাত সে ক্ষুধায় কাতরাত আর আমরা তার জন্য বসে রাত কাটাতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল। কিন্তু তার স্তনেও তখন দুধ ছিল না।

মক্কার সফরে আমি যে লম্বা কানওয়ালা উটনীর উপর সওয়ার ছিলাম, তা দুর্বলতার দরুন সকলের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে পারছিল না। এজন্য সাথীরা বিরক্তি বোধ করছিল। শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে এই সফর সমাপ্ত হল।"

মক্কা পৌছার পর যে মহিলাই শিশু মুহাম্মদ ﷺ কে দেখত এবং শুনত যে, তিনি ইয়াতীম, তখন কেউ তাকে গ্রহণ করতে রাযী হত না। (কারণ, তার পক্ষ হতে যথেষ্ট পুরস্কার ও সম্মানী পাওয়ার আশা ছিল কম)। এদিকে দুধের স্বল্পতা হালীমার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। কেননা, দুধের স্বল্পতা দেখে কেউ তাকে শিশু দিতে সম্মত হচ্ছিল না।

হালীমা বলেন, "আমি আমার স্বামীকে বললাম, শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এই ইয়াতীম শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া বরং ভাল। আমার স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।"

আল্লাহ্‌র রহমতে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল এবং দো-জাহানের সরদার শিশু মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কোলে চলে এলেন। তাঁবুতে ফিরে দুধ পান করাতে বসার সাথে সাথে বরকত ও কল্যাণের অজস্র ধারা প্রকাশ পেতে লাগল। স্তনে এত অধিক পরিমাণে দুধ নেমে এল যে, শিশু মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর দুধ-ভাই উভয়ে তৃপ্তি সহকারে পান করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। হালীমা বলেন, "আমার স্বামী উটনীর দুধ দোহন করে আনলেন এবং আমরা সকলে খুব পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলাম। আর সারা রাত আরামে কাটালাম। বহুদিন পর এটাই ছিল প্রথম রজনী, যাতে আমরা শান্তিতে মনভরে ঘুমাতে পেরেছিলাম। তখন আমার স্বামী আমাকে বললেন, 'হালীমা! তুমি অত্যন্ত মুবারক শিশু ঘরে এনেছ।' আমি বললাম হাঁ, আমারও তাই ধারণা। মুহাম্মদ অতিশয় মুবারক শিশু। এরপর আমরা মক্কা হতে রওয়ানা হলাম। আমি শিশু মুহাম্মদকে কোলে নিয়ে সেই দুর্বল কৃশকায় উটনীর উপর আরোহণ করলাম।

আল্লাহ্‌র কি মহিমা! এখন সেই দুর্বল বাহনটি এত দ্রুতগতিতে চলতে লাগল যে, অন্য কারো বাহন তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হল না। আমার সহযাত্রী মহিলাগণ বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, 'এটি কি সেই বাহন, যাতে আরোহণ করে তুমি এসেছিলে?'

যা হোক, এ ভাবে আমরা বাড়ী পৌঁছে গেলাম। যেখানে তখন চরম দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। দুগ্ধবতী সমস্ত জীব দুগ্ধশূন্য ছিল।

কিন্তু আমি গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার সব ক'টি বকরীর স্তন দুধে ভরপুর হয়ে উঠল। এখন হতে আমার বকরীগুলো প্রত্যহ দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ঘরে ফিরতে লাগল। অন্যরা তাদের পশুরস্তন হতে এক ফোঁটা দুধও সংগ্রহ করতে পারছিল না। একই জায়গায় চরা সত্ত্বেও তাদের পশুগুলি দুগ্ধশূন্য আর আমার বকরীগুলো দুধে ভরপুর হয়ে বাড়ী ফিরত। এমনিভাবে আমরা সর্বক্ষণ শিশু মুহাম্মদের বরকতসমূহ প্রত্যক্ষ করছিলাম। আর এভাবেই দুটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং আমি শিশু মুহাম্মদকে দুধ ছাড়িয়ে দিলাম। (আস-সালিহাত)

মহানবী ﷺ-এর প্রথম বাক্য

হযরত হালীমা বর্ণনা করেন ঃ যে সময় আমি শিশু মুহাম্মদকে দুধ ছাড়ালাম, তখন তাঁর পবিত্র যবান হতে এই ক'টি কথা উচ্চারিত হয়েছিল—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا وَّسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً ـ

অর্থ : এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম বাক্য। [বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রা)] হতে বর্ণনা করেছেন।
(খাসাইসে কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫)

শিশু মুহাম্মদ ﷺ-এর দৈহিক ক্রমবিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় ছিল দ্রুততর। এমনকি দুই বছর বয়সেই তাঁকে বেশ বড়সড় দেখাচ্ছিল। এখন আমরা প্রথা অনুযায়ী তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাঁর বরকতসমূহের কারণে তাঁকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। ঘটনাক্রমে সেই বছর মক্কায় প্লেগ-মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। আমরা মহামারীর অজুহাতে তাঁকে ফেরত নিয়ে আসলাম। শিশু মুহাম্মদ আমাদের কাছেই রয়ে গেলেন। তিনি ঘরের বাইরে যেতেন এবং শিশুদেরকে খেলাধুলা করতে দেখতেন। কিন্তু নিজে কখনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতেন না। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার অপর ভাইকে যে সারা দিন দেখতে পাই না, সে কোথায় থাকে?' আমি বললাম, সে বকরী চরাতে যায়। তিনি বললেন, 'আমাকেও তার সাথে পাঠাবেন।' এরপর হতে তিনি তার দুধ-ভাই (আবদুল্লাহ্)-এর সাথে বকরী চরাতে যেতেন। (খাসাইস, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫)

একদিন তারা চারণভূমিতে পশু চরাচ্ছিলেন, এমন সময় আবদুল্লাহ্ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে গৃহে এসে তার পিতাকে বললেন, 'আমার কুরায়শী ভাইকে দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক শায়িত করে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে। আমি তাদেরকে এই অবস্থায় ফেলে এসেছি।' আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘাবড়িয়ে মাঠের দিকে দৌড়ালাম। দেখতে পেলাম, মুহাম্মদ বসে রয়েছেন। কিন্তু তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাছা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, 'দু'জন সাদা কাপড় পরিহিত লোক এসে আমাকে ধরে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট চিরে তার মধ্য হতে কি যেন খুঁজে বের করল। আমি জানি না, তা কি ছিল।' আমরা তাঁকে ঘরে নিয়ে এলাম এবং পরে জনৈক গণকের কাছে নিয়ে গেলাম। গণক তাঁকে দেখা মাত্র নিজ আসন হতে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে নিজের বুকের উপর তুলে নিল আর চিৎকার করতে লাগল, "হে আরবের জনগণ! শীঘ্র এস। যে মহাবিপদ অচিরেই তোমাদের উপর ঘনায়মান, তাকে প্রতিহত কর। যার উপায় এই যে, তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা করে ফেল এবং আমাকেও তাঁর সাথে হত্যা কর। যদি তোমরা তাকে জীবিত ছেড়ে দাও, তাহলে স্মরণ রেখ, সে তোমাদের দীনকে মিটিয়ে দিবে এবং এমন একটি দীনের দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করবে, যার কথা তোমরা আজ পর্যন্ত কখনো শ্রবণ করনি।"

গণকের কথা শুনে হালীমা ভয়ে শিউরে উঠলেন এবং তাঁকে এ হতভাগার হাত হতে ছিনিয়ে এনে বললেন ঃ "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তোমার নিজের মস্তিষ্কেরই চিকিৎসা করান উচিত।" এই বলে হালীমা তাঁকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঘটনাটি তাকে ঘাবড়ে দিল। শিশু মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর জননীর নিকট ফিরিয়ে দিতে তিনি মনের গভীর থেকে তাড়া অনুভব করলেন। কেননা, তিনি তাঁর যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আশংকা বোধ করছিলেন। (খাসাইস)

মক্কায় পৌছে যখন শিশু মুহাম্মদ ﷺ-কে তাঁর জননীর নিকট সোপর্দ করলেন, তখন তিনি হালীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আগ্রহের সাথে নিয়ে গিয়ে এত শীঘ্র ফিরিয়ে আনার কারণ কি?" অনেক পীড়াপীড়ির পর হযরত হালীমাকে তাঁর নিকট সমুদয় ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করতে হল। তিনি শুনে বললেন, "অবশ্যই আমার ছেলের একটি বিশিষ্ট মহিমা রয়েছে।"তারপর তিনি গর্ভাবস্থা ও ভূমিষ্ঠকালে সংঘটিত সকল বিস্ময়কর ঘটনা শুনালেন।
(ইবনে হিশাম, পৃঃ ৯)

আমিনার ইন্তিকাল

শিশু মুহাম্মদ ﷺ-এর বয়স যখন চার বা ছয়, তখন মদীনা হতে প্রত্যাগমনকালে আবওয়া নামক স্থানে তাঁর জননীও পৃথিবী হতে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১০)

আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকাল

পিতা-মাতার পর তিনি তাঁর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হন। যখন তাঁর বয়স আট বছর দু' মাস দশ দিন, তখন আবদুল মুত্তালিবও দুনিয়া হতে বিদায় হলেন।

বালক মুহাম্মদ ﷺ-এর সিরিয়া ভ্রমণ

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবূ তালিব তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর বারো বছর দুই মাস দশ দিন বয়সে আবূ তালিব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করলেন। বালক মুহাম্মদ ﷺ-কে সাথে নিয়ে তিনি সিরিয়ার পথে যাত্রা করলেন। পথে তায়মা নামক স্থানে যাত্রা-বিরতি করলেন।

ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী

তায়মা অবস্থানকালে একদিন বুহায়রা নামক এক ইহুদী পণ্ডিত তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাকে দেখতে পেয়ে আবূ তালিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার সাথে যে বালকটি রয়েছে সে কে? আবূ তালিব বললেন, ছেলেটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। বুহায়রা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তাকে স্নেহ করেন এবং তার নিরাপত্তা কামনা করেন? আবূ তালিব বললেন, অবশ্যই। তখন বুহায়রা খোদার নামে শপথ করে বললেন, "আপনি যদি ছেলেটিকে সিরিয়া নিয়ে যান, তবে ইহুদীরা তাকে হত্যা করে ফেলবে। কারণ, ইনি সেই নবী যিনি ইহুদী ধর্মকে মিটিয়ে দিবেন। আমি আসমানী কিতাবে বর্ণিত আখেরী নবী সম্পর্কিত গুণাবলীগুলো তার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

বুহায়রা তাওরাতের অতি বড় পন্ডিত ছিলেন এবং তাওরাত কিতাবে মহানবী ﷺ-এর আকার-আকৃতির পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান রয়েছে। তাই তিনি বালক মুহাম্মদ ﷺ-কে দেখা মাত্রই চিনতে পেরেছিলেন যে, ইনিই সেই শেষ নবী যিনি তাওরাতকে রহিত করবেন এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। সুতরাং বুহায়রার কথায় আবূ তালিবের মনে ভীতির সঞ্চার হল। তিনি বালক মুহাম্মদ ﷺ-কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।
(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১০)

ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার সিরিয়া ভ্রমণ

সেই সময় মক্কায় খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ নামে একজন ধনী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিধবা মহিলা ছিলেন। তিনি যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও বিশ্বস্ত বলে মনে করতেন, তাদের হাতে নিজের বাণিজ্যসম্ভার সমর্পণ করে বলতেন যে, এগুলো অমুক জায়গায় নিয়ে বিক্রয় করে এস। তোমাদেরকে এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হবে।

বাল্যকালেই মহানবী ﷺ সারা মক্কানগরীতে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রতি প্রতিটি লোক মুগ্ধ ছিল। তিনি আল-আমীন বা অতি বিশ্বাসী উপাধিতে খ্যাত হন। তাঁর এই সুখ্যাতি ও মহত্ত্বের কথা খাদীজার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্বভার মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অর্পণ করে তাঁর দ্বারা উপকৃত হতে ইচ্ছা করলেন।

তিনি নবী ﷺ-এর নিকট বলে পাঠালেন যে, আপনি যদি আমার বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়ায় নিয়ে যান, তাহলে আমি আমার একটি গোলাম আপনার সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করে দেব এবং অন্যান্য লোককে যে লভ্যাংশ দেয়া হয়, আপনাকে তার চেয়ে অধিক লভ্যাংশ প্রদান করব। নবী ﷺ সাথে সাথে খাদীজার এই প্রস্তাবে রাযী হলেন এবং এই দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। খাদীজার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে ষোলই যিলহজ্জ সিরিয়ার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করলেন। সমুদয় পণ্য অতি বুদ্ধিমত্তার সাথে প্রচুর মুনাফায় সেখানে বিক্রি করলেন এবং সিরিয়া হতে অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে এলেন। মক্কায় পৌঁছে আনীত পণ্য খাদীজাকে বুঝিয়ে দিলেন। খাদীজা সেগুলো এখানে বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করলেন।

সিরিয়ার পথে নবী ﷺ এক স্থানে যাত্রাবিরতি করেছিলেন। তখন নাস্তূরা নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত তাঁকে দেখতে পান। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে শেষ নবীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, তা হুবহু নবী ﷺ-এর মধ্যে দেখতে পেয়ে তিনি তাকে শেষ নবী বলে চিনে ফেলেন। ইহুদী পণ্ডিত মায়সারাকে পূর্ব থেকেই চিনতেন। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার সাথের এই লোকটি কে? উত্তরে মায়সারা বলল ঃ ইনি পবিত্র মক্কার অধিবাসী কুরায়শ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত যুবক। নাস্তূরা বললেন, "এই যুবকটি কালে নবী হবেন।"

(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১২)

হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ

হযরত খাদীজা ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। নবী ﷺ-এর শিষ্টাচার ও বিস্ময়কর চরিত্র-মাধুর্য প্রত্যক্ষ করে তাঁর অন্তরে মহানবীর প্রতি এক অকৃত্রিম ভালবাসা জন্ম নিয়েছিল। ফলে তিনি মনস্থ করলেন যে, নবী ﷺ সম্মত হলে তিনি তাঁরই সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন।

নবী ﷺ-এর বয়স যখন একুশ বছর, তখন হযরত খাদীজার সাথে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। কোন কোন বর্ণনায় পঁয়তাল্লিশ বছর (সীরাতে মোগলতাঈ)। ঐ সময় নবী ﷺ-এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা ঃ ২১, ২৯, ৩০, ৩৭ (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১৪)। সীরাতে মুস্তাফা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবাহের সময় নবী ﷺ-এর বয়স ২৫ বছর ছিল বলে বর্ণিত আছে।

বিবাহ অনুষ্ঠানে আবূ তালিব এবং বনূ হাশিম ও মুযার গোত্রের নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবূ তালিব বিবাহের খোতবা পাঠ করেন। এ খোতবায় আবূ তালিব নবী ﷺ সম্পর্কে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তার অনুবাদ প্রদত্ত হল—

"ইনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ﷺ ইবনে আবদুল্লাহ্। যিনি ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম হলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরুন তাকে যার মুকাবিলায়ই রাখা হবে, তিনি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হবেন। কেননা, ধনসম্পদ এক বিলীয়মান মরীচিকা ও প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু। আর এই মুহাম্মদ ﷺ যাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের খবর আপনাদের সবারই জানা। তিনি খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাচ্ছেন। তাঁর সমুদয় মহরানা মুআজ্জাল (নগদ দেয়) হোক কিংবা মুয়াজ্জল (বিলম্বে দেয়), আমার সম্পদ হতে আদায় করা হবে। আল্লাহ্র কসম, অতঃপর তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত ও নন্দিত হবেন।"

এখানে স্মর্তব্য যে, অধিকাংশের মতে নবী ﷺ-এর বয়স যখন ২৫ বছর এবং বাহ্যত তখনো তাঁকে নুবুওয়াত দান করা হয়নি, ঠিক সেই সময়ে তাঁর সম্পর্কে আবূ তালিবের এই বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছিল। যদিও আবূ তালিব তার সেই পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল ছিল, (যার ধ্বংস সাধনে নবী ﷺ-এর গোটা জীবন উৎসর্গিত ছিল) তবু এ কথা সত্য যে, প্রকৃত সত্যকে আবূ তালিব লুকিয়ে রাখতে পারেননি।

মোটকথা, হযরত খাদীজার সাথে নবী ﷺ-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তিনি দীর্ঘ ২৪ বছর তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকেন।

হযরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তান

হযরত খাদীজার গর্ভে নবী ﷺ-এর দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের নাম ঃ কাসিম ও তাহির। কাসিমের নামানুসারে নবী ﷺ 'আবুল কাসিম' ডাকনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত তাহিরের নাম আবদুল্লাহ্ বলা হয়েছে। যাদুল মাআদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাঁর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ্। তৈয়ব ও তাহির এ দুটি ছিল তাঁর উপাধি।

কন্যা চারজনের নাম : হযরত ফাতিমা, যয়নব, রুকায়্যা ও উম্মে কুলছুম। হাকিম ইবনে কায়্যিম যাদুল মাআদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ হযরত যয়নবকে, কেউ হযরত রুকায়্যাকে, কেউ হযরত উম্মে কুলছুমকে সর্বজ্যেষ্ঠা বলে মত প্রকাশ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রুকায়্যা (রা) সর্বজ্যেষ্ঠা এবং হযরত উম্মে কুলছুম (রা) সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন। (যাদুল মাআদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫)

নবী ﷺ-এর সন্তানদের সকলেই হযরত খাদীজার গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য তাঁর তৃতীয় পুত্র হযরত ইবরাহীমই শুধু হযরত মারিয়্যা কিবতিয়্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পুত্রদের সকলেই বাল্য বয়সে ওফাত পান। অবশ্য হযরত কাসিম (রা) সম্পর্কে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে পারার মতো বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

মহানবী ﷺ-এর কন্যাগণ

হযরত ফাতিমা সর্বসম্মতিক্রমে নবী ﷺ-এর কন্যাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি তার সম্পর্কে বলেছেন, ফাতিমা জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী। পনের বছর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রা)-এর সাথে তার পরিণয় হয়। বিবাহে মহরানা নির্ধারিত হয়েছিল চারিশত আশি দিরহাম। হযরত ফাতিমাকে দেয়া যৌতুক ছিল একটি চাদর, খেজুর গাছের ছাল ভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাটিয়া, একটি মোশক, দুটি মাটির কলস। দুটি সোরাহী এবং একটি আটার চাক্কী। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ)

চাক্কী পেষণসহ ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করতেন।

নবী ﷺ-এর কোন পুত্র সন্তান জীবিত ছিলেন না। শুধু কন্যা সন্তানগণের মাধ্যমেই দুনিয়াতে তাঁর বংশ বিস্তার লাভ করেছে। কন্যা সন্তানগণের মধ্যেও কেবল হযরত ফাতিমা (রা)-এর সন্তানগণই জীবিত ছিলেন। অন্যান্য কন্যাগণের মধ্যে কারো কারো কোন সন্তানই হয়নি। আর কারো কারো সন্তান হলেও জীবিত থাকেননি।

হযরত যয়নবের বিবাহ হয়েছিল আবুল আস ইবনে রবী'র সাথে। তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। উমামা নাম্নী তাদের একটি কন্যা ছিল। হযরত ফাতিমার ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) তাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না।

হযরত রুকায়্যা ছিলেন হযরত উছমান (রা)-এর সহধর্মিণী। তাঁরা এক সাথেই হাবশায় হিজরত করেছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ চলাকালে নিঃসন্তান অবস্থায় তাঁর ইন্তিকাল হয়। তারপর তাঁর তৃতীয় ভগিনী হযরত উম্মে কুলছুমকেও নবী ﷺ হযরত উছমানের সাথে বিবাহ দেন। এ কারণে হযরত উছমান 'যিন-নূরায়ন' বা দুই নূরের অধিকারী বলে অভিহিত হতেন। নবম হিজরীতে হযরত উম্মে কুলছুমও পরলোক গমন করেন। তখন নবী ﷺ বলেন, "যদি আমার তৃতীয় কোন কন্যা থাকত, তাহলে তাকেও আমি উছমানের সাথে বিবাহ দিতাম।" (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ১৬-১৭)

মহানবী ﷺ-এর অন্যান্য পত্নীগণ

নবী ﷺ হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা পরলোক গমন করেন। মহানবী ﷺ-এর বয়স উনপঞ্চাশ বছর। তখন আরো কতিপয় পুণ্যবতী মহিলা তাঁর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন। তাঁদের পবিত্র নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এরূপ—

২) হযরত সাওদা বিনতে যামআহ (রা), ৩) হযরত আয়েশা (রা), ৪) হযরত হাফসা (রা), ৫) হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা), ৬) হযরত উম্মে সালামা (রা), ৭) হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা), ৮) হযরত জুওয়ায়রিয়াহ (রা), ৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রা), ১০) হযরত সাফিয়্যা (রা), ১১) হযরত মায়মুনা (রা)। মোট এগার জন। এদের দু'জন নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেছিলেন এবং নয়জন তাঁর ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন। আর এটা শুধু নবী ﷺ-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল বলে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। উম্মতের জন্য একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা আদৌ জায়েয নয়।

হযরত সাওদা (রা) : ইনি প্রথমে সাকরান ইবনে আমরের সহধর্মিণী ছিলেন। পরে নবী ﷺ-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। নবী ﷺ-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হবার সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। হিজরী প্রথম সনে নয় বছর বয়সে তাঁর রুখসাতী সম্পন্ন হয়েছিল। নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। তাঁর সম্পর্কে মহানবী ﷺ-এর বড় বড় সাহাবীগণ বলতেন, "যখন কোন কঠিন সমস্যার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হত, তখন আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকট তার সমাধান পেতাম।" তাই প্রবীণ সাহাবীদের অনেকেই তাঁর শিষ্য ছিলেন।

হযরত হাফসা (রা) : হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কন্যা। প্রথমে উনায়স ইবনে হুযায়ফার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে নবী ﷺ তাকে বিবাহ করেন।

হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা) : উম্মুল মাসাকীন (মিসকীনদের জননী) উপাধিতে তিনি খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তুফায়ল ইবনে হারিছের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তালাক দিলে তার ভাই উবায়দার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের এক মাস পূর্বে নবী ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৪৯)

হযরত উম্মে হাবীবা (রা) : হযরত আবূ সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহশের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। উবায়দুল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁর সন্তানাদিও ছিল। স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে পৌঁছে উবায়দুল্লাহ্ খৃস্টান হয়ে যায় এবং উম্মে হাবীবা স্বীয় ঈমান-আকীদার উপর অটল থাকেন। এই সময় নবী ﷺ হাবশার বাদশাহ নাজাশীকে চিঠি লিখে পাঠালেন যে, তিনি যেন তাঁর পক্ষ থেকে উম্মে হাবীবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। সুতরাং নাজাশী বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন এবং নিজেই এই বিবাহের অভিভাবক হয়ে মহরানার চারশত দীনার পরিশোধ করে দেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা) : তাঁর নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে আবূ সালামার বিবাহাধীনে ছিলেন। আবূ সালামার পক্ষ হতে তাঁর সন্তানাদিও ছিল। হিজরী চতুর্থ সনের জুমাদাছ ছানী মাসে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে হিজরী তৃতীয় সনে নবী ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৫৫)

কথিত আছে, হযরত উম্মে সালামা নবী ﷺ-এর অন্যান্য মহীয়সী পত্নীগণের পরে ইন্তিকাল করেন।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) : তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর ফুফাত বোন। নবী ﷺ তাঁকে যায়দ ইবনে হারিছার সাথে বিবাহ দেন। যায়দ ছিলেন নবী ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম। তিনি তাকে আপন পোষ্য পুত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। তবু যেহেতু তাঁর গায়ে একবার দাসত্বের ছোঁয়া লেগেছিল, তাই হযরত যায়নাব (রা) এই সম্বন্ধে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী ﷺ-এর আদেশ পালনার্থে সম্মত হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর কাল তিনি হযরত যায়দের বিবাহাধীনে ছিলেন। কিন্তু মানসিকভাবে মেনে নিতে না পারায় তাদের মধ্যে সব সময় মনোমালিন্য লেগেই থাকত। এমনকি হযরত যায়দ নবী ﷺ-এর নিকট এসে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে লাগলেন। নবী ﷺ তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিরত রাখলেন। কিন্তু পরে যখ

কোন কিছুতেই বনিবনা সম্ভব হল না, তখন হযরত যায়দ (রা) বাধ্য হয়ে তাঁকে তালাক প্রদান করলেন। এরপর হযরত যায়নাব (রা)-এর মনোবেদনা লাঘব করার জন্য নবী ﷺ নিজেই তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তৎকালীন আরবে পালক পুত্রকে নিজের ঔরসজাত সন্তানের সমতুল্য বিবেচনা করা হত বিধায় সাধারণ জনমতের প্রতি লক্ষ্য করে নবী ﷺ তাকে বিবাহ করতে বিরত ছিলেন। পাছে লোকেরা হয়ত এরূপ সমালোচনা করতে শুরু করবে যে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁর আপন পুত্রবধূকে বিবাহ করেছেন। কিন্তু এটা ছিল অন্ধকার যুগের একটি কুসংস্কার মাত্র এবং একে সমূলে উৎখাত করা ছিল ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব। সুতরাং কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "আপনি কি লোকদেরকে ভয় করছেন? অথচ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত।"

(সূরা আহযাব : আয়াত ৩৭)

সুতরাং হিজরী চতুর্থ সনে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে তৃতীয় অথবা পঞ্চম সনে আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী ﷺ স্বয়ং তাকে বিবাহ করেন। উদ্দেশ্য ছিল যেন মানুষ বুঝতে পারে পালক পুত্র কখনো ঔরসজাত পুত্রের সমান নয়। পালক পুত্রের স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পালক পিতার জন্য হারাম থাকে না।

(ফাতহুল বারী, তাফসীরে সূরা আহযাব)

হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা) : হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর। এটা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একদিকে একজন নবীর কন্যা এবং অপরদিকে একজন নবীর সহধর্মিণী ছিলেন। প্রথমে কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের বিবাহাধীনে ছিলেন। তার মৃত্যুর পর নবী ﷺ তাকে বিবাহ করেন।

হযরত জুওয়ায়রিয়া বিনতে হারিছ খুযাইয়া (রা) : বণূ মুস্তালিক গোত্রের সরদার হারিছের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধবন্দী হয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আনীত হন। পরে তাঁর বিবাহাধীনে আসেন। ফলে তার গোত্রের সকল লোক মুক্তিলাভ করে এবং তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারিছ (রা) : প্রথমে মাসউদ ইবনে উমরের বিবাহাধীনে ছিলেন। তিনি তালাক দিলে আবূ রিহামের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। আবূ রিহামের মৃত্যুর পর নবী ﷺ-এর বিবাহে আসেন।

(সীরাতে মোগলতাঈ)

হযরত মায়মুনা ছিলেন নবী ﷺ-এর সর্বশেষ সহধর্মিণী। তাঁর পরে নবী ﷺ আর কোন বিবাহ করেননি।

উপরোক্ত বিবিগণ ছাড়াও আরো কতিপয় মহিলার সাথে নবী ﷺ-এর বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু নবী ﷺ-এর সাহচর্য তাদের নসীব হয়নি। রুখসাতীর পূর্বে বিশেষ বিশেষ কারণে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল।

একাধিক বিবাহ সম্পর্কে কিছু কথা

একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা ইসলামের পূর্বেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মেই বৈধ বলে বিবেচিত হত। আরব, ভারতবর্ষ, ইরান, মিসর, গ্রীস, ব্যাবিলন, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই একাধিক বিবাহের প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আজো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। বর্তমান যুগে ইউরোপের লোকেরা বহুবিবাহ অবৈধ করার চেষ্টা করে সফলকাম হতে পারেনি। অবশেষে স্বাভাবিক নীতির জয় হয়েছে এবং এখন এর প্রচলনকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।

প্রখ্যাত খৃষ্টান পণ্ডিত মিঃ ডেভিন পোর্ট একাধিক বিবাহের সমর্থনে ইনজীল কিতাবের অনেক আয়াত বর্ণনার পর লিখছেন— "এ আয়াতসমূহ হতে প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক বিবাহ শুধু পসন্দনীয়ই নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তাতে বিশেষ বরকত ও কল্যাণ দান করেছেন। (জন ডেভিন পোর্টের জীবনী : পৃ. ১৫৮)

এমনিভাবে পাদ্রী ফিক্স, জন মিল্টন এবং আইজ্যাক টেলরসহ আরো অনেকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় এর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ইসলামের পূর্বে একাধিক বিবাহের সাথে কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। এক এক ব্যক্তির আওতায় হাজার হাজার নারী থাকত। বর্তমান বাইবেল পাঠে জানা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাতশত স্ত্রী এবং তিনশত হেরেম ছিল। (প্রথম সালাতীন ১/৩) হযরত দাউদ (আ)-এর

নিরানব্বই জন স্ত্রী, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তিন স্ত্রী এবং হযরত ইয়াকুব ও মূসা (আ)-এর চারজন করে স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। (বাইবেল, জন্ম অধ্যায়, ২৯ ও ৩০)

খৃষ্টান পাদ্রীরা সবসময়ই বহু বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত জার্মানীতে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনস্টানটিনোপল-এর সম্রাট ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। বৈদিক আচারেও বহুবিবাহ বৈধ ছিল এবং এতে একই সময়ে দশজন, তেরজন ও সাতাশজন করে স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। মনুকে হিন্দু ও আর্যদের সর্বজন স্বীকৃত মনীষী ও নেতা বলে মান্য করা হয়। তিনি ধর্ম শাস্ত্রে লিখেছেন, "যদি কোন ব্যক্তির চার-পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে একজন সন্তানবতী হয়,তাহলে অবশিষ্টগণকেও সন্তানবতী বলা হয়।" (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩; রিসালায়ে তাআওয়াজ, অমৃতসর।) শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দুদের মধ্যে স্বতন্ত্র সম্মানিত অবতার বলে গণ্য করা হয়। তাঁর হাজার হাজার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল।

মোটকথা, ইসলামের পূর্বে একাধিক স্ত্রীগ্রহণ এক সীমাহীন আকারে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যতদূর জানা যায়, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, আর্য এবং পারসিক কোন ধর্ম অথবা বিধানই এর কোন সীমারেখা নির্ধারণ করেনি।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রথা এমনিভাবে সীমা নির্ধারণ ছাড়াই প্রচলিত ছিল। কোন কোন সাহাবীর বিবাহে চারজনেরও অধিক স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। হযরত খাদীজার ইনতিকালের পর নবী ﷺ-এর বিবাহ বন্ধনেও বিশেষ বিশেষ ইসলামী প্রয়োজনে দশজন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত হয়েছিলেন।

অতঃপর যখন দেখা গেল যে, এই বহুবিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার খর্ব হতে চলছে, কারণ লোকেরা প্রথমত লোভের বশবর্তী হয়ে একাধিক বিবাহ করত। কিন্তু পরে স্ত্রীদের অধিকার পূরণ করতে সক্ষম হত না, তখন কুরআনের চিরন্তন বিধান মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যদিও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করেনি, তবে এর সংখ্যা নির্ধারণ করে এর অনিষ্ট ও অপকারিতাসমূহের অবসান করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে যে, "এখন তোমরা মাত্র চারজন স্ত্রীলোককে একই সময়ে বিবাহ করতে পারবে। তাও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকারসমূহ সমানভাবে পূরণ করতে সক্ষম হও। আর যদি সমতা ও সুবিচার বিধান করতে না পারো, তাহলে একাধিক স্ত্রী রাখা অন্যায় ও যুলুম।"

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .

অর্থ : বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সমতা রক্ষা করে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে। (সূরা নিসা : আয়াত ৩)

এ ঘোষণার পর একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা সর্বসম্মতভাবে হারাম হয়ে গিয়েছে। যে সকল সাহাবী বিবাহে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিল, তারা চারজনকে রেখে অবশিষ্টদেরকে তালাক দিয়ে দিল। হাদীস শরীফে আছে হযরত গায়লান যখন মুসলমান হলেন, তখন তার বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলে চারজনকে রেখে বাকী সকলকে বর্জন করো। এমনিভাবে যখন নওফল ইবনে মুআবিয়া ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাঁর পাঁচজন স্ত্রী ছিল। নবী ﷺ তাদের একজনকে বর্জন করার নির্দেশ দিলেন।
(তাফসীরে কাবীর, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩

নবী ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যাও এই সাধারণ আইন অনুযায়ী চারজনের অধিক না থাকা উচিত ছি কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে, উম্মাহাতুল মু'মিনীন অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মত নন। কুরআন ঘোষণা করছে–

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

অর্থ : হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মত নও। (সূরা আহযাব : আয়াত ৩২)

নবী ﷺ-এর পবিত্র পত্নীগণ হলেন সকল উম্মতের মাতা। তাঁরা মহানবীর পর অন্য কারো দাম্পত্যে আসতে পারে না। এখন যদি সাধারণ বিধানের আওতায় নবী ﷺ-এর চারজনের অতিরিক্ত অন্যান্য স্ত্রীগণকে তালাক দিয়ে পৃথক করা হত, তাহলে তাদের উপর কতই না অবিচার করা হত যে, সারাটা জীবনই তাদেরকে নিঃসঙ্গ থাকতে হত এবং নবী ﷺ-এর কিছু দিনের সাহচর্য তাদের জন্য এক বিরাট আযাবে পরিণত হত। একদিকে তো মহানবীর সাহচর্য ছিন্ন হয়ে যেত, অপরদিকে অন্য কোথাও দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাদের থাকত না। সুতরাং নবী-সহধর্মিণীগণকে এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা কোনক্রমেই সংগত ছিল না। সুতরাং চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা শরীআতের নির্দেশে শুধু নবী ﷺ-এরই বিশেষত্ব বলে পরিগণিত হল।

তা ছাড়া, নবী ﷺ-এর সাংসারিক জীবনের অবস্থাসমূহ-যা উম্মতের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কর্মকাণ্ডের বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে পরিগণিত -এটা শুধু নবী-সহধর্মিণীগণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত এবং এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, নয়জন স্ত্রীও সে প্রয়োজনের তুলনায় কম।

এ সকল বাস্তব অবস্থা সত্ত্বেও কোন মানুষ কি বলতে পারে যে, নবী ﷺ-এর এই বৈশিষ্ট্য তার জৈবিক ভোগ-লালসার উপর নির্ভরশীল ছিল?

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, যখন সমগ্র আরব-অনারব নবী ﷺ-এর বিরোধিতায় উঠে- পড়ে লেগেছিল, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটছিল, তাঁর উপর নানা রকম দোষারোপ ও অপবাদ আরোপ করছিল, তাঁকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলে উপহাস করছিল- এক কথায় এই দেদীপ্যমান সূর্যের গায়ে ধুলাবালি নিক্ষেপ করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে নিজেরাই শুধু লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছিল। এতকিছু সত্ত্বেও কোন শত্রু কি কোন দিন তাঁর সম্পর্কে জৈবিক ভোগ-লালসা এবং নারীঘটিত কোন ব্যাপারে কোন অভিযোগ আরোপ করতে পেরেছিল? পারেনি। এ ব্যাপারে মিথ্যা রটনার কোন দুর্বল ভিত্তিও তাদের ছিল না। নতুবা কোন মর্যাদাবান লোকের দুর্নাম রটানোর জন্য এতদপেক্ষা বড় মোক্ষম কোন অস্ত্র আর ছিল না। যদি সামান্য মাত্রও অংগুলি সংকেতের অবকাশ থাকত, তাহলে আরবের কাফিররা- যাদের কাছে নবীর ঘরের খবর পর্যন্ত গোপন ছিল না- তারা সবচেয়ে বেশী ফলাও করে তাকে তাঁর দোষ-ত্রুটিরূপে প্রচার করে বেড়াত। কিন্তু তারা বাস্তবতা অস্বীকার করে নিজেদের কথার গ্রহণযোগ্যতাকে নসাৎ করে দেয়ার মত বোকা ছিল না। কেননা, আল্লাহভীরুতার মূর্তপ্রতীক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। এতে তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, তাঁর যৌবনের সিংহভাগ শুধু নির্জনতা ও একাকীত্বের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে। অতঃপর তার বয়স ২৫ বছরে পদার্পণ করলে হযরত খাদীজা (রা)-এর পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব আসে, যিনি বিধবা ও সন্তানবতী হওয়ার সাথে সাথে জীবনের চল্লিশ বছর অতিক্রম করে বার্ধক্যের জীবন যাপন করছিলেন। তিনি নবী ﷺ-এর সাথে বিবাহের পূর্বে দুইজন স্বামীর সংসার করেছিলেন এবং দুই পুত্র তিন কন্যার জননীও ছিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ : পৃঃ ১২)

নবী ﷺ-এর পক্ষ হতে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়নি। অতঃপর বয়সের বেশীর ভাগই এই এক বিবাহেই অতিবাহিত করেন। আর তাও এমনভাবে যে, স্ত্রীকে ঘরে রেখে হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ এই বিবাহের মধ্যেই কেটেছিল। তাই তাঁর যত সন্তানাদি জন্মেছেন তাঁদের সবাই ছিলেন হযরত খাদীজা (রা)-এরই গর্ভজাত।

অবশ্য হযরত খাদীজার পরলোকগমনের পর যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে, তখন তাঁর পরবর্তী সবকয়টি বিবাহ সংঘটিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শরীঅতী প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে দশজন পর্যন্ত মহিলা তাঁর বিবাহাধীনে আগমন করেন- যাদের সবাই (হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ব্যতীত) ছিলেন বিধবা আর কেউ কেউ সন্তানবতীও বটে।

এই সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটা ধারণাও করা যায় না যে, কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক নবী ﷺ-এর এই বহুবিবাহকে কোন জৈবিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলে মন্তব্য করতে পারে। যদি কোন জ্ঞানপাপীও নবী ﷺ-এর চরিত্র, কর্ম, খোদাভীরুতা, পবিত্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং পূতঃপবিত্র জীবনের

পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি চোখ বন্ধ করে রাখে, তবু এই বহুবিবাহের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাপ্রবাহই তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করতে বাধ্য করবে যে, এই বিবাহসমূহ নিশ্চয়ই কোন জৈবিক চাহিদা কিংবা ভোগবিলাস ভিত্তিক ছিল না। যদি তাই হত, সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সাথে অতিবাহিত করে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সকে এই কাজের জন্য নির্ধারিত করা কোন মানুষের বিবেক মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে যখন আরবের কাফির ও কুরায়শ নেতৃবর্গ নবী ﷺ-এর ইঙ্গিতমাত্র তাদের নির্বাচিত সেরা লাবণ্যময়ী সুন্দরীকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে উন্মুখ ছিল। সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

এ ছাড়া তখন স্বয়ং মুসলমানদের সংখ্যাও লাখের কোঠায় পৌছে গিয়েছিল। যাদের প্রতিটি নারী নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হতে পারাকে সঙ্গত কারণেই দোজাহানের সফলতা ও গৌরবের বিষয় বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করত।

এসব সত্ত্বেও নবী ﷺ-এর পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত শুধু হযরত খাদীজাই ছিলেন তাঁর একমাত্র জীবনসঙ্গিনী। তাঁর বয়স বিবাহের সময়ই ছিল চল্লিশ বছর।

বস্তুত নবী ﷺ-এর বহুবিবাহ একান্তভাবেই ইসলাম ও শরীঅত সংক্রান্ত প্রয়োজনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। যদি নবী-সহধর্মিণীগণ না হতেন, তবে যে সব আহকাম শুধু মহিলাদের দ্বারাই উম্মতের নিকট পৌছান সম্ভব ছিল, তা অসমাপ্তই থেকে যেত।

নবী ﷺ নয়জন পবিত্রা স্ত্রী রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ এবং সর্বশেষে হযরত উম্মে সালামা (রা) ইন্তিকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা ও ফুফুগণ

আবদুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। যথা— ১) হারিছ, তার নামেই আবদুল মুত্তালিবের উপনাম আবুল হারিছ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ২) যুবায়র, ৩) হামল, ৪) দিরার, ৫) মুকাব্বিম, ৬) আবূ লাহাব, ৭) আব্বাস, ৮) গামযা, ৯) আবূ তালিব ও ১০) আবদুল্লাহ্। এদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ হলেন নবী ﷺ-এর পিতা। অবশিষ্ট নয়জন তাঁর চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তবে নয়জন এবং বারজন চাচার কথাও কোন কোন বর্ণনাতে পাওয়া যায়।

নবী ﷺ-এর ছয়জন ফুফু ছিলেন। যথা— ১) উমায়মা, ২) উম্মে হাকীম, ৩) বাররা, ৪) আতিকা, ৫) সফিয়্যা ও ৬) আরওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাহারাদারগণ

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা) বদর যুদ্ধে, হযরত যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স (রা) ও মুহাম্মদ ইবনে সালামা আনসারী (রা) উহুদের যুদ্ধে, হযরত যুবায়র (রা) খন্দকের যুদ্ধে, হযরত আবূ আয়্যূব (রা) ও হযরত বিলাল (রা) ওয়াদী কুরা'র যুদ্ধে নবী ﷺ-এর পাহারাদারীর (দেহরক্ষীর) দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর اَللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার হিফাযত করবেন' (সূরা মায়িদা ঃ আয়াত ৬৭) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হতে এই দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়।

কা'বাগৃহ নির্মাণ ও মহানবী ﷺ-কে 'আল-আমীন' স্বীকৃতি প্রদান

নবী ﷺ-এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন কুরায়শরা কা'বাগৃহকে নতুন করে পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এর পূর্বে হযরত শীছ (আ) সর্বপ্রথম কা'বাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) তা নির্মাণ করেন। কা'বাগৃহ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারাকে প্রতিটি লোকই নিজের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। এমনকি কুরায়শ বংশের প্রতিটি শাখা গোত্র কা'বাগৃহের নির্মাণকার্যে কে কার চাইতে বেশী অবদান রাখতে পারে এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং সম্ভাব্য ঝগড়া-বিবাদ পরিহার করার উদ্দেশ্যে এর নির্মাণকার্যকে গোত্রসমূহের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হল।

এই কর্ম-বণ্টন পদ্ধতিতে কা'বাগৃহের নির্মাণ-কাজ যথাস্থানে 'হাজারে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ পাথর) স্থাপন পর্যন্ত নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। কিন্তু হাজারে আসওয়াদকে উঠিয়ে তার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে গোত্রসমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিটি গোত্র ও ব্যক্তিই এই সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য উদগ্রীব ছিল। এমনকি এ ব্যাপারে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোস-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার মানসে 'দারুন-নাদওয়া' তথা 'পরামর্শ-গৃহে' সমবেত হলেন।

পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট দরযা দিয়ে কা'বা-চত্বরে প্রবেশ করবেন, তিনি এ ব্যাপারে যে মীমাংসা দিবেন তা খোদায়ী সমাধান মনে করে সকলেই মেনে নিবে।

পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল নবী ﷺ সর্বাগ্রে ঐ নির্দিষ্ট দরযা দিয়ে কা'বা চত্বরে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে দেখে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠল ঃ "ইনিই আমাদের আল-আমীন-আমরা তার মীমাংসা মেনে নিতে সম্মত।"

তখন নবী ﷺ একখানা চাদর বিছিয়ে স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ বা কালো পাথরটি তাতে রেখে দিল এবং আদেশ দিল যে, প্রত্যেক গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিরা যেন চাদরের এক এক কোণ্ ধরে তার ভিত পর্যন্ত তুলে ধরেন। তাই করা হল। চাদরখানা যখন নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছল, তখন নবী ﷺ আপন পবিত্র হাতে পাথরখানা উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করল। ইবনে হিশাম এঘটনাটি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই কুরায়শরা এক বাক্যে নবী ﷺ-কে আল-আমীন বা মহাবিশ্বাসী বলে অভিহিত করত।

(সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫)

মহানবীর নুবুওয়াতপ্রাপ্তি

নবী ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর এক দিন পূর্ণ হল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রকাশ্য ও বাহ্যিকভাবে নুবুওয়াতের পরম মর্যাদায় ভূষিত করলেন। তাঁর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির তারিখও জন্ম-তারিখের মতই রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ১৪)

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

মহানবী ﷺ এর উপর যখন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না; বরং তাতে শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ের বিধি-বিধান থাকত।

অতঃপর কিছু দিন ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ওহী অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করলে তখন তাঁকে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হল। এ পর্যায়ে মহানবী ﷺ প্রথমে তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এবং যাদের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে লাগলেন।

এই প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম তাঁর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা), বাল্যবন্ধু আবূ বকর (রা), চাচাত ভাই হযরত আলী (রা) এবং পালক পুত্র হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রা) ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব হতেই হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং মহানবী ﷺ তাঁকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিজের রিসালাতপ্রাপ্তির সুসংবাদ জানালে সাথে সাথে তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করেন এবং কালেমা শাহাদত পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর গোত্রের মধ্যে সকলের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা সকল ব্যাপারেই তাঁর উপর আস্থা রাখত। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও সেইসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন, যাদের মাঝে সততা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখতে পেতেন। সুতরাং হযরত উছমান গনী (রা), আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), যুবায়র ইবনে আওয়াম (রা), তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ (রা) প্রমুখ সাহাবী তাঁর ডাকে সাড়া দিলে তিনি তাদেরকে মহানবীর খিদমতে নিয়ে গেলেন এবং এরা সবাই মুসলমান হলেন।

এদের পর হযরত আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ্ (রা), উবায়দা ইবন হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), সাঈদ ইবনে যায়দ আদাভী (রা), আবূ সালামা মাখযূমী (রা), খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা), উছমান ইবনে মাযউন (রা) ও তাঁর দুই ভাই কুদামাহ (রা) ও উবায়দুল্লাহ্ (রা), আরকাম ইবনে আরকাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা সবাই ছিলেন কুরায়শ বংশের লোক। কুরায়শ বংশের বাইরে হযরত সুহায়ব রূমী (রা), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা), আবূ যার্‌র গিফারী (রা), আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখনো পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ অত্যন্ত গোপনে চলছিল। ইবাদত-বন্দেগী এবং শরীঅতের আচার-অনুষ্ঠানও গোপনেই পালন করা হত। পুত্র পিতাকে এবং পিতা পুত্রকে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন। মুসলমানদের সংখ্যা যখন ত্রিশের অধিক হয়ে গেল, তখন মহানবী ﷺ তাদের জন্য একখানা বড় ঘর নির্ধারিত করে দিল। তারা সবাই সেখানে সমবেত হতেন এবং মহানবী ﷺ তাদেরকে ইসলামের তা'লীম দিতেন।

এই পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত তিন বছর অবধি চলেছিল। ততদিনে কুরায়শদের এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে আরো অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হতে শুরু করেছেন। এ সংবাদ সারা মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে এর আলোচনা শুরু হয়ে গেল। এভাবে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় এসে গেল।

ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত

তিন বছর গোপন প্রচারের ফলে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন এবং জনগণের মধ্যে বিষয়টি বিপুলভাবে আলোচিত হতে লাগল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মহানবীকে প্রকাশ্যে জনগণের নিকট ইসলামের বাণী পৌছাবার নির্দেশ প্রদান করলেন। فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (অতএব, তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর (সূরা হিজর ঃ আয়াত ৯৪) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের মর্মার্থ এটাই।

মহানবী ﷺ সাথে সাথে নির্দেশ পালনে ব্রতী হলেন এবং মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরায়শদের গোত্রসমূহের নাম ধরে আহ্বান করতে লাগলেন। সমস্ত গোত্রের লোক একত্র হলে তিনি প্রথমেই তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যদি তোমাদেরকে এরূপ সংবাদ প্রদান করি যে, শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হওয়ার জন্য ছুটে আসছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর লুটতরাজ শুরু করবে, তাহলে তোমরা কি আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে?" এ কথা শুনে সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, "অবশ্যই আমরা সবাই আপনার সংবাদকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা আজ পর্যন্ত কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।" এরপর মহানবী ﷺ বললেন, "আমি তোমাদেরকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করছি যে, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস পরিহার না কর, তাহলে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ভয়াবহ শাস্তি নেমে আসবে।" তিনি আরো বললেন ঃ "আমার জানা মতে পৃথিবীর কোন মানুষই তার জাতির জন্য আমার আনীত উপহার অপেক্ষা উত্তম কোন সওগাত বহন করে আনেনি। আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ বয়ে এনেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আমি যেন তোমাদেরকে ঐ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করি। আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট মিথ্যা বলতাম, তবু তোমাদের সম্মুখে মিথ্যা বলতাম না। আর যদি সারা পৃথিবীকে ধোকা দিতাম, তবু তোমাদেরকে ধোকা দিতাম না। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি একক এবং যার কোন শরীক নেই। আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর প্রতি সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র রাসূল ও সংবাদবাহক হয়ে আগমন করেছি।" (দুরুসুস-সীরাত, পৃ. ১০)

দাওয়াতী কাজে মহানবী ﷺ-এর দৃঢ়তা

ইসলামের এই দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা অব্যাহত রইল। ধীরে ধীরে পৌত্তলিক আরবরা জানতে পারল যে, মহানবী ﷺ-এর ওহীতে তাদের মূর্তিসমূহের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজারীদের

নিবুদ্ধিতা ব্যক্ত করা হয়েছে। তখন তারা মহানবীর ঘোর শত্রুতায় অবতীর্ণ হল। পদে পদে তারা বাধা সৃষ্টি করল। নবী ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর নির্যাতন চলে। তাদের কোন পদক্ষেপই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারল না। তাই তারা অবশেষে বাধ্য হয়ে মহানবীর চাচা আবূ তালিবের কাছে এসে দাবী জানাল যে, 'আপনি আপনার ভ্রাতৃতনয়কে বিরত রাখুন। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। যতক্ষণ না দুই দলের একদল ধ্বংস হয়ে যায়।"

আবূ তালিব মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি মহানবী ﷺ-এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। মহানবী বললেন, "হে চাচাজান! আল্লাহ্‌র কসম, আরবের পৌত্তলিকরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রেখে আমাকে আল্লাহ্‌র কালেমা তাঁর সৃষ্টির নিকট প্রচার করতে বিরত থাকতে বলে, তথাপি আমি তা মেনে নিতে প্রস্তুত নই যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র সত্য দীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করবে অথবা আমি এ সংগ্রামে আমার এ জীবন বিলিয়ে দিব।"

আবূ তালিব মহানবীর এ দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করে বললেন, "আচ্ছা যাও, তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যেতে থাক। আমি তোমার কাজে সাহায্য-সহযোগিতা থেকে কখনো হস্ত সংকুচিত করব না।'

ঘৃণা ছড়ান ও তার বিপরীত ফল

কুরায়শরা দেখতে পেল যে, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিব মহানবী ﷺ-এর সাথে রয়েছে। এদিকে হজ্জের মওসুমও ঘনিয়ে আসছে (জাহিলিয়াতের যুগেও হজ্জের প্রচলন ছিল। মক্কার মুশরিকরাও হজ্জ পালন করত। কিন্তু তা করত তাদের মনগড়া বাতিল পন্থায়)। এই সুযোগে মহানবী ﷺ ইসলাম প্রচারের চেষ্টা চালাবেন। সুতরাং তাদের মনে আশংকা দেখা দিল যে, এই বার মুহাম্মদ ﷺ-এর দীন হয়ত সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব, তারা সকলে সমবেত হয়ে পরামর্শ করে সাব্যস্ত করল যে, মক্কার সমস্ত রাস্তায় তাদের নিজস্ব লোক বসিয়ে দিতে হবে যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে হজ্জ উপলক্ষে যেসব লোক আগমন করবে দূরে থাকতেই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া যায় যে, এখানে একজন জাদুকর রয়েছে, যে তার কথার মাধ্যমে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। তোমরা ভুলেও তার কাছে যাবে না। আল্লাহ্‌র মহিমায় তাদের এই কর্মপন্থা প্রকারান্তরে মহানবীর দাওয়াত ও তাবলীগের পক্ষেই কাজ করল। যদি তারা এমনটি না করত, তাহলে হয়ত বহু লোক তাঁর কোন আলোচনাই শুনতে পেত না। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি লোককে মহানবীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলল।

কুরায়শদের নির্যাতন

কুরায়শরা দেখতে পেল তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বিফল হচ্ছে। মহানবী ﷺ-এর দাওয়াতের কাজ দিনের পর দিন ব্যাপক হয়ে পড়ছে আর লোকজন বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। তখন তারা তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করল। তারা মক্কায় কতিপয় লম্পটকে একত্রিত করে প্রত্যেকটি বৈঠক-সমাবেশে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং যে-কোন পন্থায় তাঁকে কষ্ট দিতে প্ররোচিত করল।

একদিন মহানবী ﷺ কা'বা চত্বরে নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন, তখন আবূ জাহল মহানবীর পবিত্র মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইল। আবূ জাহল পাথর নিয়ে মহানবীর নিকটবর্তী হলে তার হাত কাঁপতে লাগল। পাথর হাত হতে পড়ে গেল। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং সে দৌড়িয়ে তার নিজ দলে ফিরে গিয়ে বলতে লাগল, "আমি যখন মুহাম্মদের মস্তকের প্রতি হাত বাড়াতে ইচ্ছা করলাম, তখন একটি বিরাটাকৃতির উট মুখ ব্যাদান করে আমার দিকে ধাবিত হল এবং আমাকে গিলে খেতে উদ্যত হল। এমন অদ্ভুত উট আমি কখনো দেখিনি।"

এ ছিল এমন একটি ঘটনা, যা কাফিরদের ভরা মজলিসে সকলের সম্মুখে সংঘটিত হয় এবং স্বয়ং কাফির সরদার আবূ জাহল তা স্বীকার করে। আবূ জাহল, উক্‌বা ইব্‌নে আবূ মুআয়ত, আবূ লাহাব, আস ইবনে ওয়াইল,

আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূছ, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ওলীদ ইবনে মুগীরা, নাযার ইবনে হারিছ প্রভৃতি কাফির সর্বদা মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেয়ার জন্য তাঁর পেছনে লেগে থাকত। এদের কারো ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয়নি। বরং এরা সকলেই অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কেউ কেউ বদরের যুদ্ধে তরবারির আঘাতে আর কেউ নেহাত বিশ্রী ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পচে-গলে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে।

মহানবী ﷺ-এর প্রতি কুরায়শদের প্রলোভন ও তার উত্তর

কুরায়শরা দেখল, তাদের কোন কলা-কৌশলই কার্যকরী হচ্ছে না। তারা পরামর্শক্রমে স্থির করল, তাদের সবচাইতে চতুর সরদার উতবা ইবনে রবীআকে মহানবীর নিকট প্রেরণ করবে। সে তাঁকে সকল প্রকার পার্থিব প্রলোভনে বশ করতে চেষ্টা করবে।

উতবা যখন মহানবী ﷺ সমীপে উপস্থিত হল, তখন তিনি মসজিদে নামায পড়ছিলেন। সে নিকটে গিয়ে বলল, ভাতিজা তুমি সামাজিক মর্যাদা ও বংশকৌলীন্যে আমাদের সকলের চেয়ে উত্তম। এ সত্ত্বেও তুমি তোমার গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছ। তাদেরকে এবং তাদের দেব-দেবীকে গালমন্দ করছ। তাদের পূর্বপুরুষকে মূর্খ প্রতিপন্ন করেছ। তুমি আজ তোমার মনের আসল কথাটি খুলে বল। তোমার এসব কর্মকাণ্ডের আসল উদ্দেশ্য যদি বিপুল ধন-রত্নের অধিকার লাভ করা হয়ে থাকে, তবে আমরা তোমার জন্য এত ধন-সম্পদ যোগাড় করে দিতে প্রস্তুত যে, তুমি মক্কার সবচাইতে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদি তোমার বাসনা এই হয়ে থাকে যে, তুমি একজন বড় নেতা হবে, তবে আমরা তোমাকে সমগ্র কুরায়শ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা বানিয়ে দিব। তোমার আদেশ ব্যতীত কানাটিও আমরা নাড়াব না। আর তোমার উদ্দেশ্য যদি বাদশাহী লাভ হয়ে থাকে, তবে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নিব। পক্ষান্তরে যদি তোমার উপরে কোন জিনের প্রভাব থেকে থাকে এবং তুমি যেসব কথা মানুষকে পড়ে শুনাচ্ছ, তা তারই কথা হয়ে থাকে, অথচ তুমি তার হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করতে অক্ষম হয়ে পড়েছ, তাহলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসক তালাশ করব-যে তোমাকে সুস্থ করে তুলবে।" (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ২০)

উতবা তার বক্তব্য শেষ করলে মহানবী ﷺ তার উত্তরে তাকে কুরআনের একটি সূরা তিলাওয়াত করে শুনালেন। যা শুনে উতবা হতভম্ব হয়ে গেল এবং নিজ গোত্রের নিকট ফিরে এসে বলল, "খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনেছি, যা ইতোপূর্বে আমি আমার সমস্ত জীবনেও শুনিনি। আল্লাহ্‌র কসম! তা না কোন কবিতা, না কোন গণকের বাক্য আর না কোন জাদুমন্ত্র। আমার পরামর্শ হল, তোমরা এই লোকটির [মুহাম্মদ ﷺ] উৎপীড়ন হতে বিরত থাক। কেননা, আমি তাঁর যে কালাম শ্রবণ করেছি, আল্লাহ্‌র কসম! তার সুমহান মর্যাদা শীঘ্রই বিকশিত হবে। আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা আমার কথা শুন। অন্তত কিছু দিন অপেক্ষা কর। যদি আরবরা বিজয়ী হয়ে যায়, তবে বিনা পরিশ্রমেই তোমরা এই আপদের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আর যদি সে আরবদের উপর বিজয়ী হয়, তবে তাঁর সম্মান প্রকারান্তরে আমাদেরই সম্মান। কেননা, সে তো আমাদেরই বংশের লোক।" কুরায়শরা তাদের সবচাইতে চতুর সরদারের এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেল এবং এই বলে নিষ্কৃতি লাভ করল যে, এই লোকটিকে মুহাম্মদ ﷺ জাদু করে ফেলেছে। (দুরুসুস-সীরাত, পৃঃ ১৪)

কুরায়শদের কোন চালই যখন কাজে আসল না, তখন কুরায়শরা মহানবীর সাথে সাথে তাঁর সাহাবীগণ এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনের উপরও নানাভাবে নির্যাতন চালাতে শুরু করল। হযরত বিলাল (রা) প্রমুখ সাহাবীর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হল। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শ্রদ্ধেয় মাতাকে এ কারণেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হল। ইসলামের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ২০)

সাহাবীদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ

মহানবী ﷺ নিজে সব রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর সাহাবা ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত এই নির্যাতনের ধারা সম্প্রসারিত হল, তখন তিনি তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ প্রদান করলেন। সুতরাং নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ ও ৪জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উছমান (রা) ও তাঁর স্ত্রী রুকায়্যা (রা)-ও ছিলেন। (দুরুসুস-সীরাহ, পৃঃ ১৫)

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী (আবিসিনিয়ার বাদশাহগণকে নাজাশী বলা হত- মোগলতাঈ) এই মুহাজিরগণের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁরা সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু কুরায়শরা যখন এই সংবাদ জানতে পারল, নাজাশীর নিকট বলে পাঠাল যে, এই লোকগুলো দুষ্কৃতকারী। এদেরকে আপনি আপনার রাজ্যে স্থান দিবেন না, বরং এদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

নাজাশী ছিলেন একজন বিচক্ষণ লোক। তিনি তাদের উত্তরে বললেন, "আমি তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্ত না করে এ কাজটি করতে পারি না।" অতঃপর তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা তোমাদের ধর্মমত ও তার সত্য সত্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা কর। তখন হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব অগ্রসর হয়ে বললেন, "হে বাদশাহ! আমরা ইতোপূর্বে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম এবং মৃতজন্তু ভক্ষণ করতাম। ব্যভিচার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং দুশ্চরিত্রতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলদের গ্রাস করে ফেলত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠালেন। যিনি আমাদেরই বংশের লোক। আমরা তাঁর বংশ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি আমাদেরকে এই আহ্বান জানালেন যে, আমরা যেন আল্লাহ্কে এক বলে বিশ্বাস করি, কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করি, মূর্তিপূজা ত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করি। তিনি আমাদেরকে নিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নিষেধ করলেন। খুনখারাবী, মিথ্যা বলা এবং ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করতে বারণ করলেন। আমরা এসব কথা শুনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি।" নাজাশী এই ভাষণ শুনে অভিভূত হয়ে পড়লেন। কুরায়শী দূতগণকে ফিরিয়ে দিলেন এবং নিজে মুসলমান হলেন।

মুহাজিরগণ প্রায় তিন মাসকাল সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করে মক্কায় ফিরে আসলেন। এ সময় হযরত উমর ফারুক (রা) মহানবীর দু'আর বরকতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ জন পুরুষ ও ১১ জন নারীর বেশী ছিল না। (দুরুসুত-তারীখুল ইসলামী, পৃঃ ২২)

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনে এক প্রকার শক্তি ও শৌর্য সঞ্চারিত হল। যে সকল লোক কুরায়শদের নির্যাতনের ভয়ে এতদিন নিজেদের ইসলাম গোপন করে রেখেছিলেন তারা এখন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন। আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রসারিত ও উন্নতিপ্রাপ্ত হতে লাগল।

কুরায়শরা যখন দেখতে পেল যে, মহানবী ও তাঁর সাহাবীগণের মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, এমনকি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীও মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তখন তারা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ল। এবার কুরায়শরা বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের নিকট দাবী করল যে, তোমরা তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ﷺ-কে আমাদের হাতে তুলে দাও, অন্যথায় আমরা তোমাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করব। কিন্তু বনূ আবদুল মুত্তালিব তাদের এই দাবী মনযূর করলেন না। তখন কুরায়শরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মুতাবিক এই অঙ্গীকারনামা প্রণয়ন করল যে, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সাথে পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে। আত্মীয়তা, বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয় সব কিছু বন্ধ থাকবে। অতঃপর এই অঙ্গীকারনামা কা'বাগৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখা হল। এই অঙ্গীকারনামা মানসূর ইবনে ইকরিমা লিখেছিল এবং এর পরিণতিতে তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ২৪)

এক পাহাড়ের উপত্যকায় মহানবী ﷺ ও তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে বন্দী করা হল। এ সময় একমাত্র আবূ লাহাব ব্যতীত বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত লোক মুসলিম ও কাফির নির্বিশেষে সবাই আবূ তালিবের সাথে ছিল এবং উপত্যকায় বন্দী ও অবরুদ্ধ জীবন যাপন করে। সবদিক হতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছিল। পানাহারের যে সমস্ত দ্রব্য সাথে ছিল তা কিছু দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল। কঠিন দুর্ভোগ শুরু হল। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হল।

এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করে মহানবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে দ্বিতীয় বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এবার ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন মহিলার এক বিরাট দল হিজরতে অংশগ্রহণ করলেন। এদের সাথে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) এবং তাঁর গোষ্ঠীর লোকজনসহ ইয়েমেনের মুসলমানগণও যোগ দিয়েছিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ২৪)

এদিকে মহানবী ﷺ এবং তাঁর অবশিষ্ট পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরাম সুদীর্ঘ তিন বছর এই যুলুম-অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেন। এরপর কিছুসংখ্যক লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এবং মহানবী ﷺ-এর উপর হতে এই অবরোধ তুলে দিতে উদ্যোগী হলেন। ওদিকে মহানবী ﷺ-কে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হল, কুরায়শদের অঙ্গীকারনামা উই পোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত তার কোন অক্ষরই আর অক্ষত নেই। মহানবী ﷺ তা লোকজনকে জানিয়ে দিলেন। দেখা গেল-অঙ্গীকারনামার অবস্থা তাই হয়েছে, যা মহানবী ﷺ বলেছেন। অবশেষে মহানবীর উপর হতে অবরোধ তুলে নেয়া হল।

আবূ তালিবের ওফাত

এই সময় মহানবীর চাচা আবূ তালিব ইনতিকাল করেন। এ বেদনাদায়ক ঘটনা নুবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হয়েছিল। এর তিন দিন পর হযরত খাদীজাও পরলোকগমন করেন। এ কারণে মহানবী ﷺ এ বছরকে শোকের বছর বলে অভিহিত করেছেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৩০)

আবূ তালিবের মৃত্যুর পর কুরায়শরা মহানবীর উপর নির্যাতন চালানোর অধিকতর সুযোগ পেয়ে গেল। নির্যাতনের কোন পন্থাই আর তারা বাকী রাখল না। নুবুওয়াতের দশম বছর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত যায়দ ইবনে হারিছাকে সাথে নিয়ে মহানবী ﷺ তায়েফে গমন করলেন এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালেন। দীর্ঘ এক মাস কাল ক্রমাগত তাদের মাঝে তাবলীগ ও হিদায়াতের কাজে নিয়োজিত রইলেন। কিন্তু একটি লোকও ইসলাম গ্রহণ করল না। বরং তারা মহানবীকে নানাভাবে কষ্ট দেয়ার জন্য শহরের কতিপয় বখাটে ও লম্পটকে লেলিয়ে দিল। এই হতভাগ্য পাপিষ্ঠরা মহানবীর প্রতি এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করল যে, তাঁর গোটা দেহ ক্ষতবিক্ষত ও পবিত্র চরণযুগল রক্তাক্ত হয়ে গেল। হযরত যায়দ ইবনে হারিছা (রা) যেদিক থেকে পাথর আসতে দেখতেন, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করতে চেষ্টা করতেন এবং পাথরের আঘাত নিজে মাথা পেতে গ্রহণ করতেন। হযরত যায়দের মাথা যখমে যখমে রক্তাক্ত হয়ে গেল। দীর্ঘ এক মাস পর রহমতে আলম মহানবী ﷺ যখন তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তাঁর পবিত্র হাঁটু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু সেই মুহূর্তেও তাঁর পবিত্র মুখে নিজ উম্মতের ব্যাপারে বদ-দু'আ বা অভিশাপের একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।

মহানবী ﷺ-এর মি'রাজ

নুবুওয়াতের একাদশ বছরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। এ বছর মহানবী ﷺ-কে এক মর্যাদাপূর্ণ আকাশ যাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সমগ্র নবী-রাসূলের মধ্যে শুধুমাত্র মহানবী ﷺ-এরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে ঘটনাটি এরূপ—

এক রাতে মহানবী ﷺ কা'বার হাতীমে শায়িত ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) ও মীকাঈল (আ) আগমন করে বললেন, "আমাদের সাথে চলুন।" তাঁকে বোরাক নামক বাহনের উপর আরোহণ করা হল।

তার গতি এত তীব্র ছিল যে, তার দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে গিয়ে তার একেকটি কদম পড়ত। এমনি দ্রুতগতিতে মহানবী ﷺ কে প্রথমে সিরিয়ায় আল-আকসা মসজিদে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবীকে স্বাগত জানাবার জন্য পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলকে সমবেত করে রেখেছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর হযরত জিবরাঈল (আ) আযান দিলেন এবং সকল নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু কে ইমাম হয়ে নামায পড়াবেন সকলে এরই অপেক্ষা করছিলেন। জিবরাঈল (আ) মহানবীর হাত ধরে সকলের সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি সমস্ত নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণকে নামায পড়ালেন।

এ পর্যন্ত ছিল পার্থিব জগতের সফর যা বোরাকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। অতঃপর একাদিক্রমে তাঁকে সপ্তম আসমান সফর করান হল। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হল। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সাথে, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর সাথে, পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হল।

(ফাতহুল বারী, ১৫ পারা, পৃঃ ৪৮৫)

এরপর মহানবী ﷺ সিদরাতুল মুনতাহার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথিমধ্যে হাওযে কাওসার অতিক্রম করলেন। অতঃপর তিনি বেহেশতে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি এমন সব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়াদি অবলোকন করলেন, যা অদ্যাবধি কোন দৃষ্টি দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের কল্পনাও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। অতঃপর দোযখকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হল। সেখানে তিনি একদল লোককে দেখতে পেলেন, যারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করে বেড়াত)।" অতঃপর দোযখের দরযা বন্ধ করে দেয়া হল।

এরপর মহানবী ﷺ সম্মুখপানে অগ্রসর হলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানেই রয়ে গেলেন। কেননা, এর বেশী অগ্রসর হওয়ার অনুমতি তাঁর ছিল না। এ সময় তিনি মহান আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করলেন। বিশুদ্ধ মতে এ দর্শন শুধু অন্তরের দ্বারাই নয়, বরং চোখের দ্বারাও সম্পন্ন হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) এবং সমস্ত বিজ্ঞ সাহাবী ও ইমামগণের এটাই অভিমত।

সেখানে মহানবী ﷺ সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার সৌভাগ্য হল। তখনই নামাযসমূহ ফরয করা হল। এরপর মহানবী ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন। সেখান থেকে পুনরায় বোরাকে সওয়ার হয়ে মক্কা মুআযযমার দিকে চলতে লাগলেন। পথে বিভিন্ন স্থানে কুরায়শদের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এদের কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি সালামও করলেন। তারা মহানবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বর চিনতে পারল এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও প্রদান করল। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই মুবারক সফর সমাপ্ত হয়ে গেল।

মি'রাজ সম্পর্কে চাক্ষুষ সাক্ষ্য

ভোরে কুরায়শদের মধ্যে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হল। কেউ হাততালি দিতে লাগল। কেউ হতবাক হয়ে মাথায় হাত দিল। আবার কেউ বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সকলে মহানবীকে প্রশ্ন করতে লাগল। আচ্ছা বলুন দেখি, বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণশৈলী কি ধরনের এবং সেটি পাহাড় থেকে কতদূরে অবস্থিত? মহানবী ﷺ তার সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরলেন। মসজিদে আকসার দরযা কতটি, তাক কয়টি ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কে গুণে রাখে? কাজেই মহানবী ﷺ দারুণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে আকসাকে তাঁর সম্মুখে তুলে ধরলেন। তিনি গুণে গুণে তাদেরকে বলে দিতে লাগলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ "আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।" আর কুরায়শরাও সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল এবং বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ মসজিদে আকসার অবস্থা তো ঠিকই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তারা হযরত আবূ বকর (রা)-কে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ এক রাত্রিতে মসজিদে আকসায় পৌছে পুনরায় ফিরে এসেছেন?" আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উত্তরে বললেন, "আমি তো এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করে রেখেছি। যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় চোখের পলকে তাঁর কাছে আসমানী সংবাদ পৌছে যায়, সেখানে মসজিদে আকসার ব্যাপারে বিশ্বাস করতে দ্বিধা হবে কেন?" বস্তুত এ কারণেও তাঁর উপাধি সিদ্দীক দেয়া হয়েছে।

কুরায়শ কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য

কুরায়শরা পুনরায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে মহানবীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো, আমাদের অমুক কাফেলাটি যারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে, তারা এখন কোথায়? মহানবী ﷺ বললেন, "অমুক গোত্রের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা রাওহা নামক স্থানে আমি অতিক্রম করে এসেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা সকলে তার খোঁজে বের হয়ে পড়েছিল। আমি তাদের হাওদার নিকটে গেলে সেখানে কেউ ছিল না। একটি সুরাহীতে পানি পেয়ে আমি তা পান করেছি। এরপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটি আমি অমুক স্থানে অতিক্রম করি। বোরাক যখন এর নিকটবর্তী হল, তখন উটগুলো ভয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগল। এদের মধ্যে একটি লাল রঙের উটের উপরে দুটি সাদা ও কালো বর্ণের থলে ছিল। সেটি তো অজ্ঞান হয়েই পড়ে গেল। তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটিকে আমি অতিক্রম করেছি তানঈম নামক স্থানে। এই কাফেলার সর্বাগ্রে খাকী রঙের একটি উট ছিল। তার উপরে কালো চট এবং দুটি কালো থলে ছিল। এই কাফেলা শীঘ্রই তোমাদের কাছে এসে পৌছবে।" লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কবে নাগাদ পৌছবে? মহানবী ﷺ বললেন, "বুধবার নাগাদ এসে পড়বে।"

মহানবী ﷺ যেরূপ বলেছিলেন, ঠিক সেরূপই ঘটল এবং এই কাফেলাগুলোও মহানবীর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করল।

কুরায়শদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার দলীল-প্রমাণাদি সম্পূর্ণ হওয়ার পর এবং এই বিস্ময়কর ভ্রমণ সম্পর্কে স্বয়ং তাদের জাতি-সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য প্রদান করার পর তারা মহানবীর এই মুবারক সফরকে নিছক জাদু এবং তাঁকে জাদুকর আখ্যা দিয়ে মজলিস হতে উঠে গেল।

মদীনায় ইসলাম

একটানা দশ বছর যাবত মহানবী ﷺ আরবদের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আরবের এমন এক মাহফিল ও সভা-সম্মিলন তিনি ছাড়েননি, যেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেননি। হজ্জের মওসুমে, উকাযের মেলায় এবং যিল-মাজায প্রভৃতি স্থানে গিয়ে তিনি মানুষকে ইসলামে প্রতি অহ্বান জানালেন। প্রত্যুত্তরে তারা তাঁকে নানা প্রকার কষ্ট দিতে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকল। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলত, প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান। তারপর আমাদেরকে হিদায়াত করতে আসুন। এরপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় হজ্জের মওসুমে মদীনার আওস গোত্রের কতিপয় লোক মহানবীর কাছে এসে হাযির হয়। এদের মধ্যে আসআদ ইবনে যুরারা ও যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তী বছর এই গোত্রেরই আরো কতিপয় লোক আগমন করলেন এবং তাদের মধ্য হতে ছয় অথবা আটজন মুসলমান হলেন। মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা কি আল্লাহ্র সত্য বাণী প্রচারে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ ?" তারা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্তমানে আমাদের আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছে। আপনি যদি এ সময় মদীনায় গমন করেন, তাহলে আপনার হাতে বায়আতের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য হবে না। আপনি আপাতত এক বছর এই ইচ্ছা স্থগিত রাখুন। সম্ভবত আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি হয়ে যাবে এবং আমরা আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরা একসাথে ইসলাম গ্রহণ করব। আগামী বছর আমরা

আবার আপনার দরবারে উপস্থিত হব। তখন এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে।" অতঃপর তারা মদীনায় ফিরে গেলেন। মদীনার অধিবাসীরা তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ১) মুশরিক ও ২) আহলে কিতাব। মুশরিকরা দুটি বিরাট গোত্রে বিভক্ত ছিল। ১) আওস ও ২) খাযরাজ। এ দুই গোত্র সর্বদা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকত এবং প্রায় ১২০ বছর ধরে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধের জের চলে আসছিল। (সীরাতে হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০) এমনিভাবে আহলে কিতাব তথা ইহুদীরাও কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। ১) বনূ কুরায়যা, ২) বনূ নাযীর, ৩) বনূ কায়নুকা প্রভৃতি। এ গোত্রগুলোও তাদের নিজেদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা পোষণ করত। (বায়যাভী)

মদীনায় সর্বপ্রথম বনূ যুরায়কের মসজিদে কুরআন পাঠ করা হল। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় এক বছরের মধ্যেই আওস ও খাযরাজের অধিকাংশ ঝগড়া মিটমাট হয়ে গেল। তাই পরবর্তী হজ্জের মওসুমে প্রতিশ্রুতি মুতাবিক ১২ ব্যক্তি মহানবীর দরবারে উপস্থিত হলেন। ১০ জন খাযরাজ গোত্রের এবং ২ জন আওস গোত্রের। এদের মধ্যে যারা বিগত বছর মুসলমান হননি, তারাও এবার মুসলমান হলেন এবং সবাই মহানবীর পবিত্র হাতে বায়আত করলেন। এই বায়আত সর্বপ্রথমে আকাবা নামক স্থানে সম্পন্ন হয়েছিল। তাই একে আকাবার প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) নামে অভিহিত করা হয়। (সীরাতে হালবিয়া, ১ খণ্ড, পৃঃ ৪২)

এরা মুসলমান হয়ে মদীনায় ফিরে আসলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেল এবং প্রতিটি মজলিসে ইসলামের আলোচনা চলতে লাগল।

মদীনায় ইসলামের প্রথম মাদ্‌রাসা

মদীনায় পৌঁছেও আওস ও খাযরাজ গোত্রের দায়িত্বশীল লোকেরা মহানবী ﷺ-কে চিঠি লিখলেন যে, এখানে আল্লাহর রহমতে ইসলামের প্রচারে বরকত হয়েছে। এখন এমন একজন সাহাবী আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন, যিনি আমাদেরকে কুরআন শরীফ পড়াবেন। লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। আমাদের শরীঅতের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং নামাযের ইমামতি করবেন। সুতরাং মহানবী ﷺ হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রা)-কে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসাটি মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হল। (সীরাতে হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩)

এর পরবর্তী বছর হজ্জের মওসুমে মদীনা হতে এক দীর্ঘ কাফেলা মক্কায় এসে পৌঁছল। এতে ৭০ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা ছিলেন। মহানবী ﷺ তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং রাতে আকাবার নিকটে তাদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মধ্যরাতে সবাই সমবেত হলেন। মহানবীর চাচা আব্বাসও তাঁর সাথে এসেছিলেন। (অবশ্য তখনো তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি।)

হযরত আব্বাস (রা) সমবেত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, "আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র (মুহাম্মদ স.) সর্বদা তার গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে বাস করে আসছেন। আপনারা যাঁরা তাঁকে মদীনায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, তারা ভেবে দেখুন, যদি আপনারা তার সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার যথাযথ পালন করতে এবং শত্রুর হাত হতে তাঁর পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করেন, তাহলেই কেবল এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন, অন্যথায় তাঁকে তাঁর নিজের গোত্রেই থাকতে দিন।"

জবাবে মদীনার কাফেলার সরদার বললেন, "নিঃসন্দেহে আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি এবং মহানবী ﷺ-এর বায়আতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।" এ কথা শুনে (অঙ্গীকার ও বায়আত দৃঢ় করার উদ্দেশ্য) হযরত আসআদ ইবনে যুরারা দাঁড়িয়ে বললেন, "হে মদীনাবাসীগণ! একটু অপেক্ষা কর। তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারছ যে, তোমরা আজ যে বায়আত সম্পাদন করতে যাচ্ছ তা কিসের বায়আত? জেনে রাখ, এ বায়আত হচ্ছে, সমগ্র আরব ও আজমের বিরোধিতা ও মুকাবিলার অঙ্গীকার। যদি তোমরা এটা পালন করতে পার, তবেই শুধু বায়আত সম্পাদন কর। না পারলে তা পরিষ্কার জানিয়ে দাও।" এ কথা শুনে সকলেই এক বাক্যে বলে উঠলেন, "আমরা কোন অবস্থাতেই এই বায়আত হতে সরে যাব না।" অতঃপর তারা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করি, তাহলে আমরা এর কী প্রতিদান পাব?" মহানবী ﷺ বললেন,

"আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত।" এ কথা শ্রবণ করে সকলেই বলে উঠলেন, "আমরা এতেই সন্তুষ্ট। আপনি হস্ত প্রসারিত করুন। আমরা বায়আত করি।" মহানবী ﷺ তাঁর হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিলেন এবং সকলে বায়আতের গৌরব অর্জন করলেন। এই বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ জন পুরুষ এবং ২জন মহিলা। একে আকাবার দ্বিতীয় বায়আত বলা হয়। অতঃপর মহানবী ﷺ এদের মধ্য হতে ১২ জনকে সমগ্র কাফেলার নকীব বা যিম্মাদার মনোনীত করেন।

মদীনায় হিজরতের সূচনা

কুরায়শরা যখন এই বায়আতের সংবাদ অবগত হল, তখন তাদের ক্রোধের আর অন্ত রইল না। মুসলমানগণকে নির্যাতন করার কোন পথই আর বাকী রাখল না। তখন মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ কুরায়শদের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে গোপনে একজন দু'জন করে মদীনার দিকে হিজরত করতে আরম্ভ করল। শেষ পর্যন্ত মক্কায় শুধু মহানবী ﷺ, হযরত আবূ বকর (রা), হযরত আলী (রা) এবং কিছু সংখ্যক অক্ষম লোক ছাড়া আর কোন মুসলমানই অবশিষ্ট রইলেন না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকও হিজরতের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ এই বলে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেই তুমি ও আমি একসাথে হিজরত করব।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা) -কে তখন বলেছিলেন, তুমি আরো অপেক্ষা কর, আল্লাহ্ তা'আলা হয়ত তোমাকে উত্তম সাথী মিলিয়ে দিবেন। আবূ বকর (রা) এই অপেক্ষায় রইলেন এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে দুটি উষ্ট্রী সংগ্রহ করে রাখলেন। একটি তাঁর নিজের জন্য এবং অপরটি মহানবী ﷺ-এর জন্য। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৩১)

মহানবী ﷺ-এর মদীনায় হিজরত

কুরায়শ কাফিররা সমুদয় বিষয় অবহিত হয়ে মহানবীর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানসে দারুন-নাদওয়াতে একত্রিত হল। কেউ তাঁকে বন্দী করার পরামর্শ দিল এবং কেউ তাঁকে নির্বাসিত করতে বলল। কিন্তু তাদের ধূর্ত লোকেরা বলল, এর কোনটিই করা উচিত হবে না। বন্দী করা হলে তাঁর সমর্থক ও আনসারগণ আমাদের উপর চড়াও হবে এবং তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তাঁকে নির্বাসিত করলে তা হবে আমাদের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। এই অবস্থায় মক্কার আশপাশের সমস্ত আরবরা তার চরিত্র-মাধুর্য, মিষ্টকথা ও পবিত্র কালামের ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে উঠবে এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করবেন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

হতভাগা আবূ জাহল প্রস্তাব করল, মুহাম্মদকে হত্যা করা হোক। আর এই হত্যায় প্রত্যেক গোত্র হতে এক একজন করে লোক অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন, যাতে বানূ আবদে মানাফ (মহানবী ﷺ-এর গোত্র) প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। উপস্থিত সকলেই তার এই প্রস্তাব পসন্দ করল এবং প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে যুবককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হল। তাদেরকে বলে দেয়া হল যে, অমুক রাতে এই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবীকে ওহীর মাধ্যমে কুরায়শদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে অবিলম্বে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করলেন। যে রাতে কুরায়শ কাফিররা তাদের হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার পরিকল্পনা আঁটল এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক মহানবীর বাসগৃহ অবরোধ করল ঠিক সেই মুহূর্তে মহানবী ﷺ হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং হযরত আলী (রা)-কে বললেন, "তুমি আমার চাদর মুড়ি দিয়ে আমার তক্তপোশে শুয়ে থাক। তাহলে কাফিররা আমার অনুপস্থিতি আঁচ করতে পারবে না।"

মহানবী ﷺ যখন ঘর হতে বের হলেন, তখন তাঁর গৃহের চার পাশে রীতিমত কুরায়শ কাফিরদের মেলা বসে গেছে। তিনি সূরা ইয়াসীন পাঠ করতে করতে বের হলেন এবং যখন فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (আমরা

তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি। ফলে তারা দেখতে পাচ্ছে না।) এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন এই আয়াতকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের চোখের উপরে পর্দা ফেলে দিলেন। তারা মহানবী ﷺ-কে দেখতে পেল না। তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং পথঘাট চিনে এরূপ একজন লোককে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করে রেখেছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) মহানবী ﷺ এর সঙ্গী হলেন এবং উভয়ে বাড়ীর পিছনের খিড়কি পথে বের হয়ে ছাওর পর্বতের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান

মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকরসহ ছাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে কুরায়শ যুবকরা ভোর পর্যন্ত মহানবীর ঘর হতে বের হয়ে আসার অপেক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন জানতে পারল যে, তাঁর বিছানায় হযরত আলী (রা) শুয়ে আছেন, তখন তারা হতভম্ব হয়ে গেল। কালবিলম্ব না করে তারা চতুর্দিকে মহানবীর খোঁজে নিজেদের চর প্রেরণ করল। কেউ কেউ তাঁর পদচিহ্ন ধরে খোঁজ করতে করতে ঠিক ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সামান্য একটু নুয়ে তাকালেই মহানবী ﷺ-কে দেখতে পেত। এ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বিচলিত হয়ে উঠলেন। মহানবী ﷺ তাকে বললেন, "ভয় কর না, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন।" পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং কেউই একটু ঝুঁকে দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না। বরং তাদের সবচাইতে ধূর্ত ব্যক্তি উমায়া ইবনে খালাফ বলে উঠল, "এখানে তাঁর থাকা অসম্ভব।" কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ইঙ্গিতে এই গুহার প্রবেশপথে রাতারাতি মাকড়সা জাল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর কোথা হতে এসে বাসা তৈরী করে ফেলেছিল। হযরত সুহায়ল (রহ) বলেন, হেরেম শরীফের কবুতরসমূহের বংশ-পরম্পরা সেই কবুতর হতেই শুরু হয়।

(সীরাতে মোগলতাঈ)

মহানবী ﷺ ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই গুহায় একটানা তিন রাত আত্মগোপন করে রইলেন। এমনকি অন্বেষণকারীরা নিরাশ হয়ে গেল। এই তিন দিনই রাতের অন্ধকারে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ গোপনে তাদের কাছে আগমন করতেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই মক্কায় ফিরে যেতেন। সারাদিন কুরায়শদের সংবাদপত্র সংগ্রহ করে রাতে তা মহানবীর কাছে বর্ণনা করতেন। অপরদিকে তাঁর বোন হযরত আসমা (রা) প্রত্যহ রাত্রে তাঁদেরকে খাবার পৌঁছে দিতেন। আরবরা ছিল পদচিহ্ন বিশারদ। তাই পদচিহ্ন মুছে ফেলার উদ্দেশ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ প্রত্যহ ঐ গুহা পর্যন্ত বকরীগুলোকে চরাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর গোলামকে বলে রেখেছিলেন।

ছাওর গুহা হতে মদীনা যাত্রা

ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ঠা রবীউল আওয়াল সোমবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আমর ইবনে ফুহায়রা সেই উটনী দুটি নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা এই সফরের জন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তাঁর সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে উরায়কীতও আসলেন, যাকে তিনি পথ-প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাথে নিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ একটি উটনীর উপর আরোহণ করলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দ্বিতীয়টির উপর। হযরত আবূ বকর (রা) বিমতের জন্য আমর ইবনে ফুহায়রাকেও নিজের সাথে বসিয়ে নিলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে উরায়কীত পথ-প্রদর্শনের জন্য আগে আগে চলছিলেন। (সীরাতে হালবিয়া)

সুরাকার ঘোড়া মাটিতে দেবে যাওয়া

মহানবী ﷺ মদীনার পথে এগিয়ে চলেছেন। কুরায়শী দূত সুরাকা ইবনে মালিক মহানবী ﷺ-কে তালাশ করতে করতে সেখান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সে যখন মহানবীর নিকটবর্তী হল, তখন তার ঘোড়াটি হুমড়ি

হোঁচট খেলো এবং সে ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গেল। কিন্তু সে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে মহানবীর পেছনে ধাওয়া করল এবং এত নিকটে গিয়ে পৌঁছল যে, মহানবীর কুরআন তিলাওয়াতের আওয়ায পর্যন্ত সে শুনতে পাচ্ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তখন বারবার পিছনে পিছনে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করলেন না। যখন সে একেবারে কাছে এসে গেল, তখন তার ঘোড়ার চারটি পা-ই শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেল এবং সুরাকা আবারো মাটিতে ছিটকে পড়ল। সে ঘোড়াটিকে বের করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হল। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে মহানবী ﷺ এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। তিনি থেমে গেলেন এবং তাঁর বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভেতর হতে উঠে আসল। (সীরাতে মোগলতাঈ)

ঘোড়াটির পা যখন মাটি হতে বের হল, তখন তার পায়ের গহ্বর হতে ধোঁয়া নির্গত হতে দেখা গেল। এ দৃশ্য দেখে সুরাকা আরো বেশী হতভম্ব হয়ে পড়ল এবং অতি বিনীতভাবে তার সমুদয় পাথেয়, আসবাবপত্র, উট প্রভৃতি মহানবীর চরণে সমর্পণ করতে লাগল। মহানবী ﷺ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ করনি বিধায় আমি তোমার মাল গ্রহণ করতে পারি না। তবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আমাদের অবস্থান কাউকে বলবে না।" সুরাকা ফিরে আসল এবং মহানবী নিরাপদ স্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত সে কারো নিকট এ ঘটনা প্রকাশ করল না। (হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৬)

সুরাকার স্বীকারোক্তি

কিছু দিন পর সুরাকা আবূ জাহলের কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। বলল, "হে আবূ হিকাম! (আবূ জাহলের উপাধি সমগ্র আরবে "আবূ হিকাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠোর ইসলাম-বিদ্বেষী হওয়ার কারণে তাকে আবূ জাহল উপাধি প্রদান করা হয়।) দেবতা লাত-এর কসম খেয়ে বলছি, তুমি যদি সেই ঘোড়াটির পা হাঁটু পর্যন্ত যমীনে ঢুকে পড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ যে আল্লাহর রাসূল সে ব্যাপারে তোমার সন্দেহের কোন অবকাশই থাকত না। আমার মতে তাঁর বিরোধিতা হতে তোমাদের বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখা অবশ্য কর্তব্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর বিজয়ের নিদর্শনসমূহ ভাস্বর হয়ে উঠবে। তখন সকল মানুষই কামনা করবে যে, যদি আমরা তাঁর সাথে সন্ধি করে নিতাম, তাহলে কতই না ভাল হত।"

কুবায় অবতরণ

এখান থেকে রওয়ানা হয়ে মহানবী ﷺ কুবায় পৌঁছলেন। কুবা মদীনার অদূরে একটি স্থান। মহানবী ﷺ ও তাঁর সহচরগণ কুবায় ১৪ দিন অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই সর্বপ্রথম মসজিদ, যা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর নির্মিত হয়।

হযরত আলী (রা)-এর কুবায় মিলন

মহানবী ﷺ-এর আমানতদারী কাফিরদের মাঝেও স্বীকৃত ছিল। তাই সততই তাঁর নিকট লোকজনের আমানত গচ্ছিত থাকত। হিজরতের সময় তিনি হযরত আলীকে সেকারণেই মক্কায় রেখে এসেছিলেন। যাতে তিনি মহানবীর নিকট জনগণের গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়ে তিনিও মদীনায় পৌঁছে যান। হযরত আলী (রা) সে কাজ সম্পন্ন করে মহানবীর সাথে কুবায় এসে মিলিত হন।

মহানবী ﷺ এর মদীনায় প্রবেশ

রবীউল আওয়াল মাসের জুমআর দিন কুবা হতে বিদায় নিয়ে মহানবী ﷺ মদীনার দিকে রওয়ানা হন। মদীনাবাসী মহানন্দে মহানবী ﷺ এর সওয়ারীকে ঘিরে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাদের কেউ বা পদব্রজে, আবার কেউ বা কোন বাহনে আরোহণ করে পথ চলছিলেন। মহানবীর উটনীর লাগাম ধরে টানার জন্য প্রত্যেকেই সম্মুখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। মহানবী যেন তার বাড়ীতেই অবস্থান করেন এটাই ছিল প্রতিটি মদীনাবাসীর মনের একান্ত বাসনা। মহিলা ও শিশুরা আনন্দে গান গাচ্ছিল। দিনটি ছিল জুমুআর দিন। বনূ সালিম ইবনে

আওফের বসতির নিকট জুমুআর নামাযের সময় হয়ে গেল। মহানবী ﷺ সওয়ারী হতে অবতরণ করে জুমুআর নামায আদায় করলেন এবং পুনরায় সওয়ার হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে আনসারীর বাড়ী সামনে পড়ত, তিনি তাঁর বাড়ীতেই অবস্থান করার জন্য মহানবীকে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বলছিলেন, "তোমরা আমার উটনীকে নিজের মনে চলতে দাও। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আদিষ্ট। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য এটিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে পৌছে সে নিজেই থেমে যাবে। সুতরাং উটনীটি আপন মনে চলতে লাগল। শেষে মহানবীর মাতুল বংশ বনূ আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর বাড়ীর সামনে গিয়ে উটনীটি বসে পড়ল। মহানবী ﷺ আবূ আয়্যূব আনসারীর মেহমান হলেন এবং বেশ কিছুদিন তাঁর গৃহেই অবস্থান করলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদীনায় তখনো পর্যন্ত কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। যেখানে সুযোগ হত, সেখানেই নামায আদায় করা হত। এরপর উটনীটি যেখানে বসেছিল ঐ জায়গাটি খরিদ করা হল। আর সেখানেই মসজিদে নববী নির্মাণ করা হল। এর দেয়ালসমূহ ছিল কাঁচা ইটের তৈরী, খুঁটি ছিল খেজুর বৃক্ষের আর ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। তখন কিবলার রুখ ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস। মসজিদের সাথে দুটি প্রকোষ্ঠও তৈরী করা হল। একটি হযরত আয়েশার জন্য এবং অন্যটি হযরত সাওদার জন্য। এরপর মহানবী ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য একজন লোককে মক্কায় প্রেরণ করেন। ঐ সময় হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে মদীনায় আনয়ন করেন। নবী সহধর্মিণী হযরত সাওদা (রা) এবং নবী-দুহিতা হযরত ফাতিমা ও উম্মে কুলছুম (রা) মদীনায় এসে গেলেন। তৃতীয় কন্যা হযরত যায়নাবকে তাঁর স্বামী আবুল আস (যিনি তখনো মুসলমান হননি) আটকে রাখলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ তাঁর মাতা এবং উভয় বোন হযরত আয়েশা (রা) ও আসমা (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনায় এসে পৌছলেন। শারীরিকভাবে ভ্রমণ করতে অক্ষম এরূপ কতিপয় মুসলমানই কেবল মক্কায় অবশিষ্ট রয়ে গেলেন। এমনকি এই অক্ষমদের মধ্য হতেও কেউ কেউ মদীনার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই তাদের ওফাত হয়ে গেল।

প্রথম হিজরী

ইসলামে জিহাদের নির্দেশ

মহানবী ﷺ-এর ৫৩ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন চিত্র পাঠকের সামনে এসে গেছে। এ পর্যায়ে পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কেমন করে হয়েছে তাও মোটামুটি জানা গেছে। হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণী ও গোত্রের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান অপেক্ষা এমনকি নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় মনে করতে লাগলেন। তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ কি ছিল? রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোরজবরদস্তি, ধন-সম্পদের লোভ, সম্মান-প্রতিপত্তির মোহ কিংবা কোন সশস্ত্র বাহিনীর তরবারির ভয় কি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল, নাকি এর পেছনে অন্য কোন কারণ ছিল? যখন এই নিরক্ষর নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের করুণ অবস্থাসমূহের প্রতি দৃকপাত করা যায়, তখন স্বার্থহীনভাবেই এ কথা বলা যায় যে, সম্পদের মোহ কিংবা রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি চালানোর তো প্রশ্নই উঠে না। কারণ,তার সুযোগই তো ছিল না। যে ইয়াতীম সন্তানটির পিতার স্নেহচ্ছায়া পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই তাঁর মাথার উপর হতে উঠে গিয়েছিল, যাঁকে শৈশবের ছয় বছর বয়সে জননীর স্নেহ-মমতার ক্রোড় হতেও বঞ্চিত হতে হয়েছিল, যাঁর গৃহে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বালাবার সুযোগ পর্যন্ত আসত না, যাঁর পরিবার-পরিজন কোন দিন পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পেত না, যাঁর হাতে গোনা জীবিত আত্মীয়-স্বজন ও একটি মাত্র সত্যের বাণী উচ্চারণের অপরাধে শুধু তাঁর নিকট হতে দূরেই সরে যায়নি, বরং তাঁর কঠিন শত্রুতে পরিণত হয়েছিল, তিনি কি কারো উপর রাজত্ব কায়েম করার লোভ করতে পারেন, অথবা

ধন-সম্পদের লোভ দেখিয়ে বা তরবারির জোরে কাউকে স্বীয় মতাদর্শ গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন? ইতিহাসের বিরাট দফতর আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে, যাতে সপ্রমাণিত হয় মহানবীর পবিত্র জীবনের এই ৫৩টি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, প্রথম জীবনের সহায়-সম্বলহীনতা ও অসহায়ত্বের পরে যখন ইসলাম অনেকটা স্বতন্ত্র শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিল এবং অনেক বড় বড় বীরযোদ্ধা ও বিত্তশালী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তখনো ইসলাম কোন কাফিরের গায়ে হাত উঠায়নি, অত্যাচারীদের অত্যাচারেরও কোন জবাব পর্যন্ত দেয়নি। অথচ মক্কার কাফিরদের পক্ষ হতে শুধু মহানবীই নন, তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারী-অনুরাগীগণের উপর এমন নির্মম নির্যাতন চালান হয়েছে যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কুরায়শ কাফিররা মহানবীর উপর নির্যাতনে, এমনকি তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখেনি। যেমন, দীর্ঘ তিন তিনটি বছর মহানবী ﷺ-কে তাঁর সকল অনুসারী ও অনুরাগীগণসহ অবরুদ্ধ করে রাখা, মহানবীর সাথে কুরায়শদের সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ, তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও সাহাবা কিরামের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন-নিপীড়নের করুণ বর্ণনায় ইতিহাসের একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় রঞ্জিত হয়ে আছে।

এতকিছু সত্ত্বেও কুরআন তার অনুসারীগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহারেরই অনুমতি দিচ্ছিল না। অবশ্য তখন যে জিহাদের নির্দেশ ছিল, তা হল ঃ কাফিরদেরকে কৌশলও উপদেশমূলক কথাবার্তার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দিকে আহ্বান কর।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ .

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর উত্তম পন্থায়। (সূরা নাহল ঃ আয়াত ১২৫)

আয়াতটির মর্মার্থও এই বিষয়টিকে প্রকাশ করে। আর যদি পারস্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহলে উত্তম কৌশল এবং নম্র কথার মাধ্যমে তাদের মুকাবিলা কর এবং কুরআনের প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমেই তাদের সাথে পূর্ণ জিহাদ কর যেন তারা সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا (এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের সাথে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যাও। (সূরা ফুরকান ঃ আয়াত ৫২) এর মর্মার্থও ঠিক এটাই।

এই সময় পর্যন্ত যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের বলয়ভুক্ত হয়ে সর্বপ্রকার নির্যাতনকে নীরবে সহ্য করে নিয়েছিলেন বস্তুত তারা দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ অথবা তরবারির জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হতে পারেন না। এই প্রকাশ্য বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার পরেও কি কারও পক্ষে এই কথা বলার অবকাশ আছে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে? তারা কি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারবে যে, যারা মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের প্রয়োজনে তরবারি ধারণ করতে এবং নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করত না, তাদের উপর কে তরবারি চালিয়েছিল? তারা কি বলতে পারে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারুক (রা), হযরত উছমান গনী (রা) আর হযরত আলী (রা)-এর উপরে কে তরবারি চালিয়ে তাদেরকে মুসলমান বানিয়েছিল? হযরত আবূ যার্‌র গিফারী (রা), হযরত উনায়স (রা) এবং তাঁর গোত্রকে কে বাধ্য করেছিল যে, তারা সবাই এসে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন? নাজরানের খৃস্টানগণের উপর কে বলপ্রয়োগ করেছিল যে, তারা মক্কায় এসে স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গেলেন। যামাদ আযদীকে কে বাধ্য করেছিল? তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রা) এবং তার গোত্রের লোকদের উপর কে তরবারি চালনা করেছিল? বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের উপরে কে চাপ সৃষ্টি করেছিল? মদীনার আনসারদের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তাঁরা শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হলেন না, বরং মহানবী ﷺ-কে নিজেদের দেশে ডেকে এনে সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজেদের মাথায় তুলে নিলেন এবং নিজেদের জানমাল তাঁর জন্য উৎসর্গ করে দিলেন? বুরায়দা আসলামীকে কে বাধ্য করেছিল যে, তিনি ৭০ জন লোকের বিরাট কাফেলাসহ মদীনার পথে মহানবীর দরবারে

উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে মুসলমান হয়ে গেলেন? আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর উপর কোন তরবারি চালিত হয়েছিল যে, তিনি তাঁর বাদশাহী ও সার্বভৌম প্রতিপত্তি সত্ত্বেও হিজরতের পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন? আবূ হিন্দ, তামীম, নাঈম প্রমুখের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করেছিল যে, তারা সুদূর সিরিয়া হতে সফর করে মহানবীর দরবারে উপনীত হলেন এবং তাঁর গোলামী বরণ করে নিলেন? এমনি ধরনের শত শত ঘটনায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। এগুলো এমন অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য, যা প্রত্যক্ষ করার পর প্রত্যেকটি মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য যে, ইসলাম তার মহিমা প্রচারে কখনো তরবারির মুখাপেক্ষী ছিল না।

ইসলাম প্রচার তরবারির মুখাপেক্ষী নয়

জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য কখনো এ হতে পারে না যে, মানুষের গলায় তরবারি ঠেকিয়ে তাদেরকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হবে অথবা তাদেরকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করান হবে। জিহাদের সাথে সাথে জিযিয়া করের নির্দেশ এবং কাফিরদেরকে যিম্মী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে ঠিক মুসলমানদের মতই তাদের জানমালের হিফাযত সংক্রান্ত ইসলামী বিধানসমূহ এই সাক্ষ্য বহন করে যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম কখনো কোন কাফিরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করেনি। তাই যে-কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির স্থিরচিত্তে চিন্তা করা উচিত যে, ইসলামে কী উদ্দেশ্যে এবং কী কী উপকারিতার জন্য জিহাদ ফরয করা হয়েছে। তাহলে তিনি বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে, যে ধর্মমত মানুষকে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তার অনুসারী বানায়, সে ধর্মকে যেমন পূর্ণাঙ্গ মনে করা যায় না, তেমনি সেই ধর্মও পরিপূর্ণ নয়, যাতে রাজনীতির স্থান নেই। আর সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নয়, যার সাথে ধর্ম এবং জিহাদের কোন সম্পর্ক নেই।

রাজনীতিবর্জিত ধর্ম ও জিহাদবর্জিত রাজনীতি কোনটাই পূর্ণাঙ্গ নয়

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনো দক্ষ হতে পারে না, যে শুধু মলম লাগাতে কিংবা ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে জানে, কিন্তু পলিত ও অকেজো অঙ্গসমূহের অস্ত্রোপচার করতে জানে না।

যখন পৃথিবীর সারাটা দেহ জুড়ে শিরকের বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ল এবং সেটি একটি ব্যাধিগ্রস্ত দেহের মত হয়ে পড়ল, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা একে ব্যাধিমুক্ত করার লক্ষ্যে একজন সংস্কারক এবং সরদী চিকিৎসক [মুহাম্মদ ﷺ]-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর জীবনের ৫৩টি বছর বিরামহীনভাবে এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রতিটি শিরা-উপশিরা নিরাময় করে তোলার জন্য চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা করলেন। ফলে, সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু যে অঙ্গগুলো সম্পূর্ণভাবে পচে গিয়েছিল এবং সেগুলোর সংশোধনের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রইল না। বরং প্রতি মুহূর্তে এদের বিষক্রিয়া সমগ্র দেহে সংক্রমিত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দিল, তখন অপারেশনের মাধ্যমে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গসমূহকে কেটে ফেলে দেয়াই ছিল অভিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আর এ কারণেই যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তার প্রতিপক্ষের শুধু সেইসব লোককে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছে যাদের ব্যাধি ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ যারা স্বভাবগতভাবে অন্যকেও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিল। যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করত এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হত। কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নারী, শিশু ও যেসব বৃদ্ধ ও ধর্মবেত্তাগণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত না মুসলমানদের তরবারির ধার তাদের জন্য ভীতির কারণ ছিল না। এমনকি যেসব লোক কোন চাপের মুখে বাধ্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করত, তারাও মুসলমানদের হাত হতে নিরাপদ ছিল। হযরত ইকরিমা (রা) বলেন, "বদরের যুদ্ধে মহানবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছিলেন যদি বনু হাশিম গোত্রের কোন লোক তোমাদের সম্মুখে আগমন করে, তবে তাকে হত্যা করবে না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তাকে জোর করে আনা হয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২)

বস্তুত বণ্টনে উপস্থিত ও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্য হতেও যথাসম্ভব সেইসব লোককে রক্ষা করা হত, যাদের সংস্রবভাব ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে মহানবী ﷺ অবহিত হতেন। নিম্নের ঘটনাটি তাঁরই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অষ্টম হিজরী সালে মহানবী ﷺ যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মক্কার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন পথে জনৈক বেদুইন সরদার তাঁর সমীপে উপস্থিত হল এবং সে মহানবী ﷺ-এর জিহাদকে জাহিলিয়াত যুগের আরবদের যুদ্ধবিগ্রহের সাথে তুলনা করে নিবেদন করল যে, আপনি যদি সুন্দরী নারী ও লাল রঙের উট পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহলে বনূ মুদলাজ গোত্রকে আক্রমণ করুন। কেননা, তাদের মধ্যে এ দু'টি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মহানবী ﷺ বললেন, মহান আল্লাহ আমাকে বনূ মুদলাজ গোত্রকে আক্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (ইহইয়াউল উলূম)

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, "একদা মহানবী ﷺ-এর নিকট সাতজন যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হলে তিনি তাদেরকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। ঠিক এমনি সময় হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেন এবং মহানবী ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছয় জনের ব্যাপারে এই নির্দেশই বহাল রাখুন, কিন্তু ঐ একটি লোককে মুক্ত করে দিন। মহানবী ﷺ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। মহানবী ﷺ বললেন, আপনি কি নিজের পক্ষ হতে এই সুপারিশ করছেন, না এটা আল্লাহ তা'আলার আদেশ? জিবরাঈল (আ) বললেন, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে এ ব্যাপারে আদেশ প্রদান করেছেন।" (অনূল উম্মাল, পৃঃ ১৩৫, ইবনে জাওযী)

ইসলামী জিহাদের সাথে তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের পৃথিবী-বিধ্বংসী যুদ্ধের মিল খোঁজার কোন যৌক্তিতা থাকতে পারে না। কারণ, তাদের সর্বধ্বংসী যুদ্ধের নীতি হল, নিজেদের খেয়ালখুশী ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সকলকে নিধন করা। শহরের পর শহর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সাথে ধ্বংস করে দেয়া।[১]

সারকথা, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জিহাদেরই উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটান, ইসলামের নিরাপত্তার বিধান আর ইসলাম প্রচারের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়, সেগুলোর অপসারণ। এ সমস্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর সাধারণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং মার্গোলিউস ও অন্যান্যের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামী জিহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বলপূর্বক মুসলমান বানান এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা। তেমনিভাবে ইসলামী ঐতিহ্য ও সাহাবীগণের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কর্মসমূহ পর্যালোচনা করার পর এ ব্যাপারেও আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ ফরয করা হয়েছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যত নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে অপসারিত করার জন্য আক্রমণাত্মক জিহাদও কিয়ামত পর্যন্ত জরুরী করা হয়েছে। মহানবী ﷺ এর মহাবাণী الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। (জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে)-এর মর্মার্থও এটাই এবং আত্মরক্ষামূলক জিহাদের উদ্দেশ্য যেমন মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানান নয়, তেমনিভাবে আক্রমণাত্মক জিহাদের উদ্দেশ্যও কস্মিনকালে তা হতে পারে না। বিশেষত যেখানে সাক্ষাত সমরক্ষেত্রেও ইসলামের প্রশস্ত আঁচল কাফিরদেরকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কুফরীর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাদের জানমাল এবং মান-সম্ভ্রমকে তেমনিভাবে রক্ষা করার জন্য প্রসারিত রয়েছে, যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। তাতেই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জিহাদই সমান তাৎপর্যপূর্ণ। এ ছাড়া পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা, দুর্বলদেরকে অত্যাচারীদের কবল হতে মুক্ত করা ইত্যাদি যা জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য– তাতেও উভয় প্রকার জিহাদেরই ভূমিকা সমান। সুতরাং ইসলামী ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে আক্রমণাত্মক জিহাদকে অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

কোন কোন পাশ্চাত্য মহল দাবি করে যে, ইসলাম নিজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণী শক্তি দ্বারা লোকদেরকে নিজের দিকে টেনে আনেনি, বরং তলোয়ারের ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণের মায়ায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। পরে যুগ পরিবর্তনের সাথে এই নতুন ধর্ম তাদের মনোপূত ও গা-সহা হয়ে গিয়েছে। তাদের এ ধারণা ও দাবী সম্পূর্ণ অমূলক। জগতে ইসলাম ধর্ম প্রচার তলোয়ারের দ্বারাও হয়নি, অন্য কোন প্রকার ভয় প্রদর্শনেও হয়নি। অমানিশার ঘনান্ধকারে যেমন পতঙ্গরাজি কোন অজানিত টানে প্রজ্বলিত দীপালোকের দিকে ছুটে আসে, তেমনি সত্য-সনাতন ইসলামের জ্যোতি ও উদারতা ধর্মান্বেষী মানব মাত্রেরই প্রাণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ইসলামেরই প্রয়োজনে মুসলমানদেরকে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু এটা স্থির নিশ্চিত যে, কাউকে বল-পূর্বক মুসলমান করা এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। মুসলমানগণ কার্যত কোন স্থলে তা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক, অথবা অন্য কোথাও হোক, এমন আচরণ প্রকাশ করেনি, যাতে ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগের আভাস মাত্রও পাওয়া যাবে। আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে দাবী করতে পারি যে, ইসলামের মূলনীতিসমূহের নিজস্ব সৌন্দর্যই ইসলাম প্রচারের প্রকৃত সহায়। ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ, ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আচরণ ও প্রচার আদর্শ মুসলমানদের চরিত্র-মাধুর্য ও মহানুভবতা প্রভৃতি আলোচনা করলে আমাদের দাবীর বাস্তবতা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শরীঅতে ইসলামে কাউকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করার প্রতি কঠিন নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে। কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে- لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ .

অর্থ : ধর্ম সম্পর্কে বলপ্রয়োগের বিধান নেই। যেহেতু সুপথ কুপথ হতে পৃথক হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৫৬)

অন্য এক স্থানে আছে ঃ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? (সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

মুসলমানগণ কুরআনের এই আদেশ সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। তারা আরবের বাইরে পদার্পণপূর্বক পারস্য, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বহু সহস্র বছরের পুরাতন ও শক্তিশালী রাজ্যগুলোকে অত্যল্পকালের মধ্যে পরাভূত করে এই সমস্ত রাজ্যে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিল। কিন্তু বিজয়গর্বে গর্বিত হয়ে কোন সময়েই কাউকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা তারা করেননি। এমনকি তারা কাউকে কোন প্রকার লোভ-লালসায় বশীভূত করে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রলুব্ধ করেছেন-এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্ম-প্রচার মানসে মুসলমান বাদশাহগণ পর্যন্ত এমন উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, যাতে সকলেই এটা বুঝতে পারে যে, ইসলাম প্রচারের পশ্চাতে সামান্য প্রলোভনও বিদ্যমান ছিল না। খলীফা ও বাদশাহগণের রাজত্বকালে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং নক্ষত্রোপাসকগণ নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে নিজেদের ধর্ম-কর্ম পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পালন করত। এতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ছিল না। বিধর্মীদের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদের অনুরূপই ছিল। মুসলমানদের ধন-প্রাণের যেরকম মূল্য ছিল, বিধর্মী প্রজাদের ধন-প্রাণের মূল্যও তদপেক্ষা কম বিবেচিত হত না। বিধর্মী প্রজাদের প্রাণনাশে দণ্ডস্বরূপ মুসলমানের প্রাণদণ্ড হওয়া ইসলামী ধর্মগ্রন্থেরই আদেশ।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ও বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত এবং এখনো হচ্ছে এ রকম যদি ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে করা হত, তবে মুসলিম রাজ্যসমূহে কোন বিধর্মীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। স্পেনে কোটি কোটি মুসলমানের বাস ছিল এবং সেখানে আট শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীন ছিল। কিন্তু কখনো মুসলমানগণ বিধর্মীদের অস্তিত্ব বিলোপ করার সামান্য চেষ্টাও এখানে করেনি। অথচ ইসলামী রাজত্ব অবসানের সাথে সাথে এই সুবিস্তৃত রাজ্য হতে মুসলমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। শুধু স্পেনই নয়, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি রাজ্যেও যদি মুসলমানগণ সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিত, তবে এই

সমস্ত দেশে ভিন্ন ধর্মের নাম-গন্ধ পর্যন্ত বাকী থাকতে পারত না। তদানীন্তন ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীও স্বীয় বক্ষে অষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য সিংহাসন ধারণ করে রেখেছিল। অথচ এখানেও সর্বদা অমুসলমানের সংখ্যা অধিক রয়েছে। সুস্থ মনে চিন্তা করে দেখুন, রাজধানী হতে বহুদূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের পূর্ব সীমান্তে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হতে পেরেছিল। যদি রাজধানীর ভেতরে ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে সামান্য মাত্রও চাপ দেয়া হত এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন রকমের প্রলোভনের সমাবেশ করা হত, তবে সেখানে কোন অমুসলমানের অস্তিত্ব থাকতে পারত কি? অমুসলমানদের উপর কোন প্রকার চাপ দেয়া তো দূরের কথা, সাম্যবাদ এবং সর্বজাতীয় স্বাধীনতার মানদণ্ড মুসলমানগণ এমনভাবে ঠিক রেখেছিল যে, ইসলামী শক্তির পূর্ণ যৌবনকালেও খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজক ও পুতুলপূজক সম্প্রদায় বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে মুসলমানদের সাথে স্বাধীনতার প্রতিযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হত না।

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আব্বাস বংশীয় খলীফাদের রাজত্বের সময় ইবরাহীম ইবনে হিলাল নামক জনেক নক্ষত্রপূজক আরবী সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি একটি সাধারণ রাজ-কার্যে চাকরী গ্রহণ করেন। পরে উন্নতি করে বাদশাহ ইয়যুদ্দৌলার রাজত্বকালে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইয়যুদ্দৌলা ও তাঁর ভাই আযদুদ্দৌলার মধ্যে রাজ্য সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। ইয়যুদ্দৌলার পক্ষ হতে যে সমস্ত চিঠিপত্র তার ভ্রাতার নিকট প্রেরিত হত, সেগুলো নিতান্ত আক্রমণমূলক হত এবং মন্ত্রী ইবরাহীমের হাতেই এ সমস্ত পত্র লিখিত হত। উত্তরকালে আযদুদ্দৌলা সিংহাসনপ্রাপ্ত হলে ইবরাহীমের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় তাকে গ্রেফতার করলেন। তখন বড় বড় মুসলমান রাজ-কর্মচারীগণ এই অনন্যসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগলেন। বাদশাহ শুধু তার অপরাধই ক্ষমা করলেন না, তাঁকে ইসলামী ইতিহাস লেখার মত দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করে অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিলেন।

ইবরাহীম ইবনে হিলালের মৃত্যু হলে মুসলমান রাজ-কর্মচারী এবং আলিমগণ তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। আযদুদ্দৌলার আন্তরিক আগ্রহ ছিল, যাতে ইবরাহীমের মত বিদ্বান ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করেননি, যাতে ইবরাহীমকে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। এমন কিছু করা হয়নি, যাতে স্বধর্মে থেকে তাকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামী রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইবনুতৃতিলমিয় নামক এক খৃষ্টান আলিম খলীফার দরবারে আজীবন চাকরী করেছিলেন। নিজ গুণে তিনি বাদশাহের মুসাহিবের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অথচ তাকে ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এ সমস্ত ঘটনা কি এ কথার জ্বলন্ত প্রমাণ নয় যে, বল প্রয়োগে মুসলমান করার প্রথা ইসলামের পূর্ণ শক্তির সময়েও মুসলমানদের মধ্যে ছিল না?

ইসলামী জিহাদ

কেউ বলতে পারেন, যদি ইসলাম ধর্মে বলপ্রয়োগের ব্যবস্থা না থাকত, তবে ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য কি? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, জগতে কোন্ জাতি যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া নিজেদের রাষ্ট্রীয় জীবন রক্ষা করতে পারছে? দুনিয়ায় এমন কোন রাষ্ট্রীয় জাতি নেই, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়নি কিংবা অন্ততপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পারছে? দুনিয়ায় এমন কোন রাষ্ট্রীয় জাতি নেই, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়নি কিংবা অন্ততপক্ষে যুদ্ধ-বিগ্রহ সমর্থন করে না। বর্তমান জগতের কোন্ রাষ্ট্র যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যুদ্ধোপকরণ ব্যতীত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছে? হয়ত কেউ বলতে পারেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও ধর্ম এক জিনিস নয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যুদ্ধ-বিগ্রহ সমর্থিত হলেও ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই লড়াই-ঝগড়ার স্থান নেই। অথবা বলব ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মেই লড়াই-ঝগড়ার স্থান নেই। অথবা বলব ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে উপাসনার সাধারণ নিয়ম ব্যতীত মানব জীবনের তুলনা করতে যাওয়াই ভুল। ইসলাম হল পূর্ণাঙ্গ ধর্ম, আর অন্যান্য সকল ধর্ম হল অপূর্ণ ধর্ম। দ্বিতীয়ত, কোন ধর্মে যদি সর্বাবস্থায়ই যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়ে থাকে, তবে সেই ধর্ম পালনযোগ্যই হতে পারে না। যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন ধর্ম নীরব হয়ে থাকলে বলতে হবে যে, সেই ধর্মে সকল বিষয়ের ব্যবস্থা নেই। সুতরাং তা পূর্ণাঙ্গ নয়। ইসলাম সে রকম ধর্ম নয়। মানুষ জীবনে যত রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে

পারে, তার সবগুলোর সুস্পষ্ট ব্যবস্থাই ইসলামে রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহার, চরিত্র সংশোধন ইত্যাদি জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিধি-ব্যবস্থা যেমন ইসলামে আছে, তদ্রূপ পারিবারিক জীবনে মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সাথে কিভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তাও ইসলামে আছে। সামাজিক জীবনে প্রতিবেশীর সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, সমাজে শান্তি বহাল রাখতে কি কি জিনিস আবশ্যক, রাজনৈতিক জীবনে কিরূপে দেশ শাসন ও প্রজাপালন করতে হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে কি রকম ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে শান্তি রক্ষা করে চলতে হবে, আবার ঘটনাচক্রে যুদ্ধ বাধলেই বা কি বিধি-ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ করতে হবে–এ সমুদয় দিক-নির্দেশনা ইসলাম সুস্পষ্ট রূপেই প্রদান করেছে। এক কথায়, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা।

কোন কোন মুসলমানও মনে করেন যে, ধর্ম বলতে কেবল ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুনই বুঝায়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা এবং রাজনীতি ইসলামের বহির্ভূত বিষয়। তাদের এই ধারণা অজ্ঞতাপ্রসূত ও ভ্রমাত্মক। মানব জীবনের সমস্ত বিষয়ই ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত। তাই রাজনীতিও ইসলামের বাইরে নয়। আর জগতের সমস্ত রাজনীতিই যখন অবস্থা বিশেষে যুদ্ধের ব্যবস্থা দেয়, তখন ইসলামী রাজনীতিতে যুদ্ধের ব্যবস্থা থাকতে দোষ কি? দুনিয়ার কোন জাতিই যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতীত রাষ্ট্রীয় জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, তখন মুসলমানেরা কিরূপে বেঁচে থাকতে পারবে? বস্তুত যুদ্ধ-ব্যবস্থা সব জাতিই মানতে বাধ্য। তফাত কেবল এখানে যে, অন্যান্য জাতির নিকট রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ বলে গণ্য নয়। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যবস্থা তাদের ধর্ম-পুস্তকে নেই। আর মুসলমানদের নিকট রাজনীতিও ধর্মের অংশ। সুতরাং অন্যান্য সকল ব্যবস্থার মতো যুদ্ধের ব্যবস্থা ও নিয়মাবলী ইসলামী ধর্মপুস্তকে বিবৃত হয়েছে।

ইসলামী জিহাদ ও অন্যান্য জাতির যুদ্ধের মধ্যে আরেকটি তফাত এই যে, ইসলামী জিহাদ ধর্মের খাতিরে হয়ে থাকে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থের খাতিরে নয়। আর অন্যান্য জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহ সাধারণত অর্থনৈতিক স্বার্থে হয়ে থাকে। এক জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের সামান্য অসুবিধা হলে অমনি আরেক জাতির সাথে তার সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায়।

হিদায়া প্রভৃতি ইসলামী বিধান-পুস্তকে জিহাদের দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। ই'জামে দীন ও রফয়ে ফাসাদ অর্থাৎ ধর্মের মর্যাদা রক্ষা এবং অত্যাচার-অনাচার প্রতিরোধ করা। ইসলামী জিহাদ আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণমূলক এই দুই প্রকারেই হয়ে থাকে। অবশ্য মুসলমানদের প্রাথমিক যুগের অধিকাংশ যুদ্ধই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হয়েছিল। কিন্তু অনেক সময় এমনও হয়েছে যে, প্রতিবেশী কোন রাজশক্তি মুসলমানদের অধীনতাও স্বীকার করছে না, স্বাধীন থেকে মুসলিম রাজশক্তির সাথে নিরাপত্তামূলক সন্ধিও করছে না, বরং মুসলিম রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের আশু বিপদের কোন আশংকা না থাকলেও হয়ত ভবিষ্যতে তাদের শান্তি বিপন্ন হতে পারে এবং তাদের ধর্মের উপরেও আক্রমণ হতে পারে। সুতরাং সন্ধিবিহীন যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবশ্যক বোধে মুসলিম রাজশক্তি যুদ্ধ করতে পারে এবং তাকে পরাভূত অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য করতে পারে। একে আক্রমণমূলক জিহাদ বলা যেতে পারে। কিন্তু এতে ইসলামের উপর কোন প্রকার দোষারোপের প্রশ্ন আসতে পারে না। বর্তমান সভ্যজগতের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাতেও এর চেয়ে কোন উচ্চ ধরনের নিয়মতান্ত্রিকতা পরিদৃষ্ট হয় না।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ধর্ম এবং জাতীয় নিরাপত্তার মর্যাদা বজায় রাখাই ইসলামী জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্য ধর্মের লোকদেরকে বলপূর্বক মুসলমান করা অথবা অন্য রাজশক্তিকে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা ইসলামী জিহাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। কারণ, নিজের ধর্ম এবং পূর্ণ স্বাধীনতা বহাল রেখে কোন বিজাতীয় রাজশক্তি যদি মুসলমানদের সাথে নিরাপত্তামূলক ও সম্মানজনক সন্ধি করতে রাজি হয়, এমতাবস্থায় সংগ্রাম ও নরহত্যায় লিপ্ত হওয়া ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। আমরা নিম্নে ইসলামী জিহাদের কয়েকটি ধারা তুলে ধরছি। যাতে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, ইসলামী জিহাদের সাথে

বলপ্রয়োগে মুসলমান করার কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। এমনকি রাজ্য-বিস্তারও ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য নয়।

ইসলামী জিহাদের কয়েকটি ধারা

১. ইসলামী জিহাদের মধ্যে শিশু, স্ত্রীলোক, চিররুগ্ন এবং বৃদ্ধ লোককে হত্যা করা নিষিদ্ধ, যদিও তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয়। বলপূর্বক মুসলমান করার উদ্দেশ্যে যদি জিহাদ করার আদেশ হত, তবে এদেরকে অব্যাহতি দেয়ার কোন কারণ ছিল না।

২. অমুসলমানগণ মুসলমানদের অধীনতা স্বীকারে জিযিয়া কর দিতে সম্মত হলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। ইসলামে দীক্ষিত করাই যদি জিহাদের উদ্দেশ্য হত, তবে তাদেরকে স্বধর্মে বহাল রেখে জিযিয়া নেয়ার কোন সার্থকতা ছিল না।

৩. জিযিয়াও আবার সকল কাফিরের উপরে প্রবর্তিত করার বিধান নেই। স্ত্রীলোক, শিশু, চিররুগ্ন, অন্ধ, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর উপর জিযিয়া প্রবর্তন করা যায় না। এতে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, জিহাদের মত জিযিয়াও কুফরীর শাস্তি নয়। নতুবা এ সমস্ত লোক কাফির থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য না হওয়ার কোনই কারণ ছিল না। বরং সাধারণভাবে সকল কাফিরের উপরই জিযিয়া কর ধার্য হওয়া ন্যায়সঙ্গত ছিল। জিযিয়া প্রাণ বধ করার চেয়ে সহজ সাজা। যখন এটাই শাস্তিরূপে গণ্য হল না, সুতরাং প্রাণ নাশ করা কখনো কুফরীর শাস্তি হতে পারে না।

৪. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান জিযিয়া অথবা অন্য কোন প্রকার অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে সন্ধি করা সঙ্গত বলে বিবেচনা করলে ধর্ম-বিধানে তারও অনুমতি আছে।

৫. এমনকি অমুসলিমগণকে কিছু অর্থ প্রদান অথবা অন্য কোন প্রকারে তাদের নিকট নতি স্বীকারপূর্বক সন্ধি করা যদি কোন অবস্থায় শান্তিপ্রদ ও যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তাতেও কোন বাধা নেই।

শেষোক্ত দুই ধারায় নিঃসন্দেহে বুঝা গেল যে, জিযিয়া যেমন কুফরীর দণ্ডস্বরূপ নয়, তেমনি তা উদ্দেশ্যের মধ্যেও গণ্য নয়। এটি কেবল শান্তি স্থাপনের একটি উপায় মাত্র। উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য হলে কখনো জিযিয়া ছেড়ে এমনকি নিজেদের পক্ষ হতে অর্থ প্রদানে সন্ধি স্থাপনের কোনই সার্থকতা ছিল না। অতএব, এটা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তরবারি অথবা জিযিয়া কর অন্য ধর্মে থাকার শাস্তিও নয় এবং তা লক্ষ্যবস্তুর মধ্যেও গণ্য নয়।

ইসলামী জিহাদ শান্তির দুয়ার উন্মুক্ত করে–অশান্তির নয়

ইসলাম শান্তির ধর্ম। মুসলমানগণ প্রতিবেশী বিধর্মীর সাথে আগাগোড়াই যে রকম সভ্যতা ও ভদ্রতা দেখিয়ে আসছে, পৃথিবীর সুদীর্ঘ ইতিহাস তার বড় সাক্ষী। ইসলাম মুসলমানদের জন্য যেমন শান্তি আনয়ন করেছে, অমুসলমানদের জন্যও তদ্রূপ শান্তিময় জীবন যাপনের সন্ধান দিয়েছে। জিহাদ ইসলামের একটি বিশেষ অঙ্গ। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অনেক ফলের বহিরাংশ কঠিন থাকে। কিন্তু তার ভেতরের শাঁস হয় কোমল। জিহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। মুসলিম রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিবেশী অমুসলমান রাজশক্তির সাথে শান্তিতে বসবাস করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সন্ধি স্থাপনে উভয়ের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষত রেখে কালাতিপাত করা। বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায়ও জগতের রাজশক্তিসমূহ সন্ধিসূত্রে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী। ইসলাম সন্ধি স্থাপনকে কেবল সমর্থনই করেনি, অবস্থা বিশেষে তাকে উচ্চস্থানও দান করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ‘তারা যদি সন্ধির জন্য বাহু বিস্তার করে তুমিও তার জন্য বাহু বিস্তার করবে এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করবে।’ (সূরা আনফাল ঃ আয়াত ৬১)

সন্ধির ব্যাপারে মুসলমানদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, অমুসলিমগণ এক্ষণে দুর্বলতার কারণে সন্ধি করতে রাযী হলেও তারা শক্তি সঞ্চয় করে সমরাভিযান করতে পারে। এরূপ সন্দেহের বশে যাতে সন্ধি

স্থাপন হতে বিরত না থাকে এ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে- সন্ধিকরণ সম্পর্কে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্তমান কর্তব্য হতে বিমুখ থাকা কখনো উচিত নয়।

ইসলামের আইন মতে যুদ্ধ বাধার পূর্বেও সন্ধি স্থাপনের বিধান আছে। যুদ্ধারম্ভের পরেও আছে। এ রকম উদারতা যেখানে আছে, সেখানে জোরজবরদস্তির যে কোন স্থানই থাকতে পারে না এ কথা সাধারণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তবে যদি কোন বিধর্মী রাজশক্তি শান্তিকামী মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি স্থাপন করে সৌহার্দ ও শান্তি বহাল করতে রাযী না হয়, উপরন্তু মুসলিম রাজত্বের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হয়, অথবা মুসলমান জনসাধারণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে, এমতাবস্থায় ধর্মের নির্দেশ এই যে, আত্মরক্ষা ও দুষ্টের শাস্তি বিধানপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ঘোষিত হয়েছে - فَإِنْ قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ "যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।' (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯১)

আরো ঘোষিত হয়েছে - وَقَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟

অর্থ : যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমালংঘন কর না। (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১৯০)

যুদ্ধরত মুসলিম বীরগণ যাতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন নির্লিপ্ত বিজাতীয় রাজ্যকেও আক্রমণ করে না বসে এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে সাবধান করে বলা হয়েছে, তোমরা যেন যুদ্ধাবস্থায়ও সীমালংঘন না কর। আক্রমণকারীদের রাজ্যেও এমন অনেক লোক থাকতে পারে, যারা কার্যত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অত্যাচার-অনাচারে যোগদান করে না। যেমন, স্ত্রীলোক, শিশু, রুগ্ন, বৃদ্ধ ইত্যাদি। মুসলিম যোদ্ধাগণ যাতে এরূপ নিরীহ লোকদের উপর হাত না তুলে এটাও ঐ সতর্কবাণীর অন্যতম উদ্দেশ্য। লক্ষণীয় যে, এ রকম উদারতাপূর্ণ বিধানের সাথে বলপূর্বক ধর্মান্তর করার কি সংস্রব থাকতে পারে? শত্রুরা মুসলমানদের রাজ্য আক্রমণ করে তাদের ধর্ম ও ধন-প্রাণ বিপন্ন করবে। আর মুসলমানগণ যদি কাঠের পুতুলের মত নির্বিকার থাকতে চায়, তবে ধরাপৃষ্ঠে তাদের অস্তিত্ব বজায় থাকতে পারে না। তাদের ধর্মও বহাল থাকতে পারে না। দুনিয়ার কোন জাতিই এ রকম নিরস্ত্র অবস্থায় রাষ্ট্রীয় জীবন বাঁচাতে পারে না। সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলমানদের উপর দোষ চাপাতে যাওয়া অন্যায় হবে না কেন?

আর যে সকল অমুসলমানের সাথে সন্ধি স্থাপিত হয়নি, তারা কার্যত আক্রমণ না করলেও পারস্পরিক সন্ধি-বন্ধন না থাকায় যে-কোন সময় তারা শান্তি ভঙ্গ করতে পারে। বিশেষত সেই রাজ্য যদি মুসলিম রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত হয়, তবে এ রকম আশংকা আরো প্রবল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ইসলামের বিধান হচ্ছে- فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ "মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে।" (সূরা তাওবা ঃ ৫)

নিজেদের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে কোন সন্ধিবিহীন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আধুনিক সভ্যজগতেও অপরাধ বলে গণ্য নয়। বিশেষরূপে এই অভিযানের উদ্দেশ্য যদি হয় শান্তি এবং স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষা। আমরা এই শেষোক্ত ধর্মযুদ্ধকেই আক্রমণমূলক ধর্মযুদ্ধ বলব। বস্তুত এই আক্রমণমূলক যুদ্ধও বলপূর্বক ধর্মান্তর করার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। অমুসলিম রাজশক্তি ইচ্ছা করলে যুদ্ধ বাধার পূর্বে অথবা পরে পারস্পরিক বাক্যালাপ দ্বারা সন্ধি স্থাপন করতে পারতেন। যাতে মুসলমানদের মন স্বধর্ম ও স্বজাতির নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারে। যুদ্ধ জয়ের পরেও এমন ব্যবস্থা রাখা হয়নি যে, বিজিতদেরকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হবে। পরাজিতগণকে বশ্যতা স্বীকার ও জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করা হবে এটাই ইসলামের বিধান। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন—

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

অর্থ : যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং শেষ দিনেও নয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। (সূরা তাওবা : আয়াত ২৯)

জিযিয়া কর

জিযিয়া করের স্বরূপ বুঝতে না পেরে কেউ কেউ এটাকে অমুসলমানদের উপর অত্যাচার ও অবিচারের মধ্যে গণ্য করেন। মূলত এতেও ইসলামের অসাধারণ উদারতা প্রকাশ পেয়েছে।

ইসলামের বিধান মতে মুসলিম রাষ্ট্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মুসলমান, অমুসলমান সমস্ত প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষা করতে বাধ্য। বাইরের কোন শত্রু আক্রমণ করলে, চোর-ডাকাতে উপদ্রব করলে ইত্যাদি সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানই প্রজাদের রক্ষক। রাষ্ট্রপ্রধান যেমন প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, তদ্রূপ ন্যায়ত প্রজাদেরও কর্তব্য এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করা। আর এ জন্যেই ইসলাম ধর্মের আদেশ মতে রাষ্ট্রপ্রধানের যাবেনাবী সমস্ত মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হয়েছে। কোন কোন সময় যুদ্ধ বাধলে মুসলমান প্রজাগণ যুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য। ইসলামের বিধান মতে মুসলমান যোদ্ধাদের অবস্থা স্বেচ্ছাসেবক তুল্য। তারা বেতনও দাবী করতে পারবে না। অবশ্য অবস্থা বিশেষে রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং তাদের বেতন নির্ধারিত করে দিতে পারেন। যুবকদের যুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক। কোন বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীলোকদের পক্ষেও যুদ্ধে যোগদান অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা কেবল মুসলমান প্রজাদের জন্য। অমুসলমান প্রজাগণকে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে তাদের নিকট হতে সামান্য পরিমাণ অর্থ গ্রহণের ব্যবস্থা মাত্র রাখা হয়েছে। এটাই হল জিযিয়া কর বা ট্যাক্স। এক্ষণে বলুন, মুসলমান প্রজাদের তুলনায় অমুসলমান প্রজাদের উপর কত সহজ ও সদয় ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের শান্তি-শৃংখলা এবং স্বধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য ধন-প্রাণ যথাসর্বস্ব দিয়ে জিহাদ করতে মুসলমান মাত্রই বাধ্য। পক্ষান্তরে অমুসলমান প্রজাদের কেবল সামান্য মাত্র কর দিতে হয়। তদতিরিক্ত তাদের নিকট আর কোন কিছুই দাবী করা চলবে না। এটা অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের কত বড় উদারতার পরিচায়ক তা সহজেই অনুমেয়।

বলা হয় যে, জিযিয়া কর কেবল অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ না করার শাস্তি হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে। এটা নিতান্ত অমূলক। এই ধরনের বিভিন্ন সন্দেহ নিরসনকল্পে জিযিয়া সম্পর্কীয় কয়েকটি বিশেষ ধারা নিম্নে প্রদত্ত হল।

জিযিয়ার কয়েকটি ধারা

১. স্ত্রীলোক, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী এবং বৃদ্ধের উপর জিযিয়া কর ধার্য হয় না। তদ্রূপ অক্ষম, ধনহীন এবং সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীরও জিযিয়া দিতে হয় না। এতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিধর্মী থাকার অপরাধে জিযিয়া ধার্য করা হয় না। যদি এ রকমই হত, তবে সাধারণভাবে সমস্ত অমুসলমানের উপরই জিযিয়ার বিধান থাকত। কিন্তু কার্যত সেরূপ হয়নি। কেবল যে সমস্ত লোক রাজ্য রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে সক্ষম, তাদের যুদ্ধ হতে অব্যাহতির জন্যই জিযিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধর্মী সন্ন্যাসীরা স্বধর্মে অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে থাকে। তাদের উপর জিযিয়া না থাকাতে জিযিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণিত হয়।

২. মুসলিম দলপতি অবস্থা বিশেষে ইচ্ছা করলে জিযিয়া নির্ধারিত পরিমাণে তারতম্য করে অথবা জিযিয়া রহিত করার শর্তেও অমুসলিমদের সাথে সন্ধি স্থাপন করে পারেন।

৩. দলপতি ইচ্ছা করলে অমুসলিম সম্প্রদায় বিশেষ হতে জিযিয়া রহিত করে মুসলিম পতাকাতলে যুদ্ধে যোগদান করতেও তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন।

৪. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি অমুসলিম প্রজাদের ধন-প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণ করতে অক্ষম হন, তবে ইসলামের বিধান মতে তাদের নিকট হতে গৃহীত জিযিয়া কর ফেরত দিতে হবে।

এ সমস্ত ধারায় বুঝা যায় যে, জিযিয়া কর কেবল রক্ষণমূলক ব্যবস্থার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। ধর্মান্তরের সাথে এর দূর-সম্পর্ক নেই। মোট কথা, ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই–এই মূলনীতিটি ইসলামী ব্যবস্থার সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যেই পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যের অবতারণা করছি।

হিজরতের পর ইসলাম মদীনায় এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। তখন মহানবী ﷺ জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হল। কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হতে লাগল। এই যুদ্ধাভিযানসমূহের কোন কোনটিতে মহানবী ﷺ স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। আর কোন কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিকদের পরিভাষায় প্রথম প্রকার যুদ্ধকে 'গাযওয়াহ' এবং দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধকে 'সারিয়্যাহ' বলা হয়। গাযওয়াহ্‌র সংখ্যা ২৩টি। কারো কারো মতে ২৭টি। তার মধ্যে মাত্র ৯টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। অন্যগুলোতে কোন যুদ্ধ হয়নি। সারিয়্যার সংখ্যা ৪৩টি। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ সকল গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহর মধ্যে মুসলমানদের যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতা ও সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় তাদের পক্ষে ছিল। শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের পরাজয় হয়। তাও শুধু এ জন্য যে, সৈন্যদের একটি অংশ মহানবী ﷺ-এর আদেশের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে তার কথার খেলাফ করেছিল। আমরা এইসব গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহকে অধিকতর সুস্পষ্ট করার জন্য বর্ষওয়ারী ছক আকারে নিম্নে পেশ করছি।

গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ

প্রথম হিজরী : ২টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছিল। ১) সারিয়্যাহ-ই-হামযা (রা), ২) সারিয়্যাহ-ই-উবয়দ (রা)।

দ্বিতীয় হিজরী : ৫টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছিল। ১) গাযওয়াহ-ই-আবওয়া। একে গযাওয়াহ-ই-ওয়াদ্দান বলা হয়। ২) গাযওয়াহ-ই-বাওয়াত, ৩) গাযওয়াহ-ই- বদরে কুবরা, ৪) গাযওয়াহ-ই-বানূ কায়নুকা, ৫) গাযওয়াহ-ই-সাবীক।

৩টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছিল। ১) সারিয়্যাহ-ই-আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্‌শ, ২) সারিয়্যাহ-ই-উমায়র, ৩) সারিয়্যাহ-ই-সালিম। এ বছরের অভিযানসমূহের মধ্যে বদরের যুদ্ধই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় হিজরী : ৩টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে। ১) গাযওয়াহ-ই-গাতফান, ২) গাযওয়াহ-ই-উহুদ, ৩) গাযওয়াহ-ই-হামরাউল আসাদ।

২টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছে। ১) সারিয়্যাহ-ই-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা, ২) সারিয়্যাহ-ই-যায়দ ইবনে হারিছা। এ বছরের অভিযানসমূহের মধ্যে উহুদ যুদ্ধই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ হিজরী : ২টি গাযওয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১) গাযওয়াহ-ই-বনী নাযীর, ২) গাযওয়াহ-ই-বদরে সুগরা।

৪টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছে। ১) সারিয়্যাহ-ই-আবূ সালামা, ২) সারিয়্যাহ -ই-আবদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স, ৩) সারিয়্যাহ-ই-মুনযির, ৪) সারিয়্যাহ -ই-মারছাদ।

পঞ্চম হিজরী : ৪টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে। ১) গাযওয়াহ-ই-যাতুর-রিকা, ২) গাযওয়াহ -ই-দাওমাতুল জানদাল, ৩) গাযওয়াহ-ই-মুরায়সী-এর আরেক নাম গাযওয়াহ-ই-বনী মুস্তালিক, ৪) গাযওয়াহ-ই-খন্দক। এগুলোর মধ্যে খন্দক যুদ্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ হিজরী : ৩টি গাযওয়াহ সংঘটিত হয়। ১) গাযওয়াহ-ই-বনী লাহইয়ান, ২) গাযওয়াহ-ই-গাবাহ। এর আরেক নাম গাযওয়াহ-ই-যী-কাবাদ, ৩) গাযওয়াহ-ই -হুদায়বিয়াহ।

১১টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছিল। ১) সারিয়্যাহ-ই-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ- কারতা অভিমুখে, ২) সারিয়্যাহ-ই-উক্কাশা, ৩) সারিয়্যাহ-ই-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা- যিলকুসসা অভিমুখে, ৪) সারিয়্যাহ-ই-যায়দ ইবনে হারিছা-বনী সুলায়ম অভিমুখে, ৫) সারিয়্যাহ-ই-আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ৬) সারিয়্যাহ-ই-আলী, ৭) সারিয়্যাহ-ই-যায়দ ইবনে হারিছা- উম্মে কারফা অভিমুখে, ৮) সারিয়্যাহ-ই-আবদুল্লাহ ইবনে আতীক, ৯) সারিয়্যাহ-ই-আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, ১০) সারিয়্যাহ-ই-কুরয ইবনে জাবির, ১১) সারিয়্যাহ-ই-আমর আয-যামরী।

এ বছরের অভিযানসমূহের মধ্যে গাযওয়া-ই-হুদায়বিয়াহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

সপ্তম হিজরী : ১টি গাযওয়াহ। গাযওয়াহ-ই-খায়বার। এটি গুরুত্বপূর্ণ ও অভিযানসমূহের অন্যতম।

৫টি সারিয়্যাহ। ১) সারিয়্যাহ-ই-আবূ বকর, ২) সারিয়্যাহ-ই-বিশর ইবনে সা'দ, ৩) সারিয়্যাহ-ই-গালিব ইবনে আবদুল্লাহ, ৪) সারিয়্যাহ-ই-বাশীর, ৫) সারিয়্যাহ-ই-আহ্যাম।

অষ্টম হিজরী : ৪টি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ সংঘটিত হয়েছে। ১) গাযওয়াহ -ই- মূতাহ, ২) মক্কা মুআযযমা বিজয়, ৩) গাযওয়াহ-ই-হুনায়ন, ৪) গাযওয়াহ -ই-তাইফ।

১০টি সারিয়্যাহ প্রেরিত হয়েছে। ১) সারিয়্যাহ-ই-গালিব-বনী মুলাব্বিহ অভিমুখে, ২) সারিয়্যাহ-ই-গালিব-ফাদাক অভিমুখে, ৩) সারিয়্যাহ-ই-শুজা, ৪) সারিয়্যাহ-ই-কা'ব, ৫) সারিয়্যাহ-ই-আমর ইবনে আস, ৬) সারিয়্যাহ-ই-আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ, ৭) সারিয়্যাহ-ই-আবূ কাতাদাহ, ৮) সারিয়্যাহ -ই-খালিদ-যাকে গুমায়সাও বলা হয়। ৯) সারিয়্যাহ-ই-তুফায়ল ইবনে আমর দূসী, ১০) সারিয়্যাহ-ই-কাতবা (রা)।

নবম হিজরী : ১টি গাযওয়াহ। গাযওয়াহ-ই-তাবূক। এটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া -সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

৩টি সারিয়্যাহ। ১) সারিয়্যাহ-ই-আলকামা, ২) সারিয়্যাহ-ই-আলী (রা), ৩) সারিয়্যাহ-ই-উকাশা (রা)।

দশম হিজরী : ২টি সারিয়্যা প্রেরিত হয়েছে। ১) সারিয়্যাহ-ই-খালিদ ইবনে ওলীদ (রা)-নাজরান অভিমুখে, ২) সারিয়্যাহ-ই-আলী (রা)-ইয়ামন অভিমুখে। এ বছরই বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

একাদশ হিজরী : এ বছর মহানবী ﷺ একটি সারিয়্যাহ উসামা ইবনে যায়দের নেতৃত্বে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা তাঁর ওফাতের পর রওয়ানা হয়েছে। (আল্লামা মোগলতাঈ রচিত সীরাতে মোগলতাঈ)

গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়াহ ও সারিয়্যাহ এবং বিভিন্ন ঘটনা

হিজরতের সাত মাস পর রমযান মাসে মহানবী ﷺ হযরত হামযা (রা)-কে ত্রিশজন মুহাজিরের নেতা মনোনীত করে একটি সাদা পতাকাসহ কুরায়শদের একটি কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। তারা যখন সমুদ্রের তীরে উপনীত হয়ে পারস্পরিক মুকাবিলায় লিপ্ত হলেন, তখন মাজদী ইবনে উমর জুহানী মধ্যস্থতা করে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন।

সারিয়্যা-ই-উবায়দা ইবনে হারিছ

এরপর মহানবী ﷺ প্রথম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দা ইবনে হারিছকে ৬০ জন লোকের নেতা মনোনীত করে 'বাতনে রাবিগ' অভিমুখে আবূ সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রথম কাফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। এটাই ইসলামে সর্বপ্রথম তীর, যা কাফিরদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় হিজরী

কেবলা পরিবর্তন

এ বছর হতে ইসলামী জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। মহানবী ﷺ-এর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কা'বা শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত করা হয়। এটাই পৃথিবীর প্রথম ঘর ও আদি মসজিদ। লোকজনকে একই দিকে মুখ করে একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে সমবেত করার জন্য একে কেবলা বা মনোযোগের কেন্দ্র বানান হয়েছে।

সারিয়্যাহ-ই-আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শ এবং ইসলামে সর্বপ্রথম গনীমত

এ বছর রজব মাসে মহানবী ﷺ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহ্শকে ১২ জন মুহাজিরের একটি দলের নেতা মনোনীত করে কুরায়শদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে নাখ্লা নামক স্থানে প্রেরণ করলেন। রজব মাসের প্রথম তারিখে উভয় দল মুখোমুখি হল। রজব হচ্ছে সেই চারটি নিষিদ্ধ মাসের একটি যাতে তৎকালীন আরবে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। কিন্তু মুহাজীরগণ ঐ তারিখকে জমাদিউছ ছানী মাসের ত্রিশ তারিখ বলে মনে করছিলেন। পরামর্শের পর এটাই সিদ্ধান্ত হল যে, যুদ্ধ করতে হবে। অবশেষে যুদ্ধ হল। বিপক্ষ দলের প্রধান নিহত হল এবং দুইজন বন্দী হল। আর অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। মুসলমানগণ প্রচুর মালে গনীমত লাভ করলেন, যা আমীরে সারিয়্যাহ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রেখে দিলেন।

এই ঘটনা দ্বারা সমগ্র আরবে রটে গেল যে, মহানবী ﷺ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ -বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড বৈধ করে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে কাফিররা ব্যাপক হৈচৈ শুরু করে দিল। তারা মুসলমানদের অভিযুক্ত করতে লাগল। এ সময় পবিত্র কুরআনের এ আয়াত–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۔ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۔ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۔ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۔ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۔

অর্থ : পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্র পথে বাধা দান করা, আল্লাহ্কে অস্বীকার করা, মাসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ২১৭) তাদের জবাব রূপে অবতীর্ণ হয়।

বদর যুদ্ধ

বদর একটি কূপের নাম। মদীনা হতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর নামে একটি গ্রামও সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছে। যুদ্ধের বিবরণ এরূপ ঃ

প্রাচীনকাল হতেই সিরিয়ার সাথে মক্কার কুরায়শদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তাদের সমস্ত গর্ব-অহংকার ও শক্তি-সামর্থের প্রধান উৎস। তাই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এই বাণিজ্যিক ধারাটিকে বন্ধ করে দেয়া ছিল অপরিহার্য। কুরায়শদের এক বিরাট বাণিজ্যিক কাফেলা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া হতে মক্কা আগমন করছিল। মহানবী ﷺ এই সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় হিজরী সনের ১২ই রমযান মাত্র ৩১৩ জন নিরস্ত্র মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য গমন করলেন। তিনি রাওহা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করলেন। রাওহা মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। এ দিকে কুরায়শ কাফেলার নেতা এই সংবাদ অবহিত হয়ে চিরাচরিত রাস্তা পরিত্যাগ করে কাফেলাসহ সমুদ্রের উপকূল ধরে মক্কার পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। সাথে সাথে একজন অশ্বারোহীকে মক্কায়

পাঠিয়ে দিলেন। যেন কুরায়শরা সর্বশক্তি নিয়ে অতিশীঘ্র ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে এবং তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাটি রক্ষা করে। কুরায়শগণ প্রথম হতেই মুসলমানদেরকে সমূলে ধ্বংসে করার পরিকল্পনা আঁটছিল। এই সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে ১০০ অশ্বারোহী এবং ৭ শত উট সমন্বয়ে গঠিত ৯৫০ জন বীর যুবকের এক বিরাট বাহিনী মুকাবিলা করার জন্য রওয়ানা হল। এই বাহিনীতে কুরায়শদের বড় বড় সমস্ত নেতা এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের সবাই শরীক ছিল।

মহানবী ﷺ কুরায়শদের এই জঙ্গী বাহিনীর সংবাদ অবগত হয়ে কর্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম নিজ নিজ জান-মাল মহানবীর চরণে সমর্পণ করলেন। উমায়র ইবনে ওয়াক্কাস (রা) তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলে মহানবী ﷺ তাকে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করায় তিনি কাঁদতে লাগলেন। ফলে মহানবী ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও জিহাদে শরীক হলেন। (কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০)

আনসারদের মধ্য হতে খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর কসম! আপনি আদেশ করলে আমরা সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আছি।" (মুসলিম শরীফ)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদ (রা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে ও পেছনে থেকে যুদ্ধ করব।" এতে মহানবী ﷺ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তখন সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বদরের নিকট পৌঁছে জানতে পারলেন যে, আবূ সুফিয়ান তার বণিকদলসহ নিরাপদে চলে গিয়েছেন। তবে কুরায়শদের এক বিরাট বাহিনী এই ময়দানেরই অপর প্রান্তে অবস্থান নিয়েছে। বাণিজ্যিক কাফেলাটি নিরাপদে চলে যাওয়ার পরও আবূ জাহল লোকদেরকে যুদ্ধ স্থগিত না রাখারই পরামর্শ দিল।

মুসলিম বাহিনী কুরায়শদের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ অবগত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলেন যে, কুরায়শরা আগেই পৌঁছে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, যা যুদ্ধ পরিচালনার নিরিখে খুবই উত্তম ছিল। পানির সকল ব্যবস্থাও সেই দিকেই ছিল। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছে তাদের দিকে এমন বালুকাময় শুষ্ক জায়গা পেল যে, তাতে চলাফেরাই ছিল দুষ্কর। তদুপরি সেখানে পানির চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি তখনই বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। ফলে মরু-বালুকা জমে শক্ত হয়ে গেল। গোটা বাহিনী তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। পানির পাত্রসমূহ ভরে রাখলেন। চৌবাচ্চা বানিয়ে অবশিষ্ট পানি মাটিতে আটকিয়ে রাখলেন। অপরদিকে এই বৃষ্টি কাফিরদের অবস্থান স্থল এমন কর্দমাক্ত করে দিল যে, তাদের পক্ষে চলাফেরা করা দুষ্কর হয়ে পড়ল। যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখি হল, তখন মহানবী ﷺ যোদ্ধাদের কাতার ঠিক করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। সুতরাং আল্লাহর এই বাহিনী এক সুদৃঢ় প্রাচীরের আকার ধারণ করে দন্ডায়মান হল।

যখন তিনশত তেরজন নিরস্ত্র মানুষের মুকাবিলা এক হাজার সুসজ্জিত ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সাথে সংঘটিত হতে যাচ্ছে, তখন যদি একটি লোকও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে তা যে এক বিরাট পাওয়া বলে মনে হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার পালন এসব কিছুর চেয়ে অগ্রগণ্য। ঠিক যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে হযরত হুযায়ফা (রা) ও আবূ হাসান (রা) নামে দুই সাহাবী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য এসে পৌঁছান। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে তারা রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "পথে কাফিররা আমাদের পথরোধ করে বলল যে, তোমরা কি মুহাম্মদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছ? তখন আমরা তা অস্বীকার করি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করব না বলে অঙ্গীকার করে ফেলি।" ব্যাপারটি জানতে পেরে মহানবী ﷺ তখন উভয়কেই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বারণ করে বললেন, "আমরা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পালন করব। আমাদের জন্য আল্লাহ্র সাহায্যই যথেষ্ট।" (মুসলিম শরীফ)

ব্যূহ-বিন্যাস সমাপ্ত হলে সর্বাগ্রে কুরায়শদের পক্ষ হতে তিনজন বীর ময়দানে এগিয়ে আসল। মুসলমানদের পক্ষ হতে হযরত আলী (রা), হযরত হামযা (রা) এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা) তাদের মুকাবিলা করলেন। তিনজন কাফিরই নিহত হল। মুসলমানদের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রা) আহত হলেন। হযরত আলী (রা) তাকে কাঁধে করে মহানবীর নিকট পৌছে দিলেন। মহানবী ﷺ তাকে নিজ কদম মুবারকের সাথে ঠেস দিয়ে শোয়ালেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তার মুখমণ্ডলের ধূলাবালি মুছে দিলেন। হযরত উবায়দা (রা) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মহানবীর সকাশে নিবেদন করলেন, "আমি কি শাহাদাতের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত রইলাম?" মহানবী ﷺ বললেন, না, বরং তুমি নিঃসন্দেহে শহীদ এবং আমি স্বয়ং তার সাক্ষী। আবূ উবায়দা (রা) পরম আনন্দে বললেন, "আজ যদি আবূ তালিব বেঁচে থাকতেন, তাহলে তাকে স্বীকার করতেই হত যে, আমিই তার কবিতার যোগ্যতম অধিকারী।" মহানবীর চাচা খাজা আবূ তালিবের কবিতার অর্থ হল এরূপ–

"বায়তুল্লাহর কসম! তোমাদের এই ধারণা একান্তই ভিত্তিহীন যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে কোন ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মাটির তলায় সমাহিত করে দিব অথবা শত্রুর হাতে সমর্পণ করব, যে পর্যন্ত না আমাদের লাশসমূহ তাঁর চতুর্দিকে পড়ে থাকবে এবং আমরা স্বীয় সন্তানগণ ও স্ত্রীগণকে ভুলে যাব।"

(কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২)

হযরত উবায়দা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে মহানবী ﷺ স্বয়ং তার কবরে নামলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাঁকে সমাহিত করলেন। সমস্ত সাহাবীর মাঝে বিশেষ এই মর্যাদা একমাত্র উবায়দা (রা)-এর ভাগ্যেই জুটেছিল। (কানযুল উম্মাল)

উভয় বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি হলে দেখা গেল, নিজেদেরই অনেক স্নেহ-ভাজন কলিজার টুকরা তরবারির নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র (যিনি তখনো কাফির ছিলেন) ময়দানে তরবীর্ণ হল, তখন স্বয়ং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর তরবারি তার দিকে উত্থিত হল। উত্‌বা সম্মুখে এলে তারই পুত্র হযরত হুযায়ফা (রা) তরবারি উঁচিয়ে বের হয়ে আসলেন। হযরত উমরের মামা ময়দানে অগ্রসর হলে ফারূকী তরবারি স্বয়ং তার মীমাংসা করে দিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম)

অবশেষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। একদিকে যুদ্ধ চরম ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আর অন্যদিকে নবীকুল সরদার ﷺ সিজদায় পড়ে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। তখন তার যবান থেকে এই কয়টি শব্দ বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল–

اَللّٰهُمَّ اِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ بَعْدَ الْيَوْمِ .

অর্থ : হে আল্লাহ্! এই মুষ্টিমেয় মুসলমানের দল যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আগামীকাল তোমার ইবাদত করার মত কোন লোক থাকবে না।" অবশেষে গায়বী সুসংবাদ তাঁকে আশ্বস্ত করল। মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত হল।

আবূ জাহলের পতন

আবূ জাহলের দুষ্কর্ম ও ইসলাম বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত ছিল। তাই আনসারদের মধ্য হতে হযরত মুআব্বিয (রা) ও হযরত মুআয (রা) এই দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তারা আবূ জাহলকে দেখা মাত্র হয় তাকে হত্যা করবেন, না হয় নিজেরাই শহীদ হয়ে যাবেন। এক্ষণে দুই ভাই তাদের প্রতিজ্ঞা পালনে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা আবূ জাহলকে চিনতেন না। সুতরাং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের নিকট তার পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি ইঙ্গিতে তাকে দেখিয়ে দেয়া মাত্র দুই ভাই বাজপাখীর ন্যায় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে আবূ জাহল শোনিত-সিক্ত মৃত্তিকায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। আবূ জাহলের পুত্র ইকরিমা (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) পিছন দিক হতে এসে মুআযের কাঁধে তরবারির আঘাত হানল। এতে তার একটি বাহু কেটে গেল। কিন্তু সামান্য চামড়া লেগে থাকল। মুআয ইকরিমাকে ধাওয়া করলেন। কিন্তু সে পালিয়ে গেল। মুআয এই অবস্থায় তাঁর কর্তিত বাহু নিয়েই ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কর্তিত বাহুটি ঝুলে

থাকায় অসুবিধা হচ্ছিল। তাই হাতখানি পায়ের নীচে রেখে সজোরে টান দিলেন। তাতে চর্মাংশটি ছিঁড়ে হাতটি খসে গেল। তারপর পূর্বের ন্যায়ই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ্! (সীরাতে হালবিয়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৫৪)

বিরাট মু'জিযা

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মহানবী ﷺ আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে শত্রু বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীগণকে একযোগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিলেন। একদিকে বাহ্যিক ব্যবস্থা হিসাবে সাহাবীদের ক্ষুদ্র বাহিনী কাফিরদের প্রতি ধাবিত হল। আর অপরদিকে মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের সাহায্যে ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে স্বীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন।

কুরায়শদের বড় বড় নেতা নিহত হলে অন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। তারা দিশাহারা হয়ে পালাতে লাগল। মুসলমানগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের কাউকে হত্যা করলেন আর কাউকে জীবিত বন্দী করলেন। এভাবে তাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হল। কুরায়শদের বড় বড় নেতা উত্‌বা, শায়বা, আবূ জাহল, উমায়্যা ইব্‌নে খালফ, উকবা নিহত হল। মুসলমানদের মধ্য হতে শহীদ হল ১৪ জন। ছয়জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার। বদরের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মু'জিযা বই কিছু ছিল না। কেননা, কাফিরদের দিকে এক হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা আর এক বিরাট বাহিনী, আর মুসলিম পক্ষে ছিল মাত্র ৩১৩ জন নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ। কাফিরদের দিকে ছিল বড় বড় ধনী ও বিত্তশীলদের বিপুল সমাবেশ। যাদের যে কোন একজন লোকই সমগ্র বাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর মুসলিম পক্ষে ছিল নিঃসম্বল ও দরিদ্র মানুষের জামাআত। কাফিরদের দিকে ছিল শতাধিক অশ্বারোহীর সমাবেশ। আর সারা মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ২টি ঘোড়া। কাফিররা ছিল সর্ব প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত, শক্তি প্রদর্শনে মদমত্ত, শিরস্ত্রাণ, বর্ম ইত্যাদিতে তারা একেকজন যেন লোহায় নিমজ্জিত ছিল। আর মুসলিম পক্ষে মাত্র ৩টিকয়েক তরবারি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটতে চায় না যে, এমনটি কেমন করে সম্ভব হল? তারা জানে না জয়-পরাজয় এবং সফলতা ও বিফলতা ঘোড়া, তরবারি আর ধন -সম্পদের ইখতিয়ারাধীন নয়। বরং এতে অন্য কোন অদৃশ্য হাতের ভূমিকা সক্রিয় রয়েছে।

যুদ্ধবন্দীদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

বদরের যুদ্ধবন্দীরা যখন মদীনায় পৌঁছল, তখন মহানবী ﷺ তাদেরকে দু'জন, চারজন করে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন এবং এদেরকে আরামে রাখার জন্য সকলকে নির্দেশ প্রদান করলেন। এর ফলে সাহাবীগণ বন্দীদের আহারাদির সযত্ন ব্যবস্থা করতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে কাটাতেন। হযরত মুসআব ইব্‌নে উমায়র (রা)-এর ভাই আবূ আযীযও এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, "আমাকে যে আনসারীর তত্ত্বাবধানে দেয়া হয়েছিল, তিনি খাবার এনে রুটির পাত্রটি আমার সামনে রেখে দিতেন আর নিজে শুধু খেজুরের উপর নির্ভর করতেন।" (তাবারী)

যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবীদের সাথে পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। সুতরাং চার চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া হল।

ইসলামী সাম্য

এই বন্দীদের মধ্যে মহানবী ﷺ এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসও ছিলেন। (তিনি পরে মুসলমান হন)। হযরত আব্বাস রাতের বেলায় শৃংখলের যাতনায় কাতরাচ্ছিলেন। তার এই যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি মহানবী ﷺ এর কানে প্রবেশ করলে তাঁর নিদ্রা টুটে গেল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিদ্রা কেন আসে না?" মহানবী ﷺ বললেন, আমি কেমন করে ঘুমাতে পারি যেখানে আমার পিতৃব্যের যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি আমার কানে এসে পৌঁছছে? (কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭২)

এতদসত্ত্বেও কিন্তু ইসলামের সমতা এ অনুমতি প্রদান করেনি যে, তাঁর সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্যকে বন্দীদশা হতে মুক্ত করে দিবেন। যেভাবে সকলের নিকট হতে মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে, তার নিকট হতেও তদ্রূপ গ্রহণ করা হয়েছে। বরং সাধারণ বন্দীদের তুলনায় কিছু বেশীই আদায় করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ বন্দীদের নিকট হতে চার হাজার এবং বিত্তবানদের নিকট হতে কিছু বেশী করে আদায় করা হয়েছিল। হযরত আব্বাসও ছিলেন ধনী লোক। সুতরাং তাকেও চার হাজার দিরহামের চেয়ে বেশী প্রদান করতে হয়েছিল। হযরত আব্বাসের মুক্তিপণ মাফ করে দেয়ার জন্য আনসারগণ আবেদনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামী সাম্যের বিধানে আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং শত্রু-মিত্র সবাই সমান ছিল। কাজেই আনসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তা গৃহীত হয়নি। এমনিভাবে মহানবী ﷺ-এর জামাতা আবুল আসও যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছিলেন। তার নিকট মুক্তিপণ আদায় করার মত অর্থ ছিল না। ফলে তিনি তার সহধর্মিণী অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর কন্যা হযরত যায়নাবকে (যিনি মক্কায় বসবাস করছিলেন) মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহ করে প্রেরণ করতে বলে পাঠালেন। সুতরাং তিনি তার মাতা হযরত খাদীজা প্রদত্ত তার বিবাহের যৌতুকের হারখানাই মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন। যখন এই হারখানা মহানবীর দৃষ্টিগোচর হল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি সাহাবীগণকে বললেন, "যদি তোমরা সম্মত হও, তাহলে যায়নাবের নিকট তার জননীর স্মৃতি এই হারখানা ফেরত পাঠিয়ে দাও।" সাহাবীগণ সানন্দে রাযী হয়ে হারখানা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং আবুল আসকে বলে দিলেন যে, তিনি যেন হযরত যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। (মিশকাত, পৃঃ ৩৪৬)

আবুল আসের ইসলামগ্রহণ

আবুল আস মুক্তিলাভ করে মক্কা পৌঁছলেন এবং শর্তানুযায়ী হযরত যায়নাবকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আস একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় বার সিরিয়া হতে বাণিজ্য-পণ্য নিয়ে আসার সময় ধৃত হলেন এবং তারপর ঠিক এমনিভাবে মুক্তিলাভ করলেন। এবার ছাড়া পেয়ে মক্কা আগমনপূর্বক অংশীদারদের সাথে সকল হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে ফেললেন এবং মুসলমান হয়ে গেলেন। তারপর লোকজনকে বললেন, "আমি এ জন্য এখানে এসে মুসলমান হলাম, যেন কেউ বলতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে তাগাদার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা তাকে বলপূর্বক মুসলমান বানান হয়েছে।" (তারীখে তাবারী)

বদরের বন্দীদের নিকট পরিধেয় ছিল না। মহানবী ﷺ তাদের সকলের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, কারো জামা তার গায়ে লাগছিল না। তখন মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই নিজের জামাটি খুলে তাকে দিয়ে দিল। মহানবী ﷺ পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য নিজের যে জামাটি প্রদান করেছিলেন সেখানে সেই উপকারের প্রতিদানও অনেকটা বিবেচ্য ছিল। (বুখারী শরীফ)

লেখাপড়ার গুরুত্ব

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা মুক্তিপণ আদায় করতে সক্ষম ছিল না, কিন্তু অল্প-বিস্তর লেখাপড়া জানত, তাদেরকে বলা হল, তোমরা মুসলমানদের দশ দশটি ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিবে। এটাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়দ ইবনে ছাবিত এ ভাবেই লেখাপড়া শিখেছিলেন।

এ বছরের কতিপয় ঘটনা

এ বছর রোববার দিন যখন বদরের যুদ্ধ জয়ের সুসংবাদ মদীনায় পৌঁছল তখন লোকজন মহানবীর কন্যা হযরত রুকায়্যার দাফন কার্য সম্পন্ন করে হাত-পা পরিষ্কার করছিলেন। (মুগলতাঈ)

এ বছরই বদর যুদ্ধ হতে ফেরার পর সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। রমযানের রোযা, সাদকাতুল ফিতর এবং যাকাতও এ বছরই ওয়াজিব হয়। ঈদুল আযহার নামায এবং কুরবানীও এ বছরই ওয়াজিব হয়। এ বছরেই যিলহজ্জ মাসে হযরত ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। (মোগলতাঈ)

তৃতীয় হিজরী

হিজরী তৃতীয় সালে দা'ছুর ইবনে হারিছ মুহারিবী ৪৫০ জন সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। মহানবী ﷺ বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলে তারা পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করল। মহানবী ﷺ নিশ্চিন্তে ময়দান হতে ফিরে আসলেন। এ সময় ঘটনাচক্রে বৃষ্টিতে তাঁর কাপড় ভিজে গেল। তিনি তা শুকাবার জন্য খুলে একটি গাছের উপর বিছিয়ে দিলেন এবং নিজে তার ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। দা'ছুর পাহাড়ের উপর হতে তা লক্ষ্য করছিল। যখন দেখল, মহানবী ﷺ নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ছেন, তখন সে সরাসরি তাঁর শিয়রে এসে উপস্থিত হল এবং তরবারি উঁচিয়ে বলতে লাগল– 'বল, এখন তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?" কিন্তু মহানবী ﷺ কোন প্রকার ভীত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ' আল্লাহ্ তা'আলাই রক্ষা করবেন।" এ কথা শোনা মাত্র দা'ছুরের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হল এবং তরবারিটি হাত হতে খসে পড়ল। তখন মহনবী ﷺ তরবারিটি তুলে নিলেন এবং বললেন, "এখন তুমি বল, তোমাকে আমার হাত হতে কে রক্ষা করবে?" সে বলল, "কেউ নয়।" মহানবী ﷺ তার এই করুণ দশা দেখে ক্ষমা করে দিলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৪৯)

এরপর দা'ছুর শুধু নিজেই ইসলাম গ্রহণ করলেন না, বরং নিজের গোত্রে পৌঁছে ইসলামের একজন শক্তিশালী প্রচারকে পরিণত হলেন। ইউরোপীয় বিদ্বেষীরা নয়ন মেলে দেখুন, ইসলাম প্রচারের কারণ এই উত্তম চরিত্র ছিল, নাকি তরবারির শক্তি, না সম্পদের লোভ।

হযরত হাফসা ও যায়নাবের সাথে বিবাহ

মহানবী ﷺ হিজরী তৃতীয় সনের শা'বান মাসে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার সাথে এবং একই সনে রমযান মাসে হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। (মোগলতাঈ)

উহুদের যুদ্ধ

উহুদ মদীনার অদূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। যে স্থানে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে হযরত হারূন (আ)-এর কবর বিদ্যমান রয়েছে। এই যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এর তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যথা- ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি। (যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০)

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মুশরিকদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। সুতরাং এবার তারা অত্যন্ত নিখুঁত প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা আক্রমণের সংকল্প করল এবং এই লক্ষ্যে তিন সহস্রাধিক যোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে মদীনার দিকে অগ্রসর হল। এই বাহিনীতে ছিল ৭ শত বর্ম, ২ শত অশ্ব এবং ৩ সহস্র উট। ১৪ জন মহিলাকেও তারা এই উদ্দেশ্যে সাথে করে নিয়ে এসেছিল যে এরা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করবে আর পলায়ন করলে তিরস্কার করে লজ্জা দিবে।

এদিকে মহানবী ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) যিনি মুসলমান হয়ে থাকলেও তখন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করছিলেন, যথাশীঘ্র সমুদয় ঘটনা ও অবস্থা লিখে একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। মহানবী ﷺ খবর পাওয়ার পর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ দু'জন লোক পাঠালেন। তারা এসে সংবাদ দিল যে, কুরায়শ বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছে গেছে। শহরের উপর আক্রমণের আশংকায় চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হল। ভোরে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শের পর এক হাজার সাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে মদীনার বাইরে আগমন করলেন। এদের মধ্যে মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার ৩ শত সমমনা মুনাফিকও ছিল। কিন্তু তাদের সবাই পথিমধ্য থেকে ফিরে গেল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা রইল মাত্র ৭শত।

সেনা-বিন্যাস

মদীনা থেকে বের হয়ে যখন সেনা বাহিনীর চূড়ান্ত হিসাব নেয়া হল, তখন স্বল্পবয়স্ক বালকদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু কিশোরদের মাঝে জিহাদের স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, যখন রাফি' ইবনে খাদীজকে বলা হল,

"তোমার বয়স কম, তুমি ফিরে যাও," তখন তিনি পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ালেন, যেন তাকে লম্বা মনে করা হয়। সুতরাং তাকে জিহাদে নেয়া হল। সামুরা ইব্নে জুনদুব রাফি' ইব্নে খাদীজের সমবয়সী ছিলেন। তিনি উপরোক্ত ঘটনা দেখে বললেন, আমি তো রাফি'কে কুস্তিতে ধরাশায়ী করে দিতে পারি। যদি তাকে নেয়া হয়, তবে আমাকে আরো আগেই নেয়া উচিত। তার কথায় উভয়কে কুস্তি প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দেয়া হল। সামুরা রাফি'কে ধরাশায়ী করে দিলেন। ফলে তাকেও জিহাদে গ্রহণ করা হল। (তাবারী, ৩য় খণ্ড)

যারা দাবী করে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে, এই মুসলিম কিশোরদের আত্মত্যাগ দর্শন করে তাদের মিথ্যা রটনার জন্য কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়?

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছে মহানবী ﷺ ব্যূহ রচনা করলেন। উহুদ পাহাড়টি ছিল পিছনের দিকে। কাজেই সেই দিক থেকে শত্রুদের হামলার আশংকা ছিল। তিনি ৫০ জন তীরন্দাযকে পাহাড়ের উপর প্রহরায় মোতায়েন করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, "মুসলমানদের জয় হোক কিংবা পরাজয় হোক, তোমরা কোন অবস্থায়ই নিজেদের অবস্থান হতে নড়বে না।"

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর যখন কাফির সৈন্য পিছটান দিতে লাগল, তখন মুসলমানদের পাল্লা ছিল অনেক ভারী। কুরায়শরা আতংকগ্রস্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। মুসলমানগণ গনীমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এটা দেখা মাত্র তীরন্দাযরাও তাদের অবস্থান ত্যাগ করে এখানে চলে আসলেন। যাদেরকে মহানবী ﷺ পিছনের পাহাড়ের উপর প্রহরায় নিয়োগ করেছিলেন, তাদের দলনেতা আবদুল্লাহ্ ইব্নে জুবায়র অনেক বারণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে আর এখানে থাকার প্রয়োজন নেই মনে করে তারা সেখান থেকে সরে আসলেন। এখানে কয়েকজন মাত্র সাহাবী রয়ে গেলেন। এই অবস্থা দেখে খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন) পশ্চাদ্দিক হতে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবন জুবায়র এবং তাঁর অবশিষ্ট গুটিকয়েক সাথী প্রাণপণ লড়াই করে অবশেষে সকলেই শাহাদাত বরণ করলেন। যখন রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন খালিদ তার বাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্দিক হতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই অবস্থা দেখে সম্মুখভাগের পলায়নরত কাফিররাও ঘুরে নতুনভাবে সাহস সঞ্চয় করে বিপুল বিক্রমে পাল্টা হামলা চালাল এবং উভয় ফৌজ এমনভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে গেল যে, মুসলমানগণ নিজেরা মুসলমানদের হাতেই শহীদ হতে লাগলেন। হযরত মুসআব ইব্নে উমায়র (রা) শাহাদাত বরণ করলেন। মহানবী ﷺ-এর চেহারার সাথে তাঁর অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, তাই তার শাহাদতে মহানবীর শাহাদত হওয়ার গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কোন কোন বর্ণনা মতে জনৈক শয়তান অথবা জনৈক মুশরিক অতি উচ্চৈঃস্বরে "মুহাম্মদ ﷺ নিহত হয়েছে" বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল। (যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩)

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় বীরদের পা টলটলায়মান হয়ে গেল। তবু অনেক বীর যোদ্ধা তখনো প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তাদের সকলেরই দৃষ্টি মহানবী ﷺ-কে অন্বেষণ করে ফিরছিল। সবার আগে হযরত কা'ব ইব্নে মালিক (রা) মহানবী ﷺ-কে দেখতে পেলেন। তিনি আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "মুবারক হোক– রাসূলুল্লাহ নিরাপদে এখানেই আছেন।" এই খবর শ্রবণমাত্র সাহাবা কিরাম মহানবী ﷺ-এর দিকে দৌড়িয়ে এলেন। কিন্তু সাথে সাথে কাফিররাও সকল দিক হতে সরে এসে এদিকেই তাদের আক্রমণ জোরদার করল। বেশ কয়েকবার মহানবীর উপর আক্রমণ হল কিন্তু তিনি নিরাপদেই রইলেন।

একবার কাফিররা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল। তখন মহানবী ﷺ বললেন, "কে আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত?" এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত যিয়াদ ইব্নে সাকানসহ চারজন সাহাবী এগিয়ে আসলেন এবং সকলেই প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হলেন। হযরত যিয়াদ যখন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন মহানবী ﷺ বললেন, "তাঁর লাশ নিকটে নিয়ে এসো।" লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসলেন। তাঁর দেহে তখনো কিছুটা প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি মহানবীর পবিত্র চরণের উপর মুখ রেখে সেই অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মহানবী ﷺ আহত হলেন

কুরায়শদের বিখ্যাত বীর আবদুল্লাহ্ ইবনে কুমাইয়াহ কাতার ডিঙ্গিয়ে সম্মুখে আসল এবং মহানবীর পবিত্র চেহারার উপর তরবারির আঘাত হানল। এতে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া মহানবীর পবিত্র চেহারার ভেতর ঢুকে গেল এবং একটি পবিত্র দাঁত শহীদ হল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) শিরস্ত্রাণের কড়া যখম হতে বের করার জন্য অগ্রসর হলে হযরত আবূ উবায়দা ইবনে জাররাহ কসম দিয়ে বললেন, "আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই কামড়ে ধরে সেই কড়া দুটি বের করে আনার জন্য সজোরে টান দিলেন। এতে প্রথম বারে একটি কড়া বের হয়ে আসল। কিন্তু সাথে সাথে হযরত উবায়দার একটি দাঁতও ভেঙে গেল। এই অবস্থা দেখে দ্বিতীয় বার এমনিভাবে হাতের পরিবর্তে মুখ দিয়ে দ্বিতীয় কড়াটি টেনে বের করলেন। এর সাথে আবূ উবায়দার আরো একটি দাঁত ভেঙ্গে গেল। (ইবনে হিব্বান, তাবারানী, দারা কুতনী, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪)

কাফিররা মুসলমানদের জন্য কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। মহানবী ﷺ তার একটির মধ্যে পড়ে গেলেন।

সাহাবীদের আত্মত্যাগ

এ অবস্থা দেখে আত্মত্যাগী সাহাবীগণ মহানবী ﷺ-কে চারিদিক হতে ঘিরে ফেললেন। চতুর্দিক হতে তীর ও তরবারির বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। কিন্তু সাহাবীগণ এই সমস্ত আঘাতকে নিজেদের উপর গ্রহণ করছিলেন। হযরত আবূ দাজানা (রা) ঝুঁকে পড়ে মহানবী ﷺ-এর জন্য ঢাল স্বরূপ হয়ে গেলেন। যেদিক হতেই তীর আসত, তা তার পৃষ্ঠদেশে পতিত হত। হযরত তালহা (রা) তীর ও তরবারির আঘাতসমূহকে নিজের দেহ পেতে গ্রহণ করছিলেন। ফলে তার একটি হাত কেটে মাটিতে পড়ে গেল। যুদ্ধের পরে দেখা গেল তাঁর দেহে ৭০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে। (ইবনে হিব্বান, কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮)

হযরত আবূ তালহা একটি ঢালের সাহায্যে মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করছিলেন। মহানবী ﷺ যখন মাথা উঁচিয়ে সৈন্যবাহিনীর দিকে তাকালেন, তখন আবূ তালহা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দয়া করে মাথা উঁচাবেন না। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত কোন তীর যেন আপনার দেহ মুবারকে না লাগে। এর জন্য আপনার পূর্বে আমারই বক্ষ প্রস্তুত রয়েছে।" (বুখারী, গাযওয়া-ই উহুদ)

একজন সাহাবী বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি মারা যাই, তাহলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে?" মহানবী ﷺ বললেন, 'বেহেশতে'। এই সাহাবী কয়েকটি খেজুর হাতে নিয়ে ভক্ষণ করছিলেন, এ কথা শোনামাত্র খেজুরগুলো ফেলে দিলেন এবং সোজা শত্রুদের ভিড়ে ঢুকে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। (বুখারী, গাযওয়া-ই-উহুদ)

দুর্ভাগা কুরায়শরা অত্যন্ত নির্মমভাবে মহানবী ﷺ-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করছিল, কিন্তু রাহমাতুল-লীল-আলামীন ﷺ-এর যবান মুবারক হতে তখন শুধু এ কথা কয়টিই উচ্চারিত হচ্ছিল اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, তারা জানে না।"

(ফাতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৬, পৃঃ ৪৮, গাযওয়া-ই-উহুদ)

মহানবী ﷺ-এর নূরানী চেহারা হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল এবং তিনি কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তা মুছে ফেলছিলেন আর বলছিলেন, "এই রক্তের একটি ফোঁটাও যদি যমীনে পতিত হয়, তাহলে সকলের উপরে আল্লাহ্র আযাব অবতীর্ণ হবে।" (ফাতহুল বারী, গাযওয়া-ই-উহুদ)

এই যুদ্ধে কাফিরদের ২২ বা ২৩ জন নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৭০ জন শাহাদাত বরণ করেন।

চতুর্থ হিজরী

বি'রে মাউনা অভিমুখে সারিয়্যা-ই-মুনযির (রা)

এই বছরের সফর মাসে মহানবী ﷺ সত্তরজন সাহাবীর একটি দলকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নাজদ্‌বাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে বড় বড় আলিম সাহাবীও ছিলেন। সেখানে পৌছার পর আমির, বা'ল, যাকওয়ান, উসায়্যাহ প্রভৃতি গোত্র তাদের মুকাবিলা করতে উদ্যত হল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল। সকল সাহাবীই শাহাদত বরণ করলেন। মহানবী ﷺ এই ঘটনায় খুবই মর্মাহত হলেন। এমনকি তিনি এই ঘাতকদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদ দু'আ করেন। (সীরাতে মোগলতাই, পৃঃ ৫২)

এ বছরের শাওয়াল মাসে হযরত হাসান (রা) ভূমিষ্ঠ হন এবং হযরত উম্মু সালামা (রা) মহানবীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

পঞ্চম হিজরী

কুরায়শ-ইহুদী আঁতাত

মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করে এখানকার ইহুদীদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইহুদীরা মদীনার বিত্তবান ও শীর্ষস্থানীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য ছিল। তাই মহানবীর আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে তাদের মনে প্রবল হিংসা-ক্ষোভের সৃষ্টি হল। এ জন্য তারা সর্বদা মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের অনিষ্ট চিন্তায় লেগে থাকত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করায় ইহুদীদের হিংসা ও ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রইল না। শেষ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি লংঘনে তৎপর হল। এমনকি হিজরী তৃতীয় সালে তাদের গোত্র বনূ কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল। পরে বনূ নাযীর গোত্রও বিদ্রোহ শুরু করে দিল। এই অবস্থা দেখে মহানবী ﷺ ও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন এবং সম্মুখ মুকাবিলায় তারা পালিয়ে আত্মগোপন করল। কিছু দিন এভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশ হতে বহিষ্কৃত হয়ে বনূ কায়নুকা সিরিয়া এলাকায় এবং বনূ নাযীর খায়বার ও অন্যান্য জায়গায় চলে গেলেন।

এ দিকে মক্কার কুরায়শগণ প্রথম হতেই মদীনায় ইহুদী ও মুনাফিকদেরকে চিঠি -পত্রের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণের ইন্ধন যোগাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, বরং সাথে এই হুমকিও দিয়ে আসছিল যে, যদি তোমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে মদীনা হতে বহিষ্কার করে না দাও, তাহলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করব। (আবূ দাউদ)

উপরোক্ত কারণগুলোই তাদের পারস্পরিক আঁতাত ও সেতুবন্ধের কাজ করল এবং এই সুযোগে মক্কার কুরায়শ, মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকদের সম্মিলিত শক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে উঠার ফলে মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রের মধ্যে যুদ্ধোন্মাদনার এক দাবাগ্নি জ্বলে উঠল। হিজরী পঞ্চম সনের ১০ই মুহাররম তারিখে অনুষ্ঠিত 'যাতুর-রিকা'-এর যুদ্ধটি ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। অতঃপর হিজরী পঞ্চম সালের রবীউল আওয়াল মাসে সংঘটিত দাওমাতুল জানদাল এই ধারারই আরেকটি ঘটনা। হিজরী পঞ্চম সনের শা'বান মাসের দোসরা তারিখে সংঘটিত গাযওয়া-ই-বনূ মুস্তালিকও ছিল এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রেরই নগ্ন প্রয়াস। এই ষড়যন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আকারে চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। তবে গাযওয়ায়ে খন্দক ও গাযওয়ায়ে বনূ মুস্তালিক ছাড়া অন্য গাযওয়াগুলোতে সম্মুখ মুকাবিলা হয়নি।

পরিখা-যুদ্ধ

হিজরী পঞ্চম সনের যিল-কা'দাহ মাসে তাদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং এই উদ্দেশ্যে দশ হাজারের এক সশস্ত্র বাহিনী মুসলমানগণকে পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হল। মহানবী ﷺ এই সংবাদ অবহিত হয়ে সমস্ত সাহাবীকে ডেকে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) মত প্রকাশ করলেন যে, পশ্চাদ্‌বর্তী ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না,

বরং মদীনার যে দিক দিয়ে শত্রুদের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে সেই দিকে পরিখা খনন করা হোক। তাই মহানবী ﷺ তিন হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে পরিখা খনন করতে প্রস্তুত হলেন। ৬ দিনের মধ্যে ১০ হাত গভীর পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল। পরিখা খননে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এরও এক বিরাট ভূমিকা ছিল। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃ. ৫৬)

পরিখা খনন করতে গিয়ে একটি কঠিন প্রস্তরখণ্ড বের হয়ে আসে। ফলে, পরিখা খননের কাজ ব্যাহত হয়ে পড়ে। মহানবী ﷺ তাঁর পবিত্র হস্তে কোদাল মেরে এক আঘাতেই তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন। অনন্তর খন্দক প্রস্তুত হয়ে গেল।

এদিকে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী এসে উপস্থিত হল এবং মদীনা অবরোধ করে বসল। মুসলমানগণ প্রায় পনের দিন পর্যন্ত মদীনায় অবরুদ্ধ রইলেন। এমন সময় ইহুদীদের অবশিষ্ট গোত্র বনূ কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফিরদের দলে মিশে তাদের দল ভারী করল। অবরোধের কারণে মদীনার জন-জীবনে চরম অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্য- ঘাটতির কারণে সাহাবীগণকে একাদিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতে হল। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে সাহাবীগণ নিজেদের পেট খুলে মহানবী ﷺ-কে দেখালেন যে, তাদের পেটের সাথে পাথর বাঁধা রয়েছে। তখন মহানবী ﷺ ও তাঁর পবিত্র পেটখানা দেখালেন। সেখানেও দুটি পাথর বাঁধা ছিল।

এদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করতে সক্ষম হল না, তখন তারা অপর পার হতেই তীর ও পাথর বর্ষণ শুরু করে দিল। এইভাবে উভয় পক্ষ হতে অবিরাম তীর বিনিময় চলতে লাগল। এই সময়ে মহানবী ﷺ-এর চার ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে গেল।

আল্লাহ্‌র সাহায্য

শেষে আল্লাহ তা'আলা এই সহায়-সম্বলহীন মুসলিম দলকে সাহায্য করলেন এবং কাফির বাহিনীর উপরে প্রবল ঝড় প্রবাহিত করলেন। তাদের তাঁবুর খুঁটিসমূহ উপড়ে গেল। আর চুলার উপর হতে হাঁড়ি-পাতিলগুলো পর্যন্ত উল্টে পড়ল। এ দৃশ্য কাফির বাহিনীর বুদ্ধি-বিবেককে বিকল করে দিল। এই ঘটনা তাদের মনে ভীতি সঞ্চার করল। একে তারা নিজেদের জন্য অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত মনে করল। তদুপরি ইতোমধ্যে তাদের রসদও ফুরিয়ে আসল। এদিকে হযরত নাঈম ইবনে মাসঊদ (রা) এমন এক কৌশল অবলম্বন করলেন, যার ফলে কাফির বাহিনীর মধ্যে বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হল এবং কাফিররা ময়দান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হল।

এ বছরই হজ্জ ফরয হয়। এ বছরের জমাদিউল-উলা মাসে মহানবী ﷺ-এর দৌহিত্র আবদুল্লাহ ইবনে উছমান অর্থাৎ হযরত রুকায়্যার পুত্র পরলোকগমন করেন। শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার জননীর ইনতিকাল হয়। যী-কা'দাহ মাসে হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শের সাথে মহানবী ﷺ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বছরই মদীনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৫৫)

ষষ্ঠ হিজরী

হুদায়বিয়ার সন্ধি

হিজরী ষষ্ঠ সালের যিলকদ মাসে মহানবী ﷺ উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধেন। ১৪ বা ১৫ শত সাহাবীর এক বিরাট জামাআতও তাঁর সঙ্গী হন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

হুদায়বিয়া মক্কা হতে এক মনযিল দূরে অবস্থিত একটি কূপ এবং এই নামানুসারে এখানকার গ্রামের নামও হুদায়বিয়া বলে খ্যাত। মহানবী ﷺ এখানে পৌঁছে যাত্রা-বিরতি করেন।

মহানবী ﷺ-এর মু'জিযা

এখানে একটি শুষ্ক কূপ ছিল। মহানবী ﷺ-এর মু'জিযার ফলে এতে বিপুল পানির উৎপত্তি হল। উপস্থিত

এখানে পৌঁছে মহানবী ﷺ হযরত উছমান (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। যেন তিনি কুরায়শদেরকে অবহিত করেন যে, মহানবী ﷺ এবার শুধু বায়তুল্লাহ্ শরীফের যিয়ারত এবং উমরা পালন করার জন্যই আগমন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। হযরত উছমান (রা) মক্কায় পৌঁছার সাথে সাথেই কাফিররা তাকে আটকিয়ে ফেলল। মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, কাফিররা হযরত উছমানকে হত্যা করেছে। মহানবীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনি একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে বসে সাহাবীদের নিকট হতে জিহাদের বায়আত গ্রহণ করলেন। এর বর্ণনা পবিত্র কুরআনে রয়েছে এবং একেই 'বায়আতে রিযওয়ান' বলা হয়।

পরে জানা গেল যে, সংবাদটি মিথ্যা, বরং কুরায়শরা সন্ধির শর্তসমূহ ঠিক করার জন্য সুহায়ল ইবনে আমরকে প্রেরণ করেছে। নিম্নবর্ণিত শর্তে অঙ্গীকারপত্র লিপিবদ্ধ হল এবং দশ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হল।

১. মুসলমানগণ এবার উমরা আদায় না করেই ফিরে যাবেন।
২. আগামী বছর হজ্জ করতে এসে মাত্র তিন দিন অবস্থান করে চলে যাবেন।
৩. অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তবুবারি সাথে থাকলে তা কোষবদ্ধ থাকবে।
৪. কোন লোক যদি মক্কা হতে মদীনায় চলে যায়, তাহলে মহানবী ﷺ তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন।
৫. আর মদীনা হতে কেউ মক্কায় চলে আসলে কুরায়শরা তাকে ফেরত পাঠাবে না।
৬. এই সন্ধির মেয়াদ হবে দশ বছর।
৭. এই সময়ের মধ্যে কোন যুদ্ধ, চুক্তি লংঘন বা প্রতারণার ঘটনা ঘটবে না ইত্যাদি।

এ শর্তগুলো বাহ্যত যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল এবং একান্তই পরাজয়সুলভ ছিল, কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা এটিকে 'মহান বিজয়' নামে অভিহিত করেন। আর এই সফরেই সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়। সাহাবীগণ এইভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রা) বারবার মহানবী ﷺ-কে এই সন্ধি মেনে না নিবার জন্য অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "এটাই আমার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" সুতরাং পরবর্তী কালের ঘটনাসমূহ এই রহস্যের সমাধান করে দেয়। যেমন, এই সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মক্কা ও মদীনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। কাফিররা মহানবীর কাছে এবং মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে।

এদিকে ইসলামী চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি কাফিরদেরকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে লাগল। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনানুযায়ী ঐ সময় এত বেশী লোক মুসলমান হয় যে, ইতোপূর্বে আর কখনো এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়েরই পটভূমি।

বিশ্বের শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

এই সন্ধির ফলে রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়ে গেল। মহানবী ﷺ সত্যের অবিনশ্বর বাণী দুনিয়ার সকল শাসকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে মনস্থ করলেন।

সুতরাং এই উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনে উমায়্যা (রা)-কে আবিসিনিয়ার বাদশাহ আসহামা নাজাশীর নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি মহানবীর পবিত্র পত্রখানা তাঁর উভয় চোখের উপর স্থাপন করলেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে নীচে মাটির উপর বসে পড়লেন। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মহানবী ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিল। হযরত দাহ্ইয়া কালবীকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করা হল। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে সত্য নবী তা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি আর অতীতের আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট জানতে পেরেছিলেন। সুতরাং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু এতে তার উপর তার প্রজারা ক্ষেপে গেল। তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন যে, মুসলমান হয়ে গেলে এই সমস্ত লোক তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। এ জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রইলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে হুযায়ফা (রা)-কে পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নিকট পাঠান হল। এই হতভাগা মহানবী ﷺ-এর পবিত্র পত্রের সাথে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করল এবং পত্রটি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। মহানবী ﷺ তা জানতে পেরে বলেছিলেন, "আমার পত্র যেরূপ সে টুকরা টুকরা করেছে আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে তদ্রূপ টুকরা টুকরা করে দিবেন।" এর কিছুদিন পরেই খসরু পারভেয স্বয়ং তার পুত্র শেরুভিয়ার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতিব ইব্নে আবী বালতাআ (রা)- কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট পাঠান হয়েছিল। তিনি হযরত হাতিবের সাথে বেশ সদ্ব্যবহার করেন এবং মহানবী ﷺ-এর জন্য কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তার মধ্যে একজন বাঁদী মারিয়া কিবতিয়াও ছিলেন। দুলদুল নামে একটি সাদা খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, এক হাজার দীনার ও বিশ জোড়া জামা-কাপড়ও উপঢৌকনের মধ্যে ছিল।

হযরত আমর ইবনে আসকে আম্মানের বাদশাহগণ অর্থাৎ জায়ফার ও আবদুল্লাহর নিকট প্রেরণ করা হয়। তারাও ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অতীতের কিতাবাদির মাধ্যমে মহানবী ﷺ-এর নুবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁরা তখন হতেই প্রজাসাধারণের নিকট হতে যাকাত আদায় করতে শুরু করেন এবং হযরত আমর ইবনে আস-এর হাতে সোপর্দ করেন। (সুরুলুল মাহযূন)

হযরত খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা) ও হযরত আমর ইব্নে আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) তখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে বিশেষ করে উহুদের যুদ্ধে শুধুমাত্র তার কারণেই কাফিরদের স্খলিত পা দৃঢ় ও শক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ নির্ঘাত পরাজয়ের মুখেও তারা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথে আমর ইবনে আসের সাথে সাক্ষাত হল। জানা গেল, তিনিও একই উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেছেন। উভয়ে এক সাথে মদীনা পৌঁছলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। (ইসাবা-ইবনে হাজার আসকালানী)

সপ্তম হিজরী

খায়বারের যুদ্ধ

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনূ নাযীর যখন খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, ঠিক তখন হতেই খায়বার যাবতীয় ইহুদী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। খায়বার মদীনা হতে সিরিয়ার দিকে তিন-চার মনযিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর। (যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭)

খায়বারের ইহুদীরা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। তাদের এই অশুভ তৎপরতা চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্য হিজরী সপ্তম সনের মুহাররম অথবা জমাদিউল আওয়াল মাসে মহানবী ﷺ চারশত পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহীসহ মোট ষোলশত লোকের বাহিনী নিয়ে খায়বার অভিমুখে অভিযান করেন। তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং ইহুদীদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রা) সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাই খায়বারের কপাট উপড়িয়ে ফেলেন। অথচ ৭০ জন লোকের পক্ষেও সেটি নাড়ান সম্ভব ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি এই দরযাটি ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন। এই কারণেই হযরত আলী (রা)-কে ফাতেহে খায়বার বা খায়বার বিজেতা বলা হয়। (যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৯)

ফাদাক বিজয়

খায়বার বিজয়ের পর মহানবী ﷺ ফাদাকের ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে সন্ধি স্থাপন করল।

উমরাতুল কাযা

হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যে উমরা ত্যাগ করা হয়েছিল এবং কুরায়শদের সাথে যে চুক্তি হয়েছিল যে, মহানবী ﷺ আগামী বছর উমরা পালন করবেন, সেই চুক্তি মুতাবিক এই বছর মহানবী ﷺ সকল সাহাবীসহ পুনরায় মক্কায় গমন করেন এবং উমরা সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টম হিজরী

মু'তার যুদ্ধ

মু'তা সিরিয়ার বালকা শহরের সন্নিকটে বায়তুল মুকাদ্দাস হতে প্রায় দুই মনযিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এখানেই মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর কারণ ছিল এই যে, রোম-সম্রাটের পক্ষে বুসরার শাসনকর্তা আমর ইবনে ওরাহবীল মহানবী ﷺ-এর দূত হারিছ ইবনে উমায়র (রা)-কে হত্যা করেছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল একটি গর্হিত ও অমার্জনীয় অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে তিন হাজার সাহাবীর একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। মুসলমানগণ মু'তার নিকট উপনীত হলে রোমানরা দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তা'আলা দেড় লক্ষ কাফিরের উপর তিন হাজার মুসলমানের ভীতি এমনভাবে সঞ্চারিত করে দিলেন যে, পশ্চাদপসরণ ব্যতীত তারা প্রাণ বাঁচানোর অন্য কোন উপায়ই খুঁজে পেল না। (তালখীসুল-সীরাত)

মক্কা বিজয়

হুদায়বিয়ার চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল, মুসলমানগণ পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করে আসছিলেন। কিন্তু হিজরী অষ্টম সালে কুরায়শরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করল। মহানবী ﷺ একজন দূতের মাধ্যমে চুক্তিমালা নবায়নের জন্য কুরায়শদের সামনে কতিপয় শর্ত উপস্থাপন করলেন এবং শেষের দিকে লিখে দিলেন যে, এই শর্তগুলো তাদের মনোপূত না হলে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙ্গে গেছে বলে মনে করতে হবে। কুরায়শরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই পসন্দ করল।

মহানবী ﷺ জিহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করলেন এবং হিজরী অষ্টম সালের ১০ই রমযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০ হাজার মতান্তরে ১২ হাজার লোকের বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মাগরিবের সময় হলে সকলে রোযার ইফতার করলেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ অপেক্ষাকৃত উপরের দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করার জন্য প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, কেউ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না বাধালে তোমরাও তার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না।

এদিকে মহানবী ﷺ স্বয়ং অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সাধারণ ঘোষণা প্রচার করে দিলেন যে, "যে, ব্যক্তি কা'বাঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরযা বন্ধ করে রাখবে, সেও নিরাপদ।" অবশ্য মহানবী ﷺ ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীর রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, এদের অস্তিত্বই ছিল সকল বিশৃংখলার উৎস। কিন্তু এরা সকলেই ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল এবং পরে তাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পরে মদীনায় পৌঁছে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

২০শে রমযান মহানবী ﷺ তওয়াফ সম্পন্ন করলেন। তখনো পর্যন্ত কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি রক্ষিত ছিল। মহানবী ﷺ যখন কোন মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখন একখণ্ড কাঠ দিয়ে ইঙ্গিত করতেন, আর অমনি মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করছিলেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۔ "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে। আর মিথ্যা তো বিদায় নেবারই।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত ৮১)

মক্কা বিজয়ের পর কুরায়শদের সাথে মুসলমানদের আচরণ

তওয়াফ সমাপ্ত করে মহানবী ﷺ কা'বা শরীফের চাবিবাহক উছমান ইবনে তালহা শায়বীর নিকট হতে কা'বাগৃহের চাবি নিয়ে কা'বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে বের হয়ে মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি মসজিদে গেলেন। আজ তিনি কুরায়শদের সম্পর্কে কি নির্দেশ জারী করেন, লোকজন গভীর উৎকণ্ঠার সাথে তারই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সকল সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শান্তির দূত মুহাম্মদ ﷺ কুরায়শদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "আজ কোন বাড়াবাড়ি নেই। তোমরা সকল দিক দিয়েই স্বাধীন ও নিরাপদ।" অনন্তর তিনি কা'বা শরীফের চাবি তাদেরকে ফেরত দিলেন।

(তাদ্বীসুস-সীরাত)

মহানবী ﷺ-এর মহত্ত্ব ও আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

আবূ সুফিয়ান ছিলেন মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরায়শদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা। ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত কুরায়শদের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে তিনিই প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা হতে বের হলে সাহাবীগণ তাকে গ্রেফতার করে ফেললেন। কিন্তু গ্রেফতার করে যখন মহানবীর কাছে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। মহানবীর এই মহত্ত্ব ও উদারতার ফলশ্রুতিতে আবূ সুফিয়ান সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলেন। (এখন আমরা তাকে "হযরত আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু" বলে থাকি।)

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মহানবী ﷺ-এর সামনে উপস্থিত হল। করুণার ছবি দয়ার নবী মুহাম্মদ ﷺ বললেন, "শান্ত হও। নিশ্চিন্ত থাক। আমি কোন রাজা-বাদশাহ নই। বরং একজন অতি সাধারণ মায়ের সন্তান। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী ﷺ পনের দিন সেখানে অবস্থান করেন। (সীরাতে মোগলতাঈ)

এই সময় মদীনার আনসারগণ এই ভেবে কষ্ট পেতে লাগলেন যে, এখন তো মহানবী ﷺ মক্কাতেই থেকে যাবেন আর আমরা তাঁর নিকট হতে দূরে সরে পড়ব। কিন্তু মহানবী ﷺ তাঁদের এই সন্দেহ আঁচ করতে পেরে বললেন, "না, বরং এখন যে আমাদের মৃত্যু ও জীবন তোমাদের সাথেই জড়িত।" অতঃপর হযরত আত্তাব ইবনে উসায়দ (রা)-কে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি পবিত্র মদীনায় ফিরে গেলেন।

হুনায়নের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর আরবের জনগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল। অনেক লোক ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও কুরায়শদের প্রতিপত্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিলেন। এখন তাদের সকলেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে লাগলেন। অবশিষ্ট লোকদেরও এখন ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি বা সাহস ছিল না। অবশ্য হাওয়াযিন ও বনূ ছাকীফ গোত্রদ্বয় আত্ম-সম্মানবোধের খাতিরে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার সংকল্প নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হল। মহানবী ﷺ এই সংবাদ অবগত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ১২ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলেন। এদের মধ্যে দশ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির, যারা মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা হতে মহানবী ﷺ-এর অনুগামী হয়েছিলেন। আর দুই হাজার ছিলেন নও-মুসলিম, যারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সংখ্যাটি ছিল তখন পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

হিজরী অষ্টম সালের ৬ই শাওয়াল আল্লাহর এই বাহিনী রওয়ানা হল। তারা যখন হুয়ায়ন প্রান্তরে উপনীত হলেন (হুনায়ন মক্কা হতে তিন মনযিল দূরে তায়েফের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৭২), তখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যেহেতু তখন পর্যন্ত সৈন্যদের ব্যূহ-বিন্যাসই সমাপ্ত হয়নি, তাই মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটতে লাগল।

এই পশ্চাদপসরণের বাহ্যিক কারণ হিসাবে ব্যূহ-বিন্যাসের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করা হলেও বাস্তব কারণ ছিল অন্যটি। মুসলমানগণ এ সময় চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও সাজ-সরঞ্জাম প্রত্যক্ষ করে

আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন এবং কোন কোন সাহাবী এমনকি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মত লোকের মুখেও "আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না" এই উক্তি উচ্চারিত হয়েছিল। এ জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তারা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, তাদের জয়-পরাজয় আল্লাহ্র হাতে এবং তা তীর ও তলোয়ারের খেলামাত্র নয়। বদর যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এতবড় বিজয় আর হুনায়নের যুদ্ধে এত বিপুল সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ সত্ত্বেও প্রথম দিকে পরাজয়ের এটাই অন্তর্নিহিত রহস্য।

মহানবী ﷺ এই সময় দুটি বর্ম পরিধান করে দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। লোকজনকে পশ্চাদপসরণ করতে দেখে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশে হযরত আব্বাস (রা) মুসলমানদেরকে এক বীরত্বব্যঞ্জক আওয়ায দ্বারা যুদ্ধরত থাকার আহ্বান জানান। ফলে তাদের নড়বড়ে পা পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে গেল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। মহানবী ﷺ এক মুষ্টি মাটি উঠিয়ে শত্রু বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করলেন, যা মহান আল্লাহ্র কুদরতে প্রতিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের চোখে প্রবেশ করল। একটি চোখও রক্ষা পেল না। শেষ পর্যন্ত বাহিনী ভীত ও পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। মুসলিম বাহিনীর চার ব্যক্তি আর কাফির শত্রুবাহিনীর সত্তর জনেরও অধিক সৈন্য নিহত হল। মুসলমানরা যুদ্ধরত অবস্থায় শিশু ও নারীদের উপর হাত উঠাতে উদ্যত হলে মহানবী ﷺ তাদেরকে এ কাজ হতে বিরত রাখলেন। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৭২)

তায়েফ যুদ্ধ

এরপর মহানবী ﷺ বনূ ছাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্র তায়েফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। প্রায় ১৮ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখা হল, কিন্তু বিজয় অর্জিত হল না। তাই তিনি যখন অবরোধ তুলে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতে লাগলেন, তখন পথিমধ্যে জিরানা নামক স্থানে তায়েফ হতে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট উপস্থিত হল এবং হুনায়ন যুদ্ধে তাদের যেসকল লোক বন্দী হয়েছিল তাদেরকে প্রত্যর্পণ করার আবেদন জানাল। মহানবী ﷺ তাদের আবেদন মনযুর করে তাদের বন্দীদেরকে প্রত্যর্পণ করলেন। অনন্তর মহানবী ﷺ মদীনায় উপনীত হলে তায়েফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উমরা-ই-জি'রানা

(সীরাতে মোগলতাঈ, পৃঃ ৭৪)

হুনায়ন যুদ্ধের পর জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে মহানবী ﷺ উমরা পালন করার ইচ্ছা করলেন এবং ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমন করলেন। অতঃপর উমরা সমাপনান্তে সেই রাতেই জি'রানা প্রত্যাবর্তন করলেন।

(তালখীসুস-সীরাত, পৃঃ ৫৪

নবম হিজরী

তাবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন

তায়েফ হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মহানবী ﷺ মদীনাই অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে, মু'তার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য মদীনা হতে ১৪ মনযিল দূরে তাবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করেছে। মহানবী ﷺ-ও জিহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। তা ছাড়া গরমও পড়ছিল অত্যধিক। এতদ্সত্ত্বেও আত্মত্যাগী সাহাবীগণ জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। জিহাদী তহবীলে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান হলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সমুদয় সম্পদ মহানবী ﷺ সমীপে এনে হাযির করলেন। হযরত উছমান (রা) যুদ্ধোপকরণের মাধ্যমে এক বিরাট সাহায্য পেশ করলেন। ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। (মোগলতাঈ, পৃঃ ৭৬)

রজব মাসের বৃহস্পতিবার মহানবী ﷺ ত্রিশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনীসহ তাবূকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

কয়েকটি দু'জিযা

মহানবী ﷺ পথিমধ্যে দেখতে পেলেন হযরত আবূ যর গিফারী (রা) দল হতে পৃথক হয়ে চলছেন। তখন মহানবী ﷺ বললেন, "এই লোকটি দুনিয়ার সকল সম্প্রদায় হতে পৃথক হয়েই চলবে, পৃথক হয়েই জীবন যাপন করবে এবং পৃথক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করবে।" বস্তুত পরবর্তীতে তা-ই হয়েছিল।

এই যুদ্ধেই মহানবী ﷺ-এর উটনী হারিয়ে যায়। মহানবীকে এই যোগে অবহিত করা হল যে, উটনীটির লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সাথে আটকে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখা গেল, অবস্থা তদ্রূপই ছিল।

(মোগলতাই, পৃ: ৭৭)

মুসলমানগণ যখন তাবুক পৌঁছলেন, তখন সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হিমস চলে গিয়েছিল। মহানবী ﷺ হযরত খালিদ (রা)-কে আকীদার নামক খৃষ্টান শাসনকর্তার নিকট প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলেন, তোমরা রাত্রি বেলা এই অবস্থায় তার সাক্ষাৎ পাবে যে, সে তখন শিকারে মত্ত। হযরত খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছে হুবহু তদ্রূপই দেখতে পেলেন এবং তাকে বন্দী করে মহানবীর দরবারে নিয়ে আসলেন।

মহানবী ﷺ পনের-বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হল না। এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ অভিযান। হিজরী নবম সালের রমযান মাসে মহানবী ﷺ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মসজিদে যিরারে অগ্নি-সংযোগ

তাবুক হতে ফিরে আসার পর মহানবী ﷺ সেই জায়গাটিতে অগ্নি সংযোগের নির্দেশ দিলেন, যা মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে তৈরী করেছিল এবং মুসলমানদেরকে প্রতারণা করার লক্ষ্যে এর নাম দিয়েছিল মসজিদ। (সীরাতে মোগলতাই)

এ ঘটনার দ্বারা এ বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মসজিদে যিরার বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ প্রকৃতপক্ষে মসজিদই নয়।

প্রতিনিধি দলের আগমন

দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর রাস্তাঘাট নিরাপদ হয়ে গেলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার (যার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তারই প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী) অনেকাংশে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ জন্যই সেই সন্ধির নাম আসমানী দস্তরে ফাতহ মুবীন বা প্রকাশ্য বিজয় রাখা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও কিছু লোক কুরায়শদের চাপে ইসলামে দীক্ষিত হতে পারছিল না। মক্কা বিজয় এই অসুবিধাটুকুও অপসারিত করে দিল। এখন পবিত্র কুরআনের শাশ্বত বাণী সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছে সকলের অন্তরে তার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করল। ফলে যে সকল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের কোনক্রমেই পসন্দ করত না, তারাও দলে দলে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে প্রতিনিধি দলের আকারে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হতে লাগল এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। এই প্রতিনিধি দলসমূহের অধিকাংশই হিজরী নবম সালে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়।

ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

তাবুক যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পরেই ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল মহানবী ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। এরপর ক্রমাগত প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়, যার সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার মধ্য থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

বনূ ফাযারার প্রতিনিধি দল : বনূ ফাযারার গোত্রের লোকেরা পূর্বেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। পরে প্রতিনিধি দল আকারে মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়।

বনূ তামীমের প্রতিনিধি দল : বনূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর সকলেই মুসলমান হয়ে দেশে ফিরে যায়।

বনূ সা'দ ইব্নে বকরের প্রতিনিধি দল : এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যিমাম ইব্নে ছা'লাবা। তিনি মহানবী ﷺ-কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। মহানবী ﷺ তাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করায় তাঁর মনের সকল সংশয় কেটে যায়। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নিজ গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করে ইসলামের প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কিন্দার প্রতিনিধি দল : সূরা 'সাফ্ফাত'-এর প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করার সাথে সাথেই এরা মুসলমান হয়ে যান।

বনূ আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দল : এরা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। এদের সকলেই মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে মহানবী ﷺ তাদেরকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেন।

বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল : এরাও মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মুসায়লিমাও ছিল। সে পরে মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবী করে মিথ্যাবাদী মুসায়লিমা নামে অভিহিত হয়। পরে নুবুওয়াতের এই মিথ্যা দাবীর কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে সাহাবীদের হাতে সদলবলে নিহত হয়।

বনূ কাহ্তানের প্রতিনিধি দল : বনূ কাহ্তান গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত যায়দ আল-খায়ল। এরা সবাই মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বনূ হারিছের প্রতিনিধি দল : এদের মধ্যে হযরত খালিদ ইব্নে ওয়ালীদ (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীগণসহ মুসলমান হয়ে যান।

এভাবে বনূ আসাদ, বনূ মুহারিব, হামদান, গাস্সান প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধি দলের কেউ কেউ উপস্থিতির পূর্বে এবং কেউ কেউ উপস্থিতির পরে মুসলমান হন। হিমায়ারের বিভিন্ন সরদার– যারা নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ বলে বিবেচিত হত– তাদের পক্ষে দূতগণ সংবাদ নিয়ে আসেন যে, তারা সকলেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এইভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রতিনিধি দলসমূহ উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলেন। ফলে দশম হিজরী সালে বিদায় হজ্জের সময় মহানবী ﷺ-এর সাথে এক লাখেরও বেশী মুসলমান শরীক হন। যারা এই হজ্জে উপস্থিত হতে পারেননি, তাদের সংখ্যা এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশী ছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়ন : তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে এসে হিজরী নবম সালের যী-কা'দাহ মাসে মহানবী ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরে হজ্জ মনোনীত করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করেন।

দশম হিজরী

বিদায় হজ্জ

হিজরী দশম সালের যী-কা'দাহ মাসের ২৫ তারিখ সোমবার মহানবী ﷺ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুআযযমা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাহাবীদের এক বিরাট দলও তাঁর সঙ্গী হলেন। যাদের সংখ্যা ছিল এক লাখের চেয়েও বেশী। মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৪ঠা যিলহজ্জ শনিবার মক্কা মুআযযামায় প্রবেশ করেন এবং শরীঅতের বিধান অনুযায়ী হজ্জ আদায় করেন।

বিদায় হজ্জের ভাষণ

যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে গমন করে মহানবী ﷺ এক ঐতিহাসিক ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। এটি ছিল হিতোপদেশ ও বিধিবিধান সম্বলিত মহান আল্লাহ্র সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ বার্তা। বিশেষ করে এই ভাষণের নিম্নোক্ত বাণীগুলো হৃদয়পটে অংকন করে রাখার মতো।

"হে লোকসকল! আমার কথা শ্রবণ কর, যাতে আমি তোমাদের জন্য সকল প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত করতে পারি। আগামী বছর পুনরায় তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব কিনা, তা আমার জানা নেই।"

"তোমাদের নিকট কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের জানমাল, ইয়যত-আব্রু ঠিক তেমনিভাবে সম্মানিত, যেমনিভাবে আজকের (আরাফার) এই দিন, এই যিলহজ্জ মাস এবং এই (মক্কা) নগরী তোমাদের কাছে সম্মানিত। এ জন্য কারো কাছে কারো কোন আমানত থাকলে তা অবশ্যই আদায় করে দিবে।"

"হে লোক সকল! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীগণের কিছু অধিকার রয়েছে। তাদের উপরও তোমাদের কিছু অধিকার আছে। সব লোকই পরস্পর ভাই ভাই। কারো জন্য তার ভাইয়ের মাল তার অনুমোদন ছাড়া হালাল হবে না। আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না এবং একে অন্যকে হত্যা কর না। আমি তোমাদের জন্য আমার পরে আল্লাহ্‌র কিতাব রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা এর নির্দেশাবলী শক্তভাবে আঁকড়ে ধর, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।" "হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তা (রব্ব) এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত, যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদাভীরু। কোন আরব কোন অনারবের উপর খোদাভীরুতা ব্যতীত অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী হতে পারে না। মনে রাখবে, আমি আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক যে, আমি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট এসব কথা পৌঁছে দেয়।"

হজ্জ সমাপন করে মহানবী ﷺ ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। তারপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

একাদশ হিজরী

সারিয়্যাহ-ই-উসামা

মক্কা থেকে ফিরে এসে মহানবী ﷺ হিজরী একাদশ সনের ২৬ শে সফর সোমবার রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশে এক অভিযান প্রস্তুত করেন।

এই অভিযানে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর ফারূক (রা) এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর ন্যায় প্রবীণ সাহাবীগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব হযরত উসামা (রা)-এর উপর অর্পিত হয়। এটাই ছিল সর্বশেষ অভিযান, যা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা মহানবী ﷺ নিজে সম্পন্ন করেন। এটি রওয়ানা হবার পূর্ব-মুহূর্তে মহানবী ﷺ জ্বরে আক্রান্ত হন।

মহানবী ﷺ-এর অন্তিম পীড়া

হিজরী একাদশ সনের সফর মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিবাগত রাতে মহানবী ﷺ "বাকী গারকাদ" নামক গোরস্তানে গমন করে কবরবাসীগণের উদ্দেশ্যে মাগফিরাতের দু'আ করেন এবং বলেন, "হে কবরবাসীগণ! তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও কবরের অবস্থান শুভ হোক। কেননা, এখন পৃথিবীতে ফেতনার তমসা ছড়িয়ে পড়েছে।" সেখান থেকে ফিরে আসার পর মাথায় ব্যথা অনুভব করলেন এবং সাথে সাথে জ্বরও এসে গেল।
(সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২২)

সহীহ বুখারীর বর্ণনানুযায়ী এই জ্বর ক্রমাগত ১৩ দিন স্থায়ী হয়। এই রোগেই তাঁর ওফাত হয়।
(ফাতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃঃ ৯৮)

এই সময় তিনি তাঁর সভ্যাস মুতাবিক প্রত্যহ পবিত্র সহধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত হতে থাকেন। অসুখ দীর্ঘ এবং কঠিন আকার ধারণ করলে অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করার জন্য অন্যান্য সহধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চাইলে সকলেই অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতী

ক্রমান্বয়ে পীড়া এত প্রবল আকার ধারণ করলো যে, মহানবী ﷺ আর মসজিদে গমন করতে পারছিলেন না। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়ান। এ সময় একদিন ঘটনাক্রমে হযরত আবূ

বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত আব্বাস (রা) আনসারদের একটি মজলিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলেন তারা ক্রন্দন করছেন। ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, "মহানবীর মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি।" হযরত আব্বাস (রা) মহানবী ﷺ-কে এই সংবাদটি অবহিত করলেন। এ কথা শুনে মহানবী ﷺ হযরত আলী (রা) ও হযরত ফযল (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বের হলেন। হযরত আব্বাস (রা) তাঁর আগে আগে ছিলেন। মহানবী ﷺ মিম্বরে আরোহণ করতে চাইলেন। কিন্তু দুর্বলতা হেতু নীচের সিঁড়িতেই বসে পড়লেন। উপরে উঠতে পারলেন না। অতঃপর তিনি এক সালংকার ভাষণ প্রদান করলেন। যার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল।

শেষ নবীর শেষ ভাষণ

"হে লোক সকল! আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আশংকা করছ। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন ছিলেন যে, আমিও থাকব? হাঁ, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সাথে মিলিত হবে। তোমাদের মিলনের স্থান হচ্ছে "হাওয-ই-কাওছার।" অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউ পরকালে হাওয-ই-কাওছার হতে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করার বাসনা রাখবে, সে যেন তার হাত এবং মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তা হতে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে মুহাজিরদের সাথে সদ্ব্যবহারের ওসিয়ত করছি।"

অতঃপর আরো বললেন, "যখন লোকেরা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করে, তখন তাদের শাসক এবং বাদশাহগণ তাদের সাথে ন্যায়ানুগ ব্যবহার করে। আর যখন তারা তাদের পালনকর্তার অবাধ্যতা করে, তখন তাদের শাসকগণও তাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করে দেয়।" (দুরূসুস-সীরাতিল হাশিমিয়া)

এরপর গৃহে ফিরে আসলেন এবং ওফাতের পাঁচ অথবা তিন দিন পূর্বে আরো একবার বাইরে আগমন করলেন। তখন তাঁর পবিত্র মস্তকে পট্টি বাঁধা ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নামায পড়াচ্ছিলেন। মহানবীর আগমন টের পেয়ে তিনি পিছনে সরে আসতে লাগলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় বারণ করলেন এবং নিজে তাঁর বাম পার্শ্বে বসে পড়লেন। নামাযের পর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন, "আমার প্রতি আবূ বকরের দান সবচেয়ে বেশী। আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাউকেও খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম, তাহলে আবূ বকরকেই বানাতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ খলীল হতে পারে না, তাই আবূ বকর আমার দীনী ভাই এবং বন্ধু।" তিনি আরো বললেন, "আবূ বকরের দরযা ছাড়া মসজিদে নববীতে অপর লোকদের জন্য যত দরযা রয়েছে, তার সবকয়টি বন্ধ করে দেয়া হোক।" (ফাতহুল বারী, পারা ১২, পৃঃ ২৫৬)

ইবনে হিব্বান এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, মহানবী ﷺ-এর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রা)-ই যে ইসলামী দুনিয়ার খলীফা হবেন আলোচ্য হাদীসে এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। (ফাতহুল বারী, পারা ১৪, পৃঃ ৩৫৬)

এরপর ২রা রবীউল আওয়াল সোমবার যখন লোকেরা হযরত আবূ বকরের ইমামতীতে ফজরের নামায পড়ছিলেন, তখন হঠাৎ মহানবী ﷺ হযরত আয়েশার প্রকোষ্ঠের পর্দা উঠিয়ে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং মৃদু হাস্য করলেন। আবূ বকর (রা) এটা লক্ষ্য করে পিছনে সরে আসতে লাগলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবীগণের মনও নামাযের মধ্যেই এলোমেলো হয়ে যেতে লাগল। মহানবী ﷺ তাদেরকে হাতের ইঙ্গিতে নামায পূর্ণ করার আদেশ দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন এবং পর্দা নামিয়ে দিলেন। এরপর আর কখনো তিনি বাইরে আগমন করেননি। এ দিনই যুহরের পর মহানবী ﷺ এই পৃথিবী ত্যাগ করে রফীক-ই-আ'লার (পরম বন্ধুর) সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তখন মহানবী ﷺ-এর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

মহানবীর সর্বশেষ বাক্যসমূহ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, অসুস্থতার দিনগুলোতে মহানবী ﷺ কখনো কখনো পবিত্র চেহারার উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বলতেন, ইহুদী ও খৃস্টানদের উপরে আল্লাহ্ তা'আলার অভিশাপ এ কারণেই বর্ষিত

যে, তারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলোকে নিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলমানগণ এ ধরনের বিষয় হতে বেঁচে থাকে। (বুখারী, পৃঃ ১০৫)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আরো বলেন, ওফাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মহানবী ﷺ ছাদের দিকে তাকাতেন এবং বলতেন, اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى 'হে আল্লাহ! আমি রফীকে আ'লা তথা সর্বোচ্চ বন্ধুকেই পসন্দ করি।'

কোন কোন বর্ণনা মতে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মহানবী ﷺ এর যবান মুবারকে اَلصَّلٰوةَ اَلصَّلٰوةَ –নামায নামায- এই শব্দ দুটি উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যতক্ষণ শব্দ শোনা যাচ্ছিল এই শব্দ দুটিই হচ্ছিল। (খাসাইসে কুবরা)

ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার রিওয়ায়াত উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করেছেন যে, ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে মহানবী ﷺ এর যবান মুবারক হতে اَلصَّلٰوةَ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ এই বাক্যটি উচ্চারিত হচ্ছিল। অর্থ ঃ নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ লোকের হক সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখবে।

ওফাতের সংবাদ সাহাবীগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তা'রা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মতো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী মহানবী ﷺ এর শোকাতিশয্যে তাঁর মৃত্যুকেই অস্বীকার করতে লাগলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আগমন করলেন এবং লোকজনকে ধৈর্যধারণ করার আহ্বান জানিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করলেন। ভাষণের শেষের দিকে বললেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ এর পূজা করত, সে শুনে রাখুক যে, তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক যে, তিনি অমর এবং চিরঞ্জীব।" এটি শ্রবণ করার পর সাহাবীদের চৈতন্য ফিরে আসল।

মহানবী ﷺ এর ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন করাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই সাহাবীগণ তাঁর কাফন-দাফনের পূর্বেই খলীফা নির্বাচন করাকে অত্যন্ত জরুরী বিবেচনা করলেন। কেননা, সর্ববিধ দীনী ও পার্থিব কল্যাণকর্মের অসুবিধা, ভেতরের এবং বাইরের শত্রুদের আক্রমণাশংকা প্রভৃতি ছাড়াও মহানবী ﷺ এর কাফন-দাফনের ব্যাপারেও মত-বিরোধ দেখা দেয়ার প্রবল আশংকা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এ বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে যদিও সময় লেগেছিল এবং এ কারণেই সোমবার বিকাল হতে বুধবার রাত পর্যন্ত মহানবী ﷺ এর কাফন-দাফন স্থগিত রাখতে হয়েছিল। বুধবার রাতে হযরত আলী (রা) এবং হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁকে গোসল করিয়ে কাফন পরালেন এবং তাঁর জানাযার নামায পড়া হল। বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর ঘরে সেই স্থানটিতে কবর খনন করা হল, ঠিক যেই স্থানটিতে তিনি ওফাত পেয়েছিলেন। হযরত আবূ তালহা কবর খনন করলেন এবং হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা) প্রমুখ তাঁকে কবরে শোয়ালেন। মহানবী ﷺ এর কবর অর্ধ হাত উঁচু রাখা হয়।

মহানবী ﷺ এর মহান চরিত্র ও মু'জিযা

মহানবী ﷺ সবচেয়ে বেশী সাহসী, বীরত্বের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। কেউ যদি কোন কিছু তাঁর নিকট চাইত, তিনি সাথে সাথে তা দান করে দিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুগম্ভীর ও ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। সহাবীগণ একবার তাঁকে কাফিরদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ করার জন্য আবেদন করলেন। জবাবে তিনি বললেন, "আমি রহমত হয়ে এসেছি-অভিশাপ হয়ে নয়।" তাঁর পবিত্র নান্দান শহীদ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তখনো তাদের জন্য ক্ষমার দু'আই করেছিলেন। তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি কারো উপরে স্থির থাকত না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো নিকট হতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না এবং রাগও করতেন না। তবে আল্লাহ্র বিধানের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হলে রাগ করতেন। আর যখন তিনি রাগান্বিত হতেন, তখন কেউই তাঁর সামনে দাঁড়াবার সাহস পেত না। তাঁকে কোন দুটি কাজের মধ্যে যেকোন একটি গ্রহণের অধিকার দেয়া হলে তিনি সব সময় সহজটিকেই বেছে নিতেন যেন উম্মতের জন্য সহজতর হয়।

তিনি কখনো কোন খাবার জিনিসের খুঁত বের করেননি। তা পছন্দ হলে আহার করতেন, অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন। তিনি হেলান দিয়ে বসে আহার করতেন না। তাঁর জন্য কখনো পাতলা চাপাতি রুটি তৈরি করা হত

না। শসা এবং তরমুজ খেজুরের সাথে মিলিয়ে খেতেন। মধু এবং সকল প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য পসন্দ করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মহানবী ﷺ এমন অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন যে, তিনি অথবা তাঁর পরিবার-পরিজনের কেউ-ই পেট ভরে যবের রুটিও আহার করেননি। তাঁর পরিবারের একাধারে দুই দুই মাস এমনভাবে কেটে যেত যে, চুলায় আগুন জ্বালাবার পর্যন্ত ব্যবস্থা হত না। শুধু খুরমা আর পানি খেয়ে কাটিয়ে দিতেন।

মহানবী ﷺ নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন এবং কাপড়ে নিজেই তালি লাগিয়ে নিতেন। পরিবারের সকল কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন। রোগীর সেবা করতেন। কেউ তাঁকে দাওয়াত করলে সে ধনী হোক কি গরীব হোক তার বাড়ীতে চলে যেতেন। কোন দরিদ্রকে তার দারিদ্রের কারণে হেয় মনে করতেন না এবং কোন বড় থেকে বড় রাজা-বাদশাহকেও তার বাদশাহীর কারণে ভয় পেতেন না। বাহনের পিছনে নিজের গোলাম প্রভৃতিকে বসিয়ে নিতেন। মোটা কাপড় পরিধান করতেন এবং সেলাই করা জুতা পায়ে দিতেন। সাদা কাপড় সবচেয়ে বেশী পসন্দ করতেন। অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকর করতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হতে বিরত থাকতেন। নামায দীর্ঘ আর খুতবা সংক্ষিপ্ত করতেন। গোলাম আর গরীবদের সাথে চলাফেরায় লজ্জাবোধ করতেন না। সুগন্ধি পসন্দ করতেন এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করতেন। গুণীর সমাদর করতেন এবং কারো সাথে রুক্ষস্বরে কথা বলতেন না। কাউকে বৈধ খেলাধুলা করতে দেখলে তা হতে নিষেধ করতেন না। কখনো কখনো হাসি-তামাশা ও মনোরঞ্জনের কথা বলতেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সত্য ও বাস্তবতার বাইরে কিছু বলতেন না। সমস্ত মানবের মধ্যে তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ ও উত্তম চরিত্রবান ছিলেন। কেউ কোন কাজে অপারগতা প্রকাশ করলে তা মেনে নিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, "নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন।" অর্থাৎ কুরআন যা পসন্দ করত, তিনিও তা পসন্দ করতেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খোশবূ অপেক্ষা উত্তম খোশবূ কখনো শুঁকিনি।

মহানবী ﷺ-এর মু'জিযা

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ যখন কাউকে কোন প্রদেশের শাসনকর্তা করে পাঠান, তখন তার সাথে এমন কিছু নিদর্শন দিয়ে দেন, যা দেখে জনগণ তার শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে। যেমন, চাকর-চাকরানী, সৈন্যসামন্ত ও এমন কিছু ক্ষমতা যা সাধারণ কোন মানুষ কার্যকর করতে পারে না। এমনিভাবে যখন আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তাদের সাথে সত্যতা, দীনদারী, চরিত্র-মাধুরী এবং সর্ব প্রকার মানসিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতার নিদর্শনসমূহ ছাড়াও একটি অলৌকিক শক্তিও তাঁদের সাথে থাকে, যা দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক অবনত হয়ে যায়। এই সকল অলৌকিক শক্তি আর অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রকৃতির ঊর্ধ্বের ক্ষমতাসমূহকে মু'জিযা বলা হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ-এর মুজিযাসমূহ সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে পূর্ববর্তী নবীদের চেয়ে অনেক উত্তম ও অধিক।

পূর্ববর্তী নবীদের মু'জিযা 'পবিত্র কুরআন' আজো প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রয়েছে। যার সমকক্ষতা উপস্থাপন করতে দুনিয়ার সকল শক্তি ও মানব-দানব সকলেই অক্ষম হয়েছে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, অঙ্গুলির ইশারায় পানি প্রবাহিত হওয়া, কংকরের তাসবীহ পাঠ করা, কাষ্ঠস্তম্ভের ক্রন্দন করা, মহানবীকে বৃক্ষের সালাম করা, বৃক্ষকে ডাকা এবং তার চলে আসা, হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য মু'জিযা শুধু কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারাই নয়, বহু কাফিরের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত। পূর্বের ও পরের আলিমগণ যা গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করেছেন। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তার আলোচনা অসম্ভব বিধায় পরিত্যক্ত হল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَحَبِيْبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.